মারুফ

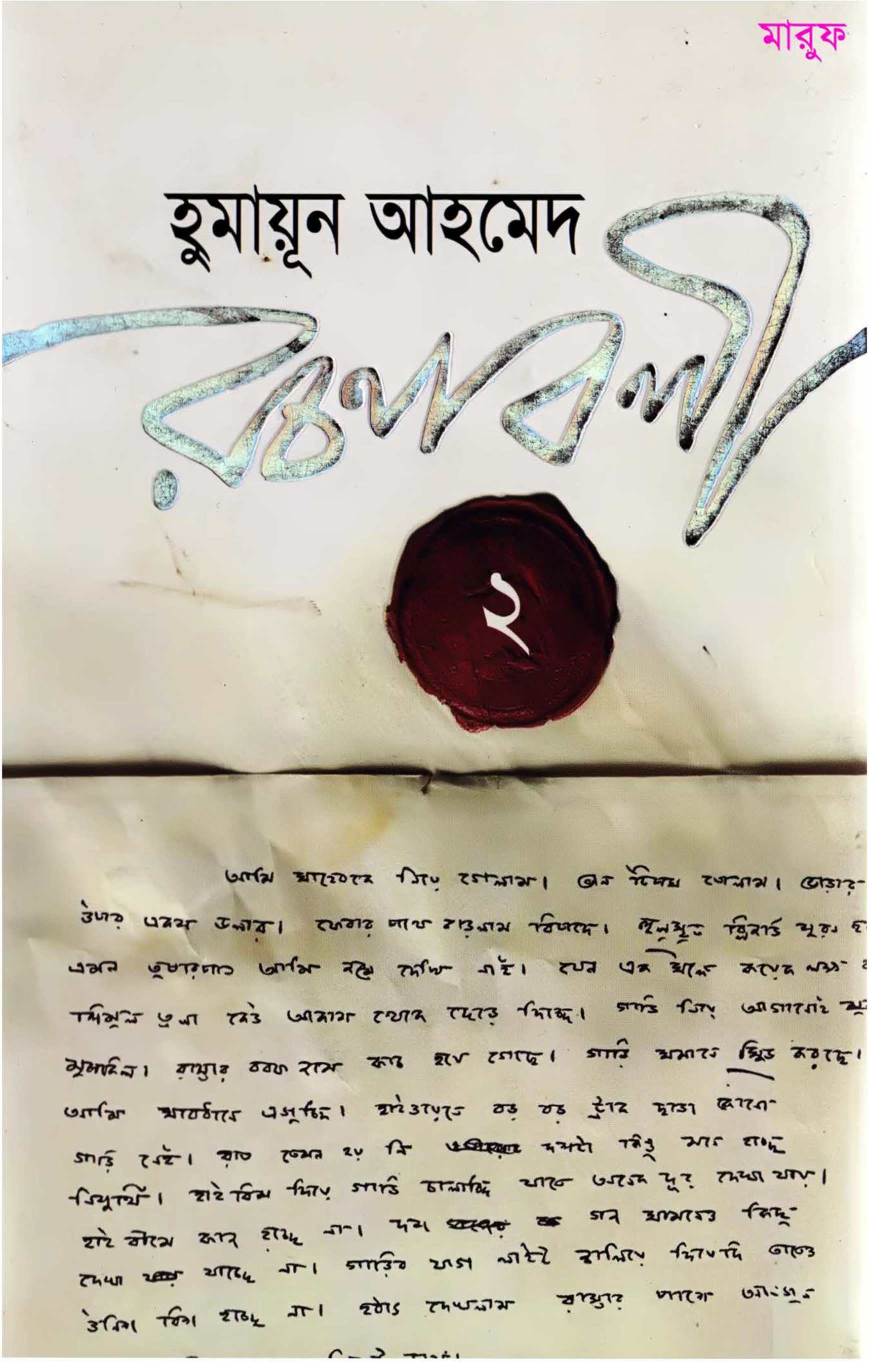

হুমায়ূন আহমেদ

রচনাবলী

২

হুমায়ূন আহমেদ

রচনাবলী

২

অন্যপ্রকাশ

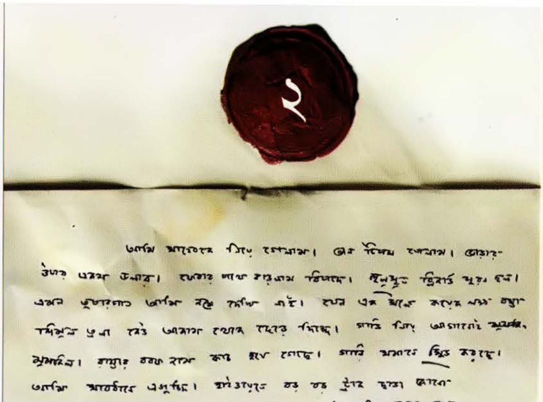

উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, কবিতা ও গান সাহিত্যের যে শাখায়ই হাত দিয়েছেন অর্জন করেছেন ঈর্ষণীয় সাফল্য আর অকল্পনীয় জনপ্রিয়তা। চলচ্চিত্র আর নাট্য পরিচালনায়ও তিনি সমান কৃতিত্বের অধিকারী। সব পরিচয়ের বড় পরিচয়, তিনি একজন নিবেদিতপ্রাণ লেখক। ষাট বছর জীবনের চার দশকেরও বেশি ব্যয় করেছেন লেখালেখিতে। জমে উঠেছে সাহিত্যের বিচিত্র আর বিপুল সম্ভার। সঙ্গতভাবেই সময় এসেছে বরেণ্য এ লেখকের রচনাবলী একসঙ্গে গ্রন্থিত করে তোলার।

এ প্রয়োজনের কথা মনে রেখেই হুমায়ূন রচনাবলী প্রকাশের উদ্যোগ। লেখকের ষাটতম জন্মদিনে প্রকাশিত রচনাবলী-র দ্বিতীয় খণ্ডে থাকছে : অন্যদিন, এই বসন্তে, সবাই গেছে বনে, তোমাকে, আনন্দ বেদনার কাব্য, তারা তিনজন, দেবী, অমানুষ, তোমাদের জন্য রূপকথা।

হুমায়ূন রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডে গ্রন্থিত 'অমানুষ' একটি ব্যতিক্রম রচনা— বিদেশী গল্পের পুনর্কথন। সুবিশাল হুমায়ূন-সাহিত্যে এ জাতীয় রচনা এই একটিই আছে।

প্রচ্ছদ :: মাসুম রহমান

বাংলা কথাসাহিত্যের ভুবনে প্রবাদ পুরুষ। গত পঁয়ত্রিশবছর ধরেই তাঁর তুঙ্গস্পর্শী জনপ্রিয়তা। এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। অধ্যাপনা ছেড়ে হঠাৎ করেই চলচ্চিত্র নির্মাণ শুরু করেন। *আগুনের পরশমণি, শ্রাবণ মেঘের দিন, দুই দুয়ারী, চন্দ্রকথা, শ্যামল ছায়া, নয় নম্বর বিপদ সংকেত, আমার আছে জল...* ছবি বানানো চলছেই। ফাঁকে ফাঁকে টিভির জন্যে নাটক বানানো।

এ দেশের সর্বোচ্চ সম্মান একুশে পদকসহ অসংখ্য পুরস্কার পেয়েছেন। দেশের বাইরেও তাঁকে নিয়ে প্রবল আগ্রহ। তাঁর বেশ কটি উপন্যাস ইংরেজিতে অনূদিত হয়েছে। একটি উপন্যাস 'গৌরীপুর জংশন' সাতটি ভাষায় অনুবাদের কাজ চলছে। ইতোমধ্যে এই উপন্যাসের ইংরেজি, জার্মান, হিন্দি ও ফার্সি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

মানুষ হিসেবে তাঁকে তাঁরই সৃষ্ট চরিত্র হিমু এবং মিসির আলির মতোই রহস্যময় বলে মনে হয়। তাঁর বেশিরভাগ সময় কাটে নিজের তৈরি নন্দনকানন 'নুহাশ পল্লী'তে।

আলোকচিত্র :: মাজহারুল ইসলাম

রচনাবলী ২

হুমায়ূন আহমেদ

রচনাবলী

২

সালেহ চৌধুরী
সম্পাদিত

অন্যপ্রকাশ

প্রথম প্রকাশ	১৩ নভেম্বর ২০০৮
©	লেখক
প্রচ্ছদ	মাসুম রহমান
প্রকাশক	মাজহারুল ইসলাম অন্যপ্রকাশ ৩৮/২-ক বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০ ফোন : ৭১২৫৮০২ ফ্যাক্স : ৮৮-০২-৯৬৬৪৬৮১
মুদ্রণ	কালারলাইন প্রিন্টার্স ৬৯/এফ গ্রীনরোড, পান্থপথ, ঢাকা
মূল্য	৫০০ টাকা
আমেরিকা পরিবেশক	মুক্তধারা জ্যাকসন হাইট, নিউইয়র্ক
যুক্তরাজ্য পরিবেশক	সঙ্গীতা লিমিটেড ২২ ব্রিক লেন, লন্ডন
কানাডা পরিবেশক	এটিএন বুক এন্ড ক্রাফটস ২৯৭০ ড্যানফোর্থ এভিনিউ, টরেন্টো
Humayun Ahmed Rachanabali Vol. II	edited by Saleh Choudhury Published by Mazharul Islam Anyaprokash Cover Design : Masum Rahman Price : Tk. 500 only ISBN : 984 868 504 9

ভূমিকা

হুমায়ূন আহমেদের নামের সঙ্গে দুটি বিশেষণ ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়—জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক আর নন্দিত কথাসাহিত্যিক। ব্যঞ্জনায় বিশেষণ দুটি প্রায় সমার্থক হলেও পার্থক্যও কিছু আছে। যেমন, যিনি জনপ্রিয় তিনি নন্দিত নাও হতে পারেন। আবার, নন্দিতদের সকলেই জনপ্রিয় হবেন, এমন কথাও জোর দিয়ে বলার উপায় নাই। বিশেষণ দুটি একই ব্যক্তিতে বর্তালে বিশেষ তাৎপর্যবহ হয়ে ওঠে। নতুন মাত্রা পায়। সংশয়ের অবকাশ থাকে না। হুমায়ূন আহমেদের ক্ষেত্রে তাই ঘটেছে।

রচনাবলির প্রথম খণ্ডের ভূমিকায় এই জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গটির উল্লেখ আছে। একজন লেখক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের এই অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন, অন্তত এই স্বল্প শিক্ষিতের দেশে, কেমন করে সম্ভব হলো এ বিষয়টি একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখার দাবি রাখে।

এ মুহূর্তে মনে পড়ল একটা পুরনো ঘটনা। বক্ষ্যমাণ ভূমিকা ওখান থেকেই শুরু করা যায়।

বেশ কয়েক বছর আগের কথা। পৌষমেলায় আমন্ত্রিত হয়ে নেত্রকোনা যাচ্ছিলাম। সেদিন ওদের নির্ধারিত আলোচ্য বিষয় ছিল 'হুমায়ূন-সাহিত্য'। আলোচনা সভার প্রধান অতিথি সব্যসাচী লেখক সৈয়দ শামসুল হক, বিশেষ অতিথি আমি। দুজন একই সঙ্গে যাচ্ছি। ঝকঝকে পাজেরো গাড়িতে করে আরামপ্রদ যাত্রা। রাস্তার দুপাশের দৃশ্য দেখতে দেখতে আমরা টুকটাক কথাও বলছিলাম। হঠাৎ হক ভাইয়ের একটা প্রশ্নে সচকিত হয়ে উঠলাম। উনি প্রশ্ন করলেন, বলতে পারেন, হুমায়ূন এমন জনপ্রিয়তা কেমন করে অর্জন করলেন ?

বলতে গেলে হুমায়ূনের লেখালেখির শুরু থেকেই তাকে অনুসরণ করে আসছি। তার অনুরাগী পাঠক হিসেবে কিছুটা পরিচিতিও আছে। স্বভাবতই প্রশ্নটা আমার কাছে আকর্ষণীয় ঠেকল। তবে তাৎক্ষণিকভাবে হাজির করার মতো কোনো জবাব আমার কাছে মজুদ ছিল না। কেননা, বিষয়টা নিয়ে ওভাবে কখনো ভাবিনি। আমি তাই বললাম, হক ভাই, আজ সন্ধ্যায় তো হুমায়ূনকে নিয়ে আমায় কিছু বলতেই হবে। আপনার সুন্দর প্রশ্নটার জবাব ওখানেই দিতে চেষ্টা করব।

সে সন্ধ্যায় যা বলেছিলাম, আমার ভাবনা আজো তাতেই স্থির। সময় তাতে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকলে তা হচ্ছে এই, প্রত্যয়টা দৃঢ়তর হয়েছে মাত্র। সেদিনকার

কথাগুলোকে আজও তাই খুবই প্রাসঙ্গিক মনে হচ্ছে, কথাগুলো ছিল অনেকটা এরকম:

শিল্প-সাহিত্যের উৎস আর লক্ষ্য অভিন্ন— জীবন। জীবন থেকে উদ্গত লেখায় জীবনের সৌন্দর্য অনুসন্ধান, উদ্ঘাটন আর পরিস্ফুটনই লেখকের সাধনা। নিজ উপলব্ধি ছড়িয়ে দেয়াতেই তার সাফল্য। দেয়ালের ঘুলগুলি গলে আসা জ্যোৎস্নার ফুল ধরার মতোই সে সৌন্দর্যকে হাতে ধরার চেষ্টা করে আসছেন হুমায়ূন আহমেদ। কাজটি তিনি এমন দক্ষতার সঙ্গে করে আসছেন যে, তা অতি দ্রুত পাঠককে স্পর্শ করে, পাঠক অজান্তেই একাত্ম হয়ে যান তার সঙ্গে, হয়তো ওতেই নিজেকে কিংবা নিজ পরিবেশকে আবিষ্কার করে আপ্লুত হয়ে ওঠেন। এ প্রক্রিয়া পাঠক আর লেখকের মধ্যে যে দৃঢ় সেতুবন্ধ রচনা করে তাকেই বলি জনপ্রিয়তা।

বিষয়টা স্পষ্টতর করতে হলে বলতে হয়, উপন্যাস আর ছোটগল্প সবই কথাসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত। শ্রেণীকরণের এই 'কথা' শব্দটির গুরুত্ব অনুধাবন আবশ্যিক। কথা বলতে গল্প বা কাহিনীকে বোঝায়। অর্থাৎ, কথাসাহিত্যকে একটা গল্প বা কাহিনী অবলম্বন করে এগোতে হয়। ফলে কথক বা কাহিনীকার ভূমিকার মাত্রার উপর লেখকের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, কথাসাহিত্যের বিভিন্ন পর্যায়ে, নানা আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় কথা বা গল্পাংশকে খাটো করে ভিন্নতর দিকগুলোর উপর জোর দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে বৈচিত্র্য এসেছে। এসেছে সার্থকতাও। উন্মুক্ত হয়েছে নতুন থেকে নতুনতর পথ। তা সত্ত্বেও গল্পের ভূমিকা কিন্তু শেষ হয়ে যায়নি। যাওয়ারও না। কার্যত, শিল্পে জীবন-বীক্ষা একটা গল্পকে অবলম্বন করেই পল্লবিত হয়ে থাকে। তারতম্য যেটুকু বর্তায় সে কেবল বিস্তারের মাত্রায়।

হুমায়ূন তার রচনায় কাহিনী বা গল্পকে ব্যবহার করেন আশ্চর্য কুশলতায়। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ নয়, নয় কোনো বিশ্বাস বা বক্তব্য চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস। গল্প যেন তার নিজ গতিতেই পরিণতির দিকে এগিয়ে চলে আর তারই মাঝ দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে একটা জীবন-ভাষ্য। এই যে গল্পের কথা বলছি, তা-ই কিন্তু হুমায়ূনের উদ্দিষ্ট নয়। হুমায়ূন মানব-মনের অন্ধিসন্ধির খবর ভালোই জানেন। গল্প আর সংলাপের পথ ধরে পৌঁছে যান বর্ণিত চরিত্রের মনের গভীরে, উঠে আসে আবেগ আর অনুভূতির চিরন্তন সত্যগুলো।

গল্পে ঘটনার সমাবেশ ঘটবেই। কখনো হয়তো তার ঘনঘটাও দৃশ্যমান হয়। কিন্তু এর সবই বাহ্য। এর মাধ্যমে ঘটনার অন্তরালে বিদ্যমান আন্তরচিত্রের উন্মোচনই সার কথা। পরোক্ষে কথা বলার এ কৌশল কার্যত পাঠক মনে অনেক বেশি প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। কথক হুমায়ূন সংযত বাক। পাঠকের উপর আস্থাশীল। তার না-বলা কথা পাঠককে আরো বেশি করে কাছে টানে।

কাহিনী নির্বাচনের জন্যে হুমায়ূনের প্রধান বিচরণক্ষেত্র মধ্য বা নিম্নমধ্যবিত্তের পরিমণ্ডল। এতে অভিনবত্ব কিছু নাই। আমাদের কথাসাহিত্যের বহুলাংশই তো জুড়ে

রয়েছে এই জীবনের উপাখ্যান। তবুও হুমায়ূন এ জীবনের আলেখ্য রচনায় বিশিষ্ট এ জন্যে যে, তিনি এই জীবনের অন্ধকারেও আবিষ্কার করেন হিরণ্যদ্যুতি, কুৎসিতের পাশেও সৌন্দর্যের অবস্থান কখনো তার দৃষ্টি এড়ায় না। আনন্দ-বেদনার মিশ্র বুননে যে জীবন মহিমান্বিত, তাই তার অন্বিষ্ট। হুমায়ূনের নিজের কথায়, 'সেখানে (মধ্যবিত্ত জীবন) দুঃখ, হতাশা ও গ্লানির সঙ্গে ভালোবাসাও আছে।' গ্লানিময় জীবনেও প্রোজ্জ্বল ভালোবাসার উপস্থিতি জীবনের প্রতি মমতাবোধকেই জাগ্রত করে। সঞ্চারিত করে পাঠকের মনে।

বস্তুত, জীবন ও জীবন-চর্যায় নানা বৈপরীত্যের সহাবস্থানের মতো সত্য সাহিত্যে প্রায়ই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। চড়া রঙ আর মোটা রেখায় আঁকা ছবিতে যেমন অনেক খুঁটিনাটি হারিয়ে যায়, সাহিত্যেও প্রায়ই তাই ঘটে। জীবনের পূর্ণ প্রতিফলন তাতে ঘটে না। হুমায়ূন আহমেদের সংক্ষিপ্ত পরিসর রচনাও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন-বাস্তবতা আর কান্না-কৌতুকের কিছুই তার দৃষ্টি এড়ায় না। আর এ কাজটি তিনি এমনভাবে করেন যেখানে বর্ণনার বাহুল্য কিংবা লেখকের নিজের কথা চাপিয়ে দেয়ার কোনো চেষ্টাই চোখে পড়ে না।

হুমায়ূনের রচনার আঙ্গিক বা শিল্পরূপ যাই হোক, সর্বত্রই নাট্যধর্মিতা বা সংলাপের প্রাধান্য সুস্পষ্ট। চরিত্রানুগ সংলাপ আদতে হুমায়ূনের প্রধান হাতিয়ার। সংলাপই উদ্দিষ্টকে স্পষ্ট করে তোলে। চরিত্র-চিত্রণে বর্ণনা বাহুল্যের দরকার পড়ে না। সংলাপের মাধ্যমেই চরিত্রগুলো আর সেই সঙ্গে বর্ণিত কাহিনী জীবন্ত হয়ে ওঠে। বর্ণনার বাঁধা পথে চলার বাধ্যবাধকতা না থাকায় পাঠক তার ভাবনা বা কল্পনাকে অবাধে খেলানোর অবকাশ পান। বাঁধা পড়েন একাত্মতা বোধের মায়াজালে। সাফল্য আর জনপ্রিয়তার মধ্যে যদি কোনো রহস্য থেকে থাকে তা এতেই নিহিত।

লেখক কোন জীবন চিত্রিত করছেন এটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু না। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে চিত্রন। যেমন, রাজা-রানি নামক প্রজাতি বিলুপ্ত হওয়ার পথে। পুরো বিলুপ্ত হলেও শেকসপিয়ার সৃষ্ট রাজা-রানি চরিত্রগুলোর আবেদনে সামান্য প্রভাবও পড়বে না। যাই হোক, নিম্নমধ্যবিত্ত জীবন হুমায়ূন আহমেদের প্রধান উপজীব্য হলেও তিনি তাতেই নিজেকে আবদ্ধ করে রাখেননি। অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মনোযোগের বৃত্তও করেছেন সম্প্রসারিত। ছিন্নমূল মানুষ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চাকচিক্যময় জীবন তার আলো-আঁধার নিয়ে ধরা দিয়েছে তাঁর রচনায়। জাতীয় জীবনের বৃহত্তম অর্জন মুক্তিযুদ্ধ নির্মাণ করেছে হুমায়ূন-সাহিত্যের প্রোজ্জ্বল পটভূমি। যে দিকগুলো পর্যায়ক্রমে এবং যথাসময়ে আলোচিত হবে।

উপাখ্যানমালা মিসির আলি

বিশেষ কোনো চরিত্রকে অবলম্বন করে উপাখ্যানমালা তৈরির রেওয়াজ সব সাহিত্যেই আছে। কুশলী কথা-কোবিদ হুমায়ূন আহমেদ তাতে আকৃষ্ট হবেন, এটাই স্বাভাবিক।

হয়েছেনও। আর এ পর্যায়ে আমাদের প্রাপ্তি তিনটে আকর্ষণীয় উপাখ্যানমালা। যার প্রথমটি হচ্ছে মিসির আলি সিরিজ। মিসির আলি সিরিজের প্রথম বই 'দেবী'। দেবী রচনাবলির দ্বিতীয় খণ্ডে অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে। সঙ্গতভাবেই এ চরিত্রটি সংক্ষিপ্ত আলোচনার দাবি রাখে।

মিসির আলি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি বা প্যারা সাইকোলজির খণ্ডকালীন অধ্যাপক। অধিত বিদ্যা আর মননের সাহায্যে রহস্যের উন্মোচনে তার অসীম আগ্রহ। প্রায়ই আধি-ব্যাধিতে কাবু নিঃসঙ্গ এ মানুষটি অন্যের সংকট মোচনে এগিয়ে যাওয়ায় নিরলস। আর এভাবেই মুখোমুখি হন বিচিত্র সব রহস্যের। হুমায়ূন এই চরিত্রটির জন্ম প্রসঙ্গে এক বিশেষ অভিজ্ঞতার উল্লেখ করেছেন। যুক্তরাষ্ট্রে চলতে চলতে শুনেছিলেন একটা লোকগীতি— 'ক্লোজ ইওর আইজ এন্ড ট্রাই টু সি'। এই চোখ বন্ধ করে দেখার ধারণাই মিসির আলি চরিত্র সৃষ্টির প্রেরণা জোগায়। 'চোখ বুজে দেখা' কোনো নতুন কথা নয়। আমাদের হাসন রাজাও বলেন, 'আঁখি মুঞ্জিয়া দেখ রূপ রে'। তবে লোকগীতির চোখ বুঁজে দেখা আর হুমায়ূন তথা মিসির আলির চোখ বুজে দেখা এক নয়। একটির ব্যঞ্জনা আধ্যাত্মিক। অপরটি বিজ্ঞান তথা বুদ্ধিনির্ভর। আপাতদৃষ্টিতে যা আধিভৌতিক বা ব্যাখ্যার অতীত তাকেও বোধ বা বুদ্ধির আওতায় নিয়ে আসা যায়, এটাই মিসির আলির প্রত্যয়।

একটি থ্রিলার সিরিজের প্রথম বই হিসেবে *দেবীর* আবির্ভাব। *দেবীর* অকল্পনীয় সাফল্য তার দ্বিতীয় খণ্ড 'নিশীথিনী'-কে অনিবার্য করে তোলে। শুরু হয় মিসির আলি উপাখ্যানমালার অব্যাহত যাত্রা। পূর্ণতা পায় মনোবিজ্ঞানী মিসির আলির অবয়ব।

গোড়ায় একটা ভিন্ন তাগিদ থাকার ফলেই হয়তো প্রথম দুটি বই-এ কিছু আধিভৌতিক বা ব্যাখ্যার অতীত রহস্যময়তা প্রশ্রয় পেয়েছে। (একই সঙ্গে দুর্জ্ঞেয় রহস্য কিংবা রহস্য সৃষ্টির প্রতি হুমায়ূনের টানের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে।) চূড়ান্ত বিবেচনায় অবশ্য মিসির আলি এমন একজন মানুষ যার কাছে যুক্তি আর বিজ্ঞানের স্থান সবার উপরে। মানবিকতার তাগিদে যেটুকু না হলেই নয় তার অতিরিক্ত আবেগ তার কাছে সর্বাবস্থায়ই পরিত্যাজ্য। মিসির আলির ভাবনাতেই তার স্বরূপ পরিস্ফুট: 'অকারণে তো কেউ নিশ্বাস ফেলে না। সব কিছুর পেছনেই কারণ থাকে। এই জগতে কার্যকারণ ছাড়া কিছুই হয় না, সবই লজিক। জটিল লজিক। জটিল কিন্তু অভ্রান্ত। লজিকের বাইরে এক চুলও কারো যাবার ক্ষমতা নেই।'

বাংলা রহস্যরোমাঞ্চ সাহিত্যে মিসির আলি এক নতুন মাত্রা যোগ করছে। অপরাধ-জগৎ নয়, প্রকৃতি আর মানবমনের জটিল রহস্যের অন্তর্ভেদ করাই এর অন্বিষ্ট।

মিসির আলি পাঠক এবং টিভিনাটক দর্শকদের মন জয় করেছে। সম্প্রতি 'দেবী' মঞ্চেও সফলভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। এই জনপ্রিয়তা মহল বিশেষে প্রচণ্ড ঈর্ষারও জন্ম দেয়। ওরা 'অপন্যাস' নামক অভিধা চয়ন করে হুমায়ূন-সাহিত্যকে কোণঠাসা

করার অপপ্রয়াস পান। মিসির আলির ব্যাপক প্রচার এবং 'মিস্‌সির আলি অমনিবাস' প্রকাশ সাহিত্যের এক তরুণ অধ্যাপককে 'মিসির আলি যমনিবাস' লেখায় উদ্বুদ্ধ করে। একে অপপ্রয়াস বলছি এ জন্যে যে, এরই মধ্যে যাবতীয় বিরুদ্ধ কণ্ঠ আজ স্তব্ধ। 'যমনিবাস' সম্ভবত যমালয়েই আশ্রয় পেয়ে থাকবে। এতে করে অবশ্য একটি ভালো কাজও হয়েছে, আবারও প্রমাণিত হয়েছে, প্রকৃত সাহিত্যের মর্যাদা কারো নিন্দা-প্রশংসার তোয়াক্কা রাখে না। শক্তিমান লেখকের পথে সামান্য কিছু বিঘ্ন হলেও তার অগ্রযাত্রা এতে ব্যাহত হয় না।

শেষ করার আগে অন্যপ্রকাশের মাজহারুল ইসলাম, আবদুল্লাহ্‌ নাসের এবং মোমিন রহমানের প্রতি আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই। তাদের সহযোগিতাই এই রচনাবলি সম্পাদনকে সম্ভব করেছে।

সালেহ চৌধুরী

সূচি

উপন্যাস

অন্যদিন ১৫
এই বসন্তে ৬৩
সবাই গেছে বনে ১৩১
তোমাকে ১৯৯

ছোটগল্প

আনন্দ বেদনার কাব্য ২৬৫

সায়েন্স ফিকশন

তারা তিনজন ৩১৭

উপাখ্যানমালা মিসির আলি

দেবী ৩৭৫

পুনর্কথন

অমানুষ ৪৬১

শিশুতোষ রচনা

তোমাদের জন্য রূপকথা ৫৬৯

পরিশিষ্ট ৬২১

উপন্যাস

অন্যদিন

চিঠি লিখলে এই ঠিকানায় চিঠি আসে। খুঁজে বের করতে গেলেই মুশকিল। সফিক লিখেছিল অবশ্যি, তোর কষ্ট হবে খুঁজে পেতে। লোকজনদের জিজ্ঞেস করতে পারিস কিন্তু লাভ হবে বলে মনে হয় না। একটা ম্যাপ এঁকে দিলে ভালো হতো। তা দিলাম না, দুর্লভ জিনিস পেতে কষ্ট করতেই হয়।

এই সেই দুর্লভ জিনিস! দু'জন মানুষ পাশাপাশি চলতে পারে না এরকম একটা গলির পাশে ঘুপসি ধরনের দোতলা বাড়ি। কত দিনের পুরনো বাড়ি সেটি কে জানে। চিতি পড়ে সমস্ত বাড়ি কালচে সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে। দোতলায় একটি ভাঙা জানালায় ছেঁড়া চট ঝুলছে। বাড়িটির ডান পাশের দেয়ালের একটি অংশ সম্পূর্ণ ধ্বসে গিয়েছে। সামনের নর্দমায় একটি মরা বেড়াল; দূষিত গন্ধ আসছে সেখান থেকে। মন ভেঙে গেল আমার। স্যুটকেস হাতে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছি—দোতলায় যাবার পথ খুঁজছি, সিঁড়িফিড়ি কিছুই দেখছি না। নিচতলা তালাবদ্ধ। নোটিশ ঝুলছে—

'এই দোকান ভাড়া দেয়া হবে'।

দোতলার জানালার চটের পর্দার ফাঁক দিয়ে কে যেন দেখছিল আমাকে। তার দিকে চোখ পড়তেই সে বলল, জ্যোতিষী খুঁজছেন ? হাত দেখাবেন ? উপরে যান, বাড়ির পেছন দিকে সিঁড়ি।

পান্থনিবাস বোর্ডিং হাউসের লোকজন আমার চেনা। সফিক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লিখেছে আমাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠবার মুখে যার সঙ্গে দেখা হলো তিনি যে নিশানাথ জ্যোতিষার্ণব তা সফিকের চিঠি ছাড়াও বলে দিতে পারতাম। প্রায় ছ'ফুটের মতো লম্বা ঝাঁকড়া ঘন চুলের একজন মানুষ। কপালে প্রকাণ্ড এক সিঁদুরের ফোঁটা, মুখভর্তি দাড়ি। গায়ে গেরুয়া রঙের একটি চাদর। পরনে খাটো করে পরা একটি ধবধবে সাদা সিল্কের লুঙ্গি। পায়ে রুপোর বোলের খড়ম। প্রথম দর্শনেই হকচকিয়ে যেতে হয়। জ্যোতিষার্ণব সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন, হস্ত গণনা করাতে এসেছেন ? পরক্ষণেই গম্ভীর হয়ে বললেন, উঁহু স্যুটকেস হাতে কেউ জ্যোতিষীর কাছে আসে না। লক্ষণ বিচারে ভুল হয়েছে। তুমি সফিকের কাছে এসেছ ?

জি।

সফিক সারা সকাল অপেক্ষা করেছিল। তোমার না ভোরবেলা আসার কথা ?

ট্রেন ফেল করলাম। ঢাকা মেইলে আসা লাগল।

জ্যোতিষার্ণব মহাগম্ভীর হয়ে বললেন, আমি জানতাম। সফিককে বললাম আশাভঙ্গ হবার কারণ ঘটবে। সে সারা সকাল রাস্তার মোড়ে তোমার জন্য দাঁড়িয়েছিল। আশাভঙ্গ তো হলোই, ঠিক কিনা তুমি বলো ?

হ্যাঁ, তা ঠিক।

ঠিক তো হবেই। তিন পুরুষ ধরে গুহ্য বিদ্যার চর্চা আমাদের হুঁ হুঁ।

জ্যোতিষার্ণব আমাকে নিয়ে গেলেন তাঁর ঘরে। তাঁর ঘরের বর্ণনা সফিকের চিঠিতে পড়েছি। বাড়িয়ে লেখেনি কিছুই— ঘরে ঢুকলে যে-কোনো সুস্থ লোকের মাথা গুলিয়ে যাবে। তিনি জানালা বন্ধ করে ঘরটা সব সময় অন্ধকার করে রাখেন। অন্ধকার ঘরে একটি ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলে। ধূপদানি আছে, কেউ হাত দেখাতে আসছে টের পেলেই ধূপদানিতে এক গাদা ধূপ ফেলে নিমিষের মধ্যে গা ছমছমানো আবহাওয়া তৈরি করে ফেলেন। কিন্তু এতসব করেও তাঁর পসার নেই মোটেও।

জ্যোতিষার্ণব আমাকে চৌকিতে বসিয়ে ধূপদানিতে ধূপ ঢেলে দিলেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হবার যোগাড়। থমথমে গলায় বললেন, উদ্দেশ্য সফল হবে তোমার। বি.এ. পাস করবে ঠিকমতো। কপালে রাজানুগ্রহের যোগ আছে। গ্রহ শান্তির একটা কবচ নিও আমার কাছ থেকে। সফিকের বন্ধু তুমি। নামমাত্র মূল্যে পাবে। আমি বললাম, কোথায়ও একটু গোসল করা যাবে? আশপাশে চায়ের দোকান আছে? বড় চা খেতে ইচ্ছা হচ্ছে।

জ্যোতিষার্ণব আঁতকে উঠলেন। যেন এমন অদ্ভুত কথা কখনো শোনেননি। রাগী গলায় বললেন, স্বাস্থ্য বিধির কিছুই দেখি জানো না। গায়ের ঘাম না মরতেই গোসল, চা! ঠাণ্ডা হয়ে বসো দেখি।

তিনি একটি টেবিল ফ্যান চালু করলেন। ফ্যানটি নতুন। ভয়ানক গম্ভীর স্বরে বললেন, আমার এক ভক্ত দিয়েছে। এইসব বিলাস সামগ্রী দুই চক্ষে দেখতে পারি না। তান্ত্রিক মানুষ আমরা— এসব কি আমাদের লাগে? শীত-গ্রীষ্ম সব আমাদের কাছে সমান।

ঘণ্টা দুয়েক অপেক্ষা করবার পর জ্যোতিষার্ণব আমাকে গোসলখানা দেখিয়ে দিলেন।

খুব সাবধানে গোসল সারবে রঞ্জু। দারুণ পিছল মেঝে। মেসের অন্য বোর্ডাররা কেউ নেই। যতক্ষণ ইচ্ছা থাকো গোসলখানায়। চা আমি বানিয়ে রাখব, এসেই গরম পাবে। কয় চামচ চিনি খাও চায়ে?

গায়ে পানি ঢালতেই শরীর জুড়িয়ে গেল। বরফের মতো ঠান্ডা পানি। পথের ক্লান্তি, নতুন জায়গায় আসার উদ্বেগ সব মুছে গিয়ে ভালো লাগতে শুরু করল। হঠাৎ করেই মনে হলো নীলগঞ্জের পুকুরে যেন ভরদুপুরে সাঁতার কাটছি। আমি অনেকবার লক্ষ করেছি, সুখী হওয়ার একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে মানুষের। অতি সামান্য জিনিসও মানুষকে অভিভূত করে ফেলতে পারে।

আমার বাবার কথাই ধরা যাক। তাঁর মতো সুখী লোক এ পৃথিবীতে খুব বেশি নেই বলেই আমার ধারণা। অথচ গত ছয় বছর ধরে তাঁর কোনো চাকরিবাকরি

নেই। তিনি ভোরবেলা উঠেই স্টেশনে যান। সেখানকার চায়ের স্টলটি নাকি 'ফার্স্ট ক্লাস' চা বানায়। খালি পেটে ঐ চা পর পর দু'কাপ খাবার পর তিনি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে গল্পগুজব করেন। কী গল্প করেন তিনিই জানেন। ন'টার দিকে স্কুলের ভাত রান্না হয় বাড়িতে। সে সময় তিনি বাড়ি ফিরে আসেন। আনজু এবং পারুলের সঙ্গে অতি দ্রুত ভাত খেয়ে নেন। সময় তাঁর হাতে খুব অল্প কারণ সাড়ে দশটার দিকে পোস্টাফিসে খবরের কাগজ আসে। কাগজটি পড়া তাঁর কাছে ভাত খাওয়ার মতোই জরুরি। সন্ধ্যাবেলা তিনি হারু গায়েনের ঘরে বেহালা বাজানো শেখেন। বর্তমানে এই দিকেই তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ নিবেদিত। মহাসুখী লোক তিনি। মা যদি বলেন, পারুলের তো নাম কাটা গেছে স্কুলে। তিন মাসের বেতন বাকি। বাবা চোখে-মুখে দারুণ দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটিয়ে বলেন, বড়ই মুসিবত দেখছি। গভীর সমুদ্র। হুঁ, যত মুশকিল তত আসান। হাদিস-কোরানের কথা। চিন্তার কিছু দেখি না। সমস্যার সমাধানও বের করেন সঙ্গে সঙ্গে, দরকার নাই স্কুলে পড়ার। পারুল মা, প্রাইভেট ম্যাট্রিক দেবে তুমি। আমি পড়াব তোমাকে। বইগুলো সব নিয়ে আয় তো মা এবং তিন নম্বরি একটা খাতা আন রুটিনটা লিখি আগে।

মা ছাড়া আমরা কেউ বিরক্ত হই না বাবার ওপর। আমরা ছোটবেলা থেকেই জানি বাবা এক ভিন্ন জগতের বাসিন্দা। এই জগতের দুঃখ-কষ্টের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ নেই।

আমাকে ট্রেনে তুলে দিতে বাবা স্টেশনে এসেছিলেন। ট্রেন ছাড়বার আগে আগে আমাকে বললেন, রঞ্জু, একটু এদিকে শুনে যা তো।

পারুল আর আনজুর কাছ থেকে অনেকটা দূরে নিয়ে গেলেন আমাকে। গলার স্বর যথাসম্ভব নিচু করে বললেন, একটা ভালো বেহালার দাম কত, খোঁজ নিবি তো। ভুলিস না যেন।

খোঁজ নেব। ভুলব না।

আমার নিজের জন্যে না। বুড়ো বয়সে কি আর গানবাজনা হয় ? তোর মাও পছন্দ করে না। অন্য লোকের জন্য।

আমি খোঁজ নেব।

ট্রেন ছাড়ার সময়ও এক কাণ্ড করলেন। ট্রেনের সঙ্গে দৌড়াতে শুরু করলেন। ট্রেনের গতি যত বাড়ে তাঁর গতিও বাড়ে। ট্রেনের লোকজন গলা বাড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

গোসল সেরে দোতলায় উঠে এসে দেখি জ্যোতিষার্ণবের ঘর জমজমাট। দু'তিনজন লোক বসে আছে পাংশু মুখে। জ্যোতিষার্ণব একজনের হাতের তালুর দিকে অখণ্ড মনযোগে তাকিয়ে আছেন। আমার দিকে না তাকিয়ে বললেন, পর্দা ঠেলে ভেতরে চলে যাও। চা পিরিচে ঢাকা।

আগে লক্ষ করিনি যে পায়রার খুপড়ির মতো ঘরও পর্দা দিয়ে দু'ভাগ করা। ভেতরে ঢুকে দেখি দড়ির খাটিয়ার উপর ধবধবে সাদা চমৎকার বিছানা করা। বিছানার লাগোয়া এক হাত বাই এক হাত সাইজের টেবিল একটি। তার উপরও ধবধবে সাদা এক ঢাকনি। খাটিয়াটার মাথার পাশে বেতের শেল্‌ফ। শেল্‌ফের উপর চমৎকার একটি কাচের ফুলদানিতে ফুল। আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। জ্যোতিষার্ণব দেখি দারুণ শৌখিন লোক।

শুধু চা নয়, পিরিচে খাবার ঢাকা আছে। একটি লাড্ডু এবং একটি সিঙ্গারা। আমি চা খেতে খেতে শুনলাম জ্যোতিষার্ণব গম্ভীর গলায় বলছেন, গ্রহ শান্তি কবচ নিতে পারেন আমার কাছ থেকে। রত্নও ধারণ করতে পারেন। তবে রত্ন অনেক দামি। তাছাড়া আসল জিনিস মিলবে না, চারদিকে জুয়াচুরি।

গ্রহ শান্তিতে কত খরচ পড়বে ?

বিশ টাকা নেই আমি, তবে আপনার জন্যে দশ।

দশ যে বড় বেশি হয়ে যায় সাধুজি।

জ্যোতিষার্ণব হাসেন, পঞ্চ ধাতুর কবজের দামই মশাই পাঁচ টাকা। তাম্র স্বর্ণ রৌপ্য পারা ও দস্তা। তঞ্চকতা পাবেন না আমার কাছে। একবার ধারণ করে দেখুন টাকাটা জলে যায় কিনা। টাকাই তো জীবনের সব নয়। হুঁ হুঁ।

বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি ধরে যায় আমার। সন্ধ্যা মিলিয়ে গেছে, ঘর অন্ধকার। সুইচ আছে একটি। আলো জ্বালাতে ঠিক সাহস হয় না। সাধুজি পাশের ঘরে প্রদীপ জ্বেলে বসে আছেন। কে জানে ইলেকট্রিসিটির আলোতে তাঁর হয়তো অসুবিধা হবে। সফিক কত রাতে ফিরবে কে জানে! শুয়ে পড়লাম সাধুজির বিছানাতেই।

শুয়ে শুয়ে কত কী মনে হয়। বাবা যেন ম্যাকমিলান কোম্পানির তাঁর সেই পুরনো চাকরিটা আবার ফিরে পেয়েছেন। গভীর রাত্রে বাড়ি ফিরেছেন প্রকাণ্ড একটা মাছ হাতে নিয়ে। পারুলের বিছানার পাশে ঝুঁকে ডাকছেন, ওরে পারুল, ওরে টুনটুনি, ওরে কুট কুট, ওরে ভুটভুট।

মা কপট রাগের ভঙ্গি করে বলছেন, কী যে পাগলামি তোমার। এই দুপুররাতে মাছ কুটতে বসবো নাকি ?

বাবার মুখভর্তি হাসি।

একশ'বার বসবে। হাজারবার বসবে।

পারুল ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে। বারবার বলছে, বইটা এনেছ বাবা ? 'দেশ বিদেশের রূপকথা' নাম লিখে চিঠি দিয়েছিলাম যে তোমাকে ?

উঁহু বড্ড ভুল হয়ে গেছেরে। একটুও মনে নেই। সামনের শনিবার ঠিক দেখিস...

পারুলের নিচের ঠোঁট বেঁকে যেতে শুরু করতেই বাবা ম্যাজিশিয়ানের ভঙ্গিতে বলে উঠেছেন, টেবিলের উপর রূপকথার বইটা আবার কে আনল ?

ঝিমুনি ধরলেও ঘুম আসে না আমার। বিছানায় এপাশ-ওপাশ করি। ধূপের গন্ধে দম আটকে আসে একেকবার। কী যে কাণ্ড সাধুজির! সফিক চিঠিতে লিখেছিল। দুনিয়াতে মন্দ মানুষ এত বেশি বলেই ভালো মানুষদের জন্য আমাদের এত মন কাঁদে। আমাদের নিশানাথ এমন একজন ভালো মানুষ। মানুষকে ধোঁকা দেয়াই যার জীবিকা— সে এমন ভালো মানুষ হয় কী করে কে জানে!

রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করেও সফিকের দেখা পাওয়া গেল না। নিশানাথ বাবু আমাকে বসিয়ে রেখে নিচে খেতে গেলেন। খাওয়ার পর আমাকে হোটেল থেকে খাইয়ে আনবেন।

হোটেলটি বেশ খানিকটা দূরে। নানান প্রসঙ্গে গল্প করতে করতে সাধুজি হাঁটছেন। অনেকেই দেখি তাঁকে চেনে। একটি পানওয়ালা দাঁত বের করে বলল, সাধুজির শইলটা বালা নাকি ?

তিনি থেমে থেমে বেশ খানিকক্ষণ কথাবার্তা বললেন পানওয়ালার সঙ্গে। তাঁর গল্প বলার ঢং চমৎকার। মুগ্ধ হয়ে শুনতে হয়। সফিক প্রসঙ্গে বলেন, সফিক ছেলেটা ভালো তবে বড় ফাজিল। ফাজলামি করে আমার সঙ্গে। আমি নাকি লোক ঠকিয়ে খাই। ছি ছি কী কুৎসিত চিন্তা! আমরা হচ্ছি তিন পুরুষের জ্যোতিষী। আমার ঠাকুরদা তারানাথ চক্রবর্তী ছিলেন সাক্ষাৎ বিভূতি। মানুষের হাত দেখে জন্মবার বলতে পারতেন। আজকালকার ছেলেপুলেরা এসবের কী জানবে ?

কথা বলতে বলতে সাধুজির মুখের ভাব বদলায়। রশীদ মিয়ার কথা বলতে বলতে তিনি চোখ-মুখ কুঁচকে এমনভাবে তাকান যেন রশীদ মিয়া ছুরি হাতে মারতে আসছে। রশীদ মিয়া, বুঝলে নাকি রঞ্জু, নরকের কীট। দেখা হলেই বলবে— বিজনেস কেমন চলছে আপনার ?

আমি চুপ করে থাকি। সাধুজি রাগী গলায় বললেন, হাত দেখা বিজনেস হলে আজ আমার গাড়ি বাড়ি থাকত। সুসং দুর্গাপুরের জমিদার ভূপতি সিংহ আমার ঠাকুরদাকে আশি বিঘা লাখেরাজ সম্পত্তি দিতে চাইলেন। ঠাকুরদা বললেন, 'ক্ষমা করবেন, দরিদ্র ব্রাহ্মণ। সম্পত্তির মোহে পড়তে চাই না।' রশীদ মিয়া কী বুঝবে আমাদের ধারা ?

সফিক ফিরতেই তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল জ্যোতিষার্ণবের সঙ্গে। সফিক গলা ফাটিয়ে চিৎকার করছে, আমার ঘরের চাবি দিয়ে গেলাম আপনার কাছে। বললাম, রঞ্জু আসামাত্র আমার ঘর খুলে দেবেন, তা না নিজের অন্ধকূপের ধোঁয়ার মধ্যে নিয়ে...

তাতে তোমার বন্ধুর কোনো ক্ষতি বৃদ্ধি হয়েছে ?

না হোক, মেসে রঞ্জুর জন্যে রান্না করতে বলে গেছি, টাকা খরচ করে তাকে হোটেল থেকে খাইয়ে এনেছেন। টাকা সস্তা হয়েছে ?

টাকার মূল্য আমার কাছে কোনো কালেই নেই সফিক।

বড় বড় কথা বলবেন না। লম্বা লম্বা বাত শুনতে ভালো লাগে না।

সামান্য ব্যাপার নিয়ে সফিক এত হৈচৈ করছে কেন বুঝতে পারলাম না। আমার লজ্জার সীমা রইল না।

সফিকের ঘরে দুটি চৌকি পাতা। আবর্জনার স্তূপ চারদিকে। দীর্ঘ দিন সম্ভবত ঝাঁট দেয়া হয় না। একপাশে একটি থালায় অভুক্ত ভাত পড়ে আছে। সফিক আমাকে বলল, লম্বা হয়ে শুয়ে পড়। সকালে কথা বলব।

তুই কোথায় যাস ?

খেয়ে আসি। ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। খেয়ে এসেই বিছানায় কাত হব। কথাবার্তা যা হবার সকালে হবে। তুই ঘুমো।

সফিক নিচে নেমেও খুব হৈচৈ করতে লাগল, হারামজাদা, ডাল শেষ হয়ে গেছে মানে ? পয়সা দেই না আমি ? আমি মাগনা খাই ? যেখান থেকে পারিস ডাল নিয়ে আয়।

সাধু বাবা ডাল খেয়ে ফেলেছে।

সাধু বাবার বাপের ডাল ?

সফিক বড্ড বদলে গেছে। এরকম ছিল না কখনো, শরীরও খুব খারাপ হয়েছে। কোনো অসুখবিসুখ বাঁধিয়েছে কি না কে জানে। আমি তো প্রথম দেখে চিনতেই পারি নি। চমৎকার চেহারা ছিল সফিকের। স্কুলে 'মুকুট' নাটক করেছিলাম আমরা। সফিক হয়েছিল মধ্যম রাজকুমার। সত্যিকার রাজপুত্রের মতো লাগছিল। কমিশনার সাহেবের বৌ সফিককে ডেকে পাঠিয়ে কত কী বলেছিলেন।

সকালবেলা সফিক আমাকে নিয়ে গেল রশীদ মিয়ার কাছে। রশীদ মিয়া তাঁর রেজিস্ট্রি খাতায় আমার নাম তুলবেন। লোকটি ছোটখাটো। সামনের দুটি দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো। সেই দাঁত দুটি ছাড়া আর সমস্ত দাঁতে কুৎসিত হলুদ রঙ। আমি পান্থনিবাসে বোর্ডার হব শুনে তিনি এমন ভাব করলেন যেন এমন অদ্ভুত কথা এর আগে শোনেননি।

না সাহেব, বোর্ডার আর নেব না। শুধু শুধু ঝামেলা।

সফিক গম্ভীর হয়ে বলল, কিসের ঝামেলা ?

টাকা-পয়সা নিয়ে খেঁচামেচি করে।

আমি, আমি খেঁচামেচি করি ?

আপনি না করেন অন্য লোকে করে।

আমাকে নিয়ে কথা। আমি যদি না করি এও করবে না। মাসের তিন তারিখে

খ্যাচাং করে টাকা ফেলে দেবে। নবী সাহেবের ঘরটা দেন তার নামে।

নবী সাহেব গেলে তবে তো দিব ?

যতদিন না যান ততদিন থাকবে আমার ঘরে।

রশীদ মিয়া অনেকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, ঐ ঘরের ভাড়া এই মাস থেকে পাঁচ টাকা বেশি।

সফিক প্রায় তেড়ে গেল।

পাঁচ টাকা বেশি কেন ? মোজাইক করে দিচ্ছেন ঘরটা ?

রশীদ মিয়া নির্লিপ্ত সুরে বলল, জানালা দুইটা। ঐ ঘরে আলো-বাতাস বেশি খেলে।

একটা জানালা পেরেক মেরে বন্ধ করে দেবেন। সাফ কথা। খোলেন আপনার খাতা।

নিতান্ত গোমড়া মুখে খাতা খুলল রশীদ মিয়া।

পেশা কী ?

আমি আমতা করে বললাম, পেশা কিছু নাই— আমি ছাত্র।

ঝপাং করে খাতা বন্ধ করে রশীদ মিয়া আতঙ্কিত স্বরে বললেন, ছাত্র মানুষ ঘর ভাড়া পাবে কোথায় ?

সফিক থমথমে গলায় বলল, যেখানে থেকে পারে যোগাড় করবে। দরকার হয় চুরি করবে।

চুরি করবে ?

হ্যাঁ, চুরি করবে। অসুবিধা আছে কিছু ? আপনি করেন না ?

আমি চুরি করি ?

মালিকের পান্থনিবাস তো ফাঁকা করে দিচ্ছেন।

রশীদ মিয়ার চোখ ঠিকরে বেরিয়ে এলো।

কে, কে বলেছে ?

বলাবলির তো কিছু নেই। সবাই জানে। সাধুজি তো পরিষ্কার বলেছেন, তীক্ষ্ণ চিবুক, ছোট কান এবং বর্তুলাকার চক্ষুর জাতক চোর স্বভাববিশিষ্ট হয়।

নিশানাথ এই কথা বলে ?

হ্যাঁ, বলবে না কেন ? সাধুজি স্পষ্ট কথার লোক।

এরপর আর আমার নামধাম খাতায় তুলতে অসুবিধা হয় না। রশীদ মিয়া গম্ভীর গলায় উপদেশও কিছু দেন, ঘরে মেয়েছেলে আনতে পারবেন না। ভদ্রলোকের মেস এইটা। ধান্ধাবাজির জায়গা না। বিশিষ্ট লোকজন থাকে।

অগ্রিম এক মাসের খাওয়া খরচের টাকা দেয় সফিক। তারপর খুব স্বাভাবিক

ভঙ্গিতে রশীদ মিয়ার পেটে হাত দিয়ে বলে, মাশআল্লাহ্ পেট তো আপনার আরো পাঁচ গিরা বড় হয়ে গেছে রশীদ মিয়া।

সফিককে যতই দেখি ততই অবাক হই। এ কোন সফিক ? দু'বৎসরে তার এ কী পরিবর্তন!

মাঝরাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল একবার। দেখি ঘরের মধ্যে লালচে আলো। সমুদ্র গর্জনের মতো শাঁ শাঁ আওয়াজ হচ্ছে। ধড়মড় করে জেগে উঠে দেখি সফিক স্টোভ জ্বালিয়েছে।

কী ব্যাপার সফিক ?

ব্যাপার কিছু না, চা খাব।

চা এই সময় ? কয়টা বাজে ?

তিনটা দশ। তুই খাবি নাকি ?

না।

রোজ এই সময় চা খাস নাকি ?

না, দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল, ভাবলাম একটু চা খাই।

আমি চুপ করে থাকলাম।

সফিক ক্লান্ত স্বরে বলল, বড় স্ট্রাগল করতে হচ্ছে। ইউনিভার্সিটি ছেড়ে দিয়েছি জানিস না বোধহয় ?

আমি জানতাম না। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কী করে পড়ব বল ? দিনে কম্পোজিটারের চাকরি। বিকালে টিউশনি আছে দুটো। এর পর আর এনার্জি থাকে না। নাইট কলেজে পাস কোর্সে নাম তোলা আছে। এই বছর আর হবে না।

সফিক দুটি কাপে চা ঢালল।

আমি বললাম, এত রাতে চা খাব না সফিক।

তোর জন্যে না, নিশানাথকে ডেকে আনছি।

কিছুক্ষণ পরই নিশানাথ জ্যোতিষার্ণবের গজগজানি শোনা গেল, রাতদুপুরে চা ? এইসব কী শুরু করেছ ? যাও, চা খাব না।

সফিকের গলা আরেক ধাপ উঁচুতে, বানানো হয়েছে চা খাবেন না মানে ? খেতেই হবে।

আরে, হুকুম নাকি তোমার ?

একশবার হুকুম। বানালাম এত কষ্ট করে আর তিনি খাবেন না। আলবত খাবেন।

সফিকের কাণ্ড-কারখানা দেখে আমি স্তম্ভিত। জ্যোতিষার্ণব অবশ্যি খড়ম খট খট করে ঘরে এলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করলেন, চা কোথায় ? ওয়াক

থু। এতো ইঁদুর মারা বিষ।

সফিক সে কথার উত্তর দিল না। খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে শান্ত স্বরে বলল, একটা গল্প বলুন নিশানাথ বাবু।

জ্যোতিষার্ণব চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, কী হয়েছে তোমার ?

কিছু হয় নাই।

না, বলো কী হয়েছে ?

সফিক ক্লান্ত স্বরে বলল, একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম আমার ছোট বোন আনু মরে পড়ে আছে। সাত-আটটা কাক তার পাশে বসে আছে।

নিশানাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, শেষ প্রহরের স্বপ্ন। তার ওপর এখন শুক্লপক্ষ— স্বপ্নের কোনোই মানে নাই। নাক ডাকিয়ে ঘুমাও।

একেবারে যে মানে নাই তা না নিশানাথ বাবু। অনুর হাসবেন্ডটা আরেকটা বিয়ে করেছে। সোমবার চিঠি পেয়েছি। মনটা বড় অস্থির। সন্ধ্যাবেলা আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছি, কিছু মনে করবেন না। আমার মাথা ঠিক নাই।

নিশানাথ বাবু কিছু বললেন না। চা শেষ করে নিঃশব্দে চলে গেলেন। আমি শুয়েই ছিলাম, ঘুম আসছিল না। সফিক জেগে রইল অনেকক্ষণ।

এই সফিক কী যে ক্যাবলা ছিল! একা একা স্কুলে আসতে ভয় পেত বলে রোজ তার বাবা স্কুলে দিয়ে যেতেন। টিফিনের সময় আমরা সবাই যখন ছোটাছুটি করে কুমির কুমির খেলি, তখন সে উদাস চোখে জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকে। অঙ্ক স্যার একদিন রেগে গিয়ে বললেন, সবাই খেলছে আর তুই বসে আছিস ? রহমান যা তো ওর কান মলে দে।

রহমান আমাদের ক্লাস ক্যাপটেন। সে গিয়ে কান চেপে ধরতেই সফিকের নিঃশব্দ কান্না। আমরা হেসে বাঁচি না। একদিন সফিকের বাসায় গিয়ে দেখি, তার মা ভাত মেখে খাইয়ে দিচ্ছেন। ক্লাস ফোরে পড়ে ছেলে, মায়ের হাত ছাড়া খেতে পারে না। কী কাণ্ড, কী কাণ্ড!

আমার ঘুম ভাঙল খুব সকালে। বাইরে এসে দেখি একটি লোক হাফ প্যান্ট পরে উঠবস করছে। আমাকে দেখে সে মনে হলো একটু লজ্জা পেল। ইতস্তত করে বলল, সফিক সাহেবের বন্ধু আপনি ?

জি।

আমি আজীজ। রেলে চাকরি করি। শরীরটা ঠিক রাখতে হয় ভাই। যা খাটনি।

আমি কিছু বললাম না। আজীজ সাহেব গায়ের ঘাম মুছতে মুছতে বললেন, আপনার মতো রোগা পটকা হলে এত দিনে যক্ষ্মা হয়ে মরে যেতাম। শরীরের জন্যে

টিকে আছি। ওয়াগন বুকিং-এর চাকরি যে করে সে-ই জানে।

আমি লক্ষ করে দেখলাম লোকটির স্বাস্থ্য সত্যি ভালো। সচরাচর এমন চোখে পড়ে না। আমি হাসিমুখে বললাম, বেশ স্বাস্থ্য আপনার।

আর স্বাস্থ্য। খাওয়া জুটাতে পারি না ভাই। শুধু ভিজা ছোলা খেয়ে কি স্বাস্থ্য হয় ? সারাক্ষণ খিদে লেগে থাকে। আসলাম পালোয়ান সকালবেলা দশটা ডিম আর এক সের গোস্তের কিমা খায়। এইসব জিনিস পাব কোথায় বলেন ?

আজীজ সাহেব আমাকে জোর করে টেনে নিয়ে গেলেন বেলের শরবত খাওয়ার জন্যে। এতে নাকি পেট ঠান্ডা থাকে। আজীজ সাহেবের ঘরটি বেশ বড়। তিনি এবং করিম সাহেব দু'জনে মিলে থাকেন। করিম সাহেব লোকটি কঙ্কালসার। মাথায় কোনো চুল নেই। কিন্তু মুখভর্তি প্রকাণ্ড গোঁফ।

করিম সাহেব, ইনি সফিক ভায়ের বন্ধু, এখানে থাকবেন।

করিম সাহেব হ্যাঁ-না কিছুই বললেন না। খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে নিচে নেমে গেলেন। তুমুল ঝগড়া শুরু হয়ে গেল তার পরই। করিম সাহেব বাঁশির মতো চিকন গলায় চিৎকার করছেন, এত বড় বালতিটা চোখে পড়ল না ?

বালতির মধ্যে নাম লেখা আছে যে দেখলেই চিনব ?

টেরা টেরা কথা বলবেন না।

টেরা কথা কে বলে, আমি না আপনি ?

যত ছোটলোকের আড্ডা হয়েছে।

মুখ সামলে কথা বলবেন সাহেব।

একজন অতি বৃদ্ধ লোক দেখলাম, কী বলে যেন দু'জনকেই থামাতে চেষ্টা করছেন। আজীজ সাহেব বললেন, উনি নবী সাহেব। গার্লস স্কুলের এ্যাসিসটেন্ট হেড মাস্টার ছিলেন। রিটায়ার করেছেন। অবস্থাটা দেখেছেন ? রাতে চোখে একেবারেই দেখতে পান না। হাত ধরে বাথরুমে নিতে হয়।

উনি নাকি ঘর ছেড়ে দেবেন, সফিক বলল।

আজীজ সাহেব গলা নিচু করে বললেন, পাগল হয়েছেন, শিকড় গজিয়ে গেছে। এই ঘর ছেড়ে যাবেন না কোথাও। দুই মেয়ে থাকে ঢাকায়— জামাইরা বড় চাকুরে, তারা নেবার চেষ্টা কম করে নাই, নিজের চোখে দেখা। ছোট মেয়েটার কত কান্নাকাটি...।

নবী সাহেব ঝগড়াটা থামিয়ে ফেললেন। তারপর নিচু গলায় ডাকতে লাগলেন, এই কাদের। এই কাদের। কাদের এই মেসের বাবুর্চি-টাবুর্চি হবে। সে এসে হাত ধরে তাঁকে উপরে নিয়ে এলো। আজীজ সাহেব ফিসফিস করে বললেন, বুড়ার দিন শেষ হয়ে আসছে। হাঁপানি আছে, ডায়াবেটিস আছে, সারারাত খকখক করে কাশে।

কিন্তু তেজ কী— মেয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকবে না। এত তেজ ভালো না রে ভাই! এখন আরাম নেয়ার সময়, কী বলেন ?

তা তো ঠিকই।

বুড়া হলে বুদ্ধিশুদ্ধি কিছু থাকে না।

সফিক ঘুম থেকে উঠে অন্য মানুষ। হাসিখুশি ভাবভঙ্গি। চা খেতে খেতে বলল, তোর কোনো চিন্তা নাই, প্রাইভেট টিউশনি ঠিক করে রেখেছি। সপ্তায় পাঁচ দিন যাবি। চোখ বন্ধ করে কলেজে ভর্তি হয়ে যা। শ' চারেক টাকাও জমিয়েছি। অসুবিধা হবে না। তাছাড়া আরেকটা বুদ্ধি বের করেছি।

কী বুদ্ধি ?

ছুটির দিনে কাটা কাপড়ের ব্যবসা করব। তুইও থাকবি।

সেটা কী রকম ব্যবসা ?

সস্তা দরে দোকান থেকে কাটা কাপড়ের পিস কিনে ফুটপাতে দাঁড়িয়ে বিক্রি করব। লাভের ব্যবসা। লালু সব ঠিকঠাক করে দেবে।

লালু কে ?

কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে। ধুরন্ধর লোক। আমাকে খুব খাতির করে।

আমি হাসি মুখে বললাম, তুই বদলে গেছিস খুব।

সফিক ঘর ফাটিয়ে হা হা করে হাসতে লাগল।

বদলাব না তো কী ? তুইও বদলাবি। দু'বেলা না খেয়ে থাকলেই সব উলটপালট হয়ে যায় বুঝলি। একদিন তো রাস্তায় সুচ বিক্রি করলাম। মজার ব্যাপার খুব।

সফিক সিগারেট ধরিয়ে ফুসফুস করে টানতে লাগল। ওর আগের সেই সুন্দর চেহারা আর নেই। চোখের নিচে কালি পড়েছে, গালের চোয়াল উঁচু হয়ে সমস্ত চেহারাটাই কেম যেন রুক্ষ হয়ে পড়েছে।

সফিক হাসি মুখে বলল, সুচ বিক্রির গল্পটা শোন। একেবারে মরণ দশা তখন। চাকরিবাকরি কিছুই নেই। হাতে জমানো টাকা-পয়সা যা ছিল সব শেষ। পুরা একটা দিন উপোস। দরজা বন্ধ করে খানিকক্ষণ কাঁদলাম। সন্ধ্যাবেলা বেরিয়েছি রাস্তায়। এম্নি সময় এক লোক এসে বলল, সুচ নিবেন ভাই ? ছয়টা চাইর আনা। আমি অবাক হয়ে বললাম, সুচ বিক্রি করে চলে তোমার ? সেই লোক আমতা আমতা করে বলে, 'না স্যার, চলে কই ? ঘরে চারজন খানেওয়ালা।' সেই রাত্রেই শুরু হলো আমার সুচের ব্যবসা। মূলধন যোগাড় করলাম জ্যোতিষার্ণবের কাছ থেকে। খুব লাভের ব্যবসা। পাঁচ টাকার সুচে দশ টাকা লাভ।

লজ্জা লাগত না তোর ?

না, লজ্জা লাগবে কেন ?

পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয় নাই ?

বেশি দিন সুচ বিক্রি করলে হয়তো হতো। বেশি দিন করি নাই। তবে আমাদের ক্লাসের একটা মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়েছিল একদিন। পেছন থেকে চিনতে পারি নি। যথারীতি বলেছি, 'আপা সুচ নেবেন, সস্তা করে দিচ্ছি।' মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে আমাকে দেখে একেবারে ফ্যাকাসে হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কথাই বলতে পারল না। শেষটায় বলল, কাল সন্ধ্যায় একবার আমার বাসায় আসবেন ? আসেন না। ঠিকানা রাখেন। আসবেন কিন্তু।

গিয়েছিলি ?

গেলাম। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি। দেখলেই বুকের মধ্যে হু-হু করে। মেয়েটিকে দেখে কে বলবে ওদের এত পয়সা। দারুণ মন খারাপ হয়ে গেল। মেয়েটি সেই রাত্রেই কম্পোজিটরের একটা চাকরি যোগাড় করে দিল। প্রেসের মালিককে কী বলেছিল কে জানে, যাওয়া মাত্র এক মাসের অ্যাডভান্স বেতন।

মেয়েটা তো খুব ভালো।

হুঁ, ভালো মেয়ে। তোকে একদিন নিয়ে যাব।

সফিককে নিয়ে সেই দিনই কলেজে ভর্তি হয়ে গেলাম। কলেজের প্রিন্সিপাল গম্ভীর মুখে বললেন, তিন বছর লস দিয়েছ দেখছি। এই তিন বছর করেছ কী ?

কানটান লাল হয়ে গেল আমার। নিজের অভাব-অনটনের কথা আমি নিজে মুখ ফুটে কখনো বলতে পারি না।

পুরনো বইয়ের দোকান থেকে কিছু বইপত্র যোগাড় করলাম। যে বাড়িতে প্রাইভেট টিউশনি যোগাড় হয়েছে সে বাড়িতেও সফিক আমাকে নিয়ে গেল। নয়-দশ বছরের একটি মেয়ে আর ক্লাস ওয়ানের একটি ছেলেকে পড়াতে হবে। এদের মা নেই। বাবা ব্যস্ততার মধ্যে সময় করতে পারেন না। ভদ্রলোক বললেন, দুটিই ভীষণ শয়তান, অস্থির হয়ে পড়েছি আমি। দেখেন ভাই যদি কিছু করতে পারেন। বাচ্চা দু'টিকে ভালো লাগল। ছোটটি দেখি একটি পেনসিল দিয়ে বোনকে খোঁচা দেয়ার চেষ্টা করছে। বড়টির মুখের ভাব এরকম যে, এইসব ছেলেমানুষি ব্যাপার দেখে সে বড়ই বিরক্ত। বাচ্চা দুটির খুব মায়াকাড়া চেহারা।

পান্থনিবাসে ফিরে এলাম অনেক রাতে। জ্যোতিষার্ণবের ঘরে প্রদীপ জ্বলছে, তাঁর মোটা গম্ভীর গলা শোনা যাচ্ছে, আপনার রবির ক্ষেত্রে ত্রিশূল চিহ্ন আছে। অতি শুভ লক্ষণ। হাজারে একটা পাওয়া যায় না। তবে মঙ্গলের ক্ষেত্র ভালো না। গ্রহ কুপিত হয়েছে।

আজীজ সাহেবের ঘরে হইহই করে তাস খেলা হচ্ছে। তীক্ষ্ণ গলায় কে যেন চেঁচাচ্ছে, এটা নো ট্রাম্পের কল ? মাথার মধ্যে কিছু আছে আপনার ? গোবরপুরা

মাথায় অফিসের কাজকর্ম করেন কীভাবে ?

বারান্দায় পাটি পেতে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন করিম সাহেব। কাদের তার গায়ে তেল মাখাচ্ছে। আরামে চোখ ছোট হয়ে আসছে করিম সাহেবের। আমাদের দেখে টেনে টেনে বললেন, তেল মালিশের মতো উপকারী কিছু নাই। দুইটা চিকিৎসা আছে— জল চিকিৎসা আর তেল চিকিৎসা।

পান্থনিবাসে আমার জীবন শুরু হলো। ১১ই মার্চ উনিশশো পঁয়ষট্টি সন।

বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে।

বাবা এবং মা দু'জনেই দু'টি পৃথক খামে চিঠি দিয়েছেন। বাবার চিঠি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। সে চিঠিতে নিজের ছেলেমেয়ের কথা কিছুই নেই। স্টেশনমাস্টার এবং পোস্টমাস্টারের কথা বিশদভাবে লেখা। বাবা লিখেছেন,

> বেহালার দাম কত তা নিশ্চয়ই খোঁজ নিয়াছ। ভালো করিয়া অনুসন্ধান করিবে এবং রেজিস্টারি চিঠি দিয়া আমাকে জানাইবে। এদিকের খবর ভালো। তবে স্টেশনমাস্টার সাহেবের বড় বিপদ। তাঁর চাকরি নিয়া ঝামেলা হইতেছে। হেডঅফিস হইতে ইন্সপেকশন হইবে। বড় উদ্বিগ্ন আছি। আমাদের পোস্টমাস্টার সাহেবের মেজো মেয়ের বিবাহের দিন ধার্য হইয়াছে। ছেলে কাস্টমসে চাকরি করে। তিনশত পঁচাত্তর টাকা বেতন। পনরই ফাল্গুন ইনশাল্লাহ্ বিবাহ। দেনা-পাওনা নিয়ে ছেলের এক মামার সহিত কিঞ্চিৎ মনোমালিন্য হইয়াছে। মামাটি অতি অভদ্র। সাক্ষাতে সমস্ত বলিব।

মায়ের চিঠিটাও ছোট। আমার পড়াশোনা নিয়ে উদ্বেগ। স্বাস্থ্য কেমন আছে, এখানকার খাওয়া-দাওয়া কেমন, এইসব। কিন্তু শেষের দিকে লিখেছেন—

> তোমার বাবার স্বাস্থ্য বিশেষ ভালো না। খাওয়া-দাওয়ায় ইদানীং খুব অনিয়ম করেন। আমার সন্দেহ হয় তাহার অল্প অল্প মাথার দোষ দেখা দিয়াছে। পরে বিস্তারিত লিখিব।

চিঠি পড়ে খুব মন খারাপ হয়ে গেল। মা নিশ্চয়ই অনেক কিছু গোপন করেছেন। খুব অস্থির লাগল। সফিকের সঙ্গে আলোচনা করা প্রয়োজন। কিন্তু সে আসবে রাত এগারোটার দিকে। বারান্দায় চেয়ার টেনে চুপচাপ বসে রইলাম। চার-পাঁচ মাসে বাবার এমন কী হতে পারে যাতে মা ভেবে বসেছেন বাবার মাথার দোষ হয়েছে। তাছাড়া সংসার চলছে কীভাবে সেই প্রসঙ্গেও কেউ কিছু লেখেন নাই। জমির আয় অতি সামান্য। মামারা মাঝে মাঝে টাকা দিয়ে সাহায্য করেন। এখনো করছেন কি না কে জানে! পারুলের স্কুলের বেতন দেয়া হয়েছে কি ? না নাম কাটিয়ে

বাড়িতে বসে আছে ? কিছু দিন আগে পারুলের চিঠি পেয়েছি, সেখানে এসব কিছুই লেখা নাই। বাড়ির জন্য বড় মন কাঁদতে লাগল।

জ্যোতিষার্ণবের কাছে একটু যে বসব সে উপায় নেই। তার নাকি আবার কী এক মৌনব্রত শুরু হয়েছে। এক সপ্তাহ কারো সঙ্গে কথা বলবেন না। হাত দেখাতে যারা আসছে তাদের ফিরিয়ে দেয়া হচ্ছে। সফিক মৌনব্রতের প্রথম দিনে চেঁচিয়ে বলেছে, শুধু ভড়ং, রোজগারপাতি নাই কিনা তাই একটা নতুন ফিকির বের করেছে।

এর উত্তরে জ্যোতিষার্ণব শ্লেটে বড় বড় করে লিখেছেন, মৌনব্রত অবস্থায় আমাকে রাগাইও না।

সেই শ্লেট রেখে এসেছেন সফিকের বিছানায়। সফিক রেগেমেগে অস্থির। তার এরকম রাগের অর্থও ঠিক বুঝতে পারি না। রোজগার বাড়াবার ফন্দিই যদি হয় তাতে ক্ষতি কী ? ফন্দিফিকির তো সবাই করে। তা এমনিতেও তার খুব তিরিক্ষি মেজাজ হয়েছে। কোনো কারণ ছাড়াই রেগে ওঠে। করিম সাহেবের সঙ্গে অকারণে একটি ঝগড়া করল। করিম সাহেব রোজকার মতো সন্ধ্যাবেলা গায়ে তেল মাখাচ্ছিলেন। সফিক গম্ভীর হয়ে বলল, এই কুৎসিত অভ্যাসটা ছাড়েন দেখি।

আপনার তো কোনো অসুবিধা হচ্ছে না।

ঘরের সামনে একটা লোক নেংটা হয়ে তেল মাখায়— এটা সহ্য করা যায় না।

আমি নেংটা হয়ে তেল মাখাই! আমি ?

তুমুল হৈচৈ বেধে গেল। নবী সাহেব এসে থামালেন।

সফিকের প্রেসের চাকরিটা নাই। কী নিয়ে গোলমাল করেছে কে জানে! লালুর সঙ্গে কাটা কাপড়ের ব্যবসা শুরু করেছে। সারাদিন রোদে দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে। সন্ধ্যার পর যায় বয়স্কদের কী একটা স্কুলে। এই চাকরিটি সে কীভাবে যেন ধাঁ করে যোগাড় করে ফেলেছে। মিউনিসিপ্যালিটি থেকে মাসে তাকে একশ' টাকা করে যাতায়াত খরচ দেয়। এর বিনিময়ে বস্তির লোকদের সে বর্ণ পরিচয় পড়ায়। এই চাকরিতে সে খুব সন্তুষ্ট। হাসিমুখে আমাকে বলে, সব গুণ্ডা-পাণ্ডাদের সঙ্গে খাতির হয়ে গেছে রে। অনেকেই আমার ছাত্র কিনা। খুব মানে। দেখবি ওদের দিয়ে 'নিউ প্রেসের' মালিককে রামধোলাই দেব একদিন। আর আমাদের রশীদ মিয়াকেও।

রশীদ মিয়া আবার কী করেছে ?

মস্ত বড় চোর। দেখ না কী করি শালাকে।

আমার মনে হয় সফিকের কোনো একটা অসুখ করেছে। রাতে তার ভালো ঘুম হয় না— ছটফট করে। প্রায়ই দেখা যায় অন্ধকার ঘরে স্টোভ জ্বালিয়ে চা করছে। রাতেরবেলা তার চা খাওয়ার সঙ্গী নিশানাথ বাবু। দুজনে চুকচুক করে অন্ধকারে চা খায়, আবার ঝগড়াও করে।

আমি প্রাণপণ চেষ্টা করি পড়াশুনা করতে। কিন্তু কিছুতেই মন বসে না। ক্লাসে বড্ড ঘুম পায়। প্রফেসররা একঘেয়ে সুরে কী বলেন তাঁরাই জানেন। একেক সময় এমন নির্বোধ মনে হয় তাদের। ক্লাস ফাঁকি দিয়ে প্রায়ই চলে যাই সদরঘাট। লঞ্চ টার্মিনালের কাছে সফিক লালুকে নিয়ে কাটা কাপড় বিক্রি করে। জায়গাটা নাকি ভালো। ঘরে ফেরা মানুষেরা বেশি দরদাম করে না। ঝটপট কিনে ফেলে। আমাকে দেখলেই সফিক বিরক্ত হয়। গম্ভীর হয়ে বলে, 'ক্লাস ফাঁকি দিয়ে আসলি ? মুসিবত দেখি।' ক্লাসে যেতে সত্যি আমার ভালো লাগে না। কলেজের ছেলেগুলোকে আপন মনে হয় না কখনো। অনেক বেশি ভালো লাগে পান্থনিবাসের লোকজনদের। এদের সাথে আমার পরিচয় অল্পদিনের— তবু মনে হয় যেন কত কালের চেনা। সিরাজ সাহেবের কথাই ধরা যাক। বয়সে আমার চেয়ে দশ-বারো বৎসরের বড়। কিন্তু আমার সঙ্গে এমনভাবে কথা বলেন যেন আমি তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু। পঁয়ত্রিশের মতো বয়স হয়েছে। বিয়ে করেছেন মাত্র গত বৎসর। বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই লাজুক ভঙ্গিতে বলেন, শুধু পয়সার অভাবে দেরি করলাম। কিন্তু বড় বেশি দেরি করে ফেলেছি। বউটার বয়স অল্পরে ভাই। মনে মনে বোধহয় কষ্ট পায়— বুড়ো হাসবেন্ড।

সিরাজ সাহেব প্রতি শনিবারে দেশে যান। সোমবার সকালে এসে অফিস ধরেন। শুক্রবার বিকালে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে হয় আমাকে। খুঁটিনাটি কত কী যে দরদাম করেন। মুখে কপট বিরক্তির রেখা।

বুঝলেন ভাই বিয়ে করার যন্ত্রণা! বাজারে ঘুরতে ভালো লাগে, বলেন দেখি ? গতবার যে নিয়ে গেলাম লাল ফিতা। পছন্দ হয় নাই। রঙটা নাকি কটা। মেয়েদের মনের ঠিক পাওয়া মুশকিল রে ভাই।

সিরাজ সাহেবের বৌটির আবার গল্পের বই পড়ার নেশা। মাঝে মাঝেই বই নিয়ে যাওয়ার ফরমাশ থাকে। বইয়ের দোকান ঘুরতে ঘুরতে ঘাম বেরিয়ে যায় আমার, বই আর সিরাজ সাহেবের পছন্দ হয় না। যে বই দেখানো হয়, সিরাজ সাহেব ঘাড় নাড়েন— উঁহু মলাটে এইটা পাখির ছবি নাকি ? এই বই ভালো হবে কী করে ভাই ? একটা ট্র্যাজিক বই দেখান না।

এমন সব অদ্ভুত জিনিস কেনার কথা মনে হয় সিরাজ সাহেবের। একবার কিনবেন সন্দেশ তৈরির ছাঁচ। সদরঘাট আর নিউমার্কেট চষে ফেললাম দুজনে— কোথাও পাওয়া যায় না। সিরাজ সাহেবের মুখ শুকিয়ে পাংশু।

খুব করে বলে দিয়েছে নিতে। শখ হয়েছে একটা, ছেলেমানুষ তো। শেষ পর্যন্ত চক বাজারে পাওয়া গেল। সিরাজ সাহেবের গালভর্তি হাসি, যেন গুপ্তধন পেয়েছেন।

রাতে টিউশনি থেকে ফেরার পর সিরাজ সাহেব একবার আসবেনই আমার ঘরে। হাসি মুখে বলবেন, বারান্দায় হাওয়ার মধ্যে খানিকক্ষণ বসবেন নাকি রঞ্জু ভাই ? পড়াশুনার ক্ষতি হলে থাক।

আমি রোজই গিয়ে বসি। একথা সেকথার পর সিরাজ সাহেব একসময় বৌয়ের কথা এনে ফেলেন।

কোয়ার্টার পেলে নিয়ে আসতে হবে। ছেলেমানুষ, একা একা থাকতে পারে বলেন দেখি? তার ওপর তার আবার ভূতের ভয়।

শিগগিরই পাবেন কোয়ার্টার?

অফিসার্স গ্রেডে গেলেই পাব। সুন্দর কোয়ার্টার। বেড রুম দুইটা। বারান্দা আছে। ফুলের টব রাখা যায়। আপনার ভাবির আবার গাছের শখ।

তাই নাকি?

আর বলেন কেন! গাছের নামে অজ্ঞান। এইবার হুকুম হয়েছে রজনীগন্ধার চারা নিতে হবে। বিয়ে করার যে কী ঝামেলা, বিয়ে না করলে বুঝবেন না।

সিরাজ সাহেব কপট বিরক্তিতে মুখ অন্ধকার করতে চেষ্টা করেন। বারান্দার আবছায়া অন্ধকারেও কিন্তু তাঁর হাসিমুখ ঢাকা পড়ে না। বড় ভালো লাগে আমার।

একবার ভাবিকে দেখতে যাব আমি আপনার সঙ্গে।

অবশ্যই অবশ্যই। এই শনিবারেই চলেন। কী যে খুশি হবে। না দেখলে বিশ্বাস করবেন না। ওর কাছে আপন-পর কিছু নাই— সবাই আপন। যেতে হবে কিন্তু ভাই, ছাড়ব না আমি।

শনিবারে কিন্তু সিরাজ সাহেব যেতে পারলেন না। অফিসের কাজ পড়ে গেল হঠাৎ করে। মুখ কালো করে ঘুরতে লাগলেন। রাতে খেতে পারলেন না। মোটেই নাকি খিদে নেই। রোববার ভোরে দেখি তার চোখ বসে গেছে। দিশেহারা ভাব। সারারাত নাকি ঘুম হয়নি। খুব আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছেন।

দেখেছেন যেন একটা মস্ত বড় সাপ রেখাকে ছোবল দিচ্ছে। মনটা বড় অস্থির ভাই। চলেন দেখি নিশানাথের কাছে যাই।

নিশানাথ গম্ভীর মুখে শুনলেন সবকিছু। তাঁর ভাব দেখে মনে ভরসা পাওয়া যায় না। কিন্তু কথা বললেন খুব নরম গলায়, দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মন তো— তাই এইসব দেখেছেন। এইসব কিছু না। শনিবার তো এলো বলে। বড় সাহেবকে বলে এইবার একদিন বেশি থেকে আসবেন।

কিন্তু পরের শনিবারে সিরাজ সাহেবকে অফিসের কাজে খুলনা চলে যেতে হলো। সোমবার সন্ধ্যায় ফিরলেন। আমরা সিরাজ সাহেবের দিকে তাকাতে পারি না। নবী সাহেবের মতো মানুষ পর্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, দেশে একটা টেলিগ্রাম করে দাও। চিন্তা করবে তো।

সিরাজ সাহেব দার্শনিকের মতো মুখ করে বললেন, টেলিগ্রাম করে আর কী হবে!

পান্থনিবাসের জীবনযাত্রা খুব একঘেয়ে বলেই বোধ হয়। সোমবার ভোরে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। সবাই অবাক হয়ে দেখলাম রিকশা থেকে একটি

ফুটফুটে মেয়ে নামছে। এমন মায়াকাড়া চেহারা। হলুদ রঙের একটি শাড়িতে দারুণ মানিয়েছে। যদিও কেউ আমাকে কিছু বলেনি তবু বুঝলাম এই মেয়েটিই সিরাজ সাহেবের বৌ। একটা হুলস্থুল পড়ে গেল আমাদের মধ্যে। নিশানাথ জ্যোতিষার্ণব সিরাজ সাহেবকে ভাই বলে ডাকেন। তিনি অবলীলায় বলতে লাগলেন, এসো মা এসো। আসবে সিরাজ। যাবে কোথায় ? অফিসের কাজে আটকা পড়ে যেতে পারে নি। আজ ও সকাল সকাল চলে গেছে। এখনই আনতে লোক যাবে।

সিরাজ সাহেবের বৌটি অল্প সময়ের মধ্যে সহজ হয়ে গেল। নিশানাথ বাবু এবং নবী সাহেব দুজনকেই সে এমন সুরে চাচাজান ডাকতে লাগল যেন বহু দিন পর হারানো চাচা ফিরে পেয়েছে। নবী সাহেব দু'বার রান্নাঘরে গিয়ে তদারক করলেন নাস্তাপানি কী দেয়া হবে। সফিক চলে গেল সিরাজ সাহেবের অফিসে। করিম সাহেব গম্ভীর হয়ে ঘোষণা করলেন, আজ আর তিনি অফিসে যাবেন না। দুপুরের খাবারটা যেন ভালো হয় সেটা দেখাশোনা করা দরকার। কাদেরের ওপর ভরসা করা যায় না। মেয়েটি মনে হলো অভিভূত হয়ে পড়েছে। সে কখনো ভাবেনি এমন একটা সমাদর তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। সবার সঙ্গে সে এমন ভাব করতে লাগল যেন সে পান্থনিবাসে দীর্ঘদিন ধরে আছে। এখানকার সবাই তার চেনা।

সফিক সিরাজ সাহেবকে সঙ্গে করে এগারোটার দিকে এলো। সিরাজ সাহেবকে কিছুই বলেনি সে। সিরাজ সাহেবের মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। তিনি কাঁপা গলায় বললেন, আমার নাকি দুঃসংবাদ আছে ?

জ্যোতিষার্ণবের দাড়ির ফাঁকে হাসি খেলে গেল। তিনিও যথাসম্ভব গম্ভীর গলায় বললেন, যান দেখি সাহেব আমার ঘরে। দুঃসংবাদ তো আছেই। ঘরে গিয়ে বসেন ঠান্ডা হয়ে, বলছি।

সিরাজ সাহেব ঘরে ঢুকতেই ঝপাং করে দরজা বন্ধ করে ফেলা হলো। জ্যোতিষার্ণবের হাতে তালা মজুদ ছিল। তালা লাগিয়ে দেয়া হলো দরজায়। আমাদের সমবেত হাসির শব্দে রাস্তায় লোক জমে গেল।

রাতেরবেলা খেতে গিয়ে দেখি ফিস্টের ব্যবস্থা। এ মাসের বাজারের ভার আজীজ সাহেবের হাতে। তিনি কাউকে না জানিয়ে ফিস্টের ব্যবস্থা করেছেন। বাকি মাস সাবধানে বাজার করে তিনি নাকি সব পুষিয়ে নেবেন।

পান্থনিবাসে নিজেদের দুঃখ-কষ্ট আমরা ভুলে থাকার চেষ্টা করি। তবু একেকবার মন ভেঙে যেতে চায়। বাড়ির চিঠি পড়ে আমার আজ বড় কষ্ট হচ্ছে। হাতে একেবারেই টাকা-পয়সা নেই। থাকলে আজ রাতেই বাড়ি চলে যেতাম। প্রাইভেট মাস্টারিটা ভালো লাগছে না। ভদ্রলোক কিছুতেই টাকা দিতে চান না। বেতন দেবার সময় হলেই অম্লান বদনে বলেন, এই মাসে একটা ঝামেলা আছে— সামনের মাসে নেন।

পরের মাসেও তাঁর হাতে টাকা থাকে না। অল্প কিছু দিয়ে বলেন, বাকি টাকাটা দিন সাতেক পরে চেয়ে নেবেন।

দিন সাতেক পর টাকা চাইলে মহাবিরক্ত হয়ে বলেন, মাসের মাঝখানে আমি টাকা পাই কোথায় বলেন দেখি? বিচার-বিবেচনা তো কিছু আপনার থাকা দরকার।

পড়াবার সময় কাছে বসে থাকেন। বাচ্চা দুটি একসময় ঘুমে ঢুলতে থাকে। আমি উঠতে চাইলেই গম্ভীর হয়ে বলেন, এখনই উঠবেন কী দশটা তো বাজে নাই! হাতের লেখাটা আর একবার লেখান।

বাচ্চাদের উঠিয়ে নিয়ে চোখে পানির ঝাঁপটা দিয়ে আবার এনে বসান। মেয়েটি করুণ চোখে তাকায় আমার দিকে। বড় মায়া লাগে।

সফিকের সঙ্গে কথা বলে মাস্টারিটা ছেড়ে দিতে হবে। ওর সঙ্গে দিনেরবেলা কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে রাতে নাইট কলেজে পড়ব। সফিকের যদি লজ্জা না লাগে আমার লাগবে কেন? বাড়িতে সাহায্য করতে হবে।

আজ আর পড়াতে না গিয়ে সফিকের জন্যে বারান্দায় মোড়া পেতে বসে রইলাম। করিম সাহেব আজও গায়ে তেল মেখে বারান্দায় মাদুরের উপর শুয়ে আছেন। আমার সঙ্গে আলাপ জমাবার চেষ্টা করলেন, নিশানাথের মাথায় এক বালতি ঠান্ডা পানি ঢাললে দেখবেন মৌনব্রত কোথায় গেছে। ফরফর করে কথা বলবে বুঝলেন, এসব ধান্ধাবাজি আমার কাছে চলবে না।

আমি চুপ করে রইলাম। করিম সাহেব বললেন, আরে ভাই লোক চরিয়ে খাই, আমার সঙ্গে চালাকি? মৌনব্রতের পাছায় লাথি।

সফিক ফিরল অনেক রাতে। চোখে-মুখে দিশেহারা ভাব। গায়ে আকাশ-পাতাল জ্বর। জ্যোতিষার্ণব তার গায়ে হাত দিয়েই মৌনব্রত ভেঙে ফেললেন, চেঁচিয়ে বললেন, পানি ঢালতে হবে মাথায়। আর ডাক্তার লাগবে একজন।

সফিক চিঁ চিঁ করে বলল, ডাক্তার দেখিয়েই এসেছি। প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়েছে, টাকা থাকলে ওষুধ আনান। আমার কাছে নাই কিছু।

জ্বর বাড়তেই থাকল। সফিক আরক্ত চোখে নিশানাথের দিকে তাকিয়ে বলল, আয়ু রেখাটা দেখেন দেখি ভালো করে। এত সকাল সকাল মরলে হবে না। কাজ অনেক বাকি আছে।

নবী সাহেব, আজীজ সাহেব, করিম সাহেব সবাই এসে ভিড় করে দাঁড়াল। আমি জ্বরের গতি দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

কিন্তু আশ্চর্য, শেষ রাতের দিকে ঘাম দিয়েই জ্বর ছেড়ে গেল। সফিক ভালো মানুষের মতো উঠে বসে বলল, খিদে লেগেছে, কী খাওয়া যায় বলেন দেখি নিশানাথ বাবু?

নিশানাথ জ্যোতিষার্ণব আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন,

বড্ড ঝামেলা হয়ে গেছে রঞ্জু। ভয়ের চোটে মানত করে ফেলেছিলাম। আজ রাতে জ্বর কমলে কাল দুপুরেই কাঙালি ভোজন করাব। হাতে পয়সাকড়ি মোটেই নাই। এদিকে জ্বর তো দেখি কমেই গেছে। তারা মা ব্রহ্মময়ী একী বিপদে ফেললে আমাকে!

শীতের শুরুতে বাবা এসে হাজির।

খোঁচা খোঁচা দাড়ি সারামুখে। গায়ে একটা ময়লা কোট। স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। চেনা যায় না এমন।

মায়ের চিঠিতে স্বাস্থ্য খারাপ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা যে এতটা কল্পনাও করিনি। নিচের পাটির একটি দাঁত পড়ে গিয়ে এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছে তাঁকে!

ও রঞ্জু, কেমন আছিস তুই ? কতদিন পর দেখলাম।

আমি অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না। বারবার মনে হলো বাবার মাথার দোষটা হয়তো সেরে গেছে। না সারলে এতদূরে ঠিকানা খুঁজে খুঁজে এলেন কী করে ? তবু সন্দেহ যায় না। বারবার জিজ্ঞেস করি, মাকে বলে এসেছেন তো বাবা ? না বলে আসেননি তো ?

বাবা পরিষ্কার কোনো উত্তর দেন না। একবার বলেন, হ্যাঁ বলেছি তো। আবার বলেন, বলব কী করে ? তোর মা কথা বলে না আমার সঙ্গে। ভাত খাওয়ার সময় আমি সামনে থাকলেও বলে, পারুল তোর বাবাকে খেতে বল।

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বাবাকে লক্ষ করি। কথাবার্তা বেশ স্বাভাবিক। আমার পরীক্ষা কবে, পড়াশোনা কী রকম করছি, এইসব খুব আগ্রহ করে জিজ্ঞেস করলেন।

রাতে হোটেলে ভাত খাওয়াতে নিয়ে গেলাম। সারাপথ গল্প করতে করতে চললেন। এখন আর গল্পের ধরন সে রকম স্বাভাবিক মনে হলো না। যেন নিজের মনেই কথা বলছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, বাড়ির সবাই ভালো আছে বাবা ?

বাবা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, হ্যাঁ, সবাই ভালো। স্টেশনমাস্টারের ছোট ছেলেটার হুপিং কফ হয়েছে।

পারুল, পারুল কেমন আছে ? তাঁর পরীক্ষা কবে ?

জানি না তো। ভালো আছে নিশ্চয়ই।

আমি অবাক হয়ে বলি, পারুল কেমন আছে জানেন না ? কী বলছেন এসব ?

কী করে জানব, বোকার মতো কথা বলিস। পারুলের বিয়ে হয়ে গেছে না ?

আমি স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে থাকি। এসব কী শুনছি!

কী বলছেন আপনি ? কিসের বিয়ে ?

গত শুক্রবার পালিয়ে গিয়ে বিয়ে করে ফেলেছে। তোর মার এমন ভ্যাজর ভ্যাজর— পুলিশে খবর দাও, পুলিশের খবর দাও। মেয়েছেলেদের বুদ্ধি তো।

আমি বেশ খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। ভাবতেও পারছিলাম না কেন তারা আমাকে একটা খবর জানানোর প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করল না।

ছেলেটা ভালো। বেশ ভালো। পারুলকে নেত্রকোনায় নিয়ে গেছে। আমি ওদের সঙ্গে গৌরীপুর পর্যন্ত গেলাম। আমার টিকিট লাগে না। ট্রেনের চেকাররা সবাই আমাকে চেনে। খুব খাতির করে।

বাবার কথাবার্তা শুনে চোখে পানি এসে গেল আমার। পারুলের মতো মেয়ে এই করবে ? পনেরো বছর যার বয়স! খবর দিলেন না কেন বাবা ? একটা টেলিগ্রাম তো করতে পারতেন।

বাবা শান্ত স্বরে বললেন, তোর মা বলল টেলিগ্রাম করলে শুধু শুধু দুশ্চিন্তা হবে। আমি চিঠি লিখব। মেয়েমানুষের এরচে' বেশি বুদ্ধি কি হবে ? হলে তো আর মেয়েছেলে থাকত না, পুরুষই হয়ে যেত।

মায়ের চিঠি পৌঁছবার আগেই পারুলের চিঠি এলো। নেত্রকোনা থেকে লিখেছে। লম্বা চিঠি। কিন্তু কোথাও নিজের বিয়ের কথা কিছু নেই। একবারও লেখেনি যে সে একটা ভুল করে ফেলেছে। তার দীর্ঘ চিঠির মূল বক্তব্য হচ্ছে, বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ। মামারা টাকা-পয়সা দেয়া বন্ধ করেছেন। আমি যেন যেভাবেই হোক প্রতি মাসে মাকে টাকা পাঠাই। প্রয়োজন হলে কলেজ ছেড়ে দিয়েও যেন একটা চাকরি যোগাড় করি। বড় ডাক্তার দেখিয়ে যেন অতি অবশ্যি বাবার ভালো চিকিৎসার ব্যবস্থা করি। চিঠির শেষে পুনশ্চ দিয়ে লেখা—

দাদা দেখবে একদিন সব ঠিক হয়ে যাবে। আজকে আমার ওপর রাগ হলেও সেদিন আর রাগ থাকবে না।

মায়ের চিঠিটি পাঁচ পাতার। ব্যাপারটি কীভাবে ঘটল তা নিখুঁতভাবে লেখা। বৃহস্পতিবার সারাদিন পারুল নাকি শুয়ে শুয়ে কেঁদেছে। মাকে বলেছে পেটে প্রচণ্ড ব্যথা। শুক্রবার সকালে পরিষ্কার দেখে একটা শাড়ি পরে অঞ্জুকে পুকুর ঘাটে নিয়ে একটি টাকা দিয়ে বলেছে ইচ্ছেমতো খরচ করতে। মা একবার খুব ধমক দিলেন। পরিষ্কার শাড়িটা নষ্ট করছে সেই জন্যে। পারুল কিছু বলে নাই। দুপুরে খাওয়ার পর মাকে গিয়ে বলেছে, মা আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে বড্ড মাথা ধরেছে। মা ধমক দিয়ে সরিয়ে দিয়েছেন। তারপর বিকালে ঘুম থেকে উঠে দেখেন পারুল ঘরে নেই।...

সফিক সব কিছু শুনে বলল, তোর বোনটার তাহলে বুদ্ধি আছে দেখি ?

বুদ্ধির কী আছে এর মধ্যে ?

বিয়ে করে নিজে বেঁচেছে, তোদেরও রিলিফ দিয়েছে।

পরক্ষণেই সে পারুল প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, প্রতি মাসে তোর মাকে টাকা পাঠাতে হবে। এইটা খুবই জরুরি। আমি অবাক হয়ে বললাম,

কোত্থেকে পাঠাব ? টাকা কোথায় ?

সবাই মিলে একটা চায়ের স্টল দিয়ে ফেলি আয়। খোঁজ নিয়েছি ভালো লাভ হবে। ম্যানেজার করে দেব নিশানাথকে। নিশানাথের দাড়ি-গোঁফ দেখেই দেখবি হুড়হুড় করে কাস্টমার আসবে। চা বানিয়ে কূল পাওয়া যাবে না।

বলে কী সফিক! নিশানাথ জ্যোতিষার্ণব চায়ের দোকান দেবে ? সফিককে দেখে মনে হলো তার মাথার প্ল্যান খুব পাকা।

কাটা কাপড়ের ব্যবসাটা মাঠে মারা গেছে। ভাত খাওয়ার পয়সা নাই লোকে কাপড় কিনবে কি!

আমি বললাম, জ্যোতিষার্ণব বুঝি চায়ের দোকান খুলবে তোর সাথে ?

না খুলে যাবে কোথায় ? একটা লোক আসে না তার কাছে। ব্যাটার এখন ধূপ কেনার পয়সা নাই।

সফিক ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। যেন খুব একটা হাসির ব্যাপার হয়ে গেছে।

জ্যোতিষার্ণবের এমন দুর্দিন যায়নি কখনো। সঞ্চয় যা ছিল উড়ে গেছে। শখের টেবিল ফ্যানটি বিক্রি করেছেন করিম সাহেবের কাছে। আমাকে গম্ভীর হয়ে বললেন, সাধু সন্ন্যাসী মানুষদের জন্যে এইসব কিছু দরকার নাই। আমাদের কাছে হিমালয়ের গুহাও যা আবার সাহারা মরুভূমিও তা, ফ্যানের কোনো প্রয়োজন নেই।

মিল চার্জ বাকি পড়ায় গত শনিবার থেকে খাওয়া বন্ধ। পরশু দুপুরে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখি একটা শুকনো পাউরুটি চিবোচ্ছেন। আমাকে দেখে দারুণ লজ্জা পেয়ে গেলেন। কানটান লাল করে বললেন, আমিষ বর্জন করলাম রঞ্জু। জ্যোতিষশাস্ত্রের মতো গূঢ় বিদ্যার চর্চা করলে মাছ-মাংস সমস্ত বর্জন করতে হয়। আমার ঠাকুরদা শ্রী শ্রী তারানাথ চক্রবর্তী সমস্ত দিনে এক মুঠি আলো চালের ভাত আর এক বাটি দুধ খেতেন। কি বিশ্বাস হয় ? আমিষ একবার বর্জন করে দেখো শরীর ঝরঝরে হয়ে যাবে।

রশীদ মিয়া উচ্ছেদের নোটিশ দিয়েছে। নিশানাথ বাবুর নাকি তিন মাসের সিট রেন্ট বাকি। জ্যোতিষার্ণব শুনলাম অতি গম্ভীর ভঙ্গিতে বলছেন, আর একটি মাস রশীদ মিয়া। এর মধ্যেই আমার মঙ্গল হোরায় প্রবেশ করবে। রবির ক্ষেত্র আবার...

আরে রাখেন সাহেব মঙ্গল আর রবি। পনেরোদিন সময়। এর মধ্যে পারেন দিবেন না পারেন বিস্‌মিল্লাহ বিদায়। তিনমাসের সিট রেন্ট আপনার দেয়া লাগবে না।

জ্যোতিষার্ণবের এমন খারাপ সময় যাবে তা স্বপ্নেও ভাবি নি। তাঁকে টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করা যাবে না। দান এবং ঋণ গ্রহণ, এই দুই জিনিস নাকি তাঁর জন্যে নিষিদ্ধ। সফিক সবার সঙ্গে পরামর্শ করে বাংলা দৈনিক সব ক'টিতে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিল। একদিন পর পর সে বিজ্ঞাপন ছাপা হলো এক সপ্তাহ পর্যন্ত।

পাক ভারত উপমহাদেশের প্রখ্যাত জ্যোতিষ শ্রী নিশানাথ চক্রবর্তী, জ্যোতিষার্ণব। এম. এ. (ফলিত গণিত)। বহু রাজা মহারাজার প্রশংসাপত্র আছে।

আসুন পরীক্ষা করুন, দর্শনী নামমাত্র।

নিশানাথ বাবু বিজ্ঞাপন দেখে খুবই রেগে গেলেন। সফিককে গিয়ে বললেন, এম. এ. (ফলিত গণিত) এটা কোথায় পেলে ? মিথ্যাচার করা হলো। উফ কি তঞ্চকতা।

সফিক বলল, সবটাই তো তঞ্চকতা নিশানাথ বাবু। সবটাই যখন মিথ্যার ওপর কাজেই মিথ্যাটাকে আরেকটু বাড়ানো হলো।

হাজার বৎসরের পণ্ডিতদের সাধনালব্ধ জ্ঞান সবই মিথ্যা ? নিতান্ত মূঢ়ের মতো কথাবার্তা। জ্ঞানহীন মূর্খের বাচালতা।

'হিমু কুন্দ মৃণালাভং দৈত্যাং পরং গুরু,
সর্ব্ব শাস্ত্র প্রবক্তা ভার্গবং ॥'

অং বং করে লাভ কিছু নাই নিশানাথ বাবু। এসব এখন ছাড়ার সময় এসে পড়েছে।

এত করেও নিশানাথ বাবুর অবস্থা ফেরানো গেল না। ঢাকা শহরের সব লোক হঠাৎ হাত দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে কিনা কে জানে। এমন খারাপ অবস্থা হবে জ্যোতিষার্ণবের স্বপ্নেও ভাবিনি। একদিন অনেক ভণিতা করে সফিককে বললেন, আমার একটা ভালো ঘড়ি আছে। এক ভক্ত দিয়েছিল। শুধু শুধু পড়ে আছে কোনো কাজে লাগে না।

কাজে লাগে না কেন ?

এইসব কলকব্জার ঘড়িতে কি আমাদের হয় ? আমাদের দরকার বালি ঘড়ি কিংবা সূর্য ঘড়ি। সেইসব ঘড়িতে পল-অনুপল এইসব হিসাবও সূক্ষ্মভাবে করা যায়। পল বোঝো তো ? পল হচ্ছে এক দণ্ডের ষাট ভাগের এক ভাগ।

সফিক নিস্পৃহ ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকে। জ্যোতিষার্ণব হাসিমুখে বলে চলেন, তাই ভাবলাম কাজে যখন লাগে না তখন আর ঘড়ি রেখে লাভ কী ? রোজ চাবি দেয়া যন্ত্রণার এক শেষ। সফিক, তুমি ঘড়িটা নিয়ে বিক্রি করে ফেলো। সফিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকায়।

বিক্রি করে ফেলব ?

হ্যাঁ। সাধু-সন্ন্যাসী মানুষ আমি, এইসব বিলাসসামগ্রী দুই চোখে দেখতে পারি না। তান্ত্রিক সাধনাতে মোহমুক্তির প্রয়োজন সবচে' বেশি। তোমরা এইসব বুঝবে না। বিষয়ী লোকদের বোঝা খুব মুশকিল।

জ্যোতিষার্ণব পকেট থেকে ভেলভেটের বাক্সে সযত্নে রাখা হাত ঘড়িটি বের করে টেবিলে রেখেই দ্রুত চলে গেলেন। বেশ ভালো ঘড়ি সেটি। সফিক ঘড়ির বাক্স হাতে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, ব্যাটার তো খুবই খারাপ অবস্থা রঞ্জু। ঘড়িটি তাঁর খুব শখের। সফিক চিন্তিত মুখে ঘড়ি হাতে বেরিয়ে গেল।

জ্যোতিষার্ণবের ভাগ্য বদলাল দুপুরের একটু পর। সম্ভবত মঙ্গল হোরায় প্রবেশ করেছে, রবির ক্ষেত্র আবার ঠিকঠাক হয়ে গেছে। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম প্রকাণ্ড একটি সাদা রঙের গাড়ি এসে থামল পান্থনিবাসের সামনে। গাঢ় নীল রঙের শাড়ি পরা একটি মেয়ে সেই গাড়ি থেকে নেমে সোজা উঠে এসেছে পান্থনিবাসের দোতলায়। সাধুজি নিশানাথ জ্যোতিষার্ণবের খোঁজ করছে সেই মেয়ে। আমাদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। রশীদ মিয়া পর্যন্ত একবার উঁকি দিয়ে দেখে গেল। অনেক দিন পর জ্যোতির্ষাণবের ভারি গলা পাওয়া গেল, অতি সুলক্ষণা মেয়ে মা তুমি, অতি সুলক্ষণা। চন্দ্র ও রবির মিলিত প্রভাব, কেতুর মঙ্গলে অবস্থান। এরকম হয় না, খুব কম দেখা যায়। হুঁ হুঁ। বিদ্যা ও ধন। লক্ষ্মী-সরস্বতী এক মালায় গাঁথা। বড় ভাগ্যবতী তুমি।

যাবার সময় সেই মেয়ে একশ' টাকার দুটি নোট দিয়ে জ্যোতিষার্ণবের কণ্ঠরোধ করে দিল। নিশানাথ বাবু দু'মাসের সিট রেন্ট মিটিয়ে দিলেন। সন্ধ্যাবেলা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ধূপ কিনে আনলেন। অনেকদিন পর তাঁর ঘরে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলল, ধূপ পড়তে লাগল। করিম সাহেব একবার অবাক হয়ে বললেন, এক কথায় দুশো টাকা দিয়ে দিল। পাগল নাকি মেয়েটা ?

নিশানাথ গম্ভীর হয়ে বললেন, দুশো টাকা খুব বেশি লাগল আপনার কাছে ? হাজার টাকা নিয়েও মানুষ একদিন আমাদের সাধাসাধি করেছে। টাকা অতি তুচ্ছ জিনিস মশাই আমাদের কাছে।

অনেক দিন পর জ্যোতিষার্ণব মেসের এক তলায় সবার সঙ্গে খেতে গেলেন। মাছের তরকারিতে নুন কম হয়েছে কেন তাই নিয়ে তুমুল ঝগড়া শুরু করলেন কাদেরের সঙ্গে।

সফিক সন্ধ্যাবেলা এসে জিজ্ঞেস করল, আভাকে আসতে বলেছিলাম। এসেছিল ? আমি অবাক হয়ে বললাম, আভা কে ?

ঐ যে মেয়েটির কথা বলেছিলাম, চাকরি দিয়েছিল আমাকে। আসে নাই ?

এসেছিল।

বলেছিলাম আজকেই আসতে। টাকা-পয়সা কত দিয়েছে জানিস নাকি ? একশো টাকা দিতে বলেছিলাম।

দুশো টাকা দিয়েছে।

মেয়েটার নজর খুব উঁচু। সাধু ব্যাটা কিছু বুঝতে পারে নাই নিশ্চয়ই।

আমি কিছু বললাম না। সফিক হাসিমুখে বলল, যাক ঘড়িটি বিক্রি করতে হয় নাই। নিশানাথের খুব শখের ঘড়ি।

সফিক ঘড়ি ফিরিয়ে দিতে গিয়ে প্রচণ্ড ঝগড়া বাধিয়ে বসল। অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে ঝগড়া। নিশানাথ বাবু সফিককে হাসতে হাসতে বলেছেন, আমার কেতু এবং মঙ্গলের যে দোষটা ছিল সেটা কেটে গেছে সফিক। হুড়হুড় করে টাকা আসা শুরু হয়েছে। তোমার দরকার হলে বলবে, লজ্জার কিছু নাই।

সফিক বলেছে, এইসব ধান্ধাবাজি এখন ছাড়েন নিশানাথ বাবু। অনেক তো করলেন।

নিশানাথ রাগে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, পুত্রবৎ জ্ঞান করি তোমাকে আর তোমার মুখে এত বড় কথা। রাগের মাথায় ব্রহ্মশাপ দিয়ে ফেলব সফিক।

কী আমার দুর্বাশা মুণি! ব্রহ্মশাপ দেবেন।

খবরদার বলছি। খবরদার। জ্বলেপুড়ে খাক হয়ে যাবে।

হাতহাতি হয়ে যাবার মতো অবস্থা।

গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে শুনি চুকচুক শব্দ হচ্ছে। অন্ধকারে বসে তিন মূর্তি চা খাচ্ছে। সফিক, জ্যোতিষার্ণব আর আমার বাবা। ফিসফিস করে তাদের মধ্যে কী সব কথাবার্তাও হচ্ছে। বাবা এখানেই আছেন, কিছুতেই ফিরে যেতে চাচ্ছেন না। রাত্রে জ্যোতিষার্ণবের ঘরে গিয়ে ঘুমান। দিনেরবেলাটা কাটান সফিকের ঘরে। আমি দেশে ফেরানোর কথা বলে বলে হার মেনেছি। সফিক অবশ্যি বলছে, থাকুন না তিনি। মেডিক্যালে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থাটা করি আগে।

মেডিক্যালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ডাক্তাররা অনেক কথাবার্তা বলেও কোনো অসুখ-বিসুখ ধরতে পারলেন না। রাগী চেহারার একজন বুড়ো মতো ডাক্তার শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললেন, অসুবিধাটা কী আপনার বুঝতে পারছি না তো।

বাবা বললেন, অসুবিধা তো কিছু নাই ডাক্তার সাহেব।

রাত্রে ঘুম হয়?

ঘুম হবে না কেন?

বাবা মহাসুখেই আছেন। পান্থনিবাসের সবার সঙ্গেই তাঁর খাতির। আজীজ সাহেব সকালবেলা ব্যায়াম করেন। তিনি বসে থাকেন পাশে। আমাকে প্রায়ই বলেন, রঞ্জু, স্বাস্থ্য হচ্ছে সমস্ত সুখের মূল। স্বাস্থ্যটা ঠিক রাখা দরকার। তুই বেলের শরবত খাবি। খুব উপকারী। আজীজ বলেছে আমাকে।

বাবার সবচে' বেশি খাতির সিরাজ সাহেবের সঙ্গে। সিরাজ সাহেব কোনো এক বিচিত্র কারণে বাবাকে পছন্দ করেন। অফিস থেকে এসেই তিনি বাবাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে যাবেন। তারপর দরজা বন্ধ করে গুজগুজ করে আলাপ। এক শনিবারে বাবা সিরাজ সাহেবের সঙ্গে তাঁর গ্রামের বাড়িতে বেড়াতে গেলেন। আমি কিছু

বললাম না। পরের শনিবার দেখি আবার যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছেন। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। বাবা শান্ত স্বরে বললেন, আমার জন্যে বৌটা কৈ মাছ যোগাড় করে রাখবে বলেছে— না গেলে কেমন করে হয় ?

কৈ মাছ খাওয়ার জন্য এতদূর যাবেন ?

নারিকেলের চিড়া করে রাখবে। এখন না যাই কী করে ?

এইবার ফিরে এসে তিনি অত্যন্ত গম্ভীর মুখে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। যেন অত্যন্ত রহস্যময় একটি ব্যাপার তিনি জেনে ফেলেছেন। ব্যাপারটি দু'দিন পর আমরাও জানলাম। রাতের খাওয়ার পর বাবা আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়ের ছবি সফিকের টেবিলের উপর রেখে গম্ভীর হয়ে সফিকের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সফিক অবাক হয়ে বলল, এ ছবি কার ? আর এই মেয়েটিইবা কে ?

বাবা রহস্যময় হাসি হেসে বললেন, রেবার ছবি।

রেবা ? রেবা কে ?

যেই হোক তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?

সফিক এবং আমি দুজনেই মুখ চাওয়াচাওয়ি করি। বাবা নিজেই খোলাসা করেন, রেবা হচ্ছে সিরাজ সাহেবের বোন। ওর সঙ্গেই তোমার বিয়ে ঠিক করে এসেছি। পাকা কথা দিয়ে ফেলেছি।

সফিকের চেয়ে বেশি হকচকিয়ে যাই আমি। বাবার যে কী সব লোক হাসানো কাণ্ড-কারখানা। সফিক কিন্তু সহজভাবেই বলে, পাকা কথা দিয়ে ফেলেছেন চাচা ?

হ্যাঁ, তা বলতে গেলে দিয়েই ফেলেছি। তোমার বাবা বেঁচে নাই। আমাকেই তো দেখতে হবে সব। ঠিক কি না তুমিই বলো ?

তা ঠিক।

বাবা মহাউৎসাহী হয়ে ওঠেন। হাসি হাসি মুখ। তোমাকে ওদের খুব পছন্দ। সিরাজের বৌ এখানে এসে দেখে গেছে তোমাকে। বড় ভালো মেয়ে, বড় ভালো। সফিক চুপ করে থাকে। বাবা উৎসাহে এবং উত্তেজনায় ছটফট করতে থাকেন।

তোমাদের বিয়ের পর আমি কিন্তু তোমাদের বাসাতেই থাকব। রেবাকেও বললাম এই কথা।

সফিক আঁতকে উঠে বলে, তাকেও বলেছেন এই কথা ?

বলব না কেন ? সংসারের মাথা তো মেয়েরাই হয়। হয় না ?

তা হয়।

আমার ধারণা ছিল সফিক রেগেমেগে একটা কাণ্ড করবে। বাবাকে নিয়ে আমি মহালজ্জায় পড়ব। সে রকম কিছু হলো না। সে যেন লজ্জায় পড়েই উঠে গেল সামনে থেকে।

আমি পরের সপ্তাহেই বাবাকে ট্রেনে তুলে দিয়ে আসলাম। ঢাকায় রেখে চিকিৎসাও কিছু হচ্ছে না। শুধু শুধু টাকা নষ্ট। মা একটির পর একটি উদ্বিগ্ন চিঠি পাঠাচ্ছেন। ট্রেন ছাড়বার আগে আগে দেখি সিরাজ সাহেব, আজীজ সাহেব আর আমাদের জ্যোতিষার্ণব এসে হাজির। তারা বিদায় জানাতে এসেছেন। আজীজ সাহেবের হাতে আবার প্রকাণ্ড একটা খাবারের ঠোঙা। ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাবা ছেলেমানুষের মতো ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। কী যে অস্বস্তিকর অবস্থা!

মা'র নামে একশ' টাকা মনি অর্ডার করে পাঠিয়ে দিলাম। আমার আর্থিক টানাটানি কিছুটা দূর হয়েছে। কলেজে বেতন মাফ হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যাবেলা একটা ভালো টিউশনি যোগাড় হয়েছে। ক্লাস নাইনের একটি মেয়েকে সপ্তাহে চারদিন পড়াই। মেয়েটি খুবই শান্ত স্বভাবের। বড়ই লাজুক। সারাক্ষণ মুখ নিচু করে পড়ে। যদি কিছু জিজ্ঞেস করি বইয়ের দিকে তাকিয়ে জবাব দেয়। মুখ তুলে তাকায় না। পড়ানো শেষ করে যখন যাবার জন্যে উঠে দাঁড়াই তখন লাজুক মুখে বলে, স্যার একটু বসেন।

মেয়েটি দ্রুত চলে যায় ভেতরে। ফিরে আসে বরফ দেয়া এক গ্লাস পানি এবং ঝকঝকে একটি কাচের বাটিতে কিছু খাবার নিয়ে। বিকালে আমার কিছুই খাওয়া হয় না। ক্ষিদেয় নাড়ি মোচড় দিতে থাকে। লোভীর মতো খাবারটা খাই। মেয়েটা নরম গলায় বলে, স্যার আরো খানিকটা আনি ? আমার লজ্জা লাগে তবু অপেক্ষা করি খাবারের জন্যে। মাসের এক তারিখে মেয়েটি অতি সঙ্কোচে টাকা দেয় আমার হাতে। যেন স্যারকে টাকা দেয়াটা একটা লজ্জার ব্যাপার। এত ভালো লাগে আমার। মাঝে মাঝে ছোটখাটো দু'একটা উপহার কিনে আনতে ইচ্ছে হয়। সাহস হয় না, হয়তো মেয়েটির মা কিছু মনে করবেন। মেয়ের মা কখনো আমার সামনে আসেন না। পর্দার আড়াল থেকে মাঝে মাঝে কথা বলেন, শেলী অঙ্কে খুব কাঁচা। দেখবেন ভালো করে।

জি দেখব।

বাড়ির কাজ ঠিকমতো করে না। ধমক দেবেন। আপনাকে ভালো মানুষ পেয়ে শুধু ফাঁকি দিচ্ছে বোধহয়।

মেয়েটির বাবার সঙ্গে দেখা প্রায় হয় না বললেই হয়। তিনি সারাক্ষণ ব্যস্ত। যখন হঠাৎ এক আধদিন দেখা হয় তখন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, চিনতে পারলাম না তো। কে আপনি ?

আমি সসঙ্কোচে বলি, আমি শেলীর মাস্টার।

তাই তো, তাই তো! আমি গত সপ্তাহেই তো দেখলাম। একটুও মনে নাই। লজ্জার ব্যাপার।

ভদ্রলোক দারুণ ব্যস্ত হয়ে ওঠেন, মাস্টার সাহেবকে চা দেয়া হয়েছে ? আফজাল আফজাল।

চা খেয়েছি আমি।

তাতে কী, আরেকবার খাবেন। আপনি নিজেও তো ছাত্র ?

জি।

শেলী বলেছে আমাকে। একটিই টিউশনি আপনার ?

আমার দারুণ লজ্জা লাগে। কানটান লাল করে বলি, বিকালেও একটা টিউশনি আছে।

আমি নিজেও খুব কষ্ট করে পড়েছি। তিন-চারটা টিউশনি করতাম। একটুও ভালো লাগত না। সারাক্ষণ ভাবতাম কখন তারা চা-টা খেতে দেবে। আপনাকে চা-টা ঠিকমতো দেয় তো ?

হা হা করে হাসতে লাগলেন ভদ্রলোক। বেশ মানুষ। হাসি থামতেই গম্ভীর হয়ে বললেন, এক বাড়িতে পড়াতাম একটা ছেলেকে। মহা মূর্খ। তিনবার ফেল করেছে ম্যাট্রিক— দেখেন অবস্থা। একেকবার ফেল করত আর ছেলের বাবা এসে আমাকে ধমকধামক— কেন ফেল করল, কেন ফেল করল।

আমার মধ্যে একধরনের হীনম্মন্যতা বোধ আছে। সব সময় নিজেকে ছোট মনে হয়। কলেজে সসঙ্কোচে থাকি। একেকদিন সফিকের সঙ্গে তার কাটা কাপড়ের স্তূপের কাছে যেতে হয়। টাকা-পয়সা গুনে গুনে রাখতে আমার কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করে। সব সময় মনে হয় এই বুঝি ক্লাসের কোনো ছেলে বলে বসবে, কে রঞ্জু না ? কিন্তু এই বাড়িতে এসে সেই ভাবটা আমার থাকে না। শেলী যেদিন জিজ্ঞেস করল, স্যার আপনি ফুটপাতে কাপড় বিক্রি করেন ? তখন কেন জানি আমার লজ্জা লাগল না। আমি খুব সহজভাবেই বললাম, হ্যাঁ। আমার বন্ধুর সঙ্গে মাঝে মাঝে যাই। তুমি জানলে কী করে ?

আমি হঠাৎ দেখলাম।

তোমার খারাপ লাগছিল নাকি ?

না তো! মজা লেগেছে।

মেয়েটিকে দেখলেই পারুলের কথা মনে হয়। কোথায় যেন পারুলের সঙ্গে এর মিল আছে। স্পষ্ট কোনো মিল নয়, একধরনের সূক্ষ্ম অস্পষ্ট মিল।

অনেকদিন পারুলের কোনো খোঁজখবর জানি না। একবার শুনেছিলাম তারা নাকি নেত্রকোনা থেকে বরিশাল চলে গেছে। নেত্রকোনায় শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বনিবনা হয়নি। বরিশালের ঠিকানা জানা না থাকায় চিঠিও দিতে পারি না। অনেকদিন পারুলকে দেখি না। শুধু পারুল কেন মা'র সঙ্গে দেখা নাই অনেকদিন। যেতে আসতে অনেকগুলো টাকা খরচ হয়। প্রাণে ধরে এতগুলো টাকা খরচ করতে পারি না।

পান্থনিবাসে একঘেয়ে জীবন কাটাই। সফিক সারাদিন ব্যস্ত থাকে। তার দেখা পাওয়া যায় না। অনেক রাতে ঘরে ফিরেই ঘুমুতে শুরু করে। সফিকের সেই মাস্টারিটা আর নাই। কাটা কাপড়ের ব্যবসা আবার শুরু করেছে। মনে হয় খুব একটা সুবিধা করতে পারছে না। তার স্বাস্থ্যও ভেঙে গেছে। ঘুমের মধ্যেই ছটফট করে। কে জানে বড় ধরনের কোনো অসুখ নিশ্চয়ই বাঁধিয়েছে। রাতেরবেলা হঠাৎ জেগে উঠে বলে, শীত লাগছে রঞ্জু, জানালাটা বন্ধ করো তো। ভাদ্র মাসের পচা গরমে তার শীত লাগে কেন কে জানে?

মাঝে মাঝে হঠাৎ সফিককে খুব খুশি খুশি লাগে। ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলে, এইবার বিয়ে করে ফেলব। দুজন থাকলে যুদ্ধে অনেক এডভানটেজ পাওয়া যায়। অভাবের সঙ্গে কি আর একা একা ফাইট চলে?

রেবার ছবিটি বের করা হয় তখন। সফিক লাজুক স্বরে বলে, বেশ মেয়েটি কী বলিস? ভালো মানুষের মতো দেখতে। কিন্তু রঞ্জু এই মেয়ের অনেক বুদ্ধি। দেখ চোখের দিকে তাকিয়ে।

সফিক রেবার ছবিটি যত্ন করে একটা খামে ভরে রাখে। সেই খামটি তার টিনের ট্রাঙ্কে তালাবদ্ধ থাকে। সফিকের লজ্জাটজ্জা একটু কম। কিন্তু রেবার প্রসঙ্গ উঠলেই সে-ই কেমন যেন লজ্জা পায়। সে প্রসঙ্গ ওঠে কম। আমি নিজে থেকে কখনো তুলি না। নিশানাথ বাবু অনেকবার বলেন, সিরাজ সাহেবের বোনের ব্যাপারটা নিয়ে কিছু করা দরকার। ভালো মেয়ে, দেবীবংশে জন্ম। এইসব মেয়ে হাত ছাড়া করা ঠিক না। বলতে বলতে আড়চোখে তাকান সফিকের দিকে। সফিক নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বলে, বিয়ে নিশ্চয়ই হয়ে গেছে এতদিনে।

জিজ্ঞেস করব সিরাজ সাহেবকে?

না, না— থাক।

নিশানাথ বাবু গম্ভীর হয়ে বলেন, এই কথাটা জিজ্ঞেস করতে আর অসুবিধা কী? সফিক চুপ করে থাকে।

নিশানাথ বাবু বলেন, বড়ই বোকামি করছো সফিক। তোমার হচ্ছে স্ত্রী-ভাগ্যে উন্নতি। কথা তো শুনবে না কিছু।

নিশানাথ জ্যোতিষার্ণবের দিনকাল বড়ই খারাপ। লোকজন হাত দেখাতে আসে কালেভদ্রে। পান্থনিবাসের টাকা আবার বাকি পড়ে। রশীদ মিয়া রোজ সকালে টাকার জন্যে তাগাদা দিতে আসে। সরু চোখে তাকিয়ে থেকে হিসহিস করে কথা বলে, ঘর কবে ছাড়বেন বলেন দেখি? আবার তিন মাসের বাকি।

জ্যোতিষার্ণব মুখ নিচু করে থাকেন। কোনো কোনো দিন রশীদ মিয়ার গালাগালি চরমে ওঠে, আর এক মাস দেখব তারপর বিস্‌মিল্লাহ ইস্ক্রু টাইট দিব বুঝছেন। সোজা আঙুলে না হলে আঙুল বেঁকা করা লাগে। জ্যোতিষার্ণব কিছুই

বলেন না। নবী সাহেব মৃদু গলায় বলেন, এইসব কী বলেন রশীদ মিয়া! মানুষের অভাব হয় না ? এইসব কথা বলা কি ঠিক ?

ঠিক-বেঠিক জানি না। আমার কথা পরিষ্কার। আমি দানসাগর খুলেছি নাকি ? না এটা সাধুজির বাপের হোটেল ?

করিম সাহেবের সঙ্গে জ্যোতিষার্ণবের মোটেই মিল নেই। জ্যোতিষার্ণবের কোনো একটা ঝামেলা হলে করিম সাহেবের আনন্দে দাঁত বের হয়ে যায়। সেই করিম সাহেবও একদিন রেগে গেলেন, এইটা কী কাণ্ড রোজ রোজ, ভদ্রলোকের অপমান।

রশীদ মিয়া চোখ লাল করে বলল, ভদ্রলোকটা কে ? আমি তো কোনো ভদ্রলোক দেখি না।

চুপ শালা। তোমাকে আজ আমি ভদ্রলোক গিলায়ে খাওয়াব।

রশীদ মিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। শুকনা গলায় বলল, আপনে এইসব কী বলছেন করিম সাহেব ?

চুপ, একদম চুপ। শালা তোমার পাছায় লাথি মেরে পাইখানার মধ্যে ফেলব। ভদ্রলোক চিনবা তখন। হইচই শুনে নিচ থেকে কাদের মিয়া ছুটে এলো। নবী সাহেব বের হয়ে আসলেন। জ্যোতিষার্ণব বিব্রত ভঙ্গিতে বললেন, থামেন করিম সাহেব। কী সব বলছেন!

আপনে থামেন। আমি থামার লোক না। শালাকে খুন করে ফাঁসি যাব আমি।

করিম সাহেব লোকটিকে আমি কোনো দিনই পছন্দ করি নাই। করিম সাহেব এমন লোক, যাকে কোনো কারণেই পছন্দ করা যায় না। পান্থনিবাসের কেউ তার সঙ্গে হাসিমুখে কথা বলে না। কিন্তু সেই রাতে সিরাজ সাহেব তাঁকে চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। রাতের খাওয়া-দাওয়ার পর আজীজ সাহেব তাঁকে তাস খেলার জন্যে ডাকতে আসলেন। নবী সাহেবের মেয়ের বাড়ি থেকে ডিমের হালুয়া এসেছিল। নবী সাহেব সেই হালুয়ার বাটি পাঠিয়ে দিলেন করিম সাহেবের ঘরে। সবাইকে ভাগ করে দেয়ার দায়িত্ব করিম সাহেবের।

জ্যোতিষার্ণব ঘর ছেড়ে দিয়েছেন।

রাত আটটায় ফিরে এসে দেখি নিশানাথ বাবুর ঘর খালি। চৌকিটা বাইরে টেনে এনে রাখা হয়েছে। রশীদ মিয়া চৌকির উপর গম্ভীর হয়ে বসে সিগারেট টানছে। কাদের বালতি বালতি পানি এনে ঘরের মেঝেতে ঢালছে এবং ঝাঁটা দিয়ে সশব্দে ঝাঁট দিচ্ছে। ছুটির দিন বলেই মেসে লোকজন কেউ নেই। নবী সাহেবও মেয়ের বাড়িতে গিয়েছেন। নয় নম্বর ঘরে যে ছেলেটি থাকে শুধু তার ঘরে বাতি জ্বলছে। আমি অবাক হয়ে বললাম, কী ব্যাপার রশীদ সাহেব ?

কিসের কী ব্যাপার ?

সাধুজি কোথায় ?

চলে গেছে।

কোথায় চলে গেছে ?

আমি কি জানি কোথায় গেছে ? আমাকে জিজ্ঞেস করেন কেন ?

কখন গেছেন ?

দুপুরে।

হঠাৎ চলে গেলেন যে ?

কী মুসিবত, আমি তার কী জানি! যেতে চাইলে আমি ধরে রাখব নাকি ? শ্বশুরবাড়ি এইটা ?

আমি বেশ অবাক হলাম। নিশানাথ বাবু কাউকে কিছু না বলে হঠাৎ করে চলে যাবেন এটা ভাবা যায় না। তাছাড়া তাঁর যাওয়ার কোনো জায়গাও সম্ভবত নাই। কে জানে হয়তো রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। কিংবা হয়তো চায়ের দোকানে বসে আছেন একা একা। আমি কাপড় না ছেড়েই চায়ের দোকানে চলে গেলাম। না সেখানে সাধুজি যাননি। রাস্তার মোড়ে যে ছেলেটি পান-সিগারেট বিক্রি করে সে বলল— সাধুজি স্যুটকেস হাতে নিয়ে উত্তর দিকে গেছেন। তার দোকান থেকে দু'প্যাকেট স্টার সিগারেট কিনেছেন।

মেসে ফিরে যেতেই নয় নম্বরের ছেলেটির সঙ্গে দেখা হলো। এই ছেলেটি এক পত্রিকার অফিসে কাজ করে। তার সব সময় নাইট ডিউটি। সারাদিন দরজা বন্ধ করে ঘুমায়, কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলে না। মেসে সে খায় না। ছুটিছাঁটার দিন তার কেরোসিন চুলায় নিজেই দেখি রান্না করে। আমাকে দেখেই ছেলেটি বলল, সফিক সাহেক কখন ফিরবেন ?

জানি না কখন।

সফিক সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

কী ব্যাপার ?

ছেলেটি আড়চোখে রশীদ মিয়ার দিকে তাকিয়ে বলল, আসেন আমার ঘরে বসি। আপনি তো আসেন নাই কখনো। আমি নিজেই অবশ্যি কাউকে বলি না। আমার একা একা থাকতে ভালো লাগে। সিঙ্গেল রুম নিয়েছি এই জন্যে।

তার ঘর নবী সাহেবের ঘরের মতো গোছানো। দেখেই মনে হয় নারীর স্পর্শ আছে। দেয়ালে আবার নীলরঙা একটি তৈলচিত্র। জ্যোৎস্না রাত্রির ছবি। অসম্ভব সুন্দর এই ছবিটি ঘরের চেহারা পাল্টে ফেলেছে। তাকালেই মন বিষণ্ন হয়।

আমার ছোট ভাইয়ের আঁকা। আর্ট কলেজে পড়ে ফোর্থ ইয়ার। আপনি কি চা খাবেন ? চায়ের ব্যবস্থা আছে।

না চা খাব না আমি, ভাত খাই নাই এখনো। আপনি কী জন্যে ডাকছিলেন ?

ছেলেটি খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সাধুজি আজ দুপুরে আমার কাছে একটি ঘড়ি রেখে গেছেন সফিক সাহেবকে দেয়ার জন্যে। খুব দামি ঘড়ি।

আমি চুপ করে রইলাম। ছেলেটি বলল, তিনি যাওয়ার সময় কাঁদছিলেন। আমার এমন খারাপ লাগল বুঝলেন! বিকালে এক জায়গায় যাওয়ার কথা ছিল, যাই নাই, দরজা বন্ধ করে বসে ছিলাম।

আমি বললাম, আপনার নাম আমি জানি না। কী নাম ভাই ?

সুলতান। সুলতান্ উদ্দিন। সাধুজি ছাড়া কেউ আমার নাম জানে না। কারো কাছে যাই না তো। সাধুজির কাছে একবার গিয়েছিলাম। মনটা খুব খারাপ সেই সময়। হঠাৎ গেলাম। তিনি অনেক কথা বললেন, এখনো মনে আছে।

কী বললেন ?

এই সান্ত্বনার কথা আর কী! অন্যরকম করে বললেন। সান্ত্বনার কথা বলা তো খুব কঠিন। সবাই বলতে পারে না। খুব হৃদয়বান মানুষ লাগে।

আমি অনেকক্ষণ বসে রইলাম তার ঘরে। কথাবার্তা না, চুপচাপ বসে থাকা। ছেলেটি একেবারেই কথাবার্তা বলে না, যতবার বললাম উঠি ততবারই বলে, বসেন না, আরেকটু বসেন। সফিক সাহেব আসলে যাবেন।

রাত এগারোটা পর্যন্ত সফিকের জন্যে অপেক্ষা করে খেতে গেলাম। এত রাত পর্যন্ত কাদের থাকে না। টেবিলে তরকারি ঢেকে রেখে ঘুমাতে যায়। কিন্তু আজ দেখি জেগে আছে। ভাত-তরকারি বাড়তে বাড়তে ফিসফিস করে বলল, হুনছেন স্যার ? করিম সাব মাল খাইছে আইজ।

কী বললি ?

মাথা ফট্টি নাইন। বমি কইরা ঘর ভাসাইয়া দিছে। আমারে সাফ করতে কয়। আমি কইছি মাল খাওয়া বমি আমি সাফ করি না। ভদ্রলোকের ছেলে আমি, কী কন স্যার অন্যায় কইলাম ?

উপরে উঠেই করিম সাহেবের সঙ্গে দেখা। বারান্দায় রাখা চৌকির উপর লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। আমাকে দেখেই মাথা তুলে বললেন, সাধুজি চলে গেছে শুনেছেন ? শালা রশীদ মিয়ার পেটে আমি একটা তিন নম্বরি যদি না ঢুকাই তাহলে আমি বেজন্মা কুত্তা। শালার মাকে আমি...।

করিম সাহেব অনর্গল কুৎসিত কথা বলতে লাগলেন। তারপর একসময় হড়হড় করে বমি করে ফেললেন।

আপনার কি শরীর খারাপ করিম সাহেব ?

না, শরীর ঠিকই আছে। শালার সস্তার তিন অবস্থা। সস্তা জিনিস খেয়ে এখন মরণ দশা। ছয় টাকা করে বোতল, বুঝলেন ? বলতে বলতে আবার বমি।

সফিক এলো বারোটার দিকে। নিশানাথ বাবু চলে গেছেন এই খবরে তার কোনো ভাবান্তর হলো না। ভেলভেটের বাক্সে মোড়া ঘড়ি ফেলে রাখল টেবিলের এক কোনায়। তার ভাবভঙ্গি এরকম যেন নিশানাথ বাবুর ঘর ছেড়ে যাওয়া তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার না। রোজই এরকম হয়। রাতে ঘুমুতে যাবার সময় বলল, চায়ের দোকান স্টার্ট দিয়ে দিব এইবার। খোঁজখবর শুরু করেছি। দু'হাজার টাকা সেলামি দিলে শ্যামলীতে একটা ঘর পাওয়া যায়। ভালো ঘর। আভাকে বলব টাকাটা ধার দিতে।

দেবে সে ?

দেবে নিশ্চয়ই। আর না দিলে কী আছে, ছোট করে শুরু করব। নবী সাহেবকে বলব কিছু দিতে।

নবী সাহেব অবশ্যি দেবেন।

সবাই দেবে। দেখিস না কী করি।

আমি বললাম, শুধু আমাদের ম্যানেজারই নেই।

সফিক কোনো উত্তর দিল না। বাতি নিভিয়ে মশারি ফেলে শুয়ে পড়ল। বাইরে করিম সাহেব মসমস করে হাঁটতে লাগলেন। বমিটমি করলে শুনেছি মাতালদের নেশা কেটে যায়। কিন্তু রাত যত গভীর হচ্ছে করিম সাহেবের নেশাও মনে হয় ততই গাঢ় হচ্ছে।

তিনি উঁচু গলায় বলছেন, ভয় পাওয়ার লোক না আমি। কাউকে ভয় পাই না। লাথ দিলে সব ঠিকঠাক। এমন লাথ ঝাড়ব পাছায় বাপের নাম ভুলিয়ে দেব।

একসময় সফিক বিরক্ত হয়ে বলল, ঘুমাতে যান করিম সাহেব।

কেন ? তোমার হুকুম নাকি ? আমি কি তোমার হুকুমের গোলাম ?

চুপ করেন করিম সাহেব।

তুই চুপ কর শালা।

সফিক আর কথা বাড়াল না। আমার অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এলো না। এপাশ-ওপাশ করতে লাগলাম। বুঝতে পারছি সফিকও জেগে আছে। সফিক একবার ডাকল, জেগে আছিস নাকি রঞ্জু ? আমি জবাব দিলাম না। বাইরে করিম সাহেবেরও আর কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। সফিক একসময় মশারির ভেতরেই একটা সিগারেট ধরিয়ে খকখক করে কাশতে লাগল। অন্ধকার ঘরে একটা লাল ফুলকি ওঠানামা করছে। দেখতে দেখতে ঘুম এসে গেল।

ঘুম ভাঙল শেষরাত্রে। ঘরের দরজা হাট করে খোলা। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। বৃষ্টির ছাটে বিছানা ভিজে একাকার। আমি ডাকলাম, সফিক এই সফিক।

কোনো উত্তর নাই। বাইরে বেরিয়ে দেখি, সে সিগারেট হাতে নিয়ে বারান্দায় বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজছে। আমাকে আসতে দেখে ক্লান্ত স্বরে বলল, ঘুম আসছে নারে।

বৃষ্টিতে ভিজছিস তো।

সফিক একটু সরে বলল, জ্যোতিষার্ণবের জন্যে খারাপ লাগছে। বেশ খারাপ লাগছে। সকাল হলেই খুঁজতে বের হব। ঢাকাতেই আছে নিশ্চয়ই।

সফিক খানিকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, অনু মারা গেছে। গত পরশু চিঠি পেয়েছি। একটা টেলিগ্রাম করার দরকার মনে করে নাই।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তুই তো আমাকে কিছু বলিস নাই সফিক।

এইসব বলতে ভালো লাগে না।

কীভাবে মারা গেল ?

সাপে কেটেছিল। তা-ই লেখা। ওঝাটঝা নাকি এসেছিল। আমি সফিকের হাত ধরলাম। আশ্চর্য— জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে অথচ সহজ-স্বাভাবিক মানুষের মতো বসে আছে।

তোর তো ভয়ানক জ্বর সফিক।

হ্যাঁ, শরীরটা খারাপ।

আয় শুয়ে থাকবি। মাথায় জলপট্টি দেব ?

নাহ্ এইসব কিছু লাগবে না। আমার ভালুক জ্বর; সকালবেলা থাকবে না দেখবি।

জ্যোতিষার্ণবকে খুঁজে পাওয়া গেল না।

সম্ভব-অসম্ভব সব জায়গায় খোঁজা হয়। ছিন্নমূল মানুষেরা যে সব জায়গায় রাতে ঘুমায়, সফিক গভীর রাতে সেইসব জায়গায় খুঁজতে যায়। কমলাপুর রেলস্টেশন, লঞ্চ টার্মিনাল, লাভ হয় না কিছু। ফুটপাতে যে সব পামিস্টরা হাতের ছবি আঁকা সাইনবোর্ড টানিয়ে বসে থাকে তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয়, লম্বা চুল, দাড়ির এক সাধু— হাত দেখেন, তাঁকে কেউ দেখেছেন ? নিশানাথ নাম।

কেউ কিছু বলতে পারে না। নবী সাহেবের কথামতো পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দেয়া হয়

> লম্বা চুল-দাড়ি, পরনে গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, প্রখ্যাত জ্যোতিষ
> নিশানাথ জ্যোতিষার্ণবের সন্ধান প্রার্থী।

বিজ্ঞাপন ছাপার তিনদিনের দিন হন্তদন্ত হয়ে হাজির হয় আভা। আপনাদের জ্যোতিষী কোথায় গেছে ?

সফিক বিরক্ত হয়ে বলে, কোথায় গেছে জানলে বিজ্ঞাপন দেই নাকি ?

আমি ভাবলাম আপনাদের কোনো পাবলিসিটির ব্যাপার বুঝি।

তাঁর পাবলিসিটি লাগে না। সে অনেক বড় দরের জ্যোতিষ।

আভা শান্ত স্বরে বলে, তিনি বড় জ্যোতিষী ছিলেন। আমার হাত দেখে জন্মবার বলে দিয়েছিলেন। আমি খুব অবাক হয়েছিলাম।

শুধু নিশানাথ নয় নবী সাহেবও পান্থনিবাস ছেড়ে চলে গেছেন। স্কুল থেকে মহাসমারোহে তাঁকে বিদায় দেয়া হয়েছে। আমরাও তাঁর বিদায় উপলক্ষে একটু বিশেষ খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছিলাম। খেতে পারলেন না। মুখে নাকি কিছুই রুচছে না। খাওয়া বন্ধ করে একবার ফিসফিস করে বললেন, আমি আর বেশিদিন বাঁচব না। পান্থনিবাসে শিকড় গজিয়ে গেছে। বলতে বলতে তাঁর চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

সিরাজ সাহেবের প্রমোশন হয়েছে। অফিসার্স গ্রেড পেয়েছেন। অফিস থেকে তাঁকে কোয়ার্টার দেয়া হয়েছে। সুন্দর কোয়ার্টার, তাঁর সঙ্গে একদিন গিয়ে দেখে আসলাম। দক্ষিণ দিকে চমৎকার বারান্দা। হু-হু করে হাওয়া বয়। সিরাজ সাহেবও পান্থনিবাস ছেড়ে চলে গেলেন। যাবার আগের দিন রাতে বিদায় নিতে এলেন আমাদের কাছ থেকে। কথা সরে না তাঁর মুখে। অনেকক্ষণ বসে রইলেন চুপচাপ। একসময় বললেন, সুখেই ছিলাম ভাই আপনাদের সাথে। আনন্দেই ছিলাম। নিশানাথ বাবুর খালি ঘরটা দেখলে চোখে পানি আসে। আমার স্ত্রীকে তিনি বড় স্নেহ করতেন।

সত্যি সত্যি চোখে পানি ছলছলিয়ে উঠল। সফিক শুয়েছিল। সফিকের মাথায় হাত রেখে বললেন, জ্বর কি আবার এসেছে?

আছে অল্প।

অবহেলা করবেন না ভাই। ভালো ডাক্তার দেখাবেন।

খানিকক্ষণ চুপ থেকে আমতা আমতা করে বললেন, আমি অতি দরিদ্র মানুষ তবু যদি কখনো কোনো প্রয়োজন হয়...

সফিক কথার মাঝখানে আচমকা জিজ্ঞেস করল, আপনার ছোট বোন রেবা, তার কি বিয়ে হয়েছে?

হ্যাঁ, গত বৈশাখ মাসে বিয়ে দিয়েছি। ঢাকাতেই থাকে। ভালো বিয়ে হয়েছে। ছেলেটা অতি ভালো। আমি ভাবি নাই এত ভালো বিয়ে দিতে পারব।

সফিক আর কিছু বলল না। সিরাজ সাহেব বললেন, আপনারা দুজন একদিন গিয়ে যদি দেখে আসেন সে খুব খুশি হবে। আপনাদেরকে চেনে খুব। সেইদিনও জিজ্ঞেস করল আপনার অসুখের কথা।

নতুন কোনো বোর্ডার এলো না পান্থনিবাসে। শুনেছি রশীদ মিয়া মেস ভেঙে বাড়ি বানিয়ে ভাড়া দেবেন। মেসে নাকি তেমন আয় হয় না। এর মধ্যে মা'র চিঠি পেলাম

> তোমার পাঠানো একশত টাকা পাইয়াছি। আমি শুনিয়া মর্মাহত হইলাম যে তুমি পড়াশুনা ছাড়িয়া কাপড় ফেরি করিয়া বেড়াও। তোমার দুই মামা অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াছেন। তোমার মনে রাখা উচিত তোমার নানা অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তুমি ছোটলোকের মতো ফেরিওয়ালা হইয়াছ এই দুঃখ আমি কোথায় রাখি। পারুলের মতো তুমিও যে বংশের মান ডুবাইবে তাহা ভাবি নাই। দোয়া জানিও। অতি অবশ্য একবার আসিবে। তোমার বাবার একটি পা অচল। হাঁটাচলা করিতে পারেন না।...

চিঠি পড়ে আমি দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থাকি। গলা ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হয়।

আজকাল বড় অস্থির লাগে।

সব যেন অগোছালো হয়ে গেছে। সুর কেটে গেছে। সফিকের সেই হাসিখুশি ভাব নেই। তার জ্বর কখনো থাকে কখনো থাকে না। মেডিক্যাল কলেজ থেকে এক্সরে করিয়ে এসেছে, যক্ষ্মাটক্ষ্মা কিছু নেই। তার ব্যবসা খুব মন্দা যাচ্ছে। কিন্তু কেমন করে যেন প্রেসের পুরনো চাকরিটা আবার যোগাড় করেছে। আজকাল সে কৃপণের মতো টাকা জমায়। তার খরচপাতি এম্নিতেই অবশ্যি কমে গেছে। বোনকে টাকা পাঠাতে হয় না। অদরকারে একটি পয়সাও খরচ করে না। মেডিক্যাল কলেজের ছোকড়া ডাক্তারটি বারবার বলেছিল, ভালো ভালো খাবার খাবেন। দুধটুধ নিয়মিত খাবেন। আপনার এখন হাই প্রোটিন ডায়েট দরকার। ডাক্তারের কথা সে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে।

হাই প্রোটিন ডায়েট খাব পয়সা কোথায় ? পাস বুকের পাই পয়সাও খরচ করবে না।

সে একটি সাইনবোর্ড লিখিয়ে এনেছে—

'নীলগঞ্জ হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্ট'

প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। খবরের কাগজে মুড়ে সেই সাইনবোর্ডটি রাখা হয়েছে চৌকির নিচে। মাঝে মাঝে রাত জেগে সে টাকা-পয়সার হিসাব মিলায়। হাসিমুখে বলে, দেরি নাই আর। শুরু করে দিতে হবে।

তার চোখ জ্বলজ্বল করে। গম্ভীর হয়ে বলে, ছোট থেকে শুরু হবে। প্রথমে থাকবে সাদামাটা চায়ের দোকান। তারপর বড় একটা হোটেল দেব। একটা হুলস্থুল কাণ্ড করব দেখবি।

সেই হুলস্থুল কাণ্ড করবার জন্য সে প্রায়ই না খেয়ে থাকে।

একদিন বলল, চায়ে চিনি দেবার দরকার কী ? চীনারা বিনা চিনিতে দিব্যি চা খাচ্ছে। না, চিনিটা আমি উঠিয়ে দেব, অনেকগুলো টাকা বাঁচে, বুঝলি ?

পান্থনিবাসের নামফলক রশীদ মিয়া সরিয়ে ফেলেছে। তিনতলায় নতুন নতুন ঘর উঠছে। জানালায় নতুন শিক বসানো হচ্ছে। চুনকাম হচ্ছে। একদিন দেখি 'রোকেয়া ভিলা' নামে একটা সাইনবোর্ড শোভা পাচ্ছে। আমাদের কাছে নোটিশ দিয়েছে, 'দুই মাসের ভেতর বাড়ি খালি করে দিতে হবে। অন্যথায় আইনের আশ্রয় নেয়া হবে' এই জাতীয় কথা লেখা।

করিম সাহেব এই নিয়ে খুব হৈচৈ করছেন, উঠিয়ে দেবে বললেই হলো ? হাইকোর্টে কেইস করে শালার পাতলা পায়খানা বের করে দেব না ? উঠিয়ে দেয়া খেলা কথা না। হুঁ হুঁ।

করিম সাহেব আজকাল প্রায় রাতেই মদটদ খেয়ে এসে বিশ্রী সব কাণ্ড-কারখানা করেন। কেউ কিছু বললেই আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করেন, নিজের পয়সায় খাই, কারোর বাপের পয়সায় না। কারোর সাহস থাকে বলুক দেখি মুখের সামনে। জুতিয়ে দাঁত খুলে ফেলব না ? ভদ্রলোক চেনা আছে আমার।

সত্য-মিথ্যা জানি না, শুনছি অফিসে কী একটা টাকা-পয়সার গণ্ডগোলের জন্য করিম সাহেবকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। তদন্ত-টদন্ত হচ্ছে। কথাটা সত্যি হতে পারে। কয়েকদিন ধরে দেখছি অফিসে যান না। গতকাল আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, কী ব্যাপার করিম সাহেব, অফিসে যান না দেখি ?

করিম সাহেব রেগে আগুন।

যাই না যাই সেটা আমার ব্যাপার। আপনে কোথাকার কে ? আপনার খাই ? না আপনার পরি ?

বি.এ. পরীক্ষার ফিস জমা দিয়ে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছি। নবী সাহেবের ঘরটিতে এখন একা একা থাকি। দিনরাত পড়তে চেষ্টা করি। নিরস পাঠ্যবইয়ের স্তূপ একেক সময় অসহ্য বোধ হয়। কোথায়ও হাঁপ ছাড়বার জন্য যেতে ইচ্ছে হয়। যাওয়ার জায়গা নেই কোনো। আমার ছাত্রীটির বাসায় যেতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বিনা দরকারে শুধু যাওয়া। শেলীর বাবা-মা কেউ কিছু মনে করেন কিনা তাই ভেবে যাওয়া হয় না।

মাকে দেখতে গিয়েছিলাম এর মধ্যে। মা আগের মতোই আছেন। এতদিন ধারণা ছিল বোধহয় খুব কষ্টে আছেন। কিন্তু দেখা গেল অবস্থা মোটেই সে রকম নয়। বাড়ির পেছনে সবজি বাগান করেছেন। হাঁস-মুরগি পালছেন। ধান-চাল রাখার জন্য নতুন একটি ঘর তোলা হয়েছে। এমন অবাক লাগল দেখে! বাবার প্যারালিসিসও তেমন কিছু নয়। দেয়াল ধরে বেশ দাঁড়াতে পারেন।

অঞ্জু দেখলাম অনেক বড় হয়েছে। তাকে অতি কড়া শাসনে রাখা হয়। অঞ্জুর কাছেই শুনলাম সে ঘুমিয়ে পড়লে মা তার বই-খাতা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখেন। যেন পারুলের মতো কিছু আবার না ঘটে। অঞ্জু অনেক চালাক-চতুর হয়েছে। অনেক কথা বলল সে। গল্প বলাও বেশ শিখেছে।

পারুল আপা ভালোই করেছে দাদা। কী যে দিন গেছে আমাদের! কতদিন শুধু একবেলা রান্না হয়েছে। মা'র মেজাজ তো জানোই। সব সময় আগুনের মতো তেতে থাকতেন। একদিন কী করেছেন শোন, বাবা দেরি করে ফিরেছেন। এগারোটার মতো বাজে প্রায়। মা দরজা খুললেন না কিছুতেই।

খুললেন না কেন ?

কে জানে কেন ? কে যাবে জিজ্ঞেস করতে ?

অঞ্জু এক ফাঁকে আমাকে জিজ্ঞেস করল, তুমি নাকি দাদা বাড়ি বাড়ি কাপড় ফেরি করে বেড়াও ? কত কাণ্ড হলো এই নিয়ে। মামারা রেগে আগুন। বাবা বেচারা সরল মানুষ। ছোট মামাকে বলেছেন, তুমি নিজেও তো মানুষদের বাড়ি গিয়ে রোগী দেখ। তাতে দোষ হয় না ?

অঞ্জু হাসতে লাগল খিলখিল করে। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, ছোট মামা তখন একেবারে হাউইয়ের মতো নাচতে লাগলেন। মা'র সঙ্গে তুমুল ঝগড়া হলো তখন। মায়ের সঙ্গে ঝগড়ায় কে পারবে বলো ? ছোট মামা হেরে ভূত।

মা'র সঙ্গে ঝগড়া কী নিয়ে ?

জমি নিয়ে। নানার সম্পত্তির ফরাইজ চাইলেন মা। তাতেই লেগে গেল।

ফরাইজ পেয়েছেন ?

পাবেন না মানে ? মাকে তুমি এখনো চেনো নাই দাদা।

অঞ্জুর কাছে শুনলাম মা আজকাল কারো সঙ্গে কথাবার্তা বিশেষ বলেন না। আমার সঙ্গেও বললেন না। অভাবে-অনটনে এরকম হয় নাকি মানুষ ? আবেগশূন্য কথাবার্তা। সেই চরম অভাব এখন তো আর নেই। এখন এরকম হবে কেন ? বাবার ধারণা মায়ের সঙ্গে জিন থাকে। আমাকে একবার একা পেয়ে ফিসফিস করে বললেন, সব জিনের কাণ্ডকারখানা।

কিসের কাণ্ডকারখানা ?

জিনের। তোর মাকে জিনে ধরেছে।

কী যে বলেন আপনি!

বাবার পাগলামি মনে হলো সেরে গেছে। সহজ-স্বাভাবিক কথাবার্তা। তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সবার কথা জিজ্ঞেস করলেন, সফিক কেমন আছে ? রেবাকে বিয়ে করেছে নাকি ? আহা, কেন করল না! নিশানাথ কই ? সন্ন্যাসী হয়ে গেছে ? আহারে বড় ভালো মানুষ ছিল। সন্ন্যাসী তো হবেই। ভালো মানুষ সংসারে থাকতে পারে ?

অঞ্জুকে জিজ্ঞেস করলাম, বাবার বেহালার শখ মিটে গেছে নাকিরে ? অঞ্জু লাফিয়ে উঠল, সবচে' দারুণ খবরটা তোমাকে দেয়া হয় নি দাদা। বাবা চমৎকার বেহালা বাজায়। যা চমৎকার! যা চমৎকার!

সে-কী!

হ্যাঁ দাদা, তুমি বিশ্বাস করবে না কী চমৎকার! মা পর্যন্ত হতভম্ভ হয়ে তাকিয়ে থাকেন।

বেহালা কিনেছেন নাকি বাবা ?

না, হারু-গায়েনকে খবর দিলেই সে বেহালা দিয়ে যায়। তুমি আজ বলো বাবাকে বাজাতে। সন্ধ্যার পর সবাই গোল হয়ে বসব। বেশ হবে দাদা। বলবে তো ?

বাবাকে বেহালা বাজানোর কথা বলতেই তিনি আঁতকে উঠলেন, পূর্ণিমা আজকে। পূর্ণিমার সময় বেহালা বাজালে পরী নামে, এটাও জানিস না, গাধা নাকি ? পরক্ষণেই গলার স্বর নামিয়ে বললেন, তুই তো বিশ্বাস করলি না যখন বললাম তোর মার সঙ্গে জিন আছে। জিন আছে বলেই তো যখন বাজাই তখন এমন করে তাকায় আমার দিকে— ভয়ে আমার বুক কাঁপে। এই দেখ হাতের লোম খাড়া হয়ে গেছে।

ঢাকায় ফিরে আসার আগের দিন মা আমাকে একশ' টাকার একটি নোট দিয়ে বললেন, তুমি যে টাকা পাঠিয়েছিলে সেই টাকা। সাথে নিয়ে যাও। ফেরিওয়ালা হবার দরকার নাই। যখন টাকার দরকার হবে লিখবে।

আমার চোখে পানি এসে গেল। মা এরকম হয়ে গেলেন কী করে ? দু'দিন ছিলাম। এর মধ্যে একবার মাত্র তিনি আগের মতো সহজ-স্বাভাবিকভাবে কথা বললেন। আগের মতো নরম স্বরের মিষ্টি কথা, তোর বাবার বেহালা শুনে যা। মানুষের মধ্যে যে কী গুণ আছে তা বোঝা বড় কষ্ট। এখন বড় আফসোস হয়। কে জানে তাঁর এই আফসোস কী জন্যে ?

বাবার কাছে যখন বিদায় নিতে গেলাম তিনি যেন কেমন কেমন ভঙ্গিতে তাকালেন। যেন আমাকে চিনতে পারছেন না। খানিকক্ষণ পর গম্ভীর হয়ে বললেন, চলে যাবেন যে চা টা খেয়েছেন ? চা না খেয়ে যাবেন না যেন। অঞ্জু খিলখিল করে হাসতে হাসতে বলল, আপনি আপনি করছো কেন বাবা ? চিনতে পারছো না ?

বাবা রাগী গলায় বললেন, হাসিস না শুধু শুধু, চিনব না কেন ? না চেনার কী আছে ?

বাবা ঘোর লাগা চোখে তাকালেন। আমার বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। সত্যি তাহলে আমাকে চিনতে পারছেন না! অঞ্জু বলল, তুমি মনে হয় ঘাবড়ে গেছ দাদা। মাঝে মাঝে বাবার এরকম হয়। কাউকে চিনতে পারেন না। আবার ঠিক হয়ে যায়।

ঢাকায় এসে দুটি চিঠি পেলাম। একটি পারুলের। পারুলের চিঠিতে একটা দারুণ মজার খবর আছে। তার যমজ মেয়ে হয়েছে। পারুলের সব কাণ্ড-কারখানাই অদ্ভুত। দ্বিতীয় চিঠিটা লিখেছে শেলী। তিনলাইনের চিঠি।

> পরম শ্রদ্ধেয় স্যার,
>
> আমার সালাম জানবেন। মা আপনাকে চিঠি লিখতে বললেন। আপনি তাঁর সঙ্গে দেখা করবেন। আপনি আর আসেন না কেন ?
>
> বিনীতা
> শেলী

এত বড় বাড়ি খাঁখাঁ করছে।

কেউ কোথাও নেই। গেটের পাশে দারোয়ান দাঁড়িয়ে থাকত, আজ সেও নেই। দরজার সামনে ভারী পর্দা দুলছে। পর্দা টেনে ভেতরে ঢুকতে সঙ্কোচ লাগল। কে জানে হয়তো শেলীর মা ভেতরে বসে আছেন। তিনি কখনো আসেন না আমার সামনে। হয়তো বিরক্ত হবেন। হয়তো লজ্জা পাবেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলাম এগারোটা বাজার ঘণ্টা দিচ্ছে। এদের বসবার ঘরে অদ্ভুত একটা দেয়াল ঘড়ি আছে। বাজনার মতো শব্দে ঘণ্টা বাজে।

কাকে চান ?

আমি চমকে দেখি চশমা-পরা একজন মহিলা পর্দা সরিয়ে উঁকি দিচ্ছেন। আমি ইতস্তত করতে লাগলাম। কে জানে ইনিই হয়তো শেলীর মা। থেমে থেমে বললাম, আমি শেলীর মাস্টার।

হ্যাঁ, আমি চিনতে পারছি। কী ব্যাপার ?

আমাকে আসতে বলেছিলেন।

কে আসতে বলেছিলেন ?

শেলীর মা আমার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন।

ভদ্রমহিলার ভ্রু কুঞ্চিত হলো। অবাক হয়ে তাকালেন।

আমি, আমি খবর দিয়েছিলাম ? কেন, আমি খবর দেব কেন ?

ঘাম বেরিয়ে গেল আমার। পিপাসা বোধ হলো।

শেলীর মা শান্ত স্বরে বললেন, ঘরে এসে বসুন। কেউ নেই আজকে। শেলী তার ফুপার বাসায় গেছে। ফিরতে রাত হবে। আচ্ছা, খবর দিয়েছে কে ?

আমি ঘামতে ঘামতে বললাম, তাহলে হয়তো ভুল হয়েছে আমার। আচ্ছা আমি তাহলে যাই।

না না, চা খেয়ে যাবেন। চা দিতে বলছি। খবর কে দিয়েছে আপনাকে ?

আমি শুকনো গলায় বললাম, শেলী চিঠি দিয়েছিল।

ও তাই। আছে চিঠিটা ? দেখি একটু।

শেলীর মা ভ্রু কুঁচকে সে চিঠি পড়লেন। বন্ধ করে খামে ভরলেন আবার খুলে

পড়লেন। আমার মনে হলো তাঁর ঠোঁটের কোনায় একটু যেন হাসির আভাস।

চা আসতে দেরি হলো না। চায়ের সঙ্গে দুটি সন্দেশ। ঝকঝকে রুপোর গ্লাসে বরফ মেশানো ঠান্ডা পানি। ভদ্রমহিলা খুব কৌতূহলী হয়ে আমার দিকে বারবার তাকাচ্ছেন। একসময় যেন হঠাৎ মনে পড়েছে এই ভঙ্গিতে বললেন, হ্যাঁ একবার অবশ্যি বলেছিলাম শেলীকে তোমাকে এখানে আসবার কথা লিখতে। তেমন কোনো কারণে নয়।

আমি কোনো কথা বলতে পারলাম না। ভদ্রমহিলা বললেন, বয়সে অনেক ছোট তুমি। তুমি করে বলছি বলে আবার রাগ করছ না তো?

জি-না।

তুমি আজ রাতে ন'টার দিকে একবার আসবে? শেলীর বাবা বাসায় থাকবেন তখন। আসতে পারবে?

যদি বলেন আসতে, আসব।

হ্যাঁ। আসবে তুমি। আমি বরঞ্চ গাড়ি পাঠাব।

গাড়ি পাঠাতে হবে না। আমি আসব।

আর শোনো, শেলীর চিঠিটা থাকুক আমার কাছে।

সমস্ত দিন কাটল একধরনের আতঙ্কের মধ্যে। এ কী কাণ্ড করল শেলী? কেন করল? বোধহয় কিছু না ভেবেই করেছে। সারা দুপুরে শুয়ে রইলাম। কিছুই ভালো লাগছে না। প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। এর মধ্যে করিম সাহেব এসে খ্যানখ্যান শুরু করেছেন। তাঁর বক্তব্য— সফিক কোন সাহসে তাকে চায়ের দোকানে যোগ দিতে বলল? চাকরি নাই বলেই রিকশাওয়ালাদের জন্যে চা বানাতে হবে? সফিক ভেবেছেটা কী? মান-সম্মান বলে একটা জিনিস আছে, ইত্যাদি। আমার বিরক্তির সীমা রইল না। করিম সাহেব বকবক করতেই লাগলেন, আমার দাদার বাবা ছিলেন জমিদার, বুঝলেন? তিনটা হাতি ছিল আমাদের। জুতা হাতে নিয়ে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ হাঁটতে পারত না। জুতা বগলে নিতে হতো। আমাদের বসতবাড়ির ইট বিক্রি করলেও লাখ দুই লাখ টাকা হয়, বুঝলেন?

সফিক আসল সন্ধ্যাবেলা। অতি ব্যস্ত সে। এসেই এক ধমক লাগাল, সন্ধ্যাবেলা শুয়ে আছিস। কাপড় পর। 'নীলগঞ্জ হোটেল এ্যান্ড রেস্টুরেন্ট' দেখিয়ে আনি।

আরেকদিন দেখব। আজ কাজ আছে এক জায়গায়। ন'টার সময় যেতে হবে।

ন'টা বাজতে দেরি আছে, ওঠ দেখি। করিম সাহেব আপনিও চলেন দেখি। সবাই মিলে রেস্টুরেন্টটা দাঁড় করিয়ে দেই।

করিম সাহেব মুখ লম্বা করে ঘর ছেড়ে চলে গেলেন।

সফিক হাসিমুখে বলল, ঘর ভাড়া নিয়ে নিয়েছি। সাইনবোর্ড আজ সকালে

টাঙিয়ে দিয়ে আসলাম। জিনিসপত্তর কেনাকাটা বাকি আছে। লালুকে সাথে নিয়ে সেইসব কিনব, এক্সপার্ট আদমি সে।

সফিকের উৎসাহের সীমা নেই। আমি শুনছি কি শুনছি না সেই দিকেও খেয়াল নেই। নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছে, ঘরের মধ্যে পার্টিশন দিয়ে থাকার জায়গা করেছি। দিব্বি পড়াশুনা করতে পারবি তুই। ইলেকট্রিসিটি আছে, অসুবিধা কিছু নাই। তুই আর করিম সাহেব তোরা দুইজন কাল-পরশুর মধ্যে চলে আয়।

করিম সাহেব ?

হ্যাঁ ও আর যাবে কোথায় ? পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কি আর নতুন করে চাকরি করা যায় ? দুই একদিন গাঁই-গুঁই করবে তারপর দেখবি ঠিকই লেগে পড়েছে, হা হা হা।

ঘরের সামনে গিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। নড়বড়ে একটা ঘর কোনোমতে দাঁড়িয়ে আছে।

এই তোর ঘর ?

সফিক বিরক্ত হয়ে বলল, তুই কী ভেবেছিলি ? একটা সাত মহল রাজপ্রাসাদ ?

কে আসবে তোর এখানে চা খেতে ?

আসবে না কেন সেইটা শুনি আগে ?

একটা ছেলে এসে ঘরের তালা খুলে দিল। সফিক হৃষ্ট চিত্তে বলল, এর নাম কালু। দারুণ কাজের ছেলে। কিরে ব্যাটা আছিস কেমন ?

বালা আছি স্যার।

আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলাম সব। সারি সারি বেঞ্চ পাতা। ফাঁকে ফাঁকে আবার টুল, কাঠের চেয়ার। মেঝেতে ইঁদুর কিংবা সাপের গর্ত। দরমার বেড়ায় এক চিলতে জায়গা আবার আলাদা করা। তার মধ্যে গাদাগাদি করে রাখা দুটি জরাজীর্ণ চৌকি।

সফিক বলল, কি পছন্দ হয়েছে ?

আমি ক্ষীণ স্বরে বললাম, ভালোই তো।

বুঝতে পারছি তোর পছন্দ হয়নি। দেখবি সব হবে। আমি না খেয়ে দিন কাটিয়েছি। রাস্তায় রাস্তায় সুচ পর্যন্ত বিক্রি করেছি আমি, কী ভেবেছিস, ছেড়ে দেব ? আয় চা খাই।

কোথায় চা খাবি ?

পাশেই চায়ের দোকান আছে একটা।

চায়ের দোকানের মালিক সফিককে দেখে গম্ভীর হয়ে গেল।

সফিক হাসিমুখে বলল, ভালো আছেন নাকি রহমান সাব ?

ভালো আর কেমন থাকুম কন। আমার দোকানের পিছনে দোকান দিচ্ছেন, ভালো থাকন যায় ?

এই তো ভালোরে ভাই, কম্পিটিশন হবে। যেটা ভালো সেটা টিকবে।

সফিক ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। হাসি থামিয়ে বলল, রহমান সাব, সব বি.এ. এম.এ. পাস ছেলেরা কাজ করবে আমার দোকানে। এই দেখেন একজন বি.এ. পাস।

রহমান সাহেব সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। সফিক গম্ভীর হয়ে বলল, আর আমাদের ম্যানেজার কে জানেন নাকি ? নিশানাথ জ্যোতিষার্ণব। জ্যোতিষ সাগর। বোঝেন কাণ্ড— ইয়া দাড়ি ইয়া গোঁফ।

রহমান সাহেব নিস্পৃহ সুরে বললেন, ভদ্রলোক আপনেরা সাবধানে থাকবেন। পাড়াটা গুণ্ডা-বদমাইশের পাড়া। আমি থাকতে পারি না আর আপনেরা নতুন মানুষ।

সফিক হেসেই উড়িয়ে দিল, গুণ্ডা-বদমাইশ কী করবে আমাদের ? আমাদের ম্যানেজার সাক্ষাৎ দুর্বাশা মুনি। কাঁচা গিলে ফেলবে।

কাঁচা গিললে তো ভালোই। আপনেরা চা খাইবেন ? এই চা দে দেখি।

রহমান সাহেব গম্ভীর হয়ে বিড়ি ধরালেন। সফিক ফিসফিস করে বলল, ব্যাটা তখন থেকেই ভয় দেখাচ্ছে শুধু। একবার মিনো গুণ্ডাকে নিয়ে আসব। মিনো গুণ্ডাকে দেখলে রহমান সাহেবের দিল ঠাণ্ডা হয়ে যাবে দেখিস।

মিনোটা কে ?

আছে আছে। আমার কাছেও জিনিসপত্র আছে। হা হা হা। মিনো গুণ্ডা আমার ছাত্র ছিল।

পান্থনিবাসে ফিরলাম রাত আটটার দিকে। বাড়ির সামনের জায়গাটা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ঘাপটি মেরে কে যেন বসে আছে। সফিক কড়া গলায় বলল, কে ওখানে কে ?

কোনো সাড়া-শব্দ নেই। আরেকটু এগিয়ে যেতেই বুকের মধ্যে কী ধরনের যেন অনুভূতি হলো। দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে চেঁচালাম, কে কে ?

আমি নিশানাথ।

আমরা অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না। জগতে কত অদ্ভুত ঘটনাই না ঘটে। সফিক প্রথম বলল, ভাবলেশহীন গলা, এইখানে কী মনে করে নিশানাথ বাবু ? কিছু ফেলে গিয়েছিলেন নাকি ?

নিশানাথ বাবু শান্ত গলায় বললেন, তুমি ভালো সফিক ?

আমি কেমন আছি তা দিয়ে আপনার কোন দরকার নিশানাথ বাবু ? আমি দৌড়ে গিয়ে নিশানাথ বাবুর হাত ধরে ফেললাম। গাঢ় স্বরে বললাম, আসেন ঘরে আসেন।

প্রায় দু'মাস পর দেখছি জ্যোতিষার্ণবকে। গেরুয়া পাঞ্জাবি ছাড়া সব কিছু আগের মতোই আছে। পাঞ্জাবির বদলে সাদা রঙের একটি শার্ট। বেশ খানিকটা রোগা লাগছে। চোখ দুটি যেন অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। নাকি আমার দেখার ভুল ?

সফিক এমন একটা ভাব করতে লাগল যেন জ্যোতিষার্ণবের ফিরে আসাটা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। সাধুজি যেন চা খেতে গিয়েছিল। চা খেয়ে ফিরে এসেছে। সে গুনগুন করে কী একটা গানের কলি ভাঁজল। তারপর গভীর মনোযোগের সঙ্গে হিসাবপত্রের খাতা বের করে কী যেন দেখতে লাগল। এমন সব ছেলেমানুষি কাণ্ড সফিকের। শেষ পর্যন্ত আমার অসহ্য বোধ হলো। চেঁচিয়ে বললাম, বন্ধ করো তো খাতাটা।

সফিক খাতা বন্ধ করে গম্ভীর স্বরে বলল, নিশানাথ জ্যোতিষার্ণব, আপনাকে আমাদের ম্যানেজার করা হয়েছে।

কিসের ম্যানেজার ?

চায়ের দোকান দিয়েছি আমরা।

জ্যোতিষার্ণবের ঠোঁটের কোনায় হাসি খেলে গেল। হালকা গলায় বললেন, সত্যি সত্যি শেষ পর্যন্ত রেস্টুরেন্ট দিয়েছ ?

হ্যাঁ, ঘর ভাড়া হয়ে গেছে।

ঘর ভাড়া হয়ে গেছে ?

হুঁ।

জ্যোতিষার্ণব হাসিমুখে তাকিয়ে রইলেন। অনেকক্ষণ আর কেউ কোনো কথা বলল না। সফিক মৃদুস্বরে বলল, নৈঃশব্দের পরী উড়ে গেছে তাই না নিশানাথ বাবু ? হঠাৎ সবাই চুপ করলে পরী উড়ে যায়, তাই না ?

জ্যোতিষার্ণব মৃদু স্বরে বললেন, তোমার অসুখটি সেরেছে সফিক ?

হ্যাঁ, সেরেছে।

জ্বর আসে না আর ?

আর কোনোদিন আসবে না।

আমি বললাম, আপনি কোথায় ছিলেন এতদিন ?

জায়গায় জায়গায় ঘুরে বেড়ালাম।

খেতেন কী ?

আশ্চর্যের কথা কী জানো ? খাওয়া জুটে গেছে। না খেয়ে থাকিনি কখনো। পান্থনিবাসে বরং আমার কষ্ট হয়েছে বেশি।

সফিক দৃঢ়স্বরে বলল, আর কষ্ট হবে না। আর কখনো না খেয়ে থাকতে হবে না। দেখবেন দিনকাল পাল্টে ফেলব।

নিশানাথ বাবু একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। যেন সফিকের কথাটি ঠিক নয়। সফিক ভুল বলছে। আমি বললাম, আমাদের কিছু না বলে চলে গেলেন কেন ?

খুব মায়ায় জড়িয়ে পড়েছিলাম। মায়া কাটানোর জন্যেই এটা করেছি।

সফিক কড়া গলায় বলল, মায়া কেটেছে ?

নিশানাথ বাবু হেসে বললেন, মায়া কাটছে সফিক।

তাহলে ফিরে আসলেন কেন ?

জ্যোতিষার্ণব তার জবাব না দিয়ে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন। যেন খুব একটা ছেলেমানুষি প্রশ্ন তাঁকে করা হয়েছে। কিন্তু ন'টা বেজে যাচ্ছে, আমি আর থাকতে পারি না। আমি উঠে দাঁড়ালাম, এক ঘণ্টার মধ্যে আমি আসব। একটা খুব জরুরি কাজ আছে, না গেলেই নয়।

জ্যোতিষার্ণব আমার দিকে তাকিয়ে রহস্যময় ভঙ্গিতে হাসতে লাগলেন।

আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন তাঁরা।

শেলীর বাবা বললেন, তোমার দেরি দেখে ভাবলাম হয়তো আসবে না। গাড়ি পাঠাব কিনা তাই ভাবছিলাম। শেলীল মা কোনার দিকে একটি সোফায় বসেছিলেন, তিনি গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, শেলী শেলী।

শেলী এসে দাঁড়াল পর্দার ওপাশে। হয়তো সে এখানে আসতে লজ্জা পাচ্ছে। সে প্রায় অস্পষ্ট স্বরে বলল, কী জন্যে ডাকছ মা ?

ভেতর আস। বাইরে দাঁড়িয়ে কেন ?

বলো না কী জন্য ডাকছ ?

তোমার স্যারকে চা দাও।

শেলীর বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, দুপুর রাতে চা কেন ? টেবিলে খাবার দিতে বলো। তুমি নিশ্চয়ই খেয়ে আসনি ? আর খেয়ে এসে থাকলেও বসো।

খাবার টেবিলে অনেক কথা বললেন ভদ্রলোক। কত কষ্ট করে পড়াশোনা করেছেন। মানুষের বাড়িতে আশ্রিত হিসেবে থাকতেন। সেইসব কথা বলছেন গর্ব এবং অহঙ্কারের সঙ্গে। একজন সফল মানুষের মুখে তার দুর্ভাগ্যের দিনের কথা শুনতে ভালোই লাগে। শেলীর মা একবার শুধু বললেন, এইসব কথা ছাড়া তোমার অন্য গল্প নাই ?

ভদ্রলোক হা হা করে হাসতে লাগলেন। যেন মজার একটি কথা বলা হয়েছে। শেলী একটি কথাও বলল না, একবার ফিরেও তাকাল না আমার দিকে। একটি গাঢ় নীল রঙের শাড়িতে তাকে জলপরীর মতো লাগছিল। শাড়িতে কখনো দেখিনি তাকে। এ যেন অন্য একটি মেয়ে। শেলির মা খেতে খেতেই জিজ্ঞেস করছিলেন, ক' ভাইবোন আমরা ? কী তাদের নাম ? কী করছে ? পান্থনিবাসে থেকে পড়াশোনা

করতে নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হয়। পড়াশুনা শেষ করে কী করব ?

খাওনা শেষ হতেই আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আমি কি এখন যাব ? ভদ্রলোক আবার হা হা করে হেসে উঠলেন। যেন এই কথাটিও অত্যন্ত মজার। বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বললেন, নিশ্চয় যাবে। তবে তুমি একটা কাজ করো, আমার এখানে অনেক খালি ঘর পড়ে আছে। তুমি আমার এখানে এসে থাকো।

শেলীর মা সঙ্গে সঙ্গে বললেন, আমিও তাই ভাবছিলাম। তুমি চলে আসো এখানে, পড়াশুনার তোমার খুব সুবিধা হবে। তা ছাড়া শেলী বেচারি খুব একলা হয়ে পড়েছে। তুমি থাকলে ওর একজন সঙ্গী হয়। বলতে বলতে তিনি মুখ টিপে হাসলেন। শেলীর দিকে ফিরে বললেন, ড্রাইভারকে গাড়ি বের করতে বলো তো মা। তোমার স্যারকে পৌঁছে দিয়ে আসুক। রাত হয়ে গেছে।

শেলী আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলো। কিছু একটা বলা উচিত তাকে। কিন্তু কোনো কথাই বলতে পারলাম না। গাড়িতে ওঠার সময় শেলী শান্ত স্বরে বলল, আপনাকে কিন্তু আসতেই হবে।

ঘরে ফিরে দেখি সফিক শুয়ে আছে। তার চোখ ঈষৎ রক্তাভ। বোধহয় আবার জ্বর আসছে। সফিক ক্লান্ত স্বরে বলল, নিশানাথ চলে গেছে। বিদায় নিতে এসেছিল আমাদের কাছে।

কোথায় গেছে ?

প্রথমে বারহাট্টা। সেখান থেকে যাবেন মেঘালয়ে। তাঁর কোনো জ্ঞাতি খুড়ো থাকেন তাঁর কাছে যাচ্ছে। ঐখানেই থাকবে।

আমার অবাক হওয়ার ক্ষমতাই নষ্ট হয়ে গেছে। অনেকক্ষণ কোনো কথাই বলতে পারলাম না। সফিক বলল, কী জন্যে থাকবে সে ? তিনপুরুষের কুলধর্ম ছাড়তে পারে কেউ ?

আর আসবে না ফিরে ?

না।

সফিক হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে উত্তেজিত স্বরে বলল, নিশানাথ না থাকুক তুই তো আছিস। দুজনে মিলে দেখ না কী কাণ্ড করি।

আমি চুপ করে রইলাম। সফিক শুয়ে পড়ল। গায়ে হাত দিয়ে দেখি বেশ জ্বর। সফিক আচ্ছন্নের মতো বলল, জ্যোতিষার্ণব কিন্তু সত্যি ভালো হাত দেখে। আজ আমি অবাক হয়েছি, খুব অবাক হয়েছি তাঁর ক্ষমতা দেখে।

আমি কৌতূহলী হয়ে বললাম, কী বলেছে জ্যোতিষার্ণব ?

সফিক সে-কথার জবাব দিল না। আমি অবাক হয়ে দেখি তার চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানি পড়ছে। অশ্রু গোপন করবার জন্যে সে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃদু স্বরে বলল, শুধু জ্যোতিষার্ণব কেন তুই নিজেও যদি আমাকে ছেড়ে চলে

যাস আমার তাতে কিছুই যাবে আসবে না। আমি ঠিক উঠে দাঁড়াব।

সেই রাত্রে একটি অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। যেন আদিগন্ত বিস্তৃত একটি সবুজ মাঠ। মাঠের ঠিক মাঝখানে সফিক দাঁড়িয়ে আছে একা একা। তার গায়ে 'মুকুট' নাটকের মধ্যম রাজকুমারের পোশাক। আকাশভরা জ্যোৎস্না। জ্যোৎস্নাভেজা সেই রাতে সবুজ মাঠের মাঝখান থেকে সফিক যেন হঠাৎ ভয় পেয়ে ছুটতে শুরু করল।

ঘুম ভেঙে গেল আমার। বাইরে এসে দেখি ফকফকা জ্যোৎস্না হয়েছে। বারান্দার মেঝেতে অপূর্ব সব নক্‌শা। পায়ে পায়ে এগিয়ে উঁকি দিলাম সফিকের ঘরে।

সফিক অন্ধকারে বসে চা খাচ্ছে একা একা। আমাকে দেখে সে হাসি মুখে ডাকল, চা খাবি রঞ্জু ? আয় না, জ্বরটা সেরে গেছে। আমার বেশ লাগছে এখন। অকারণেই আমার চোখে জল এলো।

এই বসন্তে

সে ছাড়া পেল বসন্তকালে।

কড়া রোদ চারদিকে। বাতাস উষ্ণ। গেটের বাইরে প্রকাণ্ড শিমুল গাছে লাল লাল ফুল। বসন্তকালের লক্ষণ এই একটিই। সে একটা সিগারেট ধরিয়ে উদাস চোখে শিমুল গাছের দিকে তাকিয়ে রইল। অ্যাসিস্টেন্ট জেলার সাহেব তাকে শম্ভুগঞ্জ পর্যন্ত রেলের একটি পাস এবং ত্রিশটি টাকা দিয়েছেন। এবং খুব ভদ্রভাবে বলেছেন, জহুর, ভালোমতো থাকবে।

ছাড়া পাবার দিন সবাই খুব ভালো ব্যবহার করে।

জহুর আলি ছ'বছর তিন মাস পর নীলগঞ্জের দিকে রওনা হলো। কড়া রোদ। বাতাস উষ্ণ ও আর্দ্র। বসন্তকাল।

দবির মিয়া নীলগঞ্জের বাজারে দশ মণ ডাল কিনতে গিয়েছিল। ডাল কেনার কথা ছিল পনের মণ। কিন্তু টাকার যোগাড় হয়নি। টাকাটা দেবার কথা তার শ্বশুরের। শেষ মুহূর্তে তিনি খবর পাঠিয়েছেন— এখন কিছুই দিতে পারবেন না, হাত টান। বৈশাখ মাসের দিকে চেষ্টা করবেন। বৈশাখ মাসে টাকা দিয়ে সে কী করবে! দবির মিয়া ডালের আড়তে ঘুরতে ঘুরতে তার শ্বশুরকে কুৎসিত একটা গাল দিল। এই লোকের ওপর ভরসা করাটা মস্ত বোকামি হয়েছে। শালা মহা হারামি।

দবির মিয়া মুখ কালো করে ডালের বাজারে হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। দুইদিনে বাজার চড়ে গেছে। সরসটা হয়েছে দু'শ পঁচিশ। এত দাম দিয়ে ডাল কিনে রাখলে কয় পয়সা আর থাকবে ? ডালের পাইকারও বেশি আসেনি। সেতাবগঞ্জের কোনো বেপারি নেই। সেখানে কত করে বিক্রি হচ্ছে কে জানে ?

সে বিষণ্ন মুখে এক চায়ের স্টলে ঢুকে পরপর দু'কাপ চা খেয়ে ফেলল। পঞ্চাশ পয়সা করে কাপ। কোনো মানে আছে ? কী আছে এর মধ্যে যে পঞ্চাশ পয়সা দাম হবে ? তার মেজাজ ক্রমেই উষ্ণ হতে লাগল। এই অবস্থায় সে খবর পেল, জহুর ছাড়া পেয়ে বাড়ি এসেছে। খবরটা প্রথমে সে বিশ্বাস করতে পারল না। জহুরের মেয়াদ হয়েছে ন'বছরের। এখনো ছ'বছরও হয়নি। জেল ভেঙে পালিয়েছে না কি ? দবির মিয়া তৃতীয় কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে সিগারেট ধরাল।

এই মুহূর্তে বাড়ি ফিরে যাওয়া দরকার, কিন্তু পরের হাটে দাম আরো চড়বে। এই বছরে ডালের ফলন কম হয়েছে। কিনতে হলে এখনই কিনে ফেলা উচিত। সেতাবগঞ্জের খবরটা তার আগে জানা দরকার।

দবির মিয়া শেষ পর্যন্ত দু'শ উনিশ টাকা দরে ন'মণ ডাল কিনল। আগামীকাল ডালের বেপারি বস্তাগুলো পৌঁছে দেবে।

বাড়ি ফিরতে তার অনেক রাত হলো। আজ সকাল সকাল ফেরা দরকার ছিল অথচ আজই দেরি হলো। জুম্মাঘর পার হতেই দবির মিয়া দেখল, সমস্ত অঞ্চলটা অন্ধকার। ঝড় নেই, বাদল নেই অথচ কারেন্ট চলে গেছে। এর মানে কী ? সেই যদি রোজ হারিকেনই জ্বালাতে হয় তাহলে টাকা-পয়সা খরচ করে লাইন আনার মানে কি ? এইসব ফাজলামি না ?

দবির মিয়ার বাড়ির সামনে বারান্দায় জহুর বসে ছিল। তার সামনের মোড়াতে যে বসে আছে সে খুব সম্ভব অঞ্জু— অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না। দবির মিয়া বলল, কে ? অঞ্জু উঠে ভেতরে চলে গেল। জহুর অস্পষ্টভাবে বলল, দুলাভাই, ভালো আছেন ?

এ্যাঁ, কে ?

আমি, আমি জহুর।

আরে জহুর তুমি, তুমি কোত্থেকে ?

দবির মিয়া এমন ভঙ্গি করল যেন জহুর আসার খবর সে আগে পায়নি।

এ্যাঁ, কী সর্বনাশ, আমি তো কিছুই জানি না। থাক থাক, সালাম করতে হবে না। টুনী, এই টুনী, ঘর অন্ধকার— বিষয় কী ? কারেন্ট নেই না কি ? এ্যাঁ।

দবির মিয়া অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চা-টা কিছু দিয়েছে ? টুনী, এই টুনী। এরা কোনো কাজের না। একটা বাতিটাতি তো দিতে পারে। হাত-মুখ ধুয়েছো জহুর ?

জি-না।

কোনো খোঁজখবর করে নাই। অপদার্থের গুষ্টি। যাও, গোসল করে ফেলো। অল্প পানি দিয়ে গোসল করবে। টিউবওয়েলের পানি ঠান্ডা, ফস করে সর্দি লেগে যাবে। হা-হা-হা।

দবির মিয়া হাসিটা মাঝপথে গিলে ফেলল। টিউবওয়েলের পানি ঠান্ডা, এর মধ্যে হাসির কিছু নেই। খামকা হাসছে কেন সে ?

জহুর বলল, আপনারা সবাই ভালো ছিলেন তো ?

আর ভালো থাকাথাকি! বলব সব। তুমি গোসল-টোসল সারো— আমি বালতি-গামছা আনি। আগে বরং চা খাও।

চা খেয়েছি আমি।

আরেক কাপ খাও। চায়ে না নাই।

দবির মিয়া আবার হাসি গিলে ফেলল। হয়েছেটা কী তার ? কথায় কথায় হেসে উঠছে কেন ? টুনী হারিকেন হাতে ঢুকল। দবির মিয়া ধমকে উঠল, অন্ধকারে বসিয়ে রেখেছিস মামাকে, বুদ্ধিসুদ্ধি কিছু আছে মাথায় ?

টুনী মৃদুস্বরে বলল, একটা মাত্র হারিকেন। ছোট মা আবার ফিট হয়েছেন।

কুপি জ্বাললেই হয়। অন্ধকারে বসে থাকবে না কি ?

জহুর বলল, কোনো অসুবিধা হয় নাই দুলাভাই।

বললেই হলো অসুবিধা হয় নাই ? এদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নাই। সব কয়টা গরু।

দবির মিয়া ঘরে ঢুকে গেল। অনুফা এই গরমের মধ্যেও লেপ গায়ে দিয়ে শুয়ে আছে। তার চুল ভেজা। অর্থাৎ মাথায় পানি ঢালা হয়েছে। যন্ত্রণা আর কাকে বলে! বারো মাসের মধ্যে ন'মাস বিছানায় পড়ে থাকলে সংসার চলে! দ্বিতীয়বার বিয়ে করাটা চরম বোকামি হয়েছে। অনুফা ক্ষীণ স্বরে বলল, বাজার এনেছ ?

হুঁ!

মাছ-টাছ আছে ?

আছে।

টুনীর কাছে দাও। তাড়াতাড়ি রান্না শুরু করুক।

দবির মিয়া বাজারের ব্যাগ টুনীর হাতে দিয়ে দিল।

আইড় মাছ আছে। কয়েক টুকরা ভাজি করিস টুনী।

অনুফা ক্ষীণ স্বরে বলল, আইড় মাছের ভাজি হয় না।

দবির মিয়া ফোঁস করে উঠল, হবে না আবার কী, হওয়ালেই হয়। যত ফালতু কথা।

বাবলু আর বাহাদুর নিঃশব্দে একটা স্কেল টানাটানি করছিল। দবির মিয়া দু'জনের কানে ধরে প্রচণ্ড শব্দে মাথা ঠুকে দিল। দু'জনের কেউ টুঁশব্দ করল না। অঞ্জু মশারি খাটাচ্ছিল, দবির মিয়া তার গালেও একটা চড় কষাল।

পড়াশোনা নাই ?

অন্ধকারে পড়ব কীভাবে ?

আবার মুখে-মুখে কথা ?

দবির মিয়া দ্বিতীয় একটি চড় কষাল। অনুফা মাথা উঁচু করে বলল, এত বড় মেয়ের গায়ে হাত তোলা ঠিক নয়।

তুই চুপ থাক।

তুই তোকারি করছো কেন ?

বললাম চুপ।

অঞ্জুর গালে আঙুলের দাগ বসে গেছে। সে এমনভাবে মশারি খাটাচ্ছে যেন কিছুই হয় নি। টুনী ভয়ে-ভয়ে বলল, মাছটা মনে হয় একটু নরম।

দবির মিয়ার মুখ তেতো হয়ে গেল। দেখেশুনে কেনা হয়নি। দেখেশুনে না কিনলে এই হয়। ঈমান বলে কোনো জিনিস মাছওয়ালার মধ্যে নেই। অনুফা ক্লান্ত গলায় বলল, কয়েকটা লেবুর পাতা দিস তরকারিতে।

মামা, আপনার গোসলের পানি দিয়েছি।

জহুর দেখল, এই মেয়েটি ঘুরেফিরে তার কাছে আসছে। কথা-টথা বলতে চেষ্টা করছে। অন্যরা সবাই দূরে-দূরে। এই মেয়েটির খুব কৌতূহল।

মামা, আমি কল টিপছি, আপনি পানি ঢালেন।

কল টিপতে হবে না। তুই যা।

অঞ্জু মামার কথায় কান দিল না।

তুই কোন ক্লাস পড়িস ?

ক্লাস নাইন, সায়েন্স গ্রুপ।

আর টুনী ?

বড়আপা পড়া ছেড়ে দিয়েছে। ম্যাট্রিক পাস করতে পারে নাই। তাই বাবা বলল— আর পড়তে হবে না।

ও।

বড়আপার বিয়ের চেষ্টা হচ্ছে।

ও।

আগামী সোমবার দেখতে আসবে।

তাই না কি ?

জি, বড়আপার ইচ্ছা নাই বিয়ের।

ইচ্ছা নাই কেন ?

কী জানি কেন। আমাকে কিছু বলে না। না বললে কি আর জানা যায় মামা ?

জহুর জবাব দিল না। টিউবওয়েলের পানি সত্যি সত্যি ভীষণ ঠান্ডা। শরীর কাঁপছে। অঞ্জু মৃদু স্বরে বলল, মামা, তুমি এখন কী করবে ?

কিছু ঠিক করি নাই।

তোমার কথা কিন্তু মামা আমার মনে ছিল। তুমি একটা গান গাইতে— 'মাটিমে পৌরণ মাটিমে শ্রাবণ'।

জহুর সারা মুখে সাবান মাখতে মাখতে হঠাৎ শব্দ করে হেসে উঠল।

অঞ্জু মৃদুস্বরে বলল, তোমার মনে নাই, না ?

নাহ্। কিচ্ছু মনে নাই।

আমার কথাও মনে নাই ?

নাহ্।

নান্টুর চায়ের দোকানে রাজনৈতিক আলোচনা নিষিদ্ধ। দক্ষিণ দিকের দেয়ালে সে বড় করে নোটিশ ঝুলিয়েছে— কোনো রাজনীতির আলাপ করিবেন না। রাজনীতির আলোচনার জন্যে কেউ চায়ের দোকানে যায় না। সেখানে আজানের সময়টা বাদ

দিয়ে সারাক্ষণই গান বাজে। হিন্দি গান নয়— পল্লীগীতি। নান্টু পল্লীগীতির বড় ভক্ত। চায়ের স্টলটি মোটামুটি চালু। সন্ধ্যার আগে আগে এখানে পেঁয়াজু ভাজা হয়। পেঁয়াজু খাবার জন্যে অনেকে আসে। নীলগঞ্জ থানার সেকেন্ড অফিসার সেপাই পাঠিয়ে রোজ এক টাকার পেঁয়াজু কিনিয়ে নেন। নান্টু অন্যদের টাকায় দশটা দেয় কিন্তু থানাওয়ালাদের জন্যে বারোটা।

আজ নান্টুর দোকানে গান হচ্ছিল না। পেঁয়াজুও ভাজা হচ্ছিল না। ভাজাভাজির কাজ যে করে তার জলবসন্ত হয়েছে। নান্টুর মেজাজ এ জন্যেই ঠিক নেই। মেজাজ ঠিক না থাকলে গান-বাজনা জমে না। নান্টু গান বাজায় নিজের জন্যে, কাস্টমারের জন্যে নয়। তাছাড়া তার নিজেরও শরীর বেজুত লাগছে। তারও সম্ভবত জলবসন্ত হবে। অনেকেরই হচ্ছে। সে ঠিক করল, রাত আটটার ট্রেন চলে গেলেই দোকানের ঝাঁপ ফেলে দেবে। কিন্তু আটটার ট্রেন আসতে আজ অনেক দেরি করল। থানার ঘড়িতে ন'টার ঘণ্টা পড়ারও অনেক পরে ট্রেনের বাতি দেখা গেল।

নান্টু দোকানের ঝাঁপ ফেলে বাইরে এসে অবাক হয়ে দেখল জহুর আলিকে। মাথা নিচু করে হাঁটছে। জহুর আলি ছাড়া পেয়েছে না কি ? তার ধারণা ছিল যাবজ্জীবন হয়েছে। নান্টু একবার ভাবল ডাক দেয়। কিন্তু মনস্থির করতে করতে জহুর আলি জুম্মাঘরের আড়ালে পড়ে গেল। জহুর আলির হাতে একটা দুই ব্যাটারির টর্চ। সে মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলছে। চেহারা আগের মতোই আছে। একটু অবশ্য ভারী হয়েছে। হাঁটছে মাথা নিচু করে কুঁজো হয়ে। আগে বুক ফুলিয়ে হাঁটত।

নান্টু একটা বিড়ি ধরাল। ভালো লাগল না। মাথা ঝিমঝিম করে উঠছে। অর্থাৎ জ্বর আসছে। জ্বর আসার প্রথম লক্ষণই হচ্ছে, প্রিয় জিনিসগুলো বিস্বাদ লাগে। পান মুখে দিলে পানটাকে এখন ঘাসের মতো লাগবে। নান্টু বিড়ি ফেলে দিয়ে গণপতির দোকানে থেকে এক খিলি পান কিনল। গণপতি বলল, স্টল বন্ধ করে দিলেন ?

হুঁ।

রফিকের নাকি বসন্ত ?

জলবসন্ত।

ও, আমি শুনলাম আসল জিনিস।

নান্টু পানের পিক ফেলে বলল, জহুর আলি ছাড়া পেয়েছে।

গণপতি চোখ বড় বড় করে বলল, কার কাছে শুনলেন ?

দেখলাম নিজের চোখে।

নান্টু বাড়ির পথ ধরল। অলকা ডিসপেনসারির কাছে তার সাথে দেখা হলো সাইফুল ইসলামের। সাইফুল ইসলাম রাত দশটার দিকে তার স্টলে এক কাপ চা আর একটা নিমকি খায়। নান্টু বলল, দোকান বন্ধ আজকে।

এত সকালে ?

শরীরটা ভালো না, জ্বর।

ও।

নান্টু মুখ থেকে পানটা ফেলে দিল। বিস্বাদ। জ্বর তাহলে সত্যি-সত্যি আসছে! সাইফুল ইসলাম সিগারেট ধরাল। নান্টুর বমি-বমি লাগছে। ধোঁয়াটাও অসহ্য লাগছে। নান্টু একদলা থুথু ফেলে বলল, জহুর আলি ছাড়া পেয়েছে, জানেন না কি ?

জহুর আলি কে ?

নান্টু কিছু বলল না। এ নতুন লোক। দুবছর আগে এসেছে। এরা কিছুই জানে না। সাইফুল ইসলাম আবার জিজ্ঞেস করল, জহুর আলিটা কে ?

নান্টু জবাব দিল না। তার মাথা ঘুরছে। পানের মধ্যে জর্দা ছিল নিশ্চয়ই।

জহুর আলিটা কে ?

আপনে চিনবেন না। বাদ দেন।

বলেন না শুনি।

নান্টু বড় বিরক্ত হলো। সাইফুল ইসলামকে কথাটা বলাই ভুল হয়েছে। এই লোকটি পিছলা ধরনের। ঘ্যানঘ্যান করতে থাকবে। নান্টু চাপাস্বরে বলল, পরে শুনবেন। এখন বাড়িতে যান।

এত সকালে বাড়িতে গিয়ে করব কী ?

যা ইচ্ছা করেন। গান-বাজনা করেন।

গান-বাজনা কি অর্ডারি জিনিস ? বললেই হয় ? সিগারেট খাবেন ?

নাহ্।

খান-না রে ভাই। নেন একটা।

বললাম তো— না।

দেশের উন্নতি হচ্ছে না কথাটা ঠিক নয়।

নীলগঞ্জ জায়গাটাকে চেনা যাচ্ছে না। থানার উত্তর দিকের জংলা জায়গায় দশ-বারোটা বড় বড় বিল্ডিং উঠে গেছে। রাইস মিল, অয়েল মিল, সুরভি লজেন্স ফ্যাক্টরি, আইস ফ্যাক্টরি। জহুরের বিস্ময়ের সীমা রইল না। রেলস্টেশনে যাওয়ার রাস্তাটা পর্যন্ত পাকা হয়ে গেছে। বাজারের সীমানার পরই সাদা রঙের দোতলা একটা দালান— খায়রুন্নেসা খানম ডিগ্রি কলেজ। খায়রুন্নেসা খানমকে জহুর চিনতে পারল না। কাউকে সঙ্গে আনা দরকার ছিল। চিনিয়েটিনিয়ে দিত। কিন্তু একা-একা হাঁটতেই ভালো লাগছে।

প্রচুর রিকশা চারদিকে। ফাঁকা রাস্তাতেও এরা সারাক্ষণ টুনটুন করে ঘণ্টা বাজায়। এত রিকশা কেন ? রিকশা করে যাবার জায়গা কোথায় ? আগে ছিল ঘোড়া। ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে দূর দূর থেকে মাল আনত। ধনুকের মতো বেঁকে যেত পিঠ। কিন্তু ঘোড়াগুলো গাধার মতোই নিরীহ ছিল, কিছুই বলত না। জহুর

বড়বাজারে উঠে এলো। বড়বাজারে দবির মিয়া নতুন একটা ঘর রেখেছে। জহুরের সেখানে যাওয়ার কথা। দবির মিয়া তার জন্যে অপেক্ষা করছে, দু'জনে একসঙ্গে বাড়ি ফিরবে।

বড়বাজারের তেমন কোনো পরিবর্তন হয়নি। ছোট-ছোট ঘুপচি ধরনের টিনের ঘর। ঘর জুড়ে খাট-চৌকি পাতা। এক কোনায় কুৎসিতদর্শন একটা ক্যাশবাক্স। আগরবাতির গন্ধের সঙ্গে আলকাতরার গন্ধ মিশে একটা দম আটকানো মিশ্র গন্ধ চারদিকে। মোটামুটি চিত্রটি এই। অবশ্য 'দবির স্টোর'টি বেশ বড়। দেয়ালের র‍্যাকভর্তি শাড়ি, লুঙ্গি এবং লংক্লথ। দোকানে পা দিলেই মনে হয়, দবির মিয়া এই ক'বছর প্রচুর পয়সা করেছে। জহুরকে ঢুকতে দেখেই সে ক্যাশবাক্স থেকে একটা পাঁচ টাকার নোট বের করল, দুইটা চা আর পান নিয়ে আয়। যে-লোকটিকে পান আনতে বলা হলো সে বেশ বয়স্ক। পরিষ্কার কাপড়চোপড় গায়ে। এদেরকে এত সহজে তুই বলা যায় না। কিন্তু দবির অনায়াসে বলছে। লোকটি জহুরের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাই সাহেব, শরীরটা ভালো?

জি ভালো। আপনি ভালো?

জি-জি। আমাশা হয়েছিল, এখন আরাম হয়েছে।

দবির মিয়া প্রচণ্ড ধমক দিল, চা না আনতে কইলাম?

লোকটি কাঁচুমাচু ভঙ্গি করে চা আনতে গেল। দবির মিয়া বিরক্ত মুখে বলল, যার তার সাথে আপনি-আপনি করাটা ঠিক না। ভদ্রলোকের সাথে ভদ্রলোকের ব্যবহার। ছোটলোকের সাথে ছোটলোকের। এই হারামজাদারে যে থাকতে দেই এই তার বাপের ভাগ্য।

লোকটা কে?

কেউ না, পাহারা দেয়। রাত্রে দোকানের ভিতরে ঘুমায়। নীলগঞ্জ কেমন দেখলা?

অনেক জমজমাট। নতুন নতুন দালান-কোঠা।

দালান-কোঠা পর্যন্তই সার— আর কিছু নাই। ব্যবসাপাতি বন্ধ। টাকাপয়সার নাড়াচাড়া নাই। অবস্থা সঙ্গিন।

তাই না কি?

এতটুকু জায়গার মধ্যে দুইটা আইস মেশিন। মাছ যা ঘাটে ওঠে তার সবটাই বরফ দিয়ে ঢাকা পাঠিয়ে দেয়।

দবির মিয়া থু করে ঘরের মধ্যে একদলা থুথু ফেলল।

আসছো যখন, নিজেই বুঝবে। এক ভাগ পাবদা মাছ দশ টাকা চায়। খাওয়া-খাদ্য এখন নাই বললেই হয়।

চা এবং পান এসে পড়ল। লোকটি জহুরের দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলল, আপনে যে আইছেন, সবাই জানে। ছোট চৌধুরী খুব ভয় খাইছে।

দবির মিয়া প্রচণ্ড ধমক দিল।

কতবার বলছি, ফালতু কথা বলবি না। চুপ। একদম চুপ। লোকটি চুপ মেরে গেল। জহুর দেখল, লোকটির গায়ে ফর্সা পায়জামা-পাঞ্জাবি আছে ঠিকই কিন্তু খালি পা। যারা খালি পায়ে চলাফেরা করে তাদের সহজেই তুই সম্বোধন করা যায়।

বাড়ি ফিরবার পথে দবির মিয়া নানা কথা বলতে লাগল।

কী হয়েছে না-হয়েছে, এইসব মনে রাখা ঠিক না। নতুন করে সব কিছু শুরু করা দরকার। ঠিক না জহুর ?

হুঁ।

বয়স তোমার এমন কিছু হয় নাই। বিয়ে-শাদি করা দরকার। মেয়ের জন্য চিন্তা করবে না। এই দেশে মেয়ের অভাব আছে এই কথাটা ভুল। হা-হা-হা।

জহুর চুপ করে থাকল।

রুজি-রোজগারের চেষ্টা করা দরকার। সেইটাও আমি ব্যবস্থা করব। একটা লঞ্চ কিনার চেষ্টায় আছি। বিশ্বাসী লোকজন আমার নিজেরই দরকার। বুঝলে না কি জহুর ?

জহুর হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। ফস করে জিজ্ঞেস করল, বদি ভাইয়ের বৌ কি এখনো নীলগঞ্জেই থাকে ?

কেন ?

এমনি জিজ্ঞেস করছি।

থাকে।

শ্বশুরবাড়িতেই থাকে ?

হুঁ।

সংসার চলে কীভাবে ?

কী জানি কীভাবে ? কে খোঁজ রাখে ?

দবির মিয়া বিরক্ত হয়ে একদলা থুথু ফেলল। থেমে থেমে বলল, পুরান জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক না।

দবির মিয়ার বাড়ির আলো দেখা যাচ্ছে। বাহাদুর আর বাবলুর তারস্বরে পড়াশোনা শোনা যাচ্ছে। দবির মিয়া গলা খাঁকারি দিয়ে আবার বলল, পুরানা জিনিস ঘাঁটাঘাঁটি করা ঠিক না।

তাকে ঈষৎ চিন্তিত মনে হলো।

সেদিনও সে ঈষৎ চিন্তিত হয়েছিল।

রাত সোয়া ন'টার সময় নীলগঞ্জ থানার দারোগা শামসুল কাদের তাকে থানায় ডাকিয়ে নিয়েছিলেন। জহুর আলি সংক্রান্ত কী-একটা গোলমাল। এরকম গোলমাল

জহুরকে নিয়ে লেগেই আছে। নির্ঘাত কাউকে ধমকাধমকি করেছে। দবির মিয়া থানায় যাবার আগে স্ত্রীর সঙ্গে খুব রাগারাগি করল, আর এইসব ঝামেলা নিতে পারব না। যথেষ্ট হয়েছে। মানসম্মান সব গেছে। ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে যদি না দিই তাহলে আমার নাম...

থানায় গিয়ে দবির মিয়া আকাশ থেকে পড়ল। জহুর আলিকে শম্ভুগঞ্জে খুনের দায়ে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। খুন হয়েছে বদি। ব্যাপারটি এমনই অবিশ্বাস্য যে, দবির মিয়া ঘটনার ওপর তেমন গুরুত্ব দিল না। ভুল হয়েছে বলাই বাহুল্য। কিন্তু সমস্তটাই অল্প সময়ের মধ্যে জট পাকিয়ে গেল। তাজ বোর্ডিংয়ের মালিক বলল, জহুরকে সে ৯ নম্বর ঘর থেকে বের হতে দেখেছে, তার শার্ট রক্তমাখা ছিল। এবং সে তাজ বোর্ডিংয়ের মালিককে দেখে ঘুট করে সরে পড়ে। কী সর্বনাশের কথা!

দবির মিয়া শম্ভুগঞ্জ থানা হাজতে দেখা করতে গেল। উকিল-টুকিল দিতে হয়, শতেক ঝামেলা। জহুরকে খুব বিচলিত মনে হলো না। সে বেশ স্বাভাবিকভাবে বলল, মিথ্যা মামলা দুলাভাই। ছোট চৌধুরীর কারবার। কিছু হবে না। বদি ভাইকে আমি খুন করব কেন?

তুই তার হোটেলে গেছিলি কী জন্যে?

গল্প করবার জন্যে গেছিলাম।

দবির মিয়া কপালের ঘাম মুছে ক্লান্ত স্বরে বলল, এখন আমি করি কী?

কিছু করতে হবে না, বসে থাকেন চুপচাপ। বড়আপা কেমন আছে?

দবির মিয়া তার জবাব না দিয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ফেলল।

যান, ছোট চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেন। কাঁদবার তো কিছু হয় নাই।

কাঁদবার কিছু হয় নাই, বলিস কী তুই! আমার কি টাকাপয়সা আছে?

টাকাপয়সার কী দরকার?

টাকাটয়সা ছাড়া মামলা-মোকদ্দমা হয়?

দুলাভাই, আপনি চৌধুরী সাহেবের কাছে যান।

ছোট চৌধুরী দবির মিয়ার ওপর দারুণ রেগে গেলেন।

খুন হয়েছে বদি, ধরেছে তোমার শালাকে, আমি এর মধ্যে কে? তোমার শালার মাথা আধা-খারাপ আমরা জানি, তোমারটাও যে খারাপ, তা তো জানতাম না।

দবির মিয়া আমতা-আমতা করতে লাগল।

যাও, ভালোমতো উকিল-টুকিল দেও। পয়সাপাতি খরচ করো। অপরাধ একটা করে ফেলেছে, কী আর করা! চেষ্টাটা তো করাই লাগে।

খুন সে করে নাই চৌধুরী সাহেব।

তুমি আমি বললে তো হবে না— দেখবে কোর্ট।

দবির মিয়া দীর্ঘ সময় চুপচাপ থেকে বলল, জহুরের মাথাটা গরম, আপনার সঙ্গে বেয়াদপি করেছে অনেকবার...

কথার মাঝখান থাকে থামিয়ে দিয়ে চৌধুরী সাহেব রাগী গলায় বললেন, এই জন্যে আমি তারে খুনের আসামি দিয়ে দিলাম ? অন্য কেউ এই কথা বললে আমি তাকে জুতাপিটা করতাম। নেহায়েত দুঃখে-ধান্ধায় তোমার মাথার ঠিক নাই, তাই কিছু বললাম না।

দবির মিয়া বাসায় ফিরে দেখে তার স্ত্রীর এবরশন হয়েছে। এখন-তখন অবস্থা। দুপুররাতে তাকে নিয়ে ময়মনসিংহ সদর হাসপাতালে যাবার জন্য ট্রেনে উঠতে হলো। কপাল খারাপ থাকলে যা হয়। যে ট্রেনের চার ঘণ্টার মধ্যে ময়মনসিংহ পৌঁছার কথা, সেটা পৌঁছল ন'ঘণ্টা পর। ময়মনসিংহ স্টেশনে মরা লাশ নিয়ে দবির মিয়া গলা ফাটিয়ে কাঁদতে লাগল। তার চারপাশে লোক জমে গেল।

অঞ্জু খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠে। যত রাতেই ঘুমাতে যাক সূর্য ওঠার আগে তার ঘুম ভাঙবেই। এত ভোরে আর কেউ ওঠে না। অঞ্জু তাই একা, তবে একা বেঞ্চিতে বসে থাকতে হচ্ছে না। অঞ্জু পাশের বাড়ি থেকে চেয়ে তিনটি গোলাপের কলম এনেছে। কলম তিনটি বহু যত্নে লাগানো হয়েছে বাড়ির পেছনের ফাঁকা জায়গায়। অঞ্জু সকালবেলাটা গাছগুলোর পাশে বসে কাটায়। পানি দেয়। মাটি কুপিয়ে দেয়। এবং যেদিন মন-টন খুব খারাপ থাকে, তখন কথা বলে। হঠাৎ শুনলে মনে হবে সে গাছগুলোর সঙ্গেই কথা বলছে। আসলে তা নয়, সে কথা বলে নিজের মনে। যেমন আজ সকালে সে বলছিল, মেয়েরা বড় হলে তাদের গায়ে হাত তোলা ঠিক না। খুব খারাপ। রাগ হলে বুঝিয়ে বলতে হয়। বোঝালে সবাই বোঝে। বোঝালে যখন বোঝে তখনই তো সবাই বড় হয়। ঠিক না ?

অঞ্জু কথাগুলো বলছিল ফিসফিস করে। যেন খুব গোপন কিছু বান্ধবীকে বলা হচ্ছে। টিউবওয়েলে পানি নিতে এসে জহুর অবাক হয়ে ব্যাপারটা লক্ষ করল। মঞ্জু নিচু গলায় গাছের সঙ্গে কথা বলছে।

আমি কখনো আমার ছেলেমেয়ের সঙ্গে রাগ করব না। রাগ করলে কষ্ট পায় না ? মন খারাপ হয় না ? রাগ করার দরকার কি ?

জহুর অবাক হয়ে ডাকল, এই অঞ্জু।

অঞ্জু চমকে পেছন ফিরল।

গাছের সঙ্গে কথা বলছিস নাকি রে ?

যাও মামা, গাছের সঙ্গে কথা বলব কেন ?

অঞ্জু লজ্জায় বেগুনি হয়ে গেল।

রোজ এত সকালে উঠিস ?

হুঁ। তুমিও ওঠো ?

উঠি। জেলখানার অভ্যেস।

অঞ্জু উঠে দাঁড়াল। জহুর দেখল এই মেয়েটি দেখতে বেশ হয়েছে। ছোটবেলায় কদাকার ছিল। নাক দিয়ে সব সময় সর্দি পড়ত। বুকের পকেট ভর্তি থাকত রেললাইন থেকে আনা পাথরের টুকরোয়। জহুর যতবারই জিজ্ঞেস করত, পকেটে পাথর নিয়ে কী করিস তুই? ততবারই সে নাকের সর্দি টেনে বলত, পাথর না মামা, গোগেলের ডিম।

জহুর মুখে পানির ঝাপ্টা দিতে দিতে বলল, গোগেলের ডিমের কথা মনে আছে তোর? অঞ্জু লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল।

কী রে, আছে?

আছে।

এখন আর গোগেলের ডিম আনিস না?

অঞ্জু সে কথার জবাব না দিয়ে বলল, চা খাবে মামা?

চা?

হুঁ, একটা হিটার আছে। চট করে বানাব।

ঠিক আছে আন। তুই এরকম সকালবেলা উঠে একা-একা চা-টা খাস নাকি?

না, তোমার জন্যে বানাব।

অঞ্জু চা নিয়ে আসবার পর জহুর একটা জিনিস লক্ষ করল, অঞ্জু যেন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে।

চিনি ঠিক আছে মামা?

ঠিক আছে।

অঞ্জু মামার পাশে বসে নরম গলায় বলল, তুমি কি আবার কলেজে ভর্তি হবে?

নাহ্।

তুমি কী করবে?

জহুর জবাব দিল না। অঞ্জু বলল, বাবা বলছিলেন তুমি তার সঙ্গে লঞ্চের ব্যবসা করবে।

জহুর হালকা গলায় বলল, দুলাভাইয়ের অনেক টাকা হয়েছে না কি রে?

হুঁ।

ঘর-দুয়ার তো কিছু ঠিকঠাক করে নাই।

বাবা টাকা খরচ করে না।

তাই নাকি?

হুঁ। সবাই বলছিল বড়আপাকে দুই-একটা গানটান শেখাতে। তাহলে চট করে বিয়ে হবে। তা বাবা শেখাবে না। হারমোনিয়াম কিনতে হবে যে!

এখন বিয়ে হবার জন্যে গান শিখতে হয় ?

হুঁ, হয়। যাদের গায়ের রঙ কালো তাদের হয়।

এখানে গান শেখায় কে ?

কে আবার, বগা ভাই।

বগা ভাইটা কে ?

তুমি চিনবে না, সাইফুল ইসলাম। বকের মতো হাঁটে, তাই নাম বগা ভাই।

অঞ্জু মুখ নিচু করে হাসল। পরমুহূর্তেই হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, অনেকে আবার ডাকে জেলি ফিশ। খুব মজার লোক মামা।

জহুর কিছু বলল না। বাবলু এবং বাহাদুরের কান্না শোনা যেতে লাগল। দবির মিয়ার গর্জনও ভেসে এলো, খুন করে ফেলব। আজকে আমি দুটোকেই জানে শেষ করে দেব।

জহুর বলল, ব্যাপার কী অঞ্জু ?

ওরা আজ আবার বিছানা ভিজিয়ে ফেলেছে।

দবির মিয়ার রাগ ক্রমেই চড়ছে, হারামজাদাদের আজ আমি বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। ধামড়া ধামড়া একটা, আর কাণ্ডটা দেখো।

জহুর বলল, আমি একটু ঘুরে আসি অঞ্জু।

কোথায় যাও ?

এই এমনি একটু হাঁটব।

নাস্তা খেয়ে যাও।

এসে পড়ব, বেশি দেরি হবে না।

ছোট চৌধুরী নিমের ডাল দিয়ে দাঁত মাজছিলেন। দাঁত মাজার পর্বটি তাঁর দীর্ঘ। বাড়ির সামনে হাঁটাহাঁটি করেন এবং দাঁত মাজেন। তাঁর পরনে একটি লুঙ্গি এবং পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির বোতাম সবগুলো খোলা। মুখ থেকে কষ পড়ে পাঞ্জাবির জায়গায় জায়গায় ভিজে উঠেছে। তিনি এটা তেমন গ্রাহ্য করছেন না। কারণ দাঁত মাজা শেষ হলেই তিনি গোসল করেন। গোসলের পানি গরম হচ্ছে।

বাড়ির সামনের রাস্তা দিয়ে যে-ই হেঁটে যাচ্ছে, তাকেই তিনি দু'একটা ছোটখাটো প্রশ্ন করছেন, কে, জলিল না ? আছ কেমন ? বড়ছেলের চিঠিপত্র পাও ? মনু মিয়া, তোমার বাতের ব্যথা কি কমতির দিকে ? এ্যাঁ, আরো বাড়ছে ? বলো কী !

আজকের রুটিন অন্যরকম হলো। তিনি দেখলেন, জহুর আলি হনহন করে আসছে। জহুর আলিকে দেখতে পেয়ে তিনি তেমন অবাক হলেন না। সে যে ছাড়া পেয়েছে এবং এখানে এসে পৌঁছেছে সে খবর তাঁর জানা। কিন্তু তার হনহন করে হাঁটার ভঙ্গিটা চোখে লাগে। কোনো উদ্দেশ্য ছাড়া কেউ এরকম হাঁটে না। কিন্তু এই

সকালবেলা তার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে ?

চৌধুরী সাহেব ভালো আছেন ?

চৌধুরী সাহেব চট করে জবাব দিতে পারলেন না। কিছুক্ষণ সময় লাগল।

জহুর না ?

হ্যাঁ।

ছাড়া পেয়েছ নাকি ?

হ্যাঁ, ছাড়া পেয়েছি।

ভালো, ভালো। খুব ভালো।

ছোট চৌধুরী লক্ষ করলেন জহুর আলি যেন হাসছে। না কি চোখের ভুল ? ইদানীং তিনি চোখে ভালো দেখতে পান না।

জহুর, বসবে নাকি ?

নাহ্।

জহুর 'না' বলেই গেট ধরে দাঁড়িয়ে রইল। এর মানে কী ? কী বোঝাতে চায় সে ?

নীলগঞ্জের অনেক পরিবর্তন হয়েছে, কী বলো জহুর ?

জহুর তার উত্তরে থেমে থেমে বলল, চৌধুরী সাহেব, কিছু-কিছু জিনিসের কোনো পরিবর্তন হয় না।

না, কিছু বলতে চাই না।

জহুর আলি লোহার গেটে ভর দিয়ে দাঁড়াল। চৌধুরী সাহেবের গোসলের পানি গরম হয়েছে খবর আসতেই তিনি ভেতরে চলে গেলেন। জহুর গেটে হেলান দিয়ে তবু দাঁড়িয়ে রইল। চৌধুরী সাহেবের পানি গরম হবার খবর যে দিতে এসেছিল সে বলল, কিছু চান মিয়া ভাই ?

জহুর বলল, কিছু চাই না।

অমাবস্যার রাতে নীলগঞ্জ বাজারে চুরি হবে, এটা জানা কথা। থানাওয়ালা সে জন্যেই অমাবস্যার রাতে নীলগঞ্জ বাজারে একজন পুলিশ রাখে। তবু চুরি হয়। বাজারে সমিতি-দারোয়ানের নাকের ডগায় চুরি হয়। দবির মিয়া অতিরিক্ত সাবধানী। সে বাজার সমিতি দারোয়ানের ওপর ভরসা না করে একজন লোক রেখেছে, যে রাতে দোকানের ঝাঁপ ফেলে সজাগ ঘুম ঘুমায়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। গতরাতে দবির মিয়ার দোকানে চুরি হয়েছে। ক্যাশবাক্সের কোনো টাকা নিতে পারেনি, কারণ সেখানে কোনো টাকা ছিল না। দুই থান ছিটের কাপড়, দশ গজ লংক্লথ এবং পপলিনের কাটা পিসগুলো নিয়ে গেছে। ক্যাশবাক্সের পাশে গাদা করা ছিল নীল এবং সাদা রঙের মশারি। সবগুলো কাঁচি দিয়ে কুচি কুচি করে কেটেছে।

দবির মিয়া দোকানে এসে কেঁদে ফেলল। ছাপ্পান্নটা নতুন মশারি পরশু দিন ময়মনসিংহ থেকে এসেছে। নাইটগার্ডকে দেখা গেল পান খেয়ে মুখ লাল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং যে-ই আসছে তাকেই মহা উৎসাহে ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ দিচ্ছে, ছাপ্পান্নটা মশারি, ন'টা শাড়ি, পনেরটা লুঙ্গি আর আপনের কাপড়ের থান সব মিলাইয়া...

দবির মিয়া প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিল নাইটগার্ডের গালে। পুলিশ এলো বেলা বারোটার দিকে।

দবির মিয়া তখন দোকানে ছিল না। পুলিশ খানিক জিজ্ঞাসাবাদ করে নাইটগার্ডের কোমরে দড়ি বেঁধে থানায় নিয়ে গেল। নাইটগার্ডটির বিস্ময়ের সীমা রইল না। এমন একটা কিছু হতে পারে, তা তার ধারণার বাইরে ছিল। সে রাস্তায় যার সঙ্গে দেখা হলো তাকেই ভাঙা গলায় বলতে লাগল, দবির চাচাজিরে এট্টু খবর দেন। আপনের পাওডাত ধরি!

বিকেলের মধ্য নাইটগার্ড আধমরা হয়ে গেল। রুলের বাড়ি খেয়ে তার নিচের পার্টির একটি দাঁত নড়ে গেল। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্যে এক পর্যায়ে তার অশুকোষ চেপে ধরায় সে তীব্র ব্যথার বমি করে ফেলল এবং ক্ষীণ স্বরে অর্থহীন কথাবার্তা বলতে লাগল। জমাদার সাহেব বললেন, কি, চুরি করেছিস ?

জি।

একাই করেছিস, না আরো লোক ছিল ?

ছিল।

কে কে ছিল ?

জি ছিল।

হারামজাদা ছিল কে ?

জি ?

তোর সাথে আর কে ছিল ? কয়জন ছিল ?

স্যার স্মরণ নাই।

আচ্ছা, স্মরণের ব্যবস্থা করি, দেখ।

সন্ধ্যাবেলায় দবির মিয়া এসে দেখল, থানা হাজতে এক কোনায় কুণ্ডুলি পাকিয়ে সে শুয়ে আছে। দবির মিয়া ডাকল, আই মনসুর, অ্যাই।

মনসুর শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল, কিছু বলল না।

মনসুর ভয় নাই, তরে নিতে আইছি, উইঠা দাঁড়া।

মনসুর উঠে দাঁড়াল না।

হাজতের অন্যপ্রান্তে লম্বা দাড়িওয়ালা যে-লোকটা দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিল সে বলল, এই শালার পুতে কাপড়চোপড় নষ্ট কইরা দিছে, গন্ধে থাকন দায়।

দবির মিয়াও তখন একটি তীব্র কটু গন্ধ পেল। ওসি সাহেব এলেন রাত ন'টায়। দবির মিয়া মনসুরকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছে শুনে তিনি গম্ভীর হয়ে পড়লেন।

ডেফিনিট চার্জ আছে, ওকে ছাড়াবেন কি ?

কী চার্জ আছে ?

চুরির, আর কিসের ? শক্ত প্যাঁদানি দিলে আগের চুরিগুলোরও খোঁজ পাওয়া যাবে, বুঝলেন ?

আগেরগুলোও তার করা নাকি ? কী যে বলেন ওসি সাহেব! বোকাসোকা মানুষ।

আরে রাখেন রাখেন। ধোলাই দিলেই দেখবেন নাম-ধাম বের হয়ে যাবে। ধোলাইয়ের মতো জিনিস আছে ?

দবির মিয়া ফিরে আসার সময় দারোগা সাহেব অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, শুনলাম আপনার ভাই ছাড়া পেয়েছে।

ভাই না। ছোট শ্যালক।

একই কথা। সে আপনার সঙ্গেই থাকবে ?

জি।

ভালো। খেয়ালটেয়াল রাখবেন। জেলখানা জায়গাটা খারাপ। অসৎ সঙ্গ। একবার জেলে গেলে অনেক রকম ফন্দি-ফিকির লোকজন দেখে। বুঝলেন ?

দবির মিয়া কিছু বলল না। দারোগা সাহেব একটা দেশলাইয়ের কাঠি দিয়ে কানের ময়লা আনতে আনতে প্রসঙ্গ শেষ করলেন, খেয়ালটেয়াল রাখবেন বুঝলেন। দিনকাল খারাপ।

মনসুরের ব্যাপারটা কী করবেন ?

দেখি।

বেচারা নির্দোষ।

দেখি।

দবির মিয়া অত্যন্ত মনমরা হয়ে দোকানে ফিরে এলো। দোকান খোলার পরপর আর একটি খারাপ খবর পেল। ডালের দাম পড়ে গেছে, সরসটা দু'শ তিন টাকা দরে বিকোচ্ছে। চৌধুরী সাহেব সত্তর মণ ডাল কিনে রেখেছেন। সেগুলো না কি ছেড়ে দেবেন, এরকম গুজব। চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে কথা বলা দরকার।

চৌধুরী সাহেব বাজারের মসজিদে এশার নামাজ পড়তে আসেন। কিন্তু নামাজ রাত আটটায় শেষ হয়ে গেছে। আগে আসতে পারলে হতো। দবির মিয়া তবু মসজিদের সামনে দিয়ে এক পাক হাঁটল।

মসজিদে ওয়াজ হচ্ছে। মৌলবি আবু নসর সাহেব টেনে টেনে বলছেন, এই দুনিয়াদারি অল্পদিনের। হাশরের ময়দানে আল্লাহ্ পাক সব মুর্দা জিন্দা করে

তুলবেন। ভাইসব, কারো গায়ে একটা সুতা পর্যন্ত থাকবে না। পুরুষ এবং স্ত্রী উলঙ্গ অবস্থায় উঠে আসবে ভাইসব। কিন্তু কেউ কারো লজ্জাস্থান দেখবে না। তখন সূর্য থাকবে আধ হাত মাথার ওপর। ভাইসব জিনিসটা খেয়াল রাখবেন...

সাইফুল ইসলাম সন্ধ্যার আগেই বাঁয়া-তবলা নিয়ে দবির মিয়ার বাড়ি উপস্থিত হলো। তার কিছুক্ষণ পর ন-দশ বছরের একটা ছেলে মাথায় একটা সিঙ্গেল রিড হারমোনিয়াম নিয়ে ঘামতে ঘামতে এসে উপস্থিত। দবির মিয়া দু'জনের কাউকে কিছু বলল না। অতিরিক্ত গম্ভীর মুখ করে সে বসে রইল।

আজ টুনীকে দেখতে আসবে। বরপক্ষের কেউ যদি গান শুনতে চায়, সে-জন্যই এ-ব্যবস্থা। দবির মিয়া কাল রাতেই জানতে পেরেছে টুনী 'বনের তাপস কুমারী আমি গো' এই গানটি হারমোনিয়াম বাজিয়ে নিজে নিজে গাইতে পারে। শোনার পর থেকেই সে গম্ভীর হয়ে আছে। সিও সাহেবের মেয়ের সঙ্গে লুকিয়ে লুকিয়ে গান শেখার মানেটা কী? এত যদি গানের শখ, তাকে বললেই হতো। অবশ্য বললেই সে যে গান শেখানোর ব্যবস্থা করত, তা নয়। নিতান্তই বাজে খরচ। হারমোনিয়াম সামনে নিয়ে মুখ বাঁকা করে চ্যাঁ-চ্যাঁ করার কোনো মানে হয়? তাছাড়া শরিয়তেও গান-বাজনা নিষেধ আছে। কঠিন নিষেধ।

দবির মিয়া মুখ গম্ভীর করে থাকলেও আজকে গানের ব্যাপারে কোনো আপত্তি করে নি। এই মেয়েটি পার করা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। ইদানীং নতুন একটা ঢং হয়েছে, মেয়ে দেখতে এসে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করা, তা গানটান কিছু জানে না কি?

কী আমার গানের সমঝদার একেকজন! বিয়ের পরপরই ঢুকিয়ে দেবে রান্নাঘরে অথচ কথাবার্তা এ-রকম যেন মিয়া তানসেন।

সাইফুল ইসলাম বলল, ইনারা দেরি করবেন না কি?

দবির মিয়া জবাব দিল না। সাইফুল ইসলাম মুখে পাউডার মেখে এসেছে। সেন্ট দেওয়া রুমাল দিয়ে ঘনঘন নাক ঘষছে। মাগিমার্কা এই অপদার্থটাকে সহ্য করা মুশকিল। দেখলেই মনে হয় এই হারামজাদা গান শেখাবার ছলে সুযোগ পেলেই মেয়েছেলের গায়ে হাত দেয়।

দবির মিয়া লক্ষ করল অঞ্জু যতবার বাইরে আসছে, ততবারই এই শালা সাইফুল ইসলাম চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাচ্ছে। একবার আবার বলল, 'এই খুকি, এক গ্লাস জল খাওয়াবে?' জল খাওয়াবে কিরে হারামজাদা? পানি আবার জল হলো কবে থেকে? দুই ঢোঁক পানি গিলেই চিকন স্বরে বলল, ধন্যবাদ। দবির মিয়া বহু কষ্টে রাগ সামলে মাগরেবের নামাজ পড়তে গেল।

বরপক্ষের লোকজন এসে পড়ল নামাজের মাঝামাঝি সময়ে। দবির মিয়া ইচ্ছা করে নামাজে দেরি করতে লাগল। মেয়ের বাপ ধর্মভীরু হলে দেখায় ভালো।

মেয়ে দেখতে এসেছে চারজন। মুরব্বি হলো ছেলের চাচা, নেত্রকোনার সাব-রেজিস্ট্রি অফিসে চাকরি করেন। ছেলে নিজেও এসেছে, সঙ্গে তার দু'জন বন্ধু। ছেলে অতিরিক্ত লম্বা। মুখে বসন্তের দাগ। ধূর্ত চোখ। আসার পর থেকেই শেয়ালের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে। কপালের কাছে বিরাট একটা আঁচিল— সেখান থেকে তিন-চারটা লম্বা কালো চুল ভুরু পর্যন্ত চলে এসেছে। অথচ প্রস্তাব যে এনেছে সে বলেছিল, রাজপুত্রের মতো গায়ের রঙ, খুব আদব-লেহাজ। দবির মিয়া আদব-লেহাজের কিছুই দেখল না। আধা ঘণ্টাও হয় নি এসেছে, এর মধ্যে বন্ধুদের নিয়ে তিনবার বারান্দায় গিয়ে সিগারেট টেনে এসেছে। অঞ্জুকে দেখে গলা খাঁকারি দিয়েছে। চড় দিয়ে এই হারামজাদার বিয়ের ইচ্ছা ঘুচিয়ে দিতে হয়।

দবির মিয়া অবশ্য ভদ্রভাবেই ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলল। ছেলের চাচার পাতে প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও দু'টি সন্দেশ তুলে দিল। আয়োজন ছিল প্রচুর, তবু বেশ কয়েকবার বলল, যোগ্য সমাদর করতে পারলাম না। আমি খুবই শরমিন্দা, ইত্যাদি। মেয়ের গান গাওয়ার সময় যখন এলো তখন সে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। এইসব ছেলে-ছোকরার ব্যাপারে সে থাকতে চায় না। দবির মিয়া বারান্দায় এসে দেখে জহুর এসেছে। মোড়ায় বসে চা খাচ্ছে একা-একা।

জহুর, কোথায় ছিলে ?

একটু বাইরে গিয়েছিলাম দুলাভাই।

লোকজন আসছে, ঘরে থাকলেই পারতে।

জহুর স্বাভাবিক স্বরেই বলল, দুলাভাই, আমি থাকলে নানারকম জিজ্ঞাসাবাদ হবে। সেটা বিয়েটিয়ের জন্যে ভালো না।

দবির মিয়া চুপ করে গেল। জহুর বলল, যে বাড়িতে একজন খুনি আসামি থাকে, সে বাড়ির মেয়ে বউ হিসেবে নিতে ভয়-ভয় লাগবে।

বলতে-বলতে জহুর মৃদু হাসল, আর ঠিক তখনি টুনীর গান শোনা গেল, 'আমি বন ফুল গো...।' দবির মিয়া ঢোঁক গিলল। জহুর অবাক হয়ে বলল, টুনী গাইছে নাকি ?

হুঁ ?

গান শিখল কবে ?

দবির মিয়া উত্তর দিল না। জহুর বলল, দুলাভাই, টুনী এত সুন্দর গান গায়। কী আশ্চর্য। আমি তো...

দবির মিয়া মিনমিন করে কী বলল ঠিক বোঝা গেল না। গান শেষে সাইফুল ইসলামের কথা শোনা গেল, মারাত্মক গলা। নিজের ছাত্রী বলে বলছি না। হে... হে... হে...। খুব টনটনে গলা। খুব ধরা।

ওরা মেয়ে পছন্দ করে গেল। মোটামুটিভাবে স্থির হলো শ্রাবণ মাসে বিয়ে হবে। দেনা-পাওয়া তেমন কিছু না। মেয়ের বাবা ইচ্ছে করে কিছু দিলে দেবেন—

সেটা তাঁর মেয়েরই থাকবে। তবে ছেলের একটা মোটর সাইকেলের শখ। হোন্ডা ফিফটি সিসি। তারা যাবার আগে টুনীকে ময়লা তেল চিটচিটে একটা একশ' টাকার নোট দিয়ে গেল।

দবির মিয়ার খুশি হওয়ার কথা। কিন্তু সে মনমরা হয়ে রইল। তার ওপর অনুফা যখন বলল, তার ছেলে পছন্দ হয়নি, তখন সে বেশ রেগে গেল। মেয়েছেলেরা ঝামেলা বাধানোর ওস্তাদ। পছন্দ না-হওয়ার আছে কী? ছেলের জমিজমা আছে। টুকটাক বিজনেস আছে। প্রাইমারি স্কুলের মাস্টার, অসুবিধাটা কোথায়?

অনুফা মিনমিন করে বলল, ছেলেটা বেহায়া।

বেহায়া? বেহায়ার কী দেখলে? মেয়েমানুষ তো না যে ঘোমটা দিয়ে থাকবে।

অনুফা ঢোঁক গিলে বলল, টুনীর পছন্দ হয় নাই।

টুনীর আবার পছন্দ-অপছন্দ কী? শুধু ফালতু বাত। একদম চুপ।

টুনী কানতাছে।

কান্দুক। তুই চুপ থাক।

তুইতোকারি করো কেন?

বললাম চুপ।

দবির মিয়া দোকানে গেল মুখ কালো করে। যাবার পথে একবার থানায় যাবে, এরকম পরিকল্পনা ছিল। মনসুরের ব্যাপার কী হলো জানা দরকার। কিন্তু থানায় যেতে আর ইচ্ছা করল না। যা ইচ্ছা করুক। মেরে তক্তা বানিয়ে দিক।

জুম্মাঘরের পাশ দিয়ে যাবার সময় চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। চৌধুরী সাহেব যেন দেখেও দেখলেন না। এর মানেটা কী? দবির মিয়া বলল, চৌধুরী সাহেব না? স্লামালিকুম।

ও, তুমি। এত রাইতে কী করো?

রাত বেশি হয় নাই চৌধুরী সাব। দোকানের দিকে যাই।

চৌধুরী সাহেব দাঁড়িয়ে পড়লেন।

তোমার সঙ্গে কথা আছে দবির।

কী কথা, বলেন।

রাস্তার মধ্যে তো কথা হয় না। একদিন বাড়িতে আসো।

এখন যাব? এখন অবসর আছি।

না, এখন না।

কালকে আসব? সকালে?

দিন-তারিখ করবার দরকার নাই। অবসর মতো একবার আসো।

দবির মিয়া অত্যন্ত চিন্তিত মুখে বাড়ি ফিরে গেল।

সাইফুল ইসলাম থানার পাশ দিয়ে বাজারে যাচ্ছিল। নান্টুর দোকানে সে এখন যাবে। একটা চা এবং নিমকি খাবে। মাসকাবারি ব্যবস্থা করা আছে। মাসের শেষে টাকা দিতে হয়। এছাড়াও নান্টু লোকটি গান-বাজনার সমজদার। চা খেতে-খেতে তার সঙ্গে গান-বাজনা নিয়ে দু'একটা টুকটাক কথা হয়। সাইফুল ইসলামের বড় ভালো লাগে। এই অঞ্চলে গান-বাজনার কোনো কদর নেই। মূর্খের দেশ।

সাইফুল ইসলাম শব্দ করে পা ফেলছিল। তার খুব সাপের ভয়। রাতেরবেলা হাঁটাচলা করবার সময় সে সাড়াশব্দ করে হাঁটে। আজো সে গুনগুন করছিল— 'আসে বসন্ত ফুল বনে।' কিন্তু হঠাৎ সে গান থামিয়ে পাথরের মূর্তির মতো জমে গেল। বিকট চিৎকার আসছে থানা থেকে। বিকট এবং বীভৎস। যেন কেউ লোকটার একটা হাত টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে। কিংবা একটা চোখ উপরে ফেলেছে।

বসন্তকালে রাতের ঠান্ডা হাওয়ার মধ্যেও সে কুলকুল করে ঘামতে লাগল। সাপের কথা আর তার মনে রইল না। টর্চ নিভিয়ে সে নিঃশব্দে বাজারের দিকে রওনা হলো।

নান্টু মিয়া তার দোকান খোলেনি। তার জলবসন্ত হয়েছে। সাইফুল ইসলাম নান্টুর দোকানের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরের দিকে রওনা হলো। নান্টুর দোকান ছাড়া অন্যকোনো দোকানে সে চা খায় না। নান্টুর দোকানে সে নিজের পয়সায় একটা কাপ কিনে রেখেছে। এই কাপে নান্টু অন্য কাউকে চা দেয় না।

জহুরের বিছানা আজ বারান্দায় পাতা হয়েছে। টুনী মশারি খাটাতে এসে নরম গলায় বলল, বৃষ্টি হলে কিন্তু ভিজে যাবে মামা। বৃষ্টি হবে আজ রাতে। জহুরের মনে হলো টুনীর চোখ ভেজাভেজা।

জহুর নিচু গলায় বলল, তুই তো ভালো গান শিখেছিস।

টুনী চুপ করে রইল। মশারি খাটাতে তার বেশ ঝামেলা হচ্ছে। দড়ি বাঁধবার জায়গা পাওয়া যাচ্ছে না। জহুর বলল, মশারি পরে খাটাবি, বস তুই। তোর সঙ্গে তো আমার কথাই হয় না।

রান্না হয় নাই, মামা।

রান্নাবান্না সব সময় তুই করিস না কি?

মাঝে মাঝে অঞ্জু করে। অঞ্জুর রান্না বাবা খেতে পারে না।

তোদের ছোটমা করে না?

ছোটমার শরীর ভালো না। আগুনের কাছে যেতে পারে না।

ঘরের ভেতর থেকে ঠকাঠক শব্দ হতে লাগল। টুনী বলল, এই যে আবার লেগে গেছে।

মারামারি করছে?

হুঁ। এরা নিঃশব্দে মারামারি করে। আমি সামলাই গিয়ে।

টুনী উঠে চলে গেল।

জহুর পরপর দুটি সিগারেট শেষ করল। এ দুটিই তার সর্বশেষ সিগারেট। দুলাভাইয়ের কাছ থেকে টাকা না চাইলে আর সিগারেট কেনা যাবে না। চাওয়াটা একটা ঝামেলার ব্যাপার। টাকাপয়সা আগে বড়আপা দিত। দেবার সময় রাগী-রাগী একটা ভাব করে বলত, ইশ, আর কত কাল জ্বালাবি ? বড়আপার কথা মনে হওয়ায় জহুরের সামান্য মনখারাপ হলো। খুবই সামান্য। এটা লজ্জার ব্যাপার। আরো অনেক বেশি মনখারাপ হওয়া উচিত। চোখ দিয়ে পানি-টানি পড়া উচিত। কিন্তু সেরকম কিছুই হচ্ছে না। খুব লজ্জা এবং দুঃখের ব্যাপার। বড়আপার মতো একটা ভালো মেয়ে এই দেশে তৈরি হয়নি।

মামা, তোমার চা!

অঞ্জু চায়ের কাপ বেঞ্চির ওপর নামিয়ে রাখল।

চা তো চাই নি।

খাও একটু। রান্নার দেরি আছে।

অঞ্জু বসল বেঞ্চির এক পাশে।

পড়া নেই আজকে ?

আছে। তোমার চায়ের চিনি ঠিক হয়েছে মামা ?

ঠিক আছে।

অঞ্জু বসে রইল চুপচাপ।

তুই কি কিছু বলবি না কি ?

অঞ্জু ইতস্তত করে বলল, টুনী আপা তোমাকে একটা কথা বলতে বলেছে মামা।

জহুর অবাক হয়ে বলল, সে বললেই তো হয়। উকিল ধরেছে কেন ?

তার লজ্জা লাগছে।

কী ব্যাপার ?

ঐ ছেলেটিকে আপার পছন্দ হয়নি। আমারো হয়নি।

জহুর অবাক হয়ে বলল, আমাকে বলছিস কেন ? দুলাভাইকে বল।

বাবাকে বলে লাভ হবে না।

জহুর চুপ করে গেল। অঞ্জু মৃদু স্বরে বলল, বাবা কারো কথা শোনে না।

জহুর বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, দুলাভাইয়ের অনেক পয়সা হয়েছে, না ?

হুঁ।

ছেলেটাকে পছন্দ হয়নি কেন ?

জানি না। জিজ্ঞেস করিনি।

তোর নিজেরও তো পছন্দ হয়নি। সেটা কী জন্যে ?

লোকটার চেহারা দেখলেই মনে হয় কোনো একটা মতলব পাকাচ্ছে।

চেহারা দেখে কিছু বোঝা যায় না।

অঞ্জু উত্তর দিল না। জহুর ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, জেলখানায় অনেক লোক দেখেছি ফেরেশতার মতো চেহারা, কিন্তু ভয়ঙ্কর সব অপরাধ করে এসেছে। একজনের নাম ছিল আব্দুল লতিফ, কলেজের প্রফেসর! কী চমৎকার চেহারা, কী ভদ্র ব্যবহার! কিন্তু...

কী করেছিল ঐ লোক ?

ঐসব শুনে কাজ নেই।

কতদিনের জেল হয়েছিল ?

ফাঁসির হুকুম হয়েছিল।

অঞ্জু আর কিছু জিজ্ঞেস করল না।

ঘরের ভেতরে আবার হুটোপুটি শুরু হলো। লেগে গেছে দু'ভাই। নিঃশব্দ যুদ্ধ চলছে। অঞ্জু ভাইদের সামলাতে চলে গেল।

দবির মিয়া ফিরল রাত এগারটায়। তার মুখ থমথমে। বলল, ভাত খাব না, খিদে নাই।

ব্যাপার কী দুলাভাই ?

ব্যাপার কিছু না। তোমরা না খেয়ে বসে আছ কেন এত রাত পর্যন্ত ?

আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

অপেক্ষা করার দরকার নেই। খিদে লাগলে খাবে, ব্যস।

দবির মিয়া বালতি হাতে কলতলায় গা ধুতে গেল।

গায়ে মাখার সাবান নেই। কথাটা সকালে বলা হয়নি কেন ? এই নিয়ে গর্জাতে গর্জাতে প্রচণ্ড একটা চড় বসাল অঞ্জুকে।

সকালে আপনাকে একবার বলেছিলাম বাবা।

আবার মিথ্যা কথা। বললে আমি শুনলাম না কেন ? কান তো এখনো নষ্ট হয় নি। যেখান থেকে পারিস সাবান নিয়ে আয়।

জহুর মোড়াটা উঠোনে নামিয়ে বসেছিল। সুন্দর বাতাস দিচ্ছে। পরিষ্কার জ্যোৎস্না। বেশ লাগছে বসে থাকতে।

মামা, একটা গায়ে-মাখা সাবান এনে দেবে ?

জহুর দেখল, অঞ্জু কথা বলছে বেশ সহজ স্বাভাবিক ভঙ্গিতে। যেন কিছুই হয়নি।

এনে দিচ্ছি। আমার কাছে কোনো টাকা নেই রে অঞ্জু। টাকা দিতে পারবি ?

অঞ্জু একটা দশ টাকার নোট এনে দিল।

সাবান ছাড়াও জহুর এক প্যাকেট সিগারেট কিনল! কিন্তু দোকানদার দাম নিতে চাইল না।

জহুর ভাই, দাম দিতে হবে না।

দাম দিতে হবে না কেন ?

জহুর ভাই, আপনি আমারে চিনতে পারছেন না ?

দোকানদার লোকটির সমস্ত মুখভর্তি চাপ দাড়ি। মাথায় ফুলতোলা কিস্তি টুপি একটা।

জহুর ভাই, আমি আজমল।

ও, দাড়ি রাখলে কবে ?

বেশিদিন না। আপনি আসছেন খবর পাইছি। কিন্তু লজ্জাতেই দেখা করতে যাই নাই।

লজ্জা কিসের ?

আপনের বিপদে কোনো সাহায্য করতে পারি নাই। অবশ্য সাহায্য করার মতো অবস্থা আমার ছিল না। আমারে জালিয়াতি কেইসের আসামি করছিল। শুনছেন সেটা ? বলব আপনেরে। অনেক কথা আছে, জহুর ভাই।

সাবান নিয়ে এসে জহুর দেখল, দবির মিয়া গোসলটোসল সেরে ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে শুধু অঞ্জু এবং টুনী। অঞ্জু না কি ভাত খাবে না, তার খিদে নেই। জহুর বলল, রাগ-টাগ করিস না। ভাত খা।

রাগ না মামা, সত্যি খিদে নেই। আমি রাগ-টাগ করি না।

খাওয়ার মাঝখানে টুনী বলল, বাবার দোকানের যে নাইটগার্ডকে ওরা চোর মনে করে ধরেছিল, মনসুর নাম। ওকে থানায় পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

জহুর হাত গুটিয়ে সোজা হয়ে বসল, কী বলছিস এসব!

হুঁ, সে জন্যেই বাবার এরকম মেজাজ। মামা, আরেকটু ডাল দেব ?

জহুর কোনো জবাব দিল না।

তুমি থানাওয়ালাদের বিরুদ্ধে কেইস করতে চাও ?

জি।

বেহুদা ঝামেলা করছো দবির।

চৌধুরী সাহেব, একটা নির্দোষ লোককে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

পুলিশে ধরলে কোলে নিয়ে বসায় না, মার দেয়। তোমার ঐ লোক তো আগেই আধমরা ছিল।

দবির মিয়া মুখ লম্বা করে বসে রইল।

চৌধুরী সাহেব সরু গলায় বললেন, বুদ্ধিমান লোক থানাওয়ালার সাথে বিবাদ করে না। কেইস করতে চাও করো। টাকা খরচ হবে। ফায়দা হবে না কিছু। টাকা খরচ করতে পারবে ?

টাকা কোথায় আমার ?

হুঁ। তাহলে চুপ করে থাকো। থানাওয়ালারা মিলে পাঁচশ' টাকা দেবে বলছে। ঐটা নিয়ে পাঠিয়ে দাও।

দবির মিয়া চুপ করে রইল। চৌধুরী সাহেব বললেন, দিনকাল খারাপ। খুব খারাপ। সবার সাবধান থাকা দরকার। বাজে ঝামেলায় যাওয়ার কোনো দরকার নাই।

তা ঠিক।

আর তোমার শালাকে বলবে এইটা নিয়ে যেন একটা ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা না করে। কথায়-কথায় আন্দোলন, এইসব বড় শহরে হয়। ছোট জায়গায় হয় না। তোমার ভালোর জন্যেই বলা।

দবির মিয়া ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল।

চৌধুরী সাব, তা হলে উঠি ?

বসো, চা খাও। এই চা দে।

চা আসতে অনেক দেরি হলো। চৌধুরী সাহেব দেশের অবস্থা নিয়ে আলাপ করতে লাগলেন। আলাপের ফাঁকে একসময় বললেন, তোমার শালাকে কোনো কাজেটাজে ঢুকিয়ে দাও, বুঝলে। চুপচাপ ঘরে বসে থাকা ঠিক না। আইস মিলে একজন স্টোর ইনজার্চ নেবে। তুমি চাও তো ব্যবস্থা করে দিই। পাঁচশ' টাকা মাসে পাবে। ঘরে বসে বসে এই টাকাটাই-বা মন্দ কি ? আর কাজকাম ছাড়া ঘরে বসে থাকা যায় না কি ?

দবির মিয়া উত্তর দিল না।

কী, বলব চাকরিটার জন্যে ?

চৌধুরী সাহেব, একটু জিজ্ঞেস করে দেখি।

তা দেখো। তবে আমাকে দু'এক দিনের মধ্যে বলবে।

জি, বলব।

কাজ ছাড়া মানুষ বাঁচে ?

জায়গাটা অন্ধকার।

দু'টি জড়াজড়ি করা লিচুগাছ চারদিক অন্ধকার করে রেখেছে। জহুর লিচুগাছ দু'টির নিচে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরাল। এ বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি নেই। বসার ঘরে হারিকেন জ্বলছে। হারিকেনের অস্বচ্ছ আলো আসছে জানালা গলে। জহুর একবার দেখল শাড়িপরা একটি মেয়ে জানালার ওপাশ দিয়ে হেঁটে গেল। কে ? বদি ভাইয়ের বৌ মিনু ভাবি ? একটি ছোট্ট ছেলে পড়ছে। বদি ভাইয়ের ছেলে নিশ্চয়। আর কেউ তো থাকবে না এখানে। জহুর একটু কাশল। বাড়ির ভেতর থেকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কেউ বলল, কে, কে ?

জহুর সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারল না। কতবার এসেছে এ বাড়িতে, প্রতিবারই তার এরকম হয়েছে। মিনু ভাবি যতবার বলেছেন, কে, কে ? ততবারই সে অন্য একধরনের অস্বস্তি বোধ করেছে এবং প্রতিবারই ভেবেছে আর আসবে না এ বাড়িতে। তবু এসেছে। মিনু ভাবি বেশ কয়েকবার বলেছেন, আপনি সরাসরি আসেন না কেন ? প্রায়ই দেখি লিচুগাছের নিচে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন, তারপর আসেন। অত্যন্ত সহজ এবং সাধারণ কথা। তবু জহুর কুলকুল করে ঘেমেছে।

মিনু দেখতে এমন কিছু আহামরি নয়। রোগামতো লম্বা একটি মেয়ে। গলায় পাতলা একটি চেইন। মুখে সব সময় পান। জহুর যতবার গিয়েছে ততবার বলেছে, পান দেব আপনাকে ভাই ?

জি-না, ভাবি।

না কেন ? খেয়ে দেখেন। কাঁচা খয়ের আছে। ও কী, মাথা নিচু করে ফেললেন যে! যা ভাবছেন তা না ভাই। পান-পড়া দিচ্ছি না।

মিনু খিলখিল করে হাসত। গলা ফাটিয়ে হাসতেন বদি ভাই। এই জাতীয় রসিকতা বড় পছন্দ ছিল বদি ভাইয়ের। কিন্তু শেষের দিকে কী হলো কে জানে, জহুর লক্ষ করল বদি ভাই তাকে দেখলেই কেমন গম্ভীর হয়ে পড়তেন। একদিন পুকুরপাড়ে ডেকে নিয়ে নিচু গলায় বললেন, তুই এত ঘনঘন আসিস না, বুঝলি ?

কেন ?

লোকজন নানান কথা বলে। কী দরকার ?

জহুর অবশ্য তার পরেও গিয়েছে। বদি ভাই শেষমেশ কথা বলাই বন্ধ করে দিলেন। শুধু বদি ভাই না, মিনু ভাবিও অস্বস্তি বোধ করত। বেশিক্ষণ থাকত না সামনে। 'ইশ, রাজ্যের কাজ পড়ে আছে' বলেই চট করে উঠে পড়ত।

জহুর সিগারেটটা ফেলে দিল।

হারিকেন হাতে বারান্দায় এসে দাঁড়াল মিনু। ভয়ার্ত স্বরে বলল, কে ওখানে ? কে ?

আমি। আমি জহুর।

মিনু বেশ খানিকক্ষণ কথা বলতে পারল না।

ভাবি, আমাকে চিনতে পারছেন তো ?

মিনু মৃদুস্বরে বলল, ভেতরে আসেন জহুর ভাই।

জহুর ঘরের ভেতরে এসে দাঁড়াল।

আপনি ছাড়া পেয়েছেন শুনেছি। আপনি না আসলে আমি নিজেই যেতাম।

ভালো আছেন ভাবি ?

হুঁ।

এইটি আপনার ছেলে ? কী নাম ?

রতন। এই, চাচাকে স্লামালিকুম দাও।

রতন কিছু বলল না। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। বদি ভাইয়ের মতো বড় বড় চোখ হয়েছে ছেলেটির।

জহুর ভাই, আপনি বসেন। এই চেয়ারটায় বসেন।

জহুর বসল না। হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবেই বলে ফেলল, ভাবি, আমি একটা কথা জানতে এলাম। আপনার মনে কি আমাকে নিয়ে কোনো সন্দেহ আছে ? আপনি কি কোনো দিন ভেবেছেন আমি এই কাজটা করেছি ?

মিনু ভাবি কঠিন স্বরে বললেন, ছিঃ জহুর ভাই, ছিঃ! আপনি এত ছোট ভাবলেন ?

জহুর ক্লান্ত স্বরে বলল, জেলখানাতে আমার একটা কষ্টই ছিল। আমি শুধু ভাবতাম, আপনি কি বিশ্বাস করেছেন আমি এই কাজটা করেছি ?

মিনু লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল। জহুর দেখল, মিনু ভাবির চেহারায় বয়সের ছাপ পড়েনি। শুধু মাথার ঘন চুল একটু যেন পাতলা হয়েছে। কপালটা অনেকখানি বড় দেখাচ্ছে। গায়ের রঙটাও যেন একটু ফর্সা হয়েছে। বয়স বাড়লে গায়ের রঙ ফর্সা হয় না কি, কে জানে ?

জহুর ভাই, আপনি বসেন।

জহুর বসল। মিনু চলে গেল ভেতরে। শুধু ছেলেটি ঘুরঘুর করতে লাগল। মনে হয় গল্পটল্প করতে চায়। জহুরের কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে শুধু তাকিয়ে রইল। ভেতরে টুনটুন শব্দ হচ্ছে। চা বোধহয়। চা এবং হালুয়া। জহুরের মনে হলো, সে অনন্তকাল ধরে এ বাড়ির কালো কাঠের চেয়ারে বসে আছে।

দবির মিয়া চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে তার দোকানে চলে গেল। সেখানেও বেশিক্ষণ বসল না, গেল থানায়। ওসি সাহেব ডিউটিতে ছিলেন না। সেকেন্ড অফিসার অত্যন্ত অমায়িক ভঙ্গিতে তাকে বসতে বললেন। চায়ের ফরমাস করলেন।

জি-না, চা খাব না।

আরে ভাই খান। ওসি সাহেব আপনাকে ডাকবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলেন। এসে ভালোই করেছেন।

ডেডবডির ব্যাপারে খোঁজ নিতে আসলাম। ওসি সাহেব সকালে আসতে বলেছিলেন।

ডেডবডি তো রাতেই পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠানো হয়েছে।

দবির মিয়া কিছু বলল না। সেকেন্ড অফিসার বললেন, বুঝলেন ভাই, রাত্রে ঘুমাচ্ছিলাম। যখন বলল মনসুর কেমন-কেমন করে যেন শ্বাস নিচ্ছে, তখনই বুঝলাম অবস্থা খারাপ।

ডাক্তার ডাকিয়েছিলেন ?

আরে, ডাক্তার ডাকব না ? বলেন কী আপনি! পুলিশের চাকরি করি বলেই কি অমানুষ হয়ে গেলাম না কি! ওসি সাহেব নিজে গিয়ে দুধ গরম করে আনলেন।

ডাক্তার এসেছিল ?

বললাম তো ভাই এসেছিল। আর আপনি যা ভাবছেন, পিটিয়ে মেরে ফেলেছি আমরা, সেটাও ঠিক না। মারধোর হয়, কিন্তু মানুষ মেরে ফেলবার মতো মারধোর কি করা যায় না কি ? থানা কম্পাউন্ডের মধ্যে ফ্যামিলি নিয়ে থাকি। ছেলেপুলে আছে। এর মধ্যে এরকম একটা কাণ্ড কি করা যায় ? আপনিই বলেন।

তাহলে লোকটা মরল কীভাবে ?

ভয়ে। স্রেফ ভয়ে, আর কিছু না। এখন যদি পাবলিক হৈচৈ শুরু করে, তাহলেই মুশকিল। পুলিশ সম্পর্কে পাবলিকের ধারণা খারাপ। এই যে মুক্তিযুদ্ধে এতগুলো পুলিশ আমরা মারা গেলাম— কেউ মনে রাখছে সে-কথা, বলেন ? মিলিটারি অফিসার যে ক'জন মারা গেছে পুলিশ অফিসার মারা গেছে তার চার গুণ। সেইসব কথা আর কারো মনে নেই। ঠিক বলেছি কি না বলেন ?

দবির মিয়া জবাব দিল না।

এই জন্যেই ওসি সাহেব আপনাকে খবর পাঠিয়েছেন, পাবলিক যাতে হৈচৈ শুরু না করে।

আর এইখানে কী করার আছে ? কী বলছেন এইসব!

সেকেন্ড অফিসার হাসিমুখে বললেন, আপনি বলবেন মনসুর মিয়া চুরির মধ্যে ছিল। তার জন্যেই চুরি হচ্ছিল এত দিন।

কী বলছেন এইসব ?

চোর-ডাকাতের জন্যে মানুষের কোনো সিমপ্যাথি নেই। চোর-ডাকাত শেষ হলেই পাবলিক খুশি।

আমি একটা নিরপরাধ মানুষকে চোর বলব!

নিরপরাধ, বুঝলেন কী করে ? ব্যাটা শুধু চুরি না, ডাকাতির মধ্যেও ছিল।

প্রমাণ আছে রে ভাই। বিনা প্রমাণে তো বলছি না। মারাত্মক শয়তান লোক, এতদিন টের পাননি।

দবির মিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সেকেন্ড অফিসার সাহেব বললেন, চা খান, ঠান্ডা হচ্ছে। চিনি ঠিক হয়েছে কি না দেখেন তো। এরা চিনি দিয়ে একেবারে শরবত বানিয়ে রাখে। এককাপ চায়ে এক পোয়া চিনি দেয়। মনে করে মিষ্টি দিলেই চা ভালো হয়।

সাইফুল ইসলামের রাতে ভালো ঘুম হয় না।

তার ঘরটি ছোট। একটিমাত্র জানালা, তাও বন্ধ করে রাখতে হয়। কারণ জানালার ওপাশে মুনশি সাহেব গরুর গোবর পচাবার ব্যবস্থা করেছেন। জানালা খোলা থাকলে পচা গোবরের গন্ধ বুকের ওপর চাপ হয়ে থাকে। সাইফুল ইসলাম বন্ধ ঘরের গরমে হাঁসফাঁস করে। অর্ধেক রাত পর্যন্ত তালপাতার পাখায় হাওয়া খায়। দু-তিন বার বাইরের মাঠের একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে বসে থাকে। বসে থাকতে থাকতে যখন ঘুমে চোখ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, তখন শুতে যায়। প্রচণ্ড ভ্যাপসা গরমে ঘুম চটে যায়। তালপাখা দ্রুত নাড়াতে নাড়াতে ভাবে— এই জায়গায় থাকা যায় না। খোলামেলা একটা জায়গা নিতে হবে।

অবশ্য সে সম্ভাবনা ক্ষীণ। মুনশি সাহেবের এই ঘরটায় সে বিনা ভাড়ায় থাকতে পারে। তার বদলে মুনশি সাহেবের একটি নাতিকে পড়াতে হয়। নাতিটির নাম বজলুর রশিদ। পড়াশোনায় কোনো মন নেই। কিছু বললেই বিকট সুরে চিৎকার করে। সে চিৎকারে আশেপাশে ভূমিকম্প হয়ে যায়। ছেলেটির মা পর্দার আড়াল থেকে চিকন সুরে বলে, কী হয়েছে রে বজলু?

আমারে মারছে।

বজলুর মার চিকন গলা আরো চিকন হয়ে যায়, মাস্টার সাব, পুলাপান মানুষরে মাইরধোইর কইরেন না।

সাইফুল ইসলাম প্রতিবারই বলে, জি-না, মারি নাই। মারব কেন?

কিন্তু ছেলেটির মা বিশ্বাস করে না। কারণ সে দীর্ঘ সময় পর্দায় আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকে। পর্দার নিচ দিয়ে তার ফর্সা পা দেখা যায়। এরকম ফর্সা পা সাইফুল ইসলাম আর দেখেনি। ছেলেটি অবশ্য তার মার মতো হয়নি। শ্যামলা রঙ। দাঁতগুলো বের হয়ে আছে। কে জানে তার মার দাঁতও উঁচু কি না! উঁচু হওয়াই স্বাভাবিক। এমন টকটকে যার গায়ের রঙ, তার কোনো খুঁত না থাকলে হয় না। মেয়েদের সঙ্গে থেকে থেকে সে এইসব জিনিস খুব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শিখেছে। সে দেখেছে খুব ফর্সা মেয়ের ঠোঁটের কাছে অস্পষ্ট একটা গোঁফের রেখা থাকে, পায়ের লোমগুলো হয় বড় বড়। ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের এক শালিকে সে গান শেখাত। সে মেয়েটি ছিল অসম্ভব ফর্সা। কিন্তু বড় বড় কুৎসিত লোম ছিল পায়ে। লোমগুলো

লালচে ধরনের। বাদামিও হতে পারে। ভালো মতো লক্ষ করা যায়নি। মেয়েটি ঝট করে শাড়ি টেনে দিয়েছে। মেয়েদের বোধহয় ঘাড়ের কাছে অদৃশ্য এক জোড়া চোখ থাকে। মাথা না ঘুরিয়েও অনেক কিছু টের পায়।

লোম থাকুক আর যাই থাকুক, ফর্সা মেয়েদের সাইফুল ইসলামের বড় ভালো লাগে। সার্কেল অফিসার সাহেবের ছোট মেয়েটিও ফর্সা। তাকেও সাইফুল ইসলামের ভালো লাগে।

যেসব রাত্রিতে তার ঘুম আসে না, সেসব রাত্রিতে সে ধবধবে ফর্সা কোনো একটা মেয়ের কথা চিন্তা করে— যার গায়ের চামড়া অসম্ভব মসৃণ। যেন সেই মেয়েটি পাতলা একটা শাড়ি (হলুদ বা কমলা রঙের) পরে রাতে ঘুমাতে এসেছে। সাইফুল ইসলাম বলল, এত সকাল ঘুমাও কেন গো, একটু চা-টা করো না।

চা খেলে তো তোমার ঘুম আসবে না।

না আসুক, করো একটু।

মেয়েটি হাসিমুখে চা বানিয়ে আনল। রাগ করে (কপট রাগ) বলল, চা খাওয়াটা কমাও, বড় বেশি চা খাও তুমি, ভালো না। এই গরমে কেউ চা খায়! আমি তো সেদ্ধ হয়ে গেলাম।

সাইফুল ইসলাম রহস্য করে বলল, বেশি গরম লাগলে কাপড় খুলে ফেললেই হয়, হা... হা... হা...।

ছিঃ, কী অসভ্যতা যে করো! ভাল্লাগে না।

অসভ্যতা কী করলাম, কেউ তো দেখতে আসছে না।

মেয়েটি তখন সত্যি রাগ করে ঘুমাতে গেল। সাইফুল ইসলাম চা শেষ করে মশারির ভেতর ঢুকে দেখে, মেয়েটি কাপড়চোপড় খুলেই শুয়েছে।

গত দু-তিন রাত সে এই জাতীয় কিছুই ভাবতে পারছে না। বারবার থানার পাশ দিয়ে আসবার সময় শোনা বীভৎস চিৎকার মনে আসছে। চিৎকার যে এত কুৎসিত হয়, কে জানত!

তার জানতে ইচ্ছা করে চিৎকারটা দিয়েই লোকটা মরল কি না। লোকটা অবশ্য মস্ত চোর ছিল। বাজারের চুরিগুলো সে-ই করিয়েছে। দবির মিয়া বলেছে, তার জিনিসপত্র কিছু কিছু পুলিশ উদ্ধার করেছে। চোর-ডাকাত যত কমে ততই ভালো। থানায় দু-একটা চোর-ডাকাত মারা পড়ার ভালো দিক আছে। চোর-ডাকাত সতর্ক হয়ে যায়। ওসি সাহেব খুব কড়া লোক, এইটা প্রচার হয়। কিন্তু তবু সাইফুল ইসলাম চিৎকারটার কথা ভুলতে পারে না। সে এক রাত্রে হাতের লেখাটা অন্যরকম করে নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেবকে একটা সুদীর্ঘ চিঠি লিখে ফেলে। চিঠির বক্তব্য হচ্ছে, মানুষকে পিটিয়ে মারা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। তার জন্য তাকে অবশ্যই শাস্তি ভোগ করতে হবে, ইত্যাদি। চিঠির শেষে নাম লেখে 'জনৈক পথিক।'

চিঠিটা সে অবশ্য পাঠানোর জন্যে লেখেনি। এরকম চিঠি সে তার ছাত্রীদের প্রায়ই লেখে এবং কখনো পাঠায় না। কারণ সুদীর্ঘ সেইসব চিঠির প্রায় সবটাই সীমাহীন অশ্লীলতা। পাঠানোর প্রশ্নই ওঠে না। ওসি সাহেবের চিঠিতেও খানিকটা অশ্লীলতা ছিল। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় সে লিখেছে কী করে ওসি সাহেবকে খাসি করা হবে এবং বিচি দু'টি ফেলে দিয়ে রসুনের কোয়া ভরে দেওয়া হবে।

না পাঠানোর জন্যে লেখা হলেও শেষপর্যন্ত চিঠিটা পাঠিয়ে দিল। অনিদ্রা রোগটা তার খুব বাড়ল তার পরপরই। থানার পাশ দিয়ে সে হাঁটা ছেড়ে দিল।

পঞ্চম দিনে ওসি সাহেব লোক পাঠিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। এবং অত্যন্ত গম্ভীর মুখে বললেন, কি, আপনাকে তো আজকাল দেখিই না ?

সাইফুল ইসলাম ঢোঁক গিলল।

তা আছেন কেমন ?

জি, ভালো।

এসপি সাহেব আসছেন ময়মনসিংহ থেকে। একটা আসামি যে মারা গেছে সেই তদন্তে।

সাইফুল ইসলাম ছাইবর্ণ হয়ে গেল।

এসপি সাহেব আবার গান-বাজনার খুব সমঝদার। একটু গান-বাজনার ব্যবস্থা করতে পারবেন ?

জি, জি, তা তা...

দেখেন যদি পারেন। এই শহরে আপনি ছাড়া আর কেউ তো নেই। এই এনাকে চা-মিষ্টি দে।

মাঝরাতে হঠাৎ করে বৃষ্টি নামল। জহুর বিছানা টেনেটুনে একপাশে নিয়ে এলো। তাতেও শেষরক্ষা হলো না। তোষকের অনেকখানি ভিজে চুপসে গেল। মশারি উড়তে লাগল নৌকার পালের মতো। বাড়ির লোকজনদের না জাগিয়ে ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। জহুরের কাউকে ডাকতে ইচ্ছে হচ্ছিল না। যে-রকম বাতাস হচ্ছে, এমনিতেই কারো-না-কারো ঘুম ভাঙবে।

ঘুম অবশ্য ভাঙল না। জহুর পা গুটিয়ে বেঞ্চির ওপর বসে বৃষ্টি দেখতে লাগল। তার সিগারেট ধরাবার ইচ্ছা করছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেলে আগুনের স্পর্শের জন্যে মন কাঁদে। সিগারেট নেই, শেষ সিগারেটটি ঘুমাবার আগে ধরিয়েছে। এরকম একটি ঝড়-বাদলের রাত একা-একা জেগে কাটানো কষ্টকর। জহুরের শীত লাগছিল। গায়ে দেবার কিছু নেই। চাদরটি ভিজে ন্যাতান্যাতা।

মামা।

জহুর চমকে উঠে দেখল, কোনোরকম শব্দ না করে অঞ্জু দরজা খুলে বারান্দায়

এসে দাঁড়িয়েছে। বাতাসে তার লম্বা চুল উড়ছে। অঞ্জুর চুল যে এত লম্বা, সে আগে লক্ষ করে নি। জহুর বলল, ভালো বর্ষণ শুরু হয়েছে দেখলি ?

তুমি ডাকলে না কেন আমাদের ?

তোরা নিজে থেকে উঠবি, তাই ভেবে ডাকিনি।

অঞ্জু ভারি স্বরে বলল, তুমি এমন ভাব করো, যেন তুমি বেড়াতে এসেছ আমাদের এখানে।

জহুর জবাব দিল না। অঞ্জু বলল, ছোটমা'র সঙ্গেও তুমি বেশি কথা বলো না। শুধু হাঁ-হাঁ করো। ছোটমা'র ধারণা তুমি তাকে দেখতে পারো না।

দেখতে পারব না কেন ?

অঞ্জু বেঞ্চির একপাশে বসল। জহুর বলল, বসলি কেন ? ঘুমাতে যা।

তোমার সঙ্গে বসে একটু বৃষ্টি দেখি।

ঘরের ভেতরে বাবলু জেগে উঠে চেঁচাতে শুরু করেছে। দবির মিয়া চাপা গলায় কী একটা বলল। বাবলুর চিৎকার আরো তীক্ষ্ণ ও তীব্র হলো। প্রচণ্ড একটা চড় কষাল দবির মিয়া। মুহূর্তে সব চিৎকার-চেঁচামেচি থেমে গেল। শুনশান নীরবতা। জহুর বলল, ঘুমাতে যা।

আরেকটু বসি।

দুলাভাইয়ের সিগারেটের প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট এনে দে।

অঞ্জু উঠে চলে গেল। সিগারেট নিয়ে চলে এলো সঙ্গে সঙ্গে। তার পিছে পিছে এল বাবলু। জহুর অবাক হয়ে বলল, কী রে বাবলু ? কী হয়েছে ?

ঘুম আসে না, ভয় লাগে।

ভয়ের কী আছে ?

বাবলু উত্তর না দিয়ে বয়স্ক লোকের মতো গম্ভীর হয়ে বসল বেঞ্চিতে। জহুর হাসিমুখে বলল, বাবলু, বৃষ্টিতে ভিজে যাবি।

বাবলু সে কথারও উত্তর দিল না। সে খুব স্বল্পভাষী।

অঞ্জু বলল, টুনী আপার বিয়েটা ভেঙে গেছে, তুমি শুনেছ নাকি মামা ?

না তো! কী জন্যে ভাঙল ?

তা জানি না। বাবা তো কাউকে কিছু বলে না।

বৃষ্টির বেগ খুবই বাড়ল। জহুর দেখল, বাবলু ঠেস দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। অঞ্জু ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বলল, মেয়ে হয়ে জন্মালে খুব মুশকিল।

মুশকিল কেন ?

অঞ্জু জবাব দিল না।

বাবলুকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়।

অঞ্জু উঠে বাবলুকে কোলে নিয়ে বসল। হালকা গলায় বলল, টুনী আপা আজ সারা দুপুর কেঁদেছে।

কেন ? আমি তো জানতাম ছেলে তার পছন্দ হয়নি।

তা হয়নি।

তবে কান্নাকাটি কী জন্যে ?

অঞ্জু জবাব দিল না। প্রচণ্ড শব্দে বাজ পড়ল। বাতাসের বেগ বাড়তে লাগল। অঞ্জু অস্পষ্টস্বরে বলল, মামা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

কী কথা ?

তুমি নাকি বলেছিলে, জেল থেকে ফিরে এসে চৌধুরী সাহেবকে খুন করবে ?

মনে নেই, বলতে পারি।

সত্যি সত্যি করবে না নিশ্চয়ই ?

জহুর জবাব না দিয়ে সিগারেট ধরাল। ঘরের মধ্যে এবার বাহাদুরের চিৎকার এবং দবির মিয়ার গর্জন শোনা যেতে লাগল, হারামজাদাদের যন্ত্রণায় শান্তিতে ঘুমানোর উপায় নেই। সব ক'টাকে কচুকাটা করা দরকার।

মামা।

উঁ।

তুমি না কি বদি চাচার বাসায় গিয়েছিলে ?

জহুর খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কার কাছ থেকে শুনলি ?

বাবা বলছিল ছোটমা'কে। আড়াল থেকে শুনে ফেললাম।

জহুর চুপ করে গেল।

গিয়েছিলে না কি মামা ?

হুঁ।

ওদের ছেলেটাকে দেখেছ ? খুব সুন্দর না ?

হুঁ।

খুব কিন্তু পাজি। দেখলে বোঝা যায় না। বিচ্ছু একেবারে।

এশার নামাজের পর চৌধুরী সাহেব বাড়ি ফিরবার সময় লক্ষ করলেন, জহুর হনহন করে বাজারের দিকে যাচ্ছে। চৌধুরী সাহেব গলা খাঁকারি দিলেন। জহুর তাঁর দিকে তাকাল, কিন্তু থামল না। যেমন যাচ্ছিল, তেমনি যেতে লাগল। তিনি ডাকলেন, এই যে, জহুর না ?

জহুর দাঁড়াল।

তোমার দুলাভাইয়ের সঙ্গে একটা জরুরি কথা ছিল।

বলব তাঁকে।

জহুর আর দাঁড়াল না। চৌধুরী সাহেব হাঁটতে শুরু করলেন। জহুরের ভাবভঙ্গি তাঁর মোটেও ভালো লাগে না। এইসব ভালো লক্ষণ নয়। তিনি জহুর কী করছে না-করছে, সে সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর নিয়েছেন। কিছুই করছে না। ঘরেই বসে সময় কাটাচ্ছে। কোনো মতলব পাকাচ্ছে নিশ্চয়ই। তাঁর নিজের কোনো ঝামেলায় জড়াতে এখন আর ইচ্ছা করছে না। বয়স হয়ে গেছে। শান্তিতে সময় কাটাতে ইচ্ছা হয়।

চৌধুরী সাহেব বাড়ির কাছে এসে দেখেন, সাইফুল ইসলাম গেটের কাছে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে।

স্লামালাইকুম চৌধুরী সাব।

ওলায়কুম সালাম। কী ব্যাপার?

আপনারে একটা কথা বলতে এসেছি, চৌধুরী সাব।

বলো।

শুনেছেন বোধহয় এসপি সাব আসতেছেন তদন্তে।

হ্যাঁ, জানি।

এসপি সাবের সাথে একটা কথা বলতে চাই চৌধুরী সাব।

বলতে চাইলে বলো। আমাকে বলছো কেন?

জি?

আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন?

সাইফুল ইসলাম হাত কচলাতে লাগল।

কী বিষয়ে কথা বলতে চাও?

অ্যাঁই ইয়ে... আপনার গান-বাজনা নিয়ে। এসপি সাবে গান-বাজনার খুব সমঝদার।

তোমার কথাবার্তা বুঝতে পারছি না। ব্যাপারটা কী?

সাইফুল ইসলাম আমতা-আমতা করতে লাগল। চৌধুরী সাহেব গম্ভীর গলায় বললেন, ভেতরের কথাটা কী বলো তো।

সাইফুল ইসলাম রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে মুছতে বলল, থানাওয়ালারা লোকটারে খুন করেছে চৌধুরী সাব।

বলছে কে তোমাকে?

সাইফুল ইসলাম জবাব দিল না।

জহুর বলছে নিশ্চয়ই। শোনো সাইফুল ইসলাম, তুমি বিদেশী মানুষ, কিছু জানো-টানো না। জহুরের স্বভাব-চরিত্র তুমি জানো না। সে যে খুন করেছিল সেইটা জানো?

জি শুনছি।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কমান্ডার আছিল, অনেক কাজ-কারবার করছে, বুঝলে ? ডেঞ্জারাস লোক। যে যেটা বলে, সেটাই বিশ্বাস করতে হয় না। চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। চিন্তা-ভাবনা করবার জন্যে আল্লাহ একটা মাথা দিয়েছে। বুঝলে ?

চৌধুরী সাহেব হাঁপাতে লাগলেন। হঠাৎ করেই মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে শুরু করেছে। সাইফুল ইসলাম বলল, জহুর ভাই আমাকে কিছু বলেন নাই।

চৌধুরী সাহেব চোখ লাল করে তাকালেন।

বিষয়টা আমার নিজের মনে আসল।

নিজের মনে আসল ?

জি ?

কী করতে চাও তুমি ?

সাইফুল ইসলাম রুমাল দিয়ে ঘনঘন নাক মুছতে লাগল।

কী করতে চাও তুমি ?

কিছু করতে চাই না চৌধুরী সাব।

তাহলে খামোকা বকবক করছো কী জন্যে ?

সাইফুল ইসলাম খকখক করে কাশতে লাগল।

যাও আমার সামনে থেকে।

সাইফুল ইসলাম অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকল।

চৌধুরী সাহেবের ধৈর্যচ্যুতি হলো। তিনি প্রচণ্ড একটা চিৎকার করলেন, যাও ভাগো!

সাইফুল ইসলাম তাড়াতাড়ি পা ফেলতে গিয়ে বড় রকমের হোঁচট খেল।

নবীনগর থেকে মনসুরের বাবা এসে হাজির। বরকত আলি। দবির মিয়ার ধারণা ছিল, মনসুরের নিকটআত্মীয় কেউ নেই। মনসুর প্রায়ই বলত, একলা মানুষ আমি, একটা মোটে পেট। কিন্তু মনসুরের বাবার কাছে জানা গেল— মনসুরের পাঁচ বছর বয়সের একটা ছেলে আছে। ছেলেটা তার নানাবাড়ি থাকে। তার মা'র বিয়ে হয়ে গেছে অন্য জায়গায়। দবির মিয়া শুকনো গলায় বলল, আপনি কী করেন ?

কিছু করি না জনাব। সামান্য জমিজিরাত আছে। টুকটাক ব্যবসা আছে।

দবির মিয়া দেখল বরকত আলির মধ্যে একটা সচ্ছল ভাব আছে। গায়ের নীল রঙের পাঞ্জাবিটা বেশ পরিষ্কার। পায়ে স্যান্ডেল।

কিসের ব্যবসা আপনার ?

ওষুদের। আমার একটা কানপাকার ওষুধ আছে। চালু ওষুধ।

নিজের আবিষ্কার ?

জি না, আমার আব্বাজানের। হেকিম শরিয়ত আলির।

দবির মিয়া ঈষৎ কৌতূহলী হয়। বাবলুর কানপাকার ঝামেলা আছে। ঠান্ডা লাগলেই তার কান দিয়ে পুঁজ পড়ে।

ওষুধ কী রকম ?

ভালো ওষুধ, খুব চালু।

বরকত আলি তার চামড়ার ব্যাগ খুলে ফেলল। ব্যাগভর্তি ছোটছোট শিশি। শিশিতে সবুজাভ একটি তরল পদার্থ। সঙ্গে ছাপানো হ্যান্ডবিল আছে শরিয়ত আলির স্বপ্নপ্রাপ্ত কর্ণশুদ্ধি আরক।

কত করে ?

দামটা একটু বেশি। পাঁচ টেকা! আপনে একটা ফাইল রাখেন। টেকা লাগব না।

দবির মিয়া চা আনতে লোক পাঠান। বরকত আলিকে তার ছেলের ব্যাপারে মোটেই বিচলিত মনে হলো না। চা খেতে খেতে বলল, কর্মফল, বুঝলেন ভাইসাব ? ছেলেটারে কত কইলাম ব্যবসাপাতি দেখ। সূতিকা রোগের একটা ওষুধ আছিল, একটা আছিল বাতের, 'বাতনাশক কালো বড়ি।' কিছুই শুনল না। মাথা খারাপ ছোট বয়স থেকেই।

ছেলের মরার খবর পেয়েছেন কবে ?

বিষ্যুত বারে।

কে দিল খবর ?

লোকের মুখে শুনলাম। খুব আফসোসের কথা।

হুঁ।

তা শুনলাম, ওসি সাহেব দশ হাজার টেকা দিবে ক্ষতিপূরণ। ক্ষতিপূরণ টেকায় তো হয় না। তা কী করা বলেন ?

ক্ষতিপূরণের কথাটা শুনলেন কোথায় ?

লোকজনের মুখে শোনা। কথাটা কি সত্যি ?

আমি জানি না। আপনি দেখেন খোঁজ নিয়ে।

আপনারে সাথে নিয়া একটু যাইতে চাই।

দবির মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, যান, আপনে একাই যান।

কয়েকটা দিন আপনার এইখানে থাকা লাগতে পারে। আপনার কোনো অসুবিধা নাই তো জনাব ?

না, অসুবিধা নাই। মনসুর আপনার ছেলে তো ?

জি, প্রথম পক্ষের সন্তান। অজুর পানি কই পাওয়া যায়, আছরের নামাজের সময় হইছে মনে হয়।

দবির মিয়া তাকে মসজিদটা দেখিয়ে দিল। ঠান্ডা গলায় বলল, জুম্মাঘরের গোরস্তানে মনসুরের কবর আছে। বললে ওরা দেখিয়ে দেবে।

বরকত আলিকে ছেলের ব্যাপারে খুব একটা চিন্তিত বলে মনে হলো না। সে কালো ব্যাগ হাতে নিয়ে বাজারের রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করল। নান্টুর দোকানে চা খেল। বিকালের ট্রেনে বরফ বোঝাই বাক্সে যেসব মাছ যায় সেসব মাছ দর-দাম করল। নীলগঞ্জ শহরে একটা হেকিমি ওষুধের দোকান চলবে কি না, সেই সম্পর্কে খোঁজ-খবর করল।

ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল মাগরেবের নামাজের পর। ওসি সাহেব ছিলেন না। সেকেন্ড অফিসার তাকে বিশেষ সমাদর করলেন। নান্টুর দোকান থেকে পিঁয়াজু এনে খাওয়ালেন। নগদ পয়সা দিয়ে দু'ফাইল 'শরিয়ত আলির স্বপ্নপ্রাপ্ত কর্ণশুদ্ধি আরক' কিনে রাখলেন। বরকত আলি অভিভূত হয়ে পড়ল। চারপাশে এমন সব হামদর্দি লোকজন! আজকালকার যুগে এমন দেখা যায় না।

দবির মিয়া বিছানায় শোওয়ামাত্র ঘুমিয়ে পড়তে পারে। আজ রাতে নিয়মের ব্যতিক্রম হলো। বিছানায় গড়াগড়ি করতে করতে রাত দু'টা বাজল— ঘুম এলো না। তার পাশে অনুফা ঘুমাচ্ছে মড়ার মতো। মরেই গেছে কি না, কে জানে। শ্বাস ফেলার শব্দ পর্যন্ত নেই। দবির মিয়া চাপা স্বরে বলল, অ্যাই, অ্যাই। কোনো সাড়া নেই। মেয়েরা বড় হয়েছে। এখন আর মাঝরাতে স্ত্রীকে ঘুম থেকে ডেকে ডেকে তোলা যায় না। মেয়েরা শুনে কী-না-কী ভেবে বসবে। দবির মিয়া অনুফাকে বড় কয়েকটি ঝাঁকুনি দিল। অনুফা বিড়বিড় করে পাশ ফিরল। তার ঘুম ভাঙল না। দবির মিয়া বিছানা ছাড়ল রাত দু'টার দিকে। শুয়ে থাকার কোনো মানে হয় না। যে-কোনো কারণেই হোক ঘুম চটে গেছে। সে কলতলায় পরপর দু'টি সিগারেট শেষ করল। বাইরে উথালপাথাল হাওয়া। খালি গায়ে থাকার জন্যে শীত-শীত করছে। এরকম হাওয়ায় বারান্দায় বিছানা পেতে জহুর ঘুমায় কী করে কে জানে? দিনকাল ভালো না। এরকম খোলামেলাভাবে বারান্দায় ঘুমানো ঠিক না। জহুরের শত্রুর তো অভাব নেই। কিন্তু জহুর যেটা মনে করবে, সেটাই করবে। অন্যের কথা শুনলে কি আর আজ এই অবস্থা হয়? দবির মিয়া আরেকটি সিগারেট ধরাল।

জহুরের ব্যাপারে কিছু একটা করা দরকার, কিন্তু করবেটা কী? একটা লঞ্চের যোগাড় দেখার কথা ছিল, সেটা সম্ভব না। একা-একা লঞ্চ কেনা তার পক্ষে সম্ভব না। সফদর শেখের সঙ্গে কথা হয়েছিল, সে টাকা দিতে রাজি, কিন্তু জহুরকে রাখতে রাজি না।

বুঝেন তো দবির ভাই, নানান লোকে নানান কথা বলবে।

কী কথা বলবে ?

সফদর শেখ তা আর পরিষ্কার করে বলে না, দাড়ি চুলকায়।

জহুর একটা নির্দোষ লোক, সেইটা জানেন আপনি সফদর সাব ?

আরে ছিঃ, ছিঃ, তা জানব না কেন ? আমি কত আফসোস করলাম। এখনো করি।

দবির মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, আফসোসে কোনো ফয়দা হয় না।

ফয়দা হয় না ঠিকই, তবু আফসোস থাকাটা ভালো। লোকজনের তো আফসোস পর্যন্ত নাই। এই যে ছেলেটা আসল, কেউ কি বাড়িতে এসে ভালো-মন্দ কিছু বলেছে ? না, বলে নাই। মানুষের কিছুই মনে থাকে না। চৌধুরী সাহেব তো ভালোমতোই আছেন। কয়েক দিন আগে ডিগ্রি কলেজের জন্যে অনেকখানি জমি দিলেন। নিজের পয়সায় গার্লস স্কুলের একটা হোস্টেল তৈরি করে দিলেন। বিরাট হুলস্থুল। ময়মনসিংহের ডিসি সাহেব আসলেন। কত বড় বড় কথা; কর্মযোগী, নীরব সাধক, নিবেদিতপ্রাণ...। ধুর শালা!

দবির মিয়া কলতলা থেকে উঠে এসে বারান্দায় বসল। জহুরকে কিছু একটাতে লাগিয়ে দেওয়া দরকার। বিয়ে-শাদি দেওয়া দরকার। বিয়ে দেওয়াটাও তো মুশকিল। কে মেয়ে দেবে ? দেশে মেয়ের অভাব নেই। কিন্তু খুন করে ছ'সাত বছর জেল খেটে যে-ছেলে এসেছে, তার জন্য মেয়ে নেই। চৌধুরী সাহেব অবশ্য একটি মেয়ের কথা বলেন। সম্পর্কে তাঁর ভাতিজি। মেয়েটিকে দেখেছে দবির মিয়া। শ্যামলা রঙ, বেশ লম্বা। দেখতে-শুনতে ভালোই। কিন্তু জহুরকে বলারই তার সাহস হয় না। পুরনো কথা সব ভুলে গিয়ে নতুন করে সব কিছু শুরু করাই ভালো। বরফের মেশিনে ম্যানেজারির চাকরিটা নিয়ে নিলে মন্দ কী ?

বাহাদুর জেগে উঠেছে। বিকট চিৎকার শুরু করেছে অভ্যাস মতো। দবির মিয়া নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে প্রচণ্ড একটা চড় কষাল। কান্না থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। অনুফা বলল, কেন বাচ্চা দুইটারে মারো ? দবির মিয়া উত্তর দিল না।

বাচ্চা দুইটা তোমারে যমের মতো ডরায়।

দবির মিয়া তারও উত্তর দিল না। আবার বাইরে গিয়ে বসল। তৃতীয় সিগারেট ধরিয়ে দবির মিয়া কাশতে লাগল। নাহ্, আবার বিয়ে করাটা ভুল হয়েছে। মস্ত বোকামি। অনুফার আগের পক্ষের ছেলে দুটি তার বাপের কাছে থাকবে, এ-রকম কথা ছিল। কিন্তু সাতদিন পার না হতেই বাবলু আর বাহাদুর এসে হাজির। তারা কাউকে কিছু না বলে আট মাইল রাস্তা হেঁটে চলে এসেছে। তাদের দুজনকে পাওয়া গেল নীলগঞ্জের বাজারে। কোথায় কার বাড়ি যাবে কিছু বলতে পারে না। শুধু জানে নীলগঞ্জে তাদের মা থাকে। দুটি যমজ ছেলে নিমাইয়ের মিষ্টির দোকানে বসে কাঁদছে শুনে দবির মিয়া কৌতূহলী হয়ে দেখতে গেছে। তারপর মুখ গম্ভীর করে বাড়ি নিয়ে এসেছে। বাচ্চা দুটি খালি হাতে আসে নি, প্যান্টের পকেট ভর্তি করে তাদের

মায়ের জন্যে কাঁচামিঠা আম নিয়ে এসেছে।

ছেলে দুটি বিচ্ছু। মহাবিচ্ছু। তাদের নানা খবর পেয়ে এসে নিয়ে গিয়েছিল। তিনদিন পরই রাত ন'টায় দু'মূর্তি এসে হাজির। দবির মিয়া তক্ষুনি ফেরত পাঠাবার জন্যে ব্যবস্থা করল। বাদ সাধল টুনী।

না বাবা, থাকুক।

থাকুক মানে ?

দবির মিয়ার বিরক্তির সীমা রইল না।

থাকার জায়গাটা কোথায় ?

জায়গা না থাকলেও থাকবে। মাকে ছাড়া থাকতে পারে!

ধামড়া ধামড়া ছেলে, মাকে ছাড়া থাকতে পারে না— একটা কথা হলো!

দবির মিয়া মহাবিরক্ত হলো। কী যন্ত্রণা! বিরক্তির সঙ্গে-সঙ্গে টুনীর সাহস দেখেও সে অবাক হলো। বাপের মুখে-মুখে কথা বলে, বেয়াদবির একটা সীমা থাকা দরকার।

দবির মিয়া ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। খুট করে শব্দ হলো একটা। দবির মিয়া ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল, বাবলু বের হয়ে আসছে।

কী চাস তুই ?

পেশাব করব।

শোয়ার আগে সারতে পারিস না ? বাঁদর কোথাকার। এক চড় দিয়ে দাঁত সবগুলো ফেলে দেব।

বাবলু বারান্দার এক কোণে প্যান্ট খুলে বসে রইল। দবির মিয়া আড়চোখে দেখল, বাবলু ভীত চোখে বারবার দবির মিয়ার দিকে তাকাচ্ছে।

বারান্দায় বসে পেশাব করতে নিষেধ করি নাই ?

বাবলু পাংশু মুখে উঠে দাঁড়াল।

পেশাব শেষ হয়েছে ?

না।

বাবলু আবার বসল। দবির মিয়া বলল, স্কুলে যাস তো রোজ ?

যাই।

পড়াশোনা করিস তো ঠিকমতো ?

হুঁ।

হুঁ আবার কী ? বল জি।

জি।

পড়াশোনাটা ঠিকমতো করা দরকার।

বাবলু ঘরের দিকে যাচ্ছিল। দবির মিয়া হঠাৎ কী মনে করে মৃদুস্বরে বলল, এই বাবলু, বস দেখি এখানে।

বাবলু অবাক হয়ে পাশে এসে বসল।

কিচ্ছা শুনবি নাকি একটা ? পিঠাপুলি রাক্ষসের কিচ্ছা ?

স্তম্ভিত বাবলু কোনো উত্তর দিল না।

তুই আমারে ডরাস নি ?

হুঁ।

হুঁ কীরে ব্যাটা ? বল জি।

জি।

ডরাইস না। ডরের কিছু নাই। কিচ্ছা শুনবি ?

হুঁ।

আবার হুঁ।

জি।

দবির মিয়া পিঠাপুলি রাক্ষসের কিচ্ছা শুরু করে।

অনুফা ঘুম ভেঙে অবাক হয়ে দেখল— দবির মিয়া মৃদুস্বরে বাবলুকে কী যেন বলছে। গল্প নাকি ? তার চার বছরের বিবাহিত জীবনে এমন অদ্ভুত ঘটনা সে দেখে নি।

সাইফুল ইসলাম ভোরবেলা গলা সাধে। তার গলা ভালো। গানের মাস্টারদের মতো কর্কশ এবং শ্লেষ্মা-জড়ানো নয়। চৌধুরী সাহেব সাইফুল ইসলামকে সহ্য করতে না পারলেও ভোরবেলায় তার ঘরের সামনে দিয়ে হাঁটার সময় তাঁর কান উৎকর্ণ হয়ে থাকে। এবং নিজের মনেই বলেন— মন্দ না। আজো শুনলেন—

'যা যারে কাগওয়া পিয়াকে পাস
কহিও খবরিয়া চৈন নহি ঘড়ি পল উন বিন... ।'

চৌধুরী সাহেবের হাঁটার গতি কমে গেল। মনে-মনে বললেন— বাহ্, ব্যাটা তো ভালো গাইছে! গান থেমে গেল সঙ্গে সঙ্গে। খুট করে দরজার খুলে সাইফুল ইসলাম বের হয়ে এলো। তার চোখ লাল। মুখ শুকিয়ে লম্বাটে হয়ে গেছে। সে দ্রুত এগিয়ে এলো চৌধুরী সাহেবের দিকে। চৌধুরী সাহেব লক্ষ করলেন, সে আছে খালি-পায়ে।

স্লামালিকুম চৌধুরী সাব।

ওলায়কুম সালাম।

আমি জানালা দিয়ে দেখলাম আপনি আসছেন। একটা কথা ছিল আপনার সঙ্গে।

তোমার শরীর খারাপ না কি ?

জি। রাতে আমার ঘুম হয় না।

যা গরম, ঘুম না হওয়াই স্বাভাবিক।

চৌধুরী সাব, আপনাকে একটা কথা বলতে চাই।

বলো।

একটু ভেতরে এসে যদি বসেন।

বলো, এইখানেই বলো।

সাইফুল ইসলাম বিড়বিড় করতে লাগল। চৌধুরী সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, বিষয়টা কী ?

চৌধুরী সাব, গতকাল রাত্রে আমি জুম্মাঘরের পাশ দিয়ে আসছিলাম। মনসুরের যে কবর আছে তার ধার দিয়ে আসবার সময় একটা জিনিস দেখলাম।

কী জিনিস ?

দেখলাম মনসুর বসে আছে কবরের পাশে। আমাকে দেখে সে হাসল।

কে বসে আছে বললে ?

মনসুর।

কী ছাগলের মতো কথাবার্তা!

সাইফুল ইসলাম বিড়বিড় করতে লাগল। চৌধুরী সাহেব ভারি গলায় বললেন, তুমি ডাক্তার-ফাক্তার দেখিয়ে ঘুমের ওষুধ-টষুধ খাও।

চৌধুরী সাহেব আর দাঁড়ালেন না। তাঁর অবশ্য ব্যাপারটি ভালো করে শোনার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সময় নেই। ময়মনসিংহ থেকে এসপি সাহেব এসেছেন গতরাতে। তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়েছে ডাকবাংলায়। তাঁর খাবারদাবার চৌধুরী সাহেবের বাড়ি থেকে যাচ্ছে। গতরাতে কথা হয়েছে চৌধুরী সাহেব সকালবেলা ডাকবাংলায় এসে চা খাবেন। দেরি করা যায় না। এসপি সাহেব লোকটিকে একটু কড়া ধাঁচের বলে মনে হয়েছে। সিএসপি অফিসারদের মতো। কিন্তু লোকটি দারোগা থেকে এসপি হয়েছে। এরা ভোঁতা ধরনের হয়ে থাকে, কিন্তু এ সেরকম নয়।

এসপি সাহেব একটা লুঙ্গি এবং হাতকাটা পাঞ্জাবি পরে বারান্দায় চেয়ারে বসেছিলেন। ট্যুর করতে আসা এসপি জাতীয় অফিসাররা লুঙ্গি পরে বসে থাকলে মানায় না। চৌধুরী সাহেব হাসিমুখে বললেন, কখন উঠলেন স্যার ?

সকালে উঠেছি।

রাতে ঘুম ভালো হয়েছিল।

হ্যাঁ।

খাওয়াদাওয়ার অসুবিধা হয় নাই তো স্যার ?

খানিকটা হয়েছে। পোলাওটোলাও এখন খেতে পারি না। ইনডাইজেশন হয়।

স্যার, এখন থেকে সাদা ভাত পাঠাব।

ভাত পাঠানোর তো আর দরকার নেই। আমি এগারটার ট্রেনে চলে যাচ্ছি।

চৌধুরী সাহেব অবাক হয়ে বললেন, রাত্রে আপনার জন্যে একটু গান-বাজনার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

না, রাত্রে থাকব না।

তদন্ত শেষ হয়ে গেছে না কি স্যার ?

কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করব। পোস্টমর্টেম রিপোর্টটা দেখলাম। নরম্যাল ডেথ।

এসপি সাহেব চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন, দেশে চোর-ডাকাতদের সংখ্যা কচুগাছের মতো বাড়ছে। এরা কীভাবে মরল, সেইসব নিয়ে কারো মাথাব্যথা নেই। আমি তো ভেবেছিলাম মিছিলটিছিল হবে, থানা ঘেরাওটেরাও হবে।

নীলগঞ্জ খুব ঠান্ডা জায়গা স্যার।

তাই দেখলাম। ঠান্ডা জায়গা একবার গরম হয়ে গেলে কিন্তু মুসিবত হয়।

এসপি সাহেব সঙ্গের পিয়নটিকে সিগারেট দিতে বললেন। চৌধুরী সাহেব লক্ষ করলেন, সাধারণ দেশী সিগারেটের একটি প্যাকেট দেওয়া হয়েছে। এর মানে কী ? তিনি নাশতার সঙ্গে দুপ্যাকেট ফাইভ ফিফটি ফাইভ দিয়ে দিয়েছেন। সিগারেট মেরে দিচ্ছে না কি ? কী সর্বনাশ! ব্যাপারটা খোলাসা হওয়া প্রয়োজন। সরাসরি জিজ্ঞেস করাটা ঠিক হবে কি না চৌধুরী সাহেব বুঝতে পারলেন না। এসপি সাহেব হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, আমি একটা বেনামি চিঠি পেয়েছি।

চৌধুরী সাহেব নড়েচড়ে বসলেন।

চিঠিতে বলা হয়েছে মনসুর নামের লোকটিকে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। বেনামি চিঠির কোনো গুরুত্ব আমি দিই না।

চিঠিটা একটু দেখব স্যার ?

না। আপনি দেখবেন কেন ?

দেখলে বুঝতে পারতাম কে লিখেছে ?

তার কোনো দরকার নেই।

চৌধুরী সাহেব দেখলেন দবির মিয়া হনহন করে আসছে। তিনি বললেন, দবির মিয়াকে আসতে বলেছেন নাকি স্যার ?

দবির মিয়া কে ?

মনসুর থাকত যার বাড়িতে।

হ্যাঁ, বলেছি। আপনি এখন তাহলে উঠুন চৌধুরী সাহেব। আর শোনেন, দুপুরে ভাত পাঠাবেন না।

চৌধুরী সাহেব অস্বস্তি নিয়ে উঠে পড়লেন। সিগারেটের কথাটা তাঁর আর জিজ্ঞেস করা হলো না। সাইফুল ইসলাম গলা সাধছে—

'যা যারে কাগওয়া, পিয়াকে পাস
কহিও খবরিয়া চৈন নহি ঘড়ি পল উন বিন... ।'

ব্যাটা গায় মন্দ না। দাঁড়িয়ে শুনতে ইচ্ছে করে। তিনি দাঁড়ালেন না, বাড়ি চলে এলেন। বসার ঘরে দুতিনজন লোক বসে আছে। নিশ্চয়ই কোনো দরকার-টরবার। চৌধুরী সাহেব বলে দিলেন তাঁর শরীর ভালো নয়। একজনকে পাঠালেন দবির মিয়ার দোকানে, অবশ্য যেন দবির তাঁর সঙ্গে দেখা করে।

মনসুর আলি আপনার দোকানে কাজ করত ?

জি স্যার।

সে যে চোর, সেটা জানতেন ?

জি না। পরে জানলাম।

মনসুর ধরা পড়ার পরে চুরি ডাকাতি শুনলাম বন্ধ।

জি স্যার, এখনো হয় নাই।

দারোগা সাহেবের কাছে শুনলাম আপনার ছোট ভাই একজন এসেছে।

ভাই না স্যার, আমার শ্যালক।

সে এখন করছে কী ?

দবির মিয়া কপালের ঘাম মুছে শুকনো গলায় বলল, সে একটা নির্দোষী লোক। লোকজনের ষড়যন্ত্রে এই অবস্থায় স্যার।

এসপি সাহেব কিছু বললেন না। দবির মিয়া বলল, ছেলেটার জীবনটা নষ্ট হয়েছে স্যার। শুধু তার একার না, আমারও নানান ঝামেলা হচ্ছে। বড় মেয়েটার বিয়ে হচ্ছে না।

মেয়ের বিয়ের সাথে এর কী সম্পর্ক!

যে বাড়িতে এমন খুন-খারাবি করার লোক আছে সে বাড়িতে বিয়ে-শাদি কেউ করতে চায় না।

এসপি সাহেব আচমকা প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন।

এই চিঠিটা কি আপনার শালার লেখা ?

দবির মিয়া অবাক হয়ে চিঠি পড়ল।

> মাননীয় এসপি সাহেব সমীপেষু,
>
> জনাব,
>
> বিনীত নিবেদন এই যে, গত বুধবার দিবাগত রাত্রে নীলগঞ্জ থানায় মনসুর আলি নামক এক নিরপরাধ ব্যক্তিকে খুন করা হইয়াছে। এই

> বিষয়ে আপনি যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। নচেৎ ফল খারাপ হইবে। আমরা ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করি না। থানা পুলিশকে নীলগঞ্জের লোকেরা ভয় পায় না। পূর্বেও এই অঞ্চলে এই জাতীয় অন্যায় হইয়াছে। থানার যোগসাজসে নিরপরাধ ব্যক্তিকে খুনের দায়ে জেল খাটিতে হইছে...।

দীর্ঘ চিঠি। দবির মিয়া চিঠি দু'বার পড়ল। এসপি সাহেব আবার বললেন, চিঠিটা কি আপনার শালার লেখা ?

স্যার বলতে পারলাম না। তার হাতের লেখা আমি চিনি না। তবে... ?

তবে কী ?

সে এরকম চিঠি-ফিটি লিখবে না স্যার। সে গোঁয়ার ধরনের।

দবির মিয়া অত্যন্ত চিন্তিত মুখে দোকানে গেল। বরকত আলি ক্যাশবাক্স সামনে নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছে। তার ভাবভঙ্গি যেন দোকানটা তারই। সে টেনেটেনে বলল, আজকেও আসতে দেরি করছেন। সকাল সকাল দোকান খোলা দরকার।

দবির মিয়া জবাব দিল না।

চাইর জন কাস্টমার ফিরত গেছে। আমি বলছি ঘণ্টাখানিক পরে আসতে।

ভালো করছেন।

কাস্টমার হইল আপনের হাতের লক্ষ্মী। কাস্টমার ফিরত যাওয়া খুব অলক্ষণ।

দবির মিয়া গম্ভীর হয়ে বলল, আপনার কাজ শেষ হয়েছে ?

কোন কাজের কথা কন ?

দারোগা সাহেবের সাথে দেখা করার কথা ছিল যে।

ও সেইটা। ওসি সাহেব চাইর-পাঁচ দিন পরে যাইতে কইছেন। এখন থানায় খুব ঝামেলা যাইতেছে।

আরো চার-পাঁচ দিন থাকবেন তাহলে ?

জি।

আমার এখানে না, অন্যখানে থাকেন গিয়ে।

বরকত আলি স্তম্ভিত হয়ে গেল।

যামু কই আমি ভাইসাব ?

যেখানে ইচ্ছা সেখানে যান।

বিস্মিত বরকত আলি চা খেতে গেল নান্টুর দোকানে। চা খেয়ে মাথাটা ঠান্ডা করা দরকার।

বেলা প্রায় দশটা হয়েছে। সিক্সটিন ডাউনের আসবার সময়। নান্টুর দোকানে

কাস্টমারদের ভিড় এই সময় সবচেয়ে বেশি। কাজেই সাইফুল ইসলাম যখন এসে বলল, নান্টু, একটা জরুরি কথা আছে আমার। একটু বাইরে আসো। তখন সে সঙ্গত কারণেই বিরক্ত হলো।

পরে আসেন।

পরে না, এখন।

কী, টাকাপয়সা দরকার ?

সাইফুল ইসলামকে নান্টুর কাছ থেকে প্রায়ই টাকাপয়সা ধার করতে হয়।

না, টাকাপয়সা না।

নান্টু অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে দোকানের বাইরে এসে দাঁড়াল।

বলেন, কী বিষয় ?

সাইফুল ইসলাম থেমে থেমে বলল, আমি জুম্মাঘরের পাশ দিয়ে আসছিলাম। হঠাৎ দেখি মনসুর তার কবরের পাশে বসে আছে।

কারে দেখছেন ?

মনসুর। মনসুর আলিকে।

নান্টু অবাক হয়ে তাকাল, এইসব কী কন!

সত্যি। আল্লার কসম।

সাইফুল ইসলাম নান্টুর হাত চেপে ধরল। গাড়ি আসবার সময় হয়ে গেছে। এ সময় কীসব বাড়তি ঝামেলা।

আসেন ভিতরে, চা খান।

সাইফুল ইসলাম চা খাবার জন্য ভেতরে গেল না। এসপি সাহেবের সম্মানে গান-বাজনার ব্যবস্থা করার দায়িত্ব তার। এখনো তার কিছুই করা হয় নি। গান-বাজনার আয়োজন কোথায় হয়েছে তা জানা দরকার। ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলার প্রয়োজন, কিন্তু থানায় যেতে তার সাহসে কুলাচ্ছে না।

চৌধুরী সাহেব খবর পেলেন এসপি সাহেব এগারটার গাড়িতে যাচ্ছেন না। রাতে গান-বাজনার আয়োজন করা হয়েছে। চৌধুরী সাহেবের বাড়িতেই গান-বাজনা হবে। সময় অল্প। স্থানীয় বিশিষ্ট সব লোকজনদের খবর দিতে হবে। চৌধুরী সাহেব অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

জহুরের শার্টের পকেটে কিছু ভাঙতি পয়সা ছিল। সিগারেটের দাম দেবার সময় জহুরের মনে হলো, পয়সার সঙ্গে একটা কাগজের নোটও যেন রয়ে গেছে। সত্যি তাই। ছোটখাটো কোনো নোট না, একশ' টাকার একটা নোট। দুলাভাই কোনো এক ফাঁকে পকেটে রেখে দিয়েছেন বলাই বাহুল্য। এর দরকার ছিল কি ? ডেকে

হাতে দিয়ে দিলেই হতো। সম্ভবত দিতে লজ্জাবোধ করেছেন। লজ্জাবোধ করার কী আর এর মধ্যে?

জহুর একটি সিগারেটের বদলে দু'প্যাকেট সিগারেট কিনে ফেলল। তাতেও টাকার ভাঙতি হয় না। জহুর বলল, টাকাটা থাক তোমার কাছে। মাঝে মাঝে আমি সিগারেট নেব। একসময় একশ' টাকার সিগারেট নেয়া হবে।

পান-বিড়ির দোকানের ছেলেটির বয়স অল্প। সে এরকম অদ্ভুত প্রস্তাব এর আগে শোনেনি। জহুর বলল, ঠিক আছে?

জি আইচ্ছা।

সন্ধ্যা হয়-হয় অবস্থা। জহুর স্টেশনের দিকে যাবে বলে ঠিক করল। হেঁটে বেড়াবার জন্যে জায়গাটা চমৎকার। সারি সারি কৃষ্ণচূড়ার গাছ আছে। ফুল ফুটেছে নিশ্চয়ই।

মামা।

জহুর তাকিয়ে দেখল টুনী সেজেগুজে যাচ্ছে যেন কোথায়।

যাস কোথায়?

গান গাইতে যাই মামা। গানের আসর হচ্ছে একটা।

দুলাভাই জানেন তো?

হুঁ জানেন। বাবাই যেতে বলল।

একা-একা যাচ্ছিস?

একা যাচ্ছি না। তুমিও যাচ্ছ আমার সাথে। তোমাকে ঘর থেকে দেখেই বের হয়েছি। নয়তো বাবার সঙ্গে যাওয়া লাগত। বাবার সঙ্গে যেতে ভালো লাগে না।

আসরটা হচ্ছে কোথায়?

বললে তো তুমি আবার যেতে চাইবে না।

চৌধুরী সাহেবের বাড়ি?

হুঁ। তোমাকে গিয়ে বসে থাকতে হবে না। পৌঁছে দিয়ে চলে আসবে।

ঠিক আছে।

জহুর হাঁটতে শুরু করল। টুনী তরল গলায় বলল, শার্টের পকেটে টাকা পেয়েছো মামা?

পেয়েছি।

বাবা আমার হাতে দিয়ে বলেছেন তোমার পকেটে রাখতে।

জহুর চুপ করে রইল।

হাতে দিয়ে দিলেই হয়। তা দেবেন না। শুধু শুধু ঢং।

জহুর আড়চোখে তাকাল টুনীর দিকে। বড়আপার সাথে টুনীর চেহারার খুব

মিল। হঠাৎ হঠাৎ চমকে উঠত হয়। কথাও বলে বড়আপার মতো।

বাবার দোকানে আবার চুরি হয়েছে, জানো না কি মামা?

জহুর আশ্চর্য হয়ে বলল, কই, জানি না তো।

জানবে কোত্থেকে? সে কাউকে বললে তবে তো জানবে?

তুই জানলি কীভাবে?

ছোটমা'র সঙ্গে গুজগুজ করছিলেন। আড়াল থেকে শুনলাম।

কী চুরি হয়েছে?

তা জানি না। বাবার-দিনকাল ভালো যাচ্ছে না। ডাল কিনে রেখেছিলেন, ইঁদুর না কি বস্তা ফুটো করে কীসব করছে।

টুনী ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

আমি ভেবেছিলাম তুমি আসলে সব অন্যরকম হবে। কিন্তু তুমি আর আগের মতো নেই।

জহুর কথা বলল না।

তুমি তো দেখি দিনরাত বসেই থাকো। কী ভাবো বসে বসে?

কিছু ভাবিটাবি না।

কেন ভাবো না? তোমাকে ভাবতে হবে।

ভাবতে হবে কেন?

টুনী চুপ করে গেল।

চৌধুরী সাহেবের বাড়ির সামনে বেশ ভিড়। স্থানীয় লোকজন সবই মনে হয় এসে পড়েছে। গরমের জন্যেই হয়তো বারান্দায় চেয়ার সাজানো হয়েছে। লোকজন বসে আছে চেয়ারে। জহুর ঘরের ভেতর ঢুকল না। টুনী মৃদুস্বরে বলল, তুমিও আসো না মামা।

না, তুই যা।

জহুর স্টেশনের দিকে রওনা হলো। বড় রাস্তার শেষ মাথায় এসে সে আরেকটি সিগারেট ধরাল। সাইফুল ইসলামকে এই সময় দেখা গেল দ্রুত পায়ে আসছে। তার হাতে তবলা এবং বাঁয়া। পোশাক-আশাক আগের মতো ফিটফাট নয়। পাঞ্জাবিটায়ও ইস্ত্রি নেই। গা থেকে সেন্টের গন্ধও আসছে না। সাইফুল ইসলাম জহুরকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, জহুর ভাই, আপনার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।

বলেন।

আজ তো সময় নেই। রাত্রে একবার যাব আপনার কাছে।

ঠিক আছে, আসবেন।

বিশেষ একটা জরুরি কথা।

ঠিক আছে।

আপনার কাছে একটা পরামর্শ চাই।

ঠিক আছে। এখন তাহলে যান, আপনার বোধহয় দেরি হয়ে যাচ্ছে।

জি, দেরি হচ্ছে। তা ইয়ে, টুনী কি এসেছে চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে?

এসেছে।

সাইফুল ইসলাম খানিক ইতস্তত করে বলল, আঙ্গুরীবালার মতো গলা টুনীর। আমি তাকে গান শেখাতে চাই জহুর ভাই। টাকা-পয়সা কিছু দিতে হবে না।

সাইফুল ইসলাম বাঁয়াটা নামিয়ে রেখে রুমাল দিয়ে ঘাড় মুছতে লাগল।

এইটাই কি আপনার জরুরি কথা না কি?

জি-না।

আপনার বোধহয় দেরি হয়ে যাবে।

না, দেরি আর কী?

সাইফুল ইসলাম একটা সিগারেট ধরাল। ক্লান্ত স্বরে বলল, দুই রাত ধরে আমার ঘুম হয় না।

জহুর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। অন্ধকার হয়ে গেছে, মুখ দেখা যাচ্ছে না।

আপনি বাসায় থাকবেন জহুর ভাই?

আমি থাকব।

এসপি সাহেব মৃদু গলায় বললেন, তুমি মা আরেকটি গান গাও।

আর কোনো গান তো জানি না।

এসপি সাহেব বড়ই অবাক হলেন, একটি গানই জানো?

জি।

আশ্চর্য!

চৌধুরী সাহেব নিজেও খুব অবাক হয়েছেন। গান-বাজনা তিনি বিশেষ বোঝেন না, তবু তার মনে হলো এই মেয়েটির মতো সুন্দর গলা তিনি বহুদিন শোনেননি। এসপি সাহেব বললেন, গানটি তুমি আরেকবার গাও। নাম কী তোমার মা?

টুনী।

দবির মিয়া বলল, ওর ভালো নাম সুলতানা খানম।

আপনার মেয়ে বুঝি?

জি স্যার।

এই মেয়ে খুব নাম করবে। আপনি দেখবেন, নাম করবে।

দবির মিয়া ঠান্ডা গলায় বলল, গৃহস্থ ঘরের মেয়ে গান-বাজনা আর কী করবে? এইসব আমাদের জন্যে না স্যার।

এসপি সাহেব রাগী চোখে তাকালেন। কঠিন ও তীক্ষ্ণ চাউনি।

মিনু ভাবি খয়েরি রঙের একটা শাড়ি পরেছেন। লণ্ঠনের আলোয় তাঁর মুখখানি করুণ দেখাচ্ছে। তিনি মৃদুস্বরে বললেন, চা খাবেন জহুর ভাই?

জি-না।

বৃষ্টি হবে আজ রাতে। ঘনঘন বিজলি চমকাচ্ছে। বাড়ি ফিরে যাওয়া উচিত, কিন্তু জহুর উঠল না। ঘাড় ঘুরিয়ে ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগল। চারদিকে মেয়েলি স্পর্শ আছে। দেখেই বোঝা যায়, এখানে বহুদিন ধরেই কোনো পুরুষমানুষ থাকে না।

আপনার চলে কীভাবে ভাবি?

চৌধুরী সাহেব আমার জন্যে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

তাই নাকি?

হুঁ। আমার জন্যে অনেক করেছেন।

জহুর মৃদু হাসল। মিনু নরম স্বরে বলল, তাঁর সাহায্য নিতে ইচ্ছা হয় নি, কিন্তু না নিয়েও কী করব বলেন?

তা ঠিক।

মিনু খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইল।

ঝড়-বৃষ্টি হবে, আমি উঠি ভাবি।

বসেন না। আরেকটু বসেন।

জহুর ইতস্তত করে বলল, আমার এরকম আসা ঠিক না, লোকজন নানান কথা বলতে পারে।

বলুক। আমি এখন এইসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। কত কথা রটল আমাকে নিয়ে, বুঝলেন জহুর ভাই। বিধবা মেয়েদের বড় কষ্ট।

জহুর উঠে দাঁড়াল।

ছাতা এনেছেন?

জি-না।

আমারটা নিয়ে যান। বৃষ্টি আসবে।

না, থাক।

থাকবে কেন জহুর ভাই ? নিয়ে যান।

হারিকেন হাতে মিনু চাপাস্বরে বলল, শহরে একটা ঝামেলা হচ্ছে, সেটা তো জানেন ? একটা লোককে মেরে ফেলেছে।

জানি।

জহুর ভাই, এইসব নিয়ে আপনি কোনো কথাবার্তা বলবেন না।

এই কথা বলছেন কেন ?

আপনি তাহলে আবার অসুবিধায় পড়বেন। জেলে-টেলে দিয়ে দেবে।

জহুর অস্পষ্ট স্বরে বলল, আমাকে জেলে দিলে কারো তো কোনো ক্ষতি নেই ভাবি।

মিনু সে-কথার জবাব দিল না। হারিকেনটা হাতে নিয়ে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

ঘনঘন বিজলি চমকাচ্ছে। রাতে খুব ঝড়-বৃষ্টি হবে। জহুর একটা সিগারেট ধরিয়ে হালকা গলায় বলল, যাই ভাবি। মিনু ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল।

বাতাস দিতে শুরু করেছে। ভেজা গন্ধ আসছে। দূরে কোথায়ও বৃষ্টি নেমেছে বোধহয়। জহুর মৃদুস্বরে বলল, যাই আজ।

মিনু কিছু বলল না।

সাইফুল ইসলাম রাত এগারটার সময় এসে উপস্থিত। জহুর মশারি ফেলে ঘুমাবার আয়োজন করছিল। সাইফুল ইসলামকে দেখে অবাক হয়ে বেরিয়ে এলো।

জহুর ভাই, আমি বলেছিলাম— আসব।

এত রাতে আসবেন ভাবিনি।

নান্টুর দোকানে চা খাচ্ছিলাম। এত রাত হয়েছে টের পাই নাই।

ব্যাপার কী ?

সাইফুল ইসলাম ইতস্তত করতে লাগল। জহুর বলল, বসেন, ঐ বেঞ্চিটাতে বসেন।

সাইফুল ইসলাম বসল না। জহুর বলল, বলেন শুনি, কী ব্যাপার।

আপনি বুঝি বারান্দাতে ঘুমান!

হুঁ।

সাপখোপের ভয় আছে কিন্তু। সময়টা খারাপ।

জহুর সিগারেট ধরাল।

নিন, সিগারেট নিন।

সাইফুল ইসলাম সিগারেট নিল। মৃদুস্বরে বলল, সিগারেট খাওয়া আমি ছেড়ে

দিয়েছি জহুর ভাই। খরচে পোষায় না। টাকা-পয়সার খুব টানাটানি আমার।

ছাড়তে পারলে তো ভালোই।

পুরাপুরি ছাড়তে পারি নাই। মাঝেমাঝে খাই।

জহুর বলল, কী বলতে এসেছেন, বলেন।

সাইফুল ইসলাম মৃদুস্বরে বলল, আসেন, রাস্তার উপর দাঁড়িয়ে কথা বলি।

জহুর রাস্তায় নেমে এলো। এতটুকু বাতাস নেই কোথাও। গাছের পাতা পর্যন্ত নড়ছে না। মেঘ-বৃষ্টি হবে এমন লক্ষণও নেই। ঝকঝক করছে আকাশ। সাইফুল ইসলাম চাপা গলায় বলল, মনটা খুব খারাপ জহুর ভাই। একটা মানুষ মেরে ফেলেছে, কিন্তু কেউ একটা কথা পর্যন্ত বলছে না।

কাকে মেরে ফেলেছে?

মনসুর। মনসুর আলি। পিটিয়ে মেরে ফেলেছে।

সাইফুল ইসলাম রুমাল বের করে ঘাড় মুছতে লাগল। থেমে থেমে বলল, পরশু রাতে মনসুর আলিকে দেখলাম। মাথা নিচু করে কবরের পাশে বসে ছিল।

কাকে দেখলেন?

মনসুর আলিকে। কালকেও দেখেছি।

আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

কালকে গরমের জন্যে মাঠের মধ্যে বসেছিলাম। তখন দেখলাম। পরিষ্কার দেখলাম। হাতে চটের একটা বস্তা ছিল।

জহুর দীর্ঘ সময় চুপ করে রইল। তারপর সিগারেট ধরাল।

নিন, আরেকটা সিগারেট নিন।

সাইফুল ইসলাম হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিয়ে পকেটে রেখে দিল।

কাল সকালে নাশতার পরে খাব।

জহুর মৃদুস্বরে বলল, যান, বাড়িতে গিয়ে ঘুমান। সকালে কথা বলব।

আপনি আমার কথা বিশ্বাস করেন নাই, না?

জহুর জবাব দিল না।

আপনি আমার সঙ্গে যদি আসেন তাহলে নিজের চোখে দেখবেন। আসনে জহুর ভাই।

আজকে আর যাব না কোথায়ও।

জহুর ভাই, একা-একা তো বাড়ি যেতে পারব না। ভয় লাগে। একটু এগিয়ে দেন।

জহুর হাঁটতে শুরু করল। সারা পথে আর কোনো কথাবার্তা হলো না। কবরখানার পাশ দিয়ে যাবার সময় সাইফুল ইসলাম মৃদু স্বরে বলল, আজকে নাই।

জহুর বলল, এখন যেতে পারবেন একা-একা ?

জি।

যান, ঘুমিয়ে পড়েন গিয়ে। সকালে কথা বলব।

আমার সকালে ঘুম আসে না।

কী করেন এত রাত পর্যন্ত ?

চিঠি লেখি।

রোজ চিঠি লেখেন ?

সাইফুল ইসলাম ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

জহুর বাড়ি ফিরে দেখে, দবির মিয়া বারান্দার বাতি জ্বালিয়ে গম্ভীর মুখে বসে আছে।

এত রাতে তুমি গিয়েছিলে কোথায় ?

সাইফুল ইসলাম এসেছিল, ওর সঙ্গে একটু গিয়েছিলাম।

বিছানাপত্র এইভাবে ফেলে রেখে গেছ ? চোরের উপদ্রব।

জহুর চুপ করে রইল। দবির মিয়া রাগীস্বরে বলল, ঐ হারামজাদা সাইফুল ইসলাম ঘুরঘুর করছে কী জন্যে ?

কী জানি দেখেছে।

দেখবে আবার কী ? শালা চালবাজ। আমার সাথে ফাজলামি করে।

কী করেছে আপনার সাথে ?

বলে বিনা পয়সায় গান শিখাবে। মিয়া তানসেন এসেছে। চড় দিয়ে দাঁত খুলে ফেলব।

জহুর ঘুমাবার আয়োজন করল। দবির মিয়া বাতি নিভিয়ে দিল, কিন্তু বসেই রইল বাইরে। জহুর বলল, শুয়ে পড়েন গিয়ে দুলাভাই।

দবির মিয়া সিগারেট ধরাল। ক্লান্তস্বরে বলল, রাতে বারান্দায় ঘুমানটা ঠিক না। সময় খারাপ।

জহুর চুপ করে রইল। দবির মিয়া সিগারেটে লম্বা টান দিয়ে ক্রমাগত কাশতে লাগল। জহুর বলল, দুলাভাই, আপনি কি কিছু বলবেন ?

হুঁ।

জহুর মশারি থেকে মাথা বের করল।

ব্যাপার কী দুলাভাই ?

আমার সময়টা ভালো যাচ্ছে না। দোকানে চুরি হয়েছে আরেকবার।

শুনেছি।

শুনেছি মানে, কার কাছ থেকে শুনেছ ?

এত লুকানোর কী আছে এর মধ্যে ?

আছে, আছে, তুমি বুঝবে না।

থানার পেটাঘড়িতে বারোটার ঘণ্টা পড়ল। দবির মিয়া বলল, চৌধুরী সাহেব যে কাজটা দিতে চায়, সেই কাজটা তুমি নেও জহুর। পুরনো কথা ভুলে যাওয়াই ঠিক।

জহুর বিছানা থেকে বের হয়ে বেঞ্চির ওপর বসল। দবির মিয়া বলল, আমরা অনেক কিছু হজম করি। টিকে থাকার জন্য করতে হয়। কি, ঠিক না ?

জহুর জবাব দিল না। দবির দ্বিতীয় একটি সিগারেট ধরিয়ে ধীরস্বরে বলল, চৌধুরী সাহেব এখন মনে হয় কিছুটা লজ্জিত। তোমার খোঁজখবর করছে এই জন্যই। সুযোগটা নেওয়া দরকার, বুঝলে ? আর ঐ যে একটা মেয়ের কথা বলেছিলেন, দেখলাম মেয়েটাকে। বেশ ভালো মেয়ে। ম্যাট্রিক সেকেন্ড ডিভিশনে পাস করেছে। কলেজে আর ভর্তি হয় নাই। একটু খাটো, কিন্তু ফর্সা গায়ের রঙ। চুলও দেখলাম লম্বা। চৌধুরী সাহেব বলেছেন বিয়ের খরচপাতি দেবেন।

তার সাথে আপনার আজকেই কথা হয়েছে ?

হুঁ। টুনির বিয়েরও একটা প্রস্তাব দিলেন। ছেলের কাপড়ের ব্যবসা, সৈয়দ বংশ। গ্রামে দোতলা পাকা দালান।

চৌধুরী সাহেবের আত্মীয় ?

না, তবে চেনা-জানা। মঙ্গলবার মেয়ে দেখতে আসবে।

ছেলের পড়াশুনা কেমন ?

পড়াশুনা তেমন কিছু না। সবমিলিয়ে কি পাওয়া যায় ? তবে ছেলে দেখতে সুন্দর। লম্বা-চওড়া।

ভালোই তো।

ছেলের টাকা আছে। টাকাটা খুব দরকারি জিনিস। টাকা থাকলে সবকিছু হয়। যখন বয়স কম থাকে, তখন মনে হয় টাকাটা বড় কিছু না, কিন্তু যখন বয়স বেশি হয়, সত্যি কথাটা বোঝা যায়।

জহুর মৃদুস্বরে বলল, টুনীর সম্ভবত গান-বাজনার শখ।

দবির মিয়া উঠে পড়ল। জহুর অন্ধকারে বেঞ্চির ওপর অনেক রাত পর্যন্ত বসে রইল।

বরকত আলি নীলগঞ্জ স্টেশনের ওয়েটিং রুমে ঘুমিয়েছিল। সকালবেলা সে জেগে উঠে দেখে, তার চামড়ার ব্যাগটি চুরি গেছে। তার পাঞ্জাবির পকেটে একুশ টাকা

চল্লিশ পয়সা ছিল, সেগুলোও নেই। সে তার দুঃখের কথা বলার জন্য দবির মিয়ার বাড়ি গেল। দবির মিয়া তাকে হাঁকিয়ে দিল।

বরকত আলি দুপুর পর্যন্ত নেজামুদ্দিনের ডিসপেনসারিতে বসে রইল। নেজামুদ্দিন একজন হোমিওপ্যাথ ডাক্তার। তার সঙ্গে বরকত আলির বেশ খাতির হয়েছিল। নেজামুদ্দিন তিন ফাইল কানপাকার ওষুধ কিনেছিল, বরকত আলি তার কোনো দাম নেয়নি। কিন্তু আজ বরকত আলির দুঃখের গল্প শুনে নেজামুদ্দিনের মুখ লম্বা হয়ে গেল। সে বরকত আলিকে বসিয়ে রেখে দুপুরে ভাত খেতে গেল। ফিরল বিকালে।

বরকত আলি চোখে অন্ধকার দেখছিস। সে ক্ষুধা একেবারেই সহ্য করতে পারে না। আজ সারাদিন তার তিন কাপ চা, দুটি টোস্ট বিসকিট ছাড়া কিছুই খাওয়া হয়নি।

সন্ধ্যার আগে-আগে সে থানার ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। ওসি সাহেবের সঙ্গে দেখা হলো না। তাঁর শরীর বেশি ভালো নয়। তিনি থানায় আজ আর আসবেন না। সেকেন্ড অফিসার তাকে এক কাপ চা খাওয়ালেন এবং বললেন খামকা ঘোরাঘুরি না করে বাড়ি ফিরে যেতে।

রাতেরবেলা বরকত আলিকে দেখা গেল ছেলের কবরের কাছে উবু হয়ে বসে আছে।

সাইফুল ইসলাম নান্টুর দোকানের চা খেয়ে ফিরবার পথে তাকে দেখতে পেল। সে চেঁচিয়ে উঠল, কে, কে ? মনসুর নাকি ? অ্যাই... অ্যাই।

বরকত আলি উঠে দাঁড়াল। ধরা গলায় বলল, জি আমি। আমি বরকত আলি।

এইখানে কী করেন আপনি ?

বরকত আলি বলল, আজকে আমার খাওয়া হয় নাই সাব।

খাওয়া হয় নাই ?

জি না ভাইসাব। আমার জিনিসপত্র সব চুরি গেছে। একটা পয়সাও নাই সাথে।

আরে, এ তো সিরিয়াস মুসিবত।

এই বয়সে খিদার কষ্ট সহ্য হয় না ভাইসাব।

হুঁ, না হওয়ারই কথা।

সাইফুল ইসলাম ভ্রূ কুঞ্চিত করল। মসজিদ থেকে আবার ওয়াজ শুরু হয়েছে, নবিজির সাফায়াত পাওয়া সহজ না, এই কথাটা মনে রাখবেন। দুনিয়াদারি কঠিন জায়গা ভাইসব। বড় কঠিন স্থান। দিন-দুনিয়ার মালিক গাফুরুর রহিম ইয়া জাল জালাল ওয়াল ইকরাম এরশাদ করেছেন...

সাইফুল ইসলাম তাঁকে নিজের ঘরে নিয়ে এলো। সেই রাত্রেই নীলগঞ্জ থানার ওসি সাহেবের কাছে তিন পাতার একটা চিঠি লিখল। চিঠির শুরু এরকম।

ওসি সাহেব,

আপনার কি ধারণা নীলগঞ্জের অধিবাসীরা ঘাস খাইয়া জীবনধারণ করে ? সমস্ত জারিজুরি ফাঁস হইয়া গিয়াছে। খুনের দায়ে এখন হাতকড়া পরিবার জন্য তৈরি হওয়ার সময় আসিয়াছে। শালা তুই কি ভাবিয়াছিস...

ভাত বেড়ে দিচ্ছিল অনুফা। অঞ্জু স্কুলে গিয়েছে। টুনীর শরীর খারাপ, শুয়ে আছে। জহুর অস্বস্তি বোধ করছিল। অনুফা মৃদু স্বরে বলল, পেট ভরে খান ভাইসাব।

জহুরের মাথা আরো খানিকটা নিচু হয়ে গেল। অনুফার সঙ্গে দেখা হলেই সে কোনো-একটা বিচিত্র কারণে লজ্জা বোধ করে। অনুফা ডালের বাটি এগিয়ে দিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলল, টুনীর গান-বাজনার শখ। সৈয়দ বাড়িতে বিয়া হইলে কিছুই হইত না। আপনে আপনার ভাইরে কন।

জহুর বলল, জি, বলব।

আমার কথা শোনে না। আমি মূর্খ মেয়েমানুষ।

জি, বলব আমি।

জহুর লক্ষ করল অনুফা দারুণ অসুস্থ। গালটাল ফুলে আছে। চোখ রক্তাভ। দুলাভাই বোধহয় চিকিৎসাও করাচ্ছে না ঠিকমতো। পানি পড়াটড়া খাওয়াচ্ছে কিংবা হোমিওপ্যাথি করছে। অনুফা ইতস্তত করে বলল, আর একটা কথা ভাইসাব। হুনলাম আপনে মিনুর কাছে মাঝেমধ্যে যান। আর যাইয়েন না।

জহুর ভাত মাখা বন্ধ করে অনুফার দিকে তাকাল। অনুফা বলল, আপনে রাগ কইরেন না ভাইসাব।

না, রাগ করি নি। দুলাভাই কি আপনাকে বলেছেন আমাকে এইসব বলার জন্যে ?

জি-না, আপনের দুলাভাই আমারে কিছু কইতে কয় নাই। নিজের থাইক্যা কইলাম।

আচ্ছা ঠিক আছে, আর যাব না।

মাইয়াটার খুব বদনাম। বিধবা মাইনষের খুব অল্পে বদনাম হয়। আর চাইরডা ভাত নেন।

সন্ধ্যাবেলা মেয়ে দেখতে আসবার কথা। সবাইকে অবাক করে দিয়ে সন্ধ্যার আগে-আগে চৌধুরী সাহেব এসে হাজির। দবির মিয়া অতিরিক্ত রকমের ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

চৌধুরী সাহেব সহজ-স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বসার ঘরের চেয়ারে বসে রইলেন।

ছেলে নিজেই এলো মেয়ে দেখতে। মুরব্বির মধ্যে ছেলের বড়ভাই। ছেলে

দেখে জহুর বেশ অবাক হলো। সুন্দর চেহারা। কথায় বার্তায়ও চমৎকার। টুনীকে দেখে ড্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকল না বা বন্ধুবান্ধবকে খোঁচা দিয়ে ভ্যাকভ্যাক করে হাসল না। বেকুবের মতো জিজ্ঞেস করল না, এক সের বেগুন ডুবাতে কত সের পানি লাগে ?

টুনী চলে যাবার পর ছেলের বড়ভাই বললেন, চৌধুরী সাহেব, মেয়ে আমাদের পছন্দ হয়েছে।

চৌধুরী সাহেব বললেন, আপনার পছন্দ হয়েছে বুঝলাম, ছেলের মত জিজ্ঞেস করেন।

হয়েছে, ছেলেরও হয়েছে। এখন আপনাদের যদি ছেলে পছন্দ হয় তাহলে দিন-তারিখ করেন।

চৌধুরী সাহেব গম্ভীর স্বরে বললেন, আমাদের একটা শর্ত আছে। যদি শর্তে স্বীকার হন, তাহলে সম্বন্ধ হবে।

দবির মিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। ছেলের বড়ভাই নড়েচড়ে বসল। শর্তটা কী ?

মেয়ে বড় গায়িকা। তার গান শুনলে বুঝবেন। শর্ত হলো মেয়েকে গান-বাজনা শিখাতে হবে। কী বলো দবির ?

দবির মিয়া অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। চৌধুরী সাহেব বললেন, তোমার মেয়েকে ডেকে আনো তো দবির। খালি গলায় একটা গান শুনিয়ে দিক।

টুনীকে আবার আসতে হলো। গান শোনাতে হলো। ছেলের বড়ভাই বললেন, আমাদের সাধ্যমতো আমরা চেষ্টা করব।

কথা দিচ্ছেন তো ?

জি, কথা দিলাম।

তাহলে হাত তোলেন, মুনাজাত হোক।

বিয়ের তারিখ হলো আষাঢ় মাসে। ছেলেদের দাবিদাওয়া কিছু নেই। মেয়েকে খুশি হয়ে যদি কিছু দেন, তাহলে সেটা তাদের ইচ্ছা।

দবির মিয়া চৌধুরী সাহেবকে এগিয়ে দিতে গেল। চৌধুরী সাহেব বললেন, ছেলে তোমার পছন্দ হয়েছে তো ?

জি, পছন্দ হয়েছে।

পছন্দ হওয়ারই কথা। বনেদি ঘরের ছেলে। এদের আচার-ব্যবহারই অন্যরকম।

তা ঠিক।

আর ছেলের পড়াশোনার কথা যা বলেছিলাম, তা ঠিক না। আইএ পাস করেছে।

দবির মিয়া অভিভূত হয়ে পড়ল। চৌধুরী সাহেব বললেন, আমি জহুরের চাকরিটার কথা বলে রেখেছি, জহুরকে লাগিয়ে দাও।

দবির মিয়া জবাব দিল না। চৌধুরী সাহেব অস্পষ্ট স্বরে বললেন, পুরনো কথা মনে রেখে লাভ নাই। আমার কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি হয়েছে। সবারই হয়। ভুলের সংশোধন করার চেষ্টা করছি।

দবির মিয়া অস্পষ্ট স্বরে কী বলল, ঠিক বোঝা গেল না। চৌধুরী সাহেব বললেন, বহু ঝামেলা করতে হয়েছে, বুঝলে দবির। তিনবার মরতে মরতে বাঁচলাম। একবার তো ঘরে ঢুকে কোপ দিয়েছিল। জানো তো সব। জানো না ?

জি, জানি।

টাকাপয়সা থাকলেই ঝামেলা হয়। এখন আর এইসব ভালো লাগে না।

দবির মিয়া বলল, আমি জহুরকে বলব, চৌধুরী সাহেব। আজ রাতেই বলব।

বাজারের বড় রাস্তায় উঠে আসার মুখে সাইফুল ইসলামের সঙ্গে দেখা হলো। তার দৃষ্টি উদ্‌ভ্রান্ত। সে চৌধুরী সাহেবকে দেখে প্রায় ছুটে এলো।

চৌধুরী সাব, আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে।

কী ব্যাপার ?

আমার ঘরে সন্ধ্যারাতে চুরি হয়েছে।

আছে কী তোমার ঘরে, যে চুরি হবে ?

আমার হারমোনিয়ামটা চুরি হয়ে গেছে চৌধুরী সাব। ডবল রিডের হারমোনিয়াম।

দবির মিয়াকে স্তম্ভিত করে সাইফুল ইসলাম হাউমাউ করে কেঁদে উঠল। চৌধুরী সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, এর মধ্যে কাঁদার কী আছে ? যাও, থানায় গিয়ে ডাইরি করিয়ে আসো। থানায় গিয়েছিলে ?

জি-না। আপনার বাড়িতে বসে ছিলাম।

আমার বাড়িতে কেন ? আমি কে ? যাও, থানায় যাও। এক্ষুনি যাও। সন্ধ্যারাতে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে, এটা ভালো কথা না।

টুনী এবং অঞ্জু দু'জনে একখাটে শোয়। খাটটি প্রস্থে ছোট, দুজনের চাপাচাপি হয়। এদের ঘরে কোনো ফ্যান নেই। বড্ড কষ্ট হয় গরমের সময়। সন্ধ্যার আগে-আগে বৃষ্টি হওয়ায় আজ অবশ্য তেমন গরম লাগছে না। তবু টুনী বলল, গরম পড়েছে খুব। অঞ্জু কিছু বলল না। টুনী বলল, বাবা খাটটা একটু বড় করে বানালে পারতেন। তার সব কিছুতেই পয়সা বাঁচানোর চেষ্টা।

অঞ্জু বলল, আমার একার জন্য খাটটা ঠিক আছে। আষাঢ় মাস পর্যন্ত কষ্ট করতে হবে।

টুনী কিছু বলল না। অঞ্জু বলল, ছেলেটাকে পছন্দ হয়েছে তো আপা ?

মন্দ কী ?

আমার কাছে ভালোই লাগল। ব্যবসা করে মনেই হয় না।

কেন, ব্যবসা করলেই মানুষ খারাপ হয় না কি ? সবই তো আর বাবার মতো না।

কথার কথা বললাম, রাগছো কেন ?

রাগছি না।

তোমার গানও থাকল।

ঐসব থাকবে-টাকবে না। বলতে হয় তাই বলেছে।

টুনী শুয়ে পড়ল। শোবার আগে জানালা বন্ধ করার নিয়ম। আজ আর কেউ জানালা বন্ধ করল না। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে, বেশ লাগছে। অঞ্জু একবার বলল, জানালা খোলা থাকলে বাবা রেগে যাবে।

যাক রেগে।

অঞ্জু মৃদুস্বরে বলল, বিয়েটা তোমার ভালোই হবে আপা।

ভালো হলেই ভালো।

চৌধুরী সাহেব সম্পর্কটা ভালো এনেছেন, তাই না আপা ?

কী জানি ?

মানুষ তো আর চিরকাল খারাপ থাকে না।

হুঁ।

তোমার কি মনে হয়, মামা চৌধুরী সাহেবের চাকরিটা নেবে ?

আমার কিছু মনেটনে হয় না। বকবক করিস না, ঘুমা।

অঞ্জুর হঠাৎ মনে হলো টুনী কাঁদছে। সে অবাক হয়ে বলল, আপা কাঁদছো না-কি ?

টুনী জবাব দিল না।

নীলগঞ্জ রেলস্টেশনের উত্তরে ফাঁকা জায়গাটায় চার-পাঁচ জন লোক কী যেন করছে। খুঁটি পোঁতা হচ্ছে। একজনের হাতে কাগজ-পেন্সিল। সে গরমের মধ্যেও একটা হলদে রঙের কোট পরে আছে। চৌধুরী সাহেব রেলস্টেশন থেকে ব্যাপারটা দেখতে পেলেন। হচ্ছেটা কী ? কোনো সরকারি অফিস-টফিস না কি ? তাঁর তো তাহলে জানার কথা! অবশ্য আজকাল আর আগের মতো খোঁজখবর রাখতে পারেন না। কিছুদিন আগেই হঠাৎ শুনলেন নীলগঞ্জে একটা অয়েল মিল বসানো হয়েছে। বিদেশী লোকজন হুট-হাট করে কাজ করে। আগেভাগে কাউকে কিছু বলে না। চৌধুরী

সাহেব খবর নিয়ে জানলেন, জনু খাঁ অয়েল মিল দিয়েছে। ভাটি অঞ্চলের নতুন ধনী। জলমহালে পয়সা করে এখানে পয়সার গরম দেখাতে এসেছে। চৌধুরী সাহেব একদিন গেলেন অয়েল মিল দেখতে। মিলের কাজকর্ম এখনো শুরু হয়নি, ভিত পাকা করা হচ্ছে। জনু খাঁ খুবই খাতির করল। দাঁত বের করে বলল, গরিবের ঘরে হাতির পা।

আসলাম আপনার মিল দেখতে।

দেখবার কিছু নেই বলে অবশ্য মনে হলো না। নানান কিসিমের লোকজন দেখা গেল। জনু খাঁ পানির দেশ থেকে দলবল নিয়ে এসেছে। চৌধুরী সাহেব বললেন, শুকনার দেশে বসত করবেন মনে হয়।

তা ঠিক চৌধুরী সাব। পানির দেশে ডাকাইতের ভয়টা বেশি।

চোর-ডাকাত তো সবখানেই আছে।

শুকনা দেশের ডাকাইত আর পানির দেশের ডাকাইত— কী যে আপনি কন চৌধুরী সাব! হেঁ... হেঁ... হেঁ...।

বিদেশী লোকজন ঢুকে পড়ছে নীলগঞ্জে। লক্ষণ ভালো নয়। কিছু করা দরকার। সেই বছর চৌধুরী সাহেব সরিষার ব্যবসা করবেন ঠিক করলেন। পিডিপির ইঞ্জিনিয়ারদের কী-না-কী বললেন, যার ফলে একটা ট্রান্সমিটার নষ্ট হয়ে গেল। গোটা মাসে বাতি জ্বলল মিটমিট করে। জনু খাঁ ছ'মাসের মাথায় অয়েল মিল বিক্রি করে ফেলল।

চৌধুরী সাহেব স্টেশনের উত্তরের ফাঁকা জায়গায় এসে হাজির হলেন। কড়া রোদ উঠেছে। ছাতা না আনায় তাঁর মাথা ঝাঁ-ঝাঁ করতে লাগল। এই বছর বৃষ্টি-বাদল হচ্ছে না। খুব খারাপ লক্ষণ। চৌধুরী সাহেব গলা উঁচিয়ে ডাকলেন, এই যে এই।

হলুদ কোট পরা লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। গায়ে কোট থাকলেও লোকটার চেহারা চাষাড়ে। সে উদ্ধত স্বরে বলল, কী চান ?

নাম কী তোমার ?

উদ্ধত ধরনের লোকদের আচমকা তুমি করে বললে তাদের প্রতিরোধ ভেঙে যায় এটি একটি বহু প্রতীক্ষিত তথ্য। চৌধুরী সাহেব আবার বললেন, নাম কী তোমার ?

নাম দিয়ে কী করবেন ?

এইখানে হচ্ছেটা কী ?

সিনেমাহল হবে। বিউটি ছায়াঘর।

করছেটা কে ?

নেসারউদ্দিন সাহেব।

নেসারউদ্দিন সাহেবটা কে ?

ময়মনসিংহের। উনার আরো দুইটা সিনেমাহল আছে। নেত্রকোনায় একটা, ময়মনসিংহে একটা।

লোকটি চৌধুরী সাহেবের প্রশ্নে নার্ভাস বোধ করছিল। তা কাটাবার জন্যে সে সিগারেট ধরাল।

বিদেশী লোকজন আসতে শুরু করেছে। ছোট নীলগঞ্জ এখন আর ছোট নয়। আর কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো যে-সে ফস করে তার সামনে সিগারেট ধরাবে। চৌধুরী সাহেব ক্লান্ত পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। রোদ বড্ড কড়া। এই বয়সে এত রোদে হাঁটাচলা করা মুশকিল।

নীলগঞ্জ হাইস্কুলের কাছে আসতেই তার মনে হলো, আজ সকালে স্কুল কমিটি মিটিং ছিল, তিনি আসতে পারেননি। এ-রকম ভুল তার হয় না। হওয়াটা ঠিক নয়। বয়সের লক্ষণ। চৌধুরী সাহেব নীলগঞ্জ স্কুলে ঢুকে পড়লেন। হেডমাস্টার সাহেবের ঘরে ফ্যান আছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে রওনা হওয়া ভালো। মিটিংয়ে কিছু হয়েছে না কি তাও জানা দরকার। নীলগঞ্জ স্কুলের হেডমাস্টার সাহেব লোকটি মহাচালবাজ এবং মহাধূর্ত। ধূর্ত লোকজন সময়ে অত্যন্ত বিনয়ী হতে পারে। এইটি চৌধুরী সাহেবের ভালো লাগে। হেডমাস্টার সাহেব খুবই উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, শরীরটা খারাপ না কি চৌধুরী সাহেব ?

নাহ্।

হেডমাস্টার সাহেব স্কুলের দপ্তরিকে পাঠালেন ডাব আনতে।

চৌধুরী সাহেব বললেন, কাজে আটকা পড়েছিলাম। মিটিং হয়েছে ?

জি-না, আপনি ছাড়া মিটিং হবে কি ? বুধবারে ডেট দিয়েছি। বুধবারে কোনো অসুবিধা নাই তো ?

নাহ্।

হেডমাস্টার সাহেব গলার স্বর দু'ধাপ নিচে নামিয়ে বললেন, সোবাহান মোল্লা স্কুল ফান্ডে দশ হাজার টাকা দিয়েছে। নতুন পয়সা হয়েছে আর কী। হা... হা... হা...।

চৌধুরী সাহেব ভ্রু কুঁচকে বললেন, কবে দিল ?

মিটিংয়ের সময় এসে বলে গেছে।

ও।

চৌধুরী সাহেব নড়েচড়ে বসলেন; লক্ষণ মোটেই ভালো নয়। এইসব নতুন পয়সাওয়ালা লোকজন ভেসে উঠতে চেষ্টা করছে। চৌধুরী সাহেব মৃদুস্বরে বললেন, নীলগঞ্জে সিনেমাহল হচ্ছে।

আর বলেন কেন, দেশটা অধঃপাতে যাচ্ছে।

চৌধুরী সাহেব উঠে পড়লেন।

ডাব আনতে গেছে, একটু বসেন চৌধুরী সাহেব।

নাহ্।

একটু বসেন। এসে পড়বে।

চৌধুরী সাহেব বসলেন না।

একটা রিকশা ডেকে দিই চৌধুরী সাহেব ?

রিকশা লাগবে না।

নীলগঞ্জ বদলে যাচ্ছে। রিকশা পাওয়া যায় এখন। রাস্তাঘাটে অচেনা লোকজন দেখা যায়। বড় বড় অফিসাররা এখন আর চৌধুরী সাহেবের বাড়ি এসে ওঠেন না। তাদের জন্যে সরকারি ডাকবাংলা হয়েছে।

প্রচণ্ড রোদ উপেক্ষা করে চৌধুরী সাহেব হাঁটতে লাগলেন। তৃষ্ণা পেয়েছে। ডাবটা খেয়ে এলে হতো। পাশ ঘেঁসে খালি রিকশা যাচ্ছে একটি। চৌধুরী সাহেব ভারি গলায় বললেন, এই থাম।

রিকশা থামল না। রিকশাওয়ালা সরু গলায় বলল, ভাড়া যাইতাম না।

নীলগঞ্জে এখন অনেকেই তাঁকে চেনে না। তিনি প্রচণ্ড একটা ধমক দিতে গিয়েও দিলেন না।

মসজিদের কাছাকাছি এসে শুনলেন ওয়াজ হচ্ছে। মসজিদের ইমাম সাহেব নতুন এসেছেন। আগের ইমাম সাহেবের ঘর-সংসার ছিল। ইনি এখনো বিয়েটিয়ে করেন নি। হাতে সম্ভবত কাজকর্ম কিছু নেই। সময়ে-অসময়ে মাইক ভাড়া করে নিয়ে আসেন। চৌধুরী সাহেব শুনলেন, ভাইসব হাদিস-কোরানের কথা আজকাল কেউ শোনে না। মেয়েরা পর্দাপুশিদা করে না। হাটে-ঘাটে গঞ্জে-গ্রামে যুবতী মেয়েরা নাভির নিচে কাপড় পরে ঘুরে বেড়ায়...

ইমাম সাহেব অল্পবয়স্ক বলেই যুবতী মেয়েদের কথা তার ওয়াজে বারবার আসে। ওয়াজের ফাঁকে-ফাঁকে কোরান শরীফের আয়াত পড়া হয়। তাঁর কণ্ঠ অসম্ভব মধুর বলেই শুনতে বড় ভালো লাগে। কিন্তু আজ লাগছে না। চৌধুরী সাহেবের ইচ্ছা হলো ইমাম সাহেবকে ডেকে একটা ধমক দেন। কিন্তু তা দেওয়া সম্ভব নয়। লোকটি আল্লাহ্-খোদার নাম নিচ্ছে।

জহুর কাঁঠাল গাছের নিচে মোড়া পেতে বসে ছিল। বাড়ির অন্য কেউ এখনো ঘুম থেকে ওঠেনি। জেলখানার অভ্যেস জহুরের এখনো আছে, সূর্য ওঠার আগে ঘুম ভাঙে। জহুর দেখল এই সাতসকালে সাইফুল ইসলাম হনহন করে আসছে। এই নিয়ে পর পর তিনদিন এলো।

স্লামালিকুম জহুর ভাই।

ওয়ালাইকুম সালাম। কী ব্যাপার?

জহুর ভাই, আজকে ঠিক করেছি থানায় গিয়ে একটা ডাইরি করাব।

বেশ তো, করান।

আপনার কাছে একটা পরামর্শের জন্যে আসলাম।

এর মধ্যে আবার পরামর্শ কী?

না, এই বিষয়ে না। অন্য বিষয়ে।

জহুর লক্ষ করল, সাইফুল ইসলাম আজ আবার একটু বিশেষ সাজগোজ করে এসেছে। ঘাড়ের কাছে পাউডারের সূক্ষ্ম প্রলেপ। মিষ্টি একটা সেন্টের গন্ধও আসছে গা থেকে। সাইফুল ইসলাম কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, ভাবছি পত্রিকার অফিসে একটা চিঠি লিখব।

হারমোনিয়াম চুরির খবর পত্রিকা ছাপবে না।

জি-না, সেইটা না। থানাতে এত বড় একটা খুন হয়ে গেল, সেই বিষয়ে।

ও।

বেনামে একটা চিঠি দিয়ে দেই, কী বলেন জহুর ভাই?

বেনামি চিঠি ওরা ছাপবে না।

সেই জন্যেই একটা পরামর্শ করতে আসলাম। ইয়ে, অন্য কারো নাম দিয়ে দিলে কেমন হয়?

কার নাম দেবেন?

তাও তো কথা। ইয়ে, আপনার দুলাভাই শুনলাম চন্দ্রপুর গেছেন?

হুঁ।

ফিরবেন কবে?

কাল-পরশু ফিরবেন।

সাইফুল ইসলাম একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল।

দুলাভাইকে কিছু বলতে চান?

জি-না, জি-না।

সাইফুল ইসলাম চুপচাপ বসে রইল। একসময় বলল, টুনীকে বলেছিলাম সিও সাহেবের বাসায় গিয়ে গলাটা সাধতে। ইমনের সরগম দিয়ে দিয়েছিলাম, সে যায় না। আসলাম যখন, তাকে বলেই যাই, কী বলেন?

ঠিক আছে, বলে যান। চা-ও খেয়ে যান।

গানের মধ্যে সরগমটাই আসল। গলা যত ভালোই হোক, সাধনা না থাকলে সব শেষ।

জহুর জবাব দিল না। সাইফুল ইসলাম রুমাল দিয়ে নাক মুছতে মুছতে বলল, এই যে কয়েক দিন কিছু করি নাই... এতেই আমার গলা টাইট হয়ে গেছে। সঙ্গীতের মতো কঠিন কিছু নাই।

নাশতা নিয়ে এলো অঞ্জু। বাইরের লোক আছে বলেই কি না কে জানে, আজ একটু বিশেষ ব্যবস্থা দেখা গেল। রুটির বদলে পরোটা তৈরি হয়েছে। ডিম ভাজার সঙ্গে সেমাই দেয়া হয়েছে। একটি পিরিচে আবার পাকা পেঁপে টুকরো করে কাটা। সাইফুল ইসলাম বলল, ইয়ে, টুনীর সঙ্গে একটা কথা বলার ছিল। ও আর গান শিখতে যায় না।

অঞ্জু হাসিমুখে বলল, আপার বিয়ে ঠিক হয়েছে তো, সে এখন কোথায়ও যায় না।

বিয়ে ঠিক হয়েছে, কবে ?

এই তো কয়েক দিন।

ও।

ছেলে খুব ভালো। খুব সুন্দর চেহারা।

সাইফুল ইসলাম অবাক হয়ে অঞ্জুর দিকে তাকিয়ে রইল।

আমাকে কেউ কিছু বলে নাই। ইয়ে, তাকে বলো একটু আসতে।

টুনী ঘরের ভেতর ঢুকল না। দরজার পাশে দাঁড়াল। অঞ্জুর কাছে মনে হলো, টুনীর চোখ দুটি অস্বাভাবিক ফোলা-ফোলা। যেন প্রচুর কান্নাকাটি করে এসেছে।

টুনী মৃদুস্বরে বলল, স্যার ডেকেছিলেন ?

হুঁ।

কিছু বলবেন ?

না, বলব আর কী! সিও সাহেবের বাসায় যাও না। ভাবলাম...

টুনী তাকিয়ে রইল। সাইফুল ইসলাম কথার মাঝখানে থেমে গেল। যেন আর তার কিছু বলার নেই। টুনী বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করে করে রান্নাঘরে চলে গেল।

অঞ্জু চায়ের চিনি আনতে গিয়ে দেখে টুনী রুটি বেলছে। তার চোখে সূক্ষ্ম জলের রেখা। অঞ্জু কিছু বলল না। তার নিজেরও কান্না আসতে লাগল।

চুরি তো তিন-চারদিন আগে হয়েছে, এতদিন পর আসলেন যে ?

সাইফুল ইসলাম ঢোঁক গিলল। ওসি সাহেব বললেন, হারমোনিয়াম ছাড়া আর কী গেছে ?

আর কিছু না।

চুরি-টুরি হলে সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট করা দরকার। সঙ্গে সঙ্গে রিপোর্ট হলে আমরা খোঁজখবর করতে পারি। দাগি চোরদের ডেকে ধমকাধমকি দিলে বের হয়ে পড়ে। বুঝলেন ?

জি স্যার।

আরে, চুরি তো ছোট জিনিস, খুনের খবর দিতেই লোক তিন-চার দিন দেরি করে।

সাইফুল ইসলাম কথা বলল না। ওসি সাহেব বললেন, কেন দেরি করে জানেন ?

জি-না।

কাকে কাকে আসামি দেবে, সেই শলাপরামর্শ করতে গিয়ে দেরি হয়। যত পুরনো শত্রু আছে, সব আসামি দিয়ে দেয়। বুঝলেন ?

জি স্যার।

তার ফলে আসল যে কালপ্রিট তার কিছু হয় না। আরে ভাই পুলিশ যে খারাপ তা তো সবাই জানে, আপনারাও যে খারাপ এইটা সবাই জানে না।

ওসি সাহেব চুরির এফআইআর করলেন। হারমোনিয়াম কোন দোকানের, কবে কেনা, সব লেখা হলে বললেন, এর নিচে নাম সই করেন। ঠিকানা লেখেন। দেখব কিছু হয় কি না।

সাইফুল ইসলাম নাম সই করল। সেই নামের দিকে ওসি সাহেব দীর্ঘসময় তাকিয়ে থেকে ঠান্ডা গলায় বললেন, আপনাকে দু-একটা কথা জিজ্ঞেস করি ?

জি স্যার, করেন।

মনসুরের ব্যাপারটা নিয়ে আপনি ঝামেলা পাকাবার চেষ্টা করছেন, এর কারণ বলেন তো ?

সাইফুল ইসলাম ঢোক গিলল।

ওর বাবাকে কয়েকদিন রেখেছেনও আপনার এখানে। ঠিক না ?

জি স্যার।

ঐ টাউটটা এখন কোথায় ?

বাড়িতে চলে গেছে।

আপনি তো বেনামি চিঠিপত্র ছাড়ছেন চারিদিকে। ঠিক না ?

সাইফুল ইসলাম কপালের ঘাম মুছল। তারপর শুকনো গলায় বলল, স্যার, এক গ্লাস পানি খাব।

এই এঁকে পানি দাও তো এক গ্লাস। পানি খেয়ে ঠান্ডা হন। ঠান্ডা হয়ে জবাব দেন।

সাইফুল ইসলাম কলকল করে ঘামতে লাগল।

হুঁ, এখন বলেন তো মতলবটা কী ? শোনেন, দশ বছর ধরে পুলিশে আছি। আমাদের কারবারই খারাপ লোকদের সাথে। আপনার মতো লোক বহুত দেখেছি। মিচকা শয়তান। আড়ালে কলকাঠি নাড়াবার আসল শয়তান।

আচমকা প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন ওসি সাহেব। সাইফুল ইসলাম স্তম্ভিত হয়ে গেল। তার মনে হলো পায়জামাটি ভিজে গেছে। প্রশ্রাব হয়ে গেছে সম্ভবত।

চলেন আমার সাথে। আপনার ঘর সার্চ করব।

জি, কী বললেন স্যার ?

আপনার ঘর সার্চ হবে।

ওসি সাহেব উঠে দাঁড়ালেন।

মিচকা শয়তান, ছিঁচকা শয়তান টাইট দেওয়া ওষুধ আমাদের আছে। ওঠেন তো দেখি এখন।

ট্রেন থেকে নেমেই দবির মিয়া খবরটা শুনল— সাইফুল ইসলামকে বিশ বার কানে ধরে ওঠ-বস করানো হয়েছে।

সে একটা কাণ্ড দবির ভাই, বাজারে সব লোক আসছিল মজা দেখতে। সাইফুল ইসলামের কান্দন যদি দেখতেন। হা... হা... হা...।

বিষয় কী ?

আর বলেন কেন, মেয়েছেলেদের কাছে লেখা খারাপ খারাপ চিঠি পাওয়া গেছে। চৌধুরী সাহেবের কাছে সব আছে।

কানে ধরে উঠ-বস করিয়েছে কে ?

সালিশি হয়েছে। চৌধুরী সাহেব ছিলেন। থানাওয়ালারা ছিল। মোক্তার সাব ছিল। সরদার বাড়ির লোকও ছিল। ধুন্ধুমার কাণ্ড।

দবির মিয়া নিজের দোকানে এসে পৌঁছাবার আগে আরো তিনবার সমস্ত ব্যাপারটা শুনল। পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হলেই হাসিমুখে জিজ্ঞেস করছে, ব্যাপার শুনছেন না কি ?

হুঁ, শুনেছি।

কানে ধরে উঠ-বস করায়েছে। হা... হা... হা...।

শুনেছি।

আর কান্দা যদি দেখতেন! চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে যান। চিঠি সব আছে তাঁর কাছে।

চিঠি দিয়ে আমি করব কী ?

আপনার মেয়ের কাছে লেখা চিঠিও তো থাকতে পারে। সেও তো গান শিখেছে।

দবির মিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলে কী!

কোনো ভদ্দরলোকের ছেলে এমন চিঠি লেখতে পারে! চিঠিতে হাত দিলে ধোওয়া লাগে সাবান দিয়ে, বুঝলেন। হা... হা... হা...।

সন্ধ্যার পর দবির মিয়া চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গেল। চৌধুরী সাহেব বললেন, ঘটনা শুনেছ ?

জি, শুনলাম।

অনেকে বলছিল মাথা কামিয়ে দিতে। সেটা আবার বাড়াবাড়ি হয়ে যায়।

যেটা করেছেন, সেটাই বিরাট বাড়াবাড়ি হয়েছে চৌধুরী সাব।

বলো কী তুমি দবির!

নিজের ঘরে বসে চিঠি লিখেছে, তাতে কী যায় আসে ?

পড়ে দেখো তুমি। তোমার মেয়ের কাছে লেখা চিঠিও আছে।

থাকুক। চিঠি তো সে পাঠায় নাই।

চৌধুরী সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, সব চিঠি যে পাঠায় না, তা-ও ঠিক না। থানাওয়ালাদের কাছে দুইটা চিঠি লিখেছে। পত্রিকা অফিসে লিখেছে। আমার কাছে লিখেছে।

আপনার কাছে কী লিখেছে ?

আমি না কি খুনখারাবি করি। আমি না কি বুড়া শয়তান। ছোটলোকের আস্পর্ধা দেখো!

চৌধুরী সাহেব একদলা থুথু ফেললেন। তাঁর ভাব দেখে মনে হলো পুরনো শক্তিসামর্থ্য ফিরে পাচ্ছেন। তিনি শক্ত সুরে বললেন, একে আমি নীলগঞ্জ ছাড়া করব। আমার সাথে ফাইজলামি!

দবির মিয়া বাড়ি ফিরল অনেক রাত্রে। ঘর অন্ধকার। ইলেকট্রিসিটি নেই। রান্নাঘরে শুধু হারিকেন জ্বলছে। জহুর বারান্দায় বসে সিগারেট টানছিল। দুলাভাইকে দেখে ফেলে দিল। দবির মিয়া শান্ত সুরে বলল, বাজারের ঘটনা শুনেছ ?

জি, শুনেছি।

বাজারে গিয়েছিলে ?

জি-না।

দবির মিয়া বেঞ্চির উপর বসল। ঠান্ডা গলায় বলল, এত বড় একটা অন্যায়

হয়েছে, আর তুমি কিছুই করলা না?

জহুর চুপ করে রইল।

তুমি মাছের মতো হয়ে গেছ জহুর।

জহুর জবাব দিল না। দবির মিয়া দীর্ঘ সময় অন্ধকারে বসে রইল। একটি সিগারেট ধরিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলল, সব মানুষ মাছের মতো হলে বাঁচা যায় না। দু-একজন অন্যরকম মানুষ লাগে। জহুর অস্পষ্টভাবে কী বলল, পরিষ্কার বোঝা গেল না।

টুনী এসে বলল, ভাত দেওয়া হয়েছে বাবা।

দবির মিয়া নড়ল না, বসেই রইল।

সাইফুল ইসলাম মজা খালের পাশে উবু হয়ে বসে ছিল। তার পেছনে দু'টি প্রকাণ্ড গাবগাছ। জায়গাটা ঝোপেঝাড়ে ভর্তি। সাপের আড্ডা নিশ্চয়ই, কিন্তু সাইফুল ইসলামের কেন জানি ভয় করছিল না। দুপুরের দিকে তার প্রচণ্ড ক্ষুধা হয়েছিল, এখন সেটাও নেই। থানার ঘড়িতে রাত ন'টা বাজার পর একটি শেয়াল তাকে বারবার উঁকি দিয়ে দেখে যেতে লাগল। মরা মানুষ ভেবেছে বোধহয়। সাইফুল ইসলাম বলল, যা, যা।

সাইফুল ইসলামের হঠাৎ করে জহুর ভাইয়ের কথা মনে পড়ল। জহুর ভাই নাকি একবার চৌধুরী সাহেবের পাঞ্জাবির গলা চেপে ধরে বলেছিল, হাতজোড় করে মাফ চাও, না হলে এইখানেই খুন করে ফেলব।

চৌধুরী সাহেব হাতজোড় করে মাফ চেয়েছিলেন। কত দিনের কথা, এখনো লোকে সেই ঘটনাটা মনে রেখেছে। তার নিজের কেন এরকম সাহস নেই?

শেয়ালটা আরেকটু এগিয়ে এলো। সাইফুল ইসলাম মাটির ঢেলা ছুড়ে মারল। শেয়ালটা খানিকটা পিছিয়ে গেল, কিন্তু তাকিয়ে রইল।

ক'টা বাজে? থানার ঘড়িতে ন'টার ঘণ্টা মনে হয় একযুগ আগে বেজেছে। সময় আর যাচ্ছে না। রাত এগারটায় একটা ট্রেন আছে। সে কি পালিয়ে যাবে রাত এগারটায়? কিন্তু পালিয়ে যাবেটা কোথায়? শেয়ালটা এগিয়ে আসছে আবার। সে আবার একটা ঢিল ছুড়ল। ঢিলের শব্দে সড়াৎ করে কী-একটা যেন নামল পানিতে। সাপ না কি? সাইফুল ইসলাম হঠাৎ লক্ষ করল, সাপের ভয়টা তার কেটে গেছে। অবশ্য মনসুরের বাবা বরকত আলি তার জন্যে একটা শেকড় আনবেন বলে গেছেন। সেটি সঙ্গে থাকলে সাপ দশ হাত দূরে থাকবে। সত্যি সত্যি এমন কিছু কি আছে?

মসজিদ থেকে মিষ্টি সুরে ওয়াজ হচ্ছে। কথাগুলি বোঝা যাচ্ছে না। বোধহয় পর্দা-পুশিদার ওপর বলা হচ্ছে। হায়াহীন মেয়েদের কথা, যারা নাভির নিচে শাড়ি পরে, বেগানা পুরুষের দিকে ড্যাবড্যাব করে তাকায়। যাদের পাতলা ব্লাউজের ভেতর দিয়ে

সবকিছুই দেখা যায়— ওয়স্তাগফেরুল্লাহ! এই রমণীদের জন্যে হাবিয়া দোযখ।

সাইফুল ইসলাম উঠে দাঁড়াল। বরকত আলি সাহেবকে সে শনিবারে আসতে বলেছে। কিছুই হয়তো করা যাবে না। একবার শেষ চেষ্টা করলে কেমন হয়? আর কেউ না হোক, জহুর ভাই তো নিশ্চয়ই তার পাশে এসে দাঁড়াবেন।

রান্নাঘরে নতুন করে চারটি চাল ফোটাচ্ছে টুনী। সে দেখে এসেছে মামা বারান্দায় নেই। তার কেন যেন মনে হচ্ছে, মামা গিয়েছে সাইফুল ইসলামকে আনতে। নিয়ে এলে সে নিশ্চয়ই চারটি ভাত খাবে এখানে। টুনী বসে আছে উনুনের পাশে। তার চেহারা তেমন ভালো নয়। কিন্তু আগুনের আঁচে তাকে রাজকন্যার মতো দেখাচ্ছে। আগুনের পাশে মানুষকে সব সময়ই সুন্দর দেখায়।

সবাই গেছে বনে

আকাশের দিকে তাকালে মন খারাপ হয়ে যায়।

অবিকল দেশের মতো মেঘ করেছে। চারদিক অন্ধকার করে একটু পরেই যেন কালবৈশাখীর তাণ্ডব শুরু হবে। আনিস কফি খেতে যাচ্ছিল। আকাশ দেখে তার খানিকটা মন খারাপ হয়ে গেল। বড্ড নস্টালজিক মেঘ।

অ্যান্ডারসন ব্যস্ত ভঙ্গিতে পার্কিং লটের দিকে এগুচ্ছিল। আনিসকে দেখে থমকে দাঁড়াল, সরু গলায় বলল, এখনো বাড়ি যাও নি ? প্রচণ্ড থান্ডার স্টর্ম হবে। ওয়েদার সার্ভিস স্পেশাল বুলেটিন দিচ্ছে।

কফি খেয়েই রওনা হব।

লিফট চাও ? লিফট দিতে পারি।

না, লিফট চাই না।

এ অঞ্চলে ঝড়-বৃষ্টি বড় একটা হয় না। সে জন্যেই সম্ভবত লোকজনদের ভয় একটু বেশি। দেখতে দেখতে ক্যাম্পাস ফাঁকা হতে শুরু করেছে। কফি হাউসে মোটেই ভিড় নেই। উইক এন্ডে এ রকম থাকে না কখনো। মেয়েরা সেজে-গুজে বসে থাকে। ছেলেরা আসে ডেটের কথা পাকাপাকি করতে।

আনিস কফির পেয়ালা নিয়ে বাঁ দিকে এগিয়ে গেল। কফি হাউসের শেষ মাথায় চার-পাঁচটি ছোট ছোট ঘর আছে। তিন নম্বর ঘরটি আনিসের খুব প্রিয়। দারুণ ভিড়ের সময়ও সেটি ফাঁকা থাকে। আজ পুরো কফি হাউস ফাঁকা কিন্তু সেখানে একজন বুড়ি বসে আছে।

আমি কি এখানে বসতে পারি ?

বুড়ি সম্ভবত ঘুমুচ্ছিল। আনিসের কথায় নড়েচড়ে বসল।

নিশ্চয়ই। নিশ্চয়ই।

বসার পরই আনিসের মনে হলো কাজটি ভালো হয়নি। আমেরিকান বুড়িগুলো কথা না বলে থাকতে পারে না। ভ্যাজর ভ্যাজর করে দশ মিনিটের মধ্যে মাথা ধরিয়ে দেয়।

তুমি ইন্ডিয়ান নিশ্চয়ই ?

না, আমি ইন্ডিয়ান নই।

তুমি কি মালয়েশিয়ান ?

না, আমি বাংলাদেশী।

সেটি কোথায় ?

ইন্ডিয়া ও বার্মার মাঝামাঝি একটা ছোট দেশ।

কত ছোট ?

বেশ ছোট। নর্থ ডেকোটার অর্ধেক হবে।

বুড়ি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল আনিসকে। দম ফুরিয়ে গেছে নিশ্চয়ই। বিশ্রাম নিয়ে আবার শুরু করবে।

তুমি কি শুনেছো সিভিয়ার থান্ডার স্টর্ম হবে ? স্পেশাল বুলেটিন দিচ্ছে দুপুর থেকে।

হ্যাঁ শুনেছি। খুবই খারাপ ওয়েদার।

তুমি কি এই ইউনিভার্সিটির ছাত্র ?

না, আমি এখানকার একজন টিচার।

কোন সাবজেক্ট ?

কেমিস্ট্রি। পলিমার কেমিস্ট্রি।

আনিস বড়ই বিরক্তি বোধ করতে লাগল। বুড়িগুলোর কৌতূহল সীমাহীন। এরা মানুষদের বড্ড বিরক্ত করতে পারে। বুড়িটি তার ব্যাগ থেকে সিগারেট বের করল। লাইটার জ্বালাতে জ্বালাতে বলল, তুমি কি এমিলি জোহানের নাম শুনেছ ?

না। কে সে ?

এখানকার একজন বড় কবি। গত বৎসর রাইটার্স গিল্ড অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে।

না, আমি তার নাম শুনিনি। লিটারেচারে আমার তেমন উৎসাহ নেই। বুড়ি সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে তার হাত বাড়িয়ে দিল।

আমি এমিলি জোহান। তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুব খুশি হলাম।

আনিস হকচকিয়ে গেল। বুড়ি থেমে থেমে বলল, সমস্ত কফি হাউস ফাঁকা আর তুমি বেছে বেছে আমার এখানে বসতে এসেছ দেখে ভাবলাম হয়তো আমাকে চেন। গল্প করতে চাও। বুড়িদের সঙ্গে ইচ্ছে করে কে আর বসতে চায় বলো ?

আনিস ঠিক কী বলবে ভেবে পেল না। কিছু একটা বলা উচিত।

তুমি কিন্তু তোমার নাম বলোনি এখনো।

আমার নাম আনিস সাবেত। তোমার মতো বড় কবির সঙ্গে দেখা হয়ে খুব ভালো লাগল।

বুড়ি গলার স্বর নামিয়ে ফেলল। প্রায় ফিসফিস করে বলল, মোটেই বড় কবি নই। রাইটার্স গিল্ড অ্যাওয়ার্ড হচ্ছে একটা সস্তা ধরনের পুরস্কার। এখন পর্যন্ত কোনো বড় কবি রাইটার্স গিল্ড অ্যাওয়ার্ড পায়নি। আমি যখন পেলাম তখন এত মন খারাপ হলো যে বলার নয়। বুঝতে পারলাম যে আমি একজন সস্তা ধরনের কবি, থার্ডরেট।

বুড়ি উঠে দাঁড়াল। শান্ত স্বরে বলল, তোমার সঙ্গে কি আমার আবার দেখা হবে ?

আনিসের উত্তর দেবার আগেই সে থেমে থেমে বলল,

'ওয়ান ফ্লিউ টু দা ইস্ট
ওয়ান ফ্লিউ টু দা ওয়েস্ট
অ্যান্ড ওয়ান ফ্লিউ ওভার দা কাক্কুস নেস্ট।'

আনিস অনেকক্ষণ বসে রইল একা একা। এখান থেকে বাইরের আকাশ দেখা যাচ্ছে না তবে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে তা চোখে পড়ে। কত তফাত— ঝমঝম শব্দ নেই, গাছের পাতার শন শনানি নেই, ব্যাঙ ডাকছে না। বোঝার কোনো উপায় নেই যে বাইরে আকাশ অন্ধকার করে ঝড়ো হাওয়া বইছে।

এ্যাটেনসন প্লিজ। এ্যাটেনসন প্লিজ। কফি হাউজ দশমিনিটের মধ্যে বন্ধ হয়ে যাবে। এ্যাটেনসন প্লিজ।

কফি হাউজ থেকে বেরিয়ে মনে হলো বড্ড বোকামি হয়েছে। অনেক আগেই বাড়ি ফেরা উচিত ছিল। ভালো ঝড় হচ্ছে। লোকজন কোথাও নেই। পার্কিং লট ধু-ধু করছে। আনিস মেমোরিয়াল লাউঞ্জে চলে গেল। মেমোরিয়াল লাউঞ্জে পত্রিকা পড়ার ব্যবস্থা আছে। একটি প্রকাণ্ড ভিক্টোরিয়ান পিয়ানো আছে। হট চকলেট এবং পেপসির দুটি ভেন্ডিং মেশিন আছে। অবস্থা তেমন খারাপ হলে সেখানকার সোফায় আরাম করে রাত কাটানো যাবে।

লাউঞ্জের শেষ প্রান্তে একটি ছেলে এবং খুবই অল্প বয়সী একটি মেয়ে জড়াজড়ি করে বসেছিল। ছেলেটি এক হাত দিয়ে মেয়েটির জামার হুক খুলবার চেষ্টা করছে। মেয়েটি বাধা দেবার একটি ভঙ্গি করছে এবং খিলখিল করে হাসছে। আনিস না দেখার ভান করে ভেন্ডিং মেশিনের দিকে এগুলো। এই সময় চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। এখানে এরকম হয় না কখনো। হাজারো দুর্যোগেও এদের ইলেকট্রিসিটি ঠিকই থাকে। মনে হচ্ছে মেয়েটি উঠে আসছে সোফা থেকে।

তোমার কাছে কি সিগারেট আছে?

আছে।

আমি কি তোমার একটি সিগারেট ধার নিতে পারি?

আনিস সিগারেট বের করল। মেয়েটি ফস করে লাইটার জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালো। বাদামি রঙের ঢেউ খেলানো চুল মেয়েটির। টানা টানা চোখ। লাইটারের আলোর জন্যেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক আনিসের মনে হলো মেয়েটির মুখ যেন এইমাত্র কেউ তুলি দিয়ে এঁকেছে। সিগারেটের জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ।

ছেলেমেয়ে দুটি পিয়ানোর আড়ালে চলে গেল। মেয়েটি অনবরত হাসছে খিলখিল করে। হাসির ধরন কেমন অসংলগ্ন। নিশ্চয়ই প্রচুর বিয়ার খেয়েছে। আনিস লম্বা হয়ে সোফায় শুয়ে পড়ল। ইলেকট্রিসিটি এখনো আসছে না। ট্রান্সমিশন লাইন কোথাও পুড়ে-টুড়ে গেছে বোধহয়। মেয়েটির চাপা গলার স্বর শোনা যাচ্ছে।

আহ্ কী অসভ্যতা করছো। হাত সরাও প্লিজ।

আবার খিলখিল হাসি। তারপর দীর্ঘ সময় আর কিছুই শোনা গেল না। বাইরে ঝড়ের বেগ বাড়ছে। ঘনঘন বিজলি চমকাচ্ছে। আনিস শুয়ে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন ঝড় থেমে গিয়েছে। ইলেকট্রিসিটি এসেছে। মেমোরিয়েল ইউনিয়ন আলোয় ঝলমল করছে। ছেলেটি নেই মেয়েটি টেবিলে পা তুলে বসে আছে একা একা।

তোমার কাছ থেকে কি আমি আরেকটি সিগারেট নিতে পারি ?

আনিস একটি সিগারেট দিল। মেয়েটি সিগারেট ধরিয়ে ক্লান্ত স্বরে বলল,

তোমার সঙ্গে গাড়ি আছে ?

না। কেন বলো তো ?

গাড়ি থাকলে তোমাকে একটি লিফটের জন্যে অনুরোধ করতাম।

সরি, গাড়ি নেই আমার।

তুমি থাকো কোথায় ?

টুয়েলভ এ্যাভিন্যু।

তোমার সঙ্গে আমি টুয়েলভ এ্যাভিন্যু পর্যন্ত হেঁটে হেঁটে যেতে পারি, কী বলো ?

তা পারো।

আমার বড্ড মাথা ধরেছে।

মেয়েটি বাঁ হাতে তার কপাল টিপে ধরল। আনিস বলল, তোমার ছেলে বন্ধুটি কোথায় ?

ও আমার বন্ধু হবে কেন ? কোথায় গেছে কে জানে ? ওর সঙ্গে বকবক করেই তো আমার মাথা ধরেছে।

বৃষ্টি নেই কিন্তু ঠান্ডা হাওয়া বইছে। রাস্তায় নেমেই মেয়েটি খুবই সহজ ভঙ্গিতে আনিসের হাত ধরল।

তোমার অ্যাপার্টমেন্টে কি টাইলানল আছে ?

আছে।

মনে হয় আমার জ্বর আসছে। দুটি টাইলানল এবং গরম কফি খেতে পারলে হতো।

আনিস কথা বলল না। মেয়েটির সত্যি সত্যি জ্বর আসছে। হাত বেশ গরম।

আমি কি তোমার অ্যাপার্টমেন্টে গিয়ে এক কাপ গরম কফি খেতে পারি ? রাত বেশি হয় নি তাই জিজ্ঞেস করছি।

হ্যাঁ, খেতে পারো।

আমাকে আরেকটা সিগারেট দাও।

মাথা ধরা তাতে আরো বাড়বে।

আমি তাতে কেয়ার করি না। আমি কোনোকিছুতেই কেয়ার করি না।

তা ভালো।

ভালো হোক মন্দ হোক আমি কেয়ার করি না।

বাসার সামনে এসে মেয়েটি থমকে দাঁড়াল। অবাক হয়ে বলল, এত বড় বাড়ি! এটা তোমার ?

ভাড়া দিয়ে থাকি। নিজের নয়।

আমি ভেবেছিলাম তুমি স্টুডেন্ট।

না আমি স্টুডেন্ট নই।

আনিস টাইলানল নিয়ে আসলো। পানির বোতল আনল। মেয়েটি ক্ষীণ স্বরে বলল, আমার জ্বর আসছে। তোমার কাছে থার্মোমিটার আছে ?

না, থার্মোমিটার নেই।

তোমার গাড়ি থাকলে ভালো হতো, আমাকে পৌঁছে দিতে পারতে।

আমি আমার এক বন্ধুকে টেলিফোন করছি। সে তোমাকে পৌঁছে দেবে।

আমি কি তোমার এখানে এক রাত থাকতে পারি ? ঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না আমার।

আনিস চুপ করে রইল। মেয়েটি থেমে থেমে বলল, কী থাকতে পারি ?

তা পারো।

আমাকে শোবার ঘর দেখিয়ে দাও। আমার বড্ড খারাপ লাগছে।

শোবার এই ঘরটি চমৎকার করে সাজানো। মেয়েটি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো অনেকক্ষণ। তারপর খানিক ইতস্তত করে বলল, তুমিও কি শোবে আমার সঙ্গে ?

না।

আরো শোবার ঘর আছে ?

হ্যাঁ।

মেয়েটি পায়ের জুতা খুলল। মাথায় স্কার্ফ বাঁধা ছিল। স্কার্ফ খুলে মুখ মুছল তারপর খুব সহজভাবে বলল, তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। অবশ্যি তোমার ইচ্ছা হলে আমার সঙ্গে শুতে পারো। আমি কিছুই কেয়ার করি না।

নাম কী তোমার ?

মালিশা।

শুভরাত্রি মালিশা।

মালিশা কোনো জবাব দিল না। আনিস ভ্রু কুঞ্চিত করে ভাবলো কাজটা বোধহয় ঠিক হলো না। এইসব 'হোবো' শ্রেণীর মেয়েদের ঘরে থাকতে দিতে নেই। হয়তো একটি প্রস্টিটিউট। শহুরে নষ্ট মেয়েদের একজন। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না। মন খারাপ হয় শুধু।

টিভিতে জনি কার্সন শো হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট কার্টার দাঁত বের করে কীভাবে হাসে তাই দেখাচ্ছে। আহামরি কোনো অভিনয় নয়। এতেই স্টুডিওর লোকজন হেসে গড়াগড়ি দিচ্ছে। চ্যানেল ফোরে লেট নাইট মুভি শুরু হলো। অর্থাৎ রাত বেশি হয় নি। একটা এখনো বাজে নি। আনিস কফি বানাল। ঘুমুতে যাওয়ার আগে কফি খাবার এই একটি বিশ্রী অভ্যাস তার আমেরিকা এসে হয়েছে।

মালিশা কি কফি খাবে ? সম্ভবত না। মেয়েটিকে থাকতে দেয়া ভুল হয়েছে। ড্রাগস ট্রাগস খায় কি না কে বলবে ? হয়তো রাত দুপুরে চেঁচামেচি শুরু করবে।

আনিস ঘুমুতে গেল অনেক রাতে। বাতি নেভাবার ঠিক আগের মুহূর্তে মনে হলো আজ সন্ধ্যায় যে মহিলা কবির সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তাঁর নাম মনে পড়ছে না। চমৎকার একটি নাম। খুব সম্ভবত এম দিয়ে শুরু হয়েছে। নামটি মনে না আসা পর্যন্ত কিছুতেই ঘুম আসবে না। ছটফট করতে হবে বিছানায়। পুরনো সেই রোগ আবার দেখা দিচ্ছে। স্নায়ু উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ঘাড়ের পাশের রগ দুটি ফুলে উঠছে। কাউকে জিজ্ঞেস করলে হয় না ? সফিক তো অনেকদিন ধরে আছে এইখানে। এত রাত্রে টেলিফোন করাটা কি ঠিক হবে ?

হ্যালো সফিক ? জেগে ছিলে ?

হ্যাঁ। কী ব্যাপার ?

আচ্ছা শোনো, তুমি কি এখানকার কোনো মহিলা কবিকে চেন ? বেশ বয়স ভদ্রমহিলার।

সফিক বেশ কিছু সময় চুপ করে থেকে বলল, কী ব্যাপার আনিস ভাই ?

কোনো ব্যাপার না এম্নি জিজ্ঞেস করছি। ভদ্রমহিলার নাম এম দিয়ে শুরু।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, কী জন্যে ?

আনিস লাইন কেটে দিল। সফিক এখন নির্ঘাৎ আবার টেলিফোন করবে। কাজেই এখন প্লাগ থেকে টেলিফোন খুলে রাখা উচিত।

আনিসের সারা রাত ঘুম হলো না। ঘুম আসলো ভোরবেলা।

২

ফার্গো খুবই ছোট শহর।

আমেরিকানরা একে সিটি বলে না, বলে টাউন।

সাধারণ একটি সিটিতে যা যা থাকে, এখানে তার সবই অবশ্যি আছে। আকাশ ছোঁয়া দালানই শুধু নেই। দুটি নাইট ক্লাব আছে। মেয়েরা সেখানে নগ্ন হয়ে নাচে। একটা বড় ক্যাসিনো আছে। সেখানে সপ্তাহে ছয়দিন দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টা ব্লাক জ্যাক খেলা হয়। অত্যাধুনিক শপিং মল আছে বেশ কয়েকটি, তবু ফার্গো সিটি নয়, টাউন। নিউইয়র্ক বা শিকাগো থেকে যেসব বাঙালি এখানে আসে তারা চোখ কপালে তুলে বলে, আরে এ তো আমাদের কুমিল্লা শহর। ভিড় নেই হৈচৈ নেই। বাহ্ চমৎকার তো!

কিন্তু বেশি দিন কেউ থাকে না এখানে। শীতের সময় প্রচণ্ড শীত পড়ে। কানাডা থেকে উড়ে আসে ঠান্ডা হাওয়া। থার্মোমিটারের পারা ক্রমশ নিচে নামতে থাকে। ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি তাপমাত্রা শূন্যের ত্রিশ ডিগ্রি নিচে নেমে থমকে দাঁড়ায়। অসহনীয় অকল্পনীয় ঠান্ডা। একটা শীত কোনোমতে কাটাবার পরই ফার্গোর মোহ কেটে যায়। ঘরের মধ্যে ছ'মাস বন্দি হয়ে থাকতে পারে কেউ ? বাঙালিরা মুখ কুঁচকে বলাবলি করে, এখানে মানুষ থাকতে পারে ? এখানে বাস করতে পারে পোলার বিয়ার আর সীল মাছ।

তবু অনেকেই আসে। ঘর-বাড়ি কিনে স্থায়ী হয়ে যায় কেউ কেউ। যেমন স্থায়ী হয়েছেন আমিন সাহেব। শহরে বাড়ি করেছেন। মিনেসোটায় পেলিকেন লেকের ধারে সামার হাউস কিনেছেন। বিশ বছর আগে যে দেশ ছেড়ে এসেছিলেন আজ আর তার জন্যে মন কাঁদে না।

অথচ শুরুতে কী দিন গিয়েছে। ইউনিভার্সিটি থেকে সন্ধ্যাবেলা ক্লান্ত হয়ে ফিরতেন। ঘরে রাহেলা একা। কিছুই করবার নেই। কতক্ষণ আর টিভির সামনে বসে থাকা যায়। একা একা দোকানে ঘুরতে কার ভালো লাগে ? আমিন সাহেব সান্ত্বনা দিতেন, আর একটা মাত্র বছর। পি এইচ-ডি করব না। এম. এস. করে ফিরে যাব। আর মাত্র কয়েকটা দিন কষ্ট করো।

পরিবর্তন হলো খুব ধীরে। আমিন সাহেব একদিন অবাক হয়ে লক্ষ করলেন রাহেলা চমৎকার ইংরেজি শিখেছে।

বাহ্, তুমি তো চমৎকার ইংরেজি বলো। কোত্থেকে শিখেছ ? একেবারে আমেরিকান একসেন্ট। কীভাবে শিখলে ?

টিভি দেখে দেখে শিখেছি। কী আর করব বলো ?

দু'বছরের মাথায় চাকরি হলো রাহেলার। আহামরি কিছু নয়। রিসার্চ ল্যাবে সূর্যমুখী ফুলের চারা বাছা। সেই বছর গাড়ি কিনলেন আমিন সাহেব। নাইনটিন

সেভেন্টি ওয়ান মডেল ডজ পোলারা। প্রকাণ্ড গাড়ি। নিজের গাড়িতে করে স্ত্রীকে নিয়ে গেলেন ডেডিলস লেকে। রাহেলার মনে হলো সে বোধহয় আগের মতো অসুখী নয়।

দেখতে দেখতে কতদিন হয়ে গেল। প্রচুর ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও দেশে যাওয়া হয়ে উঠল না। বেড়াতে যাবার জন্যেও নয়। একটা না একটা ঝামেলা থাকেই। পি এইচ-ডি'র বছর দেশে যাওয়া যাবে না। নতুন চাকরি, দেশে যাওয়া যাবে না। ইমিগ্রেশন না হওয়া পর্যন্ত বের হওয়া ঠিক হবে না। নতুন বাড়ি কেনা হয়েছে। এখন বাড়ি ঠিকঠাক করতে হবে, দেশে যাওয়া পিছাতে হবে। প্রথম বাচ্চা হবে এ সময়টা তো আমেরিকাতে থাকতেই হবে।

তারা প্রথমবারের মতো যখন দেশে গেল তখন রুনকির বয়স চার বছর। প্রায় এক যুগ পর দেশে ফেরা। কী দারুণ উত্তেজনা গিয়েছে। কিন্তু দেশে ফিরে কিছুই ভালো লাগল না। নোংরা ঘর-বাড়ি। দেয়ালগুলো ময়লা। রাতেরবেলা কেমন অন্ধকার অন্ধকার লাগে চারদিক। মানুষজনও কেমন যেন বদলে গেছে। কেউ যেন ঠিক সহজ হতে পারে না। বড় খালা যিনি সারা জীবন তুই তুই করে কথা বলতেন তিনি পর্যন্ত তুমি বলা শুরু করলেন।

এক মাস পরই রুনকি পড়ে গেল অসুখে। যা খায় কিছুই হজম করতে পারে না। রাহেলা আমেরিকা ফিরে এসে হাঁপ ছাড়ল।

দেখতে দেখতে কতদিন হয়ে গেল। বিশ বছর অনেক লম্বা সময়। রাহেলার বাবা-মা মারা গেলেন। আমিন সাহেবের বাবা-মা'তো আগেই ছিলেন না। কোনো পিছু টান রইল না। রাহেলার সবচে' ছোট বোনটির বিয়ে হয়ে গেল। কোথায় আছে সে কিছুই জানা নেই। জানবার জন্যে সেরকম উৎসাহও এখন হয় না। সবকিছু যেন হারিয়ে গেছে। আজকাল আয়নায় মুখ দেখলে রাহেলার তীক্ষ্ণ ব্যথাবোধ হয়। মুখের চামড়া শ্লথ হয়ে এসেছে। কানের দু'পাশের সাদা চুল সাপের মতো কিলবিল করে। এখন তাঁর অন্য একধরনের আলস্য বোধ হয়। সকালবেলা চেয়ার পেতে বারান্দায় একা একা বসে থাকেন। আমিন সাহেব তাঁকে বিরক্ত করেন না। কেমন একটা দূরত্ব এসে গেছে তাঁদের মধ্যে। মাঝে মাঝে রুনকি আসে ঝড়ের মতো।

আবার তুমি চেয়ার নিয়ে বসেছ? শিকড় গজিয়ে শেষে তুমি একটা গাছ হয়ে যাবে মা।

আয়, তুইও বোস।

হুঁ, আমার যেন কোনো কাজ নেই।

রুনকি দেখতে তাঁর মতো হয় নি তবু চমৎকার হয়েছে। গায়ের রঙ চাপা। কিন্তু কী কালো শান্ত চোখ। তাকালেই কেমন যেন মন খারাপ হয়। আয়নার সামনে

দাঁড়িয়ে রুনকি যখন চুল ব্রাশ করে, তিনি মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকেন। রুনকি ঠোঁট বাঁকায়, এমন করে তাকাও কেন মা ?

কেমন করে তাকাই।

কেমন যেন পুরুষ পুরুষ চোখে তাকাও।

তিনি তাঁর নিজের মেয়েকে একটুও বুঝতে পারেন না। মাঝে মাঝে অনেক কায়দা করে জিজ্ঞেস করেন, তুই কী রকম ছেলে বিয়ে করতে চাস রুনকি ?

বিয়ের কথা আমি মোটেই ভাবছি না। বছরের পর বছর একটা ছেলের সঙ্গে থাকা বড্ড আগ্‌লি।

এসব আবার কী ধরনের কথা ?

সত্যি কথাই বলছি তোমাকে। যেসব ছেলে আমার সঙ্গে ডেট করে, তুমি কি ভাবছো আমি ওদের কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবি ? হলি কাউ। তাছাড়া ওরাও বিয়ে করতে চায় না। ভুলিয়ে ভালিয়ে ঘরে নিয়ে শুতে চায়।

রাহেলা মুখ কালো করে বললেন, তুই নিশ্চয়ই ওদের ঘরে যাস না ?

মা যাই কি না যাই সেসব আমি তোমার সঙ্গে ডিসকাস করতে চাই না। আমার বয়স ১৯ হয়েছে। তোমাদের কোনো রেসপনসিবিলিটি নেই।

রাহেলা চান একটি হৃদয়বান এবং বুদ্ধিমান বাঙালি ছেলেকে বিয়ে করবে রুনকি। জীবনে যে সমস্ত সুখ ও আনন্দের কথা তিনি সারা জীবন কল্পনা করেছেন, তার মেয়ে সেসব ভোগ করবে। কিন্তু এই দূর দেশে তেমন ছেলে পাওয়া যাবে কোথায় ? রাহেলা লং ডিসটেন্সে পরিচিত সবাইকে একটি ছেলের কথা বলেন। খোঁজ যে আসে না তাও নয়। প্রথমেই জানতে চায় মেয়ের কি ইমিগ্রেশন আছে ? বিয়ে করলে এখানে থেকে যাবার ব্যাপারে কোনো সাহায্য হবে কি ? মেয়ের ছবি দেখতে চায় না, মেয়েটিকে দেখতে চায় না। গ্রীন কার্ড দেখতে চায়।

আমিন সাহেব নিজের ঘরে বসে কী যেন লিখছিলেন। একতলার সর্ব পশ্চিম কোণার ছোট ঘরটি তার নিজস্ব ঘর। ঘরটিতে আসবাব বলতে ছোট একটা লেখার টেবিল, একটা ইজি চেয়ার, বুক শেলফ। বুক শেলফে কয়েকটি রেফারেন্স বই, ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কিছু পুরনো সংখ্যা এবং বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ইছামতি' ছাড়া অন্যকোনো বই নেই। আমিন সাহেব মাঝে মাঝেই দরজা বন্ধ করে এই ঘরে বসে কী যেন লেখেন। রাহেলার কৌতূহল হলেও কখনো কিছু জিজ্ঞেস করেন নি। আমিন সাহেবের কোনো বিষয়ে কৌতূহল প্রকাশ করতে আজ আর তার ভালো লাগে না।

রাহেলা দরজায় দুবার টোকা দিয়ে মৃদু গলায় বললেন, আসব ? জবাব পাবার আগেই তিনি পর্দা সরিয়ে আমিন সাহেবের ঘরে ঢুকলেন। আমিন সাহেব তাঁর লেখাটি আড়াল করবার চেষ্টা করলেন। রাহেলা ভান করলেন যেন তিনি এসব কিছু

লক্ষ করছেন না।

আমি আজ সন্ধ্যায় কয়েকজনকে খেতে বলেছি। আমিন সাহেব কোনো উত্তর দিলেন না।

তুমি টচি থেকে শুঁটকি মাছ এনে দেবে।

শুঁটকি মাছ পাওয়া যায় ?

মাঝে মাঝে যায়।

আমি নিয়ে আসব।

রাহেলার মনে হলো আমিন সাহেব অস্বস্তিবোধ করছেন যেন তিনি চান না রাহেলা এখানে থাকে। কিন্তু এরকম মনে করার কারণ কী ? রাহেলা নিজের অজান্তেই বলে ফেললেন, কী লিখছো ?

তেমন কিছু না।

রাহেলা খানিকক্ষণ সরু চোখে তাকিয়ে থেকে দোতলায় চলে গেলেন। দোতলার একেবারে শেষ কামরাটি রুনকির। সে দরজা বন্ধ করে গান শুনছে।

রুনকি, দরজা খুলো তো মা।

রুনকি দরজা খুলে দিল। তার চোখ ভেজা। মনে হলো সে অনেকক্ষণ ধরে কাঁদছে।

কী হয়েছে রুনকি ?

কিছু না মা। নেইল ডাইমন্ডের গান শুনছিলাম। ওর গান শুনলে খুব লোনলি ফিলিং হয়।

রুনকি মিষ্টি করে হাসলো। রাহেলা থেমে থেমে বললেন, আমি কয়েকটি ছেলেকে খেতে বলেছি। তুমি সন্ধ্যাবেলা যেয়ো না কোথাও।

ঠিক আছে মা।

তোমার নীল শাড়িটা পরবে।

বেশ। বিশেষ কাউকে আসতে বলেছো ?

রাহেলা ইতস্তত করে বললেন, আনিস নামের একটি ছেলে আসার কথা, এন-ডি-এস-ইউয়ের টিচার। খুব ভালো ছেলে।

কী করে বুঝলে খুব ভালো ছেলে ?

সফিক বলেছে।

রুনকি হাসি হাসি মুখে বলল, নিশ্চয়ই আনমেরিড। এবং নিশ্চয়ই তুমি চাও আমি খুব ভদ্র নম্রভাবে তার সঙ্গে কথা বলি।

চাওয়াটা কি খুব অন্যায় ?

না অন্যায়, হবে কেন ? তবে মাস্টারদের আমি দু'চোখে দেখতে পারি না।

রাহেলা কঠিন চোখে তাকিয়ে রইল। রুনকি বলল, তোমার চিন্তার কিছুই নেই। আমি খুব ভদ্র ও নম্রভাবে থাকব। একটুও ফাজলামি করব না। দেখবে মিষ্টি মিষ্টি হাসছি শুধু।

৩

আনিসের ঘুম ভাঙল এগারোটায়।

সে কয়েক মুহূর্ত নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারল না সত্যি সত্যি এগারোটা বাজে ? আজ শুক্রবার সাড়ে ন'টায় একটা ক্লাস ছিল। তিনশ' ছয় নম্বর কোর্স 'পলিমার রিয়োলজি।' এখন অবশ্যি করার কিছুই নেই। মিস ক্যাথরীনকে টেলিফোন করে দিতে হবে। ক্লাস মিস করা তেমন কোনো ব্যাপার নয়। সময় করে নিয়ে নিলেই হবে। কিন্তু ঘুমের জন্যে ক্লাসে না যেতে পারাটা লজ্জার ব্যাপার।

আনিস টেলিফোন হুক লাগানো মাত্রই টেলিফোন বেজে উঠল।

হ্যালো আনিস ভাই ? আমি সফিক।

বুঝতে পারছি।

কাল রাত থেকে এই নিয়ে ছয়বার টেলিফোন করেছি। আপনি কি টেলিফোন ডিসকানেক্ট করে রেখেছিলেন ?

হ্যাঁ।

আমি ভাবলাম কী ব্যাপার ? এদিকে আপনার মহিলা কবির নাম পেয়েছি। নাম হচ্ছে মেরি স্টুয়ার্ট।

আনিস ক্লান্ত ভঙ্গিতে বলল, মেরি স্টুয়ার্ট নয়। ভদ্রমহিলার নাম এমিলি জোহান। রাত্রে মনে করতে পারছিলাম না, এখন মনে পড়েছে।

আনিস ভাই আপনার কি শরীর খারাপ ?

না, শরীর ঠিক আছে।

আমিন সাহেবের বাসায় যাবার কথা মনে আছে তো ?

আজকে তো নয়, কাল।

হ্যাঁ কাল। শুনুন আনিস ভাই, আমি আসছি।

এখন ?

এই দশ মিনিটের মধ্যে। সিরিয়াস কথা আছে।

আনিস টেলিফোন রেখে চায়ের পানি বসিয়ে দিল। পানি গরম হতে হতে হাত-মুখ ধুয়ে আসা যাবে। হাত-মুখ ধুতে গিয়ে মনে পড়ল আরেকটি প্রাণী আছে। আশ্চর্য এত বড় একটা ব্যাপার এতক্ষণ মনে পড়ল না কেন ?

কিন্তু মালিশা ছিল না। ঘরের বিছানা সুন্দর করে পাতা। বিছানার উপর এক

টুকরো সাদা কাগজ পড়ে আছে। আনিস দেখলো সেখানে পেন্সিলে লেখা— তুমি ঘুমাচ্ছ দেখে জাগালাম না। অনেক ধন্যবাদ।

আনিসের কেন যেন একটু মন খারাপ লাগল। অথচ মন খারাপ হবার কোনো কারণ নেই। আজকের দিনটি খুবই খারাপ যাচ্ছে। মাঝে মাঝে এরকম খারাপ দিন আসে। কোনোকিছুই ঠিকমতো হয় না।

সফিকের দশ মিনিটের মধ্যে আসার কথা। সে দু'ঘণ্টার মধ্যেও আসলো না। মিস ক্যাথরীনকেও টেলিফোন করে পাওয়া গেল না। ইউনিভার্সিটিতে এখন গিয়ে হাজির হওয়ার কোনো মানে হয় না। আনিসের মনে হলো তার জ্বর আসছে। কী ভয়ঙ্কর খারাপ দিন! টিভি-র নিউজ চ্যানেলে পর্যন্ত একটিও ভালো খবর নেই।

ক্যান্টাকিতে দুটি শিশুকে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

সল্ট-টু ট্রিটির আলোচনা ভেস্তে গেছে।

বেলজিয়ামের লিয়েগে শহরে একটি ট্রেন নদীতে পড়ে দেড়শ' লোকের সলিল সমাধি হয়েছে।

বাগানে চেয়ার সাজানো হয়েছে।

রুনকির মনে হলো তার মা কিছুটা বাড়াবাড়ি করছে। দু'বার টেবিল ক্লথ পাল্টানো হয়েছে। ফুলদানিতে ফুল সাজানো হয়েছে। স্টেরিও সিস্টেমকে টেনে আনা হয়েছে বাইরে।

রুনকি বলল, মা তুমি বড্ড হুলস্থুল করছো।

রাহেলা অসন্তুষ্ট হলেন। তার কপালের চামড়ায় সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল, বাইরে চেয়ার পেতে বসলে বুঝি হুলস্থুল হয় ?

তা হয় না কিন্তু ফুলদানি রাখলে হুলস্থুল হয়। তুমি ছয় ডলার খরচ করে ফুল আনিয়েছ মা।

বেশ তো, তোমার অপছন্দ হলে ফুলদানি তুলে নাও।

রুনকি অপ্রস্তুত হলো। তার মা স্পষ্টই রেগে গেছেন। সে তার মাকে ঠিক বুঝতে পারে না। অত্যন্ত ছোট কারণে তিনি অসম্ভব রেগে যেতে পারেন। রুনকি হাসি হাসি মুখে বলল, মা তুমি যদি চাও তাহলে আমি নীল শাড়িটা পরব।

আমার আবার চাওয়াচাওনি কী রুনকি ? আমি কখনো কারো কাছে কিছু চাইনি।

রুনকি মুখ কালো করে তার ঘরে চলে গেল। এমন একটি চমৎকার দিন কেমন করেই না নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রুনকি তার ঘরে দরজা বন্ধ করে দিল। এই ঘরে নিজের মনে কাঁদা যায়। উঁচু ভ্যলুমে গান বাজানো যায়। এটি তার নিজের গোপন পৃথিবী।

টুক টুক করে টোকা পড়ছে দরজায়। নিশ্চয়ই বাবা। এমন শালীন ভঙ্গিতে বাবা ছাড়া আর কেউ দরজা নক করতে পারেন না। রুনকি নরম গলায় বলল, কী চাও বাবা ?

দরজা খুলো বেটি। তোমার জন্যে একটা সারপ্রাইজ আছে।

কী সারপ্রাইজ ?

খুলেই দেখো।

রুনকি বেরিয়ে এলো, তার দু'চোখ ভেজা। চুল এলোমেলো।

তোমার জন্যে একটি গিফট প্যাকেট এসেছে। ইটালি থেকে।

ইটালিতে কে আছে তোমার মা ?

টম। সামার কাটাতে গিয়েছে।

রুনকি প্যাকেট খুলে স্তম্ভিত হয়ে গেল। প্লাস্টার অব প্যারিসের তৈরি অপূর্ব একটি নারী মূর্তি। নিশ্চয়ই মাইকেল এঞ্জেলোর কোনো ভাস্কর্যের ইমিটেশন। রুনকি গাঢ় স্বরে বলল, কী সুন্দর দেখেছ ?

হ্যাঁ সুন্দর। খুবই সুন্দর।

মাকে দেখিয়ে আনি।

রুনকি ছুটে বেরিয়ে গেল।

রাহেলা রান্না ঘরে। রান্নারান্নার কাজ অনেক আগেই শেষ হয়েছে। খাবারদাবার গরম রাখার জন্যে শুধু ওভেনে দিয়ে রাখা। অনেকরকম আয়োজন হয়েছে তবু রাহেলার মনে হচ্ছে আয়োজন পূর্ণাঙ্গ হয়নি। কাঁচামরিচ নেই ঘরে, হর্নবাকারসে কাঁচামরিচ পাওয়া যায়নি। তিনি বা আমিন সাহেব কেউ অবশ্যি ঝাল খান না, তবে প্রবাসী বাঙালিরা খাবার টেবিলে কাঁচামরিচ দেখতে ভালোবাসে।

মা দেখো টম কী পাঠিয়েছে।

কোন টম— পাগল টম ?

রুনকি বেশ বিরক্ত হলো। টম আবার কয়জন আছে যে পাগলা টম বলতে হবে ? রুনকি বলল, মূর্তিটি আমি বাগানে সাজিয়ে রাখি মা ? তোমার অতিথিরা দেখলে অবাক হবে।

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, না রুনকি, এটি তোমার ঘরেই থাক। মূর্তিটি অশালীন।

রুনকি স্তম্ভিত হয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর ঝড়ো বেগে দোতলায় উঠে গেল।

অতিথিদের মধ্যে প্রথম আসলেন নিশানাথ রায়। গ্রান্ড ফোকস ইউনিভার্সিটির অঙ্কের প্রফেসর। ভদ্রলোকের বয়স ৫৫ কিন্তু দেখায় ৭০-এর মতো। লম্বা দড়ি

পাকানো চেহারা। যে-কোনো নিমন্ত্রণে সবার আগে এসে উপস্থিত হন এবং নিরিবিলি একটি কোণ বেছে চোখ বন্ধ করে বসে থাকেন কিংবা ঘুমান। আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতেও ক্লাস নিতে গিয়ে একই কাণ্ড। তবু তিনি টিকে আছেন কারণ 'টপলজি'তে একজন প্রথম শ্রেণীর বিশেষজ্ঞ হিসেবে তাঁকে এখনো ধরা হয় (যদিও টপলজি তিনি ছেড়েছেন দশ বছর আগে)। অনেকের ধারণা গ্রান্ড ফোকস ইউনিভার্সিটির নাম লোকে জানে কারণ প্রফেসর নিশানাথ এখানে মাস্টারি করেন।

নিশানাথ বাবু তাঁর স্বভাবমতো পাঁচটার দিকেই এসে পড়লেন এবং লজ্জিত স্বরে বললেন, দেরি করে ফেললাম নাকি ?

আমিন সাহেব হাসিমুখে বললেন, না দেরি হয়নি। চা দেব, না লিকার ?

নিশানাথ বাবু বিড়বিড় করে কি যেন বললেন। পরিষ্কার বোঝা গেল না। তিনি বেছে বেছে সবচে' পেছনের একটি চেয়ারে পা উঠিয়ে বসলেন। আমিন সাহেব মার্টিনির একটি বড় গ্লাস নিয়ে এসে দেখেন নিশানাথ বাবু চোখ বন্ধ করে ফেলেছেন।

নিশানাথ বাবু নিন, মার্টিনি এনেছি।

ইয়ে কী যেন বলে, আমি অবশ্যি চা চেয়েছিলাম।

চা নিয়ে আসতে পারি, পানি গরম আছে।

নিশানাথ বাবু তার উত্তর দিলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন।

রাত আটটা বেজে গেল। অন্য দুজন নিমন্ত্রিতের কোনো খোঁজ নেই। সফিকের ঘরে টেলিফোন করা হলো কয়েকবার কেউ ধরল না। রুনকি বলল, নিশ্চয়ই কোনো অসুবিধা হয়েছে মা। তুমি এমন মুখ কালো করে থেকো না।

কী আজেবাজে কথা বলো রুনকি ? মুখ কালো করব কেন ?

আমি সরি মা।

ঠিক আছে খেতে বসো।

নিশানাথ বাবু নিঃশব্দে খেয়ে যাচ্ছেন। আমিন সাহেব একবার বললেন, রান্না কেমন হয়েছে নিশানাথ বাবু ?

নিশানাথ বাবু তার জবাব দিলেন না। তিনি কখনো অপ্রয়োজনীয় প্রশ্নের জবাব দেন না। রুনকি বলল, নিশা চাচার জিহ্বায় কোনো টেস্টবাড নেই। তিনি যাই খান তাই তাঁর কাছে ঘাসের মতো লাগে। তাই না চাচা ?

নিশানাথ বাবু তার উত্তরে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তখন টেলিফোন বাজলো। টেলিফোন ধরলেন রাহেলা।

হ্যালো, আমি সফিক।

রাহেলা শুকনো গলায় বললেন, আমরা সবাই খেতে বসেছি, একটু পরে ফোন করতে পারো ?

রাহেলা কঠিন মুখ করে খেতে বসলেন। রুনকি মায়ের দিকে না তাকিয়ে বলল, মা, এটা কিন্তু তুমি ঠিক করলে না।

রাহেলা উত্তর দিলেন না। নিশানাথ বাবু বললেন, প্রচুর আয়োজন করেছেন। মনেই হয় না বিদেশ। রুনকি বলল, মা ওদের হয়তো বিশেষ কোনো ঝামেলা হয়েছে। টেলিফোন নামিয়ে না রেখে তোমার উচিত ছিল...

আমার কী উচিত অনুচিত তা আমি তোমার কাছ থেকে শিখতে চাই না। তুমি ভাজা মাছ আরো নেবে ?

না।

নিশানাথ বাবু আপনি নেবেন ?

না।

নিশানাথ বাবু অবাক হয়ে বললেন, এটা ভাজা মাছ ? আমি ভাবছিলাম...।

রুনকি বলল, তুমি শুধু শুধু রাগ করছো মা। ওদের নিশ্চয়ই বড় রকমের কোনো ঝামেলা হয়েছে।

নিশানাথ বাবু বললেন, কাদের ঝামেলা হয়েছে ?

যাদের আসবার কথা ছিল তাদের।

কী ঝামেলা ?

সেটা এখনো জানা যাচ্ছে না। হয়তো ভদ্রলোক বাথরুমে গিয়ে দেখেন বাথটাবে একটি ডেড বডি পড়ে আছে। ডেড বডিটির পিঠে একটি ওরিয়েন্টাল কাজ করা ছুরি।

আমিন সাহেব হেসে ফেললেন। রুনকি বলল, হাসির কী হলো বাবা ? হতেও তো পারে।

নিশানাথ বাবু বললেন, এদেশে সবই সম্ভব। খুন খারাবি এদের কাছে কিছুই না, অতি অসভ্য বর্বরের দেশ।

ঝামেলাটা কী হয়েছে তা জানা গেল কিছুক্ষণের মধ্যেই। গাড়ি নিয়ে হাইওয়েতে আটকা পড়েছে। সফিকের প্রাচীন ফোর্ড ফিয়াসটার ট্রান্সমিশন কাজ করছে না। হাইওয়ের একটি রেস্ট হাউসে বসে আছে দু'জন। রুনকি বলল, রাস্তার মাঝখানে গাড়ি নিয়ে আটকা পড়া দারুণ এক্সাইটিং। রাহেলা ভ্রু কুঁচকালেন। ঠান্ডা স্বরে বললেন, এর মধ্যে এক্সাইটিং কী দেখলে তুমি ? সাধারণ মানুষদের মতো ভাবতে শেখো। গাড়ি নিয়ে আটকা পড়াটা হচ্ছে যন্ত্রণা। এক্সাইটমেন্ট নয়।

তুমি এত রেগে রেগে কথা বলছো কেন মা ?

রুনকি কথা বন্ধ করে গাড়ি নিয়ে ওদের খোঁজে যাও। তোমার বাবাকে পাঠাব না। সন্ধ্যা থেকে মার্টিনি খাচ্ছে, ওর হাত স্টেডি নেই।

কথাটা ঠিক না। দুপেগের মতো মার্টিনি আমিন খেয়েছেন। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। রাহেলার মেজাজ চড়ে আছে। চুপ করে থাকাই ভালো। নিশানাথ বাবু বসার ঘরের সোফায় পা গুটিয়ে আবার ধ্যানস্থ হয়েছেন। আমিন তার পাশে এসে বসতেই তিনি বললেন— বুঝলেন, অতি অসভ্য অতি বর্বর জাত।

রাহেলা রুনকির সাথে গ্যারাজ পর্যন্ত গেলেন। রুনকির হাতে চাবি দিয়ে বললেন,

নতুন ছেলেটির সঙ্গে খুব ভদ্র ব্যবহার করবে। রুনকি অবাক হয়ে বলল, আমি অভদ্র মা? কী বলছো তুমি?

যা বলছি মন দিয়ে শোনো। আমি চাই তুমি বাঙালি ছেলেদের সঙ্গে কিছুটা মেলামেশা করো।

রুনকি চুপ করে রইল। রাহেলা বললেন, তোমার একটি ভালো বিয়ে হোক সেটাই আমি চাই। আমি তোমাকে হ্যাপি দেখতে চাই।

বাঙালি ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলেই আমি হ্যাপী হব? তোমার তো বাঙালি ছেলের সঙ্গেই বিয়ে হয়েছে। তুমি কি হ্যাপি?

রাহেলা উত্তর দিলেন না। রুনকি বলল, এইসব নিয়ে আমি এখন ভাবতে চাই না। আর আমি চাই না তুমিও ভাব। ইদানীং আমাকে নিয়ে তুমি বেশি চিন্তা করছো।

তুমি বলতে চাও চিন্তার কিছু নেই?

রুনকি গাড়িতে উঠে ইঞ্জিন স্টার্ট দিল। রাহেলা বললেন, শাড়ি একটু উপরের দিকে টেনে নাও। এক্সিলেটরের সঙ্গে যেন না লেগে যায়।

হাইওয়েতে নেমেই রুনকি গাড়ির স্পীড বাড়িয়ে সত্তরে নিয়ে এল। গ্র্যান্ড ফোকস থেকে ফার্গো ইন্টারস্টেট হাইওয়ে ফাঁকা থাকে বলেই পুলিশটুলিস তেমন থাকে না। যত ইচ্ছা স্পিড তোলা যায় গাড়িতে। রুনকির বান্ধবী শ্যারন একবার পঁচানব্বই পর্যন্ত তুলেছিল। কী প্রচণ্ড কাঁপুনি গাড়ির। রুনকির এতটা সাহস নেই। সত্তরেই তার খানিকটা হাত কাঁপে। তা ছাড়া 'ফল সিজন' বলেই গাছের পাতা ঝরছে। শুকনো পাতার উপর দিয়ে গাড়ি গেলে অদ্ভুত শব্দ হয়, কেমন যেন ভয় ভয় করে।

আপনাদের নিতে এসেছি আমি।

আনিস মেয়েটিকে দেখে অবাক হলো। হালকা-পাতলা গড়নের বাচ্চা একটি মেয়ে। শিশুদের চোখের মতো তরল চোখ। কেমন যেন অভিমানী পাতলা ঠোঁট।

আপনি বুঝি সেই টিচার? আনিস? আনিসের উত্তর দেয়ার আগেই মেয়েটি বলল, আমি কিন্তু মাস্টারদের একটুও পছন্দ করি না। আপনি আবার রাগ করবেন না যেন।

আনিস হাসিমুখে বলল, না আমি রাগ করব না।

মাস্টাররা ক্লাসের বাইরে কিছু জানে না, জানতে চায়ও না।

তাই কি ?

হ্যাঁ। আমি দশ ডলার বাজি রাখতে পারি আপনি কবি কিটসের প্রণয়িনীর নাম জানেন না।

আনিস অবাক হলো। মেয়েটির মুখ হাসি হাসি কিন্তু ঝগড়া বাঁধানোর একটা সূক্ষ্ম চেষ্টা আছে। সফিক তার গাড়ি নিয়ে এখনো ব্যস্ত। তার ধারণা ঝামেলাটা আসলে ট্রান্সমিশনে নয় কারবুরেটরে, আর খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলেই সে ঠিক করে ফেলতে পারবে।

আনিস একটি সিগারেট ধরিয়ে মৃদু স্বরে বলল, কবি কিটসের প্রণয়িনীর নাম জানা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় নয়।

আইনস্টাইনের কয় স্ত্রী সেটা জানা বোধহয় অত্যাবশ্যকীয় ?

না, তা নয়। এইসব হচ্ছে বিলাস।

সফিকের গাড়ি একটি ছোট গর্জন করে আবার ঠান্ডা হয়ে গেল। সে হাসি মুখে বলল, দেখলেন তো আনিস ভাই, প্রায় কায়দা করে ফেলেছি। আর দশ মিনিট।

আনিস সে কথার জবাব দিল না। রুনকি মাথার স্কার্ফ শক্ত করে বাঁধতে বাঁধতে মৃদু স্বরে বলল, আমি তর্ক করে আপনাকে রাগিয়ে দিতে চাই না। তাহলে মা খুব রাগ করবেন। মাকে আমি রাগাতে চাই না। তাঁর কিছুদিন আগেই নার্ভাস ব্রেক ডাউন হয়েছিল। আরেকবার হলে খুব মুশকিল হবে।

সফিকের গাড়ি স্টার্ট নিয়েছে। বিকট শব্দ আসছে সেখান থেকে।

সফিক কোমরে হাত দিয়ে গাড়িকে উদ্দেশ করে ছোটখাটো বক্তৃতা দিয়ে ফেলল— শালা, তুমি মানুষ চেন নাই। কত ধানে কত চাল বুঝো নাই। শালা, এক চড় দিয়ে তোমার দাঁত খুলে ফেলব...।

রুনকি খিলখিল করে হেসে ফেলল।

৪

ফাইভ হানড্রেড লেভেলের একটি ক্লাস ছিল সাড়ে দশটায়। আনিস ক্লাসে ঢুকে দেখলো, চেয়ারম্যান ড. হিল্ডারবেন্ট পেছনের দিকে বসে আছে। হিল্ডারবেন্ট একা নয়, অরগেনিক কেমিস্ট্রির ড. বায়ারও কফির পেয়ালা হাতে বসে আছেন। হিল্ডারবেন্ট বলল, আমরা তোমার ক্লাসে বসতে পারি তো ?

আনিস বলল, নিশ্চয়ই।

কোনো প্রশ্নট্রশ্ন আবার জিজ্ঞেস করো না হা হা হা। আনিস অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। হঠাৎ করে তার ক্লাসে এসে বসার কারণ বোঝা যাচ্ছে না। তবে এরা তাকে

পছন্দ করছে না এটুকু পরিষ্কার বোঝা যায়। পছন্দ না হবার কারণ তার জানা নেই। কোনো কারণ থাকার কথাও নয়।

আনিস বক্তৃতা শুরু করল। ড. বায়ার কিছু শুনছে বলে মনে হলো না। কিন্তু গলায় ফিসফিস করে কী যেন বলছে হিল্ডারবেন্টকে। একবার দুজনেই সশব্দে হেসে উঠল। হিল্ডারবেন্ট আনিসের দিকে তাকিয়ে বলল, সরি আনিস। তুমি চালিয়ে যাও। আনিস যেতে পারল না। ড. বায়ার হঠাৎ করে বললেন, তোমার ইংরেজি কথা আমি ঠিক ধরতে পারছি না আনিস। তুমি কি আরেকটু স্লো যাবে ?

তুমি তো নিজেই কথা বলছো বায়ার। আমি নিজে স্লো বললেও কিছু আসবে যাবে না।

দু'একটি ছেলে হেসে উঠল। হিল্ডারবেন্ট বলল, চালিয়ে যাও। তুমি চালিয়ে যাও।

আনিস দশ মিনিট আগে ক্লাস শেষ করে দিল। হিল্ডারবেন্ট উঠতে যাচ্ছিল, আনিস বলল, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে হিল্ডারবেন্ট।

বলো।

আজকে হঠাৎ আমার ক্লাসে এসে বসলে কেন ? পলিমার রিওলজিতে তোমার কোনো উৎসাহ আছে বলে তো শুনিনি।

হিল্ডারবেন্ট খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমরা বসেছি একটা জিনিস দেখতে। তোমার সম্পর্কে ডীনের অফিসে একটা রিপোর্ট হয়েছে। বলা হয়েছে তোমার উচ্চারণ কেউ বুঝতে পারছে না।

রিপোর্ট কি ছাত্ররা করেছে ?

তা জানি না। তুমি ডীনকে জিজ্ঞেস করতে পারো। আমি অবশ্যি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি তোমার কথা বুঝতে না পারার কোনো কারণ নেই।

ধন্যবাদ।

আনিস কফি খেতে গেল মেমোরিয়াল ইউনিয়নে। ড. এন্ডারসন খাতাপত্র নিয়ে একটি টেবিল দখল করে বসেছিল। আনিসকে দেখেই গম্ভীর মুখে বলল, তোমাদের বাংলাদেশের স্টল দেখে আসলাম।

কী দেখে আসলে ?

লাইব্রেরিতে আন্তর্জাতিক একটা মেলা হচ্ছে। সেখানে তোমাদেরও একটা স্টল দেখলাম।

আনিসের মনে হলো ড. এন্ডারসন যেন হাসি গোপন করবার চেষ্টা করল।

তুমি কফি শেষ করেই যাও।

স্টলের ব্যাপারটি মিথ্যা নয়।

একটি প্রকাণ্ড টেবিল নিয়ে সফিক বসে আছে। সফিকের গায়ে একটি হাতা কাটা স্যান্ডো গেঞ্জি এবং পরনে সবুজ রঙের একটি লুঙ্গি। বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের পোশাক। টেবিলে একটি ময়লা পাঁচ টাকার নোট, দুটি দশ পয়সা। আরেক পাশে একটি বড় ফুলস্কেপ কাগজে মার্কার দিয়ে অ আ লেখা, আনিস স্তম্ভিত।

ব্যাপার কী সফিক ?

আরে আনিস ভাই, আজকে ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টে একটা চাকরির খোঁজে এসেছিলাম। শুনি ইন্টারন্যাশনাল উইক হচ্ছে, বাংলাদেশের একটা কিছু না থাকলে দেশের বেজ্জতি। আমার নিজের কাছে যা ছিল নিয়ে চলে এসেছি।

বলো কী ?

জিনিস কম থাকায় সুবিধা হয়েছে। দেশটা কোথায় কী এইসব সবাই জানতে চাচ্ছে। হা হা হা। নামটা তো জানল, কী বলেন ?

খালি টেবিল নিয়ে সাতদিন বসে থাকবে বুঝি ?

আরে না। আজ বিকালেই রুনকিদের বাড়ি থেকে এক গাদা জিনিসপত্র নিয়ে আসব দেখবেন। হুলস্থুল কারবার করব। একটা মালয়েশিয়ান আমার স্টলের সামনে এসে দাঁত বের করে হাসছিল। শালার অবস্থাটা কী হয় কালকে দেখবেন। রুনকিকে নিয়ে আসব। দেশের ইজ্জতের একটা ব্যাপার। আনিস হাসিমুখে বলল, তোমার চাকরির কী ব্যবস্থা হবে ? এই সাতদিন আর যাচ্ছ না সেখানে ?

আরে ভাই রাখেন চাকরি। মাথার ঘায়ে কুত্তা পাগল অবস্থা এখন।

লোকজন কেউ কেউ এসে দাঁড়াচ্ছেও স্টলের সামনে। কেউ কেউ বিস্মিত হয়ে বলছে, কোন দেশের স্টল এটি ?

বাংলাদেশের।

কোথায় সেটি ? প্যাসিফিক আইল্যান্ড ?

না, এশিয়া মহাদেশে।

কত বড় দেশ সেটি ? কত স্কয়ার মাইল ?

কালকে বলতে পারব। কাল আসবেন।

লোক সংখ্যা কত ?

আগামীকাল জানতে পারবেন। সব লিখে টাঙিয়ে দেয়া হবে।

আনিস দূর থেকে দেখল লোকজন আসছে না সফিকের স্টলে। তবে বুড়ো-বুড়িরা কিছু কিছু আসছে। তারা আবার দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সফিকের বক্তৃতা শুনছে।

দেশটা অত্যন্ত সুন্দর। সবুজ গাঢ় সবুজ। সমুদ্র আর নদী। বনে ঘুরে বেড়ায় ইয়া ইয়া রয়েল বেঙ্গল টাইগার। আগামীকাল যদি আসেন তবে সেই রয়েল বেঙ্গলের ছবিও দেখতে পাবেন। দয়া করে আসবেন। ভুলবেন না।

৫

সফিকের কাণ্ডকারখানাই অন্যরকম।

পাঁচটা ডলার পকেটে নিয়ে ফার্গোতে এসে এক মাসের মধ্যে দু'শ চল্লিশ ডলার দিয়ে গাড়ি কিনে ফেলল। আমিন সাহেব খবর পেয়ে বিরক্ত হলেন খুব, গাড়ি কিনলে গাড়ির দরকারটা কী তোমার ?

সফিক মাথা চুলছে বলছে, দেশের সম্মানের জন্যেই কাজটা করলাম।

দেশের সম্মান ? দেশের সম্মান মানে ?

গরিব দেশ গরিব দেশ করে তো, বুঝলেন না শালাদের দেখিয়ে দিলাম আর কী !

তোমার দু'শ চল্লিশ ডলারের গাড়ি দিয়ে ওদের দেখিয়ে দিলে ? চালাতে জানো গাড়ি ?

শিখব।

এখানেই শেষ নয়, আর্টসের ছাত্র কীভাবে সায়েন্সের কম্বিনেশনে চার-পাঁচটা সাবজেক্ট নিয়ে ফেলল। আমেরিকায় এসে ইতিহাস-ভূগোল পড়ে লাভটা কী ? পড়তে হলে পড়তে হয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি কম্প্যুটার সায়েন্স।

মিড টার্মের রেজাল্ট হওয়ার পর ফরেন স্টুডেন্ট এডভাইজার টয়লা ক্লিন ডেকে পাঠালেন সফিককে। রেজাল্ট ভয়াবহ। তিনটি ডি এবং একটি সি।

সফিক, তোমার দেশ কোথায় ?

সফিক গম্ভীর হয়ে বলল, ইন্ডিয়া ম্যাডাম। ক্যালকাটা সিটি।

টয়লা ক্লিন কাগজপত্র ঘেঁটে সফিকের চেয়েও গম্ভীর হয়ে বললেন, কিন্তু আমার কাছে যেসব কাগজপত্র আছে সেখানে লেখা বাংলাদেশ।

সফিক মাথা চুলকায়, জবাব দেয় না।

তুমি কি দয়া করে ব্যাপারটা আমার কাছে এক্সপ্লেইন করবে ?

রেজাল্ট যা হয়েছে ম্যাডাম। এতে দেশের একটা বদনাম হয়ে যায় এই জন্যেই বলি ইন্ডিয়া।

টয়লা ক্লিনের গাম্ভীর্য মনে হয় খসে পড়ছে। ঠোঁটের কোনায় মৃদু হাসি।

তোমার দেশের সব ছাত্র বুঝি 'এ' পায় ?

ম্যাডাম আমার দেশের ছাত্ররা সব বাঘের বাচ্চা। যে-কোনো আমেরিকান স্ট্রেইট 'এ' ছেলেমেয়েদের এরা কুৎ করে পানি দিয়ে গিলে ফেলবে।

তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

অর্থাৎ এরা খুব মারাত্মক। একেবারে গ্রীন পেপার।

টয়লা ক্লিন বলে দিলেন ফাইন্যালে যে করেই হোক এভারেজ সি থাকতেই

হবে। জিপিএ ২-এর কম হলে ভিসা রিনিউ হবে না। দেশে ফিরে যেতে হবে।

বাইরে দিনে ছয় সাত ঘণ্টা কাজ করে পড়ারই সময় পাই না ম্যাডাম।

কোথায় কাজ করো তুমি ?

নিক্স প্লেসে। বিয়ার বিক্রি হয় সেখানে।

চারদিন পর সফিকের কাছে টয়লা ক্লিনের এক চিঠি এসে হাজির।

প্রতি ঘণ্টায় মিনিমাম ওয়েজ তিন ডলার পঞ্চাশ সেন্ট করে তোমাকে লাইব্রেরিতে একটি কাজ দেয়া হলো। এখন পড়াশোনার ভালো সুযোগ পাবে।

লাভ কিছু হলো না। ফাইন্যালে দেখা গেল চারটাই ডি। টয়লা ক্লিন ভ্রু কুঁচকে বলল, এখন কী করবে ?

গভীর সমুদ্রে ম্যাডাম। বিষ খাওয়া ছাড়া উপায় নাই কিছু।

আরেকটা কোয়ার্টারের সুযোগ যাতে দেয় এই চেষ্টা করব ? প্রথম দিকে কিছু সহজ কোর্স নিলে কেমন হয় ?

সফিককে দ্বিতীয় কোয়ার্টারের সুযোগ দেয়া হলো। ডীনের অফিস থেকে পার্মিশনের জন্যে টয়লা ক্লিনকে প্রচুর দৌড়াদৌড়ি করতে হলো। দ্বিতীয় কোয়ার্টারে হলো দুটি ডি এবং একটি সি ও একটি এফ। টয়লা ক্লিন গম্ভীর হয়ে বলল, এই ইউনিভার্সিটিতে তুমি আর পড়তে পারছো না সফিক। কী করবে এখন ? দেশে ফিরে যাবে ?

না।

ইল্লিগেল অ্যালিয়েন হিসাবে থাকবে ?

হ্যাঁ।

টয়লা ক্লিন শান্ত স্বরে বলল, গুড লাক। আমেরিকা হচ্ছে ল্যান্ড অব অপরচুনিটি। কিছু একটা হয়েও যেতে পারে তোমার।

সফিক গ্রেভার ইনের কাছে একটা ঘর ভাড়া করে নিক্স প্লেসের কাজে লেগে গেল।

নিক্স প্লেস যে মহিলাটি চালায় তার নাম জোসেফাইন নিক্স। লম্বায় চার ফুট তিন ইঞ্চি। দৈর্ঘ্যের স্বল্পতা সে অবশ্যি পুষিয়ে নিয়েছে ওজন দিয়ে। বর্তমান ওজন ২৩০ পাউন্ড। সে ওজনও প্রতি সপ্তাহে বাড়ছে। গায়ের রঙ ঘন কৃষ্ণ বর্ণ। গত ছয় পুরুষ ধরে আমেরিকায় বাস করেও আফ্রিকার আদিম বর্ণের কিছুমাত্র পরিবর্তন হয় নি। সফিককে চাকরি দেবার সময় সে ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, তোমাকে চাকরি দিচ্ছি একটি মাত্র কারণে, তোমার গায়ের রং কালো। সাদা মানুষগুলোকে ঈশ্বর বিষ্টা দিয়ে তৈরি করেছেন। সাদা মানুষের রক্তের মধ্যে একটা জিনিসই আছে, সেটা কী জানো ?

না।

বিষ। আসল হেমলক বিষ। পৃথিবীতে যত অন্যায় অবিচার হয়েছে সব করেছে সাদা মানুষ।

তাই কি ?

একদম খাঁটি কথা। আমার এখানে সাদা মানুষ ঢুকলে পাছায় লাথি দিয়ে বের করে দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তা দেয়া যায় না। কারণ ফেডারেল আইনে সাদা এবং কালোর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই। কী কুৎসিৎ আইন। সাদা কখনো কালোর সমান হয় ?

জোসেফাইনের এখানে একটি সাদা ছেলেও কাজ করে। কিন্তু তাতে জোসেফাইনের কিছুই যায় আসে না। চক্ষু লজ্জাটজ্জা বলে তার কাছে কিছু নেই।

সাদা মানুষদের মুণ্ডুপাত না করে সে তার দিন শুরু করে না।

হ্যারি (জোসেফাইনের স্বামী) যে আজ জেলে খাবি খাচ্ছে সে কিসের জন্যে ? কী কারণে ? একটি মাত্র কারণ জজ সাহেব ছিল সাদা। জুরিরা ছিল সাদা। যে পুলিশ ধরেছে সেও ছিল সাদা। এই অবস্থায় হ্যারির বিশ বছরের জেল হবে না তো কার হবে ? ইলেকট্রিক চেয়ারে নিয়ে যে বসায় নি সে আমার উপর মাদার মেরির অসীম করুণা আছে বলেই।

হ্যারির অভাবে জোসেফাইন যে খুব কাতর সে রকম মনে করারও কোনো কারণ নেই। দিনের মধ্যে দু'একবার সে বলবেই যিশু খ্রিস্টের দয়া হ্যারি এখন জেলে। বাইরে থাকলে নিক্স প্লেসের অর্ধেক বিয়ার সে-ই খেয়ে ফেলত। এখন ভালো হয়েছে। জেলে বসে আঙুল চুষছে।

কাস্টমারদের সঙ্গে নিত্যদিন খিটিমিটি লেগে আছে। কেউ হয় তো বলল, ব্লাডি মেরিতে জল মনে হচ্ছে বেশি হয়ে যাচ্ছে জোসেফাইন।

বেশি হলে খেয়ো না। তোমাকে পায়ে ধরে সাধছি ?

পয়সা দিচ্ছি, ঠিক জিনিস খাব। পানি মেশানো ব্লাডি মেরি খাব কেন ?

আলবত খাবে। তুমি একা-নও তোমার চৌদ্দগুষ্টি খাবে।

টাকাপয়সা নিয়েও সফিকের সঙ্গে তার খিটমিটি লেগেই আছে। ঘণ্টায় দু'ডলারের বেশি কিছুতেই দেবে না। পোষালে কাজ করো, না পোষালে করবে না। দশ ঘণ্টা কাজ করলে সে হিসাব করে বের করে সাত ঘণ্টা কাজ হয়েছে। তার বড় মেয়ে এ্যালেনকে নিয়েও তার আদিখ্যাতার অন্ত নেই। সুযোগ পেলেই গলা নিচু করে বলবে, খবরদার কোনোরকম ফষ্টিনষ্টির চেষ্টা করবে না। আমার মেয়েটা খারাপ। একটু ইশারা করলেই সর্বনাশ। আমি যদি দেখি এইসব কিছু হচ্ছে তাহলে খুন করে ফেলব, হুঁ হুঁ।

এ্যালন নিজেও তাঁর মায়ের মতো তিনমণি বস্তা। তাকে নিয়ে ফষ্টিনষ্টি করার ইচ্ছা হবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু মেয়ের মা তা বোঝে না।

মেয়েটির স্বভাব-চরিত্র অবশ্যি সত্যি সত্যি ভালো না। আড়ালে পেলেই সফিকের সঙ্গে কুৎসিত সব অঙ্গভঙ্গি করে। একদিন বেশ ভালো মানুষের মতো সফিককে মুভি দেখাতে নিয়ে গেল। মুভি দেখাবার এত সাধ্য-সাধনার কারণ জানা গেল মুভি শুরু হবার পর। হার্ড করে পর্নো মুভি একটি। মেয়েটি মেঘ স্বরে বলল, সব কায়দাকানুন যাতে শিখতে পারো সে জন্যেই নিয়ে এলাম। অনেক কিছু জানার আছে।

৬

টুক টুক করে টোকা পড়ছে দরজায়।

তার মানে যে এসেছে সে পরিচিত কেউ নয়। পরিচিতরা ডোরবেল বাজায়। ডোরবেলটি এমন জায়গায় যে অচেনা কারো চোখে পড়ে না।

আনিসের মনে হলো যে এসেছে সে একজন মহিলা। শুধুমাত্র মেয়েরাই দরজায় দু'বার টোকা দিয়ে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে তৃতীয়বার টোকা দেয়। ছেলেদের এত ধৈর্য নেই।

আনিস দরজা খুলে দিল। একটি মেয়েই দাঁড়িয়ে আছে, মালিশা। দিনের আলোয় তাকে একেবারেই চেনা যাচ্ছে না। তার উপর সে বেশ সাজগোজ করেছে। কাঁধে লাল টকটকে ভেলভেটের ব্যাগ। সোনালি চুলগুলোকে লম্বা বেণি করে কাঁধের দু'পাশে ঝুলিয়ে দিয়েছে। রাতের আলোয় যতটা অল্প বয়সী মনে হয়েছিল এখন অবশ্যি সে রকম লাগছে না।

তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো?

তা পারছি। তুমি মালিশা। মালিশা গিলবার্ড।

আমি কি ভেতরে এসে বসতে পারি?

হ্যাঁ পারো।

মেয়েটি ঘরে ঢুকেই বলল, তুমি সন্ধ্যাবেলা ফ্রি আছো?

কেন বলো তো?

আমি তোমাকে কোনো একটি ভালো রেস্টুরেন্টে নিয়ে যেতে চাই। আজ আমার জন্মদিন।

শুভ জন্মদিন মালিশা।

ধন্যবাদ। তুমি কি যাবে আমার সঙ্গে?

আনিস ইতস্তত করতে লাগল।

তোমার ইচ্ছা না হলে যেতে হবে না।

আনিস বলল, কোথায় যেতে চাও?

আমার পকেটে চল্লিশ ডলার আছে। এর মধ্যে হয় এরকম কোনো রেস্টুরেন্টে। ম্যাক্সিকান খাবার তোমার পছন্দ হয় ? সেগুলো বেশ সস্তা।

ম্যাক্সিকান খাবার আমার খুব পছন্দ।

তোমাকে খুব একটা ভালো রেস্টুরেন্টে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল আমার। কিন্তু কী করব বলো ? রোজগারপাতি নেই। হাই স্কুল পাস করিনি। কাজেই রেস্টুরেন্টের ওয়েট্রেস আর বেবি সিটিং-এর বেশি কিছু পাই না। চল্লিশ ডলার জমাতে হলে আমাকে দু'মাস রোজ আট ঘণ্টা করে কাজ করতে হয়।

আনিস বলল, তুমি যদি কিছু মনে না করো তাহলে আমি বরং ডিনারটা কিনি।

মালিশা হেসে ফেলল।

এখন আমার অবস্থা খুবই খারাপ। কিন্তু শিগগিরই আমি মাল্টি মিলিওনিয়ার হচ্ছি। কাজেই টাকা খরচ করতে মায়া লাগে না আমার।

আনিস বলল, মিলিওনিয়ার সত্যি সত্যি হচ্ছ তুমি ?

ইউ বেট। আমার মা ডলারের বস্তার উপর শুয়ে আছে। আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছে যদি বিষটিষ খাইয়ে দেই। আমিও বুড়িকে ভজিয়ে ভজিয়ে রাখছি। প্রতি সপ্তাহে চিঠি দেই— মা, তোমার শরীর কেমন আছে ? ঠিকমতো ওষুধপত্র খাচ্ছ তো ? গরমের সময় অবশ্যই হাওয়াই থেকে ঘুরে আসবে। হা হা হা।

আনিস হেসে ফেলল। মালিশা বলল, বুড়ো বুড়ি হলেই মানুষ এরকম হয়ে যায়। ডলারই তখন প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। জীবন দিয়ে ডলার আগলে রাখে। আমার মতে পঞ্চাশ-এর উপর বয়স হলেই তাকে ঘাড় ধরে একটা নির্জন দ্বীপে ফেলে দিয়ে আসা উচিত। না না আমি খুব সিরিয়াস। জানো, তুমি আমার মার কত টাকা আছে ? আন্দাজ করতে পারো ?

না।

মা দু'নম্বর বিয়ে করে একজন পোল ব্যবসায়ীকে। তার হচ্ছে সি কার্গোর ব্যবসা। আমার স্টেপ ফাদার মারা যাবার পর সব কিছু আমার মা পেয়েছে। তার মধ্যে আছে রাজপ্রাসাদের মতো দু'টি বাড়ি। একটি ফ্লোরিডাতে অন্যটি বোহেমিয়া আইল্যান্ডে। মা সব কিছু বিক্রি করে ডলার বানিয়ে ব্যাংকে জমা করেছে। নিজে গিয়ে উঠেছে ওল্ড হোমে। সস্তায় থাকা-খাওয়া যায়। বিশ্বাস করতে পারো ?

বিশ্বাস করা কঠিন।

আমি তারই মেয়ে। আর দেখো চল্লিশটি ডলার খরচ করতে আমার গায়ে লাগছে।

আনিস দেখল মেয়েটির চোখ ছলছল করছে। আমেরিকান মেয়ে কাঁদবে না ঠিকই। এরা মচকাতে জানে না। আনিস বলল, ছ'টার আগে নিশ্চয়ই তুমি খেতে যাবে না ? কফি খাও একটু ?

দাও।

কফিতে দুধ চিনি দাও তুমি ?

দু'চামচ চিনি। দুধ চাই না।

আনিস কফি বানাতে বানাতে বলল, মিলিওনিয়ার যখন হবে তখন এত টাকা খরচ করবে কীভাবে ?

প্রথমেই প্লাস্টিক সার্জারি করব। আমার বুক দুটি বড়ই ছোট। সিলিকোন ব্যাগ দিয়ে বড় করব। আমাকে দেখে অবশ্যি বোঝা যায় না আমার বুক এত ছোট। আমি অন্য ধরনের ব্রা ব্যবহার করি। ফোম ব্রা।

ও আচ্ছা।

এই ব্রাতে ছোট বুকও খুব এট্রাকটিভ মনে হয়। ব্রা খুললেই তুমি হতাশ হবে। দেখতে চাও ?

না না, ঠিক আছে বিশ্বাস হচ্ছে তোমার কথা।

তাছাড়া আমার নাকটাও বেশি ভালো না। মনে হয় অনেকখানি ঝুলে আছে। তাই না ?

আমার তো মনে হয় না।

তোমার সৌন্দর্যবোধ নেই তাই বুঝতে পারছো না। নাকটা অল্প একটু তুলে দিলেই সব বদলে যাবে।

কেমন বদলাবে ?

যেমন ধরো তখন যদি তোমাকে বলি— ব্রা খুললেই দেখবে আমার বুক দু'টি টাইনি তুমি দেখতে চাও ? তুমি বলবে— তাই নাকি ? কই দেখি তো ?

আনিস খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, মালিশা তুমি বেশ বুদ্ধিমতী।

আমার মায়েরও তাই ধারণা। মা বলেন, বুড়ো বয়সে কোনো ধনী মহিলার উচিত নয় তার মেয়েকে কাছে রাখা। বিশেষ করে সে মেয়ে যদি তোমার মতো ইন্টেলিজেন্ট হয়।

কফি কেমন হয়েছে মালিশা ?

ভালো।

আরেক কাপ নেবে ?

দাও। তোমার নাম কিন্তু আমি জানি না।

আনিস।

তুমি কি ইন্ডিয়ান ?

না, বাংলাদেশ হচ্ছে আমার দেশ।

সেটা আবার কোথায় ?

ইন্ডিয়ার পাশে ছোট একটা দেশ।

সেখানেও কি ইন্ডিয়ার মতো লক্ষ লক্ষ মানুষ থালা হাতে খাবারের জন্য ঘুরে বেড়ায় ?

কোথায় শুনেছ এসব ?

আগে বলো সত্যি কিনা ? ডাস্টবিনের পাশে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা বসে থাকে। কখন কেউ এসে খাবার ফেলবে সেই আশায়। বলো, সত্যি নয় ? নাকি তোমার স্বীকার করতে লজ্জা লাগছে ?

আনিস ইতস্তত করে বলল, সত্যি নয়। বড় বড় অভাব হয়েছে। সেতো পৃথিবীর সব দেশেই হয়েছে। ইউরোপে হয়নি ? আমেরিকাতেও তো ডিপ্রেসন হয়েছে।

আনিস তুমি রেগে যাও কেন ? তোমাকে রাগাবার জন্যে আমি বলিনি।

তোমরা যা ভাব দেশটি মোটেই সে রকম নয়।

মালিশা ঠোঁট চেপে হাসল। পরমুহূর্তে ভালো মানুষের মতো বলল, ইলেকট্রিসিটি আছে ?

এসব জিজ্ঞেস করছো কেন ?

কারণ জানতে ইচ্ছে হচ্ছে। বলতে ইচ্ছা না হলে বলবে না। আনিস গম্ভীর মুখে বলল, না মালিশা ইলেকট্রিসিটি-ফিটি নেই। গাড়িফাড়িও নেই, শহরে বাস সার্ভিসের বদলে আছে এ্যালিফেন্ট সার্ভিস। হাতির পিঠে চড়ে যাওয়া আসা।

ঠাট্টা করছো ?

তা করছি।

কেউ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করলে আমার ভালো লাগে না। প্লিজ আমার সঙ্গে ঠাট্টা করবে না এবং আমি সরি।

সরি কী জন্যে ?

তোমাকে দেশের কথা বলে হার্ট করেছি সেই জন্যে। আমার যখন টাকা হবে তখন আমি তোমার দেশ দেখতে যাব।

বেশ তো।

দেশে তোমার কি বউ আছে ?

না।

কোনো সুইট হার্ট ?

না, তাও নেই।

আমি মনে মনে আশা করছিলাম তুমি বলবে 'না'। বিবাহিত লোকদের আমার ভালো লাগে না।

টুন টুন করে ঘণ্টা বাজছে। যে এসেছে সে যদিও ডোর বেল বাজাচ্ছে তবু লোকটি অপরিচিত। এরকম করে ঘণ্টা কেউ বাজায় না। ছোট বাচ্চাদের মতো অনবরত টিপেই যাচ্ছে। আনিস দরজা খুলে অবাক হয়ে গেল। নিশানাথ বাবু।

নিশানাথ বাবু ঘরে ঢুকেই মুগ্ধ কণ্ঠে বললেন, এই মেয়েটি বড় সুন্দর তো ? দুর্গা প্রতিমার মতো চোখ। মালিশা বলল, আপনি কি আমাকে নিয়ে কিছু বলছেন ? আমার দিকে তাকিয়ে বলছেন তাই জিজ্ঞেস করছি।

নিশানাথ বাবু হাসি মুখে বললেন, আমি বলছি এই মেয়েটি কে ? আমাদের এক গডেস-এর চোখের মতো অপূর্ব চোখ।

মালিশা হাসি মুখে বলল, আমার নাম মালিশা। আজ আমার জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে আপনি কি আমার সঙ্গে দয়া করে ডিনার খাবেন ?

খাবো না কেন ?

নিশানাথ বাবুর ভাব দেখে মনে হলো তিনি খুব অবাক হয়েছেন প্রশ্ন শুনে।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার সঙ্গে কিন্তু মাত্র চল্লিশ ডলার আছে। মেক্সিকান রেস্টুরেন্টে গেলে মনে হয় এতেই তিনজনের হয়ে যাবে, কী বলেন ?

টেকো খেতে আর কয় পয়সা লাগবে ? হয়েও থাকবে দেখবে।

নিশানাত বাবু ঠিকানা যোগাড় করে কী জন্যে হঠাৎ এসেছেন আনিস বুঝতে পারলো না। নিশানাথ বাবু ফার্গোতে এসেছিলেন বাংলাদেশের স্টল দেখতে। সেখান থেকে আনিসের কাছে এসেছেন। কারণ রাহেলা বিশেষভাবে বলে দিয়েছেন আনিসের ঘর হয়ে আসতে। হঠাৎ করে আনিসের সঙ্গে দেখা করে আসতে হবে কেন নিশানাথ বাবু বুঝতে পারেননি। অনেক কিছুই তিনি বুঝতে পারেন না। আসতে বলা হয়েছে তিনি এসেছেন, ব্যস। আনিস বলল, বাংলাদেশের স্টল কেমন দেখলেন ?

চমৎকার। ঐ টম ছোকরা কী সব কায়দাকানুন করে দিয়েছে, আমি স্তম্ভিত। টেবিলটাতে হার্ডবোর্ড ফোর্ড লাগিয়ে রঙ টং দিয়ে এমন করেছে দেখে মনে হয় একটা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ছোকরার গুণ আছে।

মালিশা অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, আপনার নামটা কি দয়া করে বলবেন ?

আমার নাম নিশানাথ।

এই নামের মানে কী ?

এর মানে হলো 'গড অব দ্যা ডার্কনেস।'

বাহ্, মজার নাম তো ?

নিশানাথ বাবু সিগারেট ধরিয়ে বললেন, ঐ টম ছোকরার গুণ আছে। হুলস্থুল করছে বুঝলেন নাকি আনিস সাহেব। পেছনে হার্ডবোর্ডের উপর বৃষ্টির ছবি এঁকেছে। ছবির দিকে তাকালেই বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনা যায়। মনে হয় ব্যাঙ ডাকছে চারদিকে।

মালিশা বলল, ব্যাঙ ডাকছে মানে ?

আমাদের দেশে বৃষ্টি হলেই ব্যাঙ ডাকে। সেই শব্দ জগতের মধুরতম ধ্বনির একটি। তুমি না শুনলে বুঝতেই পারবে না।

ব্যাঙের ডাক তো আমি শুনেছি। ওর মধ্যে মধুরতার কী আছে ? এইসব তুমি কী বলছো ?

মালিশা তোমাকে বুঝানো যাবে না।

নিশানাথ বাবু ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললেন। মালিশা অবাক হয়ে বলল, আপনি অদ্ভুত লোক! সত্যি অদ্ভুত!

মালিশার বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হলো।

মেট্রোপলিটন বাসে উঠতে গিয়ে দেখে একটার উপর বাজে। ফাঁকা বাস। সে ছাড়া অন্য কেউ নেই। একটি নব্বই বছরের বুড়ি ছিল সে টুয়েলভ স্ট্রিটে নিমে গেল। নামবার সময় বুড়িটি বলল, আমাকে একটু হাত ধরে নামিয়ে দেবে ?

মালিশা এমন ভাব করল যেন সে শুনতে পায়নি। বুড়ি দ্বিতীয়বার কিছু না বলে নিজে নিজেই নামল। এই বয়সেও রাত দুপুরে একা একা বাসে চড়া চাই। খোঁজ নিলে দেখা যাবে পাস বই ভর্তি ডলার। তবু পাঁচ ডলার খরচ করে ক্যাব ডাকবে না। দেশে একটা ফেডারেল আইন থাকা দরকার। যে আইনে সত্তরের উপর বয়স হলে সব টাকাপয়সা সরকারের কাছে সারেন্ডার করে নির্বাসনে যেতে হয়।

বাস ডাউন টাউনে আসতেই মালিশা নেমে গেল। এখানে বাস বদল করতে হবে। বাস থেকেই মালিশা লক্ষ করল, তার হাত-পা শিরশির করছে। নির্ঘাৎ আবার জ্বর আসছে। এ রকম হচ্ছে কেন ? বারবার শরীর খারাপ হচ্ছে। মালিশা মাথা নিচু করে দ্রুত হাঁটতে লাগল। শরীর বেশি খারাপ হবার আগেই অ্যাপার্টমেন্টে ফিরে যাওয়া দরকার।

বাসস্ট্যান্ডটি ফার্স্ট এ্যাভিন্যুতে। মালিশার ইচ্ছে হলো বাসের জন্যে না হেঁটে একটি ক্যাব ডাকে। সে খোলা একটি ট্যাভার্নে ঢুকে পড়ল। ক্যাব কোম্পানিকে টেলিফোন করতে হবে।

জন ট্রিভলটার রেকর্ড বাজছে উচ্চ স্বরে। কোমর জড়াজড়ি করে ডায়াসের কাছে দু'তিনটা ছেলেমেয়ে নাচছে। সেদিকে তাকিয়ে মালিশার কেমন যেন মাথা ঘুরতে লাগল।

হ্যালো মালিশা গা গরম করবে নাকি ? নাচবে এক পাক ?

মালিশা তাকাল কিন্তু ছেলেটিকে চিনতে পারল না।

মালিশা এসো।

নাহ্।

না কেন ?

আমার শরীর ভালো লাগছে না।

মালিশা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল চিনতে পারছে না কেন ? ছেলেটি এসে পরিচিত ভঙ্গিতে হাত ধরল। গলার স্বর নামিয়ে বলল, যাবে না কি আমার সঙ্গে ?

কোথায় ?

আমার অ্যাপার্টমেন্টে। দুজনের ছোটখাট একটা পার্টি হয়ে যাবে কী বলো ?

না।

না কেন ? আসো। আমি তো অপরিচিত কেউ নই ? আগেও তো আমার সঙ্গে ডেটে গিয়েছো। এসো এসো খুব ফান হবে।

৭

রাহেলা দরজা খুলে দেখতে পেলেন ছ'ফুট লম্বা টম দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার সারা মুখে দাড়িগোফের জঙ্গল। খালি গা। পরনে জিনসের একটি হাফপ্যান্ট। পায়ে জুতাটুতা কিছুই নেই।

আমি রুনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

কার সঙ্গে ?

রুন, রুনকি।

রাহেলা একবার ভাবলেন বলেন রুনকি বাড়ি নেই। কোথায় গেছে জানি না। কিন্তু বলতে পারলেন না। টম ভারি গলায় বলল, তুমি বোধহয় আমাকে চিনতে পারছো না। আমার নাম টমাস গ্রে। আমি রুনের বন্ধু।

ভেতরে এসে বসো আমি ডেকে দিচ্ছি।

না, আমি ভেতরে এসে তোমার কার্পেট নোংরা করব না। পায়ে আমার প্রচুর ময়লা।

রাহেলা রুনকির ঘরে উঁকি দিলেন। রুনকি চুল ছেড়ে চুপচাপ বসে আছে। হালকা সুরে পোলকা মিউজিক বাজছে। রুনকির সামনে গাদা খানিক বইপত্র ছড়ানো। রাহেলা দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মৃদুস্বরে ডাকলেন, রুনকি ?

ভেতরে এসো মা।

রুনকি তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলতে চাই।

রুনকি হাসিমুখে বলল, কথা বলতে চাইলে বলো। এত গম্ভীর হয়ে আছো কেন ?

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, আমরা তোমাকে ভালোবাসি এবং তোমার মঙ্গল চাই এই সম্পর্কে তোমার কোনো সন্দেহ আছে ?

আছে।

রাহেলা মুখ কালো করে বললেন, আমি তা জানতাম না।

ঠাট্টা করছিলাম মা। তুমি ঠাট্টা বুঝতে পারো না এ তো বড় মুশকিল।

রাহেলা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, আমি চাই না তুমি টমের সঙ্গে মেলামেশা করো।

রুনকি খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, টম কি এসেছে?

রাহেলা উত্তর দিলেন না। রুনকি ঝড়ের বেগে নিচে নেমে গেল। রাহেলারও ইচ্ছা হলো নিচে নামেন। কিন্তু নামলেন না। নামলেই হয়তো দেখবেন দু'জন জড়াজড়ি করে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিন আমেরিকায় বাস করার পরও এই দৃশ্য তাঁর ভালো লাগে না। রাহেলা মন্থর পায়ে নিজ ঘরের দিকে এগুলেন। তার কিছুক্ষণ পর রুনকি আবার উপরে উঠে আসলো। নিজের ঘরে বসেই রাহেলা বুঝতে পারলেন রুনকি সাজগোজ করছে। হালকা সুরে শিস দিচ্ছে। মেয়েদের শিস দেয়া একটা কুৎসিত ব্যাপার।

সেই রাতে রুনকি আর বাড়ি ফিরল না।

৮

ক্লাস থেকে বেরুনোমাত্র এন্ডারস্যানের সঙ্গে দেখা। এন্ডারস্যান লোকটি ফুর্তিবাজ। দেখা হলেই একটা মজাদার কথা বলবে কিংবা জিভ বের করে ভেংচে দেবে। কে বলবে সে হেটারোসইক্লিক কম্পাউন্ডের একজন বিশেষজ্ঞ— একজন ফুল প্রফেসর। আনিস বলল, হ্যালো এন্ডারস্যান।

এন্ডারস্যান একটি চোখ বন্ধ করে অন্য চোখ পিটপিট করতে লাগল। আনিস হেসে ফেলতেই সে বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে আনিস। এসো কফি খেতে খেতে বলব।

কফি হাউসে তিল ধারণের জায়গা নেই। ফাইন্যাল এগিয়ে আসছে। ছেলেমেয়েরা বইখাতা নিয়ে ভিড় জমাচ্ছে কফি হাউসে— কেউ টেবিল ছাড়ছে না। খুপরি ঘরগুলোর একটিতে জায়গা পাওয়া গেল মিনিট দশেক দাঁড়িয়ে থাকার পর। আনিস বলল, কী বলবে বলো?

ইদানীং কি তুমি অল্প বয়সী একটি সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছ?

আনিস অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কী জন্যে জিজ্ঞেস করছো?

কারণ আছে। আমেরিকা একটা ফ্রি কান্ট্রি। তুমি কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু এই ক্ষেত্রে একটি প্রবলেম হয়েছে।

কী প্রবলেম?

এন্ডারস্যান গম্ভীর মুখে বলল, মেয়েটি একটি প্রসটিটিউট।

আনিস চুপ করে রইল। এন্ডারস্যান আবার বলল, তুমি প্রসটিটিউটের সঙ্গে ঘুরলেও কিছু যায় আসে না। কিন্তু মাঝে মাঝে বড় রকমের ঝামেলা হয়। হঠাৎ একদিন হয়তো মেয়েটি তোমাকে এসে বলবে আমার পেটে তোমার বাচ্চা। এবরশনের জন্যে হাজার দশেক ডলার দরকার।

আনিস গম্ভীর মুখে বলল, জানলে কী করে মেয়েটি একটি প্রসটিটিউট ?

আমি জানি। মেয়েটির নাম নিশ্চয়ই মালিশা। ঠিক না ? আনিস জবাব দিল না।

জোসেফাইন পঞ্চমবারের মতো সফিকের চাকরি নট করে দিলো।

তোমার মতো মিনমিনে শয়তান, ফাজিল আর অকর্মাকে ছাড়াও আমার চলবে। শুক্রবার এসে পাওনা গন্ডা বুঝে নেবে।

বুড়ির রেগে যাওয়ার কারণ সফিক একজন কাস্টমারের নাকে গদাম করে ঘুসি মেরেছে। বেচারার দোষ হচ্ছে সে নাকি সফিকের দেশ বাংলাদেশ শুনে কোমরে হাত দিয়ে হায়নার মতো হেসেছে। জোসেফাইন চোখ লাল করে বলেছে, হেসেছে বলেই ঘুসি মারবে ? খুশি হয়ে বেচারা হেসেছে।

খুশি হয়ে হেসেছে মানে ? এই হাসি খুশি হওয়ার হাসি ?

কিসের হাসি সেটা ? বলো তুমি, কিসের হাসি ?

কিসের যে হাসি তা অবশ্যি সফিকও জানে না। হয়তো বিনা কারণে হেসেছে। কিন্তু সফিকের মেজাজ সকাল থেকেই খারাপ যাচ্ছিল। সকালবেলাতেই খবর পাওয়া গেছে জেমসটাউনের রকিবউদ্দিন একটি রেস্টুরেন্ট দিচ্ছে। মন খারাপ করার মতো খবর নয়। কিন্তু রেস্টুরেন্টের নাম দিয়েছে 'ইন্ডিয়া হাউস'। সফিককে টেলিফোন করে বলল, বাংলাদেশের নাম তো কেউ জানে না। কিন্তু ইন্ডিয়ান ফুডের নাম জগৎজোড়া, কাজেই নাম দিলাম 'ইন্ডিয়া হাউস'। আপনি ভাই ফার্গোর সব বাঙালিদের খবর দেবেন। ইনশাআল্লাহ্ আগামী মাসেই খুলব।

সফিক মেঘস্বরে বললো, 'ইন্ডিয়া হাউস' নাম দিয়েছেন ?

এখনো ফাইন্যাল করি নাই। 'ইন্ডিয়া ফুডস'ও দিতে পারি।

অর্থাৎ ? ইন্ডিয়া থাকবেই ?

হ্যাঁ, তা তো থাকতেই হবে।

শুনেন ভাই, আপনাকে যদি আমি ফার্গোতে দেখি তা হলে আপনাকে আমি খুন করে ইলেকট্রিক চেয়ারে বসব, বুঝেছেন।

আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।

চুপ শালা।

সফিক টেলিফোন রেখে নিক্স প্লেসে এসেই কাস্টমারের নাকে ঘুসি বসাল। জোসোফাইন এবার সত্যি সত্যি রেগেছে। এ পর্যন্ত তিনবার বলেছে।

সফিক তোমাকে যেন আর না দেখি। যথেষ্ট হয়েছে।

সফিক নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখে ইমিগ্রেশন থেকে চিঠি এসেছে, সে যেন চিঠি পাওয়ার সাতদিনের ভেতর ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাচারাইলেজেশন অফিসার টি রবার্টসনের সঙ্গে দেখা করে।

সফিককে এ নিয়ে চিন্তিত মনে হলো না। তার মাথায় ঘুরছে কী করে হারামজাদা রহমানকে একটা উচিত শিক্ষা দেয়া যায়। একটা বাংলাদেশী রেস্টুরেন্ট দিয়ে ফেললে কেমন হয় ? খুব কি কঠিন ব্যাপার ? নাম দেয়া যেতে পারে 'দি মেঘনা'— এ প্লেস ফর এক্সোটিক বাংলাদেশী ফুড। কিন্তু ফুড কি এক্সোটিক হবে ? শব্দটা ঠিক আছে নাকি ? এইসব ব্যাপারে রুনকি একজন ছোটখাট বিশেষজ্ঞ। সফিক টেলিফোন করল তৎক্ষণাৎ। টেলিফোন ধরলেন রাহেলা।

আমি সফিক।

বুঝতে পারছি। কী ব্যাপার ?

খালা, আমরা একটু রেস্টুরেন্ট দিচ্ছি। নাম হচ্ছে আপনার 'দি মেঘনা'।

কী দিচ্ছ ?

রেস্টুরেন্ট। বাংলাদেশী সব খাবার টাবার পাওয়া যাবে। আজ সন্ধ্যায় বাসায় এসে সব আলাপ করব।

রাহেলা গম্ভীর গলায় বললেন, সন্ধ্যাবেলা আমরা থাকব না।

ও আচ্ছা, রুনকিকে একটু দেন। ওর সঙ্গে কথা বলি।

রুনকি তো নেই।

নেই মানে ?

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, তুমি কি কিছু জানো না ?

না, কী জানব ?

রুনকি এখন আর আমাদের সঙ্গে থাকে না।

কোথায় থাকে তাহলে ?

রাহেলা ঠান্ডা স্বরে বললেন, আমি জানি না কোথায় থাকে।

সফিক অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে বলল, কই আমাকে তো কিছু বলেন নাই।

তোমাকে বলতে হবে কেন ? তুমি কে ?

রাহেলা টেলিফোন নামিয়ে রেখে ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠলেন। এই শহরে আর থাকতে পারবেন না। অনেক দূরে চলে যেতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরে যেতে হবে আড়ালে, যাতে কেউ কখনো রুনকির খোঁজে টেলিফোন করতে না পারে।

৯

রুনকি গিয়ে উঠেছে টমের ওখানে।

দুটি অবিবাহিত ছেলেমেয়ের এক সঙ্গে বাস করা এমন কিছু অবাক হওয়ার মতো ঘটনা নয়। বিয়ের মতো এমন একটি প্রাচীন ব্যবস্থা কি আর এত সময় পর্যন্ত ধরে রাখা যায় ? এখন হচ্ছে লিভিং টুগেদার। যতদিন ইচ্ছে একসঙ্গে থাকা। যখন আর ভালো লাগছে না তখন দূরে সরে যাওয়া। কারো কোনো দায়িত্ব নেই। দায়িত্ব থাকলেই ভালোবাসা শিকলে আটকে যায়। শিকলে কি আর মায়াবী পাখি ধরা পড়ে ?

টম যেখানে থাকে সেটি কোনো অ্যাপার্টমেন্ট নয়। চমৎকার একটি বাড়ি। সামনে লন আছে, ফুলের বাগান আছে, পেছনে চমৎকার সুইমিংপুল। বাড়ির মালিক এ ক'মাসের জন্যে যাচ্ছে সুইজারল্যান্ড। সে জন্যে সে বাড়ি চার মাসের জন্যে ভাড়া দিতে চায়। ভাড়া নামমাত্র— মাসে চারশ' ডলার। সবটা টাকা এক সঙ্গে দিতে হবে।

টমের বাড়ি পছন্দ হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ি, পছন্দ না হয়ে উপায় আছে ?

আমি নেব তোমার বাড়ি।

টমের পোশাক-আশাক দেখে বাড়ির মালিক ঠিক ভরসা পায় না। গম্ভীর হয়ে বলে— ষোলশ' ডলার এক সঙ্গে দিতে হবে কিন্তু।

বেশ তো নিয়ে আসব বিকেলে। তুমি ঘরে থাকবে তো ?

যেহেতু বিকেলে গেলে ভদ্রলোককে ঘরে পাওয়া যাবে সেহেতু টম আর বিকেলে গেল না। পরদিন দুপুরে গিয়ে হাজির। ভদ্রলোক ঘরে নেই। তার স্ত্রী দরজা খুলল। টম হাসি মুখে বলল, আমি তোমার বাড়ি ভাড়া করতে এসেছি। তোমার স্বামীর সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।

ও হ্যাঁ, তোমার জন্যে সে অপেক্ষা করছিল। তুমি কি ষোলশ' ডলার নিয়ে এসেছো ?

নিয়ে এসেছি।

টম কাঁধের ব্যাগ থেকে কাগজে মোড়া একটি পেইনটিং বের করল। গম্ভীর মুখে বলল, এর দাম কম করে হলেও তিন হাজার ডলার, তোমাকে জলের দামে দিচ্ছি।

ভদ্রমহিলা স্তম্ভিত।

ভয় নেই, পছন্দ না হলে নগদ দাম দেব। দেখো ভালো করে।

সন্ধ্যাবেলার ছবি। পুরনো ধরনের একটি লাল রঙা ইটের বাড়ির ভাঙা জানালা দিয়ে একটি কিশোরী মেয়ে উঁকি দিচ্ছে। মেয়েটির চোখেমুখে সূর্যের রক্তিম আলো। ছবি থেকে চোখ ফেরানো মুশকিল। ভদ্রমহিলা আমতা আমতা করতে লাগলেন।

আমার হাসবেন্ডের সঙ্গে কথা না বলে তো রাখতে পারি না।

বেশ তাহলে নগদ দাম দিচ্ছি।

টম গম্ভীর মুখে পকেটে হাত রাখল (পকেটে একটিমাত্র পঞ্চাশ ডলারের নোট) ভদ্রমহিলা থেমে থেমে বলল, তারচে' এক কাজ করো, ছবিটা রেখে যাও আমি ওর সঙ্গে আলোচনা করে তোমাকে জানাব।

বেশ তো বেশ তো।

টম জানে এই মেয়েটির স্বামীকে ছবিটি রাখতেই হবে। অবশ্যি একটি ভালো ছবি হাতছাড়া হলো। তাতে কিছুই আসে যায় না। কাউকেই ধরে রাখা যায় না। সমস্তই হাতছাড়া হয়ে যায়।

রুনকি যখন প্রথম উঠে এলো টমের ঘরে তখন টম সিরামিক্সে কিছু ফ্যান্সি পেইন্ট করছিল। দশটি টবের অর্ডার আছে, বিকাল পাঁচটার মধ্যে দিতে হবে। সময় লাগছে খুব বেশি। রুনকিকে ঢুকতে দেখে টম ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল, কিছু বলল না। রুনকি বলল, তোমার সঙ্গে থাকতে আসলাম টম।

বেশ তো, ভালো করেছ।

টম ছবি আঁকায় মন দিল। নীল রঙটা ঠিক মানাচ্ছে না কেমন যেন লেপ্টে লেপ্টে যাচ্ছে। রুনকি গম্ভীর হয়ে বলল, আমি বাবা মা সবাইকে ছেড়ে এসেছি। তুমি বোধহয় ঠিক বুঝতে পারছো না।

টম ডিজাইন থেকে চোখ তুলেই বলল, বাবা-মাকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে থাকতে আসাটা ঠিক হতো না। আমি বুড়ো-বুড়ি সহ্য করতে পারি না।

তুমি মন দিয়ে শুনছো না টম। দয়া করে শোনো আমি কী বলছি। তাকাও আমার দিকে। প্লিজ।

টম তাকাল।

আমি তোমার জন্যে সব ছেড়ে ছুড়ে এসেছি।

রুন এটি তুমি ভুল বললে। তুমি আমার জন্যে আসনি। এসেছ নিজের জন্যে। আমি তোমাকে কখনো আসতে বলিনি। মনের মধ্যে এসব ভুল ধারণা থাকা ঠিক না। এতে পরে কষ্ট পাবে।

রুনকি জবাব দিল না। টম বলল, চট করে কফি বানিয়ে আন তো দেখি আমার জন্যে। চিনি দু'চামচ চাই, নো ক্রীম।

বাইরে থেকে টমকে ভবঘুরে ও ছন্নছাড়া মনে হলেও আসলে সে মোটেও সে রকম নয়। রুনকি অবাক হয়ে দেখল টমের অত্যন্ত গোছালো স্বভাব। সিগারেট খেয়ে ঘরময় ছড়িয়ে রাখে না। হৈচৈ হুল্লোর কিছুই করে না। রুনকির ঘুম ভাঙার আগেই সে ঘুম থেকে উঠে ব্রেকফাস্ট তৈরি করে ছবি নিয়ে বসে। ঘণ্টা তিনেক

একনাগাড়ে কাজ করে। এই সময় তার মূর্তি ধ্যানী পুরুষের মূর্তি। কথা বললে জবাব দেবে না। চা খাবে না, সিগারেট খাবে না। সকালের কাজ শেষ হলেই ঘণ্টাখানেক শুয়ে থাকবে চুপচাপ। তার ভাষায় এটি হচ্ছে মেডিটেশন। বারোটা নাগাদ লাঞ্চ তৈরি হবে। লাঞ্চ শেষ করেই বেরুবে কাজের খোঁজে। সারাদিন কাজ পাওয়া যায় না। ঘোরাঘুরিই সার। তখন সে তার আঁকা চমৎকার একটি ছবি রাস্তার মোড়ে টাঙিয়ে বসে থাকবে। ছবির নিচে বড় বড় হরফে লেখা— 'একজন দুরারোগ্য ক্যানসারে মরণাপন্ন শিল্পীকে সাহায্যের জন্যে ছবিটি কিনুন। এই শিল্পী গনিনের মতো ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছেন কিন্তু হায় ভাগ্যের কী ছলনা!' ছবি বিক্রি হয়ে যায় চট করে। যে-কোনো ছবি বিক্রি হলেই টমের খানিক মন খারাপ হয়। বিড়বিড় করে নিজের মনে— কিছুই ধরে রাখা যাচ্ছে না। কোনো কোনো দিন মন খারাপের তীব্রতা এতই বাড়ে যে সে হুইস্কি খেতে খেতে চোখ লাল করে বাড়ি ফেরে। রুনকিকে গম্ভীর হয়ে বলে, প্রচুর ক্ষমতা নিয়ে জন্মেছিলাম কিন্তু কিছুই হচ্ছে না। লাল হচ্ছে আমার সবচে ফেভারিট কালার অথচ লাল রঙের ব্যবহারটা এখনো শিখতে পারলাম না। এরকম জীবনের কোনো মানে হয় ?

এই জাতীয় কথাবার্তার কোনো অর্থ হয় না বলাই বাহুল্য। তবু রুনকির ভয় করে। বড় শিল্পী না হওয়াই ভালো। টম আর দশজন মানুষের মতো সহজ-স্বাভাবিক মানুষ হোক। সংসারে ভালোবাসা থাকুক, সুখ থাকুক। খ্যাতির কি সত্যি কোনো প্রয়োজন আছে ?

টম অবশ্যি রুনকিকে খুব পছন্দ করে। তবু রুনকির ভয় কাটে না। সব সময় মনে হয় একদিন সে হয়তো ভালো মানুষের মতো ঘর থেকে বেরুবে আর ফিরবে না। পৃথিবীতে একধরনের মানুষ আছে যাদের ভালোবাসা দিয়ে ধরে রাখা যায় না।

রুনকি নিজেকে মানিয়ে নিল খুব সহজেই। বাজার করা রান্না করা কোনোকিছুই আর আগের মতো জটিল মনে হলো না তার কাছে। বাইরে বেরুলে একটি ক্ষীণ অস্বস্তি অবশ্যি থাকে মনের মধ্যে— যদি পরিচিত কারো সঙ্গে দেখা হয়। সবচে' ভালো হতো যদি টমকে নিয়ে বহু দূরে কোথাও চলে যাওয়া যেত। প্রশান্ত মহাসাগরের ছোট কোনো একটি দ্বীপে। যেখানে জনমানুষ নেই। সারাক্ষণ হু-হু করে হাওয়া বইছে। সন্ধ্যাবেলা আকাশ লাল করে সূর্য ডুবে হঠাৎ করে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়।

টমের এই বাড়িটিও অবশ্যি দ্বীপের মতোই। শহরের বাইরে খোলামেলা একটা বাড়ি। ঠিকানা জানে না বলেই কেউ আসে না। রুনকি মাকে টেলিফোন করে ঠিকানা দিতে চেয়েছিল। রাহেলা শান্ত স্বরে বলেছেন, তোমাদের ঠিকানার আমার কোনো প্রয়োজন নেই রুনকি। তোমার ঠিকানা তোমার কাছে থাকুক।

ঠিকানা না রাখলে টেলিফোন নাম্বার রাখো।

রাহেলা উত্তর না দিয়ে টেলিফোন নামিয়ে রেখেছেন।

কেউ জানে না রুনকি কোথায় আছে তবু একদিন সফিক তার ভাঙা ডজ গাড়ি নিয়ে এসে উপস্থিত। রুনকির বিস্ময়ের সীমা রইল না। সফিক গাড়ি থেকে নেমেই বলল, বাংলাদেশী কায়দায় তোমাদের একটা বিয়ের ব্যবস্থা করবার জন্যে আসলাম। গায়ে হলুদটলুদ সব হবে। বরের বাড়ি থেকে কনের বাড়িতে রুই মাছ যাবে— গায়ে হলুদের তত্ত্ব। দেশের একটা পাবলিসিটি হয়ে যাবে। মেলা লোকজনকে বলা হবে, কী বলো ?

রুনকি বহু কষ্টে হাসি সামলায়।

টম বুঝি রাজি হবে! তোমার যে কী সব চিন্তাভাবনা সফিক ভাই।

রাজি হবে না মানে ? টমের ঘাড় রাজি হবে। ব্যাটা দেশের একটা বেইজ্জতি করে ফেলেছে। বাংলাদেশী মেয়েকে ভাগিয়ে নিয়ে এসে....।

রুনকি গম্ভীর মুখে বললো, সফিক ভাই, টম কাউকে ভাগিয়ে টাগিয়ে আনেনি। আমি নিজেই এসেছি। আর আমার জন্যে তোমার বাংলাদেশের কোনো বেইজ্জতি হয় নি। আমি বাংলাদেশী নই। আমি বাই বার্থ আমেরিকান। আমার বাবা মা'র মতো নেচারালাইজড সিটিজেন না।

সফিক সারাদিন থাকল রুনকির ওখানে। 'দি মেঘনা রেস্টুরেন্ট' খোলার ব্যাপারে তার রুনকির সাহায্যের দরকার। হুলস্থুল কাণ্ড করতে হবে সেখানে। লাঞ্চ ও ডিনারের টাইমে পল্লীগীতির সুর বাজবে। বাংলাদেশের বিখ্যাত সব শিল্পীদের তেলরঙের নিসর্গ দৃশ্যের ছবি দিয়ে সাজানো হবে লবি। খাওয়ার শেষে হাতে তুলে দেয়া হবে এক খিলি পান এবং খাঁটি বাংলায় বলা হবে— 'আবার আসবেন'।

কিন্তু টাকাটা তুমি পাচ্ছ কোথায় ?

সবার কাছ থেকে চেয়ে চিন্তে যোগাড় হবে। তোমাকেও দিতে হবে। ছাড়াছাড়ি নেই।

আমার কাছে আছেই কুল্যে একশ' ডলার।

দাও একশ' ডলারই সই। তোমাকে দিয়েই শুরু।

সারাদিন অপেক্ষা করেও টমের দেখা পাওয়া গেল না। সে আসরে রাত আটটায়। রুজভেল্ট স্কুলের কী একটা ডেকরেশনের কাজ নাকি পেয়েছে। শেষ করে ফিরবে।

১০

অক্টোবর মাস।

বরফ পড়ার সময় নয় কিন্তু আবহাওয়া অফিস বলেছে তুষারপাত হতে পারে। সম্ভাবনা শতকরা বিশ ভাগ। আকাশ অবশ্যি পরিষ্কার। ঝকঝকে রোদ। সন্ধ্যার

আগে আগে দেখা গেল সব ঘোলাটে হয়ে আসছে। সাড়ে ছ'টা থেকে ঝুরঝুর করে বরফ পড়তে শুরু করল। বৎসরের প্রথম বরফ, খুশির ঢেউ খেলে গেল চারদিকে। ছেলে-বুড়ো সবাই চোখ বড় বড় করে বলছে— আহ কী চমৎকার তুষার পড়ছে। হাউ লাভলী!

রাত ন'টার খবরে বলল— কানাডা থেকে ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে আর উষ্ণ হাওয়া আসছে সাউথ থেকে। কাজেই সারারাত ধরে ব্লিজার্ড হতে পারে। ইতোমধ্যে এক ফুটের মতো বরফ পড়েছে। রাস্তা-ঘাট পিছল। কেউ যেন বিনা প্রয়োজনে বাইরে না যায়। হাইওয়ে আই নাইন্টি বন্ধ। বড়ই ফুর্তির সময় এখন। শুরু হবে ব্লিজার্ড পার্টি। উপকরণ সামান্য বিয়ার, বাদাম ভাজা এবং চড়া মিউজিক। বৎসরের প্রথম ব্লিজার্ডকে স্বাগত জানানোর এই হচ্ছে ফার্গোর সনাতন পদ্ধতি।

আনিস মোটা একটি কম্বল গায়ে জড়িয়ে সোফায় আরাম করে বসল। ঘরে একটি ফায়ার প্লেস আছে। ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালানোর কায়দাকানুন তার ভালো জানা নেই। চিমনি পরিষ্কার আছে কি না কে জানে। এর চেয়ে কম্বল জড়িয়ে থাকাই ভালো। কফি পটে কফি গরম হচ্ছে। টিভিতে দেখাচ্ছে ডেভিড কপারফিল্ডের ম্যাজিক। হাতের কাছে দুটি রগরগে ভূতের বই। একটি স্টিফন কিংয়ের 'সাইনিং'। নিউয়র্ক টাইমস-এর মতে কোনো সুস্থ লোক এই বই একা একা পড়তে পারে না। অন্যটি ডিমস কিলেনের 'দি আদার নুন'। পিশাচ নিয়ে লেখা রক্ত জল করা উপন্যাস। ব্লিজার্ডের রাতের জন্যে এর চেয়ে ভালো প্রস্তুতি কল্পনাও করা যায় না।

আনিস জানালার পর্দা সরিয়ে বাইরে তাকালো। বরফে সমস্ত ঢেকে গেছে। বাতাসের সঙ্গে উড়ছে বরফের কণা। গাছের পাতায় মাখনের মতো থরে থরে তুষার জমতে শুরু করেছে। একটি ধবধবে সাদা রঙের প্রকাণ্ড চাদর যেন ঢেকে ফেলেছে শহরটিকে। হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সাদা চাদর নৌকার পালের মতো কাঁপছে তিরতির করে। অপূর্ব দৃশ্য। চোখ ফেরানো যায় না। আনিস মন্ত্রমুগ্ধের মতো জানালার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। মালিশা গিলবার্ড এসে উপস্থিত হলো এই সময়।

প্রচণ্ড ঠান্ডাতেও তার গায়ে পাতলা একটা উইন্ড ব্রেকার ছাড়া আর কিছুই নেই। কালো একটা স্কার্ফে কান দুটি ঢাকা। হাতে খাবারের একটি প্যাকেট। মালিশা বলল, আমি ভাবলাম কেউ নেই, অনেকক্ষণ ধরে কড়া নাড়ছি। ঘরে তোমার বান্ধবীরা কেউ আছে বুঝি?

আনিস বলল, ভেতরে এসো। এরকম দিনে বেরুলে কী জন্যে?

মালিশা বলল, তুমি কথার জবাব দাওনি। ঘরে কি তোমার বান্ধবীরা কেউ আছে?

না, তা নেই।

যাক, আমি শুধু দুজনের জন্যে খাবার এনেছি।

মালিশা খানিকটা কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে প্যাকেট খুলতে শুরু করল।

আনিস বলল, স্কার্ফটা খুলে মাথা মুছে নাও। এত তাড়া কিসের মালিশা ?

তাড়া আছে। দুপুরে খাইনি কিছু। খাবার সব ঠান্ডা হয়ে আছে। গরম করতে দিয়ে তারপর হাত-মুখ ধোব।

খাবার বিশেষ কিছু নয়। বড় একটি প্যান পিজা, কয়েকটি মেক্সিকান টেকো এবং এক বোতল সস্তা বারগুন্ডি। আনিস বলল, কোনো বিশেষ উপলক্ষ আছে কি মালিশা ?

আজ আমার জন্মদিন।

আনিস হাসি মুখে বলল, দু'মাস আগে একবার তুমি জন্মদিনের খাবার খাইয়েছ।

ঐ দিন মিথ্যা বলেছিলাম। তোমাকে কোথাও নিয়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। জন্মদিনের অজুহাত দিয়ে নিয়ে গেলাম।

এম্নি বললে বুঝি যেতাম না ?

না। আমি ভালো মেয়ে না। আমার সঙ্গে বেরুতে হয়তো তোমার সংকোচ হবে।

মালিশা দ্রুত হাতে খাবার ওভেনে ঢুকিয়ে মাথার চুল মুছতে শুরু করল।

হঠাৎ করে এসেছি বলে রাগ করোনি তো ? টেলিফোন করব ভেবেছিলাম। পরে ভাবলাম টেলিফোনে তুমি বলে বসতে পার— আমি ব্যস্ত। সামনাসামনি কেউ এমন কথা বলতে পারবে না। আনিস, তুমি কি বিরক্ত হচ্ছ।

বিরক্ত হব কেন ? কিন্তু জন্মদিনের কেক কোথায় ?

কেক কেনা গেল না। টাকা কম পড়ে গেল। তাছাড়া কেক আমার ভালো লাগে না।

আনিস লক্ষ করল মালিশার চোখ ঈষৎ রক্তাভ। একটু যেন ঢুলছে।

তুমি কি প্রচুর ড্রিংক করেছ মালিশা ?

প্রচুর নয় তবে করেছি। একা একা ভালো লাগছিল না।

টেলিফোন করলেই একটা কেকের ব্যবস্থা করা যায়। কিন্তু আবহাওয়ার যা ধরন-ধারণ কেউ কি অর্ডার নেবে ? চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে। আনিস বসবার ঘরে চলে আসল। গলা উঁচু করে বলল— তুমি খাবার সাজাও মালিশা। আমি একটা টেলিফোন সেরে আসছি। অর্ডার ওরা নিল। বলল এক ঘন্টার মধ্যে দিয়ে যাবে। শুধু কেক নয় দশটি লাল গোলাপের একটি তোড়াও আসবে সেই সঙ্গে। আনিসের মনে হলো সে নিজেও খুব নিঃসঙ্গ। মালিশা হঠাৎ করে আসায় তার খুবই ভালো লাগছে। একটা কেমন যেন অন্য ধরনের আনন্দ।

আনিস, পিজা তোমার ভালো লাগে তো ?

খুব লাগে।

সস্তার মধ্যে খুব ভালো খাবার, তাই না ?

তা ঠিক।

মালিশা হাসি মুখে বলল, আমার বয়স একুশ। একুশ বছরের একটি মেয়ের জন্মদিনে কোনো লোকজন নেই কেউ বিশ্বাস করবে এ কথা ? জন আসবে বলেছিলো, আমি এইসব কিনেছিলাম জন এবং আমার জন্যে। তার নাকি হঠাৎ মাইগ্রেন পেইন শুরু হয়েছে।

আনিস বলল, জন কে ?

আমার একজন বন্ধু। সিয়ারসে কাজ করে। তোমার কি মনে হয় ওর সত্যি সত্যি মাইগ্রেন পেইন ?

আনিস উত্তর দিল না।

মালিশা বলল, জনের একজন নতুন বান্ধবী হয়েছে। একটি মেক্সিকান মেয়ে। ও নির্ঘাত ওর সঙ্গে ঝুলাঝুলি করছে। তোমার কী মনে হয় ?

আমার পক্ষে বলা মুশকিল। নির্ভর করে জনের সঙ্গে তোমার পরিচয় কী রকম তার ওপর।

পর পর চার শনিবার ডেট করেছি। জন নিজেই ডেট চেয়েছে। দু'রাত ঘুমিয়েছি ওর সঙ্গে। ওটা ঠিক হয় নি। ওতে দাম কমে যায়। তাছাড়া ঐ মেক্সিকান মেয়েটিকে তো তুমি দেখনি। দারুণ ফিগার। পুরুষের কাছে ফিগারটাই আসল।

আনিস প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে বলল, তোমার মা কেমন আছে ?

ভালোই। গত সপ্তাহে চিঠি পেয়েছি। বুড়ির শখ হয়েছে বিশ্ব ভ্রমণের। একজন সঙ্গীও পেয়েছে— জিম ডগলাস। মনে হয় ঐ বুড়ো ফুসলে ফাসলে নিয়ে যাচ্ছে। টাকার গন্ধ পেয়েছে বুঝলে না ? দু'জনে ফট করে বিয়েও করে বসতে পারে। তাহলে বড়ই ঝামেলা হবে। হয়তো দেখা যাবে কিছুই পেলাম না। আমার যা ভাগ্য।

কোথায় যাচ্ছেন তোমার মা ?

কে জানে কোথায় ? আমি লিখেছি— যাও মা, ঘুরে আস। তোমার ভালো লাগাই আমার ভালো। এবং ডগলাস সাহেব যখন যাচ্ছেন তখনতো তোমার খুব ফান হবে। মনের কথা নয় বুঝতেই পারছো, সবই বানানো।

মালিশা খাবার কিছুই স্পর্শ করল না। ঢকঢক করে এক গ্লাস বারগুন্ডি খেয়ে ফেলল। তার মনে হয় নেশা হয়েছে। চোখের কোণ লালাভ।

শোনো আনিস, আমার মনে হয় আমি তোমাকে ভালোবাসি। হাসছো কেন ? তোমার কি ধারণা আমার নেশা হয়েছে ? মোটেই নয়।

আনিস বলল, কফি খাবে ?

না।

শোনো আনিস। আমার মিলিওনিয়ার হবার সম্ভাবনা খুব বেশি। তুমি কি আমাকে বিয়ে করবে ? ভালোই হবে তোমার।

আনিস হাসতে হাসতে বলল, টাকার জন্যে তোমাকে বিয়ে করতে হবে কেন ? তোমার নিজের দাম তো কিছু কম নয়।

আমাকে খুশি করার জন্যে বলছো ?

না। নিশানাথ বাবুর কথা মনে নেই, তিনি বলেছিলেন তোমাকে দেখতে ইন্ডিয়ান গডেসের মতো লাগে।

আমার মনে আছে আনিস। আমার যখন টাকা হবে তখন আমি ঐ ইন্ডিয়ান ভদ্রলোককে একটি বুইকস্কাইলার্ক গাড়ি কিনে দেব। ওর কি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি আছে ?

না, ওর সে সবের বালাই নেই।

ম্যাকের স্কাইলার্ক গাড়ি ছিল। ম্যাক ছিল দারুণ বড় লোক। ওর সঙ্গে আমি অনেকবার ডেটে গিয়েছি। ও আমাকে একটা ড্রেস কিনে দিয়েছিল, যার দাম দু'শ পঁচাত্তর ডলার। আমি তোমাকে দেখাব।

আনিস চুপ করে রইল। মালিশা মনে হলো একটু টলছে। আনিস বলল, আর খেয়ো না মালিশা।

কেন, খাব না কেন ?

বেশি হয়ে যাচ্ছে। তোমার হাত কাঁপছে।

হাত কাঁপছে কারণ আমার জ্বর আসছে। আমার শরীর বেশি ভালো না।

ডাক্তার দেখিয়েছ ?

না। ডাক্তার দেখাবার মতো কিছু নয়, তাছাড়া আমার হেলথ ইন্স্যুরেন্স নেই। ডাক্তারের কাছে গেলেই গাদা খানিক ডলার লাগবে। সেটা কে আমাকে দেবে ? তুমি নিশ্চয়ই দেবে না। হা হা হা।

কেক চলে আসল দশটার দিকে। সিলোফেন কাগজে মোড়া দশটি লাল টুকটুকে গোলাপ। মালিশা অনেকক্ষণ অবাক হয়ে দেখল ফুলগুলো। আনিস হাসি মুখে বলল, শুভ জন্মদিন মালিশা।

মালিশা জবাব দিল না। তার চোখে জল আসছে। সে তা গোপন করবার জন্যে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল।

১১

এ বৎসর প্রচণ্ড শীত পড়েছে।

ফার্গোতে যারা বসবাস করে তাঁরা পর্যন্ত বলছে— নেস্টি ওয়েদার। ফেব্রুয়ারি মাসেই চার ফুটের মতো বরফ জমে গেল শহরে। সন্ধ্যার পর লোকজন আর ঘর ছেড়ে বের হয় না। কেউ যে সপিং-এ গিয়ে ঘুরে ফিরে মন তাজা করবে সে উপায় নেই। ঘণ্টা খানিক ঠান্ডায় পড়ে থাকলেই আর স্টার্ট নেবে না। বড় বড় উইন্টার সেল হচ্ছে সেখানে পর্যন্ত লোকজন নেই।

টমের দিনকাল বেশ খারাপ হয়ে গেল। কাজ নেই। গোটা ফেব্রুয়ারি মাসে বাচ্চাদের বইয়ের একটি ইলাশট্রেশন ছাড়া আর কোনো কাজ জুটল না। রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছবি বিক্রিও বন্ধ। এই প্রচণ্ড ঠান্ডায় পায়ে হেঁটে কেউ চলাফেরা করে না। সবাই বের হয় গাড়ি নিয়ে। কার দায় পড়েছে গাড়ি থামিয়ে ছবি কিনবে ? সবচে' বড় অসুবিধা হচ্ছে বাড়িটি ছেড়ে শহরতলির একটা অ্যাপার্টমেন্ট নিতে হয়েছে। সেখানে রান্নাঘর এবং বাথরুম শেয়ার করতে হয়। টম বেশ কয়েকবার বলেছে এই শহর ছেড়ে অন্য কোথাও যাবে কিন্তু বলা পর্যন্তই। সে নাকি বরফে ঢাকা শহরের কয়েকটি ছবি এঁকেই বিদায় হবে। ছবি এঁকে ফেললেই হয়। কিন্তু এখনো তার মনমতো বরফ জমা হয় নি।

প্রকৃতির কাছে সম্পূর্ণ পরাজিত একটি শহরের ছবি আঁকব তারপর বিদায়। বুঝলে রুনকি, এখনো সময় হয় নি।

পরাজিত হবার আর বাকি কোথায় ?

অনেক বাকি। এখনো বাকি আছে।

এই অ্যাপার্টমেন্টটিতে রুনকির গা ঘিনঘিন করে। যে মেয়েটির সঙ্গে রান্নাঘর ও বাথরুম শেয়ার করতে হয় সে সবকিছু বড় ময়লা করে রাখে। গভীর রাত পর্যন্ত হাই ভ্যলুমে গান শোনে। সময়ে অসময়ে টমের কাছ সিগারেট চায়। ভালো লাগে না রুনকির। অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। প্রায়ই অ্যাপার্টমেন্টের সিঁড়িতে মদ খেয়ে লোকজন গলা ফাটিয়ে চেঁচায়। কিছুদিন আগেই পুলিশ এসে ছ'নম্বর ঘর থেকে একটি লোককে ধরে নিয়ে গেল। এ জায়গা ছেড়ে কোথাও যেতে পারলে হাঁপ ছেড়ে বাঁচা যায়। কিন্তু যাবার উপায় নেই। এরচে' সস্তায় ফার্গোতে অ্যাপার্টমেন্ট পাওয়া যাবে না। টম নিজেও অনেক খোঁজাখুঁজি করেছে। কিন্তু ওর হাত একেবারেই খালি। অবস্থা এরকম চললে আন-এমপ্লয়মেন্ট বেনিফিটের জন্যে হাত পাততে হবে। টমের তাতে খুবই আপত্তি।

আমি কি ভিখিরি যে আন-এমপ্লয়মেন্ট নেব ?

যখন কিছুই থাকবে না তখন কী করবে ?

তখন অন্য কোথাও যাব। এই নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না।

কোনো কাজটাজ করে টমকে সাহায্য করার ইচ্ছা হয় রুনকির কিন্তু শীতের সময়টায় কাজ পাওয়া খুব মুশকিল। একটি কাজ পাওয়া গিয়েছিল দক্ষিণ ফার্গোতে। গাড়ি ছাড়া এতদূর যাওয়ার কোনোই উপায় নেই। বাস ঐ লাইনে যায় না। টমের গাড়িও নেই। দিন-রাত ঘরেই বসে থাকতে হয় রুনকির। ইউনিভার্সিটির ক্লাস বাদ দিতে হয়েছে। উইন্টারকোয়ার্টারে নাম রেজিস্ট্রি করা হয়নি। ধারে সাতশ' ডলার যোগাড় করা গেল না।

টম কাজের খোঁজে সারাদিন ঘোরাঘুরি করে। রুনকি ঘরেই থাকে। ভালো লাগে না। টম সেদিন বলল, তুমি বাবা-মার কাছে ফিরে যাও রুনকি।

কেন ?

তোমার এখানে আর মন লাগছে না।

আমি কি বলেছি মন লাগছে না ?

বলতে লজ্জা লাগছে বলে বলছো না। বাবা-মার কাছে ফিরে যেতেও তোমার লজ্জা লাগছে। লজ্জার কিছু নেই রুনকি।

তুমি বড্ড বাজে কথা বলো টম।

টম হেসে বলেছে, এইটি তুমি ভুল বললে রুনকি। বাজে কথা আমি কখনো বলি না। তোমার মধ্যে দ্বিধা দেখতে পাচ্ছি বলেই বলছি।

তোমার কি ধারণা আমি আর তোমাকে ভালোবাসি না ?

সে কথা আমি বলি নি রুন।

তুমি কি আমাকে ভালোবাস ?

তুমি খুব চমৎকার একটি মেয়ে। তোমাকে যে কেউ ভালোবাসবে।

তুমি কিন্তু আমার কথার জবাব দাও নি।

আমি তোমাকে খুবই ভালোবাসি রুনকি।

যদি সত্যি ভালোবাস তাহলে প্লিজ চলো অন্য কোথাও যাই।

আর কয়েকটি দিন, প্রকৃতির কাছে শহরের পরাজয়ের ছবিটা শেষ করেই রওনা হব।

রুনকির এখন মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে মার সঙ্গে গিয়ে কথা বলে কিন্তু সাহস হয় না। তার দিকে তাকিয়েই মা নিশ্চয়ই বুঝে ফেলবেন ব্যাপারটা। মায়েরা অনেক কিছু বুঝতে পারে।

সফিক এসেছিল সেদিন, সে শুধু বলল, বাহ্ স্বাস্থ্য ভালো হয়েছে তোমার রুনকি।

রুনকি একবার ভাবল সফিককে বলবে ব্যাপারটা। কিন্তু বলতে বলতেও সামলে গেল। টমকে আগে জানানো উচিত। টমের আগে অন্য কারোর জানা ঠিক নয়।

সফিক আসলেই অনেক খবর পাওয়া যায়। সমস্তই বাংলাদেশের খবর।

বুঝলে রুনকি, জিয়াউর রহমান সাহেবের নাম হয়েছে এখন 'জিয়াউর রহমান খাল কাটি'। শুধুই খাল কাটছে।

জিয়াউর রহমান কে ?

মাই গড। আমাদের প্রেসিডেন্ট। ফেরেশতা আদমি।

তাই নাকি ?

বেচারার একটা হাফ শার্ট আর দুটো ট্রাউজার আর কিছুই নাই।

কী যে তুমি বলো সফিক ভাই।

এইতো বিশ্বাস হলো না। মিথ্যা বলব কেন খামখা। একটা পয়সা বেতন নেয় না গভর্মেন্টের কাছ থেকে।

বেতন না নিলে চলে কী করে ?

চলে আর কোথায় ? কিছুই চলে না। দেশের জন্য লোকটার জান। নিজের দিকে তাকাবার সময় আছে ?

সফিক এলে রুনকি কিছুতেই যেতে দেয় না। বাংলাদেশী রান্না রাঁধতে চেষ্টা করে। ভাত রান্না হয় সেদিন।

রান্না কেমন হয়েছে সফিক ভাই ? মা'র মতো হয়েছে ?

চমৎকার। ফাস ক্লাস।

ভাতটা বেশি নরম হয়ে গেছে না ?

নরমই আমার কাছে ভালো লাগে। চাবানোর দরকার হয় না। মুখে ফেললেই হড়হড় করে নেমে যায়।

চাকরি পেয়েছো সফিক ভাই ?

না, জোসেফাইনকে খুব তেলাচ্ছি, কাজ হচ্ছে না।

অন্য কোথাও চেষ্টা করো।

গ্রীন কার্ড নেই, কাজ দেবে কে আমাকে ? গভীর সমুদ্র।

সেবার যে বলেছিলে ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টে একটা কাজ পাবে ?

সম্ভাবনা চল্লিশ পারসেন্ট। বাঁদরের দেখাশোনা। খাঁচা পরিষ্কার রাখা। ওদের ব্যালেন্সড ডায়েট দেয়া। ড. লুইসের হাতেই সব, দেখি ব্যাটাকে ভজানো যায় কিনা। শালার দয়ামায়া কিছুই নাই শরীরে। দুঃখের কথা বলেও লাভ হয় না।

পরাজিত শহরের ছবি টমের আঁকা হলো না। মন্টানার ছোট্ট একটি শহরে কাজ পাওয়া গেল। এক ভদ্রলোক পাহাড়ের ওপর চমৎকার একটি শীতাবাস বানিয়েছেন, তার লবির ডেকোরেশন। কাজটি লোভনীয়। কারণ যতদিন কাজ শেষ না হচ্ছে ততদিন শীতাবাসে থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা। পাশেই স্কী করবার স্পট। জমে যাওয়া একটি হ্রদ আছে। সেখানে উইন্টার ফিসিং-এর ব্যবস্থা আছে। বরফ খুঁড়ে ছিপ

ফেললেই প্রকাণ্ড সব কার্প ধরা পড়ে। টম রাজি হয়ে গেল। পরাজিত শহরের ছবি পরেও আঁকা যাবে। রুনকিকে অবাক করে দিয়ে এক সন্ধ্যায় শ্যাম্পেনের একটি বোতল নিয়ে আসল, এসো রুনকি সেলিব্রেট করা যাক।

কিসের সেলিব্রেশন ?

তোমার বাচ্চা আসছে সেই সেলিব্রেশন।

রুনকি দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারল না।

তুমি কখন জানলে ?

সেটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট ?

শ্যাম্পেনের মুখ খোলা মাত্রই কর্কটি বহুদূর ছুটে গেল। টম হেসে বলল, আমার বাচ্চা খুব ভাগ্যবান হবে। আর শোনো রুনকি, আমার মনে হয় আমাদের বিয়ে করা উচিত। ম্যারেজ লাইসেন্স এখান থেকেই নিয়ে যাব। হানিমুন হবে মন্টানায়, ঠিক আছে ? না কি তুমি আন-মেরিড মাদার হতে চাও ?

রুনকি জবাব দিল না। টম বলল, তোমাকে বিয়ের পর আমার বাবা-মা'র কাছে নিয়ে যাব। সিয়াটলে থাকেন তারা। তাদের ছোট একটা ফার্ম আছে। তোমার ভালো লাগবে। তবে যেতে হবে গরমের সময়। তখন ওয়েদার ভালো থাকে। ওকি রুনকি কাঁদছো কেন ?

মন্টানায় যাবার আগে রুনকি দেখা করতে গেল মা'র সঙ্গে। রাহেলা দরজা খুলে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে রইলেন।

কি মা, ঘরে ঢুকতে দেবে না ?

রাহেলা কথা বললেন না দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালেন।

বাবা কোথায় ?

মেনিয়াপলিস গিয়েছে।

কবে ফিরবে ?

সোমবার।

ও, তাহলে আর দেখা হচ্ছে না। আমরা মন্টানা চলে যাচ্ছি মা। রাহেলা চুপ করে রইলেন। রুনকি ওভারকোট খুলতেই শান্ত স্বরে বললেন, মা হচ্ছো তাহলে।

হ্যাঁ হচ্ছি। তোমার এমন মুখ কালো করবার দরকার নেই মা। আমরা বিয়ে করছি। ম্যারেজ লাইসেন্স যোগাড় হয়েছে। বিয়েতে আসবে না জানি তবু কার্ড পাঠাব।

রুনকি টাওয়েল দিয়ে মাথার চুল মুছল। হালকা গলায় বলল, কফি খাওয়াবে যা ঠান্ডা বাইরে।

রাহেলা কফির পট বসালেন। রান্নাঘর থেকেই থেমে থেমে বললেন, তোমার পড়াশোনার পাঠ তাহলে চুকেছে।

আবার শুরু করব। তা ছাড়া....

তা ছাড়া কী ?

পুঁথিগত পড়াশোনার তেমন দাম নেই মা। পৃথিবীতে যত টেলেন্টেড লোক জন্মেছে তাদের কারোর ইউনিভার্সিটির ডিগ্রি ছিল না।

তা ছিল না কিন্তু ওদের টেলেন্ট ছিল। তোমার তা নেই। রুনকি হাসল। কথার উত্তর না দিয়ে কফির পেয়ালা হাতে নিয়ে চলে গেল দোতলায় তার নিজের ঘরে। ঘরটি রাহেলা চমৎকার করে সাজিয়ে রেখেছেন। দেখেই মনে হবে এই বাড়ির মেয়েটি হয়তো কলেজে গিয়েছে, ফিরে আসবে এক্ষুনি।

রুনকি দেখল তার ব্যবহারি কাপড়গুলো পর্যন্ত ইস্ত্রি করে রাখা হয়েছে। বার্বি ডল দু'টি মা নিচ থেকে নিয়ে এসে তার ঘরে রেখেছেন। দেয়ালে রুনকির ছোটবেলার একটি ছবি— ববল গাম দিয়ে বল বানানোর চেষ্টা করছে রুনকি।

রাহেলা শুনলেন উপরে গান বাজছে। কিংস্টোন ট্রায়োর বিখ্যাত গান,

We had joy we had fun
We had seasons in the sun
But the hills we will climb
Where the seasons out of time

তিনি নিঃশব্দে উপরে উঠে আসলেন। রুনকি কার্পেটে পা ছড়িয়ে চুপচাপ বসে আছে। ক্লান্ত বিষণ্ণ একটি ভঙ্গি। কাঁদছে নাকি ? রাহেলা বললেন, রুনকি তুমি কি দুপুরে খাবে এখানে ?

রুনকি চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, না মা, দুপুরে আমরা রওয়ানা হব। টম এসে এখান থেকে তুলে নেবে আমাকে।

তুমি যদি তোমার কোনো জিনিসপত্র নিতে চাও নিতে পারো।

মা, আমি কিছুই নিতে চাই না।

রুনকি চোখ মুছে বলল, তুমি কি আমার বাচ্চাটির জন্যে দুটি নাম দেবে— একটি ছেলের নাম একটি মেয়ের নাম ?

রাহেলা থেমে থেমে বললেন, আমার নাম তোমাদের পছন্দ হবে না রুনকি। তোমরা নিজেরা নাম বেছে নাও।

কেন তুমি এত রেগে আছ মা ? তুমি কি বুঝতে পারছো না আমি অনেক দূরে চলে যাচ্ছি ?

দূরে গেছ অনেক আগেই। নতুন করে বুঝাবুঝির কিছু নেই।

রুনকি বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, যাবার আগে পুরনো দিনের মতো তুমি কি আমাকে একটি চুমু খাবে মা ? প্লিজ!

১২

নিশানাথ বাবু খুব সকালে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছেন।

উদ্দেশ্য আশেপাশের গ্যারেজ— সেগুলো খুঁজে দেখা। প্রি-উইন্টার গ্যারেজ সেল শুরু হয়েছে। বুড়ো-বুড়ির দল অপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গাড়ির গ্যারেজে সাজিয়ে বসে আছে। মূল্য নাম মাত্র। নিশানাথ বাবু সকাল থেকেই এ সব দেখে বেড়াচ্ছেন। গ্যারেজসেলে ঘুরে বেড়ানো তাঁর বাতিকের মতো। যে সব জিনিস তিনি গত চৌদ্দ বছরে কিনেছেন তাঁর মধ্যে একটি প্রকাণ্ড পিয়ানো পর্যন্ত আছে। এম স্ট্রিটের দোতলা বাড়ি গ্যারেজসেলে কেনা জঞ্জাল দিয়ে তিনি ভর্তি করে ফেলেছেন। নতুন কিছু কিনে রাখবার জায়গা নেই তবু কিনছেন।

আজ তার একটি ফুলদানি পছন্দ হলো। জার্মান সিলভারের ফুলদানি। খুব সুন্দর কাজ। দাম লেখা আছে এক ডলার।

এরচে' কমে দিতে পারো ? এক ডলার বড্ড বেশি মনে হচ্ছে।

যে বুড়ো জিনিসপত্র সাজিয়ে বসে আছে সে অবাক হয়ে বলল, এক ডলার কি যথেষ্ট কম নয় ডঃ নিশানাথ ?

নিশানাথ বাবু দেখলেন বুড়ো হচ্ছে স্টাটিসটিকসের স্ট্যানলি। মাংকি ক্যাপে সমস্ত মুখ ঢেকে রেখেছে বলে চেনা যাচ্ছে না।

গুড মর্নিং স্ট্যানলি।

গুড মর্নিং। কফি খাবে ? গ্যারাজ সেল উপলক্ষে কফি পাওয়া যাচ্ছে। পঞ্চাশ সেন্ট চার্জ, ফ্রি রিফিল। নিশানাথ বাবু পঞ্চাশ সেন্ট দিয়ে এক পেয়ালা কফি নিলেন।

বিক্রিটিক্রি কেমন ?

মন্দ নয়। সাড়ে ন'ডলার বিক্রি করেছি। বসো তুমি ঐ চেয়ারটাতে বসো। নিশানাথ বাবু অবাক হয়ে স্ট্যানলির দিকে তাকালেন। এই লোকটি মাসে চার হাজার ডলারের মতো পায়। দুপুরের একটা সাদাসিধা লাঞ্চের জন্যেই খরচ করে ত্রিশ-চল্লিশ ডলার। অথচ সে বাড়ির যত সব জঞ্জাল সাজিয়ে সাড়ে ন'ডলার বিক্রি করে কী খুশি।

স্ট্যানলি ভারি স্বরে বলল, ওল্ড হোমে যাবার প্রস্তুতি, বুঝলে ? জিনিসপত্র সব বিক্রিটিক্রি করে হাত খালি করছি।

প্রস্তুতি কি একটু সকাল সকাল নিয়ে ফেলছো না ?

উঁহু রিটায়ার করবার টাইম হয়ে আসছে। বছর দুই আছে মাত্র। নিশানাথ বাবু জার্মান সিলভারের ফুলদানি ছাড়াও একটা বড় আয়না কিনে ফেললেন। আয়নাটির

দাম পড়ল তিন ডলার। স্ট্যানলি বারবার বলল, আয়নাটায় খুব জিতে গেলে। আমার স্ত্রী ইটালি থেকে ছ'শ লীরা দিয়ে কিনেছিল।

তিনি বাড়ি ফিরলেন এগারোটার দিকে। কী আশ্চর্য, রুনকি বসে আছে বারান্দার ইজিচেয়ারে। রুনকি হাসি মুখে বলল, গ্যারাজ সেলে গিয়েছিলেন চাচা?

হুঁ।

ইস, কী যে এক রোগ বাঁধিয়েছেন।

ভেতরে আয় রুনকি।

আজ কী কিনলেন?

জার্মান সিলভারের একটা ফুলদানি আর একটা আয়না। তুই নিবি?

না।

আয়নাটা নিয়ে যা। ভালো জিনিস ছ'শ লীরা দাম পড়েছে ইটালিতে।

পড়ুক। চাচা আপনার কাছে বিদায় নিতে আসলাম।

নিশানাথ বাবু কিছু বললেন না। চায়ের পানি চড়ালেন। রুনকি সোফায় বসতে বসতে বলল, আমরা মন্টানায় চলে যাচ্ছি।

মন্টানা খুব সুন্দর জায়গা।

আপনার সঙ্গে হয়তো আর দেখা হবে না।

নিশানাথ বাবু দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, অল্প বয়েসী মেয়ে নিরাশ ভঙ্গিতে কথা বললে ভালো লাগে না। তাদের বলা উচিত আবার হয়তো দেখা হবে। অর্থ একই— আনসারটিনিটি। কিন্তু বলার ভঙ্গিটা অপটিমিস্টিক। চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবি?

না চাচা। আপনাকে একটা খবর দেই— আমরা বিয়ে করছি।

জানি। সফিক বলেছে। বাঙালি কায়দায় নাকি বিয়ে হবে?

না, সে রকম কিছু না।

নিশানাথ বাবু চা বানিয়ে এনে দেখেন রুনকি কাঁদছে। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, কাঁদছিস কেন মা?

চাচা, আমি কি ভুল করছি?

কোনটা ভুল আর কোনটা না তা বুঝা মানুষের সাধ্যের বাইরে। ও নিয়ে চিন্তা করিস না। চা খা।

রুনকি চায়ে চুমুক দিল। নিশানাথ বাবু গাঢ় স্বরে বললেন, খিদিরপুরের এক কলেজে অঙ্ক পড়াতাম, বুঝলি রুনকি। কী নিদারুণ অভাব গেছে আমার। আর এখন পাশ বই দেখলে তুই চমকে উঠবি। আমি যদি খিদিরপুরে পড়ে থাকতাম সেটা

ভুল হতো। আবার আমেরিকা আসাটাও ভুল হয়েছে। তাহলে ঠিক কোনটা ?

রুনকি চুপ করে রইল। নিশানাথ বাবু বললেন, বেঁচে থাকার আনন্দটাই একমাত্র সত্যি। ঐটি থাকলেই হলো। আয়নাটা একটা কাগজ দিয়ে বেঁধে দেই মা ?

দিন।

নিশানাথ বাবু আয়নাটি গিফট র‍্যাপ করবার জন্যে পাশের ঘরে চলে গেলেন। রুনকি একটু হাসলো। সে জানে নিশানাথ বাবু শুধু আয়না কাগজ দিয়ে বাঁধবেন না। সেই সঙ্গে একটা খামের মধ্যে মোটা অঙ্কের একটা চেক থাকবে। এটি নিশানাথ বাবুর একটি পুরনো অভ্যাস। রুনকির সব জন্মদিনে তিনি রুনকিকে গল্পের বই দেন। সেই বইয়ের ভেতর একটা খাম থাকবেই। যা দেয়ার তা সরাসরি দিয়ে দিলেই হয় কিন্তু তা তিনি দেবেন না। কত রকম অদ্ভুত মানুষ দুনিয়াতে আছে।

১৩

জোসেফাইনের মন ভেজানোর সব চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। বুড়ি পরিষ্কার বলে দিয়েছে।

কাজ তোমাকে দেব না। মাথা বেঠিক লোক আমি রাখি না। লুনাটিকদের বিষয়ে আমার এলার্জি আছে।

আমাকে তো তাহলে না খেয়ে থাকতে হয় জোসেফাইন। তুমি ছাড়া কে আমাকে কাজ দেবে ? উপোস দিতে হবে আমাকে।

একেবারে কিছুই না জুটলে এখানে এসে হামবার্গার খেয়ে যাবে, চার্জ লাগবে না। কিন্তু চাকরি তোমাকে দিচ্ছি না।

ফার্গোতে বিদেশীদের কাজ পাওয়া ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে। এড দেখে টেলিফোন করলেই জিজ্ঞেস করে— গ্রীন কার্ড আছে ? নেই শুনলেই খট করে টেলিফোন নামিয়ে রাখে। যারা কিছুটা ভদ্র তারা মিষ্টি সুরে বলে, এখানে ওপেনিং নেই। তুমি ঠিকানা রেখে যাও। আমরা ওপেনিং হলে খবর দেব।

ওপেনিং নেই তো এড দিলে কেন ?

কয়েকটি ওপেনিং ছিল, সেগুলি ফিল্ড আপ।

'দি মেঘনা রেস্টুরেন্টে'র জন্যে যে টাকাপয়সা উঠেছে (সর্বমোট সাতশ' এগারো ডলার) সেখানে হাত পড়েছে। রেস্টুরেন্টের চিন্তা এখন আর তেমন নেই। কারণ রহমান তার 'ইন্ডিয়া হাউস' নিয়ে পিছিয়ে পড়েছে। তার ধারণা এত ছোট শহরে বিদেশী রেস্তোরাঁ চলবে না। সে খোঁজ নিয়ে দেখেছে এখানে যে ক'টি চীনা রেস্তোরাঁ আছে, সেখানে শুক্র-শনি এই দু'দিনই যা লোকজন হয়। অন্যদিন রেস্তোরাঁ খাঁ খাঁ করে। তাছাড়া এই প্রচণ্ড শীতে কার এমন মাথাব্যথা যে কাঁপতে কাঁপতে বাইরে খেতে আসবে ?

এদিকে ইমিগ্রেশনের লোকজনও বেশ ঝামেলা করছে। তিন-চারটা চিঠি এসেছে। কোনোদিন হুট করে হয়তো পুলিশ এসে হাজির হবে। ঠিকানা বদলাতে হলো সেই কারণেই। নিক্স প্লেসের উল্টোদিকে ছোট একটা ঘর। শুধু শোয়ার ব্যবস্থা। খাওয়াদাওয়া নিক্স প্লেসে। বুড়ি তার কথা রেখেছে খাওয়ার পর বিল দিতে গেলে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করে, কাজ পেয়েছো ?

না।

নো চার্জ।

বেশ, খাতায় লিখে রাখো। চাকরি পেলে সব এক সঙ্গে দেব।

বাকির কারবার আমি করি না, ভাগো।

কাজ শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল।

ফার্মেসি ডিপার্টমেন্টের সেই চাকরি।

গোটা দশেক বাঁদর, কয়েকটি কুকুর আর প্রায় শ'দুয়েক গিনিপিগের দেখাশোনা। সময়মতো খাবারদাবার দেয়া। খাঁচা পরিষ্কার করা। পশুগুলোকে পুরোপুরি জীবাণু মুক্ত রাখা। কাজ অনেক সেই তুলনায় বেতন অল্প। নব্বই ডলার প্রতি সপ্তায়। নব্বই ডলারই সই। মহা উৎসাহে কাজে লেগে গেল সফিক।

কাজটা যত খারাপ মনে হয়েছিল তত নয়। বাঁদরের খাঁচায় একটিকে পাওয়া গেল একেবারে শিশু। সফিককে দেখেই সে দাঁত বের করে ভেংচে দিল। সফিক অবাক, আরে তুই এইসব ফাজলামি কোত্থেকে শিখলি ?

বানরের বাচ্চাটি কথা শুনে উৎসাহিত হয়েই বোধহয় থু করে এক দলা থুথু ছিটিয়ে দিল সফিকের দিকে।

মহা মুশিবত হলো তো শালাকে নিয়ে। মারব থাপ্পর।

বাচ্চাটা গালি শুনে উৎসাহিত হয়ে খুব লাফালাফি শুরু করল। তার আনন্দের সীমা নেই।

সন্ধ্যা সাতটা বাজে।

আনিস সবেমাত্র ফিরেছে ইউনিভার্সিটি থেকে। হাতমুখও ধোয়া হয়নি, সফিক এসে হাজিরা। এক্ষুনি যেতে হবে তার সঙ্গে।

কী ব্যাপার আগে বলো।

আগে বললে আপনি আর যাবেন না।

যাব। ঘরে তেমন কিছু নেই। এখন বলো ব্যাপারটা কী ?

জং বাহাদুরের শয়তানিটা দেখাব আপনাকে। নিজের চোখে না দেখলে বিশ্বাস

করবেন না শালা ওয়ান নাম্বার হারামি।

জং বাহাদুরটা কে ?

ও, আপনাকে তো বলা হয় নাই। বাচ্চা একটা বাঁদর। বাচ্চা হলে কী হবে শয়তানের হাড্ডি। দেখবেন নিজের চোখে।

নিজের চোখে কিছু দেখা গেল না। জং বাহাদুর ঘুমিয়ে পড়েছে। সফিক খুব মনমরা হয়ে পড়ল। আনিস হাসিমুখে বলল, কালকে এসে দেখবো।

সকাল সকাল আসবেন। খাবার দেয়ার সময় হলে কী করে দেখবেন। বিকাল বেলা একটা কলা, একটা আপেল আর একটা ডিমসিদ্ধ দেয়া হয়েছে। শালা কলা আর ডিমটা খেয়ে আপেলটা আমাকে সাধছে, দেখেন কাণ্ড।

তুমি না বললে শয়তানের হাড্ডি। আমার কাছে তো বেশ ভালো মানুষই মনে হচ্ছে।

আরে না না, তার বজ্জাতির কথা তো কিছুই বললাম না।

আনিস হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলল, তোমার কি কোনো কাজ আছে সফিক ? তোমার গাড়িতে আমাকে এক জায়গায় নিয়ে যেতে পারবে ?

কোথায় ?

আনিস খানিক ইতস্তত করে বলল, একটি মেয়ের সঙ্গে আমার কিছু পরিচয় হয়েছে। অনেকদিন তার খোঁজ নেই। ভাবছিলাম একটু খোঁজ নেব।

সফিক বেশ অবাক হলো। আনিস থেমে থেমে বলল, আমি দেশে ফিরে যাব সফিক। আমার ভালো লাগছে না। আমি ঐ মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে যেতে চাই।

সে কোথায় থাকে ?

সাউথ ফার্গো।

চলুন যাই। ফুলের দোকান হয়ে যাবেন ? ফুল নেবেন ?

ফুল কেন ?

সফিক হাসিমুখে বলল, আমেরিকান মেয়েকে বিয়ের কথা কি ফুল ছাড়া বলা যায় ? এক গাদা গোলাপ নিয়ে যান। ডাউন টাউনে ফুলের দোকান সারারাত খোলা থাকে। আনিস দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, হ্যাঁ নিশ্চয়ই ফুল তো কিনতেই হবে।

মালিশাকে পাওয়া গেল না। বাড়িওয়ালি সরু গলায় বলল, ওর মা মারা গেছে। ও গেছে টাকাপয়সা কিছু দিয়ে গেছে কিনা দেখতে।

কবে গিয়েছে ?

এক সপ্তাহ হলো।

আনিস বলল, ও কি টাকাপয়সা কিছু পেয়েছে ?

আমি কী করে জানব ? একশো ডলার রেন্ট বাকি রেখে গেছে সে। আমি চিন্তায় অস্থির টাকাটা মার গেল কি না।

আমি কি এই গোলাপগুলো তার ঘরে রেখে যেতে পারি ?

পারবে না কেন ? রেখে যাও। তুমি কি ওর বন্ধু ?

হ্যাঁ।

ভালো। আমার ধারণা ছিল ওর কোনো বন্ধু নেই। আমার দু'জন ভাড়াটে আছে যাদের কোনো ছেলে বন্ধু নেই— একজন হচ্ছে মালিশা অন্যজন এমিলি জোহান।

এমিলি জোহান ?

হ্যাঁ, কবি এমিলি জোহান, নাম শুনেছ ? খুব বড় কবি ? রাইটার্স গিল্ড অ্যাওয়ার্ড পাওয়া।

আমি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে পারি ?

না, পারো না। সে এখন মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে আছে।

ফেরার পথে আনিস একটি কথাও বলল না।

১৪

সকালবেলা একটা পার্কা গায়ে দিয়ে আমিন সাহেব শোভেল নিয়ে বেরুলেন। বরফে ড্রাইওয়ে ঢাকা পড়েছে। পরিষ্কার না করলে গাড়ি বের করা যাবে না। অসম্ভব ঠান্ডা পড়েছে। চোখ জ্বালা করছে। কনকনে হাওয়া। নাক-মুখ সমস্তই ঢাকা তবু সেই হাওয়া কী করে যেন শরীরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। অল্পক্ষণ শোভেল চালাবার পর তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। বয়স হয়েছে। এখন আর আগের মতো পরিশ্রম করতে পারেন না। দিন ফুরিয়ে আসছে। ঘণ্টা বাজতে শুরু করেছে। চলে যাবার সময় হয়ে এলো। এবারের যাত্রা অনেক দূরে। গন্তব্যও জানা নেই। আমিন সাহেব ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেললেন। রুনকি থাকলে এতটা পরিশ্রম হতো না। নিমিষের মধ্যে বরফ কেটে গাড়ি বের করে ফেলত। তারপর ছুটাছুটি শুরু করত বরফের উপর। তুষার বল বানিয়ে চেঁচাত— মারব তোমার গায়ে বাবা ? দেখবে আমার হাতের টিপ ? মেয়েটা একেবারে ছেলেমানুষ রয়ে গেল।

না, কথাটা ঠিক হলো না। রুনকি এখন আর ছেলেমানুষ নয়। আমিন সাহেব বিশ্রাম নেবার জন্যে গ্যারাজের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালেন। তখনই চোখে পড়ল রাহেলা দোতলার বারান্দায় একটা সাদা চাদর গায়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঠান্ডায় এমন পাতলা একটা চাদর গায়ে দিয়ে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে ? নিউমোনিয়া বাঁধাবে নাকি ? রাহেলা উপর থেকে ডাকলেন, চা খেয়ে যাও।

চা খেয়ে আমিন সাহেবের মনে হলো তাঁর শরীর ভালো লাগছে না। নিশ্বাস নিতে একটু যেন কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু তিনি কিছুই বললেন না। রাহেলা বললেন,

আজকের এই দিনটি একটি বিশেষ দিন। তোমার মনে আছে ?

না।

আজ রুনকির জন্মদিন।

আমিন সাহেব বড়ই অবাক হলেন। এতবড় একটা ব্যাপার তিনি ভুলেই বসে আছেন। উফ, কী ঝামেলাই না হয়েছিল। বরফে চারদিক ঢাকা। বেশির ভাগ রাস্তাঘাটই বন্ধ। এর মধ্যে রাহেলার ব্যথা শুরু হলো। এ্যম্বুলেন্সে খবর দিলেই হতো তা না তিনি গাড়ি নিয়ে বের হলেন। ফিফটিনথ স্ট্রীট থেকে উঠিয়ে নিলেন নিশানাথ বাবুকে। কী দুরবস্থা ভদ্রলোকের। ব্যাপার-ট্যাপার দেখে এই ঠান্ডাতেও তাঁর কপাল দিয়ে টপ টপ করে ঘাম পড়ছে। রাহেলা একবার বললেন— আমার মনে হচ্ছে গাড়িতেই কিছু একটা হয়ে যাবে। নিশানাথ বাবু বললেন— মা কালীর নাম নেন ,চেঁচামেচি করবেন না। রাহেলা ধমকে উঠলেন— মা কালীর নাম নেব কেন, মা কালী আমার কে ? এই সময় গাড়ি স্কিড করে খাদে পড়ে গেল। উঁহু কী ভয়াবহ সময়ই না গিয়েছে।

আমিন সাহেব বললেন, আমাকে আরেক কাপ চা দাও।

তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে ? তুমি ঘামছো।

না, শরীর ঠিক আছে।

রাহেলা বললেন, আমি রুনকির জন্মদিন উপলক্ষে ছোট্ট একটা কেকের অর্ডার দিতে চাই।

আমিন সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। রাহেলা চোখ নিচু করে বললেন, আমি তুমি আর নিশানাথ বাবু।

বেশতো।

রাহেলা মৃদু স্বরে বললেন, রুনকির প্রতি আমি অবিচার করেছি।

আমিন সাহেব জবাব দিলেন না। রাহেলা বললেন, নিজেদের মতো ওকে আমরা বড় করেছি। ক্যাম্পিং-এ যেতে দেইনি। ডেট করতে দেইনি।

বাদ দাও ওসব।

আমেরিকায় থাকব অথচ বাংলাদেশী সাজব সেটা হয় নাকি বলো ?

আমিন সাহেব জবাব দিলেন না। রাহেলা বললেন, কাল রাত্রে আমি রুনকিকে স্বপ্নে দেখেছি। যেন ছোট খালার বাসায় ওকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছি। ছোট খালা বলছেন— রাহেলা তোর মেয়ে তো পরিষ্কার বাংলা বলছে। আর তুই বললি ও বাংলা জানে না। ছোট খালাকে মনে আছে তোমার ?

না।

আমাদের বিয়েতে তোমাকে মুক্তা বসানো আংটি দিয়েছিলেন। সেই আংটি তোমার হাতে বড় হয়েছে শুনে ছোট খালা দুঃখে কেঁদে ফেলেছিলেন।

মনে পড়ছে। খুব মোটাসোটা মহিলা, তাই না ?

হ্যাঁ। কী যে ভালোবাসতেন আমাকে! এখন তাঁর শুনেছি খুব দুঃসময়! ছেলেদের সংসারে থাকেন। ছেলেরা দু'চক্ষে দেখতে পারে না। অসুখবিসুখে চিকিৎসা করায় না। আমি ছোট খালার নামে কিছু টাকা পাঠাতে চাই।

বেশ তো।

ভালো এমাউন্টের টাকা। ছোট খালা নিশ্চয়ই খুব খুশি হবেন।

তা হবেন।

আমি পাঁচশ' ডলার পাঠাতে চাই।

আমিন সাহেব বললেন— আমি একটা ব্যাংক ড্রাফট করে আনব।

রাহেলার চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

কাঁদছো কেন ?

কই, কাঁদছি না তো।

রাহেলা মৃদু স্বরে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলিনি। গত মাসে রুনকি এসেছিল।

আমিন সাহেব তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন। রাহেলা বললেন, রুনকির বাচ্চা হবে।

ও বলেছে তোমাকে ?

হ্যাঁ।

টম কি আছে এখনো তার সঙ্গে ?

আছে।

রুনকি কী জন্যে এসেছিল ?

ওর বাচ্চার জন্যে দুটি নাম চায়। একটি ছেলের নাম অন্যটি মেয়ের।

আমিন সাহেব দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বললেন, মেয়ে হলে ওর নাম রাখব বিপাশা।

বিপাশা ?

হ্যাঁ পাঞ্জাবের একটা নদীর নাম। পাঞ্জাবে ওরা বলে বিয়াস।

তোমার কি শরীর খারাপ লাগছে, তুমি খুব ঘামছো।

আমিন সাহেব ক্লান্ত স্বরে বললেন, আমার শরীরটা খারাপ লাগছে।

গাড়ি বের করার দরকার নেই। তুমি শুয়ে থাকো। আর নিশানাথ বাবুকে টেলিফোন করে দাও সন্ধ্যাবেলা যেন আসেন। আমাদের এখানে খাবেন।

আমিন সাহেব নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। তাঁর শরীর বেশ খারাপ লাগছে। এই বয়সে বরফ না কাটাই ভালো। বড় বেশি চাপ পড়ে। শরীর দুর্বল হয়েছে, এখন আর আগের মতো চাপ সহ্য করতে পারেন না। পরীক্ষা করলে হয়তো দেখা যাবে

ব্লাডে সুগার আছে।

নিশানাথ বাবুকে টেলিফোন করবার আগে কী মনে করে যেন দরজা বন্ধ করে দিলেন। নিশানাথ বাবু ঘরেই ছিলেন।

নিশানাথ বাবু, আমি আমিন।

বুঝতে পারছি। আপনার কি শরীর খারাপ ? এভাবে কথা বলছেন কেন ?

আমার শরীর ভালো না। আপনাকে একটি জরুরি ব্যাপারে টেলিফোন করছি।

বলুন।

আপনি তো জানেন আমার এই বাড়ি এবং টাকাপয়সা সব আমি আমার মেয়ের নামে উইল করে রেখেছি। আপনি একজন উইটনেস।

আমি জানি।

নিশানাথ বাবু নানান কারণে আমার স্ত্রীর সঙ্গে আমার মনের মিল হয়নি।

এই বয়সে সেটা তোলার কোনো যুক্তি নেই আমিন সাহেব।

আমিন সাহেব খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে থেমে থেমে বললেন, আমি আমার স্ত্রীর উপর একটা বড় অন্যায় করেছি নিশানাথ বাবু। আজ আমি যদি মারা যাই সে পথের ভিখেরি হবে।

আমিন সাহেব আপনার শরীর কি বেশি খারাপ ?

হ্যাঁ। আপনি কি একটু আসবেন ? আমি নতুন করে উইল করতে চাই।

আমি এক্ষুনি আসছি। সব কাগজপত্র নিয়ে আসব।

নিশানাথ বাবু।

বলুন।

আজ রুনকির জন্মদিন।

আমি জানি। সকালেই মনে হয়েছে।

আমিন সাহেব শান্ত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, আরেকটি কথা জিজ্ঞেস করি আপনাকে, আনিস ছেলেটিকে কেমন মনে হয় আপনার ?

খুব ভালো ছেলে। অত্যন্ত রিলায়েবল।

আমিন সাহেব টেলিফোন করলেন আনিসকে। আনিস বেশ অবাক হলো। আমিন সাহেব তাকে কখনো টেলিফোন করেননি আগে।

আনিস তুমি আমাকে চিনতে পারছো ? আমি আমিন।

চিনতে পারছি। কী ব্যাপার বলুন তো ?

আমার মেয়েটির দিকে তুমি লক্ষ রাখবে।

আনিস অবাক হয়ে বলল, আপনার কি শরীর খারাপ ?

হ্যাঁ।

কী হয়েছে ?

আমি বুঝতে পারছি না। কিন্তু মনে হচ্ছে সময় শেষ হয়ে আসছে। তুমি আমার মেয়েটির খোঁজখবর রাখবে। প্লিজ!

আমি আসছি এক্ষুনি।

আমিন সাহেব দরজা খুলতেই দেখলেন রাহেলা দরজার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে। রাহেলার চোখে মুখে স্পষ্ট ভয়ের ছাপ। রাহেলা বললেন, তোমার কী হয়েছে ?

আমিন সাহেব বললেন, রাহেলা, আমি মারা যাচ্ছি।

রাহেলা আমিন সাহেবের হাত ধরে ইজিচেয়ারে শুইয়ে দিলেন।

তোমার উপর খুব অবিচার করেছি রাহেলা।

রাহেলা দ্রুত আমিন সাহেবের সার্টের বোতাম খুলে ফেললেন। তাঁর হাত কাঁপছে। কী করবেন বুঝতে পারছেন না। আমিন সাহেব প্রচণ্ড ঘামছেন।

রাহেলা, তুমি রাগ করো না। একটা বড় অন্যায় করা হয়েছে।

রাহেলা দীর্ঘ দিন আগে মারা যাওয়া তাঁর মাকে ডাক ছেড়ে ডাকতে লাগলেন— আম্মা ও আম্মা।

১৫

মালিশা গিলবার্ট তার মায়ের টাকা পেয়েছে। টাকার পরিমাণ মালিশার ধারণাকেও ছাড়িয়ে গেছে। সলিসিটর যখন টেলিফোন করে বলল, তোমার জন্যে দুটি খবর আছে। একটি ভালো একটি মন্দ— কোনটি আগে শুনতে চাও ?

তখনো মালিশা কিছু বুঝতে পারেনি। সে বলেছে ভালোটি আগে শুনতে চাই।

তোমার হার্টের অবস্থা ভালো তো ? খবর শুনে ফেইন্ট হতে পারো।

খবর শুনে তার অবশ্যি তেমন কোনো ভাবান্তর হয়নি। বাড়িওয়ালিকে গিয়ে বলেছে, আমার মা মারা গেছেন আমি ফ্লোরিডা যাচ্ছি। তোমার রেন্ট আমি ফিরে এসে দেব।

প্লেনে যাওয়ার মতো টাকা নেই, গ্রে হাউন্ডের টিকিট কাটতে হলো। পৌঁছতে লাগবে তেত্রিশ ঘণ্টা। গ্রে হাউন্ডের বাস ছাড়বে রাত চারটায়। এমন লম্বা সময় কাটানোও এক সমস্যা। মালিশার বারবার মনে হচ্ছিল এ্যাটর্নি ভদ্রলোক হয়তো ভুল করেছে। মা হয়তো নাম কামাবার জন্যে টাকাপয়সা সব দিয়ে গেছে ক্যানসার ইন্সটিটিউটে কিংবা কোনো এতিমখানায়। সেইসব কাগজপত্র হয়তো এ্যাটর্নি ব্যাটা এখনো দেখেনি। না দেখেই টেলিফোন করেছে।

ফার্গো ফোরামেই তো একবার এ রকম একটি খবর উঠল। কোটিপতি বাবা মারা গেছে। খবর পেয়ে ছেলেরা মহানন্দে বাড়ি-ঘর দখল করে বসেছে। কারখানায়

গিয়ে কর্মচারীদের ছাঁটাই করা শুরু করেছে। এমন সময় এ্যাটর্নি অফিস থেকে চিঠি এসে হাজির— এতদ্বারা জানান যাইতেছে যে, জনাব সোরেনসেন জুনিয়ার তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি ইথিওপিয়ার ক্ষুধার্ত শিশুদের ক্ষুধা নিবারণের জন্যে দান করিয়াছেন। অতএব......

মালিশার মার ব্যাপারেও সে রকম কিছু হয়েছে কিনা কে জানে। যদি সে রকম হয় তাহলে ফার্গো ফিরে আসার ভাড়াটাও থাকবে না! অবশ্যি ফিরে আসা এমন কিছু জরুরি নয়। তার জন্যে সব শহরই সমান।

বাসে বসতে গিয়ে মালিশা দেখল তার সিট নাম্বার তের। এটি একটি অলক্ষণ। আগে জানলে টিকিট বদলে নিত। নিশ্চয়ই মা তার জন্যে কিছুই রেখে যায়নি। আর কেনই বা রাখবে! একবারও কি মালিশা তার মায়ের কথা ভেবেছে? মৃত্যুর খবর পেয়ে তার তো সামান্য মন খারাপও হয়নি। ঈশ্বর ও জন্যে তাকে ঠিক শাস্তিই দেবেন। ফ্লোরিডা পৌঁছামাত্র এ্যাটর্নি বলবে, 'মিস আমাদের একটি বড় ভুল হয়ে গেছে। আপনার মা তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি আমেরিকান বন্য পশু সংস্থাকে দিয়ে গেছেন।'

সে রকম কিছু হলো না।

ডরোথী গিলবার্টের হাতে লেখা উইল পাওয়া গেল। এ্যাটর্নি ভদ্রলোক মিষ্টি হেসে বলল, মিস মালিশা তুমি নিশ্চয়ই এখনো আন্দাজ করতে পারছ না যে তুমি কত টাকার মালিক?

মালিশা বলল, না আমি পারছি না।

সব হিসাব আমাদের হাতে আসেনি। তবে যা এসেছে তাতেই আমাদের মাথা ঘুরছে।

এ্যাটর্নিটির বয়স খুবই অল্প। সে মালিশাকে দুপুরে লাঞ্চ খাওয়াতে নিয়ে গেল। হাসতে হাসতেই বলল, তুমি আবার মনে করে বসবে না যে তোমার সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করছি। আমি বিবাহিত। এবং স্ত্রীকে দারুণ ভালোবাসি। একা একা যাতে তোমাকে লাঞ্চ খেতে না হয় সে জন্যেই আমি সঙ্গে এলাম।

তোমাকে ধন্যবাদ।

কী করবে তুমি এত টাকা দিয়ে?

এখনো ভেবে ঠিক করিনি। তবে একজনকে আমি একটি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি উপহার দিতে চাই।

কী রঙ?

নীল, আসমানি নীল।

কাকে দিতে চাও জানতে পারি?

একজন ইন্ডিয়ানকে। তাঁর নামটি অদ্ভুত, অন্ধকারের দেবতা। সে আমার চোখের খুব প্রশংসা করেছিল।

সে ছাড়াও নিশ্চয়ই অনেকেই তোমার রূপের প্রশংসা করেছে। সবাইকেই কি তুমি বুইক স্কাইলার্ক গাড়ি দিতে চাও ?

কেউ সত্যিকারভাবে আমার রূপের প্রশংসা করেনি— ঐ ভদ্রলোক করেছিল।

মিস মালিশা, এখন অনেকেই তোমার রূপের প্রশংসা করবে।

হ্যাঁ, তা করবে।

মালিশার থাকবার জায়গা করা হয়েছে হিলটনে। কাগজপত্রের ঝামেলা মিটলেই স্থায়ী কোনো ব্যবস্থা করা হবে। রাতে বিদায় নেবার আগে অল্প বয়েসী এ্যাটর্নিটি হাসিমুখে বলেছে, তোমার টাকাপয়সার বিলি ব্যবস্থা করবার জন্যে একজন দক্ষ আইনজ্ঞ দরকার।

তুমি কি একজন দক্ষ আইনজ্ঞ ?

না। তবে বিশ্বাসী।

তুমি আমার হয়ে কাজ করলে আমি খুশিই হব।

ধন্যবাদ। প্রথমেই আমি তোমার জন্যে দু'জন সিকিউরিটি গার্ড রাখতে চাই। আমি কাল সকালেই ব্যবস্থা করব।

তার প্রয়োজন আছে কি ?

আছে। ধনী মহিলার জন্যে অনেক কিছুর প্রয়োজন হয়। আমেরিকা বাস করবার জন্যে ভালো নয় মিস মালিশা।

সারারাত মালিশার ঘুম হলো না। অনেকবার মনে হলো সমস্ত ব্যাপারটাই একটা স্বপ্ন নয় তো ? একটি নিখুঁত সুখের স্বপ্ন ? এক্ষুনি হয়তো ঘুম ভাঙবে। বাড়িওয়ালি এসে বলবে— এ মাসের হাউস রেন্ট এক'শ ডলার এখনো দাওনি। আজকে কি তুমি একটি চেক লিখতে পারবে ? কিন্তু স্বপ্নটা আর ভালো লাগছে না। বড় খারাপ লাগছে। যেন সামনে দীর্ঘ একটা অন্ধকার পথ। হোটেল হিলটনের আরামদায়ক উষ্ণতায়ও মালিশার ভীষণ শীত করতে লাগল। সে বেল টিপে বেয়ারাকে ঠান্ডা গলায় বলল— আমার ঘুম আসছে না। বড় খারাপ লাগছে।

১৬

মেমোরিয়াল লাউঞ্জে তুমুল উত্তেজনা।

অসহায় সামুদ্রিক তিমি মাছের কল্যাণে টাকা তোলা হচ্ছে। চারদিকে বড় বড় পোস্টার— তিমি মাছদের বাঁচার অধিকার আছে। নোংরা রাশিয়ান, তিমি শিকার বন্ধ করো। পৃথিবীর কোনো কোনো অঞ্চলে কত তিমি মারা পড়ছে তার পরিসংখ্যানও ঝুলছে জায়গায় জায়গায়।

মেমোরিয়াল লাউঞ্জে দু'টি মেয়ে সেজেগুজে চুমু খাওয়ার স্টল (কিসিং বুথ) খুলে বসেছে। এদের চুমু খেলে দু'ডলার করে দিতে হবে। সেই ডলার চলে যাবে তিমি রক্ষার ফান্ডে। প্রচুর ডলার উঠছে। মেয়ে দু'টি চুমু খেয়ে কূল পাচ্ছে না। আনিস অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চুমু খাওয়া দেখল। দীর্ঘদিন আমেরিকায় থেকেও কিছু কিছু জিনিসে এখনো সে অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারেনি। কিসিং বুথ তার একটি।

হ্যালো আনিস।

আনিস তাকিয়ে দেখলো ডঃ বায়ার। হাতে সাবমেরিন স্যান্ডউইচ। গালভর্তি হাসি।

তিমি ফান্ডে কিছু দিয়েছ ?

এখনো না।

একটা এডভাইস দিচ্ছি। ঐ নীল স্কার্ট পরা মেয়েটিকে চুমু খেতে যেও না। সে নিশ্চয়ই দাঁত ব্রাশ করে না। ড. বায়ার ঘর কাঁপিয়ে হাসতে লাগলেন।

আনিস, তুমি কি লাঞ্চ খেতে যাচ্ছ ?

হ্যাঁ।

আমি জয়েন করতে পারি তোমার সঙ্গে ?

তা পারো।

আনিস তার প্রিয় জায়গাটিতেই গিয়ে বসল। ভিড় নেই, সবাই জড় হয়েছে তিমি মাছদের সাহায্যের ব্যাপার দেখতে। ড. বায়ার অনবরত কথা বলে যেতে লাগল, আমেরিকানদের কেউ পছন্দ করে না। কিন্তু ওদের না হলেও আবার কারোর চলে না।

আমেরিকানরা যদি এক বৎসর কোনো ফসল না করে তাহলে থার্ড ওয়ার্ল্ডের চার ভাগের এক ভাগ লোক মরে ভূত হয়ে যাবে।

মুখে সবাই বলে আগলি আমেরিকান, কিন্তু হাত পাততে হয় আগলি আমেরিকানদের কাছেই হা হা হা।

রাশিয়ানরা এ বৎসর কত লক্ষ মেট্রিক টন গম কিনছে জানো ? জানো না ? আন্দাজ করো তো ?

আনিস হু হা করে যাচ্ছিল। ড. বায়ার তাতেই খুশি। একটির পর একটি প্রসঙ্গ টেনে আনতে লাগল। একসময় আনিস বলল, আমাকে এখন উঠতে হয়।

ক্লাস আছে কোনো ?

না। লাইব্রেরিতে যাব।

পাঁচ মিনিট বসো। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব।

আনিস তাকালো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে।

ডঃ বায়ার বললেন, শুনলাম তুমি দেশে ফিরে যাচ্ছ। কেমিস্ট্রির চেয়ারম্যানের কাছে এই রকম একটা চিঠি দিয়েছ।

হ্যাঁ।

অবশ্যই এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবু কারণ জানতে পারি কি ? তুমি একজন ভালো টিচার। এবং হাইলি কোয়ালিফাইড। খুব শিগগিরই ট্যেনিউর পাবে। তারপর গ্রীন কার্ডের জন্যে দরখাস্ত করতে পারবে।

ড. বায়ার এখানে আমার ভালো লাগছে না।

তোমাকে দোষ দেয়া যাচ্ছে না, এ জায়গার ওয়েদার অত্যন্ত খারাপ। তুমি বরং কালিফোর্নিয়ার দিকে চলে যাও।

ওয়েদার নয়।

ড. বায়ার তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে বললেন, দেশটাই তোমার ভালো লাগছে না ?

না।

এখানে যে ফ্রিডম আছে সে ফ্রিডম তোমার নিজের দেশে আছে ?

না।

এখানকার মতো অর্থনৈতিক নিরাপত্তা তোমার দেশে আছে ?

না, তাও নেই।

দেখো আনিস, আমি অনেক বিদেশীকে দেখেছি পড়াশুনা শেষ করে দেশে চলে যাওয়ার জন্যে পাগল হয়ে ওঠে। চলেও যায় কিন্তু মাস ছয়েক পর আবার ছুটে আসে। স্বপ্নভঙ্গ বলতে পারো।

আনিস কিছু বলল না। ড. বায়ার কফিতে একটা লম্বা চুমুক দিয়ে বললেন, তোমরা বিদেশীরা থাকো শামুকের মতো। বাইরের কারো সঙ্গে মিশতে পারো না। এটা ঠিক না। আন্তর্জাতিক হতে চেষ্টা করা উচিত। পৃথিবীটাই হচ্ছে তোমার দেশ। এভাবে ভাবলে আর খারাপ লাগবে না।

আনিস কোনো উত্তর দিল না। ড. বায়ার হড়বড় করে বললেন, তুমি নিশ্চয়ই কিসিং বুথের মেয়ে দুটিকে চুমু খাওনি। খেয়েছ ?

না।

এসো আমার সঙ্গে চুমু খাবে। আমাদের কালচারকে দূরে ঠেলে রাখলে তো চলবে না। এসো তো দেখি। তবে নীল স্কার্ট পরা মেয়েটির থেকে দূরে থাকবে। আমি ঠিক করেছি ঐ মেয়েটিকে একটি জাম্বো সাইজের এ্যাকোয়া ফ্রেশ টুথপেস্ট উপহার দেব হা হা হা।

আনিসকে ড. বায়ারের সঙ্গে দোতলায় উঠে আসতে হলো। কিসিং বুথের নীল স্কার্ট পরা মেয়েটি নেই। অন্য মেয়েটির গলায় উজ্জ্বল রঙের একটি রুমাল। শঙ্খের

মতো সাদা মুখ। শান্ত নীল চোখ। আনিসের মনে হলো যেন মালিশা দাঁড়িয়ে আছে। অনেক দিন মালিশাকে দেখা হয় না। কিসিং বুথের মেয়েটি আনিসের দিকে তাকিয়ে হাসলো। হাসিটা পর্যন্ত মালিশার মতো। ড. বায়ার বললেন, দাঁড়িয়ে আছ কেন এগিয়ে যাও।

আনিস মন্ত্রমুগ্ধের মতো এগুলো। কাছাকাছি আসতেই চিনতে পারল মেয়েটিকে। তার ছাত্রী। কোর্স নাম্বার পাঁচশ' দু-তে আছে। মেয়েটি হাত বাড়িয়ে রিনরিনে কণ্ঠে বলল, হ্যালো ডক।

আনিস ঠিক করে ফেলল এক গাদা ফুল নিয়ে আজ সন্ধ্যাতেই আবার যাবে মালিশার খোঁজে। কী ফুল নেয়া যায় ? ডাউন টাউনে ফুলের দোকান কটা পর্যন্ত খোলা থাকে ?

১৭

নিশানাথ বাবু সাত সকালে টেলিফোন করেছেন, হ্যালো সফিক এক কাণ্ড হয়েছে। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ ?

পাচ্ছি। কী হয়েছে ?

কে যেন একটা গাড়ি কিনে পাঠিয়েছে। নীল রঙের একটা বুইক।

কে পাঠিয়েছে ?

কিছুই লেখা নাই।

পরিচিত যারা আছে তাঁদের জিজ্ঞেস করেছেন ?

পরিচিতরা আমাকে গাড়ি দেবে কেন ?

ভুলটুল হয় নাই তো ? অন্যের গাড়ি ভুলে হয়তো দিয়ে গেছে।

উঁহু। আমার নাম লেখা আছে।

বলেন কী ?

তুমি একবার আসবে সফিক ? আমি মহা চিন্তায় পড়েছি।

এক ঘণ্টার মধ্যে আসছি। জং বাহাদুরের কাণ্ডকারখানাও বলব।

নতুন কিছু করেছে নাকি ?

হ্যাঁ হ্যাঁ, না শুনলে আপনার বিশ্বাস হবে না। শালা বজ্জাতের হাড্ডি।

তাই নাকি ?

গতকালকে ফস করে আমার পকেট থেকে নোট বইটা নিয়ে গেছে। আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে এই রকম ভাব করছে যেন সে নোট বইটা খেয়ে ফেলবে। বুঝেন অবস্থা! বাসায় থাকবেন। আমি আসছি।

তুমি কি এক্ষুনি আসছো ?

একটু দেরি হবে। ল্যাবরেটরিতে গিয়ে ওদের সকালের খাবার দিয়েই আসব। বাসায় থাকবেন আপনি।

ভোর ন'টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে ড. লুইস সফিককে বললেন— জং বাহাদুরকে নিয়ে ল্যাবরেটরি ওয়ানে যেতে। খাঁচা খুলতেই শান্ত ভঙ্গিতে জং বেরিয়ে এলো। গুটিসুটি হয়ে বসে রইলো সফিকের কোলে। ড. লুইস হেসে বললেন, এটি দেখছি খুব শান্ত স্বভাবের। খাঁচা থেকে বের করলেই এরা খুব চিৎকার করে। ওদের একটা সিক্সথ সেন্স আছে— বুঝতে পারে কিছু একটা হবে।

ড. লুইস জং বাহাদুরের গায়ে দু'টি ইনজেকশন করলেন এবং সফিককে বললেন, একে এখন চব্বিশ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণে রাখতে হবে। তিন নম্বর খাঁচায় রেখে দাও।

সফিক দেখল জং বাহাদুর ঝিম মেরে গেছে, নড়াচড়া করছে না। খাঁচায় নামিয়ে রাখতেই সে শান্ত ভঙ্গিতে মাঝখানে গিয়ে বসে রইলো। সফিক বলল, এই ব্যাটা কী হয়েছে তোর ?

জং বাহাদুর দাঁত বের করল না। জিভ বের করে ভেংচে দিল না। শুধু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল।

ড. লুইস, কী দিয়েছেন ওকে ?

হেভি মেটাল পয়জনিং করা হয়েছে। রক্তের মধ্যে মারকারীর একটা সল্ট ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। ও মারা যাবে ছত্রিশ ঘণ্টার মধ্যে। আমরা মেটাল পয়জনিং-এর এফেক্ট লক্ষ করব। ব্লাড প্রেসার কী করে ফল করে সেটা মনিটার করা হবে।

সফিকের গা কাঁপতে লাগল। তিন নম্বর খাঁচার সামনে গিয়ে ভাঙা গলায় ডাকল, জং বাহাদুর, জং বাহাদুর।

জং বাহাদুর ঘাড় ঘুড়িয়ে থাকল। কী শান্ত দৃষ্টি।

দু'নম্বর খাঁচার সব ক'টি বানর ভীত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জং বাহাদুরের দিকে। ওরা কি কিছু বুঝতে পারছে ? ড. লুইস এসে দেখলেন পিপুল ডাইলেটেড হতে শুরু করেছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। লোহিত রক্ত কণিকা ফুসফুস থেকে আর রক্ত নিয়ে যেতে পারছে না।

সফিক ক্লান্ত স্বরে বলল, ড. লুইস বড্ড খারাপ লাগছে আমার।

সফিকের চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়তে লাগল। জং বাহাদুর তাকাচ্ছে সফিকের দিকে। সফিক মৃদু স্বরে বলল, 'লা ইলাহা ইল্লা আনতা সোবহানাকা ইন্নি কুন্তু মিনায যোয়ালেমিন।'

ড. লুইস অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন। সেন্টিমেন্টাল ইন্ডিয়ানস। সিলি সেন্টিমেন্টের জন্যেই ওদের কিছু হয় না। চাইনিজ পোস্ট ডকটিও চোখ বড় বড় করে

তাকিয়ে আছে সফিকের দিকে। সে অস্পষ্ট স্বরে চাইনিজ ভাষায় কী যেন বলল— নিশ্চয়ই কোনো ইস্টার্ন ফিলোসফি। রাবিশ, এসব সেন্টিমেন্টাল ইন্ডিয়ানদের নিয়ে মুশকিল। এরা বড় ঝামেলা করে।

সফিক জং বাহাদুরের খাঁচার শিক দু'হাতে ধরে মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে। জং বাহাদুর মনে হলো এগিয়ে আসছে তার দিকে। সফিক চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল।

১৮

মিস মালিশা আপনার কি রাতে ঘুম হয় নি?

নাহ্...

স্নায়ু উত্তেজিত হয়েছিল সে জন্যে এই হয়েছে। ডাক্তারে সঙ্গে কথা বলে কোনো একটা সিডেটিভের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন ছিল। ভুলটা আমার।

মালিশা চোখ তুলে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল এ্যাটর্নির দিকে। অল্প বয়েসী এই ছোড়াটাকে বেশ লাগছে তার। সে বলল, আমি তোমার নাম ভুলে গেছি। আই এ্যাম সরি।

আমার নাম ডেনিস বেয়ার। তুমি আমায় বিল ডাকতে পারো।

বিল, একটি বুইক গাড়ি পাঠাবার কথা বলেছিলাম।

পাঠানো হয়েছে।

কে পাঠিয়েছে কি কিছুই লেখা নেই তো?

না। কিন্তু মিস মালিশা কাউকে গিফট দেয়ার প্রধান আনন্দই তো হচ্ছে গিফট পেয়ে সে কেমন খুশি হলো তা জানা, ঠিক নয় কি?

মালিশা জবাব দিল না। ডেনিস বেয়ার মিটমিট করে হাসতে লাগল। মালিশা বলল, হাসছো কেন?

আজকের ন্যাশনাল ইনকোয়ারে তোমার ছবি ছাপা হয়েছে। তুমি বিখ্যাত হতে শুরু করেছ।

মালিশা ক্লান্ত স্বরে বলল, আমার শরীরটা ভালো লাগছে না। আজ আমি কোথাও যেতে চাই না।

মিস মালিশা ডিসট্রিক্ট এ্যাটর্নি অফিসে আজকে একবার যেতেই হবে। ঘণ্টা খানিকের বেশি লাগবে না। অনেস্ট।

মালিশা জবাব দিল না। ডেনিস বেয়ার একটি সিগারেট ধরিয়ে হাসি মুখে বলল, সেখান থেকে যাব চেস ম্যানহাটনে, কথা দিচ্ছি ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সব ঝামেলা চুকিয়ে ফেলব।

আজকে না গেলে হয় না?

না। আজকে যেতে হবে। ডলার একটি চমৎকার জিনিস। পৃথিবীর মধুরতম শব্দকটির একটি। কিন্তু শব্দটি মধুময় রাখার যন্ত্রণাও কম নয়।

প্রকাণ্ড একটি ফোরডোর শেভ্রোলেট গাড়ি হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ির পেছনের সিটে মধ্য বয়েসী একজন ভদ্রলোক একটি সামার কোট পড়ে বসে আছেন। ডেনিস বেয়ার মৃদু স্বরে বলল, ওর নাম জিম। তুমি যখনি বাইরে যাবে ও ছায়ার মতো থাকবে তোমার সঙ্গে। ও তোমার বডি গার্ড। খুব এফিসিয়েন্ট লোক।

মালিশা ক্লান্ত স্বরে বলল, আমার এসব দরকার ছিল না।

দরকার আছে।

গাড়িতে উঠেই মালিশা বলল, আমার কেন যেন ভালো লাগছে না, কিছুতেই মন বসছে না।

সন্ধ্যাবেলা অপেরা দেখতে চাও।

টিকিট পাওয়া যাবে ?

ডলার দিয়ে পৃথিবীর যে-কোনো জিনিস পাওয়া যায়।

তাই কি ?

হ্যাঁ। তুমি কী চাও বলবে আমি ব্যবস্থা করব। ডলারের মতো চমৎকার জিনিস কি পৃথিবীতে আছে ?

ডলারের মতো চমৎকার জিনিস পৃথিবীতে নেই, না ?

না।

মালিশার মনে হলো তার জ্বর আসছে। কিছুই ভালো লাগছে না। গায়ের সঙ্গে গা ঘেঁসে জিম বসে আছে। লোকটি মূর্তির মতো, সমস্ত রাস্তায় একবার শুধু বলল, চমৎকার ওয়েদার মিস মালিশা।

ডিসট্রিক্ট এ্যাটর্নি অফিসে দু'ঘণ্টার মতো লাগল। মালিশাকে তেমন কিছু করতে হলো না। শুধু চুপচাপ বসে থাকা। মাঝে মাঝে দু'একটা ফর্মে সই করা। এ্যাটর্নি জেনারেলের সঙ্গেও মিনিট দশেকের কথাবার্তা বলতে হলো। দু'ঘণ্টা বসেই মালিশার প্রচণ্ড মাথা ধরে গেল।

চেস ম্যানহাটনে যাবার পথে ডেনিস বেয়ার শান্ত স্বরে বলল, মিস মালিশা আমি বুঝতে পারছি আপনার খুব বিরক্তি লাগছে। কিন্তু উপায় নেই।

চেস ম্যানহাটনে আজ না গেলে হয় না ?

না। আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

মালিশা চুপ করে গেল। জিম বলল— চমৎকার ওয়েদার তাই না মিস্টার বেয়ার ? ডেনিস বেয়ার সে কথার জবাব না দিয়ে মালিশার দিকে তাকিয়ে শান্ত স্বরে বলল, আমার মনে হয়, আই বি এম এ তোমার যে শেয়ার আছে সেগুলি বিক্রি করে ফেলা

উচিত। আই বি এম ফল করতে শুরু করেছে। তুমি কি ওয়াল স্ট্রীট জার্নাল পড়ো?

না।

এখন থেকে নিয়মিত পড়বে। আমি একজন এ্যানালিস্টও ঠিক করে রেখেছি। সে সপ্তাহে একদিন এসে তোমাকে ওয়াল স্ট্রীটের ব্যাপারগুলো এক্সপ্লেইন করবে।

মালিশা শুকনো গলায় বলল, গাড়িটা একটু রাখতে বলো, আমার বমি আসছে।

গাড়ি থামাবার আগেই মুখভর্তি করে বমি করল মালিশা।

আই এ্যাম সরি।

সরি হবার কিছুই নেই।

এখন কি ভালো লাগছে?

নাহ্, বড্ড খারাপ লাগছে। প্লিজ আমাকে হোটেলে নিয়ে চলো।

১৯

ইন্টারস্টেটে আসামাত্র হাইওয়ে পেট্রল পুলিশ গাড়ি থামাল। ফার্গো মুরহেড এলাকায় তুষার ঝড় হবার সম্ভাবনা— প্রচুর বরফ পড়ছে। হাইওয়ে ক্লোজ করে দেয়া হয়েছে। টম নেমে এলো গাড়ি থেকে।

অফিসার, আমাকে যেতেই হবে। এই মেয়েটির বাবা মারা যাচ্ছে। এই সময় মেয়েটির তার বাবার কাছে থাকা দরকার।

রাস্তা অত্যন্ত খারাপ। অনেক গাড়ি স্কিড করে পথের পাশে পড়ে আছে।

আমি খুব কেয়ারফুল ড্রাইভার। বিশ মাইলের উপর স্পিড তুলব না, প্লিজ অফিসার, প্লিজ!

তুমি বুঝতে পারছো না দারুণ রিস্কি ব্যাপার।

অফিসার প্লিজ! এই মেয়েটিকে আমি যে করেই হোক তার বাবার কাছে নিয়ে যেতে চাই।

গাড়ি চলছে খুব ধীর গতিতে। টম সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ করে স্টিয়ারিং হুইলের উপর ঝুঁকে আছে। সে একসময় শান্ত স্বরে বলল, ভালোমতো কম্বল জড়িয়ে নাও রুন। হিটিং কাজ করছে না।

রুনকি পায়ের উপর কম্বল টেনে দিল। কোনো কথা বলল না। টম নিচু ভ্যলুমে একটি ক্যাসেট চালু করেছে। রাতেরবেলা গাড়ি চালাতে হলে ঘুম তাড়াবার জন্যে এটা করতে হয়। মিষ্টি সুরে পোলকা বাজছে। রুনকি জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। মাইলের পর মাইল ফাঁকা মাঠ। বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে সব। কী ভয়ঙ্কর সুন্দর!

২০

আনিস এসেছে একা একা।

তুষারপাত হচ্ছে। রাস্তা জনমানব শূন্য। থার্মোমিটারের পারা নিচে নামতে শুরু করেছে। স্ট্রিট লাইটের আলো অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কে জানে তুষার ঝড় হবে কি না। উত্তর দিক থেকে বাতাস দিচ্ছে। লক্ষণ মোটেই ভালো নয়। আনিস এমিলি জোহানের ঘরের কড়া নাড়ল।

এমিলি জোহান তুমি কি আমাকে চিনতে পারছো ? মেমোরিয়াল ইউনিয়নে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল।

হ্যাঁ, চিনতে পারছি। খুব কম মানুষের সঙ্গে আজকাল আমার দেখা হয়। আমি সবাইকে মনে রাখি।

আমি একটা মেয়ের খোঁজ করছিলাম। মালিশা গিলবার্ট। ওকে আমার বিশেষ প্রয়োজন।

এমিলি জোহান শান্ত স্বরে বলল, তুমি কি ওর জন্যে গোলাপ ফুল এনেছিলে ? ল্যান্ড লেডি আমাকে বলেছিল।

আনিস জবাব দিল না। এমিলি জোহান থেমে থেমে বললেন, আমরা আমেরিকানরা খুব অদ্ভুত জাত। যখন কোনোকিছু চাই মনপ্রাণ দিয়ে চাই। যখন সেই জিনিসটা পাওয়া যায় তখন জীবন অর্থহীন হয়ে যায়।

আনিস কিছু বুঝতে পারল না। এমিলি জোহান থেমে থেমে বললেন, মালিশা গিলবার্ট ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমিয়েছে। দীর্ঘ বিরতিহীন ঘুম। আনিস, তুমি কি আমার ঘরে এসে বসবে ? নক্ষত্র নিয়ে আমি একটি চমৎকার কবিতা লিখেছি।

আনিস বেরিয়ে আসলো। বরফে বরফে চারদিক ঢাকা পড়ে গেছে। একটি পরাজিত শহর।

তুষার ঝড় হবে। নিশ্চয়ই তুষার ঝড় হবে।

আনিস পায়ে হেঁটে বাড়ির পথ ধরলো। ভূতে পাওয়া শহরে জনশূন্য পথ ঘাট। কী অদ্ভুত লাগে হাঁটতে। ব্রডওয়ের কাছে ছাতা মাথায় একটি রোগা মেয়েকে দেখা গেল। সিগারেটের আলোয় তার ক্লান্ত মুখ চোখে ভাসলো ক্ষণিকের জন্যে। মেয়েটি ক্ষীণস্বরে বলল, হ্যালো মিস্টার, কী নেস্টি ওয়েদার!

আনিস জবাব দিল না। মেয়েটি থেমে থেমে বলল, আজ রাতের জন্যে তোমার কোনো ডেট লাগবে ?

নাহ্, ধন্যবাদ।

মেয়েটি এগিয়ে এলো তবু। মুখের সিগারেট দূরে ছুড়ে ফেলে সরু গলায় বলল, তুমি কি আমার জন্যে এক মগ বিয়ার কিনবে ? কী দুঃসহ শীত!

একদিন এই দুঃসহ শীত শেষ হবে। আসবে রোদ উজ্জ্বল সামার। ছুটি কাটানোর জন্যে আমেরিকানরা গাড়ি নিয়ে নেমে আসবে হাইওয়েতে। মন্টানা, সল্ট লেক, ইয়েলো স্টোন পার্ক। কত কিছু আছে দেখবার। সামারের রাতগুলো এরা বনের ধারে তাঁবু খাটিয়ে কাটাবে। প্রচণ্ড জ্যোৎস্না হবে রাতে। যুবক-যুবতীদের বড্ড বনে যেতে ইচ্ছা করবে।

তোমাকে

নীলু বয়সে আমার চেয়ে এগারো মিনিটের বড়। তার জন্মের ঠিক এগারো মিনিট পর আমার জন্ম হয় এবং দারুণ একটা হৈচৈ শুরু হয়। ডাক্তার শমসের আলি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, আরে যমজ বাচ্চা দেখি। ঠিক তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। আমরা দুই বোন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকি। ডাক্তার শমসের আলি হারিকেনের জন্যে চেঁচাতে থাকেন। আমার নানিজান ছুটে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে পানির একটা গামলা উল্টে ফেলেন।

আমার জন্মের সময় চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল বলে বাবা আমার নাম রাখেন রাত্রি। নীলু জন্মের পর পর খুব কাঁদছিল, তাই তার নাম কান্না। এইসব কাব্যিক নাম অবশ্যি টিকল না। একজন হলো নীলু। তার সাথে মিল রেখে আমি হলাম বিলু। তার চার বছর পর আমাদের তিন নম্বর বোনটি হলো। মিল দিয়ে নাম রাখলে শুধু মেয়েই হতে থাকবে, এই জন্যে তার নাম হলো সেতারা। নীলু, বিলু এবং সেতারা।

বাবার রাখা নাম না টিকলেও বাবা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। সুযোগ পেলেই চেঁচিয়ে ডাকতেন, কোথায় আমার বড় বেটি কান্না ? কোথায় আমার মেজো বেটি রাত্রি ? জন্মদিনে বই উপহার দেবার সময় বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় গোটা গোটা হরফে লিখতেন, 'মামণি রাত্রিকে ভালোবাসার সহিত দিলাম' কিংবা 'মামণি কান্নাকে পরম আদরের সহিত দেওয়া হইল।'

বইয়ের সঙ্গে সব সময় একটা করে তার স্বরচিত কবিতা থাকত। সেই কবিতা তিনি তাঁর প্রেস থেকে ছাপিয়ে ফ্রেম করে বাঁধিয়ে আনতেন। আট বছরের জন্মদিনে আমি এবং নীলু যে কবিতাটি পেলাম, সেটা শুরু হয়েছে এভাবে—

'সাতটি বছর গেল পর পর
আজকে পড়েছ আটে
তব জন্মদিন নয়ত মলিন
ভয়াল বিশ্বহাটে।

যমজ বোন বলেই আমরা দুজন সব সময় একই কবিতা পেতাম। শুধু কবিতা নয়, গল্পের বইও একই হতো। দুজনের জন্যে দুটি 'শিশু ভোলানাথ' কিংবা দুটি 'ঠাকুরমার ঝুলি।'

আমরা দুজন যে দেখতে অবিকল এক রকম— এ নিয়ে বাবার মধ্যে একটা গোপন গর্ব এবং অহঙ্কার ছিল। নতুন কেউ এলেই হাসিমুখে বলতেন— এরা যমজ।

একজনের নাম রাত্রি, একজনের নাম কান্না। যার চুল ছোট ছোট ও হচ্ছে কান্না। মা বড় বিরক্ত হতেন। ভুরু কুঁচকে বলতেন— যমজ মেয়ে নিয়ে এত ঢোল পিটানোর কী আছে ? যমজ-ফমজ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না, ছিঃ!

আমাদের দুজনকে যাতে দেখতে এক রকম না দেখায় এ জন্যে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। আমার চুল কেটে ছোট ছোট করে দিলেন। একজনের গায়ের রং যেন অন্যজনের চেয়ে আলাদা হয় সে জন্যে নীলুকে সপ্তাহে তিনদিন কাঁচা হলুদ দিয়ে গোসল করাতে লাগলেন। কিছুতেই কিছু হলো না। আমরা যতই বড় হতে থাকলাম আমাদের চেহারার মিল ততই বাড়তে লাগল। নীলু যেমন লম্বা আমিও তেমন লম্বা। তার চিবুকের নিচে যে রকম একটি লাল রঙের তিল, আমারও অবিকল সে রকম তিল। তার যেমন শ্যামলা গায়ের রঙ আমারও তাই। মা পর্যন্ত ভুল করতে লাগলেন। যেমন একদিন বারান্দায় বসে তেঁতুলের খোসা ছড়াচ্ছি, মা ঝড়ের মতো এসে প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন।

এক খিলি পান দিতে বললাম কতক্ষণ আগে ?

আমি শান্ত স্বরে বললাম, আমাকে বলোনি। বোধহয় নীলুকে বলেছ। আমি বিলু।

আমার ছোট চুল যখন লম্বা হলো, তখন দেখা গেল বাবা এবং মা ছাড়া আমাদের কেউ আলাদা করতে পারে না। কেন পারে না সে-ও এক রহস্য। নীলুর সঙ্গে আমার বেশ কিছু অমিল আছে। যেমন নীলুর নাক একটুখানি চাপা। ওর চোখ দুটি একটুখানি উপরের দিকে ওঠান। তবুও দোতলার নজমুল চাচা আমাদের দু'বোনকে যখনি দেখেন, তখনি বলেন, কে কোন্ জন ? কে কোন্ জন ? নীলু তাতে খুব মজা পায়। আমার অবশ্যি রাগ লাগে। এইসব আবার কী ঢং ? নজমুল চাচা সব সময়ই ঢং করেন। মা নজমুল চাচাকে সহ্যই করতে পারেন না। নজমুল চাচার গলা শুনলেই মুখ কুঁচকে বলেন, ভাঁড় কোথাকার। সব সময় ভাঁড়ামি।

আমাদের নিয়ে সবচে' বেশি ভাঁড়ামি করেন অবশ্যি আমার বড় মামা। দিনাজপুর থেকে বেড়াতে এলেই মহা উৎসাহে আমাদের দুজনকে সামনে বসিয়ে উঁচু গলায় বলেন, দেখা যাক আমি নীলু-বিলুকে আলাদা করতে পারি কি-না। ওয়ান টু থ্রী— হুঁ এই জন হচ্ছে আমাদের বিলুমণি। বড় মামা ভাঁড়ামি করলে মা রাগ করতেন না, বরং একটু যেন খুশিই হতেন। সবচে' খুশি হতো নীলু। সে হেসে কুটিকুটি। নীলুর নাম কান্না না হয়ে ভালোই হয়েছে। সে হাসতেই জানে, কাঁদতে জানে না। আমরা যখন ক্লাস সেভেনে উঠলাম নীলু আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল তার হাসি নিয়ে। যা-ই দেখে তাতেই তার হাসি পায়। মা হয়তো কিছু নিয়ে ধমক দিয়েছেন। সে মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করবার চেষ্টা করছে। মা কঠিন স্বরে বলছেন, হাসছো কেন তুমি ?

কই, হাসছি না তো।

মুখ ফেরাও। তাকাও আমার দিকে।

নীলু মুখ ফেরালে আমরা দেখতাম হাসি থামাবার চেষ্টায় তার গাল লালচে হয়ে উঠছে।

কেন তুমি শুধু শুধু হাসছো ? হাসির কী হয়েছে বলো তুমি, তোমাকে বলতে হবে।

আর হাসব না মা। এখন থেকে শুধু কাঁদব।

বলেই সে আবার ফিক করে হেসে ফেলল। মা প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন।

বাঁদর কোথাকার। তোমার হাসি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি দেখো।

নীলুর চোখে জল আসছে কি না দেখতে চেষ্টা করতেন। কোথায় কী! নীলু এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন কিছু হয়নি। মা ক্লান্ত হয়ে বলতেন, ঠিক আছে যাও আমার সামনে থেকে।

নীলু এমনভাবে ছুটে যেত যেন আড়ালে গিয়ে হেসে বুক হালকা করবে। নীলুটা এমন হয়েছে কেন ? এ বাড়িতে সবাই একটু গম্ভীর। সেতারা যার বয়স মাত্র পাঁচ, সে পর্যন্ত কম কথা বলে। নীলু কার কাছ থেকে এত কথা বলা শিখল ? কার কাছ থেকে অকারণে হাসার এই অদ্ভুত অসুখ জোগাড় করল ?

আমার এবং নীলুর খাট দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটায়। নীলু ঘুমায় সেতারাকে সঙ্গে নিয়ে। তার একা একা ভয় করে। আকবরের মা ঘুমায় বারান্দায়। আমরা ডাকাডাকি করলে তার উঠে আসার কথা। সে একবার ঘুমালে নিশ্চিন্ত। সারা রাতে এক সেকেন্ডের জন্যেও জাগবে না। এমনিতে অবশ্যি বলবে, ভইন, আমার সজাগ ঘুম। ইটু শব্দ হইলেই চউখ খোলা। আকবরের মা কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারে না। প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। অনেকবার তাকে বিদায় দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, লাভ হয়নি কিছু। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বলেছে, যাইতাম না। দেহি কেমনে বিদায় দেয়। তামশা না ? এই বুড়ো বয়সে যাইতাম কই ?

আকবরের মা রাতে ভাতটাত খেয়ে ঘুমাতে এসে জিজ্ঞেস করে, কইগো মাইয়ারা, ভূতের কিচ্ছা হুনতে চাও ? নীলু ভীতু সে শুনবে না, কিন্তু যেহেতু আমি শুনি কাজেই তাকেও শুনতে হয়।

আকবরের বাপের গপটা কই। শইলের মইধ্যের লোম খাড়া হইয়া যায়, বুঝছনি মাইয়ারা। শীতের সময়। খুব জার। আকবরের বাপের মাছ মারতে যাওনের কথা। আমারে কইল তামুক দে...

নীলু গল্পের মাঝখানে জিজ্ঞেস করে, তুই করে বলত ?

তা ঠিক। গরিব মাইনষের কথাবার্তা তুই-তুকারি দিয়া।

আকবরের মা'র ভাষা ঠিক বোঝা না গেলেও গল্প ধরতে কোনো অসুবিধে হয় না। সব গল্পের শেষে আকবরের বাবা। যার সাহসের কোনো সীমা নেই, একটা ভূতের গলা জাপ্টে ধরে কুমড়ো গড়াগড়ি করবে। এবং সব শেষে ভূতটা জঙ্গল ভেঙে ছুটে যাবে। যাবার সময় বলবে, এইবার ছাইরা দিলাম। বুঝছস ? জানে বাঁচলি।

গল্প শেষ হলেই নীলু বলবে, ধুর, ভূত আবার আছে নাকি ?

আকবরের মা চোখ কপালে তুলে বলবে, এইটা কেমুন বেকুবের মতো কথা কইলা ? দেশটা ভর্তি ভূত আর পেত্নীতে। আমার সাথে একবার যাইও আমরার নীলগঞ্জের বাড়িত। নিজের চউক্ষে ভূত দেখবা।

আকবরের মা শুধু যে আমাদের ভূতের গল্প শোনাবার চেষ্টা করে তাই না মাকেও শোনাতে চেষ্টা করে। সুযোগ পেলেই একটা গল্প টেনে আনতে চায়, বুঝছেন আম্মা, একবার হইল কী । মা এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন। আজেবাজে গল্প মা একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। শুধু আকবরের মা নয়, বাবাকেও এমনিভাবে থামান হয়, যা বলতে চাও সরাসরি বলতে পারো না ? এত ফেনাও কেন ?

ফেনাই নাকি ?

হ্যাঁ, ফেনাও। বেশি রকম ফেনাও। যা বলার তা সহজভাবে বলতে পারা উচিত।

ও।

রাগ করলে নাকি আবার ?

না। আমি এত সহজে রাগ করি না।

বাবার এই কথাটি খুব সত্যি। বাবা রাগ করতে পারেন না। নীলুর ধারণা বাবা মোটা বলেই রাগ করতে জানেন না। মোটা মানুষদের এই একটা বড় অসুবিধে। কথাটা হয়তো সত্যি। আমাদের স্কুলের মোটা আপাগুলিকে কিছুতেই রাগান যায় না। আর চিকনা আপাগুলি কারণ ছাড়াই চিড়বিড় করছে। আমাদের মা নিজেও রোগা বলেই বোধহয় তাঁর রাগ বেশি। তিনি রাগেন না শুধু আমাদের প্রেসের ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে। তাঁর নাম প্রণব বসু। এঁর অনেক রকম গুণ আছে। চমৎকার গান গাইতে পারেন। এবং চমৎকার গল্প করতে পারেন। তারচে' বড় কথা, চমৎকার রসিকতা করতে পারেন। এবং রসিকতাগুলি করেন গম্ভীর মুখে।

যেমন একদিন নীলুকে বললেন, এই নীলু কাল কী হয়েছে জানিস ?

না তো, কী হয়েছে ?

উচ্চাঙ্গসঙ্গীতের যে ওস্তাদ আছেন মুনসি মীর আলী, তিনি কাল জিলা স্কুলের মাঠে রাগ জয়-জয়ন্তি গেয়ে দুটি মেডেল পেয়েছেন। একটা বড় মেডেল। একটা

ছোট মেডেল। ছোটটা পেয়েছেন গান গাওয়ার জন্যে আর বড়টা গান থামানোর জন্যে।

প্রণব বাবুকে আমরা ডাকি ম্যানেজার কাকু। মা ডাকেন ম্যানেজার। বাবা ডাকেন 'বোস'। ভালো কিছু রান্নাটান্না হলে বাবা বলবে, দেখি বোসকে একটা খবর দাও তো। খাওয়াদাওয়ার পর একটু গান-বাজনা হবে।

ম্যানেজার কাকু অবশ্যি সহজে গান-বাজনা করেন না। তবে যদি ধরে-বেঁধে একবার বসান যায়, তখন গান চলে গভীর রাত পর্যন্ত। আমরা অবশ্যি এত রাত পর্যন্ত থাকতে পারি না। ধমক দিয়ে মা আমাদের নিচে পাঠিয়ে দেন। তবে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা জেগে থেকে গান শুনি। আমার নিজের গান শেখার খুবই শখ। মাকে বেশ কয়েকবার বলাতে মা ম্যানেজার কাকুকে বললেন, ওদের একটু গান শেখান না।

ম্যানেজার কাকু গম্ভীর গলায় বললেন, বৌদি ওদের বয়স কম।

কম বয়স থেকেই তো শুনেছি গান-বাজনা শুরু করতে হয়।

উঁহু, সঙ্গীতের জন্যে মমতা ছাড়া কিছু হয় না। সেই মমতাটা অল্প বয়সে হয় না। আপনি যদি শিখতে চান শেখাতে পারি।

রক্ষা করো, এই বয়সে আর আঁ আঁ করতে পারব না।

ম্যানেজার কাকুকে একমাত্র নীলু ছাড়া আমরা সবাই বেশ পছন্দ করি। নীলু যদিও ম্যানেজার কাকুর রসিকতায় সবচে' উঁচু গলায় হাসে কিন্তু আড়ালে বলে, আমার ম্যানেজার কাকুকে ভালো লাগে না।

কেন, ভালো না লাগার কী আছে?

আছে একটা-কিছু। আমি জানি না কী।

নীলু মাঝে মাঝে এলোমেলো কথাবার্তা বলে এবং সেগুলি সত্যি হয়ে যায়। সেতারা যেদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে, সেদিন সকালবেলাতেই নীলু বলেছে, আমি রাতে স্বপ্ন দেখেছি সেতারা খাট থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে। ম্যানেজার কাকু প্রসঙ্গে নীলুর আশঙ্কাও সত্যি হয়ে গেল।

আমরা স্কুলে গিয়েছি। থার্ড পিরিয়ডে জিওগ্রাফি আপা এসে বললেন, নীলু-বিলু তোমরা দুজন বাসায় যাও তো, তোমাদের নিতে এসেছে। আমরা অবাক হয়ে বাসায় এসে দেখি আকবরের মা সেতারাকে ঘুম পাড়াচ্ছে, বাসায় মা-বাবা কেউ নেই। দোতলার নজমুল চাচা শুধু বসার ঘরে মুখ কালো করে বসে আছেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। মা নাকি ম্যানেজার কাকুর সঙ্গে কোথায় চলে গেছেন। আর আসবেন না— এ রকম একটা চিঠি লিখে গেছেন।

বাবা ফিরলেন রাত এগারোটায়। আমরা জেগে বসে আছি। অনেক লোকজন এসেছে। কেউ যাচ্ছে না। সবাই গম্ভীর মুখে বসে আছেন বসবার ঘরে। বাবা ঘরে

ঢুকে এমন ভাব করলেন যেন কিছুই হয়নি। হাসিমুখে বললেন, রেণু ঝগড়া করে সকালের ট্রেনে দিনাজপুর তার বাবার বাড়ি চলে গেছে। আমি ছিলাম না। ভাগ্যিস প্রণব বাবু বুদ্ধি করে সঙ্গে গেছেন। নয়তো একা একা মেয়েছেলে এতদূর যাবে, দেখেন না অবস্থাটা। এই মেয়েজাতটার মতো রাগ আর কারোর নেই। হা হা হা। এদের নিয়েও চলে না। না নিয়েও চলে না।

লোকজন সব বারোটার মধ্যে চলে গেল। আমরা নিজেদের ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিলাম। বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন।

মামণিরা ঘুমাচ্ছ?

আমরা কেউ জবাব দিলাম না। বাবা মৃদু স্বরে বললেন, আজ রাতে তোমরা আমার সঙ্গে ঘুমাবে মামণিরা।

নীলু শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সে সময় আমার এবং নীলুর বয়স বারো, সেতারার সাত।

মা চলে গিয়েছেন এবং আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না— এটা আমরা খুব সহজেই বুঝে ফেললাম। শুধু সেতারা বুঝতে চাইল না। সে এম্নিতেই কম কথা বলে। এখন কথাবার্তা পুরোপুরিই বন্ধ করে দিল। দিনরাত সে শুধু মাকে খুঁজত। মা'র শোবার ঘরের সামনে কতবার যে গিয়ে দাঁড়াত। ডাকাডাকি না কিছু না, শুধু দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা। আমি একদিন দেখতে পেয়ে ডাকলাম, এই সেতারা।

উঁ।

এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছিস কেন?

সেতারা মাথাটা অনেকখানি নিচু করে ফেলল যেন খুব-একটা অপরাধ করেছে।

কী করছিস তুই?

কিছু না।

আয় আমার সাথে নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করব, আসবি?

না।

আমি লক্ষ করি, সে একা একা ঘুরে বেড়াতে চায়। কারো সঙ্গে থাকতে চায় না। সন্ধ্যাবেলা কেউ কিছু বলার আগেই সে 'আমার সাথী' বই নিয়ে বসে একমনে নিচু স্বরে পড়তে থাকে—

কমলা ফুলি কমলা ফুলি
কমলালেবুর ফুল

কমলা ফুলির বিয়ে হবে
কানে মোতির দুল।

যখনি সে পড়তে বসে এই একটি কবিতাই সে পড়ে। তখন যদি বাড়ির সামনে কোনো রিকশা এসে থামে, সে পড়া বন্ধ করে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। একসময় বই বন্ধ করে অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। নিঃশব্দে চলে যায় বারান্দায়। আবার ফিরে এসে পড়তে বসে— কমলা ফুলি, কমলা ফুলি কমলালেবুর ফুল...।

একদিন নীলু বলল, সেতারা মা আমাদের কাউকে পছন্দ করেন না তো তাই চলে গেছেন। আর আসবেন না।

আচ্ছা।

যে আমাদের ভালোবাসে না, আমরাও তাকে ভালোবাসি না, ঠিক না?

হুঁ।

তুই আর মাকে খুঁজবি না— আচ্ছা?

সেতারা মৃদু স্বরে বলল, আমাদের পছন্দ করে না কেন?

আমরা সবাই তো মেয়ে এই জন্যে, ছেলে হলে পছন্দ হতো। আমাদের তো কোনো ভাই নেই। বুঝেছিস?

হুঁ।

সেতারা মায়ের আদর পায়নি বললেই হয়। তার জন্মের পর পর মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেতারা বড় হতে থাকে আকবরের মা'র কোলে। মা'র অসুখ যখন সারল তখনো অবস্থার পরিবর্তন হলো না। মা মাঝে মাঝেই বিরক্ত স্বরে বলতে লাগলেন, ঘরভর্তি হয়ে যাচ্ছে মেয়ে দিয়ে, ভালো লাগে না। সেতারা যখন হাঁটতে শিখল, টুকটুক করে হাঁটত। মায়ের ঘরে গিয়ে দাঁড়াত সুযোগ পেলেই। মা গম্ভীর গলায় ডাকতেন, আকবরের মা ওকে নিয়ে যাও তো, এক্ষুনি ঘর নোংরা করবে। তার দু'বছর বয়স হতেই মা ওকে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের ঘরে। রাতে ঘুমাবে নীলুর সঙ্গে। দুধ খাবার জন্যে কাঁদলে আকবরের মা উঠে দুধ বানিয়ে দেবে। সেতারা তখন কোনো ঝামেলা করেনি। এখনো করে না। নীলুর গলা জড়িয়ে ঘুমায়। নীলু বলে, গল্প শুনবি?

বলো।

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার দুই রাণি দুয়ো ও সুয়ো...

এই পর্যন্ত আসতেই সেতারার চোখ বুজে আসে। কোনোদিন আর সে গল্প শেষ পর্যন্ত শোনা হয় না।

ইদানীং বাবা সেতারাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমাতে চান। সেতারাও বেশ ভালো মানুষের মতো যায়। কিন্তু মাঝরাতে একা একা চলে আসে আমাদের ঘরে। রোজ

এই কাণ্ড। একরাতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল, সেতারা সবাইকে ডাকতে লাগল, মা এসেছে রিকশা নিয়ে। আমরা ধড়মড় করে উঠে বসলাম, কোথায় ?

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম।

বলিস কী ?

হৈচৈ শুনে বাবা উঠে এলেন। কোথায় কী, খা-খা করছে চারদিক! সেতারা দারুণ অবাক হলো। বাবা বললেন, স্বপ্ন দেখেছ মা।

উঁহু স্বপ্ন না। আমি দেখলাম।

সেতারা চোখ বড় বড় করে সবার দিকে তাকাতে লাগল। সে ব্যাপারটা কিছুতেই বুঝতে পারছে না। বাবা সেতারাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। সে রাতে আমি এবং নীলু এক খাটে ঘুমাতে গেলাম। এবং অনেক রাত পর্যন্ত দুজনেই নিঃশব্দে কাঁদলাম। অথচ দুজনই এমন ভাব করতে লাগলাম যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

ধীরে ধীরে অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটল বাড়িতে। বাবা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি পরিবর্তনগুলি করলেন খুব সাবধানে। একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি মা'র আলনায় কোনো কাপড় নেই। সব বাবা কোথায় সরিয়ে ফেলেছেন। তার দিন সাতেক পর বারান্দায় মা'র যে বড় বাঁধাই করা ছবিটি ছিল সেটিকে আর দেখা গেল না। বাবা-মা'র শোবার ঘরে তাদের বেশ কয়েকটি ছবি ছিল, সেগুলিও সরান হলো।

আমাদের ঘরে মা-বাবা এবং আমাদের তিনজনের যে ছবিটি ছিল সেটি শুধু বাবা সরালেন না। রান্নাবান্না করবার জন্যে রমজান নামের একজন বুড়ো মানুষ রাখা হলো। এই লোকটি এসেই প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু করল আকবরের মা'র সঙ্গে। দুজনেরই কী ঝাঁঝাল কথাবার্তা। কিন্তু রমজান লোকটি ভালো। সে সেতারাকে কোলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ভাত খাওয়াত। আমাদের উপর তার খবরদারিরও সীমা ছিল না।

এই সইন্ধ্যা রাইতে বাগানো ঘুরাঘুরি করণ ঠিক না।

অত তেঁতুল খাওন বালা না, বুদ্ধি নষ্ট হয়।

ভাত খাওনের আগে বিসমিল্লাহ কইরা এট্টু লবণ মুখের মইধ্যে দেওন দরকার।

রাতেরবেলা খাওয়া-দাওয়া শেষ হলে সে গম্ভীর হয়ে একটা খবরের কাগজ নিয়ে আমাদের পড়ার ঘরে গিয়ে বসত। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে এমন সব কথাবার্তা বলত যে, নীলু হেসে উঠত খিলখিল করে।

হুঁ, খুব সংকটময় অবস্থা। বুঝছো নীলু আপা, অবস্থা সংকটময়।

কেন ?

নেপালে পাহাড়ি ঢল। হুঁ।

এই অবস্থায় ঝগড়া লেগে যেত আকবরের মা'র সঙ্গে। আকবরের মা কোমরে দুই হাত দিয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে এসে দাঁড়াত।

বিদ্যার জাহাজ যে বইছেন পাকঘরের বাসনডি কেডা ধুইব ?

চুপ থাকো। অশিক্ষিত মূর্খ মেয়ে মানুষ, এদের নিয়া চলাফেরা মুশকিল।

রমজান ছাড়াও একজন ভয়ঙ্কর রোগা দাঁত নেই ওস্তাদ রাখা হলো। এই ওস্তাদটির নাম মুনশি সোভাহান। তিনি আমাদের তিন বোনকে সপ্তাহে তিনদিন গান শেখাবেন। আমরা তিনজনেই গান শিখতে শুরু করলাম। সকালবেলা হারমোনিয়াম নিয়ে বসে 'সারেগা রেগামা গামাপা'। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। ওস্তাদ সোভাহান বেশিক্ষণ গান শেখাতে পারেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হাঁপানির টান ওঠে। গান থামিয়ে বলেন, ঘরে কোনো টিফিন আছে কিনা দেখোতো খুকি। না থাকলে একটা মুরগির ডিম ভেজে দিতে বলো। হাঁসের ডিম না। হাঁসের ডিম গন্ধ করে, খেতে পারি না।

গানের উপর থেকে আমার মন উঠে গিয়েছিল, কাজেই আমাকে দিয়ে গান হলো না। সেতারা এবং নীলু শিখতে লাগল। কিছুদিন পর নীলুও কেটে পড়ল। রইল শুধু সেতারা। মাস ছয়েকের মধ্যে দেখা গেল বেণি দুলিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সেতারা গাইছে, নবীর দুলালী মেয়ে খেলে মদিনায়। ও ও ও খেলে মদিনায়।

ওস্তাদ সোভাহান ঘাড়-টাড় দুলিয়ে বলেছেন, মারহাবা মারহাবা কী টনটনে গলা। এইবার লক্ষ্মী ময়না গিয়ে দেখো তো কোনো টিফিন আছে কি-না। না থাকলে মধুর দোকান থেকে যেন একটা আমৃত্তি নিয়ে আসে। আর চা দিতে বলো।

সে বছর শীতের সময় মা আমাদের তিনবোনকে সিরাজগঞ্জ থেকে আলাদা আলাদা চিঠি লিখলেন। বাবা একদিন সন্ধ্যায় পাংশুমুখে তিনটি খামে বন্ধ চিঠি নিয়ে আমাদের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। কাঁপা গলায় বললেন, তোমাদের মা চিঠি লিখেছেন। তোমরা কি সেই চিঠি পড়তে চাও ?

বাবার গলা কাঁপছিল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম বাবা চাচ্ছেন আমরা বলি, না। বাবা কপালের ঘাম মুছে নিচু স্বরে বললেন, আমরা সবাই তাকে ভুলতে চেষ্টা করছি। এখন আবার চিঠিপত্র শুরু করলে কষ্ট হবে। নতুন করে কষ্ট হবে।

বাবা থামতেই সেতারা বলল, আমার চিঠি দাও। খানিকক্ষণ চুপ থেকে নীলুও বলল, আমার চিঠিটাও দাও। শুধু আমি কিছু বললাম না। বাবা ধরা গলায় বললেন, মামণি রাত্রি, তোমারটা।

আমি চাই না।

কী লেখা ছিল নীলু এবং সেতারার চিঠিতে আমি জানি না। নীলু সমস্ত কথাই আমাকে বলে। শুধু চিঠির ব্যাপারে কিছু বলল না। আর সেতারা তো তার খামই খুলল না। বন্ধ খাম হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আমি বললাম, খুলে দেব ?

না।

না খুললে পড়বি কী করে ?

আমি পরে পড়ব।

যেন পড়লেই চিঠির মজা শেষ হয়ে যাবে। আমি সমস্ত দিন ভাবলাম কী লিখেছেন মা চিঠিতে ? ক্লাসে আপারা কী পড়ালেন কিছুই বুঝতে পারলাম না। অংক আপা দু'বার ধমক দিলেন, এই বিলু তোমার পড়ায় আজকে মন নেই, কী ব্যাপার ?

কিছু না আপা।

আমি কী বলছি তুমি তো কিছুই শুনছো না।

শুনছি আপা।

না শুনছো না। বলো তো আমি কী বলছিলাম ?

আমি বলতে পারলাম না। সব মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার ক্লাসের মেয়েরা বিচিত্র কারণে আমাকে অপছন্দ করে। সব সময় আমার পেছনে লেগে থাকে। আমাদের বাথরুমের দেয়ালে আমাকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা লেখা। একটা নেংটা মেয়ে এবং ছেলের ছবিও আঁকা আছে। মেয়েটার গায়ে লেখা বিলু ক্লাস নাইন খ শাখা। অথচ কোথাও নীলুর নামে কিছু লেখা নেই। আমি কখনো বাথরুমে যাই না। যদি যেতেই হয়, তাহলে অনেকক্ষণ সেখানে বসে কাঁদি। ইরেজার দিয়ে লেখাগুলি তুলে ফেলতে চেষ্টা করি— কিছুতেই সেগুলি ওঠান যায় না।

বিলু মন দিয়ে পড়াশুনা করবে, বুঝলে। এরকম করলে তো হবে না।

ক্লাসের মেয়েগুলি আবার হৈচৈ করে হেসে উঠল। বাড়িতে ফিরে এসে অনেকক্ষণ একা বসে রইলাম। রাতে রমজান ভাইকে বলে দিলাম, খিদে নেই কিছু খাব না। অনেক রাতে ঘুমাতে গিয়ে দেখি আমার বালিশের নিচে মায়ের পাঠানো খামটা রেখে দেয়া। নিশ্চয়ই বাবার কাণ্ড।

ঘরে কেউ নেই। নীলু এখনো পড়ছে। সেতারা রান্নাঘরে রমজান ভাইয়ের সঙ্গে কী যেন করছে। আমি দরজা বন্ধ করে খাম খুলে ফেললাম। মা আমাকে বিলু নামে সম্বোধন করেননি, প্রথমবারের মতো লিখেছেন— রাত্রি।

মামণি রাত্রি,

জানি প্রচণ্ড রাগ করেছো তুমি। কিন্তু কী করবো মা।

> উপায় ছিল না। তুমি যখন বড় হবে, তখন বুঝবে। মানুষের মন খুব বিচিত্র জিনিস। একবার কোনো কিছুতে মন বসে গেলে তা ফেরানো যায় না। আমি বহু চেষ্টা করেছি। মানুষ হয়ে জন্মানোর মতো কষ্টের কিছু নেই। আমি তোমাদের ছেড়েছুড়ে এসেছি তবু রাতদিন তোমাদের কথাই ভাবি। রাতদিন প্রার্থনা করি যে কষ্ট আমি পাচ্ছি তা যেন কখনো আমার মামণিদের না হয়।
>
> তোমার মা

থার্ড পিরিয়ডে অংক আপা ক্লাসে ঢুকেই বললেন, বিলু ক্লাস শেষে আজ তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে।

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। অংক আপা আজেবাজে প্রশ্ন করেন। কয়েকদিন আগে হাফ টাইমের সময় অংক আপার সঙ্গে দেখা। আপা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমার মা শুনলাম ঐ লোকটার সঙ্গে ইন্ডিয়া চলে গেছে, সত্যি নাকি ?

না, সত্যি না।

কোথায় আছে তাহলে ?

আমি চুপ করে রইলাম।

আপা গলা নিচু করে বললেন, বলতে পারো না, না ?

সিরাজগঞ্জে আছেন।

ও, বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে নাকি ?

আমি জানি না আপা।

আমাকে কে যেন বলল একটা ছেলে হয়েছে।

আমার নিজের ধারণা মেয়েদের মতো হৃদয়হীন পুরুষরা হতে পারে না। ছেলেরা কেউ এখনো আমাকে আমার মা প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। অথচ চেনাজানা মেয়েদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে কিছু জানতে চায়নি।

ক্লাসের বন্ধুদের কথা বাদই দিই, বন্ধুদের মা-খালাদের পর্যন্ত কৌতূহলের সীমা নেই। কোনো না কোনোভাবে টেনেটুনে ঐ প্রসঙ্গ আনবেই।

বিলু, তোমরা আগে কিছু টের পাওনি ? আগেই তো টের পাওয়া উচিত।

তোমার মা নাকি যাবার আগে বহু টাকা-পয়সা নিয়ে গেছে ?

মা গিয়েছেন প্রায় দু'বছর আগে। এখনো কেউ সেটা ভুলতে পারে না কেন কে জানে ?

অংক ক্লাসটা আমার খুব খারাপভাবে কাটল। ক্লাস শেষ হওয়া মাত্র গেলাম আপার কাছে। আপার নিজের কোনো ঘর নেই। কমন রুমে একগাদা টিচারের সঙ্গে বসে আছেন। তিনি আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, তোমাদের বাড়িতে বয়স্ক মহিলা কেউ নেই ?

কাজের একটি মেয়ে আছে। আকবরের মা।

সে ছাড়া কেউ নেই ?

জি না আপা। কেন ?

তোমরা তো বড় হচ্ছ এখন, কিছু কিছু জিনিস তোমাদের বলা দরকার, কেউ বলছে না তাই তোমাকে ডাকালাম।

আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আপা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, বিলু তোমার এবং নীলুর দুজনেরই এখন ব্রা পরা উচিত।

আমি চোখমুখ লাল করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

তোমার বাবাকে বলবে কিনে দিতে। বাবাকে বলার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। আর যদি লজ্জা লাগে তাকে আমি একটা চিঠি লিখে দিতে পারি।

দিন, একটা চিঠি লিখে দিন।

ঠিক আছে, ক্লাস ছুটির পর চিঠি নিয়ে যেও। আরেকটি কথা, নীলু মোটেই পড়াশোনা করে না। তোমার বাবাকে বলবে কোনো প্রাইভেট টিচার রেখে দিতে। অংকে সে খুব কাঁচা। অংক জানে না বললেই হয়।

আপা আমি বলব।

ঠিক আছে তুমি যাও এখন। এইসব বললাম দেখে কিছু মনে করোনি তো ?

জি না।

মনে হচ্ছে তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। রাগ করার কিছু নেই বিলু। তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি। এত ঝামেলার মধ্যেও যে মেয়ে প্রতি বিষয়ে সবচে' বেশি নম্বর পায়, তার প্রশংসা তো করতেই হয়।

অংক আপা একটু হাসলেন।

বিলু ?

জি।

কখনো কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবে।

ঠিক আছে আপা, বলব।

শোনো আরেকটা কথা। ইয়ে কী যেন বলে তোমার বাবা নাকি আবার বিয়ে করছেন ?

জি না।

তুমি বোধহয় জানো না। বাবার বিয়ের কথা তো মেয়েদের জানার কথা নয়।

বাবার বিয়ের কথা কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। দিনাজপুর থেকে বড় মামা এসেছিলেন। তিনি পর্যন্ত নীলুকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, দুলাভাই নাকি বিয়ে করছেন ? নীলু তার স্বভাবমতো হেসে ভেঙে পড়েছে।

হাসছিস কেন ?

হাসির কথা বললে হাসব না মামা ?

আমি কি হাসির কথা বললাম নাকি ? বিয়ে করলে তোদের অবস্থাটা কী হবে ভেবেছিস ?

কী আর হবে ? আমার তো মনে হয় ভালোই হবে। কথা বলার একজন লোক পাওয়া যাবে।

কথা বলার লোকের তোর অভাব ?

হ্যাঁ মামা। বিলুর সঙ্গে কি আর সব কথা বলা যায় ? মা জাতীয় একজন কেউ লাগে। বাবা বিয়ে করলে ভালো হয় মামা।

করছেন নাকি ?

জানি না মামা। তবে দোতলার নজমুল চাচা একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা এখন একটা বিয়ে করলে মনে হয় সংসার স্বাভাবিক হয়।

তুই কী বললি ?

আমি বললাম, তা তো ঠিকই।

মামা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। নীলু বলল, তারপর একদিন এক বুড়োমতো ভদ্রলোক এসে বাড়িটারি ঘুরেটুরে দেখলেন। মার সঙ্গে বাবার সম্পর্ক কী রকম ছিল জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করলেন।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ মামা, বিয়ে বোধহয় লেগে যাচ্ছে।

নীলু খিলখিল করে উঠল। আমি নিজেও অবাক হলাম। এসব কিছুই আমি জানি না। নীলু আজকাল অনেক কথাই আমাকে বলে না। প্রায়ই সে তার বান্ধবীর বাড়ি যাচ্ছে। হঠাৎ করে তার সঙ্গে এত খাতির হলো কেন— জিজ্ঞেস করাতে সে গা এলিয়ে হেসেছে। এ বাড়ির সবাই বদলে যাচ্ছে। বাবা বদলেছেন সবচে' বেশি। আমাদের জন্মদিন গেল জুন মাসের দশ তারিখ। বাবা কোনো কবিতা লিখলেন না। কয়েকদিন আগে দেখলাম সেতারাকে কী জন্যে যেন ধমকাচ্ছেন। সেতারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বাবার এরকম আচরণ তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। বাড়িও ফিরছেন আজকাল অনেক রাতে। গতকাল বাড়ি ফিরলেন সাড়ে এগারোটার দিকে। আমি জেগে বসে ছিলাম। বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে

আছ কেন ? আর থাকবে না। দশটা বাজতেই ঘুমাতে যাবে।

আমি শান্ত স্বরে বললাম, তুমি আমার সঙ্গে এত রেগে রেগে কথা বলছো কেন ?

রেগে রেগে কথা বলছি নাকি ?

আমি উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। বাবা খাওয়া-দাওয়ার পর আমার ঘরের পাশে জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, এই বিলু, বিলু। আমি ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। বাবা বেশ খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন।

বাবা এরকম ছিলেন না, বাবা বদলে যাচ্ছেন। নীলু তো বদলেই গেছে। আমি নিজেও বোধহয় বদলাচ্ছি। একা একা থাকতে ইচ্ছে করে। সেদিন খুব ঝগড়া করলাম নীলুর সঙ্গে। আমি মাঝে মাঝে অচেনা সব মানুষদের মন গড়া চিঠি লিখি, নীলু সেটা জানে। তবু সে একটা চিঠি হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, প্রেমপত্র নাকিরে ? তারপর মুখ বাঁকা করে পড়তে শুরু করল— আপনাকে একটি কথা বলা হয়নি। এখন শ্রাবণ মাস তো, তাই খুব বৃষ্টি হচ্ছে। রাতদিন ঝমঝম বৃষ্টি। নীলু বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, শ্রাবণ মাস কোথায় রে, এটা তো আশ্বিন মাস। তোর মাথাটাই খারাপ। হি-হি-হি। আমি চিঠি কেড়ে নিয়ে নীলুর গালে একটা চড় কষিয়ে দিলাম। নীলু দারুণ অবাক হয়ে গেল। আমি এরকম ছিলাম না।

বাবা বিয়ে করলে সংসার স্বাভাবিক হলে তো ভালোই হয়। নীলু ঠিকই বলেছে, সব বাড়িতে মা জাতীয় একজন কেউ দরকার। সে সময়মতো মেয়েদের ব্রা কিনে দেবে।

কিন্তু আমার বড় মামা সেদিকটা দেখছেন না। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু-একটা হতে যাচ্ছে। মামা বললেন, খোঁজখবর না রাখায় এটা হচ্ছে। নানান ধান্ধায় থাকি।

খোঁজখবর নেই তা ঠিক। মামার বাড়ির সঙ্গে এখন সম্পর্ক নেই বললেই হয়। মামারা অনেকদিন ধরে আসেন না। আগে ঘনঘন আসতেন এবং যতবার আসতেন ততবারই জিদ করতেন আমাদের দিনাজপুরে নেবার জন্যে। বাবা ব্যবসাপাতির ঝামেলা তুলে এড়িয়ে যেতেন। মা স্পষ্ট বলতেন, তোমাদের বৌদের সঙ্গে আমার বনে না। বাবা-মা মারা গেলে বাপের বাড়ি থাকে না। সেখানে যাওয়াও যায় না।

বাবা আবার বিয়ে করবেন কি-না এই প্রসঙ্গে বড় মামার এরকম কৌতূহলের কারণ কী আমি ধরতে পারি না। মামাদের সঙ্গে আমার বাবার তেমন আন্তরিকতা নেই। এইসব নিয়েও মার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হতো। মা বলতেন, আমার ভাইদের তুমি সহ্য করতে পারো না, এর কারণ কী আমাকে বলো তো ?

সহ্য করতে না পারার কী আছে ?

কথা বলো না, চুপচাপ থাকো।

একেকজনের একেক রকম স্বভাব। আমার স্বভাবই হচ্ছে কথা কম বলা।

দোতলার নজমুল হুদা সাহেবের সঙ্গে তো খুব বকবক করো।

আমি বকবক করি না। উনি করেন আমি শুনি।

আমার ভাইদের সঙ্গে তো তাও করো না।

ওনার বকবকানি শোনা যায়। তোমার ভাইদেরটা শোনা যায় না।

ও— তাই বুঝি?

বাবা চুপ। মা কাটা কাটা গলায় বললেন, বেশ তো আমি ওদের বলব যেন আর না আসে।

মামাদের আসা বন্ধ হয়নি। আমার ধারণা বাবার কাছ থেকে তাঁরা টাকা-পয়সা নিতেন। আমার সব মামারাই ব্যবসা করতেন। টাকার দরকার তাদের লেগেই থাকত। এটা অবশ্যি আমাদের অনুমান। কারণ মামারা হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেই মা গম্ভীর মুখে বলতেন, দরকার ছাড়া তো তোমাদের আসা হয় না, আবার দরকার হয়েছে বুঝি? মামারা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতেন।

এবারো যখন এলেন সম্ভবত টাকার জন্যেই এলেন। বাবার ব্যবসাপাতির অবস্থা সম্পর্কে খুব ব্যস্ত হয়ে খোঁজখবর শুরু করলেন। আমার ঘরে ঢুকে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, দুলাভাইয়ের ব্যবসা কেমন চলছে রে?

ভালোই বোধহয়। আমি তো এইসব ঠিক জানি না।

না জানলে হবে কেন? খোঁজখবর রাখতে হয়। দুলাভাইয়ের ছেলে নেই। তোদেরই তো খোঁজ করতে হবে। ঠিক না?

আমি চুপ করে থাকি। বড় মামা সিগারেট ধরান একটা। নিচু গলায় বললেন, মনে হয় দুলাভাইয়ের ব্যবসা ভালোই হচ্ছে। তোদের গান-বাজনা শেখাচ্ছেন, এসব তো দারুণ খরচান্ত ব্যাপার। হাতি পোষার মতো, লাভ হয় না কিছু।

লাভ হবে না কেন?

আরে ধুর, দুই-একদিন সারেগামা করলেই যদি গান হতো তাহলে কি আর কথা ছিল নাকি?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। বড় মামা হঠাৎ করে বললেন, তোদের এখন শাড়ি পরা উচিত, বুঝলি? তোর আর নীলুর। বড় হয়ে গেছিস।

কথাটা এমন অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলা যে আমি হকচকিয়ে গেলাম। বড় হয়ে যাচ্ছি। বড় হওয়াটা খুব-একটা কি বাজে ব্যাপার?

রাস্তাঘাটে একা একা চলাফেরা করবি না। ঐদিন দেখলাম সন্ধ্যার পর নীলু বাড়ি আসল।

বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। জন্মদিন।

জন্মদিন-ফন্মদিন যাই হোক একা একা যেন না যায়। সুন্দরী মেয়েদের অনেক রকম যন্ত্রণা।

আমরা সুন্দরী বুঝি ?

হুঁ, ইয়ে সুন্দরী তো বটেই। আয়না দিয়ে নিজেদের দেখিস না ?

আমি হঠাৎ বলে বসলাম, কে বেশি সুন্দর মামা ? আমি না নীলু ?

মামা জবাব দিলেন না। তাঁকে চিন্তিত মনে হতে লাগল।

ক্লাস নাইনের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষাতে নীলু অংক এবং ইংরেজিতে পাস করতে পারল না। অংকে পেল তেইশ আর ইংরেজিতে একত্রিশ। তাকে খুব বিচলিত মনে হলো না। হাসিমুখে বলল, ধুর— আমি আর পড়াশুনা করব না।

করবি না তো কী করবি ?

বিয়ে করব।

বিয়ে করবি মানে ? কাকে বিয়ে করবি ?

বিয়ে করার লোকের অভাব আছে নাকি ? আমি হ্যাঁ বললে এক্ষুনি দু'তিনটা ছেলে চলে আসবে।

তাই নাকি ?

হুঁ, তুই কী ভাবিস আমাকে ?

আমি প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম, বাবা পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে রাগ করবেন।

রাগ করবার কী আছে ? সবাই একরকম হয় ? কেউ ভালো করে, কেউ করে না।

বাবা রাগ করলেন না। প্রগ্রেস রিপোর্টটা দেখলেন অবাক হয়ে।

এরকম হয়েছে কেন নীলু ?

পড়াশুনা করতে আমার ভালো লাগে না বাবা।

আগে তো লাগত।

আগেও লাগত না। জোর করে পড়তাম।

ভালো না লাগলেও অনেক কিছু করতে হয় নীলু। তোমাদের জন্যে একজন টিচার রেখে দিলে কেমন হয় ?

নীলু কথা বলে না। বাবা বললেন, তোমার কী মনে হয় বিলু মা ?

ভালোই হবে।

নীলু হালকা স্বরে বলল, এখন থেকে আমি একা একটা ঘরে থাকতে চাই বাবা। পশ্চিমের ঐ ঘরটা পরিষ্কার করে দিলেই হবে। আমি রমজান ভাইকে বলব।

একা থাকার দরকার কী ? তোমার তো আবার ভূতের ভয়।

এখন আমার ভূতের ভয় নেই বাবা।

আমার মনে হয় না এটা ভালো হবে।

ভালোই হবে বাবা।

ঠিক আছে। সেতারা কার সঙ্গে থাকবে?

তোমার সঙ্গে কিংবা বিলুর সঙ্গে।

নীলু উঠে চলে গেল। বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, তোর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে?

জি না।

স্কুলে আপারা বকাঝকা করেছে বোধহয়। জানিস কিছু?

জি না?

নীলু সারা দুপুর জিনিসপত্র সরিয়ে পশ্চিমের ঘরটা গোছাল। আমি কয়েকবার বললাম, এই— রাত্রিবেলা ভয় পাবি। নীলু কোনো উত্তর দিল না। বিকেলের মধ্যে দেখলাম ঘর তৈরি হয়ে গেছে। একটা খাট। পড়ার টেবিল। আলনা। মায়ের ড্রেসিং টেবিল দিয়ে চমৎকার সাজিয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে এক ফাঁকে আমাদের ঘর থেকে মায়ের ছবিটাও নিয়ে গেছে।

সেতারা পড়েছে খুব মুশকিলে। সে রাতে কার সঙ্গে ঘুমোবে বুঝতে পারছে না। আমাকে সে ঠিক পছন্দ করে না। বাবার সঙ্গেও থাকতে চায় না। কিন্তু নীলু বলে দিয়েছে সে একা একা ঘুমোবে। আমি সেতারাকে বললাম, ওর যা ভূতের ভয়, দেখবি রাত আটটা বাজলেই এই ঘরে চলে আসবে কিংবা তোকে নিয়ে যাবে।

সেতারা খুব-একটা ভরসা পাচ্ছে না। সে মুখ কালো করে দুপুর থেকেই আমার পেছনে ঘুরছে।

ছুটির দিন বিকালে সাধারণত নজমুল চাচা আমাদের সঙ্গে এসে চা খান। আজ তিনি খবর পাঠালেন তাঁর ঘরে গিয়ে যেন আজকের চাটা খাওয়া হয়। তিনি মুক্তাগাছার মন্ডা আনিয়েছেন। নীলু বলল, ধুর— আমি যাব না।

যাবি না কেন?

আমার মাথা ধরেছে।

দুটো এসপিরিন খা।

বললাম তো ভালো লাগছে না।

নীলু তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

নজমুল চাচার শরীর ভালো ছিল না। চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ছিলেন। নজমুল চাচা সাধারণত চা খেতে খেতে মজার মজার গল্পগুজব করেন। আজ সে সব কিছুই হলো না। নজমুল চাচা বিরসমুখে বললেন, তোর বাবার একটা বিয়ের কথা হচ্ছে। মেয়েটির হ্যাসবেন্ড মারা গেছে একাত্তরের যুদ্ধে। একটি ছেলে আছে। ন'বছর বয়স। ছেলেটা তার নানার কাছে থাকে।

আমি কিছু বললাম না। নজমুল চাচা বললেন, মেয়েটা খুব ভালো। আমি চিনি। প্রাইমারি স্কুলের টিচার। একদিন নিয়ে আসব এখানে। তোরা কথাবার্তা বলিস।

জি আচ্ছা।

সৎ মায়ের অত্যাচার-টত্যাচার সম্পর্কে যা শোনা যায় সে সব ঠিক না। তাছাড়া তোরা তো যথেষ্ট বড় হয়েছিস। এত বড় বড় মেয়েরা তো সাধারণত বন্ধুর মতো হয়। ঠিক না?

জানি না, হয়তো হয়।

তোর বাবার অবস্থাটা দেখতে হবে না? রাত-বিরাতে বাড়ি ফেরার বাজে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।

আমি চুপচাপ বসে রইলাম।

নীলু আসে নি যে?

ওর নাকি মাথা ধরেছে।

ও নাকি পরীক্ষায় খুব খারাপ করেছে?

জি।

সংসারে বিশৃঙ্খলা আসার জন্যে এটা হয়েছে। বুঝতে পারছিস তো?

চাচা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রমজান ভাই এসে বলল, ইউনিভার্সিটির একজন মাস্টার নাকি নিচে বসে আছে।

চাচা অবাক হয়ে বললেন, কিসের মাস্টার? মাস্টার এখানে কী জন্যে? বিলু তুই উপরে আমার কাছে পাঠিয়ে দে তো।

বসার ঘরে গম্ভীর চেহারার একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। বয়স খুব বেশি নয় কিন্তু অন্যরকমের একটি ভারিক্কি ভাব আছে। ভদ্রলোক আমাকে দেখেই বললেন, একটু দেরি করে ফেললাম, না?

আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

আমি আগেই আসতাম। ভাবলাম জন্মদিনে খালি হাতে আসা ঠিক না। কিন্তু তোমাদের এখানে তো কিছু পাওয়া যায় না। আমি ঘণ্টাখানিক ঘোরাঘুরি করেছি। কবিতার বই পাওয়া যায়। কবিতা তো তুমি পড়ো না, নাকি পড়ো?

আমি অবাক হয়ে বললাম, আপনি বোধহয় নীলুর কাছে এসেছেন। আমি ওর ছোট বোন বিলু। আমরা যমজ বোন। ভদ্রলোক দীর্ঘ সময় স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

নীলু আমাকে বলে নি তার যমজ বোন আছে। লোকজন কি সব চলে গেছে নাকি?

কিসের লোকজন ?

আজ নীলুর জন্মদিন না ?

না তো।

ও আমাকে বলেছিল আসতে। সম্ভবত ঠাট্টা। আমি বুঝতে পারিনি। আমি ঠাট্টা বুঝতে পারি না।

ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমা খুলে কাচ মুছতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনি বসুন, আমি নীলুকে ডেকে নিয়ে আসি।

তোমাদের চেহারায় অদ্ভুত মিল। যমজ বোনদের মধ্যেও কিছু ডিফারেন্স থাকে। একজন মোটা হয় অন্যজন রোগা, কিন্তু...

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন।

আপনি বসুন, আমি এক্ষুনি ডেকে আনছি।

নীলুকে ভদ্রলোকের কথা বলতেই সে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

এইসব কী রে নীলু ? ভদ্রলোক কে ?

মুন্নিকে তো চিনিস ? মুন্নির দূর-সম্পর্কের ভাই।

তাঁকে আসতে বলেছিলি ?

হুঁ।

কেন ?

এমনি বলেছি।

আয় তাহলে। কী যে কাণ্ড।

আমি যেতে পারব না। আমার মাথা ধরেছে।

নীলুর মাথা ধরেছে এবং গায়ে বেশ জ্বর শুনে ভদ্রলোক অল্প হাসলেন।

আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই। ওর জন্যে দুটো বই এনেছিলাম— দিয়ে দিও।

আপনি বসুন, চা খেয়ে যান।

তোমার বাবা আছেন ?

জি না। উনি রাত করে ফেরেন।

তোমার বাবা যখন থাকবেন তখন একদিন আসব।

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, আমি আসব এটা বোধহয় নীলু ভাবেনি। এসে পড়েছি দেখে হকচকিয়ে গেছে।

আপনি বসুন না, চা খেয়ে যান। উপরে নজমুল হুদা চাচা আছেন, তাঁর কাছেও বসতে পারেন।

না না, ঠিক আছে।

আমি ভদ্রলোককে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, বেশ একটা অস্বস্তিকর অবস্থা হয়ে গেল তাই না ? আমার প্রবলেম হচ্ছে আমি ঠাট্টা-তামাশা ঠিক ধরতে পারি না। মনে হয় আমার বুদ্ধিসুদ্ধি নিচু স্তরের।

বলেই ভদ্রলোক উঁচু গলায় হেসে উঠলেন। একজন ভারিক্কি ধরনের গম্ভীর চেহারার ভদ্রলোক এমন ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠবেন আমি কল্পনাও করি নি।

নীলু বলল সে রাতে খাবে না।

কেন খাবি না রে ?

বললাম না জ্বর।

রমজান ভাই কাউকে না খাইয়ে ছাড়ে না। সে ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল, রাইতে ভাত না খাইলে এক চড়ুইয়ের রক্ত পানি হয়।

নীলু শব্দ করল না। তার ঘরের দরজাও খুলল না। সেতারার মনে ক্ষীণ আশা ছিল হয়তো শেষ পর্যন্ত তাকে ডেকে নেবে। সেসব কিছুই হলো না। রাত ন'টা বাজতেই নীলু তার ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল।

খুব বৃষ্টি হলো সে রাতে— ঝমঝম করে বৃষ্টি। আকবরের মা বলল, আশ্বিন মাসে বিষ্টি, লক্ষণ খুব বালা।

আমি অনেক রাত পর্যন্ত বাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাবাকে কি সব খুলে বলা উচিত ? বাবা খুব দেরি করতে লাগলেন। ঝড়বৃষ্টিতে এদিকে সব ভাসিয়ে নিচ্ছে।

বাবা ফিরলেন গভীর রাতে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রমজান ভাই আমাকে ডেকে তুলে ফিসফিস করে বলল, ছোট আফা, লক্ষণ বেশি বালা না!

কেন কী হয়েছে ?

মদ খাইয়া আইছে।

সমস্ত রাত আমার ঘুম হলো না।

সেতারা এক কাণ্ড করেছে। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে। দুটি পত্রিকার (দৈনিক বাংলা, অবজার্ভার) প্রথম পাতায় তার ছবি ছাপা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাত থেকে শিশুসংগীত সম্মেলনের গ শাখায় স্বর্ণপদক নিচ্ছে।

অথচ বাবা সেতারাকে ঢাকায় যেতেই দিতে চাননি। গানের স্যারের কত ধরাধরি, কত সুপারিশ। বাবার এক কথা, না, এইসবের দরকার নেই।

শেষ পর্যন্ত নজমুল চাচা যখন সঙ্গে যেতে রাজি হলেন তখনই শুধু গম্ভীর মুখে বাবা রাজি হলেন।

ঢাকায় গিয়ে সে যে এই কাণ্ড করেছে তাও আমরা জানি না। রমজান ভাই পত্রিকা পড়ে প্রথম জানল এবং এমন চেঁচামেচি শুরু করল—।

সেতারা যে ভেতরে ভেতরে এমন ওস্তাদ হয়ে উঠেছে তা আমরা বুঝতে পারি নি। সকালবেলা ঘুম ভেঙেই অবশ্যি শুনতাম—

'কোয়েলিয়া বলেরে মাই
অঙ্গন মোরে বারে বারে
পিয়া পরদেশ গাও কিনু
সদারঙ্গ পিয়ারাবা। তোমাবিনা নয়নানা দরশন বারে বারে।'

একই জিনিস সকালে একবার বিকেলে একবার। মাথা ধরে যাওয়ার মতো অবস্থা। বাবা পর্যন্ত গানের স্যারকে একদিন বললেন, ছয় সাত মাস ধরে একই জিনিস গাচ্ছে শুনতে খুবই বিরক্ত লাগে।

গানের স্যার একগাল হেসে বললেন, সময় হলে দেখবেন। হা হা হা। সময় হোক না।

ফিরে আসবার পর সেতারার একটা সংবর্ধনাও হলো। আমি সেতারাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। বাবা কোথাও যানটান না। নীলুও যাবে না।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এলন, আরে নীলু, এই মেয়ে তোমার বোন ? তুমি তো বলোনি তোমার এমন গুণী বোন আছে। আসো তুমি, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

একবার ভাবলাম বলি, আমি বিলু। কিন্তু কিছুই বললাম না।

আমি দিন দশেকের মধ্যে চলে যাব। ইউনিভার্সিটি খুলে যাচ্ছে।

ও।

পরশুদিন আসতে বলেছিলাম আসোনি তো ?

আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। একবার ভাবলাম যাই তোমাদের বাসায়।

আমি বিলু। নীলু আসেনি।

ভদ্রলোক চশমা খুলে কাচ পরিষ্কার করতে লাগলেন।

এত পরে বলছো কেন ? প্রথমে বললেই হতো।

ভদ্রলোক রাগী চোখে তাকালেন আমার দিকে। আমি এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। এবার পেছন ফিরে দেখলাম তিনি কেমন যেন খড়্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমার কেন জানি খুব কষ্ট হতে লাগল।

আমাকে কেউ তেমন পছন্দ করে না। কেন করে না আমি জানি না। নীলু অন্য

ঘরে চলে যাবার পর সেতারাও চলে গিয়েছে তার সঙ্গে। আকবরের মা আগে আমার ঘরের সামনে পাটি পেতে ঘুমাত, এখন ঘুমোচ্ছে ওদের ঘরের সামনে। নজমুল চাচা সব ঈদে আমাদের উপহার দেন। আমি লক্ষ করেছি নীলুর উপহারটা হয় অনেক সুন্দর, অনেক দামি।

ক্লাসের মেয়েরাও আমাকে পছন্দ করে না। টগরের বোনের বিয়েতে টগর ক্লাসের পাঁচটি মেয়ে ছাড়া সবাইকে দাওয়াত করল। আমি ঐ চার-পাঁচজন মেয়ের মধ্যে একজন। সবাই এরকম করে কেন আমার সঙ্গে ?

নীলু ইদানীং আমার সঙ্গে কথা বলা ছেড়েই দিয়েছে। নিজের থেকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তবেই জবাব। সেদিন দেখলাম খুব সাজগোজ করছে। আমি বললাম কোথায় যাচ্ছিস রে ?

যাচ্ছি এক জায়গায়।

কোথায় ? কোনো বন্ধু ?

নীলু চুপ করে রইল।

ঐ ভদ্রলোকের কাছে যাচ্ছিস বুঝি ?

গেলে কী হয় ?

প্রায়ই যাস নাকি ?

মাঝে মাঝে যাই।

এরকম যাওয়া ঠিক না। লোকজন খারাপ বলবে।

খারাপ বললে বলুক না। আমি কি পায়ে ধরে সাধছি— আমাকে খারাপ না বলার জন্যে।

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, ঐ ভদ্রলোকের নাম কী ?

রকিব ভাই, অংক পড়ায়। খুব শিগগির আমেরিকা চলে যাবে।

উনিই বলেছেন বুঝি ?

মুন্নি বলেছে। উনি মুন্নির খালাতো ভাই হন।

কোন মুন্নি ? কালো মুন্নি ?

হুঁ।

নীলু কপালে একটা টিপ পরে অনেকক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে আবার টিপটি তুলে ফেলল। হালকা গলায় বলল, মুন্নির ধারণা রকিব ভাই ওকে বিয়ে করবে।

করবে নাকি ?

কী জানি করতেও পারে। আমার কিছু যায় আসে না। করতে চাইলে করবে।

যায় আসে না, তাহলে যাস কেন ?

নীলু থেমে থেমে বলল, আমি ওদের বাড়ি গেলেই মুন্নি রাগ করে। দারুণ রাগ করে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। আমার খুব মজা লাগে। সেই জন্যে যাই।

ছিঃ, নীলু এইসব কী ?

শুধু মুন্নি না, ওর মাও রাগ করেন। সেদিন কী বলছিলেন শুনবি ?

কী বলছিলেন ?

বলছিলেন, মুন্নির সঙ্গে রকিব ভাইয়ের বিয়ের কথা সব পাকাপাকি হয়ে আছে, শ্রাবণ মাসে। বিয়ে ? ডাহা মিথ্যা। কোনো কথাই হয় নি।

তুই জানলি কী করে কোনো কথা হয়নি ?

আমি জিজ্ঞেস করলাম।

কাকে জিজ্ঞেস করলি ?

রকিব ভাইকে। আবার কাকে ?

খুব খারাপ হচ্ছে নীলু।

খারাপ হলে আমার হচ্ছে, তোর তো হচ্ছে না। তুই আমার সঙ্গে বকবক করিস না। যা ভাগ।

নীলু আজকাল স্কুলেও নিয়মিত যাচ্ছে না। সকালবেলা স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি-টৈরি হয়ে হঠাৎ বলবে, আজকে আর যাব না। পেটব্যথা করছে।

সেদিন সেলিনা আপা (আমাদের হেড মিসট্রেস) আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। রাগী গলায় বললেন, তুমি কি গত শুক্রবারে কালোমতো রোগা একটা ছেলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিলে ? বিউটি লন্ড্রির সামনে ?

কই, না তো আপা।

আমিও তাই ভাবছিলাম। ঐটা নীলু। আজেবাজে ছেলের সঙ্গে আজকাল খুব মিশছে মনে হয়। তোমার বাবাকে বলবে। ঐ সব লোফার টাইপের ছেলে। পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়, মেয়ে দেখলে শিস দেয়। বলবে তুমি তোমার বাবাকে।

জি বলব।

ঠিক আছে তোমার বলার দরকার নেই। তাঁকে বলবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।

জি আচ্ছা।

তাছাড়া ও তো রেগুলার ক্লাসেও আসে না। বাড়িতে শাসন না থাকলে যা হয়।

নীলু এসব শুনে গা দুলিয়ে হাসতে লাগল, ধুর— ঐ ছেলের সঙ্গে আমি ঘষাঘষি করব কেন ? আমাকে জিজ্ঞেস করল ক'টা বাজে। আমি বললাম। তারপর আমি বললাম— আপনার হাতে তো ঘড়ি আছে, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন ? সে

ব্যাটা একদম ঘাবড়ে গেল। আমতা আমতা করে বলল— আমার ঘড়ি নষ্ট। আমি বললাম— মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভালো লাগে, না? ছেলেটার যে কী অবস্থা। দূর থেকে অন্য বন্ধুগুলি তাকে দেখছে। হি-হি-হি। ঐ পাঁজিগুলি আগে আমাকে দেখলেই শিস দিত। এখন আর দেয় না।

আর কথা হয় নি ঐ ছেলের সাথে?

আর কথা হবে কেন?

সেলিনা আপা বাবার সঙ্গে কথা বলবেন।

বলুক।

বাবা খুব রাগ করবেন।

করলে করবে।

বাবা সত্যি সত্যি রাগ করলেন। বেশ রাগ। চিৎকার চেঁচামেচি। শুধু তাই না, এক পর্যায়ে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন। নজমুল চাচা ছুটে এলেন, ছিঃ ছিঃ এসব কী কাণ্ড! মেয়ে বড় হয়েছে না?

বাবা ঝাঁঝাল স্বরে বললেন, ওর স্কুল এখন বন্ধ। তুমি একটা ছেলে দেখো তো, ওর বিয়ে দিয়ে দেব।

আচ্ছা সেটা দেখা যাবে। বিয়ে দিতে চাইলে বিয়ে দেবে। বিলু মা, তুমি আমাদের দু'কাপ চা দাও তো। লেবু দিয়ে।

নীলু যেন কিছুই হয় নি ভঙ্গিতে বলল, আমাকেও এক কাপ চা দিস তো।

পরদিন নীলু স্কুলে গেল না। সন্ধ্যাবেলা বাবার সামনেই তার সমস্ত বই-খাতা বারান্দায় জমা করতে লাগল। বাবা ইজিচেয়ারে বসে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

কী করছিস নীলু?

বইপত্রগুলি সব ফেলে দিচ্ছি বাবা। পড়াশোনা তো আর করছি না। বই দিয়ে কী হবে?

পড়াশোনা করবি না আর?

না। তুমি নিষেধ করলে। তাছাড়া আমারও ভালো লাগে না।

কী করবি ঠিক করেছিস?

এখনো কিছু ঠিক করি নি।

বাবা আর কিছু বললেন না। রাতে ভাত খাবার সময় হঠাৎ অপ্রাসাঙ্গিকভাবে বললেন, রাগের মাথায় অনেক অনেকে কিছু বলে, সে সব মনের মধ্যে পুষে রাখা ঠিক না।

নীলু মুখ না তুলেই বলল, আমি মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখিনি।

আর কোনো কথাবার্তা হলো না।

সে রাতে বাবা বাইরে গেলেন না। গম্ভীর হয়ে সেতারার পড়া দেখিয়ে দিতে বসলেন। সেতারা ক্লাস সিক্সে উঠেছে। নতুন ক্লাসে উঠেছে বলেই পড়াশোনার খুব আগ্রহ। সে হাসি মুখে তার বইপত্র দেখাতে লাগল। বাবা একসময় আমার পড়াশোনারও খোঁজ নিলেন, পড়াশোনা ঠিকমতো হচ্ছে তো?

জি হচ্ছে।

প্রি-টেস্ট কবে?

এখনো দেরি আছে।

কোন কলেজে পড়বি কিছু ভেবেছিস? ঢাকায় যেতে চাস নাকি?

নাহ্।

ঢাকা না যাওয়াই ভালো, যা গোলমাল। এই স্ট্রাইক ওই স্ট্রাইক।

তা ঠিক।

নীলু আমাদের কাছেই কী-একটা গল্পের বই নিয়ে উবু হয়ে আছে, যেন কোনো কিছুই তার কানে যাচ্ছে না।

নীলু এত মন দিয়ে কী পড়ছিস?

ভূতের গল্প।

নাম কী?

ডাকবাংলা রহস্য।

খুব ভয়ের নাকি?

খুব না। কিছু ভয়ের।

বাবা হঠাৎ বললেন, তোরা সবাই মিলে মামার বাড়ি থেকে ঘুরে আয় না। একটা চেঞ্জ হবে। সেতারার তো বোধহয় মনেই নেই।

মনে আছে বাবা, পুকুর পাড়ে দুটো তাল গাছ আছে। সেই পুকুরের ঘাটে বসে থাকলে একরকম মাছ আসে। চোখগুলো বড় বড়। ঠিক না নীলু আপা?

হুঁ। চ্যালা মাছ।

বাবা আবার বললেন, কী রে যাবি নাকি তোরা? যাস যদি তোর মামাকে লিখি। এসে নিয়ে যাবে।

তুমি যাবে না?

নাহ্। আমার ব্যবসা-ট্যবসা খুব খারাপ। তোরা তো জানিস না। অবশ্যি আমি নিজেই বলি না কিছু। প্রেসটা আমি খুব সম্ভব বিক্রি করে দেব। বয়স হয়ে গেছে, এইসব ঝামেলা এখন আর ভালো লাগে না।

নীলু বাবার কথা শুনল, কিন্তু কিছু বলল না।

যাবি মামার বাড়ি ?

যাওয়া যায়।

আচ্ছা ঠিক আছে, লিখে দেব তোর মামাকে। পৌষ মাসের দিকে গেলে ধান কাটা দেখবি।

সে রাতে ঘুমোতে গেলাম দশটার দিকে। সেতারা তার বালিশ নিয়ে এসে হাজির। আপা, আজ তোমার সঙ্গে ঘুমাব।

আয়। হঠাৎ আমার সঙ্গে যে।

নীলু আপা বলেছে আজ সে একা একা ঘুমোতে চায়।

বাতি নেভাতে সেতারা ফিসফিস করে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপা, রাগ করবে না তো ?

না রাগ করব কেন ?

আগে গা ছুঁয়ে বলো রাগ করবে না।

রাগ করব না, বল।

সেতারা বেশ খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, মেয়েদের যখন শরীর খারাপ থাকে তখন কোনো ছেলেকে চুমু খেলে নাকি পেটে বাচ্চা হয় ?

বলেছে কে এসব ?

বলো না হয় কি না ?

না, হয় না। এইসব জিনিস নিয়ে না ভাবাই ভালো।

তাহলে বাচ্চা কীভাবে হয় ?

জানি না কীভাবে হয়, ঘুমা তো।

সেতারা ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। সেতারাও অনেকটা আমার মতো, এ বাড়িতে তার কথা বলার কেউ নেই। স্কুলে তেমন বন্ধুবান্ধব নেই। সেদিন দেখলাম টিফিনের সময় ওদের ক্লাসের সব মেয়ে মিলে চুলটানা বিবিয়ানা সাহেববাবুর বৈঠকখানা খেলা খেলছে। সেতারা দূরে দাঁড়িয়ে তৃষিত নয়নে দেখছে।

আমি সেতারার গায়ে হাত রাখতেই সেতারা বলল, মাকে কাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি আপা। খুব লম্বা লম্বা চুল।

আমি অবাক হয়ে বললাম, তুই ঘুমাসনি ?

উঁহু।

আয় দুজনে মিলে এক কাজ করি, নীলুকে ভয় দেখিয়ে আসি।

সেতারা উত্তেজনায় উঠে বসল। কীভাবে ভয় দেখাবে ? জানালার কাছে গিয়ে 'হুম' করবে।

তা করা যায়। যাবি ?

চল।

আমরা দরজা খুলে পা টিপে টিপে বাইরে এসে দেখি বাবা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। তার পাশে মোড়ায় গুটিশুটি মেরে নীলু বসে আছে। বাবা নীলুর মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। নীলু সম্ভবত কাঁদছে। বাবা আমাদের দেখে হালকা গলায় বললেন, কিরে সেতারা— বাথরুমে যাবি নাকি ?

না বাবা, আমরা নীলু আপাকে ভয় দেখাবার জন্যে এসেছি।

বাবা হেসে উঠলেন। দীর্ঘদিন পর বাবা এমন উঁচু গলায় হাসলেন।

নীলু চোখ মুছে বলল, আমাকে ভয় দেখান এত সস্তা না।

আমাদের বাড়িটির একটি নাম আছে 'উত্তর দিঘি'। বাড়ির কত সুন্দর সুন্দর নাম থাকে কিন্তু এ বাড়িটি দেখতে যেমন অদ্ভুত, নামটিও তেমনি। মায়ের খুব শখ ছিল শ্বেতপাথরের একটা নতুন নেম প্লেট লাগাবেন, 'মাধবী ভিলা' লেখা থাকবে সেখানে।

বাড়িটি কিনেছিলেন আমার দাদা। তিনি ধুরন্ধর প্রকৃতির লোক ছিলেন। দাঙ্গার সময় যখন ময়মনসিংহ শহরের বেশির ভাগ ধনী হিন্দু জলের দামে বাড়ি বিক্রি করে কোলকাতায় চলে গেল, আমার দাদা তখন 'উত্তর দিঘি' ও 'শ্রীকালি প্রেস' কিনে ফেললেন। টাকা যা দেয়ার কথা তার অর্ধেকও নাকি দেননি। এইসব আমার মায়ের কাছ থেকে শোনা। মা নাকি বিয়ের পর অনেকদিন দেখেছেন বাড়ির মালিক বাকি টাকার জন্যে এসে বসে আছে এবং দাদা নানান রকম টালবাহানা করছেন। তার কিছুদিন পর দাদা মারা যান। আমার ধারণা লোকটিকে টাকা-পয়সা না দেয়ার জন্যেই নিদারুণ যন্ত্রণায় দাদার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পেটে ক্যানসার হয়েছিল।

আমাদের 'উত্তর দিঘি' বাড়িটি প্রকাণ্ড। দোতলা বাড়ি। তবে ছাদে ওঠার কোনো সিঁড়ি নেই। মার খুব শখ ছিল ছাদে ওঠার সিঁড়ি করবেন। জোছনা রাতে ছাদে হাঁটাহাঁটি করা যাবে। হাঁটাহাঁটি করার জায়গার অভাব এ বাড়িতে নেই। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ি। কাঁঠাল, পেয়ারা, আম এবং তেঁতুল গাছ দিয়ে বাড়িটা ঘেরা। বাড়ির সামনে ফুলের গাছ আছে বেশ কয়েকটা এবং জায়গায় জায়গায় সিমেন্ট দিয়ে উঁচু বেদির মতো করে বাঁধান। সেখানে বসে খুব আরাম করে গল্পের বই পড়া যায়। আমার যখন কিছু ভালো লাগে না তখন আমি লাল বেদিগুলোর কোনো-একটিতে বসে থাকি। নীলুর মতে ওগুলো আমার গোসাঘর।

আজ আমার মন খুব ভালো ছিল। মন ভালো হওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। কিন্তু ভালো লাগছিল। তবু আমি গোসাঘরে এসে চুপচাপ বসে রইলাম। সেতারা দোতলার বারান্দায় বসে গলা সাধছিল। বেশ লাগছিল শুনতে। এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। নীলুর সেই রকিব ভাই হঠাৎ করেই যেন আমার সামনে এসে

উপস্থিত হলেন। এখানে আসতে হলে গেট খুলে অনেকখানি হাঁটতে হয়। কখন গেট খুললেন এবং কখনই বা এলেন।

ভালো আছ ?

আপনি ভালো আছেন ?

আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিলাম, তুমি পাথরের মূর্তির মতো বসে আছ। তোমার বাবা বাসায় আছেন ?

জি না। সন্ধ্যা নাগাদ আসবেন।

আমি তার সঙ্গে দেখা করব আজকে, কী বলো ?

ঠিক আছে।

আমি পরশুদিন সকালে ঢাকা চলে যাব। ভাবলাম যাবার আগে দেখা করে যাই। আর আসা হবে কি-না জানি না।

আর আসবেন না বুঝি ?

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন, তুমি কি আসতে বলো ?

আমি চুপ করে রইলাম।

কী, কথা বলছো না যে ?

আমি কিন্তু বিলু, আপনি আমাকে নীলু ভাবছিলেন।

ভদ্রলোক চশমা খুলে কাচ পরিষ্কার করতে লাগলেন।

নীলু কি বাসায় আছে ?

জি আছে। আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।

না ঠিক আছে ডাকতে হবে না।

ডাকতে হবে না কেন ? আপনি তো ওর সঙ্গেই কথা বলতে এসেছেন ?

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

ঠিক তা না। আমি নদীর ধার দিয়ে অনেকখানি হাঁটি। আজও তাই করছিলাম। হঠাৎ তোমাকে দেখলাম। ভাবলাম নীলু।

ও।

নীলু অনেকদিন মুন্নিদের বাড়িতে যায় না। মনে হয় ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তুমি জানো কিছু ?

জি না। ওর সঙ্গে আমার কথা বন্ধ।

ভদ্রলোক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, তোমরা যে বাচ্চা মেয়ে এটাও মনে থাকে না।

আমি বুঝি বাচ্চা মেয়ে ?

হুঁ। তোমরা আড়ি দাও এবং ভাব দাও। ঠিক না ?

আমি দেই না, নীলু দিতে পারে। আসুন, ভেতরে এসে বসুন। নজমুল চাচা আছেন, দোতলায় তাঁর ঘরেও বসতে পারেন।

নজমুল চাচা কে ?

আমাদের একজন ভাড়াটে। দোতলায় একটা ঘর নিয়ে থাকেন।

নীলু শোনো, আমি এখন আর ঘরে ঢুকব না।

আমি কিন্তু বিলু।

ও হ্যাঁ বিলু। তুমি এক কাজ করো, আমি নীলুর জন্যে একটা গল্পের বই এনেছিলাম, 'ঘনাদার গল্প', এটা ওকে দিয়ে দিও।

আমি অল্প হাসলাম। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, হাসছো কেন ?

আপনি একটু আগে বলেছিলেন নীলুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসেননি, এখন বলছেন বই নিয়ে এসেছেন তাই হাসছি।

ঠিক তখন দোতলার বারান্দা থেকে নজমুল চাচা ডাকলেন, এই— এই বিলু উনি কে ?

নজমুল চাচার গলা ভয় ধরান, যেন হঠাৎ ভূত দেখেছেন। অনেকক্ষণ থেকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন হয়তো।

পরিচয় করিয়ে দেবার পর নজমুল চাচা অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

আরে আপনি জমির আহমেদ সাহেবের ছেলে ? আপনাকে চিনব না বলেন কী ? আপনার বাবা ছিলেন কালিনারায়ণ স্কলার।

আমি বাবার মতো হইনি অবশ্যি।

আরে আপনিই কম কী। অংকের প্রফেসর। কী সর্বনাশ।

প্রফেসর না। লেকচারার।

আমার কাছে লেকচারারও যা প্রফেসরও তা। কী আশ্চর্য কাণ্ড বলেন দেখি। নীলুর সঙ্গে আলাপ হলো কীভাবে ?

ও আমাকে একটা অংক জিজ্ঞেস করেছিল, আমি করতে পারিনি।

বলেন কী! কী অংক ?

ও জিজ্ঞেস করল— পাঁচের সঙ্গে দুই যোগ করলে কখন ছয় হয় ?

কখন হয় ?

যখন ভুল হয় তখন হয়। অংকটা আসলে সহজ।

নজমুল চাচা ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, যা নীলুকে আসতে বল। বলবি প্রফেসর সাহেব এসেছেন। চা-টার ব্যবস্থা করতে হবে।

আমি ঘর থেকে বেরোবার সময় শুনলাম ভদ্রলোক বলছেন, আপনি কি বুঝতে পারেন কে বিলু কে নীলু ?

পারি। নীলুটা খুব হাত নেড়ে কথা বলে।

রকিব সাহেব দোতলায় বসে আছেন শুনে নীলু দারুণ অবাক হলো।

সে কী, আমি তো বলেছি এ বাড়িতে যেন কখনো না আসেন।

কী জন্যে বলেছিস ?

ধুর, ভাল্লাগে না।

ভাল্লাগে না কেন ?

এমনভাবে কথা বলে যেন আমি বাচ্চা মেয়ে।

যাবি না তাহলে ?

উঁহু।

নীলু যদিও বলল উঁহু কিন্তু আমি দেখলাম সে কামিজ বদলে শাড়ি পরছে।

শাড়ি পরছিস কেন ?

ইচ্ছা হয়েছে পরছি। তোকে জিজ্ঞেস করে কাপড় পরতে হবে ?

নীলু অনেক সময় নিয়ে মুখে পাউডার দিল। এবং একসময় চিরুনি হাতে এসে বলল, চুল বেঁধে দিবি ?

আমি চুল বেঁধে দিয়ে বললাম, আজ আর তোকে কেউ বাচ্চা মেয়ে বলবে না।

নীলু রাগী স্বরে বলল, তুই কি ভাবছিস আমি দোতলায় যাচ্ছি ? মোটেই না, আমি বাগানে হাঁটতে যাচ্ছি। সেতারার গলা সাধা শেষ হলেই যাব।

আমি দেখলাম নীলু সত্যি সত্যি সেতারাকে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছে। অপূর্ব লাগছে তাকে। আমার মনে হলো এমন রূপবর্তী মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি।

বড় মামার চিঠি এসেছে।

সুদীর্ঘ চিঠি। যার বক্তব্য হচ্ছে— এ সময় গ্রামের বাড়িতে নীলু-বিলুদের বেড়াতে আসা ঠিক হবে না। কী কারণে ঠিক হবে না তা স্পষ্ট করে বলা নেই। শুধু লেখা— গাঁয়ের লোকজন এদের দেখতে এসে নানান কথা বলবে, এটা ওদের ভালো লাগবে না। মনের উপর চাপ পড়বে। এইসব। আমার কাছে একটা ব্যাপার খুব অবাক লাগল। চিঠি শেষে পুনশ্চতে লেখা— যা হবার হইয়াছে, এখন দুলাভাই আপনি যদি হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখাইয়া সব ভুলিয়া যান তাহা হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়। ভুল মানুষ মাত্রই করে। ইহাই মানব ধর্ম।

এর মানে কী ? নতুন করে এইসব কথা তোলা হচ্ছে কেন ?

নীলুকে জিজ্ঞেস করতেই সে হেসে বলল, বুঝতে পারছিস না ? মা এখন মামার বাড়িতে।

তার মানে ?

মানে-টানে জানি না। মা এখন মার ঘাড়ে চেপে বসে আছে। মামা ঘাড় থেকে নামাতে চাইছে।

বুঝলি কী করে ?

এখানে না বোঝার কিছু আছে নাকি ?

নীলু তরল গলায় হাসল।

শেষ পর্যন্ত দেখবি বাবা বলবেন, ঠিক আছে চলে আসুক। আর মা তার ছেলে কোলে নিয়ে এ বাড়িতে উঠে আসবেন। খুব কান্নাকাটি হবে কিছুদিন। তারপর সব ঠিকঠাক। মাঝখান থেকে আমরা একটা ভাই পেয়ে যাব।

তোর কথার কোনো ঠিকঠিকানা নেই নীলু।

না থাকলে কী আর করা। তবে এ রকম হলে মন্দ হয় না। কী বলিস ? বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে না ?

হুঁ।

বাবা যে হারে মদ-টদ খাচ্ছে। একেবারে দেবদাসের মতো—

নীলু হেসে উঠল।

এর মধ্যে হাসির কী আছে ?

কান্নারও কিছু নেই।

নীলু গম্ভীর মুখে বই নিয়ে পড়তে বসল। ইদানীং তার পড়াশোনায় খুব মনোযোগ হয়েছে। এই নিয়ে কিছু বললে সে গম্ভীর হয়ে বলে, তোরা সব স্টার-ফার পেয়ে পাস করবি আর আমি বুঝি ফেল করব ? সেটা হচ্ছে না।

এখন আমাদের স্কুলটুল নেই। পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে জোরেসোরে। সপ্তাহে তিনদিন কোচিং ক্লাস হয়। সেখানে মেয়েরা সবাই ভান করে যে কিচ্ছু পড়াশোনা হচ্ছে না। কে কোন কলেজে পড়বে সে নিয়েও ক্ষীণ আলোচনা হয়। হলিক্রস কলেজ ভালো না ইডেন ভালো সব মেয়েরাই সেটা জানে।

এমন সিরিয়াস পড়াশোনার সময়টাতেও আমাদের ক্লাসের রুবিনার বিয়ে হয়ে গেল। সেলিনা আপা খুব রাগ করলেন— বাবা-মাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি ? সেলিনা আপা খুব কাটা কাটা কথা বলে অপমান করলেন রুবিনার বাবাকে। ঝাঁঝাল গলায় বললেন, আপনাদের মতো শিক্ষিত মূর্খের জন্যে দেশের এমন খারাপ অবস্থা।

রুবিনা খুবই কান্নাকাটি করতে লাগল। গায়েহলুদের দিন দেখি কেঁদে মুখটুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। রুবিনার এক মোটাসোটা খালা পানভর্তি মুখ নিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন, মেট্রিক ক্লাসটা হচ্ছে মেয়েদের বিয়ের বয়স। এরপর আর রসকষ থাকে না। নীলুটা ফস করে বলে বসল, কেন , তখন রস কী হয় ?

রুবিনার খালা চোখ বড় বড় করে বললেন, এই ফাজিল মেয়েটা কে ?

নীলু হাসিমুখে বলল, ফাজিল বলছেন কেন ?

খুব হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল চারদিকে। রুবিনার খালা রেগেমেগে অস্থির। কয়েকবার বললেন, আজকালকার মেয়েগুলি এমন কেন ?

অনেকদিন পর রুবিনার গায়েহলুদ উপলক্ষে আমরা খুব হৈচৈ করলাম। বিয়েটিয়ে এই জাতীয় অনুষ্ঠান আমার ভালো লাগে না। গাদাগাদি ভিড়। মেয়েদের লোক দেখান আহ্লাদীপনা। খাবার টেবিলে তাড়াহুড়ো করে বসতে গিয়ে শাড়িতে রেজালার ঝোল ফেলে দেয়া। অসহ্য! কিন্তু রুবিনার গায়েহলুদ আমার কেন যে এত ভালো লাগল। বরের বাড়ি থেকে 'এলা' নামের একটি মেয়ে এসেছিল, সে ঢাকায় 'ও' লেবেলে পড়ে। ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। জন্মের বন্ধুত্ব। এর আগে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব হয়নি। আমরা দুজন এক ফাঁকে ছাদে চলে গেলাম। মেয়েটি নানান কথা বলতে লাগল। একটি ছেলের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। ছেলেটি মেডিক্যালে পড়ে। এক বিয়ে বাড়িতে আলাপ হয়েছিল। খুব নাকি লাজুক ছেলে। আর দারুণ ভদ্র। এলা নিচু স্বরে বলল, জানো ভাই, ও একবার যা অসভ্য কথা লিখেছিল আমাকে। আমি খুব রাগ করলাম। ওর সঙ্গে দেখা করাই বন্ধ করে দিলাম। টেলিফোন করলে টেলিফোন নামিয়ে রাখতাম। শেষে কী করল সে জানো ?

কী করল ?

বলল সে বিষ খাবে। আমি তো জানি তাকে। খাবে বলেছে যখন তখন খাবেই। ছেলেরা দারুণ সেন্টিমেন্টাল হয় ভাই।

তখন তুমি কী করলে ?

কী আর করব, দেখা করলাম।

আমি ইতস্তত করে বললাম, অসভ্য কথাটা কী লিখেছিল ?

এলা তরল গলায় হেসে উঠল, দুর তা বলা যায় নাকি ? বিয়ের দিন তুমি আসবে তো ? ঐ দিন তোমাকে ওর ঐ চিঠিটাই পড়াব। দেখবে ছেলেরা কী রকম অসভ্য হয়।

রুবিনার বিয়ের দিন আমরা কেউ ও-বাড়িতে গেলাম না। নীলুর জন্যেই যাওয়া হলো না। সে কিছুতেই যাবে না এবং আমাকেও যেতে দেবে না।

তুই না গেলে না যাবি। আমি যাই।

না, বললাম তো যেতে পারবি না।

কেন, অসুবিধেটা কী ?

ওরা আজেবাজে কথা বলছিল, তোকে বলতে চাই না।

বলতে চাস না কেন ?

কারণ শুনলে তোর খারাপ লাগবে।

লাগুক খারাপ।

নীলু মৃদু স্বরে বলল, ওরা বলছিল সেতারার চেহারার সঙ্গে নাকি ঐ লোকটির খুব মিল। আর সেতারা গান-বাজনাও ঐ লোকটির মতো জানে।

কখন বলছিল ?

রুবিনার খালা বলছিল, আমি পাশের ঘরে ছিলাম।

আমি চুপ করে রইলাম।

নীলু বলল, তোর মন খারাপ লাগবে বলেছিলাম না। তবুও তো শোনা চাই।

আমি সে রাতে ঘুমোতে পারলাম না। বাবা ফিরলেন অনেক রাতে। সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ হতে লাগল। রমজান ভাইয়ের গলা শোনা গেল, ছিঃ, আপনের শরম করে না ?

চুপ থাক।

আপনে চুপ থাকেন।

ধুপ করে একটা শব্দ হলো। বাবার গলা।

ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেব। শুয়োরের বাচ্চা। বেশি সাহস হয়েছে।

মেয়েরা বড় হইছে না ? হায়া-শরম নাই ?

চুপ থাক।

আপনে চুপ থাকেন।

পানি ঢালার শব্দ। আকবরের মা উঠে গেল। ঝনঝন করে কী যেন পড়ল। আবার পানি ঢালা হচ্ছে। কী হচ্ছে এসব ?

বাবা আজকাল বড্ড ঝামেলা করছেন। আবার একটা বিয়ে করলে তার জন্যে ভালোই হতো। নজমুল চাচা যাঁকে বাসায় নিয়ে এসেছিলেন, সেই মহিলাটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। ছোটখাট মানুষ, লম্বা চুল। কথা বলেন টেনে টেনে। আমাদের সঙ্গে বেশ আগ্রহ করে কথা বললেন। নীলু যখন বলল, আচ্ছা আপনি কি আমাদের দুজনকে আলাদা করতে পারবেন ? আমার নাম নীলু ওর নাম বিলু। কিছুক্ষণ পর যদি আমরা দুজন এক রকম কাপড় পরে আসি তাহলে কি বলতে পারবেন কে বিলু কে নীলু ?

তিনি হাসিমুখে বললেন, আরে এ মেয়ে তো দেখি খুব পাগলি!

আমাদের দু'জনারই ভদ্রমহিলাকে খুব পছন্দ হলো। শুধু সেতারা মুখ গোঁজ করে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি ডাকলেন, এই কী যেন নাম তোমার ?

সে উঠে চলে গেল।

আমরা তাঁকে বাগান দেখাবার জন্যে নিয়ে গেলাম। সেতারা কিছুতেই যাবে

না। আমরা সেতারাকে ছাড়াই বাগানে বেড়াতে গেলাম। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া তেঁতুল গাছ দুটি দেখে তিনি খুব অবাক হলেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন, বসতবাড়ির কাছে কেউ তেঁতুল গাছ লাগায় নাকি?

নীলু বলল, লাগালে কী হয়?

বুদ্ধি কমে যায়। তেঁতুল খেলেও বুদ্ধি কমে।

এটা কিন্তু ঠিক না। রকিব ভাই খুব তেঁতুল খান। কিন্তু তাঁর খুব বুদ্ধি।

রকিব ভাই কে?

নীলু চুপ করে গেল। তিনিও আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। একবার শুধু বললেন, এত বড় বাড়িতে থাকো, ভয় লাগে না?

আমরা কিছু বললাম না। ভদ্রমহিলা যাবার আগে নীলুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন এবং অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললেন, তোমাদের মার সঙ্গে কি তোমাদের যোগাযোগ আছে?

নীলু বলল, না নেই।

তোমরা চিঠি লিখলেই পারো। তোমরা কেন লিখবে না? তোমরা লিখবে।

আমাদের খুব আশা ছিল ভদ্রমহিলার সঙ্গে বাবার বিয়ে হবে। কিন্তু বিয়ে হয় নি। বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না। নজমুল চাচার উপর রেগে গিয়ে আজেবাজে কথা বলতে লাগলেন, তোমরা পেয়েছটা কী? আমাকে না বলে এই সব কী শুরু করেছ?

নজমুল চাচাও কী সব যেন বললেন। তুমুল ঝগড়া বেঁধে গেল।

এক পর্যায়ে বাবা বললেন, যাও তুমি আমার বাড়ি থেকে এক্ষুনি বিদেয় হও।

নজমুল চাচাও চেঁচাতে লাগলেন, আমি তোমার দয়ার উপর আছি নাকি? নগদ ভাড়া দিয়ে থাকি।

সে এক বিশ্রী অবস্থা। নজমুল চাচা সেই রাতেই ঠেলা গাড়ি নিয়ে এলেন। মালপত্র পাঠান হতে লাগল। আমরা বসে বসে দেখলাম। ঠেলা গাড়ি এসেছে দুটি। নজমুল চাচার জিনিসপত্র তেমন কিছু নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব তোলা হয়ে গেল। আমরা দেখলাম বাবা দাঁড়িয়ে আছেন সিঁড়ির কাছে আর নজমুল চাচা একটা বেতের ঝুড়ি হাতে নিয়ে নেমে যাচ্ছেন।

নীলু তখন ছুটে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় তাঁকে জাপ্টে ধরল।

নজমুল চাচা বললেন, আরে মা, কী করিস তুই, ছাড় ছাড়।

নীলু ছাড়ল না।

নজমুল চাচা বললেন, এ তো বড় মুসিবত হলো দেখছি। আরে বেটি কী করিস।

তাঁর হাত থেকে বেতের ঝুড়ি ছিটকে পড়ে গেল।

নজমুল চাচা ভারী গলায় বললেন, এই মালপত্র সব তুলে রাখ। সাবধানে তুলিস।

নজমুল চাচা আমাদের কোনো আত্মীয় নন। দোতলার তিনটি কামরা ভাড়া নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন পনেরো বছরের মতো। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন ষোলে-সতেরো বছর আগে। একটিমাত্র মেয়ে, অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মেয়ে নেদারল্যান্ড না কোথায় যেন থাকে। বছরে দু'তিনটি চিঠি দেয়। চিঠিতে খুব স্বাস্থ্যবান কিছু ছেলেমেয়ের ছবি থাকে। নজমুল চাচা সেই চিঠি পড়ে গম্ভীর হয়ে বলেন, উফ এ্যারন বাংলাটা এখনো শেখে নাই। খুব খারাপ, খুব খারাপ।

এ্যারন তাঁর নাতনি।

নীলু অনেক কিছুই করতে পারে যা আমি পারি না। নজমুল চাচা যখন চলে যাচ্ছিলেন আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে তাঁকে ফেরাই। কিন্তু আমি গেলাম না, ছুটে গেল নীলু। আমরা দুজনে দেখতে অবিকল একরকম, কিন্তু দুজন সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে উঠছি। আমরা এ রকম কেন ?

কাল রাতে আমি চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখেছি। এমন চমৎকার স্বপ্ন যে ঘুম ভেঙে খানিকক্ষণ কাঁদলাম। একবার ইচ্ছে হলো নীলুকে ডেকে তুলি। স্বপ্নের কথাটা বলি ওকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করলাম না। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে স্বপ্নটার কথা ভাবলাম। ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্নটিকে অর্থবহ মনে হচ্ছিল জেগে থেকে তা আর মনে হলো না। আমি দেখেছিলাম একটি নদী। নদীর চারপাশে ঘন বন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর বন অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখলাম শুধুই নদী। সেই নদীতে বালি চিকচিক করছে। কোথাও কেউ নেই। আমার একটু ভয়ভয় করছে। তবু আমি নদীতে নামতেই নদীটি আমাদের নানার বাড়ির পুকুর হয়ে গেল। সে পুকুরের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কুমির কুমির খেলছে। স্বপ্নের নদীর পুকুর হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। আমি একটুও অবাক না হয়ে ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে কুমির কুমির খেলতে লাগলাম। একটি পাঁজি ছেলে ডুবসাঁতার দিয়ে কেবলই আমার পা জড়িয়ে গভীর জলের দিকে টেনে নিতে চাচ্ছিল। আমার রাগ লাগছিল কিন্তু কিছুই বলছিলাম না। কারণ স্বপ্নের মধ্যে মনে হচ্ছিল এই ছেলেটি যেন আমার স্বামী। একসময় ছেলেটি টেনে আমাকে মাঝপুকুরে নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, এই সুশী তোমাকে এখন ছেড়ে দেই ?

কেন মানুষ এমন অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে ? আমি জেগে এই ছেলেটির মুখ খুব মনে করবার চেষ্টা করলাম, কিছুতেই মনে পড়ল না। শুধু মনে পড়ল ছেলেটির চোখগুলো মেয়েদের চোখের মতো টানা টানা। আর ওর হাত দুটি লম্বা এবং খুব ফরসা। কে জানে এ রকম একটি ছেলের সঙ্গেই হয়তো আমার বিয়ে হবে। সে আমাকে আদর করে ডাকবে 'সুশী'। কী আশ্চর্য এরকম একটা অদ্ভুত নাম এল

কোত্থেকে ? ভাবতে ভাবতে আবার আমার চোখ ভিজে উঠল। বাকি রাত এক ফোঁটা ঘুম এল না।

এত ভোরে কখনো আমি আগে উঠিনি। অদ্ভুত লাগছিল আমার। আলোটাই অন্যরকম। কেমন মায়া মায়া আলো, স্বপ্নের মধ্যে যে-রকম আলো দেখা যায় সে রকম। আমি নিচে বাগানে নেমে গেলাম। কদম গাছের নিচটায় তখনো খুব অন্ধকার। আমার একটু ভয় ভয় করছিল। কিন্তু গাছের নিচে এসে দাঁড়ান মাত্র দেখলাম নীলু জেগে উঠেছে। টুথব্রাশ নিয়ে ঘুমঘুম চোখে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। নীলু সব সময় খুব ভোরে ওঠে। কিন্তু সে যে এ রকম অন্ধকার ভোর তা জানা ছিল না। আমি ডাকলাম, এ্যাই নীলু।

নীলু আমাকে দেখতে পেল না। সে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর একটি কাণ্ড করল, মা এসেছে মা এসেছে বলে ছুটে গেল গেটের দিকে।

আমি এগিয়ে এসে বললাম, এ্যাই নীলু কী হয়েছে রে ?

নীলু খুব অবাক হলো। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। একসময় থেমে থেমে বলল, আমি ভাবলাম মা বুঝি। গলার স্বর অবিকল সে রকম লাগল।

নীলুর কি কিছুটা আশাভঙ্গ হয়েছে ? কী জানি হয়তো হয়েছে। মা'র কথা সে হয়তো সারাক্ষণই ভাবে। মুখে বলে না।

আজ এত সকালে উঠেছিস যে ?

দেখলাম একদিন উঠে কেমন লাগে।

কেমন লাগে ?

ভালোই তো।

নীলু চুপচাপ দাঁত ঘষতে লাগল। আমি বললাম, তুই কি মা'র কথা খুব ভাবিস ?

নাহ্।

তাহলে আজ এ রকম ছুটে গেলি যে ?

আমার ইচ্ছা হয়েছে গিয়েছি। তোর তাতে কী ?

রাগ করছিস কেন ?

নীলু জবাব না দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। তখন মনে পড়ল নীলুর সঙ্গে আমার ঝগড়া চলছে। গত এক সপ্তাহ ধরে কথাবার্তা বন্ধ। ঝগড়ার কারণটি অতি তুচ্ছ। আমি নীলুর একটি চিঠি খুলে পড়ে ফেলেছি। কিছুই নেই সে চিঠিতে। ছয় লাইনের একটি চিঠি। নীলুর পরিচিত প্রফেসরটি লিখেছেন। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার যে বইটি নীলু পড়তে চেয়েছে সেটি তিনি দোকানে খুঁজে পাননি। পেলেই পাঠাবেন।

এমন কী আছে সেই চিঠিতে যে নীলু রাগ করল ? কিন্তু সে এমন ভাব করতে লাগল যেন আমি তার কাছে লেখা খুব গোপন একটি প্রেমপত্র পড়ে ফেলেছি। আমি

যখন বললাম কী আছে এই চিঠিতে যে তুই এ রকম করছিস ?

যাই থাকুক, কেন আমার চিঠি পড়বি ?

বেশ, আর পড়ব না।

পড়বি না শুধু না, তুই আমার ঘরেও কোনোদিন ঢুকবি না।

বেশ, ঢুকব না।

আর আমার সঙ্গে কথাও বলবি না।

ঠিক আছে, বলব না।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হলো না। সন্ধ্যাবেলা বাবা প্রেস থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সে নালিশ করল, বাবা বিলু আমার সব চিঠিপত্র পড়ে ফেলে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। তুমি ওকে ডেকে নিষেধ করে দাও।

ঠিক আছে করব।

না, এখনই করো।

বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। শান্ত স্বরে বললেন, একজনের কাছে লেখা চিঠি অন্যের পড়াটা ঠিক না মা। আমি লজ্জায় বাঁচি না। নীলুটা এমন হচ্ছে কেন কে জানে। আগে এ রকম ছিল না। তার কাছে চিঠি এলেই আমাকে সে চিঠি পড়তে দিতো। একবার সে পেনফ্রেন্ডশিপ করল বুলগেরিয়ার কী একটা ছেলের সঙ্গে। সেই ছেলেটা সবুজ রঙের কাগজে লম্বা লম্বা চিঠি লিখত ভুল ইংরেজিতে। চিঠির শেষে একটা ঠোঁটের ছবি এঁকে লিখত 'Kiss'। নীলু আমাকে সেই চিঠি পড়তে দিয়ে বলত, মাগো কী অসভ্য! নীলুর সেইসব চিঠির জবাবও লিখে দিতাম আমি। একদিন সে লজ্জায় লাল হয়ে বলল, বিলু চিঠির শেষে তুইও লিখে দে 'Kiss'। ঐ বাঁদরটার সাথে তো আর দেখা হচ্ছে না। কী বলিস ? আমি লিখলাম 'Kiss'। নীলু বহু যত্নে একটা ঠোঁটের ছবিও আঁকল। তারপর ঐ ছেলে ছবি পাঠাল। মাথায় চুল নেই একটিও। গালে এত বড় একটা আঁচিল। হাতির কানের মতো বড় বড় কান। ছবি দেখে দারুণ রেগে গেল নীলু। ছেলেটি লিখেছিল সুযোগ পেলেই সে তার বাংলাদেশী পেনফ্রেন্ড নীলুর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। নীলু বলল, লিখে দে হাঁদারাম তুমি বাংলাদেশে এলে তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব। বাঁদর কোথাকার।

নীলু চিঠি লেখা বন্ধ করে দিলেও আমি চালিয়ে যেতে লাগলাম। মজাই লাগত আমার। বানিয়ে বানিয়ে কত কিছু যে লিখেছি। যেমন একবার লিখলাম, কাল আমরা সমুদ্রে নৌকা নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কী যে সুন্দর সমুদ্র আমাদের। খুব মজা হয়েছে। একবার সে লিখল, তোমার কি কোনো ছেলেবন্ধু আছে ? আমি লিখলাম, হ্যাঁ আছে। আমার ছেলে-বন্ধুটি একজন কবি। সে আমাকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছে।

ছেলেটা সত্যি সত্যি হাঁদারাম। যা লিখতাম তাই বিশ্বাস করত। তারপর একদিন সে হঠাৎ লিখে বসল, আসছে সামারে আমি বাংলাদেশে আসব। কী সর্বনাশ। ভয়ে আমি এবং নীলু দুজনই অস্থির। একি ঝামেলা হলো। কী যে ভয়ে কেটেছে সেই সময়টা। রাতে ভালো ঘুম পর্যন্ত হতো না। নীলু অবশ্যি খুব একটা ভয় পায়নি। ও বলত, খামোকা ভয় পাচ্ছিস, আসবে-টাসবে না। আর যদি এসেও পড়ে, তাহলে বলব নীলু নামের মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে।

ছেলেটি অবশ্যি আসেনি। এবং চিঠিপত্রও দেয়নি আর। হয়তো অন্যকোনো দেশের কোনো মেয়ের সঙ্গে আবার পেনফ্রেন্ডশিপ করেছে।

নীলুর যন্ত্রণায় আরো সব চিঠি লিখতে হয়েছে আমাকে। একবার সে বলল, খুব ভাষা-টাষা দিয়ে একটা চিঠি লিখে দে তো বিলু। কার কাছে, কী— কিছুই বলবে না। লিখলাম একটা চিঠি। সেটা তার পছন্দ হলো না। আবার একটা লিখলাম। কত কাণ্ড হলো সে চিঠি নিয়ে। ক্লাসের মেয়েরা সেই চিঠির লাইন বলে বলে নীলুকে খ্যাপাতে লাগল। কোথায় পেয়েছে তারা সেই চিঠি কে জানে। নীলু যে ছেলেকে লিখেছিল সে-ই হয়তো বলে দিয়েছে। নীলু বাসায় এসে কেঁদে-টেদে অস্থির। সেই সময় নীলুর সঙ্গে খুব ভাব ছিল আমার। নীলু হঠাৎ করেই অন্যরকম হয়ে গেল। আমার কোনো বন্ধুটন্ধু নেই। নীলু দূরে সরে যেতেই আমি একা হয়ে গেলাম। এরকম একটি অদ্ভুত সুন্দর সকালে একা থাকতে ইচ্ছে করে না। আমি নীলুর খোঁজে বাগানের পেছনের দিকে এসে দেখি নীলু কাঁদছে। কী আশ্চর্য! আমি বললাম, কী হয়েছে রে ?

কিছু হয় নি।

কাঁদছিস কেন ?

তোর কাছে সব কিছু বলতে হবে নাকি ?

বললে দোষ কি ?

নীলু কোনো জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে বাগান ছেড়ে চলে গেল। সকালটা হঠাৎ করেই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। লোকজন সবাই জেগে উঠেছে। রমজান ভাই ঘটাং ঘটাং করে টিউবওয়েলে পানি তুলছে। আকবরের মা ময়লা থালা-বাসন এনে জমা করছে টিউবওয়েলের পাশে। একসময় ঝগড়া লেগে গেল দুজনের মধ্যে। এরা দুজন দুজনকে সহ্যই করতে পারে না। তবু কেমন করে থাকে এক সঙ্গে ? এদের চেঁচামেচিতেই বোধহয় বাবার ঘুম ভাঙল। বাবা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চারদিক আবার চুপচাপ। বাবা বললেন, আমাকে চা দাও এক কাপ। এরা দুজনে কেউ কোনো উত্তর করল না। আকবরের মা বেড়ালের মতো ফ্যাসফ্যাস করে কী বলতেই আবার বেঁধে গেল রমজান ভাইয়ের সঙ্গে। বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। আজকাল কেউ আর বাবাকে তেমন গ্রাহ্য করে না। আমি এগিয়ে এসে বললাম,

আমি বানিয়ে আনছি বাবা।

তুই আবার চা বানাতেও জানিস নাকি ?

জানব না কেন ?

বাবা অবাক হয়ে বললেন, কার কাছে শিখলি ?

কী আশ্চর্য কাণ্ড, চা বানান আবার শিখতে হয় নাকি ? বাবা এরকম ভান করতে লাগলেন যে খুব অবাক হয়েছেন।

আর কী জানিস, রান্নাবান্না করতে পারিস ? ভাত-মাছ এইসব ?

নাহ্।

এগুলিও শিখে ফেল। রমজানকে বল শিখিয়ে দিতে।

আচ্ছা বলব।

নীলুকে সঙ্গে নিয়ে শিখে ফেল। একদিন বিয়েটিয়ে হবে। রান্নাবান্না না জানলে বিয়ে দেয়াই যাবে না, হা হা হা।

অনেক দিন পর বাবা হাসলেন। মানুষের হাসির মতো সুন্দর কি কিছু আছে ? বাবার হাসির সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে রোদ ঝলমল করে উঠল।

মা একটা কথা সবসময় বলতেন, মানুষ যখন হাসে তখন তার সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী হাসে। কিন্তু সে যখন কাঁদে, তার সঙ্গে আর কেউ কাঁদে না। কাঁদতে হয় একা একা।

চা বানাতে বানাতেই শুনলাম সেতারা গলা সাধা শুধু করেছে। নিসা গামা পামা গামা। গামা পামা গারে সা। গান-টান কিছু না, সামান্য সারে গামা, কিন্তু কী যে ভালো লাগছে শুনতে।

বাবাকে চা নিয়ে দিতেই বাবা বললেন, ভাবছি তোদের নিয়ে কোথাও ঘুরেটুরে আসব। যাবি নাকি ?

কোথায় ?

গারো পাহাড়ে গেলে কেমন হয় ? জাড়িয়ে জাঞ্জাইল লাইনে বেশি দূর হবে না। ছয়-সাত ঘণ্টা লাগবে ট্রেনে। বন বিভাগের একটা রেস্টহাউস আছে। যাবি নাকি ?

যাব বাবা।

জায়গাটা সুন্দর। রাতেরবেলা একটু ভয়ভয় লাগে।

কেন ?

বন্য হাতির শব্দটব্দ পাওয়া যায়। এখন বোধহয় আর সে রকম নেই। তোরা যদি যেতে চাস তাহলে একটা প্রোগ্রাম করি।

যাবে কবে ?

দুই দিনের মাত্র ব্যাপার, একটা তারিখ করলেই হয়। তুই নীলুকে জিজ্ঞেস করে আয় ও যাবে কি-না।

নীলু সব শুনে লাফিয়ে উঠল। বেড়ানোর ব্যাপারে নীলুর মতো উৎসাহী আর কেউ নেই। গারো পাহাড় দেখতে যাওয়া হবে শুনেই তার সব রাগ পড়ে গেল। নানান রকম পরিকল্পনা করে ফেললাম আমরা। যেমন সম্পাদের ক্যামেরাটা নিয়ে যাব এবং খুব ছবি তুলব। সেখানে আমরা দুজনেই শাড়ি পরব। এবং এ উপলক্ষে বাবাকে বলব দুটি শাড়ি কিনে দিতে। বন বিভাগের রেস্ট হাউসে রাতের খাবার-টাবার হয়ে যাবার পর বাবাকে বলব গল্প বলার জন্যে। বাবা অবশ্যি গল্পটল্প তেমন বলতে পারে না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা হারিকেন জ্বালিয়ে বসে থাকব। হারিকেনের আলো কী যে ভালো লাগে আমার।

একেকটা দিন এমন অন্যরকম হয়। মনে হয় দুঃখ-টুঃখ সব বানান ব্যাপার। চারদিকে শুধু সুখ এবং সুখ। সন্ধ্যাবেলা আমরা দু'বোন শাড়ি পরে বারান্দায় হাঁটছি, নজমুল চাচা ডেকে পাঠালেন।

কিরে বেটিরা শুনলাম দল বেঁধে নাকি পাহাড়ে যাচ্ছিস ?

জি চাচা।

তা আমাকে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করিল না ? আমারও তো পাহাড়-টাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে।

সত্যি সত্যি যাবেন আমাদের সাথে ?

এরকম পরীর মতো মেয়েদের পাহারা দিয়ে রাখার জন্যেও তো লোকজন দরকার।

পরের কয়েকটি দিন আমাদের দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কাটল। একদিন শুনলাম বন বিভাগের ডাকবাংলোটা পাওয়া গেছে। তারপর দিনক্ষণ ঠিক হলো। ন'তারিখে ভোরের ট্রেনে যাব, পৌঁছব বিকাল নাগাদ। নজমুল চাচা যাবেন। রমজান যাবে। বাবার প্রেসের একজন কম্পোজিটর মাখন মিয়া সেও যাবে। কারণ মাখন মিয়ার বাড়ি ঐ অঞ্চলে, সে সব খুব ভালো চেনে।

আট তারিখ রাতে বাবা বাড়ি ফিরলেন না। রাত একটায় নজমুল চাচা খোঁজ নিতে গেলেন। আমরা তিন বোন বসার ঘরে বসে রইলাম চুপচাপ। নজমুল চাচা ফিরলেন দু'টার দিকে এবং হালকা গলায় বললেন, কাজে আটকা পড়ে গেছে, সকাল বেলাতেই চলে আসবে। ঘুমিয়ে পড়ো। নীলু শান্ত স্বরে বলল, বাবার কী হয়েছে বলেন ?

কী আবার হবে ? কাজ থাকে না মানুষের ?

নজমুল চাচা রেগে গেলেন। নীলুও রেগে গেল।

বাবার কী হয়েছে বলেন।

কাল সকালে আসবে, তখন জিজ্ঞেস করিস। কিছু হয় নি, ভালোই আছে।

নীলু তেজি গলায় বলল, আপনাকে এখন বলতে হবে।

এরকম করে তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস কেন ?

নীলু কেঁদে ফেলল। বাবা ফিরলেন পরদিন দুপুরে। কোর্ট থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে। তাঁর রাত কেটেছিল থানা হাজতে। মদ খেয়ে খুব নাকি হৈচৈ করছিলেন বা এই জাতীয় কিছু। খুবই কেলেংকারি ব্যাপার। আমরা সপ্তাহখানেক কেউ স্কুলে গেলাম না। ঠিক করলাম বাবার সঙ্গে কেউ কোনো কথা বলব না। ডাকলেও সাড়া দেব না। এমন ভাব করব যেন শুনতে পাইনি। কোনো লাভ অবশ্যি তাতে হলো না। বাবা আমাদের ডাকাডাকি বন্ধ করে দিলেন। যতক্ষণ বাসায় থাকেন চুপ করে থাকেন।

একদিন দেখি একটি টেলিভিশন কিনে আনলেন। সেতারার খুব শখ ছিল টিভির। কথা ছিল সেতারার আগামী জন্মদিন ঢাকা থেকে এটি কিনে আনা হবে এবং সেই উপলক্ষে আমরা সবাই দল বেঁধে ঢাকা যাব। তিনি বোধহয় আমাদের সঙ্গে ভাব করবার জন্যেই আগে-ভাগে কিনে ফেললেন। সন্ধ্যাবেলা টিভি চালু হলো। আমরা কেউ দেখতে গেলাম না। আকবরের মা এবং রমজান ভাই মোড়া পেতে টিভির সামনে রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে রইল।

বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম আমরা। সেই সময় বড় মামার চিঠিতে জানলাম মা'র একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম কাজল।

মায়ের শরীর খুব খারাপ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আছেন। কী যে কষ্ট হলো আমার। কত লক্ষ বার যে বললাম— মা ভালো হয়ে যাক। মাকে ভালো করে দাও। রোজ রাতে তাঁকে স্বপ্নে দেখতাম। রক্তশূন্য একটি লম্বাটে ফর্সা মুখ। চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা। স্বপ্ন দেখে রোজ রাতেই কাঁদতাম। আমরা তিন বোনই নিশ্চিত ছিলাম মা মারা যাবেন। কিন্তু তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। চিঠি লিখল মা নীলুকে। নীলু তার কোনো চিঠি আমাকে পড়তে দেয় না। কী লেখা ছিল সে চিঠিতে তা জানলাম না। নীলু শুধু বলল, কাজল খুব বিরক্ত করে, রাতে মাকে ঘুমাতে দেয় না।

এসএসসি পরীক্ষায় খুব ভালো রেজাল্ট করলাম। এত ভালো যে, সেলিনা আপা একদিনের জন্যে স্কুল ছুটি দিলেন। এবং একটি গোল্ড মেডেল দেবার ব্যবস্থা করলেন। খায়রুন্নেসা গোল্ড মেডেল। খায়রুন্নেসা তাঁর মায়ের নাম। এই গোল্ড মেডেলটি সেবারই প্রথম ঘোষণা করা হলো। আমাদের স্কুলের কোনো ছাত্রী যদি এসএসসি পরীক্ষায় সমস্ত বোর্ডে প্রথম তিনজনের মধ্যে থাকতে পারে, তবেই সে এই গোল্ড মেডেল পাবে। ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে আমাকে পাঁচশ' টাকা

দেয়া হলো। শুধু তাই না, একদিন সকালবেলা একজন স্থানীয় সংবাদদাতা আমার ইন্টারভ্যু নিতে এলেন। নজমুল চাচার উৎসাহের সীমা নেই। শাড়ি খুলে একটা কামিজ-টামিজ পর, বয়স কম দেখা যাবে। কানের দুলগুলি খুলে ফেল তো, ভালো ছাত্রীদের এইসব গয়না-টয়না মানায় না। মুখে হালকা করে পাউডার দে।

ইন্টারভ্যু পর্ব সমাধা হতে অনেক সময় লাগল। বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন নজমুল চাচা। যেমন ভদ্রলোক যখন জিজ্ঞেস করলেন, দৈনিক ক'ঘণ্টা পড়াশুনা করতে ? আমি কিছু বলার আগেই নজমুল চাচা বললেন, ঘণ্টার কি কোনো হিসাব আছে ভাই ? রাতদিনই পড়ছে। যখনই দেখি তখনি মুখের ওপর একটা বই। হা হা হা।

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, কোনো প্রাইভেট টিচার ছিল ?

নজমুল চাচা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, এই মেয়ের প্রাইভেট টিচার লাগে ? কী যে বলেন ভাই!

কথাটি পুরোপুরি মিথ্যা। আজিজ স্যার আমাকে আর নীলুকে সপ্তাহে চারদিন অংক করাতেন। নলিনীবাবু স্যার পড়াতেন ইংরেজি।

পাঠ্যবই ছাড়া বাইরের বই কেমন পড়েছ তুমি ?

বাইরের বই তো বেশি পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ টলস্টয় সব আপনার নিচের ক্লাসেই পড়ে শেষ করেছে। হা হা হা।

ইন্টারভ্যু হলো আসলে নজমুল চাচার সঙ্গে। আমি শুধু হাসিমুখে তাঁর পাশে রইলাম। এবং সেই ইন্টারভ্যুর খানিকটা ছাপাও হলো একটি ইংরেজি পত্রিকায়। তার পরপরই একটি চিঠি পেলাম আমরা দু'বোন।

> কল্যাণীয়াসু নীলু অথবা বিলু
>
> তোমাদের দু'বোনের একজনের ছবি দেখলুম পত্রিকায়। ছবির সঙ্গে ডাকনাম দেয়া ছিল না। কাজেই বুঝতে পারছি না ছবিটি কার।
>
> যার ছবি তার জন্যে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। মফস্বলের একটি স্কুল থেকে এমন চমৎকার রেজাল্ট করা দারুণ ব্যাপার। আমার খুবই ভালো লাগছে। এর মধ্যে একবার ময়মনসিংহ এসেছিলাম। তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছি। গেট বন্ধ ছিল। কাজেই ভেতরে আর ঢুকিনি। পরে ভেবেছি গেট খুলে ঢুকলেই হতো।
>
> অনেক সময় আমরা যা করতে চাই করতে পারি না। কেন পারি না তাও জানি না। পরে তা নিয়ে কষ্ট পাই। ঠিক না ?

> আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তোমরা দু'বোন আমার চিঠি পড়ে খুব হাসবে। অবশ্যি একটি ক্ষীণ আশা যে এই চিঠিটি তোমাদের হাতে পৌঁছবে না। কারণ তোমাদের ঠিকানা আমার জানা নেই। শুধু জানি তোমাদের দু'বোনের একজন হচ্ছ নীলু, একজন বিলু এবং তোমাদের বাড়িটির নাম 'উত্তর দিঘি।' এ রকম সংক্ষিপ্ত ঠিকানায় চিঠি যাওয়ার কথা নয়। ঠিক না ?
>
> রকিব হাসান

কত অসংখ্যবার যে সেই চিঠি আমি পড়লাম। প্রতিবারই আমার মনে হয়েছে এই চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তার বাইরেও কিছু আছে। আর একবার পড়লেই তা বোঝা যাবে।

চিঠিটি নজমুল চাচাও পড়লেন এবং বললেন, বিশিষ্ট ভদ্রলোক। খুব আদব-কায়দা। একটা ভালো সংবাদ পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দিয়েছে। এইসব ভদ্রতা কি দেশে আজকাল আছে ? সংবাদ শুনলে লোকজন আজকাল বিরক্ত হয়। মা সুন্দর করে গুছিয়ে একটা চিঠি লেখো। বানান ভুল যেন না থাকে। সাবধান। ডিকশনারি দেখবে। আর শোনো, এই চিঠি যত্ন করে তুলে রাখবে। রেজাল্ট নিয়ে যত চিঠি, যত টেলিগ্রাম আসবে সব তুলে রাখবে। আলাদা একটা ফাইল করে রাখবে। আমি অফিস থেকে ফাইল নিয়ে আসব।

নীলু চিঠিটির শুরুটা পড়েই গম্ভীর মুখে বলল, তোর চিঠি আমাকে দিচ্ছিস কেন ? আমি অন্যের চিঠি পড়ি না।

পড়া যাবে না এমন কিছু এখানে লেখা নেই।

না থাকুক।

নীলু পাশ ফিরে বালিশে মুখ ঢাকল। তার বেশ ক'দিন ধরে জ্বর যাচ্ছে। তেমন কিছু নয়, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠছে না। আমার ধারণা, সে আশা করেছিল তার রেজাল্ট অনেক ভালো হবে। রেজাল্ট মোটেও ভালো হয়নি। ফার্স্ট ডিভিশন দেখা শেষ করে আমরা যখন সেকেন্ড ডিভিশন দেখতে শুরু করেছি সে তখন দৌড়ে পালিয়েছে। নজমুল চাচা তাকে পাসের খবর দিতেই সে কেঁদে-টেদে একটা কাণ্ড করেছে।

পরেরবার অনেক ভালো হবে দেখবি।

আর দেখতে হবে না।

সবাই কি আর ফার্স্ট-সেকেন্ড হয় নাকি রে বোকা ? আমি নিজে তিনবারের বার মেট্রিক পাস করলাম। কিন্তু আইএ-তে আবার ফার্স্ট ডিভিশন!

থাক, আপনাকে আর বকবক করতে হবে না।

বাবা নিজে এসেও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন।

আরে সেকেন্ড ডিভিশন খারাপ নাকি ?

খারাপ হবে কেন ? খুব ভালো, তুমি যাও তো এখন।

নীলুকে আমরা খুব শক্ত মেয়ে হিসেবে জানতাম। এই ব্যাপারটায় যে সে এতটা মন খারাপ করবে ভাবতেও পারিনি। কিছু দিন পরই সে জ্বরে পড়ে গেল। অল্পদিনের জ্বরেই শুকিয়ে-টুকিয়ে অন্যরকম হয়ে গেল। এক রাতে ঘুমুতে এল আমার ঘরে। একা একা তার নাকি ভয় লাগছে। কে যেন বারবার তার জানালার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। আমরা দুজন অনেকদিন পর এক সঙ্গে ঘুমুতে গেলাম। সেতারা শুয়েছে একা একটি খাটে। আমরা দুজন একটিতে। আমি নরম স্বরে বললাম, এত মন খারাপ করছিস কেন ?

জানি না কেন।

তুই তো পড়াশোনাই করিসনি, রেজাল্ট কোত্থেকে ভালো হবে ?

তা ঠিক।

নীলু একটি হাত আমার গায়ের ওপর রেখে বলল, দুজন এবার আলাদা হয়ে যাব। তুই যাবি ঢাকায় আর আমি এখানে কোনো ভাঙা কলেজে।

আমি ঢাকায় যাব না, এইখানে থাকব।

তুই ঢাকায় পড়তে যাবি এটা তো জানা কথা। সেটাই ভালো। তুই এত ভালো ছাত্রী, তোর তো ভালো কলেজেই যাওয়া উচিত।

আমরা দুজন হালকা গলায় নানান কথাবার্তা বলতে লাগলাম। অনেক রাতে শুনলাম বাবা ঘরে ফিরেছেন। গুনগুন করে কী বলছেন। রমজান ভাই রাগী গলায় কী-সব বলছেন। নীলু ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, চল ঘুমিয়ে পড়ি।

প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছি, তখন নীলু বলল, বিলু একটা কথা। জেগে আছিস তো ?

হুঁ।

আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোকে।

কী প্রতিজ্ঞা ?

নীলু চুপ করে রইল। আমি অবাক হয়ে বললাম, কিসের প্রতিজ্ঞা ?

ঢাকায় গিয়ে রকিব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবি না।

এসব কী বলছিস, আমি দেখা করব কেন ?

আর ওর চিঠির জবাব দিবি না।

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নীলু কাঁদতে শুরু করল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, কথা দে আমাকে আমার গা ছুঁয়ে বল।

কী যে কাণ্ড তোর।

আমি নীলুকে জড়িয়ে ধরলাম। এমন বোকা কেন নীলুটা ?

সেদিন আকাশের রঙ ছিল ঘন নীল।

আমরা এমনিতে কখনো আকাশ দেখি না। আমরা আকাশের দিকে তাকাই মন খারাপ হলে। মন বিষণ্ন হলে আকাশও বিষণ্ন হয়। হেমন্তের এই ঝকঝকে সকালে আকাশটা অসম্ভব বিষণ্ন হয়ে গেল। আমি তবু মুখে হাসি টেনে রাখলাম। ভোরবেলা নাশতা খাবার সময় খুব হাসিখুশি থাকতে চেষ্টা করলাম। নজমুল চাচাও আজ আমাদের সঙ্গে নাশতা খেলেন। নীলু বসে রইল পাথরের মতো মুখ করে। বাবা একবার সাবধানে চলাফেরার কথা বললেন।

একা একা কোথাও যাবার দরকার নেই। কোথাও যেতে হলে বন্ধু-বান্ধব কাউকে সঙ্গে নিবি।

নজমুল চাচা বললেন, চিন্তার কিছু নেই, সফদর সাহেব প্রতি শুক্রবারে এসে বাসায় নিয়ে যাবেন। আর ছুটিছাঁটা হলে নিজে ময়মনসিংহে এসে পৌঁছে দেবেন। অতি ভদ্র সজ্জন ব্যক্তি।

আমি তাদের কথায় হ্যাঁ-না কিছুই বললাম না। ঠিক যখন যাবার সময় হলো তখন ইচ্ছে করল চেঁচিয়ে বলি— আমি এইখানেই থাকব। এখানকার কলেজে ভর্তি হব। কিছুই বলা হলো না।

নজমুল চাচা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেন ছাড়তে খুব দেরি করতে লাগল। বাবা প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। নীলু সেতারা কেউ আসে নি। ওরা খুব কাঁদছিল। বাবা বলেছিলেন, তোরা আসিস না। তোরা থাক এখানে। আর এত কান্নাকাটির কী আছে। দুই মাস পরে তো আসছেই।

ট্রেন ছেড়ে দেবার সময় বাবা মনে হলো খুব অবাক হয়ে পড়েছেন। যেন ভাবতে পারেননি ট্রেন একসময় ছেড়ে দেবে। তিনি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলেন। নজমুল চাচা বললেন, আরে করো কী, হাত ছেড়ে দাও। বাবা হাত ছাড়লেন না। যেন শেষ মুহূর্তে তাঁর মনে হলো আমি চলে যাচ্ছি। তিনি ট্রেনের লোকজন, প্লাটফরমের গাদাগাদি ভিড় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ফুঁপিয়ে উঠলেন, আমার আম্মি। আমার রাত্রিমনি। ওরে বেটি টুনটুন।

আমি পাথরের মতো মুখ করে বসে রইলাম। পৃথিবীতে এত কষ্ট কেন থাকে ? কেন এত দুঃখ চারদিকে ? জানালার ওপাশে কী সুন্দর সব দৃশ্য। গাঢ় নীল রঙের ডোবা একটি। তার ওপর সাদা মেঘের ছায়া পড়েছে। কঞ্চি হাতে একটি ছোট্ট ছেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ট্রেনের দিকে। পাট বোঝাই একটি গরুর গাড়ির চাকা

আটকে গেছে। গরুটি ধবধবে সাদা। একসময় নজমুল চাচা বললেন, ছিঃ মা কাঁদে না।

বিলু,

তোর দুটি চিঠিই পেয়েছি। প্রথমটির জবাব সঙ্গে সঙ্গে লিখেছিলাম। রমজান ভাইকে পোস্ট করতে দিয়েছি। ওমা, দুই দিন পরে দেখি তার বাজারের ব্যাগ থেকে চিঠি বেরুল। ভিজে ন্যাতা ন্যাতা। অথচ রমজান ভাই আমাকে বলেছে সে নিজ হাতে চিঠি ফেলেছে। দেখ অবস্থা। তারপর তোমার দু'নম্বর চিঠিটি এল। ভাবলাম রাতে জবাব লিখব। রাত ছাড়া চিঠি লিখতে ভালো লাগে না। কিন্তু রাতে বাবার খুব জ্বর এল। মাথায় পানি ঢালতে হলো, ডাক্তার আনতে হলো। ডাক্তার বলছেন ম্যালেরিয়া। দেশে কি এখন ম্যালেরিয়া আছে নাকি যে ম্যালেরিয়া হবে। ডাক্তারটির বয়স খুব কম, আমার মনে হয় নতুন পাস করেছে। আমার মতো পাস। বইটাই ভালোমতো পড়েনি। আমার সঙ্গে গম্ভীর হয়ে কথা বলছিল।

মিস নীলু, ভয়ের কিছু নেই। আমি আবার এসে দেখে যাব।

আমি হেসে বাঁচি না। মিস নীলু আবার কী! কলেজে ওঠার পর দেখি অনেকেই সম্মান-টম্মান করছে। বিশেষ করে আমাদের কলেজের একজন লজিকের স্যার— নজিবর রহমান ভুঁইয়া। উনি সব সময় আপনি আপনি করছেন। ছাত্রীরা তাঁর নাম দিয়েছে প্রেমকুমার। কারণ তিনি নাকি সব মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করেন। তাঁকে প্রতি বছর পাঁচ ছ'বার হাফসোল খেতে হয়। হাফসোল কী জানিস তো? নাকি তোদের কলেজে এসব কথা বলে না?

যাই হোক নজিবর রহমান স্যার কী করল তোকে বলি। ক্লাসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ নজিবর রহমান স্যারের সঙ্গে দেখা। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, তুমি ফার্স্ট ইয়ারের না?

জি স্যার।

গত ক্লাসে আস নি কেন?

বাবার জ্বর ছিল তাই আসিনি।

লজিকের কতগুলি ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন পড়েয়েছি। মিস করলে পরেরগুলি ধরতে পারবে না।

আমি চুপ করে রইলাম। নজিবর রহমান স্যার গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ মাথা দুলিয়ে বললেন, ঠিক আছে আমার কাছে প্রিপেয়ারড নোট আছে। একবার এসে নিয়ে যেও।

আমি অবশ্যি নোট নিতে যাই নি। গেলেই আমার নাম হয়ে যেত প্রেমকুমারী। হি হি হি। উঁচু ক্লাসের মেয়েদের কাছে শুনেছি তাঁর কাছে ক্লাস নোটের দশ-বারোটা কপি তৈরি থাকে। যাদের সঙ্গে তাঁর প্রেম করার ইচ্ছে হয় তাদের তিনি ডেকে ডেকে দেন। ভদ্রলোক কিন্তু পড়ান খুব ভালো। আমাদের আরেকজন স্যার আছে খুব ভালো পড়ান। তাঁর নাম কি জানিস ? তাঁর নাম 'মুরগির গু'। কী জন্যে বেচারার এই নাম হলো ? অনেকদিন ধরে তাঁর এই নাম চলছে। ছোটখাট মানুষ, খুব পান খান। ক্লাস শুরু করবার আগে ডাস্টার দিয়ে টেবিলে একটা প্রচণ্ড বাড়ি দিয়ে বলেন, নিস্তব্ধতা! ছাত্রীগণ নিস্তব্ধতা হিরন্ময়! প্রথমদিন তো আমি বহু কষ্টে হাসি সামলালাম, কিন্তু পরে দেখি সাংঘাতিক ভালো পড়ান। তাঁর একটা ভালো নাম হওয়া দরকার ছিল।

ক্লাসের অনেক কথা লিখলাম। আরো মজার ব্যাপার আছে, পরে লিখব। একজন আপা আছেন তাঁর নাম 'মিস চাটা'। দারুণ অসভ্য অসভ্য সব গল্প আছে তাঁকে নিয়ে। চিঠিতে লেখা যাবে না।

এবার অন্য খবর বলি। মুন্নির বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে পিডিবির ইঞ্জিনিয়ার। খুব নাকি বড়লোক। আমি অবশ্যি বিয়েতে যাই নি। কারণ আমাকে যেতে বলেনি। মুন্নি ক্লাসের প্রায় সব মেয়েকে বলেছে, আমাকে বলে নি। রকিব ভাই এসেছিলেন ঢাকা থেকে। আমার অবশ্যি ধারণা ছিল আসবেন না। বিয়ের পরদিন আমাদের বাড়িতে এলেন। কখন এসেছেন আমি কিছুই জানি না। কী জন্যে বসার ঘরে গিয়েছি, দেখি তিনি বসে বসে বাবার সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁর গায়ে নীল রঙের স্ট্রাইপ দেয়া একটা শার্ট ছিল। এমন মানিয়েছিল তাঁকে কী বলব।

আমার গায়ে ছিল বোম্বে প্রিন্টের ঐ জংলী শাড়িটা। আমাকে নিশ্চয় ভূতের মতো লাগছিল। কারণ ঐ দিন আমি

চুলও বাঁধিনি, কিছুই করিনি। আকবরের মাকে বলেছিলাম চুল বেঁধে দিতে। সে দিতাছি আপা বলে সেই যে গিয়েছে গিয়েছেই। আর দেখা নেই। আমি গিয়ে দেখি দিব্যি ঘুমাচ্ছে। তারপর আমিও ঘুমাতে গেলাম। এখন চিন্তা করে দেখ অবস্থা। চুল বাঁধা নেই। ঘুমঘুম ফোলা মুখ, পরনে জংলী শাড়ি। কী ভাবলেন উনি কে জানে। আমি তো একদম হতভম্ব হয়ে গেছি। উনি বললেন, তুমি কে নীলু না বিলু?

আর বাবার যা কাণ্ড। বাবা বললেন, সালাম কর নীলু, সালাম কর।

সালাম করব কী। আমি বললাম, আপনি বসুন, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।

উঁহু, আমি বেশিক্ষণ বসতে পারব না।

উনি অবশ্যি অনেকক্ষণ বসলেন। চা'টা খেলেন। যাবার আগে আমাকে দুটো বই দিয়ে গেলেন। একটা হচ্ছে— ঘনাদার গল্প (দেখো না কাণ্ড, ঘনাদার গল্প পড়ার বয়স এখন আছে?) অন্যটি হচ্ছে একটি কবিতার বই, নাম— পালক। আজ আর লিখব না, ঘুম পাচ্ছে।

নীলু

পুনশ্চ তোর সঙ্গে যে রকিব ভাইয়ের দেখা হয়েছিল ঢাকায় এই কথাটি তুই কোনো চিঠিতেই লিখিস নি।

প্রিয় আপা,

আমি তোমাকে চারটি চিঠি দিয়েছি, তুমি মাত্র দুটি চিঠির জবাব দিয়েছ। এরকম করলে আমি আড়ি নেব। তখন মজা টের পাবে। বাবার খুব অসুখ। ডাক্তার বলেছেন ম্যালেরিয়া। খুব দুর্বল হয়ে গেছেন। এখন আর বাইরে যান না। আর বাবা তার প্রেসটা বিক্রি করে দিয়েছেন। কিন্তু কাউকে সেটা বলেননি। নজমুল চাচা এটা শুনে খুব রাগ করেছেন।

আরেকটা খুব খারাপ খবর আছে। আমার গানের স্যারের ছোট ছেলেটা পানিতে ডুবে মরে গেছে। ছেলেটার বয়স সাত। তার নাম দীপন। তুমি তাকে দেখেছিলে। তোমার মনে আছে। তবলা বাজিয়েছিল। তুমি বললে ওমা এইটুকু ছেলে আবার তবলা বাজায়। তোমার কলেজ কবে ছুটি হবে?

সেতারা

প্রিয় মা বিলু,

দোয়া নিও। তোমার বাবার অসুখের সংবাদ পাইয়াছ। এখন কিছুটা সুস্থ, তবে পুরাপুরি সারে নাই। চিন্তার কোনো কারণ নাই। ইতিমধ্যে তোমার লোকাল গার্জেন সফদর সাহেবের একখানি পত্র পাইয়াছি। তুমি নাকি তাঁকে বলেছো—তুমি ছুটির দিনে হোস্টেলেই থাকতে চাও। এটা ঠিক না। সফদর সাহেব অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর কথা শুনিবে। এবং সেই মতো চলিবে।

তোমার বাবার ব্যবসা কিঞ্চিৎ মন্দা যাইতেছে। তিনি খুব সম্ভবত প্রেস বিক্রি করিয়া দিয়াছেন। কাজটা ঠিক হয় নাই। চালু প্রেস বিক্রয় করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি কোনোরূপ চিন্তা করিও না। তোমাদের অন্য অংশটি ভাড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি। দুই একজনের সঙ্গে কথাবার্তা হইয়াছে। যে-কোনো ভাড়াটেকে হুট করিয়া ঢুকানো ঠিক হইবে না, তাই বিলম্ব হইতেছে।

ভালো থাকিও ও ঠিকমতা পড়াশুনা করিও।

তোমার চাচা

নজমুল ইসলাম

নীলু,

তোর চিঠি পেয়েছি আজ বিকেলে।

এখন রাত প্রায় এগারোটা। অনেক রাতে উত্তর লিখতে বসেছি, কারণ আমার রুমমেট কিছু লেখার সময় খুব বিরক্ত করে। ঘাড়ের কাছে মাথা এনে সে চিঠি পড়বে। আমি এতটুকুও পছন্দ করি না, তবু সে এটা করবেই। তার ধারণা আমি কোনো ছেলেকে চিঠি লিখছি। আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।

বাবার অসুখের খবর পেয়ে খুব খারাপ লেগেছে। এতদিনে সেরেছে নিশ্চয়ই। সব জানাবি। নজমুল চাচা লিখেছেন প্রেস বিক্রি হয়ে গেছে। শুনে যা ভয় লাগছে। এখন আমাদের চলবে কী করে ? আজ সমস্ত দিন আমার এইসব ভেবে খুব খারাপ লেগেছে। তার উপর আজ বায়োলজি ল্যাব ছিল। আমাদের ডেমনেসট্রেটর একটা ব্যাঙ এনে ক্লোরফরমড

করলেন। আমরা শুধু দূর থেকে দেখলাম। তারপর উনি সেটা কচ করে কেটে ফেললেন। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডটা তখনো লাফাচ্ছে। কী যে খারাপ লেগেছে।

বিকেলে হোস্টেলে ফিরে এসেও বমি বমি লাগছিল। রাতে ভাত খাইনি। আমার রুমমেট তখন ফ্রেঞ্চ টোস্ট করে খাওয়াল। ওর একটা কেরোসিন কুকার আছে। খাটের নিচে লুকিয়ে রাখে। কারণ হলে এইসব এলাউ করে না। কিন্তু বেচারির খুব রান্নার শখ। কয়েকদিন আগে গাজরের হালুয়া বানাল। এটা বানান যে এত সহজ তা জানতাম না। খেতেও খুব ভালো হয়েছিল। মেয়েটির নাম মালা। রাজশাহী থেকে এসেছে। অনেক রকম রান্না জানে। দারুণ স্মার্ট মেয়ে। হোস্টেল সুপারের পারমিশন না নিয়েই সে দু'দিন তার এক আত্মীয় বাড়ি থেকে এসেছে।

এখানে নিয়মের খুব কড়াকড়ি। তবে সিনিয়র মেয়েদের বেলায় এতটা নয়। সিনিয়র মেয়েরা দোতলায় থাকে। ওদের সঙ্গে আমাদের তেমন যোগ নেই। ওরা অনেক রকম কাণ্ডকারখানা করে। গত শুক্রবারে কী হয়েছে জানিস ? রাত একটায় হঠাৎ শুনি দারুণ হৈচৈ হচ্ছে। পরে শোনা গেল, দোতলার ক'টি মেয়ে প্ল্যানচেট করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মা নিয়ে এসেছে। সে আত্মা আবার কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। হোস্টেল সুপারটুপার এলেন। হুলস্থূল কাণ্ড।

তুই লিখেছিস তোর রকিব ভাইয়ের সঙ্গে যে দেখা হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু লিখিনি। ইচ্ছে করেই লিখিনি। তুই আবার কী ভাবতে কী ভাববি। যাক এখন লিখছি। সেদিন কেমিস্ট্রি প্রাকটিক্যাল খাতা কিনতে ন্যুমার্কেটে গিয়েছি। আমার সঙ্গে আছে আমার রুমমেট মালা। সে চুল বাঁধার রাবার ব্যান্ড আর টিপ কিনবে। কেনাকাটা শেষ হবার পর আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ মালা বলল— দ্যাখ, ঐ ভদ্রলোক তখন থেকে আমাদের পিছে পিছে আসছে আর মিচকি মিচকি হাসছে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। আমাকে তাকাতে দেখেই সে বলল— তুমি নীলু না বিলু ?

আমি তখনো চিনতে পারিনি। তখন ভদ্রলোক রাগী গলায় বললেন— চিঠির জবাব দাওনি কেন ? তখন চিনলাম। খুব

অবাক হয়েছিলাম। এ রকম দাড়িগোঁফ কল্পনাও করিনি। তারপর উনি আমাদের আইসক্রিম খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। মালা কিছুতেই যাবে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্যি গেল। তিনি সারাক্ষণই তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। তার কী ধারণা জানিস ? তার ধারণা— না বলব না।

শোন নীলু একটা কথা— তুই ঐ ভদ্রলোককে বলবি উনি যেন দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেলেন। যা জঘন্য লাগছিল ওঁকে।

এই যা— একটা বেজে যাচ্ছে, শুয়ে পড়ি। কাল পরশু আবার চিঠি লিখব।

বিলু

মা বিলু,

দোয়া নিও। নীলুর নিকট হইতে শুনিলাম তোমাদের দোতলার মেয়েরা প্ল্যানচেটে আত্মা আনিয়াছে। উহাদের সহিত কোনোরূপ সম্পর্ক রাখিবে না। সব কিছু নিয়া ছেলেখেলা ভালো না।

তোমাদের উপরের তলায় নতুন ভাড়াটে আসিয়াছে। অতি সজ্জন ভদ্রলোক। স্বামী-স্ত্রী ও একটি ছেলে। ছেলেটি ঈষৎ দুরন্ত।

তোমার বাবার অসুখ অল্প বাড়িয়াছে। তবে চিন্তার কারণ নাই। শরীরের ওপর অযত্ন ও অবহেলার এই ফল। কিছুদিন ভুগাইবে। আর সব সংবাদ ভালো। জনৈক লোক মারফত আমি মুক্তাগাছার কিছু মণ্ডা পাঠাইলাম। বন্ধু-বান্ধব নিয়া খাইও। আর তোমাদের হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টের নিকট একটি পৃথক পত্র দিলাম। পত্রটি তাহাকে পৌঁছাইও এবং আমার সালাম দিও। ইতি।

তোমার চাচা
নজমুল ইসলাম

হোস্টেল সুপার।
জনাবা,

সবিনয় নিবেদন এই যে, জানিতে পারিলাম আপনার হোস্টেলের কতিপয় ছাত্রী প্ল্যানচেট না কী যেন করিতেছে। এইসব বিষয় নিয়া ঠাট্টা-তামাশা শুভ নয়। ছাত্রীর অভিভাবক

হিসাবে আমি চিন্তাযুক্ত আছি। আপনি যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া চিন্তামুক্ত করিবেন। আপনার নিকট এই আমার বিনীত প্রার্থনা। ইতি

নজমুল ইসলাম

আপা,

তুমি নীলু আপাকে এত লম্বা লিখেছ, আমাকে লেখোনি কেন ? আমি খুব রাগ করেছি। আর কোনোদিন তোমাকে চিঠি লিখব না। আল্লাহর কসম।

বাবার অসুখ খুব বেড়েছে। আর আকবরের মার হাতের আঙুলের নিচে ঘা হয়েছে। নজমুল চাচা বলেছেন বেশি পানি ঘাঁটাঘাঁটির জন্যে এটা হয়েছে।

দোতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছে করিম সাহেব। ভদ্রলোক খুব মোটা। তার ছেলেটি দারুণ দুষ্ট। এবং খুব ফাজিল। সে আমাদের কাচের জগটা ভেঙে ফেলেছে। ভেঙে আবার দাঁত বের করে হাসে। এমন ফাজিল।

সেতারা

পুনশ্চ আপা তোমরা যে রবীন্দ্রনাথের আত্মা এনেছ সে কী করেছে ? আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ে বলেছে সেও নাকি প্ল্যানচেট করতে পারে। আমার বিশ্বাস হয় না, সে খুব গুল ছাড়ে। এই জন্যে আমরা তার নাম দিয়েছি গুল বাহার।

প্রিয় বিলু,

তোদের হোস্টেলের মেয়েরা ভূত এনেছে শুনে নজমুল চাচা খুব রাগ করেছেন। তিনি বলেছেন তিনি হোস্টেল সুপার এবং প্রিন্সিপ্যালকে চিঠি লিখবেন।

আমাদের দোতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম নীনা। ভদ্রমহিলা নাকি-স্বরে কথা বলেন। প্রথম দিন বাড়িতে এসে বললেন— বাঁড়ি ত খুঁব বঁড়। তঁবে চাঁরদিকে খুঁব জঁঙ্গলা। আমি বহু কষ্টে হাসি সামলেছি। তবে ভদ্রমহিলা খুব ভালো। বাবার জন্যে স্যুপ করে পাঠান। এবং খুব খোঁজখবর করেন। তবে ভদ্রমহিলার শুচিবায়ু আছে। রোজ তিন-চারবার ঘর ধোয়া-মোছা করেন।

বিলু, তোকে এখন একটা কথা বলি— আমি রকিব ভাইয়ের একটা খুব চমৎকার চিঠি পেয়েছি। এত সুন্দর চিঠি যে আমি খুব কাঁদলাম। কত লক্ষবার যে পড়লাম সেই চিঠি। আমার কী ইচ্ছে করে জানিস ? ইচ্ছে করে একদিন হুট করে ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে খুব চমকে দেই। তারপর তিনি যখন বলবেন— তুমি কে, নীলু না বিলু ? আমি তখন বলব, আমি বিলু। এবং অনেকক্ষণ বিলু হিসেবে কথাবার্তা বলার পর হঠাৎ বলব, আমি কিন্তু নীলু। ভদ্রলোকের মুখের অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখ।

বিলু, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কী করে আমার পরিচয় হলো তোকে বলি। মুন্নিদের বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। অপলারাও গিয়েছে। মুন্নি বলল, আমার এক ভাই এসেছেন, ইউনিভার্সিটির টিচার। অংকের টিচার, যা গম্ভীর। আমরা আড়াল থেকে দেখলাম সত্যি গম্ভীর। মুন্নি তখন করল কী জানিস ? আমাকে বলল— এই নীলু, তুই যদি আমার ঐ ভাইয়ের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে খেতে পারিস তো বুঝব তোর সাহস। আমি বললাম— আমি শুধু শুধু তাঁর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে খাব কেন ?

তুই তো টেনেছিস সিগারেট। স্কুলের বাথরুমে। এখন দেখি তোর সাহস। যদি সিগারেট চাইতে পারিস তাহলে প্রমাণ হবে আমাদের ক্লাসে তোর চেয়ে সাহসী মেয়ে নেই।

আমি ইতস্তত করে ঢুকে পড়লাম ভদ্রলোকের ঘরে। কোনোমতে বললাম— মুন্নির সঙ্গে আমার একটা বাজি হয়েছে। সেই বাজিতে আমি জিতব, যদি আপনি আমাকে একটা সিগারেট দেন।

ভদ্রলোক কিছুই বুঝতে পারলেন না, তবে একটা সিগারেট বের করে দিলেন। আমি বললাম, আপনি রাগ করবেন না। সিগারেটটা আমাকে ধরাতে হবে। ভদ্রলোক দিয়াশলাই বের করে দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কী ?

নীলু।

ও নীলু। তোমার কথা বলেছে আমাকে মুন্নি।

কী বলেছে ?

বলেছে যে তুমি খুব তেজি মেয়ে।

আরো অনেক কিছু বলেছে নিশ্চয়ই।

ভদ্রলোক তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি বললাম, আর কিছু বলেনি মুন্নি ?

আর কী বলবে ?

বলেনি আমার মা পালিয়ে গেছে ? আমাদের সম্পর্কে যখন কেউ কিছু বলে সেটাই সবার আগে বলে।

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, মুন্নি বলেনি সে সব ?

বলেছে।

আমি দেখলাম জানালার আড়াল থেকে মুন্নি ও অপলা অবাক হয়ে দেখছে আমার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

আমি বললাম, আজ উঠি। আপনি আমার ওপর রাগ করেননি তো।

রাগ করব কেন ?

আপনার সামনে সিগারেট টানলাম যে!

না, রাগ করি নি। মাঝে মাঝে এই সব ছেলেমানুষি দেখতে ভালোই লাগে।

আমি উঠে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক বললেন— নীলু বসো, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভালো লাগছে। প্লিজ বসো। আমি অবাক হয়েই বসলাম। আর আমার কী যে ভালো লাগল। এখনো মনে আছে সে রাতে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারিনি। শেষ রাতের দিকে ঘুম এল এবং আমি ঐ ভদ্রলোককে স্বপ্নে দেখলাম। যেন আমি চা বানাচ্ছি, তিনি এসে বললেন— নীলু, আমার আজ ফিরতে দেরি হবে, তুমি খেয়ে নিও। অপেক্ষা করবার দরকার নেই। আমি রাগের ভঙ্গি করে বললাম— না, আজ কোথাও যেতে পারবে না। আজ আমরা বাগানে হাঁটব।

অদ্ভুত মিষ্টি স্বপ্নের ভেতরই আমি কেঁদে বুক ভাসিয়েছি। কাউকে এই স্বপ্নের কথা বলতে পারিনি। তোকে বলার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সাহস হয় নি। যদি তুই হাসাহাসি করিস।

তোকে আমি অনেক কথা বলতে চাই বিলু। ছুটি হতে তো অনেক দেরি। একবার চলে আয় না। তাছাড়া এমনিতেও

তোর আসা উচিত। বাবার শরীর খুব খারাপ, কেউ তোকে জানাচ্ছে না। কাল রাতে আমি ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন, কে রেনু ? আমি বললাম— বাবা আমি নীলু। বাবা কেমন চোখে তাকালেন আমার দিকে, তারপর বললেন— নীলু, তোর মা বোধহয় এসেছে। বসতে-টসতে দে। পুরনো কথা মনে রেখে লাভ নেই।

বিলু চলে আয়।

তোর
নীলু

বাড়ি ফিরে অবাক হলাম।

সব কিছুই অন্যরকম লাগছে। চারদিকে কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার। সব কিছুই অন্যরকম হয়ে গেছে। সেতারাকেও মনে হলো এই তিন মাসে অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। সবচে’ বদলেছেন বাবা। কী যে খারাপ হয়েছে তাঁর স্বাস্থ্য। চোখ হলুদ। মাথার সামনের দিকের চুল সব পড়ে গেছে। আমি তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকতেই তিনি বললেন, কে, রেনু ?

আমি অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, বাবা আমাকে চিনতে পারছেন না ?

চিনতে পারব না কেন ? কখন এসেছিস ?

এই তো কিছুক্ষণ আগে।

বস মা আমার কাছে।

বাবা তাঁর রোগা একটা হাত আমার কোলে তুলে দিলেন।

তুমি আমাকে একটা চিঠিও লেখোনি বাবা।

শরীরটা খারাপ মা। খুব খারাপ।

ঠিক তখন নীলু চা নিয়ে ঢুকল। বাবা মাথা তুলে বললেন, কে রেনু ?

নীলু অত্যন্ত যত্নে বাবাকে বালিশে হেলান দিয়ে বসাল। পিরিচে ঢেলে ঢেলে চা খাওয়াল। নীলু দেখি অনেক কাজ শিখেছে। গিন্নি গিন্নি ভাব।

সে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ছুটোছুটি করে অনেক কাজ করছে। এক ফাঁকে বলল, সংসারের হাল ধরেছি।

তাই দেখছি।

কী যে ঝামেলা গেছে তুই তো জানিস না। তোকে কিছু জানান হয়নি।

তা জানাবি কেন, আমি কে ?

তাও ঠিক।

নীলু হাসল।

আমি বললাম— তুই খুব সুন্দর হয়ে গেছিস নীলু। নীলু কিছু বলল না। অন্য সময় হলে সে কিছু-একটা ঠাট্টার কথা বলত। আজ দেখলাম লজ্জা পাচ্ছে।

নীলু তুই কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস।

অন্যরকম মানে কী রকম?

তোর মধ্যে কেমন একটা মা মা ভাব চলে এসেছে।

নীলু, এবারও লজ্জিত ভঙ্গিতে আবার হাসল। সত্যি সত্যি সে বদলে গেছে। কিন্তু এই নীলুকেও ভালো লাগছে। আমি মৃদু স্বরে বললাম, আজ রাতে আমরা দুজন এক সঙ্গে শোব, কেমন নীলু?

ঠিক আছে।

সারারাত গল্প করব।

নীলু হাসল। ছোট বোনদের পাগলামি কথাবার্তা শুনে বড় বোনরা যেমন প্রশ্রয়ের হাসি হাসে সে রকম হাসি। ওরা আমার ঘরটি ঠিক আগের মতো করে সাজিয়ে রেখেছে। টেবিলের ওপর বইপত্র যা ছিল সব সে রকমই আছে। একটা বাজারের লিস্ট করেছিলাম, সেই লিস্টটা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রেখেছে।

আমার বিছানায় এখন কে শোয় নীলু? সেতারা?

হুঁ সেতারা বুঝি সে রকম? ও এখনো আমার সঙ্গে ঘুমায়। আরো অনেক মজার ব্যাপার আছে সেতারার।

সেতারা বলল, ভালো হবে না আপা।

আমি বললাম, কী ব্যাপার?

সেতারাকে কে যেন প্রেমপত্র লিখেছে। রুল টানা কাগজে।

নীলু খিলখিল করে হেসে উঠল। কে বলবে এই বাড়িতে কোনো দুঃখ-কষ্ট আছে?

নীলু বলল, নজমুল চাচা তাঁর মেয়ের কাছে যাচ্ছেন জানিস?

নাতো।

সামনের মাসের মাঝামাঝি যাবেন। ওর মেয়ের কী যেন একটা অপারেশন হবে। গলাব্লাডার না কী যেন, ঠিক জানি না। মেয়ে বাবার জন্যে টিকিট পাঠিয়েছেন।

নজমুল চাচা নিশ্চয়ই খুব খুশি?

না, খুব না। এত দূর একা একা যেতে ভয় পাচ্ছেন।

ভয়ের কী?

কী জানি চাচার হেন তেন কত কথা, আসলে যাবার ইচ্ছা নেই।

যাচ্ছেন তো ?

তা যাচ্ছেন।

নজমুল চাচার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। নজমুল চাচা আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে লাগলেন। যেন আমি তাঁর হারিয়ে-যাওয়া একটি মেয়ে, কোনোদিন ফিরে পাবেন ভাবেন নি, হঠাৎ ফিরে পেয়েছেন। তাঁর কাণ্ড দেখে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নীলু হাসতে লাগল। চাচা রাগী গলায় ধমক দিলেন, হাসছিস কেন ?

নীলু মুখ টিপে বলল, এম্নি হাসছি। কাঁদলে দোষ নেই, হাসলে দোষ।

তুই নিচে যা তো নীলু।

ঠিক আছে যাচ্ছি। কিন্তু বিলু ভেবে যাকে জড়িয়ে ধরে কাদা হচ্ছে সে কিন্তু বিলু নয়। আমি বিলু।

নজমুল চাচা হকচকিয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে লাগলেন। তাঁর মনে সন্দেহ ঢুকে গেল।

তুই কে ? নীলু না বিলু ?

আমি বিলু।

সত্যি করে বল।

সত্যি বলছি।

না, তুই নীলু। বড় ফাজিল হয়েছিস, যা বিলুকে পাঠিয়ে দে। আমি হাসতে হাসতে নিচে নেমে গেলাম। বাড়িতে এসে বড় ভালো লাগছে।

দোতলার নতুন ভাড়াটেদের সঙ্গেও দেখা হলো। নীলু বলেছিল নাকি-স্বরে কথা বলেন। কোথায় কী দিব্যি ভালো মানুষের মতো কথাবার্তা। নীলুটা এমন বানাতে পারে। ভদ্রমহিলাকে আমার বেশ পছন্দ হলো। তবে একটু কথা বেশি বলেন। আমার সঙ্গে দু'তিন মিনিট কথা হলো, এর মধ্যে হড়বড় করে একশ' গণ্ডা কথা বলে ফেললেন। তবে যে সব মেয়েরা বেশি কথা বলে ওদের মনে কোনো ঘোরপ্যাঁচ থাকে না। এইটা খুব সত্যি। বেশি কথা বলা মেয়েরা খুব দিলখোলা হয়।

সমস্ত দিন আমি অন্য একধরনের ভালো লাগা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দুপুরে নীলু আমাকে বাগানে নিয়ে গেল। পেয়ারা গাছে নাকি ডাঁসা পেয়ারা হয়েছে। খুব মিষ্টি।

বাগান পরিষ্কার করেছে কে ?

দোতলার ঐ ভদ্রমহিলা করিয়েছেন। এখন ভালো লাগছে না ?

হুঁ। চমৎকার লাগছে।

ঐ ভদ্রমহিলা আর তার হ্যাসবেন্ড প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা বাগানে বসে চা খান।

একদিন দেখি হাত ধরাধরি করে হাঁটছেন। খুব রোমান্টিক।

আমি ঘাসের ওপর বসতে বসতে বললাম, তোর রকিব ভাই আর চিঠি-ফিঠি লেখে না?

নীলু লাল হয়ে বলল, লেখে মাঝে মাঝে।

কী লেখেন?

এইসব আজেবাজে তেমন কিছু না।

তুই নিশ্চয়ই খুব লিখিস?

নীলু জবাব দিল না।

কি রে, লিখিস না তুই?

লিখি মাঝে মাঝে।

তুই কী লিখিস নীলু?

নীলু চুপ করে রইল।

বল না?

যা মনে আসে তাই লিখি। বাবার কথা লিখি, মার কথা লিখি। তোর কথা সেতারার কথা সবার কথা লিখি।

লিখতে খুব ভালো লাগে?

হুঁ।

আমি একটি ছোট্ট নিশ্বাস গোপন করে হালকা স্বরে বললাম, তোদের বিয়ে হলে বেশ মানাবে। দুজনেই চিঠি লেখার ওস্তাদ।

নীলু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। হয়তো তার চোখে পানি আসছে। চাচ্ছে না আমি দেখে ফেলি।

সন্ধ্যাবেলা আমরা তিন বোন নদীর পাড়ে হাঁটতে গেলাম। মা যখন ছিলেন তখন আমরা প্রায়ই হাঁটতে আসতাম। প্রায় মাইলখানিক হাঁটা হয়ে যেত। একসময় ক্লান্তিতে পা ভারী হয়ে আসত, তবু মায়ের হাঁটার শেষ নেই।

নীলু বলত, আর পারব না। ক্ষমা চাই। আমি এখানে বসে থাকব, তোমরা যাও। মা বলতেন, অল্প কিছুদূর যাব। সামনেই নদীটা খুব সুন্দর। একই রকম নদী। একই দৃশ্য দু'পাশে। তবু কিছু কিছু জায়গায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলতেন, আহ্ কী সুন্দর! তেমন বিশেষ সৌন্দর্যের কিছু আমরা দেখতে পেতাম না। কিন্তু মা'র মুগ্ধ ভাব আমাদেরও স্পর্শ করত। নীলু হাই তুলে বলত, মন্দ না, ভালোই। মা চলে যাবার পর আমরা আর নদীর কাছে আসিনি। না, কথাটা ঠিক না। বাবার সঙ্গে এসেছিলাম একদিন। গত শীতের আগের শীতে বাবার হঠাৎ শখ হলো আমাদের

নিয়ে বেড়াবেন। খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যাব। নদীর পাড়ে বসে চা খাব, কী বলিস ? আমরা কেউ তেমন উৎসাহ দেখালাম না। শুধু সেতারা খুব উৎসাহ দেখাতে লাগল।

প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা বেড়াতে বের হলাম। বাবার কাঁধে ফ্লাস্ক। আমরা তিন বোন হাত ধরাধরি করে তাঁর পিছু পিছু যাচ্ছি। কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। দেখার মতো কিছুই নেই। নদীটিও শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। বাবার উৎসাহ মিইয়ে এসেছে। মৃদু স্বরে বললেন, ফিরে যাবি নাকি ? নীলু বলল, কোথাও বসে চা শেষ করি। এত কষ্ট করে ফ্লাস্কটা আনলে। কোথাও বসার মতো জায়গা পাওয়া গেল না। সব শিশিরে ভিজে আছে। বাবা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। সেই আমাদের শেষবারের মতো যাওয়া।

বাবা সুস্থ থাকলে বাবাকে নিয়ে আসা যেত। তিনি আমাদের তিন বোনকে বেরুতে দেখে আগ্রহ নিয়ে বলেছিলেন, কোথায় যাচ্ছিস তোরা ? সেতারা বলেছে, নদীর পাড়ে হাঁটতে যাচ্ছি বাবা। তিনি ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললেন, ভালো, খুব ভালো।

বেশিক্ষণ থাকব না। যাব আর আসব।

যতক্ষণ ইচ্ছা থাকিস মা। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আমি ভালোই আছি। খুব ভালো।

আমরা হাঁটছি নিঃশব্দে। অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। দু'একজন বুড়োমতো ভদ্রলোক সেতারাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভালো আছ ?

নীলু বলল, সেতারাকে সবাই চেনে। ইশ আগে যদি মন দিয়ে গানটা শিখতাম।

আমরা হাঁটতে হাঁটতে শহরের শেষ প্রান্তে চলে এলাম প্রায়। সেখানে প্রকাণ্ড একটা ঝাঁকড়া রেন্টি গাছ। তার শিকড় নেমে গেছে নদীর দিকে। কয়েকজন কলেজের ছেলে-টেলে হবে গাছের গুঁড়ির ওপর বসে সিগারেট টানছিল। ওরা আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়াল। একজন এগিয়ে এসে বলল, আপনারা বসবেন ?

নাহ্।

বসুন না একটু আমাদের সঙ্গে। বসুন।

সেতারা বলল, কিন্তু আপনারা গান গাইতে বলতে পারবেন না।

সব ক'টি ছেলে একসঙ্গে হেসে উঠল। আমরা তিন বোন পাশাপাশি বসলাম। ছেলেগুলি বসল আমাদের সামনে।

নীলু বলল, আপনারা রোজ এখানে আসেন ? জায়গাটা খুব সুন্দর।

ছেলেগুলি কোনো উত্তর দিল না।

সেতারা বলল, সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাড়ি যাওয়ার দরকার।

আমরা আপনাদের পৌঁছে দেব। আমরা 'উত্তর দিঘির' পাশ দিয়েই রোজ যাই।

আমরা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। ছেলেগুলি সেতারাকে গান গাইতে বলল না। কিন্তু সেতারা নিজ থেকেই গুনগুন করতে শুরু করল। খোলা মাঠ। অদূরেই শীর্ণকায় ব্রহ্মপুত্র। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাখিরা ডানা ঝাঁপটাচ্ছে গাছে গাছে। এর মধ্যে সেতারার কিন্নর কণ্ঠ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল—

'চাহিতে যেমন আগের দিনে
তেমনি মদির চোখে চাহিও
যদি গো সেদিন চোখে আসে জল
লুকাতে সে জল করিও না ছল...'

আমাদের তিন বোনের চোখ ভিজে উঠল। আমরা কতগুলি অপরিচিত ছেলেকে সামনে বসিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। কান্নার মতো গভীর তো কিছু নেই। একজনের দুঃখ অন্যজনকে স্পর্শ করে না। কিন্তু একজনের চোখের জল অন্যকে স্পর্শ করে। ছেলেগুলি দেখলাম একে একে মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে তাকাচ্ছে। পুরুষরা তাদের চোখের জল মেয়েদের দেখাতে চায় না।

একটি ছেলে কোমল স্বরে বলল, আরেকটা গাইবেন ?

কোন অলৌকিক জগৎ থেকে সেতারার গান আসে ? বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে শুনলাম সে গাইছে, নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি জল।

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা মিলিয়ে এল। ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে উড়ে আসতে লাগল শীতল হাওয়া। অন্ধকার ঝোপগুলিতে চিকমিক করতে লাগল জোনাকি। ছেলেগুলি আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সেতারা বলল, ভেতরে আসবেন ?

জি না, জি না।

কিন্তু ওরা চলেও গেল না। গেটের বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

একজন মৃদু স্বরে বলল, আপনার বাবার শরীর কি এখন ভালো ?

নীলু বলল, একটু ভালো।

কিন্তু বাবার শরীর ভালো নয়। আমি জানি বাবা মারা যাবেন খুব শিগগিরই। মৃত্যু টের পাওয়া যায়। তার পদশব্দ ক্ষীণ কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বাবা মারা যাবার পরপরই আমরা একা হয়ে যাব। কেউ কি তখন এগিয়ে আসবে আমাদের কাছে ? একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে রকিব ভাই হাসিমুখে বলবেন— কে বিলু আর কে নীলু ? গাঢ় ভালোবাসার সুবিশাল বাহু প্রসারিত করবেন আমাদের দিকে ? হয়তো করবেন, হয়তো করবেন না। এখানে কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না।

বসবার ঘরে বাতি জ্বলছিল। আমরা ঘরে ঢুকেই দেখলাম আমাদের লাল রঙের সোফাটিতে মা বসে আছেন। কেমন অদ্ভুত একটি শান্ত বিষণ্ন ভঙ্গি। মা মাথা নিচু করে বললেন, তোমাদের বাবাকে দেখতে এলাম। নজমুল সাহেব টেলিগ্রাম করেছিলেন।

মার পরনে সাদার উপর নীল নকশার একটা শাড়ি। মাথায় আঁচল দিয়ে চুপচাপ বসে আছে। বয়সের ছাপ পড়েছে চোখেমুখে। কপালের কাছে এক গোছ রুপালি চুল। তবুও কী চমৎকারই না লাগছে তাকে।

মা বললেন, তোমরা কেমন আছ ?

কেউ কোনো জবাব দিলাম না। মা কি আমাদের তুমি করে বলতেন না তুই করে বলতেন কিছুতেই মনে পড়ল না।

সবাই অনেক বড় হয়ে গেছ। এবং খুব সুন্দর হয়েছো সবাই। বসো। কথা বলি তোমাদের সঙ্গে।

আমরা বসলাম।

মা বললেন, তোমরা নাকি নদীর পাড়ে গিয়েছিলে ?

আমরা সে কথার জবাব দিলাম না।

মা থেমে থেমে বললেন, কয়েকদিন আগে সেতারার গান শুনলাম রেডিওতে। বিশ্বাসই হয়নি আমার একটি মেয়ে এত সুন্দর গান গায়।

সেতারা তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। কিছু-একটা দেখতে চেষ্টা করছে মা'র মধ্যে। নিজের মনের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে হয়তো।

তুমি মা খুব নাম করবে। দেশের মানুষের ভালোবাসা তুমি পাবে— এখনই অবশ্যি পেয়েছ, আরো পাবে।

নীলু বলল, আপনি কখন এসেছেন ?

কিছুক্ষণ আগে এসেছি।

বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

মা ইতস্তত করে বললেন, না।

যান, বাবার কাছে যান। উনি আপনার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে আছেন।

মা নড়লেন না। বসেই রইলেন।

আমি বললাম, আসুন, আপনাকে বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।

বাবার ঘরে ঢোকা মাত্র বাবা তার অভ্যাসমতো বললেন, কে, রেনু ?

মা দরজার পাশে থমকে দাঁড়াল। বাবা বললেন, ভালো আছ রেনু ?

সেই রাতে বাবার অসুখ বেড়ে গেল। বুকে হাত দিয়ে বহু কষ্টে টেনে টেনে শ্বাস নিতে লাগলেন। কথাবার্তা জড়িয়ে গেল। তবু একটু কোনো শব্দ হতেই মাথা তুলে

বলতে লাগলেন, কে, রেনু ?

মা তাঁর এত পাশে দাঁড়িয়ে কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না।

আমি চলে এলাম আমার ঘরে। নীলুর বিছানার ওপর দেখি একটি নীল খাম পড়ে আছে। রকিব ভাইয়ের লেখা চিঠি নিশ্চয়ই। নীলু হয়তো আজই পেয়েছে। রেখে দিয়েছে গভীর রাতে একা একা পড়বার জন্যে।

চারদিকে সুনসান নীরবতা। আমি বসে আছি চুপচাপ। আমার পাশেই ভালোবাসার একটি নীল চিঠি। আমি হাত বাড়িয়ে চিঠিটি স্পর্শ করলাম। ঠিক তখনি নিচ থেকে একটি তীব্র ও তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ ভেসে এল।

মা কাঁদছেন।

ছোটগল্প

আনন্দ বেদনার কাব্য

আনন্দ বেদনার কাব্য

বইটির নাম 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'।

প্রচ্ছদে একটি মেয়ের মুখের ছবি। মেয়েটি কাঁদছে। তার মুখের পাশে একটি গ্লোব। একটি বিকটদর্শন নরকঙ্কাল গ্লোবটি বাঁ হাতে জড়িয়ে ধরে আছে। কঙ্কালটির ডান হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা। যথেষ্ট জটিলতা। পৃথিবীর রিক্তশ্রী ফুটিয়ে তোলার আয়োজনে কোনো ত্রুটি নেই।

এ ধরনের প্রচ্ছদচিত্রের বইগুলোর পাতা সাধারণত উল্টানো হয় না। তবুও অভ্যাসবশেই পাতা উল্টালাম। এবং একসময় দেখি গ্রন্থকারের লেখা ভূমিকাটি পড়তে শুরু করেছি। শুরু না করলেই বোধহয় ভালো ছিল। ভূমিকাটিতে খুব মন খারাপ করা একটি ব্যাপার আছে। আমার নিজের যথেষ্ট দুঃখ-কষ্ট আছে, অন্যের দুঃখ-কষ্ট আর ছুঁতে ইচ্ছে করে না। গ্রন্থকার লিখেছেন, "দীর্ঘ পাঁচ বছর পূর্বে 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করি। সেই সময় আমার অতি আদরের জ্যেষ্ঠ কন্যা মোসাম্মৎ নুরুন্নাহার খানম (বেনু) উক্ত গ্রন্থের জন্যে প্রচ্ছদচিত্রটি অঙ্কন করে। অর্থাভাবে তখন গ্রন্থটি প্রকাশ করিতে পারি নাই। আজ প্রকাশিত হইল। কিন্তু হায়, আমার বেনু মা দেখিতে পাইল না।"

বইটির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রচ্ছদশিল্পীর সামান্য একটু পরিচয়ও আছে। সেখানে লেখা— প্রচ্ছদশিল্পী মোসাম্মৎ নুরুন্নাহার খানম। দশম শ্রেণী, বিজ্ঞান বিভাগ।

মফস্বল থেকে প্রকাশিত বইটি হঠাৎ করেই অসামান্য হয়ে উঠল আমার কাছে। এই বইটি ঘিরে দরিদ্র পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবিটি চোখের সামনে দেখতে পেলাম। লম্বা বেণির দশম শ্রেণীর কালোমতো রোগা একটি মেয়ে যেন গভীর ভালোবাসায় বাবার বইয়ের জন্যে রাত জেগে প্রচ্ছদ আঁকছে। আঁকা হবার পর বাবাকে দেখাল সেটি। পৃথিবীর সব বাবাদের মতো এই বাবাও মেয়ের শিল্পকর্ম দেখে অভিভূত হয়ে গেলেন। রাতে সবাই খেতে বসেছে। দরিদ্র আয়োজন। কিন্তু সবার মুখ হাসি-হাসি। বাবা বললেন, পাস করলে আমার বেনু-মাকে আমি আর্ট কলেজে দেবো। বেনু বেচারি লজ্জায় মরে যায়। ভাত মাখতে মাখতে বলল, ধুর ছাই, মোটেও ভালো হয়নি। বাবা রেগে গেলেন, ভালো হয়নি মানে? আঁকুক দেখি কেউ এরকম একটা ছবি।

বই অবশ্যি বাবা প্রকাশ করতে পারলেন না। কে ছাপবে এরকম বই? দু'একজন প্রকাশক বলেও ফেলল, এসব পদ্যের বই কি আজকাল চলেরে ভাই? এসব নিজের পয়সায় ছাপতে হয়। টাকা জমান, জমিয়ে নিজেই ছাপান।

প্রয়োজনীয় টাকা জোগাড় করতে বাবার দীর্ঘ পাঁচ বছর লাগল। হয়তো স্ত্রীর কানের দুলজোড়া বিক্রি করতে হলো। সেবছর ঈদে বাচ্চারা কেউ কাপড় নিল না। তিনি খুঁজে পেতে সস্তার একটি প্রেস বের করলেন, যার বেশির ভাগ টাইপই ভাঙা। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। কারণ প্রেসের মালিক সালাম সাহেব, গ্রন্থকারের কবিতার একজন ভক্ত। গ্রন্থকার লিখেছেন, 'টাউন প্রেসের স্বত্বাধিকারী জনাব আবদুস সালাম সাহেব আমার এই গ্রন্থখানি প্রকাশের ব্যাপারে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন। এই কাব্যানুরাগী বন্ধুবৎসল মানুষটির সহযোগিতা ব্যতীত এই গ্রন্থ আপনাদের হাতে তুলিয়া দেওয়া আমার সাধ্যাতীত ছিল। জনাব আবদুস সালাম সাহেবকে ধন্যবাদ দিয়া ছোট করার ধৃষ্টতা আমার নাই।'

ভূমিকা থেকে বোঝা যাচ্ছে কবি সন্ধ্যাবেলায় প্রুফ দেখতে যখন যেতেন তখন সালাম সাহেব হাসিমুখে বলতেন, এই যে কবি সাহেব, আসেন, আপনার সেকেন্ড প্রুফ রেডি। কই রে, কবি সাহেবের জন্যে চা আন। চা খেতে খেতে বললেন, প্রুফে চোখ বুলাতে বুলাতে আপনার একটা কবিতা পড়েই ফেললাম। বেশ লিখেছেন।

কোন কবিতাটির কথা বলছেন ?

ঐ যে কী যেন বলে, ইয়ের উপর যেটা লিখলেন। বৃষ্টি বাদলার কথা আছে যেটায়।

ও, 'নব-বর্ষা'র কথা বলছেন ?

হ্যাঁ, ঐটাই। চমৎকার। খুবই ভাবের কথা। আপনি তো ভাই বিরাট লোক।

কবি নিশ্চয়ই বই ছাপানোর সব টাকা আবদুস সালাম সাহেবকে দিতে পারেননি। সালাম সাহেব বললেন, যখন পারেন দিবেন। কবি মানুষ আপনি। আপনার কাছে টাকা মার যাবে নাকি— হা হা হা। ক'জন পারে আপনার মতো কবিতা লিখতে ?

ভূমিকা পড়েই জানতে পারলাম নেত্রকোনা শহরের একজন প্রবীণ উকিল বাবু নলিনী রঞ্জন সাহাও জনাব আবদুস সালামের মতো কবির প্রতিভায় মুগ্ধ। কবি লিখেছেন, "বাবু নলিনী রঞ্জন সাহার উৎসাহ ও প্রেরণা আমাকে গ্রন্থখানি প্রকাশ করিবার জন্য আগ্রহী করিয়াছে। বাবু নলিনী রঞ্জন একজন স্বভাব-কবি এবং কাব্যের একজন কঠিন সমালোচক। তিনি যখন আমার কবিতা প্রসঙ্গে সাপ্তাহিক পত্রিকা 'মঞ্জুষা'তে আমার একটি কবিতার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন, এই কবির কাব্যগ্রন্থ অনতিবিলম্বে প্রকাশ হওয়া বাঞ্ছনীয়, তখনই আমি স্থির করি... ।"

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'তে মোট একশ' তেরোটি কবিতা আছে। প্রতিটি কবিতার নিচে রচনার স্থান, তারিখ এবং সময় দেয়া আছে। অনেকগুলোর সঙ্গে বিস্তৃত ফুটনোট। কয়েকটি উল্লেখ করি।

'দিবাবসান' কবিতাটির ফুটনোটে লেখা, 'আমার বড় শ্যালক জনাব আমীর সাহেবের বাড়িতে এই কবিতাটি রচিত হয়। তাহার বাড়ির সন্নিকটে খরস্রোতা

একটি নদী আছে (নাম স্মরণ নাই)। উক্ত নদীর তীরে এক সন্ধ্যায় বসিয়াছিলাম। দিবাবসানের পরপরই আমার মনে গভীর আবেগের সৃষ্টি হয়। কবিতা রচনার উপকরণ সঙ্গে না থাকায় আবেগটি যথাযথ ধরিয়া রাখিতে পারি নাই। সমস্ত কবিতাটি মনে মনে রচিত করিয়া পরে লিপিবদ্ধ করিতে হইয়াছে।'

অন্য একটি কবিতার (বাসর শয্যা) ফুটনোটটি এরকম— 'এই দীর্ঘ কবিতাটি আমি আমার বাসর রাত্রে রচনা করিয়াছি। সেই সময় বাহিরে খুব দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া ছিল। প্রচণ্ড হাওয়া এবং অবিশ্রান্ত বর্ষণ। ক্ষণে ক্ষণে বিদ্যুৎ চমকাইতেছিল। আমার নবপরিণীতা বালিকাবধূ মেঘগর্জনে বারবার কাঁপিয়া উঠিতেছিল।'

বাসর রাত্রিতে স্বামীর এই কাব্যরোগ দেখে নতুন বৌটি নিশ্চয়ই দারুণ অবাক হয়েছিল। তার চোখে ছিল বিস্ময় এবং হয়তো কিছুটা ভয়। কবি স্বামী দীর্ঘ রচনাটি কি সেই রাত্রেই পড়ে শুনিয়েছেন তাঁর স্ত্রীকে ? না শুনিয়ে কি পারেন ? ঝড়-জলের রাত। হাওয়ার মাতামাতি। টাটকা নতুন কবিতা। রহস্যমণ্ডিত এক নারী। সেই রাত কী যে অপূর্ব ছিল সেটি আমরা ফুটনোট পড়ে কিছুটা বুঝতে পারি।

এবং এও বুঝতে পারি, যে লোক বিয়ের রাতে সাড়ে ছ'পৃষ্ঠার একটি কবিতা লিখতে পারেন, তিনি পরবর্তী সময়ে কী পরিমাণ বিরক্তি ও হতাশার সৃষ্টি করেছেন তাঁর স্ত্রীর মনে। ঘরে হয়তো টাকা-পয়সা নেই। ছোট ছেলের জ্বর। তার জন্যে সাগু কিনে আনতে হবে। কিন্তু ছেলের বাবা কবিতার খাতা নিয়ে বসেছেন। গভীর ভাবাবেগে তাঁর চোখে জল। লিখছেন 'একদা জ্যোৎস্নায়' নামের দীর্ঘ কোনো রচনা। কেন কিছু কিছু মানুষ এমন নিশি-পাওয়া হয় ? দুঃখ-কষ্ট, হতাশা-বঞ্চনা কিছুই তাঁদের স্পর্শ করে না। স্বর্গীয় কোনো একটি হিংস্র পশু তাঁদের তাড়া করে ফিরে। কেন করে ? আমার উত্তর জানা নেই। জানতে ইচ্ছে হয়।

এইসব নিশি-পাওয়া মানুষদের বেশিরভাগই নিজের ক্ষুদ্র পরিবার এবং কয়েকজন ভালোমানুষ বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর কারো কাছে তাঁদের আবেগের কথা পৌঁছাতে পারেন না। কৃপণ ঈশ্বর এদেরকে আবেগে উদ্বেলিত হবার মতো অপূর্ব একটি হৃদয় দিয়ে পাঠান, কিন্তু সেই আবেগকে প্রবাহিত করবার মতো ক্ষমতা দেন না। এরা বড় দুঃখী মানুষ।

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র পাতা উল্টাতে উল্টাতে আমার এমন কষ্ট হলো। কবি কত বিচিত্র বিষয় নিয়ে কত আজেবাজে জিনিসই না লিখেছেন। ইরানের শাহকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা আছে। কী আছে এই স্বৈরাচারী রাজার মধ্যে যে তাকে নিয়ে পর্যন্ত একটা কবিতা লিখতে হলো ? তিনটি কবিতা আছে মহাসাগর নিয়ে। কবি কিন্তু সাগর-মহাসাগর কিছুই দেখেননি। [সমুদ্র দেখিবার সৌভাগ্য আমার হয় নাই। তবে বহুবার আমি মনশ্চক্ষে সমুদ্র দেখিয়াছি। ফুটনোট, 'হে মহাসিন্ধু'।]

কবিতা আমি পড়ি না। কিন্তু 'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র প্রতিটি কবিতা আগ্রহ নিয়ে পড়লাম। কিছুই নেই। কষ্টে সঞ্চিত শেষ মুদ্রাটিও নিশ্চয়ই চলে গেছে এই বইয়ে। বাকি জীবন এই পরিবারটি অবিক্রিত গ্রন্থটির প্রতিটি কপি গভীর আগ্রহে আগলে রাখবে। প্রাণে ধরে সের দরে বিক্রি করতে পারবে না। বইয়ের স্তূপের দিকে তাকিয়ে স্ত্রী মাঝে মাঝে গোপনে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলবেন। কিন্তু তাতে কী আছে ? অন্তত একটি দিনের জন্যে হলেও তো এই পরিবারটিতে আনন্দ এসেছিল। কবি-স্ত্রী মুগ্ধচোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে ভেবেছিলেন, আমার স্বামী তাহলে সত্যি সত্যি একটি বই লিখে ফেলেছেন ? ছেলেমেয়েরা বাবার বই নিয়ে ছুটে গেছে বন্ধু-বান্ধবদের দেখাতে।

বাবা প্রথমবারের মতো বুক উঁচু করে তাঁর বড় সাহেবের ঘরে ঢুকে বলেছেন, স্যার, আপনার জন্যে একটা বই আনলাম। বড় সাহেব অবাক হয়ে বললেন, আরে আপনি আবার বই লিখলেন কবে ?

স্যার, প্রচ্ছদটা আমার মেয়ের আঁকা।

তাই নাকি ? বাহ্ চমৎকার!

'রিক্তশ্রী পৃথিবী'র শেষ কবিতাটি সম্পর্কে বলি। শেষ কবিতাটির নাম— 'মাগো'। কবিতাটি নুরুন্নাহার খানমকে নিয়ে লেখা। ফুটনোট থেকে জানতে পারি, মৃত্যুর আগের রাতে সে যখন রোগযন্ত্রণায় ছটফট করছিল তখন তার অসহায় বাবা এই কবিতাটি লিখে এনেছিলেন মেয়েকে কিঞ্চিৎ 'উপশম' দেবার জন্যে। কবিতাটি ক্ষুদ্র এবং রচনাভঙ্গি অন্য কবিতার মতোই কাঁচা। কিন্তু প্রতিটি শব্দ চোখের গহীন জলে লেখা বলেই বোধকরি কবিতাটি দুঃখী বাবার মতোই হাহাকার করে ওঠে। সেই হাহাকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ছাড়িয়ে চলে যায় অদেখা সব ভুবনের দিকে।

একটিমাত্র কবিতা লিখেও কেউ কেউ কবি হতে পারেন। অল্পকিছু পঙ্‌ক্তিমালাতেও ধরা দিতে পারে কোনো এক মহান বোধ, মহান আনন্দ, জগতের গভীরতম ক্রন্দন। সেই অর্থে আমাদের 'রিক্তশ্রী'র কবি একজন কবি।

এইসব দিনরাত্রি

থার্ড পিরিয়ডে প্রণব বাবুর কোনো ক্লাস নেই।

তিনি কমনরুমে এসে পত্রিকা খুঁজতে লাগলেন। একটি মাত্র পত্রিকা রাখা হয়। পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত সেটি হেডমাস্টার সাহেবের ঘরে থাকে। আজ হেডমাস্টার সাহেব আসেননি। তার মেয়ের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। ছেলের বড় ফুপা এসেছেন। সেই উপলক্ষে তিনি বড় সাইজের কৈ মাছের খোঁজে গিয়েছেন।

কাজেই কমনরুমের টেবিলে পত্রিকাটি পাওয়া গেল। ভাঁজ পর্যন্ত খোলা হয়নি। এরকম একটা কড়কড়ে নতুন পত্রিকা পড়ার আনন্দই অন্যরকম। প্রণব বাবু কোনার দিকে ইজি চেয়ারে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পরই তার কপাল দিয়ে টপটপ করে ঘাম পড়তে লাগল। তিনি ভাঙা গলায় ডাকলেন, বশীর মিয়া! ও বশীর মিয়া!

বশীর মিয়া স্কুলের দপ্তরি। সেও হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গে কৈ মাছের খোঁজে গিয়েছে। কেউ এলো না। ফোর্থ পিরিয়ডে আজিজুদ্দীন সাহেব কমনরুমে পানি খেতে এসে দেখেন প্রণব বাবু মরার মতো পড়ে আছেন।

প্রণব বাবু, কী হয়েছে ?

প্রণব বাবু বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। তাঁর কথা জড়িয়ে গেল। আজিজুদ্দীন সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, শরীর খারাপ না-কি ? এ্যাই প্রণব বাবু !

শরীর ঠিক আছে।

আজিজুদ্দীন সাহেব কপালে হাত রাখলেন। না কপাল ঠান্ডা। জ্বরজ্বারি কিছু নেই।

প্রণব বাবু দুর্বল কণ্ঠে বললেন, পানি খাব। একটু পানি দেন।

মাথা ঘুরছে নাকি ? এ্যাই প্রণব বাবু ?

প্রণব বাবু ফিসফিস করে বললেন, লটারির রেজাল্ট দিয়েছে।

আজিজুদ্দীন সাহেবের ব্যাপারটা বুঝতে অনেক সময় লাগল। রেডক্রস লটারির দু'টাকা দামের টিকিট সবাইকে একটি করে কিনতে হয়েছে। হেডমাস্টার সাহেব পঞ্চাশটা টিকিট ময়মনসিংহ থেকে নিয়ে এসেছিলেন। গম্ভীর গলায় বলেছেন, সবাইকে কিনতে হবে। দেশের কাজ। আমরা শিক্ষকরা যদি না করি কারা করবে ? সবার জন্যে একটা এগজাম্পল সেট করতে হবে। পাঁচটা করে কিনবেন সবাই।

থার্ড মাস্টার জলিল সাহেব মুখ কালো করে বললেন, দু'মাস ধরে বেতন নাই, এর মধ্যে এইসব আবার কী ঝামেলা স্যার ?

দেশের কাজের মধ্যে আবার ঝামেলার কী দেখলেন ? পাঁচটা করে কিনবেন সবাই। আর স্টুডেন্টদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটের ব্যবস্থা করবেন। দেশের কাজ।

পাঁচটা করে টিকিট কিনতে হলো সবাইকে। হেডমাস্টার সাহেব দেশের কাজের জন্য হঠাৎ করে এত ব্যস্ত হয়ে যাওয়ার রহস্যও উদ্ধার হলো। প্রতি দশটি টিকিটে তার দু'টাকা করে লাভ থাকে।

সেই লটারির রেজাল্ট দেখে প্রণব বাবুর কপাল ঘামছে, কথা জড়িয়ে যাচ্ছে— তার অর্থ কী ? আজিজুদ্দীন সাহেব অবাক হয়ে বললেন, কী ব্যাপার ভাই, কিছু পেয়ে গেলেন নাকি ? অ্যাঁ ?

প্রণব বাবু জড়িয়ে জড়িয়ে বললেন, পেয়েছি।

আজিজুদ্দীন সাহেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ক্লাস নাইনে তার ইংরেজি গদ্য পড়াবার কথা, তিনি আর সেখানে গেলেন না। প্রণব বাবুর পাশের চেয়ারে চুপচাপ বসে রইলেন। দুনিয়াতে কত অসম্ভব ব্যাপারই না ঘটে। প্রণব বাবু পরশু দিন তাঁর কাছে পঞ্চাশটা টাকা চেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন, হাত একেবারে খালি। কোত্থেকে টাকা আসবে ? গত মাসেও হাফ বেতন হয়েছে। আজিজুদ্দীন সাহেব ক্লান্ত স্বরে বললেন, এরকম ভ্যাবদার মতো বসে আছেন কেন ? ফুর্তি-টুর্তি করেন।

কী ফুর্তি করব ?

তাও ঠিক। লোকজন এরকম হঠাৎ লক্ষপতি হলে কী করে ফুর্তি করে কে জানে। রেজাল্টটা কোথায় দিয়েছে ? দেখি পত্রিকাটা।

ক্লাস নাইনের ছেলেগুলো বড্ড গণ্ডগোল করছে। একজন এসে কমনরুমে উঁকি দিয়ে দেখে গেল। আজিজুদ্দীন সাহেব ভ্রূ কুঁচকে লটারির খবর দু'তিনবার পড়লেন। তার কাছে কোনো টিকিট নেই। তিনি সবগুলো নেজামের চায়ের স্টলে বিক্রি করে ফেলেছেন।

টিফিন পিরিয়ডে স্কুল ছুটি হয়ে গেল। মাস্টারদের কারো আর ক্লাস নেয়ার উৎসাহ রইল না। সবাই কমনরুমে শুকনো মুখে বসে রইলেন। স্কুল ছুটি হয়ে যাওয়ায় ছেলেদের জন্য আনা টিফিন বেঁচে গেছে। লুচি আর বুন্দিয়া। অন্যসময় হলে টিফিনের ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে উৎসাহী আলোচনা চলত, আজ আর কিছুই জমছে না। ক্লাস টেনের ছেলেগুলো কমনরুমের দরজার কাছে জটলা পাকাচ্ছিল। আজিজুদ্দীন সাহেব প্রচণ্ড ধমক দিলেন, নাট্যশালা নাকি, অ্যাঁ ? যা, বাড়ি যা। দু'দিন পরে পরীক্ষা কোনো হুঁশ নাই। গোরুর দল!

হেডমাস্টার সাহেব খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন। এবং খুব হৈচৈ শুরু করলেন।

স্কুল ছুটি দিয়েছে কে ? স্কুল ছুটি দেয়ার মতো কী হয়েছে বলেন তো ? একজন লটারিতে ক'টা টাকা পেয়েছে, আর ওম্নি স্কুল ছুটি ? পেয়েছেনটা কী ?

হেডমাস্টার সাহেবের কথায় কারো কোনো ভাবান্তর হলো না। অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, কী ভ্যানরভ্যানর করছেন ? কে গিয়ে এখন ক্লাস নেবে ?

অসুবিধাটা কী ? আমি তো এর মধ্যে অসুবিধার কিছু দেখলাম না।

তিন মাস বেতন নাই। এর মধ্যে একজন দু'লাখ টাকা পেলে মেজাজ ঠিক থাকে ?

তিন মাস বেতন নাই কথাটা তো ঠিক বললেন না। হাফ বেতন হয়েছে গত মাসে। এসএসসি পরীক্ষার কালেকশন হলে বাকিটা পাবেন। ভালো কালেকশন হবে এইবার।

রশীদ মিয়া হেডমাস্টারের সঙ্গে ফিরে এসেছে। সে একটি বড় গামলায় তেল-মরিচ দিয়ে মুড়ি মাখছিল। দুপুরে এটাই স্যারদের টিফিন। কেরোসিন কুকারে চায়ের পানি ফুটছে। হেডমাস্টার সাহেব বিরসমুখে বললেন, আজকেও মুড়ি ? আজ একটা ভালো টিফিনের দরকার ছিল।

কেউ কোনো সাড়া দিল না। টিফিনপর্ব শেষ হয়ে গেল খুব তাড়াতাড়ি। টিচাররা সবাই বাড়ি চলে গেলেন। প্রণব বাবু নড়লেন না। হেডমাস্টার সাহেব একসময় বললেন, বাড়ি গিয়ে আমোদ ফুর্তি করেন। চুপচাপ বসে আছেন কী জন্যে ?

ভালো লাগছে না স্যার।

ভালো লাগবে না কেন ? আজকে তো আপনার ভালো লাগারই দিন। হেডমাস্টার সাহেব শুকনো গলায় টেনে-টেনে হাসতে লাগলেন।

জোর-জবরদস্তি করে কিনিয়েছি বলেই পেলেন। মনে রাখবেন সেটা। হা-হা-হা। উপকারের কথা কারো মনে থাকে না, এইটাই দুনিয়ার নিয়ম।

প্রণব বাবু বিড়বিড় করে কী যেন বললেন। পরিষ্কার বুঝা গেল না। হেডমাস্টার সাহেব শুকনো গলায় বললেন, যে টিকিটে পেয়েছেন সেটা আছে তো ? অনেক সময় দেখা যায় টিকিটটাই মিসিং। তখন সবই গেল।

প্রণব বাবু মানিব্যাগ থেকে টিকিট বের করে হেডমাস্টার সাহেবের হাতে দিলেন। হেডমাস্টার সাহেব ভ্রু কুঞ্চিত করে দীর্ঘ সময় তাকিয়ে রইলেন টিকিটের দিকে।

তার মেয়ের এই বিয়ের প্রস্তাবটাও হয়তো ভেঙে যাবে। ছেলের ফুপা বলেছে ছেলের নাকি মটর সাইকেলের খুব সখ। অজপাড়াগাঁর পোস্টমাস্টারের ছেলে মোটর সাইকেল দিয়ে করবেটা কী ? তেরো টাকার কৈ মাছ জলে গেছে বলাই বাহুল্য। হেডমাস্টার সাহেব ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে বললেন, প্রণব বাবু, আপনি এইবার একটা মোটর সাইকেল কিনে ফেলেন।

মটর সাইকেল দিয়ে আমি কী করব ?

চড়বেন, চড়বেন। আপনাদের তো দিনকাল।

হেডমাস্টার সাহেব আবার টেনে-টেনে হাসতে লাগলেন।

প্রণব বাবু স্কুল থেকে বেরুলেন সন্ধ্যার পর। তাঁর ধারণা ছিল বাজারের ভেতর দিয়ে যাবার সময় অসংখ্যবার লটারির টাকা পাওয়ার খবর তাকে বলতে হবে। কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না। কেউ কি জানে না খবরটা ? আশ্চর্য!

তাঁর ছেলে সুবল যেবার ময়মনসিংহে চুরি কেইসে গ্রেফতার হলো সেবার প্রণব বাবুকে অসংখ্যবার ব্যাপারটা বলতে হয়েছে।

ফল্‌স কেইস বোধহয়। কী বলেন প্রণব বাবু ? হাজার হলেও আপনার ছেলে। ভদ্রলোকের সন্তান।

ফল্‌স কেইস না। চুরি সত্যি-সত্যি করেছে।

বলেন কী! ব্যাপারটা ঠিকমতো বলেন তো শুনি। বসেন না। এ্যাই, বাবুকে চা দে।

আজ প্রণব বাবু নীলগঞ্জ বাজারের প্রায় শেষপ্রান্তে চলে আসলেন। কেউ কিছু জিজ্ঞেস করল না। বাজার থেকে বেরুবার সময় করিম মিয়া চিকন গলায় ডাকল, বাবু, একটু শুনে যান তো।

কী ব্যাপার?

মোট দু'শ এগারো টাকা পাওনা। আমরা গরিব ব্যবসায়ী। এতটা টাকা আটকা পড়লে চলে?

দিয়ে দিব।

দিয়ে দিব সেইটা তো বাবু দু' তিন মাস ধরেই শুনতেছি। নিবারন সাহার কাছে এইরকম চারশ' টাকা পাওনা। হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে চলে গেল ইন্ডিয়া।

আমি ইন্ডিয়া যাব না। ইন্ডিয়াতে আমার কেউ নাই।

প্রণব বাবুর খুব ইচ্ছা হলো লটারির কথাটা বলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না।

প্রণব বাবু বাড়ি পৌঁছলেন রাত আটটার দিকে। কোনো সাড়াশব্দ নেই। সাড়াশব্দ করার লোকও অবশ্যি নেই। চারদিকে ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। তিনি হাতড়ে-হাতড়ে তালা খুললেন। হারিকেন জ্বালালেন। টেবিলের ওপর খাবার ঢাকা আছে। খান কতক রুটি, একটা ভাজি, এক বাটি তেঁতুলের টক। তার রান্না হয় জ্যাঠার বাড়িতে। রান্না হয়ে গেলে তালা খুলে খাবার রেখে যায়। সেই বাবদ জ্যাঠার হাতে যখন যা পারেন দেন।

প্রণব বাবু কেরোসিন কুকার জ্বালিয়ে রুটি গরম করতে বসলেন, তখনই হঠাৎ করে সুবল এসে উপস্থিত। সুবলের সঙ্গে তার দেখা-সাক্ষাৎ হয় না বললেই হয়। গত ছ'মাসে একবার মাত্র এসেছিল দু'দিনের জন্যে। তিনি কোনো কথাবার্তা বলেননি। আজকে নিজে থেকেই কথা বললেন, আছিস কেমন সুবল?

আছি কোনো মতো। তুমি আছ কেমন বাবা?

খেয়ে এসেছিস নাকি?

হুঁ। মটন বিরিয়ানি খেয়েছি ইস্টিশনে। জানি তো এত রাত্রে খাওয়াদাওয়ার কোনো আয়োজন তোমার নাই। খাচ্ছ কী তুমি? রুটি নাকি?

হুঁ। খাবি একটা?

না।

প্রণব বাবু খেতে বসলেন। সুবল বাইরের বারান্দায় গিয়ে সিগারেট ধরাল। প্রণব বাবু লক্ষ করলেন, সুবলের গায়ে চকচকে একটা সার্ট থাকলেও তার পায়ের

চামড়ার জুতোজোড়াতে তালি পড়েছে। যে মটরশপে মেকানিকের কাজ শিখত সেখানে পয়সাকড়ি বোধহয় কিছুই দেয় না।

তাঁর মনে পড়ল দু'মাস আগে আড়াইশ' টাকা চেয়ে ভুল বানানে তিন পাতার একটা চিঠি লিখেছিল সুবল। তিনি জবাব দেননি। এবারো টাকার জন্যেই বোধহয় এসেছে।

বাবা, ঘরে চায়ের পাতা আছে?

আছে বোধহয়। দেখ তো হরলিক্সের বোতলটার মধ্যে।

সুবল চায়ের পানি চাপিয়ে মৃদুস্বরে বলল, তোমার কাছে তিনশ' টাকা হবে বাবা? আমার খুবই দরকার।

প্রণব বাবু অনেকক্ষণ ছেলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বাবা, খুব ঝামেলার মধ্যে পড়ে গেছি।

প্রণব বাবু কিছু বললেন না।

একটা ব্যবস্থা তোমাকে করতেই হবে বাবা।

প্রণব বাবুর ইচ্ছা হলো জিজ্ঞেস করেন— কী ঝামেলা? কিন্তু তিনি চুপ করে রইলেন। তাঁর যে মেয়ে কলকাতার শিবপুরে ছিল সেও কী একটা ঝামেলায় পড়েছিল। এক হাজার টাকা চেয়ে চিঠি লিখেছিল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু সেই ছোট্ট চিঠি পড়ে তিনি সারারাত ঘুমাতে পারেননি। মেয়েটি অনেক বয়স পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ঘুমাত। কী বিশ্রী ঘুম। পা দুটি বুকের কাছে এনে মাথা বাঁকা করে। কত বকাঝকা কত কী। লাভ হয়নি কিছুই। অঞ্জুর সেই চিঠির জবাব তিনি দেননি। লজ্জাতেই দিতে পারেননি। দীর্ঘ একবছর সেই চিঠি পকেটে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন। ক্লাসে গিয়েছেন। পাটিগণিতের কঠিন কঠিন সব অংক জলের মতো বুঝিয়ে দিয়েছেন।

প্রণব বাবু বারান্দায় গিয়ে বসলেন। কী চমৎকার জ্যোৎস্না!

অন্ধকার হালকা হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। লেবুফুলের ঘ্রাণ আসছে। গাছটাতে লেবু হয় না, শুধুই ফুল ফোটে। গাছগাছালির কোনো যত্ন নেই আর। কে যত্ন করবে? সুবল চায়ের কাপ নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল।

বাবা, খুব বড় একটা ঝামেলার মধ্যে পড়েছি।

সবাই বড় ঝামেলায় পড়ে। তিনিও মেয়েকে নিয়ে ঝামেলায় পড়েছিলেন। ছেলে পাওয়া যায় না। শেষটায় কেদারনাথ বাবু কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বিয়ে দিলেন। বিয়েটা কেমন হয়েছিল কে জানে? বর পছন্দ হয়েছিল পাগলিটার? আজ আর তা জানবার কোনো উপায় নেই। বাবাকে কি আর এইসব কথা কোনো মেয়ে লেখে? বাবাকে লিখতে হয় দারুণ সমস্যার সময়।

সুবল মৃদুস্বরে বলল, বাবা চা খাবে, চা দেই?

দে।

চিনি নাই। চিনি ছাড়া চা।

দে একটু।

সুবল তাকিয়ে দেখল তার বাবার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ব্যাপারটা কী ? সে আড়চোখে তাকাতে লাগল।

তিনশ' টাকা না পেলে বেইজ্জত হব।

সুবল কথাটা বলেই মাথা নিচু করে ফেলল। এবং লক্ষ করল তার নিজের চোখও ভিজে উঠছে। সে হঠাৎ বলে ফেলল, বড় কষ্ট বাবা।

কষ্ট! হ্যাঁ কষ্ট তো বটেই। প্রণব বাবু ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেললেন।

টাকাটার কি জোগাড় হবে ?

প্রণব বাবু জবাব দিলেন না। চোখ মুছলেন। সুবল বাবার কাছে সরে এলো। প্রণব বাবু হঠাৎ কী মনে করে সুবলের একটি হাত চেপে ধরে সশব্দে ফুঁপিয়ে উঠলেন। সুবল বলল, কাঁদবে না বাবা। দেখি একটা ব্যবস্থা করব আমি নিজেই। কাঁদবে না।

মেয়েটারে বড় দেখতে ইচ্ছা হয় সুবল।

তিনি দু'লক্ষ টাকার একটি টিকিট পকেটে নিয়ে একজন নিঃস্ব মানুষের মতো কাঁদতে লাগলেন। সুবল বাবাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। তিনশ' টাকার তার সত্যি খুব প্রয়োজন ছিল। সুবলের ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা হচ্ছিল। কিন্তু সে কাঁদল না। উদাস গলায় বলল, চিন্তার কিছু নাই বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে।

প্রণব বাবু ধরা গলায় বললেন, কিছুই ঠিক হয় না রে। তার কথা সমর্থন করেই ঘরের ভিতর থেকে একটি তক্ষক ডেকে উঠল। চারদিকে মাছের চোখের মতো মরা জ্যোৎস্না।

উনিশ শ' একাত্তর

তারা এসে পড়ল সন্ধ্যার আগে আগে।

বিরাট একটা দল। মার্চ টার্চ কিছু না। এলোমেলোভাবে হেঁটে আসা। সম্ভবত বহুদূর থেকে আসছে। ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ছে একেকজন। ঘামে মুখ ভেজা। ধূলিধূসরিত খাকি পোশাক।

গ্রামের লোকজন প্রায় সবাই লুকিয়ে পড়ল। শুধু বদি পাগলা হাসিমুখে এগিয়ে গেল। মহানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, বিষয় কী গো ?

পুরো দল থমকে দাঁড়াল মুহূর্তে। বদি পাগলার হাতে একটা লাল গামছা। সে গামছা নিশানের মতো উড়িয়ে চেঁচাল, কই যান গো আপনেরা ? এমন অদ্ভুত ব্যাপার সে আগে কখনো দেখেনি।

মেজর সাহেবের চোখে সানগ্লাস। তিনি সানগ্লাস খুলে ফেলে ইংরেজিতে বললেন, লোকটা কী বলছে ? রফিক উদ্দীন সঙ্গে সঙ্গে বলল, লোকটা মনে হচ্ছে পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে পাগল থাকে।

তাই নাকি ?

জি, স্যার।

বুঝলে কী করে এ পাগল ?

রফিক উদ্দীন চুপ করে গেল। মেজর সাহেবের খুব পেঁচানো স্বভাব, একটি কথার দশটি অর্থ করেন। বদি পাগলাকে দেখা গেল ছুটতে ছুটতে আসছে। তার মুখভর্তি হাসি। রফিক ধমকে উঠল, এ্যাই, কী চাস তুই ? বদি পাগলার হাসি আরো বিস্তৃত হলো। রফিক কপালের ঘাম মুছল। সরু গলায় বলল, লোকটা স্যার পাগল। আমাদের সব গ্রামে একটা করে ।

এই কথা তুমি আগে একবার বলেছ। একই কথা দু'তিনবার বলার প্রয়োজন নেই।

রফিক ঢোঁক গিলল। মেজর সাহেব ঠান্ডা গলায় বললেন, এ জায়গাটা আমার পছন্দ হচ্ছে। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করা যাক। সবাই টায়ার্ড।

মাইল পাঁচেক গেলেই স্যার নবীনগর। খুব বড় বাজার। পুলিশ ফাঁড়ি আছে। সন্ধ্যা নামার আগে আগে নবীনগর চলে যাওয়া ভালো।

কেন ? তুমি কি ভয় পাচ্ছ ?

জি-না স্যার, ভয় পাব কেন ?

মেজর সাহেব দলটির দিকে তাকিয়ে কিছু একটা বললেন। মৃদু একটা সাড়া জাগল। নিমেষের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে পড়ল সবাই। মাথা থেকে ভারী হ্যালমেট খুলে ফেলতে লাগল। মেজর সাহেব নিচু স্বরে বললেন, পাগলটাকে বেঁধে ফেলতে বলো। তিনি কাঠের একটি বাক্সের উপর বসে পাইপ ধরালেন। খাকি পোশাক পরা কারো মুখে পাইপ মানায় না। কিন্তু এই মেজর অসম্ভব সুপুরুষ। তাঁর মুখে সবকিছুই মানায়।

পাগলটাকে আমগাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলা হলো। তার কোনো আপত্তি দেখা গেল না। বরং কাছাকাছি থাকতে পারার সৌভাগ্যে তাকে আনন্দিতই মনে হলো। কেউ তার দিকে তেমন নজর দিল না। এরা অসম্ভব ক্লান্ত। এদের দৃষ্টি নিরাশক্ত ও ভাবলেশহীন।

মেজর সাহেব পানির বোতল থেকে কয়েক চুমুক পানি খেলেন। বুটজুতা জোড়া খুলে ফেললেন। তাঁর বাঁ-পায়ের গোড়ালিতে ফোস্কা পড়েছে। রফিক বলল,

ডাব খাবেন স্যার ? মেজর সাহেব সে-কথার জবাব না দিয়ে শান্ত স্বরে বললেন, আগে আমরা কোনো গ্রামে গেলেই ছোটখাটো একটা দল পাকিস্তানি পতাকা হতে নিয়ে আসত, এখন আর আসে না। এর কারণ কী, জানো ?

জানি না স্যার।

ভয়ে আসে না। এই গ্রামের সব কটি লোক এখন জঙ্গলে লুকিয়ে আছে। ঠিক না ?

রফিক জবাব দিল না। বদি পাগলা বলল, এট্টু বোতলের পানি খাইতে মন চায়।

ও কী চায় ?

ওয়াটার বটল থেকে পানি খেতে চায় স্যার।

গ্রামের সবাই পালিয়ে গেলেও আজীজ মাস্টার যেতে পারেনি। কারণ ঘোনাপাতা থেকে তার ছোট বোন এসেছিল। আজ সকাল থেকেই তার প্রসব ব্যথা শুরু হয়েছে। এরকম একজন মানুষকে নিয়ে টানাটানি করা যায় না। তবু দু'বার বলল, ধরাধরি কইরা নাওডাত নিয়া তুললে শ্যামগঞ্জ লইয়া যাওন যায়। তার জবাবে আজীজ মাস্টারের মা তার কাপুরুষতা নিয়ে কুৎসিত একটা গাল দিয়েছেন। ঠ্যাং ভাঙা বিড়ালের সঙ্গে তুলনা করেছেন। আজীজ মাস্টার প্রতিবাদ করেনি, কারণ কথাটি সত্যি। সে বড়ই ভীতু। গ্রামে মিলিটারি ঢুকেছে শোনার পর থেকে তার ঘনঘন প্রস্রাবের বেগ হচ্ছে। সে বসে আছে উঠানে। এবং সামান্য শব্দেও দারুণভাবে চমকে উঠছে।

মাস্টার, বাড়িত আছ ?

কেডা ?

আমরা। খবর হুনছ ? বদি পাগলারে বাইন্ধা রাখছে আম গাছে।

হুনছি।

নীলগঞ্জের মুরুব্বিদের কয়েকজন শংকিত ভঙ্গিতে উঠে এলো উঠোনে।

তোমার তো এট্টু যাওন লাগে মাস্টার।

কই যাওন লাগে ?

দবীর মিয়া তার উত্তর না দিয়ে নিচু গলায় বলল, তুমি ছাড়া কে যাইব ! তুমি ইংরেজি জানো। শুদ্ধ ভাষা জানো।

মিলিটারির কাছে যাইতে কন ?

হ।

আমি গিয়া কী করতাম ?

গিয়া কইবা এই গ্রামে কোনো অসুবিধা নাই। পাকিস্তানের নিশানটা হাতে লইয়া যাইবা। ভয়ের কিছু নাই।

মাস্টার অনেকক্ষণ কোনো কথা বলল না। দবীর মিয়া বিরক্ত হয়ে বলল, কথা কও না যে?

আমি যাই ক্যামনে? বাড়িত অত বড় বিপদ। পুতির বাচ্চা অইব।

তোমার তো কিছু করনের নাই মাস্টার। তুমি ডাক্তারও না কবিরাজও না।

মাস্টার ক্ষীণস্বরে বলল, পাকিস্তানের পতাকা পাইয়াম কই?

ক্যান, ইস্কুলের পতাকা কী করলা?

ফালাইয়া দিছি।

ফালাইয়া দিছ? ক্যান?

মাস্টার জবাব দেয় না। দবীর মিয়া রাগী গলায় বলে, আইএ পাশ করলে কী হইব মাস্টার, তোমার জ্ঞান বুদ্ধি অয় নাই। পতাকাটা তুমি ফালাইলা কোন আক্কেলে? অখন কী আর করবা, যাও খালি হাতে।

আমার ডর লাগে চাচাজি।

ডরের কিছু নাই। এরা বাঘও না ভাল্লুকও না। তুমি গিয়া খাতির যত্ন কইরা দুইটা কথা কইবা। এক মিনিটের মামলা। কী কও আসমত?

নেয্য কথা।

দেরি কইরো না। আন্ধাইর হওনের আগেই যাও।

একলা?

একলা যাওনই বালা। একলাই যাও। তিনবার কুলহু আল্লাহ্ কইয়া ডাইন পাওডা আগে ফেলবা। পাঁচবার মনে মনে কইবা, ইয়া মুকাদ্দেমু। ভয় ডরের কিছুই নাই মাস্টার। আল্লাহ্‌র পাক কালাম। এর মরতবাই অন্যরকম।

আজীজ মাস্টার মাথা নিচু করে বসে রইল। তার আবার প্রস্রাবের বেগ হয়েছে। ঘরের ভেতর থেকে পুতি কুঁ কুঁ করছে। প্রথম পোয়াতি, খুব ভোগাবে।

ভইনটারে এমুন অবস্থায় ফালাইয়া ক্যামনে যাই।

এইটা কী কথা? তুমি ঘরে থাইক্যা করবাটা কী? বেকুবের মতো কথা কও খালি। উঠ দেহি।

আজীজ মাস্টার উঠল।

মেজর সাহেব দীর্ঘ সময় তার দিকে সরু চোখে তাকিয়ে রইলেন। অন্ধকার হয়ে আসছে। তাঁর মুখের ভাব ঠিক বুঝা যাচ্ছে না। তিনি বসে আছেন কাঠের একটি বড় বাক্সের উপর। পা দু'টি ছড়ানো। মেজর সাহেব পরিষ্কার বাংলায় বললেন, কী চাও?

আজীজ মাস্টার থতমতো খেয়ে গেল। এ বাংলা জানে নাকি? কী আশ্চর্য!

কী চাও তুমি ?

জি, কিছু চাই না।

মেজর সাহেব এবার ইংরেজিতে বললেন, কিছু না চাইলে এসেছ কেন ? তামাশা দেখতে ? সার্কাস হচ্ছে ?

আজীজ মাস্টার ঘামতে শুরু করল। মেজর সাহেবের পরবর্তী সমস্ত কথোপকথন হলো ইংরেজিতে। আজীজ মাস্টার বেশিরভাগ জবাবই দিল বাংলায়। তাতে অসুবিধা হলো না। মেজর সাহেব ভালো বাংলা জানেন।

তুমি কী করো ?

আমি এখানকার প্রাইমারি স্কুলের টিচার।

এখানে আবার স্কুলও আছে নাকি ?

জি স্যার।

আর কী আছে ?

একটা মসজিদ আছে।

শুধু মসজিদ। মন্দির নাই ? পূজা হয় যেখানে।

জি-না স্যার।

ঠিক করে বলো মন্দির আছে কি না।

নাই স্যার।

মেজর সাহেব পাইপ ধরালেন। ঠান্ডা গলায় কাকে যেন পাঞ্জাবি বা অন্য কোনো ভাষায় কী বললেন। সেই লোকটি উঠে এসে প্রচণ্ড একটা চড় বসিয়ে দিল আজীজ মাস্টারের গালে। আজীজ মাস্টার চিৎ হয়ে পড়ে গেল। আমগাছের সঙ্গে বাঁধা বদি পাগলা দারুণ অবাক হয়ে বলল, ও মাস্টর, উঠ উঠ।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে মেজর সাহেব বললেন, তোমার নাম কী ?

আজীজুর রহমান।

আজীজুর রহমান, তোমাদের এদিকে মুক্তিবাহিনী আছে ?

জি-না।

সবাই পাকিস্তানি ?

জি।

বাহ্ খুব ভালো। তুমি নিজেও একজন খাঁটি পাকিস্তানি, ঠিক না ?

জি স্যার।

সবাই পাকিস্তানি হলে এত ভয় কিসের ? আমার তো মনে হয় এ গ্রামের সবাই ভয়ে পালিয়েছে। মেয়েগুলি লুকিয়ে আছে জঙ্গলে। ঠিক না ?

আজীজ মাস্টার জবাব দিল না। তার মাথা ঘুরছে। বমি আসছে। বহু কষ্টে সে বমির বেগ সামলাতে লাগল।

তোমাদের কি ধারণা আমরা তোমাদের মেয়েদের ধরে নিয়ে যাব ?

আজীজ মাস্টার চুপ করে রইল।

কী, কথা বলছ না যে ? তোমার নিজের স্ত্রীও কি জঙ্গলে লুকিয়েছে ?

স্যার, আমি বিয়ে করিনি।

বিয়ে কর নি ? বয়স কত তোমার ?

চল্লিশ।

চল্লিশ! এখনো বিয়ে করোনি ? তাহলে চালাও কীভাবে ? মাস্টারবেট করো ?

আজীজ মাস্টার কপালের ঘাম মুছল। মেজর সাহেব হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, কথার জবাব দাও।

রফিক উদ্দীন ক্ষীণ স্বরে বলল, স্যার জানতে চাচ্ছেন আপনি হস্তমৈথুন করেন কিনা। বলে ফেলাই ভালো। স্যার রেগে যাচ্ছেন।

করি না।

বলো কী ? তোমার যন্ত্রপাতি ঠিক আছে ? দেখি পায়জামা খুলে সবাইকে দেখাও তো।

স্যার, কী বললেন ?

পায়জামা খুলে তোমার যন্ত্রটা সবাইকে দেখাতে বললাম। ঝটপট করো। দেরি করবে না। আমার হাতে সময় বেশি নেই।

আজীজ মাস্টার অবাক হয়ে তাকাল রফিকের দিকে। রফিক উদ্দীন অস্পষ্ট সুরে বলল, খুলে ফেলেন ভাই। ব্যাটা ছেলেদের মধ্যে আবার লজ্জা কী ? খুলে ফেলেন, স্যার রাগ করছেন।

মেজর সাহেব নিচু গলায় কী একটা বললেন। একজন এসে হ্যাঁচকা টানে আজীজ মাস্টারের পায়জামা নামিয়ে ফেলল। মেজর সাহেব বললেন, জামাটাও খুলে নাও।

আজীজ মাস্টার দু'হাতে তার লজ্জা ঢাকার চেষ্টা করতে লাগল। একটা মৃদু হাসির গুঞ্জন উঠল চারদিকে। একজন কে যেন কাগজের দলা পাকিয়ে ছুড়ে মারল আজীজ মাস্টারের দিকে। মেজর সাহেব বললেন, তুমি পাকিস্তানিদের ভালোবাস ?

বাসি।

গুড। পাকিস্তানি মিলিটারিদের ভালোবাস ?

জি স্যার।

ভেরি গুড। আমাকেও নিশ্চয়ই ভালোবাস। বাস না ? বলো, বলে ফেলো।

বাসি স্যার।

যে তোমাকে নেংটো করে দাঁড়া করিয়ে রেখেছে তাকেও তুমি ভালোবাসছ। তুমি তো বিশ্বপ্রেমিক দেখছি।

মেজর সাহেব অনুচ্চ স্বরে কী একটা বলতেই চারদিকে হাসির বান ডেকে গেল। বদি পাগলা চোখ বড় বড় করে বলল, মাস্টর তোমার কাপড় কই ? এ্যাই মাস্টর। আজীজ মাস্টার ঘোলা চোখে তাকাল তার দিকে। তার বমি বমি ভাবটা কেটে গেছে, শুধু মাথার পেছন দিকটায় তীব্র ও তীক্ষ্ণ একটি যন্ত্রণা। মেজর সাহেব বললেন, আজীজুর রহমান, তুমি ভয়ে মিথ্যা কথা বলছ। প্রাণে বাঁচবার জন্যে। সত্যি কথা বলো, তোমাকে ছেড়ে দেব। তুমি কি আমাকে পছন্দ কর ?

না।

পাকিস্তানিদের পছন্দ করো ?

না।

এই তো আসল কথা বেরুচ্ছে। তুমি কি চাও এটা বাংলাদেশ হোক ? তুমি তাহলে একজন দেশদ্রোহী। দেশদ্রোহীর মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিত। আমি সেই ব্যবস্থাই করতে চাই। নাকি তুমি বাঁচতে চাও ?

আজীজ মাস্টার জবাব দিল না।

দেরি করবে না। বলে ফেলো বাঁচতে চাও কিনা।

রফিক উদ্দীন ভয় পাওয়া গলায় বলল, বলেন ভাই, বাঁচতে চাই। এরকম করছেন কেন ? শুধু শুধু নিজের বিপদ ডেকে আনছেন।

বদি পাগলা আবার কথা বলে উঠল, ও মাস্টর কাপড় পিন্দ। তুমি নেংটা।

আজীজ মাস্টার নড়ল না। মেজর সাহেব বললেন, কাপড় পর। কাপড় পরে আমার সামনে থেকে বিদেয় হয়ে যাও। ক্লিয়ার আউট।

আজীজ মাস্টার কাপড় পড়ল না। হঠাৎ একদলা থুথু ফেলল। সেই থুথু মেজর সাহেবের ডান পায়ের হাঁটুর কাছে এসে পড়ল। মেজর সাহেব চোখ তুলে তাকালেন। চারদিকে কোনো শব্দ নেই। আজীজ মাস্টার এগিয়ে এসে আরেক দলা থুথু ফেলল। সেই থুথু মেজর সাহেবের সার্টে এসে পড়ল। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে, এবার আমরা রওনা হব।

সৈন্যদল মার্চ করে এগুচ্ছে। মেজর সাহেবের মুখ অসম্ভব বিবর্ণ। পেছনে মাথা উচু করে দাঁড়িয়ে আছে একজন নগ্ন মানুষ।

ফার্মগেটে বাসে উঠবার সময় জলিল সাহেবের বাম পায়ের জুতার তলাটা খুলে পড়ে গেল। বাসে উঠবার উত্তেজনায় ব্যাপারটা তিনি খেয়াল করলেন না। শুধু মনে হলো দাঁড়িয়ে তিনি যেন ঠিক আরাম পাচ্ছেন না। বাম পায়ে তেমন জোর নেই।

শাহবাগের কাছে এসে তিনি বসবার জায়গা পেলেন। অফিস টাইমে বসবার জায়গা পাওয়া অসম্ভব ভাগ্যের ব্যাপার। নিশ্চয়ই কিছু একটা ঝামেলা আছে। তিনি আড়চোখে পাশে বসা লোকটির দিকে তাকালেন এবং শিউরে উঠলেন। লোকটির ঘাড় থেকে কান পর্যন্ত দগদগে ঘা। লালাভ একরকম রস সেখান থেকে গড়িয়ে পড়ছে। জলিল সাহেবের পেটের মধ্যে পাক দিয়ে উঠল। তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নিলেন তার পায়ের দিকে। আর তখনই দেখলেন বাম পায়ের জুতার তলাটার কোনো চিহ্নও নেই। এক বছরও হয়নি। এর মধ্যে এই অবস্থা। পাশে বসা লোকটি বলল, ক'টা বাজে ?

ন'টা।

লোকটা রাগী গলায় বলল, আপনার ঘড়িতে তো ন'টা দশ বাজে; ন'টা বললেন কেন ?

জলিল সাহেব তাকিয়ে দেখলেন লোকটির হাতেও ঘা। কুষ্ঠ নাকি ? তিনি বাঁদিকে খানিকটা সরে এলেন। লোকটি পা মেলে যতটুকু জায়গা খালি ছিল সবটুকু ভরাট করে ফেলল।

আপনার জুতার কী হয়েছে ?

জলিল সাহেব জবাব দিলেন না।

খুলে পড়ে গেছে না-কি ?

হ্যাঁ।

বাসের অনেকগুলো লোক উঁকি দিল। যেন দারুণ একটা মজার ব্যাপার। অনেকরকম ছোট ছোট প্রশ্ন হতে লাগল।

কোন সময় খুলল ?

টের পান নাই ? বলেন কী!

কোন কোম্পানির জুতা ? বাটা নাকি ? বাটা জুতার আগের কোয়ালিটি এখন আর নেই।

জুতার দোকানে না গিয়ে অর্ডার দিয়ে বানানোই এখন ভালো। হেসে-খেলে চার-পাঁচ বছর যায়।

জলিল সাহেব লক্ষ করলেন, তার সামনের সিটে বসা দুটি মেয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে জুতা দেখতে চাচ্ছে। এই গাদাগাদি ভিড়ের মধ্যেও তামাশা দেখা চাই। একটি মেয়ে

আবার ফিক করে হেসে ফেলল। এর মধ্যে হাসির ঠিক কী আছে জলিল সাহেব ভেবে পেলেন না। তার মনে হলো মেয়েরা এখন আর আগের মতো নেই। মানুষের দুঃখ-কষ্ট নিয়ে তারাই সবার আগে হেসে ওঠে। যেমন তাঁর অফিসের ডিসপাস সেকশনের মেয়েটি। কী মায়াকাড়া চেহারা, কী মিষ্টি হাসি। একদিন লাঞ্চের সময় এসে জিজ্ঞেস করল, কী লাঞ্চ আনলেন আজকে ?

তিনি বললেন, রুটি আর আলু ভাজা।

কয়েকদিন পর আবার জিজ্ঞেস করল। সেদিনও তিনি বললেন, রুটি আর আলু ভাজা। তারপর একদিন তিনি শুনেন ডিসপাস সেকশনের সবাই তাকে ডাকছে 'মিস্টার পটেটু ভাজা'।

এইসব তাঁকে বিচলিত করে না। কিন্তু এমন একটা মিষ্টি চেহারার মেয়ে, যে এত সুন্দর করে হাসে, সে কী করে মানুষের কষ্ট নিয়ে তামাশা করে ? তাছাড়া তিনি তার বাবার বয়সী। বিয়ে করলে এত বড় একটা মেয়ে তার নিশ্চয়ই থাকত।

জলিল সাহেবের গুলিস্তানে নামার কথা, কিন্তু তিনি প্রেসক্লাবে নেমে পড়লেন। জুতাটা সারানো যায় কি-না দেখতে হবে। আজকে অফিসে দেরি হবেই। গত এক বছরে তিনি একদিন মাত্র দেরি করেছেন। আজকেরটা নিয়ে হবে দু'দিন। দু'দিন দেরি হলে কিছু হবে না।

কিন্তু সেকশন অফিসার নজমুল হুদা সাহেব তাকে সহ্যই করতে পারেন না। তিনি আসার পর থেকে শুধু খুঁত ধরার চেষ্টা করছেন।

এ-কী জলিল সাহেব, চিঠি লিখছেন ডেট কোথায় ? ডেট ছাড়া চিঠি হয় ? বাইশ বছরে কাজ এই শিখেছেন ? রিপিটিশনের বুঝি এই বানান ? ডিকশনারি দেখতে পারেন না ? অফিসের খরচে তো ডিকশনারি কেনা হয়। সেটা কি শুধু টেবিলে সাজিয়ে রাখবার জন্যে ?

ভাউচারগুলো সই করিয়ে রাখতে বলেছিলাম, এখন দেখি দু'টা ভাউচারে কোনো সই নেই। পেয়েছেন কী আপনি ? বাইশ বছরেও সামান্য কাজটা শিখতে না পারলে কখন পারবেন ?

আসলে আপনার এখন অফিসের কাজে মন নেই। মন থাকলে এরকম হয় না।

মুচি ছেলেটি গম্ভীর মুখে টায়ারের রাবার কাটছে। বয়স তের-চৌদ্দ'র বেশি হবে না, কিন্তু কাজের ফাঁকে-ফাঁকে ফসফস করে সিগারেট টানছে। এক পোচ রাবার কাটে আর গম্ভীর হয়ে সিগারেটে টান দেয়। ভাবখানা যেন রাবার কাটার মতো জটিল কাজ এ পৃথিবীতে আর তৈরি হয়নি। বহু কষ্টে ছেলেটির গালে চড় মারার ইচ্ছা দমন করে জলিল সাহেব টুল কাঠের বাক্সের ওপর বসে-বসে ঝিমুতে লাগলেন। এগারোটা সাত মিনিটে জুতা তৈরি হলো। জলিল সাহেব সত্যি-সত্যি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ছেলেটি ডেকে তুলল তাকে।

না, বয়স হয়ে যাচ্ছে। নয়তো এরকম অসময়ে কেউ ঘুমিয়ে পড়ে ? নজমুল হুদা সাহেব ঠিকই বলেছিলেন, বয়স হয়ে গেছে, এখন অফিস ছেড়ে বাড়িতে বিশ্রাম করেন। অফিসের কাজ আর আপনাকে দিয়ে হবে না।

ঠিক সাড়ে এগারোটার সময় তিনি অফিসে পৌঁছলেন। তাঁর মনে হলো কিছু একটা হয়েছে। ডিসপাস সেকশনের আমিন সাহেব কেমন যেন অদ্ভুত চোখে তাকালেন।

জুতাটা ছিড়ে গিয়েছিল, ঠিক করতে গিয়ে দেরি হয়ে গেল।

আমিন সাহেব কোনো কথা বললেন না।

রাবারের সোল লাগিয়েছি। দশ টাকা লাগল।

আমিন সাহেব শুধু বললেন, ও তাই বুঝি ?

ডিসপাসের ঐ মেয়েটি হেডক্লার্কের সঙ্গে হাত নেড়ে নেড়ে কী যেন কথা বলছিল। জলিল সাহেবকে দেখেই থেমে গেল। এর মানে কী ? জলিল সাহেব কৈফিয়তের স্বরে বললেন, জুতার তলিটা খুলে পড়ে গিয়েছিল।

মেয়েটি শীতল স্বরে বলল, বড়সাহেব আপনাকে খুঁজছিলেন।

কখন ?

সাড়ে দশটার দিকে।

কী জন্যে ?

তার কাছ থেকেই শুনবেন।

জলিল সাহেব নিঃশব্দে তার টেবিলে গিয়ে বসলেন। টেবিলের উপর ক্লিয়ারেন্সের দু'টি ফাইল ছিল। তার একটিও নেই। তিনি চেয়ারে বসে ঘামতে লাগলেন। পাশের টেবিলের সুভাস বাবু মৃদুস্বরে বললেন, কোনোদিন দেরি করেন না। আজকে দেরি করলেন ?

জলিল সাহেব বিড়বিড় করে কী বললেন ঠিক বুঝা গেল না।

আপনার ফাইল দু'টা নাজমুল হুদা সাহেব নিয়ে গিয়েছিলেন। এখন আমাকে দেখে দিতে বলছেন।

জলিল সাহেব কিছু বললেন না।

আপনাকে বড় সাহেব দেখা করতে বলেছেন, যান দেখা করে আসেন।

জলিল সাহেব নড়লেন না। ফ্যানের ঠিক নিচেই তার চেয়ার। তবু তিনি কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন।

আজ সন্ধ্যায় বাড়ি গিয়ে কী বলবেন তিনি ? যার বাড়িতে তিনি মাসে তিনশ' পনেরো টাকা দিয়ে থাকেন এবং খান সে তার দূরসম্পর্কের ভাই। তবু সে তাকে নিশ্চয় দশদিনের মধ্যে বাড়ি থেকে বের করে দেবে। দশদিন পর নতুন মাস শুরু

হচ্ছে। নতুন মাস থেকে অন্য একজন কাউকে সে নেবে। না নিলে তার সংসার চলবে না। তার বৌটি অবশ্যি খুব কষ্ট পাবে। এই মেয়েটি অন্য মেয়েগুলোর মতো না। এই মেয়েটির মধ্যে দয়ামায়া আছে। বড় ভালো মেয়ে।

জলিল সাহেব।

জি।

বসে আছেন কেন ? যান সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসেন।

যাই।

জলিল সাহেব উঠলেন না, বসেই রইলেন। তার দারুণ তৃষ্ণাবোধ হলো। একটি বেয়ারা আছে, তাকে বললেই সে পানি এনে দেয়। কিন্তু তাকেও তিনি কিছু বললেন না। প্রবল তৃষ্ণা নিয়ে ফ্যানের নিচে বসে তিনি কুলকুল করে ঘামতে লাগলেন।

প্রাইভেট কোম্পানি, চাকরি চলে গেলে টাকা-পয়সা তেমন কিছুই পাওয়া যাবে না। প্রভিডেন্ট ফান্ডে অল্প যা কিছু ছিল তার প্রায় সবটা নিয়েই বাবার শেষ চিকিৎসা করতে হলো। জানতেন টাকাটা জলে যাচ্ছে, তবু করতে হলো। বিনা চিকিৎসায় মরতে দেয়া যায় না। ক্যান্সার, বাঁচার কোনো আশা নেই জেনেও তিন হাজার টাকা খরচ করে অপারেশন করাতে হয়।

ডাক্তার সাহেব নিজেও নিষেধ করেছিলেন, এই বয়সে অপারেশন শক সহ্য হবে না। বাড়িতে নিয়ে যান, শান্তিতে মরতে দেন। অপারেশন সাকসেসফুল হলেও লাভ নেই তেমন কিছু। বড়জোর বছরখানেক বাঁচবেন।

কিন্তু বাবা ক্ষেপে উঠলেন অপারেশনের জন্যে। রোজ দু'বেলা জিজ্ঞেস করেন, অপারেশন কবে ? তাড়াতাড়ি করা দরকার। এইসব জিনিস যত তাড়াতাড়ি হয় তত ভালো।

প্রভিডেন্ট ফাণ্ড থেকে মোট পাঁচ হাজার আটশ' টাকা পাওয়া গিয়েছিল (আসলে ছ'হাজার। দু'শ' টাকা পান খাওয়ার জন্যে দিতে হয়েছে)। তার মধ্যে খরচ হলো তিন হাজার। বাকি টাকাটা ফেরত দিয়ে ফেলবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু ফেরত দিতে ইচ্ছা করছিল না। এতগুলো টাকা হাতছাড়া করতে মায়া লাগে। সব চকচকে নোট। হাতে নিয়ে থাকতেও আনন্দ। নতুন জুতা কিনে ফেললেন একজোড়া, একটা মশারি কিনলেন। আগের মশারিটি দিয়ে তিনটি নারকেল পাওয়া গেল। সদরঘাটের পুরনো কাপড়ের দোকান থেকে ছাপান্ন টাকার কোট কিনলেন একটা। এই কোটটিই তার কাল হয়েছিল। কোটের পকেট থেকেই বাকি টাকাগুলো পকেটমার হয়। সব নতুন নোট। তিনি সেদিন অফিসে না গিয়ে রেসকোর্সের মাঠে একটা গাছের নিচে সারা দুপুর বসে ছিলেন। রেসকোর্সের মাঠটাকে গাছটাছ লাগিয়ে যে এত চমৎকার করা হয়েছে তা তিনি জানতেন না।

লাঞ্চ আওয়ারে বড় সাহেব ডেকে পাঠালেন।

বড় সাহেবের ঘরে এয়ারকুলার আছে। সেটি বোধহয় কাজ করছে না। জলিল সাহেবের গরম লাগছে। প্রচণ্ড গরম। বড় সাহেবের পাশে নাজমুল হুদা সাহেব বসে আছেন। চেক-চেক শার্টের জন্যে তাঁর বয়স খুব কম লাগছে। কিন্তু শার্টের ছাপাটা ভালো না। কেমন যেন চোখে লাগে। জলিল সাহেবের চোখ কড়কড় করতে লাগল।

জলিল সাহেব।

জি স্যার।

বসেন। দাঁড়িয়ে আছেন কেন ?

জলিল সাহেব বসলেন।

সকালবেলার দিকে একবার আপনার খোঁজ করেছিলাম।

জলিল সাহেব জুতা ছেঁড়ার ব্যাপারটা বলতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু বলতে পারলেন না। গলায় কথা আটকে গেল। বড় সাহেব শান্ত স্বরে বললেন, হেড অফিস থেকে চিঠি এসেছে। তারা আপনাকে অফিসার্স গ্রেডে প্রমোট করেছে। আপনার সার্ভিসে হেড অফিস খুব স্যাটিসফায়েড।

জলিল সাহেব শুকনো চোখে তাকিয়ে রইলেন।

নজমুল হুদা সাহেবের পাশের কামরাটাতে আপনি আপাতত কাজ শুরু করুন। জিনিসপত্র কিছু লাগলে রিকুইজিশন স্লিপ দিয়ে স্টোর থেকে নিয়ে নেবেন।

বড় সাহেব হাত বাড়িয়ে বললেন, কনগ্রাচুলেশন!

হাতটি যে হ্যান্ডসেকের জন্যে বাড়ানো জলিল সাহেব অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝতে পারলেন না। যখন বুঝতে পারলেন তখন তার চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। তিনি ধরাগলায় বললেন, স্যার, জুতাটা ঠিকমতো সেলাই করেনি। একটা পেরেক উঁচু হয়ে আছে। খুব ব্যথা লাগছে।

ক্যান্টিনে সবাই বোধহয় তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিল। তাঁকে আসতে দেখে সবাই উঠে দাঁড়াল। ডিসপাস সেকশনের মেয়েটি হাসিমুখে বলল, স্যার, আপনার সম্মানে আজ আমরা সবাই দুপুরে একটু বিশেষ খাওয়া-দাওয়া করব। নজমুল হুদা সাহেবও খাবেন আমাদের সঙ্গে।

কিছু একটা বলা দরকার। সবাই হাসি-হাসি মুখে তাকিয়ে আছে তার দিকে। জলিল সাহেব বিড়বিড় করে বললেন, জুতাটা ঠিকমতো সেলাই করেনি। একটা পেরেক উঁচু হয়ে আছে।

কাদের মিয়া বিরিয়ানি এবং একটি করে টিকিয়া আনতে স্টেডিয়ামে গেছে। জলিল সাহেব তাঁর নিজের লাঞ্চ বাক্সটি হাতে করে চুপচাপ বসে রইলেন। তাঁর খুব ইচ্ছা

করছিল ডিসপাস সেকশনের মেয়েটিকে লাঞ্চ বক্সটি খুলে দেখান। কারণ সেখানে রুটি এবং আলু ভাজা ছাড়াও একটা খেজুর গুড়ের সন্দেশ আছে। রোজ-রোজ এক জিনিস খেতে কষ্ট হয় ভেবেই বাড়ি থেকে মেয়েটি দিয়ে দিয়েছে। তিনি খুব আপত্তি করেছিলেন। কিন্তু মেয়েটি শোনেনি। মেয়েজাতটা হচ্ছে মায়াবতীর জাত। শুধু শুধু মায়া দেখায়। জলিল সাহেবের চোখ আবার ভিজে উঠল। ডিসপাস সেকশনের মেয়েটি বলল, স্যার, আপনার কষ্ট হচ্ছে। আপনি বরং জুতাটা খুলে রাখেন।

খেলা

খায়রুন্নেসা গালর্স হাইস্কুলের থার্ড স্যার, বাবু নলিনি রঞ্জন একদিন দুপুরবেলা দাবা খেলা শিখে ফেললেন। এই খেলাটি তিনি দুচোখে দেখতে পারতেন না। দুজন লোক ঘণ্টার পর ঘণ্টা একটা বোর্ডের দিকে বিরক্তিকর ভঙ্গিতে তাকিয়ে থাকবে; মানে হয় কোনো ? তবু তাঁকে খেলাটা শিখতে হলো। জালাল সাহেব জিওগ্রাফি স্যার, তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু। জালাল সাহেবের কথা ফেলতে পারলেন না। টিফিন টাইমে তিনি শিখলেন বড়ে কীভাবে চলে, ঘোড়া কী করে আড়াই ঘরের লাফ দেয়, গজ শুঁড় উঁচু করে কোণাকুণি দাঁড়িয়ে থাকে। জালাল সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, ব্রেইনের খেলা, বুঝলে পণ্ডিত ? বুদ্ধির চর্চা হয়।

বুদ্ধির চর্চা কী করে হয় নলিনি বাবু সেটা ঠিক বুঝতে পারলেন না, কিন্তু প্রথম খেলাতেই জালাল সাহেবকে হারিয়ে দিলেন। জালাল সাহেব ফ্যাকাশেভাবে হাসতে হাসতে বললেন, হেলাফেলা করে খেলেছি বলে এই অবস্থা। হবে নাকি আরেক দান ?

আরেক দানের সময় ছিল না। ফোর্থ পিরিয়ডে ইংলিশ কম্পোজিশন। নলিনি বাবু উঠে পড়লেন। ক্লাসে ভালো পড়াতে পারলেন না। মাথার মধ্যে খুব সূক্ষ্মভাবে দাবা খেলাটা ঘুরতে লাগলে। এরকম তাঁর কখনো হয় না।

ছুটির পর দুহাত খেলা হলো। জালাল সাহেব শুকনো হাসি হেসে বললেন, তোমার সঙ্গে দেখি চিন্তাভাবনা করে ডিফেনসিভ খেলা দরকার।

তৃতীয় খেলাটিতে জালাল সাহেব প্রচুর চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। তাঁর আছরের নামাজ কাজা হয়ে গেল। খেলা চলল সন্ধ্যা পর্যন্ত। দফতরি বাচ্চু মিয়া ঘর বন্ধ করতে না পেরে অত্যন্ত বিরক্ত মুখে বারান্দায় হাঁটহাটি করতে লাগল। খেলার শেষে জালাল সাহেব ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেললেন। নলিনি বাবু বললেন, তুমি দেখি মনমরা হয়ে গেছ।

জালাল সাহেব বললেন, আরেক হাত খেল। লাস্ট দান। এইবার আর পারবে না, খুব ডিফেনসিভ খেলব।

আজ থাক। ট্যুইশনি আছে।

কতক্ষণ আর লাগবে! খেল দেখি।

শেষ খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো। জালাল সাহেব ঘনঘন নিঃশ্বাস ফেলতে লাগলেন। নলিনি বাবু বললেন, চল যাওয়া যাক।

আরেক হাত খেল।

আর না, রাত হয়েছে।

খেল তো, রাত বেশি হয় নাই।

নলিনি বাবু আবার বসলেন।

তাঁর জয়যাত্রা শুরু হলো। নিয়ামতপুরের লোকজন কিছুদিনের মধ্যেই জেনে গেল এ শহরে অসম্ভব ভালো একজন দাবাড়ু আছেন। তাঁকে কেউ হারাতে পারে না। তাঁর সেই খ্যাতি পরের পনেরো বছর পর্যন্ত অক্ষুণ্ন রইল।

পনেরো বছর দীর্ঘ সময়। এই সময়ে তাঁর দুটি দাঁত পড়ল। বাঁ চোখে ছানি পড়ল। এবং তিনি অ্যাসিসটেন্ট হেডমাস্টার হিসেবে শ্রাবণ মাসের এক মেঘলা দুপুরে রিটায়ার করলেন। তার বিদায় সংবর্ধনা উপলক্ষে লেখা মানপত্রে বলা হলো— 'বাবু নলিনি রঞ্জন দাবার জগতের একজন মুকুটহীন সম্রাট। তিনি বাংলাদেশ দাবার চ্যাম্পিয়ন জনাব আসাদ খাঁকে পর পর তিনবার পরাজিত করে দাবার জগতে এক ইতিহাস সৃষ্টি করেছিলেন।'

কথাটি সত্যি। আসাদ খাঁর শালীর বাড়ি নিয়ামতপুর। তিনি কোনো এক অশুভক্ষণে শালীর বাড়ি বেড়াতে এসেছিলেন এবং কৌতূহলী হয়ে খেলতে বসেছিলেন। তাঁর ধারণা ছিল মফস্বলে যা হয়ে থাকে মোটামুটি ধরনের একজন খেলোয়াড়কে নিয়ে সবাই মাতামাতি করে, এও সেরকম। খেলতে বসেও তার সে ভুল ভাঙল না। তিনি দেখলেন রোগা এবং বেটে এই লোকটি ওপেনিং সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানে না। যারা সাধারণ দু'একটা বইটই পড়েছে তারাও যেসব জানে এ লোকটি স্বাভাবিক কারণেই সেসব কিছু জানে না। যার ফলে পঞ্চম চালের ম্যথায় আসাদ খাঁ নলিনি বাবুর রাজার সামনের বড়েটি নিয়ে নিলেন। তিনি অবহেলার একটা হাসিও হাসলেন। কিন্তু সেই হাসি তাঁর ঠোঁটে ঝুলে পড়ল যখন দেখলেন কৃশকায় এই বেঁটে লোকটি তার দুটি ঘোড়া নিয়ে হঠাৎ করেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আসাদ খাঁ খুবই অবাক হলেন, কিন্তু নিয়ামতপুরের লোকজন এমন ভাব করতে লাগল যে, এর কাছে হারার মধ্যে অবাক হবার কিছু নেই।

আসাদ খাঁর সে-বছর শালীর বাড়ি বেড়াতে আসার সমস্ত আনন্দ ধুয়ে মুছে গেল। নেত্রকোনা থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক পত্রিকায় লেখা হলো— 'নিয়ামতপুর নিবাসী প্রবীণ দাবাড়ু, খায়রুন্নেসা গালর্স হাইস্কুলের শিক্ষক বাবু নলিনি রঞ্জন বাংলাদেশ দাবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করিয়াছেন। উল্লেখ্য

যে, নিয়ামতপুরের গৌরব এই কীর্তিমান দাবাড়ু বিগত দশ বৎসরে কাহারো নিকট পরাজিত হন নাই ... ।'

ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি। নলিনি বাবু শুধু জিতেই গেছেন। অনেক দূর দূর থেকে লোকজন খেলতে আসত তার সঙ্গে। একবার দাবা ফেডারেশনের সেক্রেটারি এক বিদেশীকে নিয়ে উপস্থিত হলেন। এতবড় ঘটনা নিয়ামতপুরে আর ঘটেনি। যারা দাবা খেলার কিছুই বুঝে না, তারাও এসে ভিড় করল। টিফিনের পর খায়রুন্নেসা গার্লস হাইস্কুল ছুটি হয়ে গেল। ফেডারেশনের সেক্রেটারি দু'বার বললেন, আপনি খুব সাবধানে খেলবেন। যাকে নিয়ে এসেছি তিনি বেলজিয়ামের লোক। খুব উঁচুদরের খেলোয়াড়।

আমি সাবধানেই খেলি।

তাড়াহুড়া করে চাল দেবার দরকার নাই, বুঝলেন ?

নলিনি বাবু মাথা নাড়লেন, বুঝেছেন।

এঁর সঙ্গে গিয়াকো পিয়ানো ডিফেন্স খেলাই ভালো। সেই ডিফেন্স জানেন তো ?

জি-না। জানি না।

সেক্রেটারি সাহেবের ভ্রু কুঞ্চিত হলো। সেই কুঞ্চন আরো গাঢ় হলো যখন দেখলেন, নলিনি বাবু পিকে ফোর-এর উত্তরে আর ফোর দিয়ে বসে আছেন।

কী করছেন আপনি ? এঁর সঙ্গে এক্সপেরিমেন্ট করছেন নাকি ? এটা কী দিলেন ?

সাহেবটিও ইংরেজিতে কী যেন বলল। বাবু নলিনি রঞ্জন ইংরেজির শিক্ষক, কিন্তু কিছু বুঝতে পারলেন না। সেক্রেটারি সাহেব মুখ কালো করে বললেন, প্রশিক্ষণহীন প্রতিভা দেখাতে নিয়ে এসে বড় বেইজ্জতীর মধ্যে পড়লাম দেখি।

খেলা হলো তিনটি। একটি ড্র হলো, দু'টিতে নলিনি বাবু জিতে গেলেন। সেক্রেটারি সাহেবের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

আপনি ঢাকাতে খেলতে আসেন না কেন ?

ট্যুইশনি আছে। তাছাড়া শরীরটা ভালো না। হাঁপানি।

আরো না না। আপনি আসবেন ভাই।

দরিদ্র মানুষ, টাকা-পয়সা নাই।

আরে আপনি আবার কিসের দরিদ্র ?

সেক্রেটারি সাহেব জড়িয়ে ধরলেন নলিনি বাবুকে।

কাজেই শ্রাবণ মাসের মেঘলা দুপুরে বাবু নলিনি রঞ্জনের বিদায় সংবর্ধনায় বারবার ঘুরে ফিরে দাবার কথা এলো। এবং সভার শেষে সভাপতি, স্কুল কমিটির সেক্রেটারি ও পৌরসভা চেয়ারম্যান, সুরুজ মিয়া অত্যন্ত রহস্যময় ভঙ্গিতে ঘোষণা করলেন যে, নিয়ামতপুরের গৌরব দাবার অপরাজের নক্ষত্র বাবু নলিনি রঞ্জনের প্রতি বিশেষ সম্মান প্রদর্শনের জন্যে তিনি একটি ব্যবস্থা করেছেন। পনেরো হাজার

টাকার একটি চেক দিচ্ছেন স্কুল ফান্ডকে। যদি কেউ নলিনি বাবুকে হারাতে পারে তাহলে তাকে এই টাকাটি দেয়া হবে। আর যদি কেউ হারাতে না পারে, তাহলে স্কুল ফান্ড নলিনি বাবুর মৃত্যুর পর এই টাকাটা পাবে।

সভায় তুমুল করতালি হলো। হেডমাস্টার সাহেবকে পনেরো হাজার টাকার চেকটি উঁচু করে সবাইকে দেখাতে হলো। সুরুজ মিয়া যে এমন একটি নাটকীয় ব্যাপার করতে পারেন তা কারো কল্পনাতেও আসেনি।

আশ্বিন মাসের এক সন্ধ্যায় নলিনি বাবুর হাঁপানির টান খুব প্রবল হলো। বাতাস তার কাছে ক্ষীণ মনে হলো। ফুসফুস ভরাবার জন্যে তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর গলার কাছে একটি রগ বারবার ফুলে উঠতে লাগল। এই অবস্থাতেও তিনি তাঁর জীবনের শেষ খেলাটি খেলতে বসলেন। এই খেলাটি তিনি খেলবেন হারবার জন্যে। তিনি আজ হারবেন তাঁর দীর্ঘ দিনের বন্ধু জালাল সাহেবের কাছে। জালাল সাহেব পনেরো হাজার টাকা জিতে নেবেন। সেই টাকায় নলিনি বাবুর চিকিৎসা হবে। শীতের জন্যে গরম কিছু কাপড় কিনবেন, শীতে বড় কষ্ট হয় তার।

খেলা হচ্ছে স্কুলঘরে। জালাল সাহেব চ্যালেঞ্জের খেলা খেলছেন। অনেকেই এসেছে কৌতূহলী হয়ে। নলিনি বাবুর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। একটা ভুল চালে তাঁর গজ খোয়া গেল। তার কিছুক্ষণ পর একটা নৌকা পিনড হয়ে গেল। অস্ফুট গুঞ্জন উঠল চারদিকে। নলিনি বাবু দেখলেন জালাল সাহেবের চোখ দিয়ে জল পড়ছে। পনেরো বছরের অপরাজেয় দাবা চ্যাম্পিয়ন আজ পরাজিত হতে যাচ্ছেন। জালাল সাহেবের মুখ অস্বাভাবিক বিবর্ণ। চাল দেবার সময় তাঁর হাত কাঁপতে লাগল।

হোমিওপ্যাথ ডাক্তার সোবহান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, নলিনি বাবুর অবস্থা তো খুব খারাপ।

জালাল সাহেব ধরা গলায় বললেন, সব আমাদের নলিনির ভান, দেখবেন এক্ষুনি সব ঠিক করে ফেলবেন।

নলিনি বাবু ক্ষীণ স্বরে বললেন, তুমি কাঁদছ নাকি জালাল ?

না। চোখে কী যেন পড়ল।

জালাল সাহেব চোখের সেই অদৃশ্য জিনিসটা বের করবার জন্যে চোখ কচলাতে লাগলেন।

ক্ষীণ একটি হাসির রেখা কি দেখা গেল নলিনি বাবুর চোখে ? তিনি ঘোড়ার একটি কিস্তি দিলেন। রাজা সরে এলো এক ঘর। দ্বিতীয় কিস্তি দিলেন বড়ে দিয়ে, রাজা আরো এক ঘর সরল। নলিনি বাবু যেন অদৃশ্য কোনো নগরী থেকে তাঁর কালো গজটি বের করে আনলেন। সোবহান সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, কী সর্বনাশ! নলিনি বাবু গজটা বড়ের মুখে এগিয়ে দিয়ে বললেন, কিস্তি।

জীবনের শেষ খেলাটিতে বহু চেষ্টা করেও তিনি হারতে পারলেন না। সহায় সম্বলহীন অসহায় প্রায় বিনা চিকিৎসায় নিয়ামতপুরের গৌরবের মৃত্যু হলো ১২ই নভেম্বর ১৯৭৫ সন। রোজ মঙ্গলবার। খায়রুন্নেসা গার্লস স্কুল সে উপলক্ষ্যে দুদিন ছুটি থাকল।

শিকার

সে হাঁটে নিঃশব্দে।

যখন হাঁটে বাতাস পর্যন্ত কাঁপে না। নৈঃশব্দের চলাফেরা। কিন্তু মতি মিয়া টের পায়। অন্ধ মানুষদের এই একটি সুবিধা। এরা বাতাস শুঁকে অনেক কিছু বলে দিতে পারে। আজও পারল। মাথা ঘুরিয়ে বলল, কেডা যায় ? আজরফ নাহি ?

আজরফ জবাব দিল না। যে নিঃশব্দে হাঁটে সে ফস করে জবাব দেবে এটা আশা করা যায় না। মতি মিয়া আশাও করে না। দ্বিতীয়বার ডাকে, আজরফ! ও আজরফ মিয়া!

আজরফ জবাব দেয় না। জবাব দেয় তার পোষা বক। বকটির বয়স মাত্র পাঁচ, কিন্তু সে নব্বই বছরের বুড়োর মতো ডাকে— কক কক ককর। বড় কুৎসিত ডাক। মতি মিয়া নড়েচড়ে উঠে।

আজরফ, বক ধরতে যাস নাহি ?

হ।

যাইস না বাজান। সোনা চান আমার।

আজরফ চুপ করে থাকে।

পক্ষী ধরণ বালা না। বদদোয়া লাগে। আমারে দেইখ্যা বুঝস না ? ও আজরফ। আজরফ মিয়া।

কী ?

ব' তুই। তরে একটা গফ কই। ক্যামনে বদদোয়া লাগে হেই গফ।

আজরফ বসে না। গল্পের প্রসঙ্গ আসায় খাঁচার বকটি সম্ভবত উৎসাহী হয়। সে ডানা ঝাপ্টায় এবং দ্বিতীয়বার ডাকে— কক কক কক। মতি মিয়া জুত হয়ে বসে। কার্তিক মাসের নরম রোদ তার পিঠে। রোদের মধ্যে নেশাজাতীয় কিছু কি আছে ? কেমন যেন নেশা নেশা ভাব হয়, বড় ভালো লাগে মতি মিয়ার। এই বয়সে শরীর বাড়তি উত্তাপ চায়। মতি মিয়ার প্রতি রাতেই ইচ্ছা করে চারপাশে আগুন করে মাঝখানে বসে থাকতে। কিন্তু এখন মাত্র কার্তিক মাস। শীতও ভালো করে পড়েনি।

আজরফ আছস ?

হ।

বকপক্ষীর কথা কই। বড় হারামি পক্ষী। বুঝছস ?

বুঝলাম।

যে বক ধরে তার চউখ থাকে না। চউখ তার যায়। আইজ হউক, কাইল হউক— চউখ যায়। আমারে দেইখ্যা বুঝস না ?

বকপক্ষীর হারামিপনা বুঝাবার জন্যে মতি মিয়া তার বুজে যাওয়া চোখ মেলতে চেষ্টা করে। মেলতে অবশ্যি পারে না।

অ আজরফ!

কও হুনতাছি।

ব' আজরফ।

আজরফ বসে না। মতি মিয়ার পিঠে ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। মতি মিয়া গানের মতো সুরে কথা বলে, বকপক্ষী মরণ ঠোকর দেয়, বুঝছস ? আর ঠোকর দেয় জায়গামতো। পরথম ধাক্কায় যায় ডাইন চউখ, পরের ধাক্কায় বাঁও। দুনিয়া হয় আন্ধাইর। নয়নের মতো জিনিস নাইরে বাজান।

আজরফ শুনছে কি শুনছে না মতি মিয়া বুঝতে পারে না। খাঁচায় বন্দি বক ডানা ঝাপ্টায়। মতি মিয়া তাতেই উৎসাহ বোধ করে।

বক-মারার চউখ থাকে না রে আজরফ। আমারে দেইখ্যা বিবেচনা কর। নেজামের ভাইস্তার কথা মনে আছে ?

কোন নেজাম ?

মতি মিয়া উত্তেজনায় সোজা হয়ে বসে। নেজামের ভাইস্তার গল্প সবিস্তারে শুরু করে। কথা বলতে তার বড় আরাম লাগে। তাছাড়া পিঠের উপর কার্তিক মাসের চমৎকার রোদ। রোদের মতো ভালো জিনিস আছে। এক পর্যায়ে ঝিমুনি এসে যায় মতি মিয়ার।

আজরফ বসে থাকে উত্তরবন্দের নাবালে একটা জলা জায়গায়। তার এক হাতে বক ধরার ফাঁদ। কাঁচা বেতপাতা দিয়ে ঢাকা গোল করে বাঁধা একটা চাটাই। বকরা ক্ষীণদৃষ্টির পাখি। ফাঁদটাকে তাদের কাছে মনোরম একটা ঝোপের মতো লাগে। দড়ি দিয়ে বাঁধা পোষা বকটি বসে থাকে চাটাইয়ের মাথায়। সে আকাশের দিকে তাকিয়ে ঘনঘন ডাকে। সেই কর্কশ ডাকে বকদের প্রতি কোনো করুণ আবেদন থাকে নিশ্চয়ই। কারণ মুক্ত বকের দল তখন মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরতে থাকে। পোষা বকটি ক্রমাগত ডাকে। বকরা নিচে নেমে আসে। সন্দেহভরা চোখে তাকায়, তবু নেমে আসে। এবং একসময় পোষা বকটির পাশে এসে বসে। গভীর মমতায়

কিছু হয়তো বলতে চায়। কিন্তু সে সুযোগ হয় না। বক শিকারি একহাতে খপ করে তার পা ধরে বিদ্যুৎগতিতে তাকে নামিয়ে এনে পায়ের নিচে চাপা দেয়। দ্রুত হাত খালি করতে হয়। কারণ অন্য আরেকটি বক নামতে শুরু করেছে। সময় নেই মোটেই। বক নিচে নামনোর সময়টাই ভয়াবহ। হতচকিত পাখিটি একবার হলেও মরণ ঠোকর দিতে চেষ্টা করে। সে তখন খোঁজে মানুষের চোখ। একটা নরম তুলতুলে জায়গা যেখানে ঠোঁট অনেকখানি বসিয়ে দেয়া যায়। বক-মারার চোখ যায় বকের ঠোঁটে। প্রথমে ডানটি তারপর বাঁটি।

আজ পাখিরা আসছে না। বেলা হয়ে গেছে বোধহয়। রোদ চড়ে গেলে পাখিরা নিচে নামতে চায় না। আজরফ তাকাল আকাশের দিকে। আকাশ শূন্য এবং ঘন নীল। এমন নীল যে দৃষ্টি পিছলে যায়। তাকিয়ে থাকলে মাথায় সূক্ষ্ম যন্ত্রণা হয়। শূন্য নীল আকাশের মতো অদ্ভুত জিনিস আর আছে নাকি?

কিছু পাইছ আজরফ?

আজরফ তাকিয়ে দেখল মেম্বর সাব। মেম্বারজাতীয় লোকরা সবার সঙ্গেই দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ কথা বলে। এরা কথা বলতে বড় পছন্দ করে।

ওখনো মনে হয় কিছু পাও নাই?

জি-না।

কেমন ধরা পড়ে, ও আজরফ?

ঠিক নাই। কোনোদিন আট-দশটাও পাই।

কও কী! দুই টেকা কইরা বেচলেও তো বিশ টাকা। কত কইরা?

ঠিক নাই।

আজরফের কথা বলতে ভালো লাগে না। সে তাকায় আকাশের দিকে। দূরে একটি বক চক্কর খাচ্ছে। এটি কি নামবে? পোষা বকটি উত্তেজিত হয়ে উঠছে। ডানা ঝাপটাচ্ছে। আজরফ নিজের মনেই বলে, ডাক দেরে অনুফা। তর বন্ধুরে ডাক দে দেহি। পোষা বক (যার গোপন নাম অনুফা) ডাকে না, তৃষ্ণার্ত চোখে তাকায় আকাশের দিকে। মেম্বর সাহেবও তাকান। তারপর একসময় রবারের জুতায় জলভূমিতে ছপ ছপ শব্দ তুলে ডিসট্রিক্ট বোর্ডের সড়কে গিয়ে উঠেন। সেখানে দাঁড়িয়ে ছাতা নেড়ে বলেন, যাইরে আজরফ।

আজরফ তাকায় তার দিকে, ঠিক তখনি তাঁর বাঁ চোখ টনটন করে উঠে। চোখ দিয়ে পানি পড়তে শুরু করে। এটা খুব খারাপ লক্ষণ। এর মানে হচ্ছে বাঁ চোখটির সময় শেষ হয়ে এসেছে। ধরা পড়া বকগুলির কোনো একটি ঠোকরে তুলে নেবে বাঁ চোখ। কিংবা হয়তো পোষা বকটি মরণ ঠোকর দেবে । বড় হারামি পাখি। আজরফ তাকাল অনুফার দিকে। ফাঁদের মাথায় শান্ত ভঙ্গিতে সে বসে আছে। আজরফের চোখে জল জমে আছে বলেই সবকিছু অন্যরকম দেখাচ্ছে। ছোট্ট অনুফাকে দেখাচ্ছে প্রকাণ্ড সারস পাখির মতো। তার ঠোঁট দুটি সুবিশাল।

আজরফ শার্টের হাতায় চোখ মুছল, কিন্তু জল পড়া বন্ধ হলো না। যাবে, এবার বাঁ চোখটা যাবে। আজই বোধহয় যাবে।

সফদর আলির এরকম হলো। কথা নেই বার্তা নেই শুধু ডান চোখ দিয়ে জল পড়ে। সফদর ভাই দেখা হলেই বলত, ডাইন চউখটা এইবার যাইব। বুঝছস আজরফ ? এইটা নিশানা।

ক্যামনে কন ?

চউখের নিজের একটা জীবন আছে। হে বুঝে।

কথা ঠিক। তাঁর চোখ সত্যি সত্যি গেল। ভয়াবহ ব্যাপার! সফদর ভাইয়ের ভয়ঙ্কর চিৎকারে নবীনগরের সমস্ত মানুষের বুক কাঁপতে লাগল। পাখিরা কি কিছু বুঝতে পারে ? সফদর ভাইয়ের পোষা বক (যার নাম সোনা) ক্রমাগত ডাকতে লাগল, কক কক কক। সেই ডাক বেদনার ডাক, না আনন্দ-উল্লাসের ডাক ?—কোনোদিন জানা যাবে না।

সদর নেত্রকোনায়। নৌকায় যেতে লাগে দু'দিন। ন্যাকড়া পোড়া ছাই দিয়ে চোখ বেঁধে নৌকায় তোলা হলো সফদর আলিকে। মাথার কাছে বসে রইল আজরফ আর সফদর আলির ছোট ছেলেটা যার নামও সোনা। বড় খারাপ যাত্রা ছিল সেটি। একেকবার মাথা তুলে হো হো করে চিৎকার করে উঠত সফদর। তার ছেলেটাও তখন অবিকল বাবার মতো চেঁচাত, হো হো।

সদর হাসপাতালের বারান্দায় চারদিন শুয়ে থেকে পঞ্চমদিন সন্ধ্যায় তাঁর মৃত্যু হলো। চোখ বিষিয়ে গিয়েছিল।

আজরফ আকাশের দিকে তাকাল। আকাশ কেমন যেন ঘোলাটে হয়ে আসছে। দু'একটা সঙ্গীহীন বক উড়ে উড়ে যাচ্ছে। এরা এখন ঘুরবে। একা একা। ঝাঁক বাঁধার সময় এখনো হয়নি। ঝাঁক বাঁধা হবে আরো দু'মাস পর। তখন বকগুলি অন্যরকম হয়ে যাবে। পোষা বকের ডাকে আর নিচে নামবে না। কেন নামবে না ? জগতে অনেক অমীমাংসিত রহস্য আছে। এ জগৎ বড় রহস্যময়। চোখ যাবার সময় হলে সে কাঁদে। কেন কাঁদে ? আজরফ লুঙ্গির একপ্রান্ত টেনে চোখ মুছল। বড্ড জল পড়ছে। বেচারা খুব কাঁদছে। বোধহয় মরতে চায় না।

অনুফা মাথাটা কাত করে তাকে দেখছে। তার ছোট্ট চোখ দুটি টকটকে লাল। সে হঠাৎ কক কক করে ডেকে উঠল। সে কি কিছু বুঝে ফেলেছে নাকি ? বুঝে ফেলেছে যে আজ পাখি-মারা আজরফের বাঁ চোখটি যাবে। আর সে আসবে না ফাঁদ নিয়ে। উত্তরবন্দের নাবাল জমিটায় চুপচাপ এসে বসে থাকবে না।

পশুপাখিরা অনেক কিছু বুঝতে পারে। মতি মিয়ার ধারণা, ওরা মানুষের চেয়েও অনেক বেশি জানে। বেশি জানে বলেই গৃহস্থের মৃত্যুসংবাদ নিয়ে কুপাখি আসে। কু ডাক ডেকে বারবার উড়ে উড়ে যায়। গৃহস্থের পোষা কুকুর কাঁদে উঁ উঁ করে।

দীর্ঘদিনের বাস্তুসাপ হঠাৎ করে ঘর ছেড়ে যায়। মতি মিয়া বলে, বুঝছস আজরফ, পশুপাখি খুব বুঝদার। এইডা আমার কথা না, হযরত সোলায়মান আলায়হিস সালামের কথা। তারা সব বুঝে। সব না বুঝলে চউক্ষে ক্যান ঠোকর দেয় ? শইলে জায়গা তো আরো আছে। আছে না ? তুই ক' দেহি ?

আকাশে বকগুলি চক্কর দিতে দিতে নিচে নামতে শুরু করেছে। অনেকগুলি পাখি একসঙ্গে। এরকম তো হয় না। তাছাড়া রোদ চড়ে গেছে, এই সময় ওরা নিচে নামে না। এখন নামছে কেন ? ওরা কি সত্যি সত্যি টের পেয়েছে কিছু ?

আজরফের মনে হলো আজ বেশ কিছু সাহসী পাখি স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্যে তৈরি হয়েই নিচে নামতে শুরু করেছে। এদের ঠোঁট অসম্ভব ধারালো এবং নিশানা অব্যর্থ। আজ এরা একের পর এক ধরা দেবে। কোনোই বাধা দেবে না। এতটুকুও চমকাবে না। তারপর তাদের একজন বিদ্যুৎগতিতে ঠোঁট বসাবে তরল মাংসে। সেই পাখিটি হবে সতেজ স্বাস্থ্যবান পাখি। তার বসার ভঙ্গি হবে ঋজু ও গর্বিত। তার পালক হবে দুধের মতো সাদা। আজরফের পোষা বকটির মধ্যে অস্থিরতা দেখা গেল। সে ডাকল এবং ডাকতেই থাকল। পাখিরা চক্রাকারে নেমে আসছে। আজই সেই দিন। আজরফের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। তৃষ্ণা বোধ হলো। নিশ্বাস পড়তে লাগল ঘনঘন। পেটের মধ্যে কিছু একটা পাক খাচ্ছে। বমি আসছে।

পাখি ধরা ছেড়ে দিলে কেমন হয় ? ছেড়ে দেয়া কি যায় না ? এই মুহূর্তেই তো সে অনুফার বাঁধন খুলে দিতে পারে। পারে না কি ? ছেড়ে দিলেই অবশ্যি সে যাবে না। ঘুরে ঘুরে উড়তে থাকবে। বন্দি জীবনেরও একটা মায়া আছে। গত বৎসরও সে একবার তার বক ছেড়ে দিল। সেই বকটির নাম ছিল অন্তু। অন্তু ছাড়া পেয়েও উড়ে গেল না। ভীষণ অবাক হয়ে বারবার আজরফের মাথার উপর দিয়ে উড়তে লাগল। আজরফ বলল, যারে বেটা যা। পাখি ধরা ছাড়লাম। তুই যা।

অন্তু গেল না। চাটাইয়ের মাথায় বিষণ্ন ভঙ্গিতে বসে থাকলে।

যারে বেটা, পাখি-মারার কাম আর করতাম না। তুই যা।

অন্তু তবু বসেই রইল। তারপর একসময় খুবই অবাক হয়ে উড়ে গেল।

মতি মিয়ার ধারণা বক শিকারি কখনো শিকার ছাড়তে পারে না। বড় পাজি নেশা। জীবন্ত কিছু ধরে ফেলার মতো কড়া নেশা আর কিছু নেই। তাই পাখি-মারারা প্রতিবছরই একবার বলে, পাখি ধরা ছাড়লাম গো। আর না। বহুত হইছে।... তারপর দিন কাটায় খুবই বিষণ্নভাবে। কিছুতেই তখন আর মন বসে না। পরের বৈশাখে আবার সে বকের ছানা এনে পুষতে শুরু করে। কার্তিক মাসে সেই পোষমানা বক নিয়ে লাজুক ভঙ্গিতে ঘর ছেড়ে বের হয়। লোকজন বলে, কী মিয়া, আবার শুরু করলা ?

এই এট্টু।

পাখি-মারারা চোখ না যাওয়া পর্যন্ত ফিরতে পারে না। প্রথমে যায় একটি। নেশা তখন আরো বাড়ে। রক্তের মধ্যে ঝমঝম শব্দ হতে থাকে। কক কক ডাক শুনলেই স্নায়ু কাঁপতে থাকে উল্লাসে। তারপর যায় দ্বিতীয় চোখ। জগৎ অন্ধকার হয়। অন্ধকার না হওয়া পর্যন্ত এদের মুক্তি নেই। যখন সব অন্ধকার হয় তখন নেশা কেটে যায়। তখন তারা রাত জেগে পাখির ডানা ঝাপ্টানি শোনে। সুযোগ পেলেই তত্ত্বকথা বলে। অন্ধরা তত্ত্বকথা বলতে বড় ভালোবাসে।

আজরফ অনুফাকে ছেড়ে ছিল। যা ভাবা গিয়েছিল তাই। অনুফা একটু উড়ে গিয়েই আবার এসে বসল চাটাইয়ের মাথায়। আজরফ ক্লান্ত স্বরে বলল, হুস হুস যা ভাগ।

অনুফা গেল না। তার বসার ভঙ্গি ঋজু ও গর্বিত। তার পালক দুধের মতো সাদা। একটি সতেজ স্বাস্থ্যবান পাখি।

যা, ভাগ ভাগ। যা।

কক কক।

ভাগ ব্যাটা, ভাগ।

কক কক ককর।

পাখি মারা ছাড়ছি, তুই যা।

কক কক।

অনুফা তার ধবধবে সাদা পালকে ঠোঁট ঘসল। এর মানে কী ? এইটিই কি সেই পাখি ?

কড়া রোদ। আকাশ ঘোলাটে। অনেকগুলি পাখি চক্রাকারে উড়ছে। যেন সাহস দিচ্ছে অনুফাকে। আছি, আমরা আছি। আজরফের হৃৎপিণ্ড লাফাতে লাগল। শরীর ঝনঝন করছে। স্নায়ু টানটান হয়ে উঠছে। সময় নেই। আজই সেই বোঝাপড়ার দিন। অতি দ্রুত এখন অনুফার হলুদ পা ঝাপ্টে ধরে ফেলতে হবে। বিদ্যুৎগতিতে নামিয়ে আনতে হবে নিচে। আজরফ ঘাড় উঁচু করে তাকাল। অনুফাও তাকাল। আজরফের চোখে আবার জল আসছে। পাখিটিকে আবার প্রকাণ্ড মনে হচ্ছে। যেন সাদা পালকের অতিকায় একটি অচেনা পাখি। এর জন্ম অদেখা কোনো এক ভুবনে। মাথার উপর উড়তে থাকা বকগুলি দ্রুত নিচে নেমে আসছে। আজরফ হাত বাড়াল। আসছে, ওরা নেমে আসছে। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত কাঁপিয়ে তারা ডাকল— কক কক।

হ্যালো জরী ?

হ্যাঁ।

কেমন আছ ?

আপনি কে বলছেন ?

আমি একটু থমকে গেলাম। জরী কি সত্যি সত্যি আমার গলা চিনতে পারে না ? তা কেমন করে হয় ?

হ্যালো, কথা বলছেন না যে ?

আমি। আমি আনিস।

ও, তাই বলেন। আপনার কি ঠান্ডা লেগেছে ?

না তো।

গলার স্বর ভারী।

আমি ছোট্ট একটি নিশ্বাস গোপন করলাম। আমার গলার স্বর ঠিকই থাকে, কিন্তু জরীর কাছে কখনো মনে হয় ভারী, কখনো ভাঙা ভাঙা। কোনোদিন চিনতে পারে না।

হ্যালো জরী, তুমি কি আজ বাসায় থাকবে ?

কখন বলুন তো ?

এই ধর বিকেলে।

উঁহু, বিকেলে থাকব না। কেন ?

একটু দরকার ছিল। সন্ধ্যাবেলা থাকবে ?

না, সন্ধ্যাবেলা জুনু খালাদের বাসায় যাব।

কখন ফিরবে ?

তা কী করে বলব! জুনুখালা কি সহজে ছাড়বে ? রাতে হয়তো ফিরবই না।

জরী খিল-খিল করে হাসল। যেন রাতে না-ফেরাটা খুব একটা হাসি-তামাশার ব্যাপার।

হ্যালো আনিস ভাই, একটু ধরুন তো, কে যেন আমাকে ডাকছে। আসছি এক্ষুনি।

আমি টেলিফোন কানে লাগিয়ে বসে রইলাম। গ্রীন ফার্মেসির ছেলেটা আড়চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। তার মুখে বিরক্তির রেখা গাঢ় হতে শুরু করেছে। সে গম্ভীর স্বরে বলল, কতক্ষণ ফোন ধরে বসে থাকবেন ? ইম্পর্টেন্ট কল টল আসতে পারে। লাইন আটকে রাখলে চলে নাকি ?

এই যে ভাই একটু।

একটু একটু করে তো একঘণ্টা নিয়ে নিলেন।

আমি না শোনার ভান করে একটু ঘুরে দাঁড়ালাম। লাইনের ওপাশ থেকে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রথম কিছুক্ষণ পোঁ পোঁ শব্দ হচ্ছিল। এখন তাও নেই। চারদিকে অখণ্ড নীরবতা। জরী নিশ্চয়ই ভুলে বসে আছে। জরীর মা হয়তো রিসিভার উঠিয়ে রেখেছেন। ঘণ্টাখানেক পর আবার করলে কেমন হয়।

কিরে ভাই, আপনার হয়েছে ? না কানে নিয়ে আরো খানিকক্ষণ বসে থাকবেন ?

আমি টেলিফোন নামিয়ে রাখলাম। একটা ময়লা এক টাকার নোটও বাড়িয়ে দিলাম। পয়সা দিয়ে ফোন করি, তবু এমন যন্ত্রণা। ইচ্ছা করছিল একটা চড় দিয়ে ছেলেটার মুখে আঙুলের দাগ বসিয়ে দেই। হারামজাদা ছোটলোক! কিন্তু সেরকম কিছুই করি না। সারা মুখে একটা তেলতেলে ভাব এনে নরম স্বরে বলি, বিজনেস কেমন ?

সে জবাব দেয় না।

নেন একটা সিগারেট নেন।

সে নিতান্ত অবহেলায় সিগারেট ধরায়। আমার দিকে তাকায় না পর্যন্ত। রহমানকে বলে, এই শালাকে একটা ধোলাই দিলে দিলে কেমন হয় ? শালা হারামি।

আজ আমার কিছু করবার নেই। কোনোদিনই অবশ্যি থাকে না। তবে আজ আমি বিশেষ রকম ফ্রি। বাজার করতে যেতে হয়নি। বাবা বাজারে গিয়েছেন। তিনি সপ্তাহে দু'দিন বাজারে যান। আজ হচ্ছে সেই দু'দিনের একদিন। আজ তিনি দুপুর পর্যন্ত মাছের বাজারে ঘুরবেন। অসংখ্য মাছ টিপে টিপে দেখবেন এবং শেষ পর্যন্ত কিছু পচা মাছ কিনে অন্ধকার মুখে বাড়ি ফিরবেন। লেবুপাতা দিয়ে সেই মাছ রান্না হবে। বাড়িওয়ালার একটি লেবুগাছ আছে। তার পাতাগুলি আমরা পচা মাছ দিয়ে দ্রুত খেয়ে ফেলছি। সেদিন বাড়িওয়ালার মেয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলেছে, এ-কী, গোটা গাছটাই দেখি মুড়িয়ে ফেলেছে! এখন থেকে কেউ গাছে হাত দিতে পারবে না। এইসব সহ্য হবে না। গাছ তোলা সহজ ঝামেলা ?

বাড়িওয়ালার এই মেয়েটা দারুণ ক্যাটক্যাট করে। মেয়েটার অনেক বয়স। কিন্তু রোগা এবং বেঁটে বলে বয়সটা চোখে পড়ে না। মেয়েটির দাঁত ভাসা, তবে গায়ের রং দারুণ ফর্সা। ফর্সা রঙের যে-কোনো মেয়ে দেখলেই আমার মা মনে মনে সেই মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। এবং মা'র চোখে তার নানারকম গুণাবলি ধরা পড়তে থাকে। এই পুরুষালি মেয়েটি সম্পর্কে মা'র মন্তব্য হচ্ছে— বড় তেজি মেয়ে। আজকালকার যুগে তেজি মেয়েই দরকার। পুতু পুতু মেয়ে দিয়ে কাজ হয় না। আর চুল দেখেছিস ? হাঁটু পর্যন্ত। একবার চুল বাঁধতেই এই মেয়ের আধা সের তেল লাগে।

বাড়িওয়ালার এই মেয়েটির সঙ্গে আমার কোনো কথাবার্তা হয় না। সে আমাকে বখাটে ছেলে হিসেবে জানে। চোখে চোখ পড়লেই সে একটা অবজ্ঞার ভাব ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করে। আমি গায়ে মাখি না। এই যুগে কোনো কিছু গায়ে মাখতে নেই। এটা হচ্ছে গায়ে না-মাখার যুগ। সফিকের ভাষায়— 'মু মে লাথ মার ফিন ভি হাসেঙ্গি।' সে ইদানীং উর্দুতে বাতচিত করছে। কখন যে পাবলিকের হাতে মার খাবে। দিনকাল খারাপ। পাবলিক আজকাল সহজেই চেতে যায়।

আমি মতিঝিলের দিকে রওনা হলাম। গন্তব্য জলিলের অফিস। সেখান থেকেই জরীকে আবার একটা ফোন করা যাবে। বাসে গাদাগাদি ভিড়। সবগুলি মানুষের গা থেকে ঘামের গন্ধ আসছে। হানড্রেড হর্স পাওয়ারের গন্ধ। মাথা ঝিমঝিম করে। তবু তার মধ্যেই জরীর সঙ্গের কথাবার্তাগুলি রিহার্সেল দিয়ে রাখলাম।

হ্যালো জরী?

হ্যাঁ, ইস টেলিফোন রেখে দিয়েছিলেন কেন? আমার যা রাগ লাগছিল।

লাইনটা হঠাৎ করে কেটে গেল।

আমি তখন থেকে ফোনের সামনে বসে আছি।

সে-কী! কোথায় যে যাবার কথা ছিল। যাওনি?

যাব কীভাবে? আপনি যদি ফোন করেন।

শোন জরী, হ্যালো।

বলুন, শুনছি।

আমার পাশের লোকটি হঠাৎ করেই তার কোমর ঝাঁকুনি দিল। ফোনের কথাবার্তা থেমে গেল। জরীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার সময় আমার মনটা অস্বাভাবিক তরল অবস্থায় থাকে বলে আমি কিছুই বললাম না। তবে আমার পাশের রোগামতো লোকটি ঠান্ডা গলায় বললেন, ভাইজান, আপনার পাছাটা সামলে রাখেন। বেশি নড়াচড়া করছে। পাছা নাড়ানো লোকটি চোখ লাল করে তাকাল। লোকটি বিশাল। সে থমথমে স্বরে বলল, কী কইলেন?

শুনলেন তো কী বললাম। পাছা সামলান।

খবরদার!

কাকে খবরদার বলেন? ঘাড় ধরে নামিয়ে দেব বুঝলেন। এটা পাবলিক বাস।

পাছা দোলানো লোকটি থমকে গেল। রোগা লোকটির সাহসের তারিফ করতে হয়। মুক্তিযোদ্ধা ছিল বোধহয়। আমি একটু সরে গিয়ে ওদের জায়গা করে দিলাম। বোঝাপড়া করতে চাইলে করুক। কিন্তু মোটা লোকটি ভড়কে গেছে। লোকটির দেহটাই বিশাল, সাহস নেই। সে প্রেসক্লাবে অন্য একজনের মা মাড়িয়ে নেমে গেল।

জলিল অফিসেই ছিল। সাধারণত থাকে না। এটা তার নিজের অফিস। নিজের অফিসে না থাকলে কিছু যায় আসে না। জলিল আমাকে দেখেই ভ্রু কুঁচকাল। এটা

সে নতুন শিখেছে। পয়সা হবার পর মানুষ যে জিনিসটা প্রথম শিখে তা হচ্ছে ভ্রু কুঁচকানো। তারপর শিখে কাঁধ ঝাকানো। জলিল কাঁধও ঝাঁকাল। এটা বিশেষ ভালো হলো না। ঠিকমতো শিখে উঠতে পারেনি বোধহয়।

কিরে তুই যে, কী মনে করে ?

আসলাম।

তা তো দেখতেই পাচ্ছি। চাস কী ?

চাই না কিছু।

টাকাপয়সা চাইলে পাবি না। বন্ধুবান্ধবদের ধার দেয়া বন্ধ করে দিয়েছি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। ঐদিন শফিক এসে দু'শ টাকা নিয়ে গেল। না দিয়ে পারলাম না। খুব ঝুলাঝুলি।

দিয়ে ভালোই করেছিস।

আর ভালো! ঐ পয়সা কি আর ফেরত পাব ? জলে গেছে।

এত পয়সা তোর, যাক না কিছু জলে।

জলিল খুশি হলো। এই প্রথম তার মুখে হাসির একটা আভাস দেখলাম। জলিলকে খুশি করবার সবচে' ভালো বুদ্ধি হচ্ছে ওর টাকাপয়সা নিয়ে কথা বলা।

কি লাল হয়ে যাচ্ছিস ?

ধুর, কী যে বলিস! বহু কষ্টে পাঁচ লাখ টাকার একটা কাজ ম্যানেজ করেছি। একটা কালভার্ট। তবে মারজিন থাকবে না। নানান লোকদের খাওয়াতে হবে।

শালা, তুইই উঠে গেলি আমাদের মধ্যে।

উঠে গেল কথাটা ঠিক না। জলিল বরাবর উঠেই ছিল। তাদের দু'পুরুষের ব্যবসা। ইটের ব্যবসা। তিন-চারটা নাকি ব্রিক ফিল্ড আছে। ব্যবসাদারের ছেলেপুলেরাও পড়াশোনা করে। এবং দেখা গেল ভালোই করে। এমএ-তে দিব্যি সেকেন্ড ক্লাস ম্যানেজ করে ফেলল। তারপর একদিন শুনলাম বিজনেস শুরু করেছে। মতিঝিলে অফিস। শফিককে নিয়ে দেখতে এলাম। তেমন কিছু না। ময়লা ময়লা আসবাব। সোফার গদি ছেঁড়া। একটা স্টেনো আছে, শাকচুন্নীর মতো দেখতে। কথা বলে নাকে। তবে জলিল জমিয়ে ফেলল। ওদের রক্তের মধ্যে ব্যবসা। ধাই ধাই করে উঠে গেল। শাকচুন্নীর মতো স্টেনোটা পর্যন্ত সুন্দর হয়ে গেল। শফিক একদিন বলেই ফেলল, বেটি দেখতে খারাপ না। লদকা লদকি করব ? প্রথম লদকা লদকি তারপর হাম তোম। তবে স্টেনোটা আমাদের মোটেই পাত্তা দিল না। তার বড় সাহেবের আমরা হচ্ছি বোসম ফ্রেন্ড, তাতে তার কোনো মাথাব্যথা নেই। চোখ তুলে তাকায় না পর্যন্ত। শালী!

জলিল বলল, চা-টা কিছু খাবি ?

দিতে বল।

নাকি কফি দিতে বলব ? ভালো কফি আছে।

শালা কফি ধরেছিস নাকি ?

ধরতে হয়। নানান ধরনের লোকজন আসে। বাংলাদেশে ব্যবসা করা মুশকিল আছে।

মুশকিল থাকবেই। মাগনা কেউ পয়সা দিবে নাকি ?

জলিল সিগারেট বের করে ধরাল। দামি জিনিস। কিন্তু প্যাকেটটা আমার দিকে বাড়াল না। ইচ্ছা হলে তুলে নিতে পার এই ভাব। নিজ থেকে দেবে না। ইঙ্গিতও করবে না। এই কায়দাটিও সে নতুন শিখেছে। ইউনিভার্সিটিতে দেদার বিলাতো। তার সঙ্গে আমাদের খাতিরের মূল কারণই ছিল ফ্রি সিগারেট।

কফি চলে এলো। আমি অন্যদিকে তাকিয়ে ওর প্যাকেট থেকে সিগারেট নিলাম। জলিল গম্ভীর হয়ে বলল, করছিস কী এখন ?

কিছু করছি না।

না করলে হবে নাকি ? কিছু একটাতে লেগে পড়।

দেখি।

দেখতে দেখতে তো চুল পাকিয়ে ফেলছিস। পাবলিক ওয়ার্কসের ঐ চাকরিটা কি হলো ? হয় নাই ?

এটাতে আমার ইন্টারেস্ট নাই। বোগাস জিনিস।

বোগাস কেন ?

আমি জবাব না দিয়ে বললাম, একটা টেলিফোন করব।

জলিল সঙ্গে সঙ্গে মুখ অন্ধকার করে ফেলল।

আমার এইখানে যেই আসে তারই দেখি টেলিফোন করা লাগে। ঐ দিন শফিক এসে চিটাগাংএ কল করল। এটা কি টেলিফোন এক্সচেঞ্জ নাকি ?

পয়সা দেব শালা। মাগনা করবা না।

পয়সার গাছ হয়েছে তো তোর। কোথায় করবি ? সেই তোর জরিনা না কী যেন, তার কাছেই নাকি ?

আমি জবাব দিলাম না।

কেন খামাখা ঝুলাঝুলি করছিস। ঐ মেয়ে তোর সাথে ভিড়বে নাকি ? শুধু খেলাবে।

বুঝলি কী করে খেলাবে ?

ঐসব বোঝা যায়।

জলিল হাই তুলল। শালা হামবাগ দু'টা পয়সা হাতে আসতেই সবকিছু বুঝে ফেলছে।

ঐসব চিন্তা বাদ দে। চোখ বুঁজে কোনো একটা কিছুতে লেগে পড়। বিজনেস করতে চাস সুযোগ সন্ধান দিতে পারি।

চুপ থাক। বিজনেস আমি করব না। ছোটলোকের কাজ। ঐসব পোষায় না।

জলিল মুখ কালো করে ফেলল। ব্যাটাকে আরেকটু ঘায়েল করবার জন্যে আমি সরু গলায় বললাম, বিজনেসওয়ালাকে বাড়িওয়ালা বাড়ি ভাড়া দেয় না। মেয়ের বাপ মেয়ে দেয় না। বাংলাদেশে বিজনেসম্যানরা হচ্ছে শিডিউল কাস্ট। কই, দেখি টেলিফোনটা।

জলিল ফোন এগিয়ে দিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরালো। তার মুখ কালো। আমি তার আঁতে ঘা দিয়েছি। নীলুফার নামের একটি মেয়ের প্রতি তার কিছু রস সঞ্চার হয়েছিল। মেয়ের বাবা রাজি হননি। সোজা বলে দিয়েছেন— বিজনেসম্যানের কাছে মেয়ে দিব না। মাসখানেক জলিল খুব গম্ভীর ছিল। অফিসে গেলে কথা বলত না। চা খাওয়াতে বললে বলত, চা হবে না, চিনি নেই। খসরুকে একদিন তো চূড়ান্ত অপমান করল। খসরু ঘরে ফিরবার জন্যে দশটা টাকা চেয়েছিল রিকশা ভাড়া। জলিল বলেছে, হেঁটে হেঁটে বাড়ি যা। ভিক্ষার পয়সায় রিকশা চাপতে লজ্জা লাগে না?

ভিক্ষা কোথায়? ফেরত দেব।

বড় বড় বাত দিয়ে লাভ নাই। ফেরত দেবার মুরোদ তোর নেই।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। ভিক্ষাই করবি সারা জীবন। ভিক্ষা করবি আর ভিক্ষার পয়সায় রিকশা চড়বি। তোদের আমার চেনা আছে।

মুখ সামলে কথা বল শালা। একটা ফর্টি নাইন বসিয়ে দেব মুখে।

সেটা পারলেও তো কাজ হতো। সেটাও পারবি না। চোটপাট যা করবার মুখেই করবি। তোদের আমি চিনি।

হ্যালো জরী।

হ্যাঁ। কে কথা বলছেন?

আমি। আমি আনিস।

বুঝতে পারছি। কিছু বলবেন?

তুমি আমাকে টেলিফোন ধরিয়ে রেখে কোথায় গেলে, তারপর আর এলে না।

ওমা কখন!

আমি ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললাম। সত্যি কি তার মনে নেই? না ইচ্ছা করে ভান করছে। জরী ভান করার মেয়ে নয়।

হ্যালো জরী।

বলুন।

তোমার সঙ্গে আমার একটু কথা ছিল।

কথা থাকলে বলুন। শুনছি।

টেলিফোনে বলা যাবে না।

এমন কী কথা যা টেলিফোনে বলা যাবে না?

আমি সামনাসামনি বলতে চাই। কবে তুমি ফ্রি থাকবে বলো তো।

আমি ফ্রি নেই। বাড়িভর্তি মেহমান, নানান ঝামেলা। এদিকে সামনের সপ্তাহে নেপাল যাচ্ছি।

কোথায় যাচ্ছ?

নেপাল। দুলাভাই নিয়ে যাচ্ছেন। প্রথম কথা ছিল কক্সবাজার যাব। পরে হিসাব করে দেখলাম কক্সবাজার যেতে যে খরচ নেপাল যেতে একই খরচ। শেষে নেপাল যাওয়া ঠিক হলো।

কতদিন থাকবে?

বেশিদিন থাকা যাবে না। এক সপ্তাহ। ওখানে থাকার খরচ খুব বেশি। টুরিস্ট স্পট তো। আমেরিকানরা এসে এসে সব জিনিসের দাম বাঁড়িয়ে ফেলেছে। আচ্ছা রাখি?

হ্যালো জরী।

বলুন। একটু তাড়াতাড়ি বলুন, মা আমাকে ডাকছে। হ্যালো, বলুন কী বলবেন। হ্যালো।

আমি কিছু বললাম না। ঠিক সেই মুহূর্তে বলার কিছু পাওয়া গেল না। জলিল বলল, কী, কথা শেষ?

হুঁ।

কী করবি এখন? বাড়ি যাবি?

হুঁ।

আমি উঠে পড়লাম। জলিল বলল, চল নিউমার্কেট পর্যন্ত লিফট দেই। সোভাহান, গাড়ি বের করতে বলো তো।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম।

গাড়ি কিনেছিস নাকি?

এখনো পুরোপুরি কিনিনি। ট্রায়াল দিয়ে দেখছি। এক সপ্তাহর জন্যে ট্রায়াল দিতে এনেছি। তবে বোধহয় কিনব।

দাম কত?

এক লাখ চায়। পুরনো গাড়ি, কিছু কমাবে। আমি সত্তরে আছি। এর বেশি হলে নো। খুব টাইট অবস্থা আমার।

জলিল আত্মপ্রসাদের হাসি হাসল। গাড়িতে উঠে নিজ থেকেই সিগারেটের প্যাকেট বাড়িয়ে দিল।

দেখিস ভাই গাড়িতে ছাই ফেলিস না। একটু টিপটপ কন্ডিশনে রাখতে চাই। দেখ হাতলের কাছে ছাইদান আছে।

আমি খুব সাবধানে ছাইদানে ছাই ফেলতে লাগলাম। জলিল গম্ভীর গলায় বলল, সোভাহান সরোদটা দাও তো।

দারুণ আরামের গাড়ি। আরামে চোখ বন্ধ হয়ে আসে। জলিল বলল, কালারটা কেমন দেখছিস ? সোবার না ?

হুঁ।

আরেকটা পেয়েছিলাম, লাল। লাল আমার পছন্দ না। এত দাম দিয়ে একটা জিনিস কিনব, কী বলিস ?

তা তো ঠিকই।

এই লাইনে গাড়িটা হচ্ছে একটা নেসিসিটি। নানান ধরনের পার্টির কাছে যেতে হয়। সব জায়গায় রিকশা চেপে গেলে মান থাকে না।

তা তো ঠিকই। তুই এখন মানী লোক।

ঠাট্টা করছিস নাকি ?

না, ঠাট্টা করব কেন!

সরোদ কেমন লাগছে ?

ভালোই।

ভালো বললে হয় না। বুঝলি, ক্ল্যাসিক জিনিস।

হুঁ।

নে নে আরেকটা সিগারেট নে।

থাক। এইমাত্র তো খেলাম।

তাহলে রেখে দে একটা। ভাত খাওয়ার পর খাস।

জলিল আমাকে যথেষ্ট খাতির করল। বাসার সামনে এনে নামিয়ে দিল।

খেতে বসে দেখি বাবা আজ ভালোই বাজার করেছেন। মাছ পচা নয়। টাটকা সরপুঁটি। মা হাসিমুখে বললেন, বাজারে আজ মাছ সস্তা গেছে।

তাই নাকি ?

হুঁ।

বাবা আজ অফিসে যাননি দেখলাম।

তার শরীরটা ভালো না।

কী হয়েছে ?

বুকে নাকি ব্যথা করছে। শুয়ে আছেন। বয়স হয়েছে তো।

দুপুরের খাওয়াটা ভালোই হলো। তবে বেচারা বাবা খেতে পারলেন না। বিছানায় উবু হয়ে শুয়ে রইলেন।

বিকালে তোর বাবাকে মগবাজারে নিয়ে যাস।

ঠিক আছে।

মগবাজারে আমার এক মামা থাকেন। ডাক্তার। বিনা পয়সায় আমাদের চিকিৎসা করেন। চিকিৎসা ভালোই করেন। রোগ সারে।

পান খাবি ?

দাও একটা।

মা পান এনে দিলেন। তাকে হাসিখুশিই মনে হলো। তিনি বিছানায় পা উঠিয়ে বসলেন।

বাড়িওয়ালীর বউ এসেছিল আজকে, বুঝলি।

কেন ?

নানান গল্পগুজব করল। শেষে বলল, আমার মেয়েটার জন্যে একটা ছেলে দেখেন না আপা। ভালো পরিবারের শিক্ষিত ছেলে হলেই হবে। চাকরিবাকরি বা ব্যবসা বাণিজ্যের একটা কিছু ব্যবস্থা আমরাই করব।... নজরটা তোর দিকে, বুঝলি তো ?

তুমি কী বললে ?

আমি কিছু বলি নাই। আগ বাড়িয়ে কিছু বললে ভাববে আমাদের গরজ। কী দরকার!

আমি চুপ করে রইলাম। মা বললেন, কথায় কথায় আবার শুনিয়ে দিল মেয়ের নামে পঁচিশ হাজার টাকা জমা আছে। তা আছে ঠিকই। টাকার কুমীর।

মা তৃপ্তির হাসি হাসলেন। আমি বারান্দায় গিয়ে জলিলের সিগারেটটা ধরালাম। খাবার পর একটা দামি সিগারেট বেশ লাগে। মনের মধ্যে অনেক উচ্চশ্রেণীর ভাব আসে।

বাড়িওয়ালার মেয়েটা বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে আছে। দূর থেকে তার ফর্সা হাত দেখা যাচ্ছে। চুলগুলি ছাড়া। মা ঠিকই বলেছেন। লম্বা চুল মেয়েটির। জরীর চুলও কি লম্বা ? আমি কখনো লক্ষ করি নি। জরীর মতো মেয়েদের কখনো খুঁটিয়ে দেখা হয় না। এদের সঙ্গে দেখা হয় স্বপ্নে। স্বপ্ন সবসময়ই অস্পষ্ট।

অসুখ

নয়া পল্টনের এক গলিতে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমার রিফ্লেক্স অ্যাকশান খুব ভালো। চট করে একটা দোকানের আড়ালে চলে গেলাম। কিন্তু তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, আরে রঞ্জু না ? তিনি এগিয়ে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। আমি নিরীহ ভঙ্গিতে বললাম, কেমন আছেন স্যার ?

অতিরিক্ত উত্তেজনায় স্যারের হাঁপানির টান এসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিতে পারলেন না। আকাশের দিকে তাকিয়ে শ্বাস টানতে লাগলেন। দম ফিরে পাওয়া মাত্র প্রথম যে কথাটি বললেন, চল আমার সঙ্গে।

এখন তো স্যার যেতে পারব না। জরুরি কাজ আছে মতিঝিলে। একজন বসে থাকবে।

স্যার আরো জোরে আমার হাত চেপে ধরলেন। যেন আমি হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে যাব।

স্যার, আমি বরং কাল সকালে একবার আসব। বাসায় থাকবেন তো ? সকাল দশটার মধ্যে চলে আসব।

আমি তোমাকে অনেকদিন থেকে খুঁজছি। তুমি যে ঠিকানা দিয়েছিলে সেই ঠিকানায় কয়েকবার গেছি। সেইখানে তো কেউ থাকে না।

আমি জবাব দিলাম না। স্যার বললেন, খোকনের মার অবস্থা খুব খারাপ। তোমাকে খুঁজছি এইজন্যেই।

অসুখ বেড়েছে নাকি ?

বাড়া কমা আর কী! বেশিদিন বাঁচবে না। মরাই এখন ভালো।

আমি কিছু বললাম না। স্যার মৃদুস্বরে বললেন, এখন খুব বিরক্ত করে। চেঁচামেচি করে। আর ভাল্লাগে না। তোমাকে অনেক খুঁজেছি। কেউ ঠিকানা বলতে পারে না।

তারপর আর না যাওয়া ভালো দেখায় না। আমি বিরক্ত মুখে হাঁটতে শুরু করলাম। মতিঝিলে ফজলু আমার জন্য সত্যি সত্যি অপেক্ষা করবে। তার আমাকে নিয়ে একজন ইঞ্জিনিয়ারের কাছে যাওয়ার কথা। সেই ইঞ্জিনিয়ার নাকি ইচ্ছা করলেই দু'তিনটা চাকরি দিয়ে ফেলতে পারেন। এইসব গালগল্প আজকাল আমি আর বিশ্বাস করি না। তবু যে যা বলে করি। এখন যদি কেউ আমাকে বলে অমুক লোকের বাড়ির সামনে গিয়ে দশবার ডিগবাজি খেলে আমার একটি চাকরি হবে, আমি সম্ভবত তাও করব। ফজলু করবে তারচেয়েও বেশি। সে হয়তো বিশটা ডিগবাজি খাবে।

আমরা হাঁটছি নিঃশব্দে। রাস্তায় হাঁটলেই আমার সিগারেট ধরাতে ইচ্ছা করে। এখন সেটা সম্ভব নয়। কারণ, আমার সঙ্গে পা মিলিয়ে যিনি হাঁটছেন তিনি স্কুলে আমাদের ইংরেজি পড়াতেন। এবং তাঁর বড় ছেলেটির সঙ্গে এককালে আমার দারুণ বন্ধুত্ব ছিল।

স্যার, বাসার অন্য সবাই ভালো ?

স্যার জবাব দিলেন না। সম্ভবত এখন আর তিনি কানে তেমন ভালো শুনেন না। স্কুলে থাকতেও কম শুনতেন। একই কথা তিনবার চারবার বলতে হতো। আমি আরেকবার বললাম, বাসার সবাই ভালো তো স্যার ?

ভালো।

নীলুর বিয়ে হয়েছে ?

কী বললে ?

নীলুর বিয়ে হয়েছে নাকি ?

হয়েছে।

ছেলে কী করে ?

ব্যবসা করে।

আমার অল্প একটু মন খারাপ হলো। নীলু মেয়েটি অসম্ভব রূপসী। এককালে নীলুর জন্যে আমার বেশ দুর্বলতা ছিল। বেনামিতে কয়েকটি চিঠিও লিখেছিলাম। সেইসব আমার লেখা টের পেয়ে নীলু কেঁদেকেটে অস্থির।

আমি ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললাম। স্যার বললেন, রিকশা নিব নাকি ? হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে ?

না না, কষ্ট কিসের! চাচির চিকিৎসা করাচ্ছেন ?

মৃত্যুই এই রোগের একমাত্র চিকিৎসা।

বিলু কেমন আছে ?

ভালো। ওরও বিয়ে হয়েছে, জামাই সিলেটের চা-বাগানে কাজ করে।

খুব অল্পবয়সে বিয়ে দিলেন মনে হয়।

অল্প কোথায় ? তাছাড়া ঝামেলা কমল। ঝামেলা এখন আর ভালো লাগে না।

স্যার আমাকে বসার ঘরে বসিয়ে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রায় দু'বৎসর পর এলাম এবাড়িতে। কিছুই বদলায়নি। কিছু কিছু বাড়ি আছে যেগুলি সবসময় আগের মতো থাকে। পর্দার রঙ পর্যন্ত পাল্টায় না। কিংবা হয়তো সবসময় একই রঙের পর্দা কেনা হয়।

আমাকে অবাক করে দিয়ে নীলু এসে ঢুকল। মায়ের কাছে বেড়াতে এসেছে হয়তো। বেশ সেজেগুজে আছে। বিয়ে হবার জন্যেই হোক কিংবা অন্য যে-কোনো

কারণেই হোক তাকে দেখাচ্ছে আরো সুন্দর। নীলু এসেই ঝগড়ার ভঙ্গিতে বলল, আপনি বাবাকে ভুল ঠিকানা দিয়েছিলেন কেন?

ভুল না। আমি এক অ্যাড্রেসে বেশিদিন থাকি না।

রঞ্জু ভাই, আপনি একটা মিথ্যা কথা বললেন। যে ঠিকানা দিয়েছিলেন সে ঠিকানায় রঞ্জু নামের কেউ কোনোদিন ছিল না।

আমি চুপ করে রইলাম। নীলু বলল, মা'র জন্যে তো অন্তত এক আধবার আপনার আসা উচিত। উচিত না?

সময় পাই না।

সময় পান না কেন?

নানান ধান্ধায় থাকি।

আজ কিন্তু সন্ধ্যার আগে যেতে পারবেন না। সন্ধ্যাবেলা আমার বর আসবে, সে আপনার সঙ্গে যাবে। দেখে আসবে আপনি কোথায় থাকেন।

নীলু এমনভাবে বর কথাটি বলল যে, তাকে আরো সুখী সুখী মনে হলো। বোধহয় বেশ ভালো বিয়ে হয়েছে। গলায় ভারী একটা হার। হাতে মোটা মোটা বালা। ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করি, বেনামি চিঠিগুলির কথা মনে আছে?

জিজ্ঞেস করবার আগেই স্যার এসে ভেতরে নিয়ে গেলেন। মৃদুস্বরে বললেন, কাপড়চোপড় এখন আর ঠিক থাকে না। ঠিকঠাক করতে সময় লাগে।

ঘরটি অন্ধকার। কিছুই প্রায় চোখে পড়ে না। স্যার বললেন, আলো সহ্য করতে পারে না, এইজন্যে এই ব্যবস্থা।

আমি বললাম, চাচি, ভালো আছেন?

কোনো উত্তর এলো না। নীলু বলল, মা চিনতে পারছ? ভাইয়ার বন্ধু। রঞ্জু ভাই।

বিছানার উপর কিছু একটা যেন নড়ল। পরিষ্কার গলায় চাচি বললেন, জানালাটা খুলে দে নীলু।

ঘর আলো হয়ে উঠতেই অপ্রকৃতস্থ মহিলাটিকে আবার দেখলাম। কী ঝকঝকে চোখ! বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। মাথা ঝিমঝিম করে উঠে। আমি দ্বিতীয়বার বললাম, চাচি, আমাকে চিনতে পারছেন? আমি খোকনের বন্ধু।

চাচি কোনো জবাব দিলেন না। স্যার বললেন, ও আগাগোড়াই খোকনের সঙ্গে ছিল। খোকন কীভাবে মারা গেছে সেটা ও খুব ভালো জানে। রঞ্জু, তুমি বলো তো খোকন কীভাবে মারা গেল।

আমি চুপ করে রইলাম। নীলু বলল, রঞ্জু ভাই, আপনি বলেন। মা কথা সব বুঝতে পারেন। আর আপনাকে মা চিনতে পেরেছেন।

যে গল্প আরো কয়েকবার এই অপ্রকৃতস্থ মহিলাকে শুনিয়েছি সেই গল্প আবার শুরু করলাম। চাচি তাকিয়ে রইলেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে।

মেথিকান্দা অপারেশনে খোকনের তলপেটে গুলি লাগে। ওকে নিয়ে আমরা পালিয়ে আসি। খোকন মারা যায় নৌকায়। নৌকায় করে আমরা পালাচ্ছিলাম।

চাচি তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, এটা কি সত্যি কথা ?

জি সত্যি।

চাচির গলা আরো তীক্ষ্ণ হয়ে গেল, এটা কি সত্যি ?

জি চাচি, সত্যি। শুধু শুধু মিথ্যা কথা বলব কেন ?

চাচি এইবার কেঁদে উঠলেন। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বললেন, তবে যে ওরা বলে খোকনকে মিলিটারিরা ধরে ফেলেছিল, তারপর মাঠের মধ্যে নিয়ে জবাই করেছে।

চাচি, এটা মিথ্যা কথা।

কেন আমার ছেলেকে নিয়ে মিথ্যা কথা বলে ?

যুদ্ধের সময় এরকম মিথ্যা গুজব রটে চাচি। তাছাড়া ওরা মানুষ কীভাবে জবাই করবে ? ওরা নিজেরাও তো মানুষ।

বলতে বলতে আমি ফ্যাকাশেভাবে হাসতে চেষ্টা করলাম। চাচি আর কিছু বললেন না। তাঁর উত্তেজনা কমে আসছে। এখন বেশ কিছুদিন শান্ত থাকবেন। কয়েক রাত তাঁর সুনিদ্রা হবে। তারপর আবার অস্থির হয়ে পড়বেন। স্যার খুঁজতে থাকবেন আমাকে।

মিথ্যা কথা বলতে আমার কখনো খারাপ লাগে না। একটি মাকে প্রবোধ দেবার জন্যে আমি এক লক্ষ মিথ্যা অনায়াসে বলতে পারি। কিন্তু তবুও কখনো এ বাড়িতে আসতে চাই না। অপ্রকৃতস্থ এই মহিলাটির সামনে এসে বসলেই আমি নিজেও কিছু পরিমাণে অপ্রকৃতস্থ হয়ে পড়ি। সীমাহীন ক্রোধ আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ইচ্ছা করে ছুটে গিয়ে কোনো একটি ভয়ঙ্কর অপরাধ করি। যে অপরাধের কথা এর আগে কেউ কখনো শোনেনি। কিন্তু আমি তা করতে চাই না।

আমি অন্য দশজন মানুষের মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে চাই। একটি ছোট্ট ঘর। একজন মমতাময়ী নারী। একজন মানুষ খুব বেশি কিছু তো কখনো চায় না।

নীলু আমাকে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এসে খুব কাঁদল। নীলুর স্বামী এলো আমার পিছু পিছু। আমি কোথায় থাকি তা জেনে আসবে। লোকটি ভালোমানুষ ধরনের। রাস্তায় নেমেই আমি তাকে বললাম, নীলুর সঙ্গে যে আমার প্রেম ছিল সেটা আপনি জানেন নাকি ভাই ? ভদ্রলোক চমকে উঠলেন। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, দারুণ লদকা-লদকি ছিল।

আমি অপ্রকৃতস্থ হতে শুরু করেছি।

কবি

টাউন প্রেসের মালিক সিরাজুল ইসলাম রাগী রাগী মুখ করে বসেছিলেন। তাঁর রাগের অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রুফ রিডার জোবেদ আলী এখনো এসে পৌঁছায়নি। মেশিনম্যান কাজ ছাড়া বসে আছে। তাছাড়া আকাশের অবস্থা ভালো নয়। ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। ঝড়বৃষ্টি হলে সিরাজুল ইসলাম সাহেবকে বাড়ি ফিরে যেতে হবে। আজ তার খুব শখ ছিল বিন্তির ওখানে রাত কাটাবেন। তিনি মাসে একবার বিন্তির ওখানে কিছুটা সময় থাকেন। এই মেয়েটি ভালো। বাজে ঝামেলা করে না। এই বয়সে বাজে ঝামেলা তার সহ্য হয় না।

রাত আটটার দিকে সত্যি সত্যি চেপে বৃষ্টি এলো। তার কিছুক্ষণ পর ভিজতে ভিজতে জোবেদ আলী এসে উপস্থিত।

একটু দেরি হয়ে গেল ইসলাম সাহেব। মেয়েটার জ্বর।

সিরাজুল ইসলাম উত্তর দিলেন না। তিনি অন্য কথা ভাবছিলেন।

ডাক্তার গাদাখানিক ওষুধ দিয়েছে।

তাই নাকি ?

জি।

অসুখটা কী ?

জোবেদ আলী দীর্ঘ সময় নিয়ে অসুখ সম্পর্কে বলতে লাগল। সিরাজুল ইসলাম সাহেবের শোনার আগ্রহ ছিল না। তবু তিনি আগ্রহের একটা ভাব চোখেমুখে ফুটিয়ে রাখলেন।

আজকে একটু তাড়াতাড়ি বাসায় যাব স্যার।

আরে সর্বনাশ, কী বলেন! কাল সকালে ডেলিভারি দিতে হবে। পার্টি দুইবার তাগাদা দিয়ে গেছে। চা খান, চা খেয়ে বসে যান।

জোবেদ আলী বসে গেল। লোকটি প্রুফ দেখার কাজে ওস্তাদ বিশেষ। নটার আগেই এক ফর্মার মতো দেখা হয়ে গেল।

জোবেদ আলী!

জি স্যার।

কী মনে হয়, বৃষ্টি ধরবে ?

বলা তো মুশকিল।

মুশকিল হবে কেন ? বৃষ্টি বাদলা নিয়েই তো আপনাদের কারবার— কবি মানুষ।

জোবেদ আলীর মুখে অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা দেখা গেল।

আপনারা আছেন সুখে। বৃষ্টির মতো একটা বাজে ঝামেলা নিয়েও লিখে ফেলেন মহাকাব্য।

জোবেদ আলীর মুখের হাসি স্পষ্ট হলো। সিরাজুল ইসলাম লোকটিকে সে মনেপ্রাণে অপছন্দ করে। কিন্তু এই একটি লোকই তাকে কবি বলে খোঁচা দেয়। খোঁচাটিও বড় মধুর মনে হয় তার কাছে।

স্যার, একটু সকাল সকাল যাওয়া দরকার। মেয়েটা স্যার

যাবেন যাবেন। কতক্ষণ আর লাগবে ? শেষ করে ফেলেন। বানানগুলিও দেখবেন।

জোবেদ আলী গভীর মনোযোগে বানান দেখে। সিরাজুল ইসলাম দেখেন বৃষ্টি। মাসের বিশেষ বিশেষ ফুর্তির দিনগুলিতে বৃষ্টি বাদলা হয় কেন এই রহস্যের তিনি মীমাংসা করতে পারেন না। তার কাছে জগতের অমীমাংসিত রহস্যের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে থাকে।

বিন্তি মেয়েটির গায়ের রঙ কালো। কালো মেয়েগুলি সাধারণত মায়াবতী হয়। একটি কালো মায়াবতী স্ত্রীর জন্যে তার একধরনের ক্ষুধা বোধ হয়। কিন্তু তার স্ত্রীর গায়ের রঙ ফর্সা। দারুণ ফর্সা। শুধু গায়ের রঙের জন্যে তার সঙ্গে বিয়েটা হয়ে যায়। মেয়েটির উঁচু দাঁত তখন চোখে পড়েনি। কিংবা দাঁত হয়তো সেসময় উঁচু ছিল না। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দাঁত আরো উঁচু হচ্ছে। এবং গায়ের রঙ হচ্ছে আরো সাদা। এখন তাকে শ্বেতীরোগীর মতো লাগে।

স্যার, বাকিটা কাল সকালে দেখে দিব।

আরে পাগল নাকি ? সকালেই পার্টি আসবে। শেষ করে ফেলেন। কতক্ষণ আর লাগবে ? চা খাবেন ?

জি-না।

খান খান। ঐ চা দে তো। তারপর কবি সাহেব, নতুন কবিতা কী লিখলেন ?

একটা ছোট লিরিকের মতো লেখলাম গত রাত্রে।

বলেন কী!

শুনবেন স্যার ?

থাক থাক কাজ করেন। কাজের সময় কাব্যচর্চা ঠিক না।

জোবেদ আলী প্রুফের উপর চোখ রেখে অস্পষ্ট স্বরে বলল, ‘দেশের মাটি’তে ছাপা হবে।

তাই নাকি ?

জি। সম্পাদক সাহেব খুব প্রশংসা করলেন।

ভালো ভালো। এইবার বই বের করে ফেলেন।

বলতে বলতে সিরাজুল ইসলামের মনে হলো বৃষ্টি ধরে আসছে। সিরাজুল ইসলাম রক্তের মধ্যে একধরনের চঞ্চলতা অনুভব করলেন। বিন্তি মেয়েটি কথা বলে টেনে টেনে। যশোর-টশোরের দিকে বাড়ি নিশ্চয়ই। তিনি কখনো জিজ্ঞেস করেননি। এই জাতীয় মেয়েদের সঙ্গে বাড়তি খাতির রাখা ঠিক না। দূরে দূরে থাকতে হয়।

জোবেদ আলী কাজ শেষ করে উঠে পড়ল। এবং মুখে কালো করে ইতস্তত করতে লাগল। এই ভঙ্গিটি সিরাজুল ইসলামের চেনা। কাজেই তিনি ভারী গলায় বললেন, পার্টির কাছ থেকে আদায়পত্র কিছু হয় নাই। বিজনেস তুলে দিতে হবে, বুঝলেন ?

দশটা টাকা হবে ? কলা নিয়ে যেতে বলেছিল।

সিরাজুল ইসলাম অপ্রসন্ন মুখে একটা নোট বের করে দিলেন। মাসের মাঝামাঝি টাকা দিতে তার ভালো লাগে না।

যাই স্যার।

সিরাজুল ইসলাম জবাব দিলেন না। তার মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠছিল। কারণ বড় বড় ফোঁটায় আবার বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে।

জোবেদ আলী বাসায় ফিরে দেখেন মেয়ের জ্বর কমে গিয়েছে। মেয়ে অপেক্ষা করছে বাবার জন্যে। কলা এলে দুধ-কলা দিয়ে ভাত খাবে। কিন্তু রাত বেড়ে গিয়েছিল। কলা পাওয়া যায়নি। জোবেদ আলীর বেশ খারাপ লাগল।

কাল সকালে কলা নিয়ে আসব।

আচ্ছা।

সবরি কলা, না সাগর কলা ?

যেটা তোমার ইচ্ছা।

ঠিক আছে।

জোবেদ আলী খেয়ে-দেয়ে তার খাতা নিয়ে বসল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর এই একটা সুবিধা হয়েছে, গভীর রাতে বইখাতা নিয়ে বসলেও কেউ কিছু বলে না।

ঝমঝম বৃষ্টি হচ্ছে বাইরে। এরকম ঝড়বৃষ্টির রাত ঘুমিয়ে কাটানোর কোনো মানে হয় না।

জোবেদ আলীর মেয়েটি ঘুমাল না। তার জ্বর আসছিল। সে কাঁথা গায়ে দিয়ে চোখ বড় বড় করে বাবাকে দেখতে লাগল। একবার সে ফিসফিস করে ডাকল, বাবা। জোবেদ আলী শুনতে পেল না। তার মনে অদ্ভুত সুন্দর একটা লাইন এসেছে,

'কী সুন্দর বৃষ্টি আজ রাতে।' অন্য লাইনগুলি আর মনে আসছে না। এই একটি লাইনই ঘুরে ফিরে আসছে। গভীর আবেগে তার চোখ ভিজে উঠল।

মেয়েটির জ্বর বাড়ছে। সে আবার ডাকল, বাবা। বাইরের ঝড়বৃষ্টির শব্দে সে ডাক চাপা পড়ে গেল। মেয়েটি জ্বরতপ্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল, বাবার চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। সে কিছুই বুঝতে পারল না। শিশুরা অনেক কিছুই বুঝতে পারে, আবার অনেক কিছুই বুঝতে পারে না।

সায়েন্স ফিকশন

তারা তিনজন

লী আকাশের দিকে তাকাল।

লী যা করে অন্য দু'জনও তাই করে। তারাও আকাশের দিকে তাকাল। আকাশের রঙ ঘন হলুদ। সন্ধ্যা হয়ে আসছে বলেই হলুদ রঙ ক্রমে ক্রমে ঘোলাটে সবুজ বর্ণ ধারণ করছে।

লী হঠাৎ বলল, আকাশের বাইরে কী আছে ?

এই প্রশ্ন আগেও অনেকবার করা হয়েছে, তবু প্রতিবারই মনে হয় এই যেন প্রথমবারের মতো করা হলো। অয়ু মৃদুস্বরে বলল, আকাশের বাইরে আছে আকাশ!

তার বাইরে ?

তার বাইরে আছে আরেকটি আকাশ।

লী আর প্রশ্ন করল না। আজকাল অয়ু কেমন যুক্তিহীন কথা বলে। আকাশের বাইরে আবার আকাশ কী ? লী বলল, তোমার শরীর ভালো আছে অয়ু ?

ভালো।

তোমার পা কেমন ?

অয়ু উত্তর দিল না। অর্থাৎ অয়ুর পা ভালো নেই। অথচ একটু আগেই বলেছে শরীর ভালো। কোনো মানে হয় না। যুক্তিহীন কথা।

ঠান্ডা বাতাস দিতে শুরু করেছে। আস্তে আস্তে বাতাসের বেগ বাড়বে। সেই সঙ্গে দ্রুত কমতে থাকবে তাপ। মধ্যরাতে চারদিক হবে হিমশীতল। লী বলল, চল এবার যাওয়া যাক।

তারা দু'জন কথা বলল না। দু'জনেই তখনো আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে।

লী আবার বলল, চল আমরা নেমে পড়ি।

কোথায় ? আমরা কোথায় যাব ?

উত্তর দিয়েছে নীম। লী লক্ষ করল নীমের কথাবার্তার ধরন হতাশাগ্রস্তের মতন। এটি ভালো লক্ষণ নয়। তাদের সঙ্গে আরো একজন ছিল। সে-ও এরকম কথাবার্তা বলতে শুরু করেছিল। এসব খুব খারাপ লক্ষণ। লী কঠিন স্বরে বলল, নীম, তুমি একটু আগে বলেছ— আমরা কোথায় যাব ?

হ্যাঁ বলেছি।

তুমি কি যেতে চাও না কোথাও ?

না।

কেন না ?

কোথায় যাব বলো ?

তা ঠিক। খুবই ঠিক। যাওয়ার জায়গা কোথায় ? যেখানেই যাওয়া যাক সেই একই দৃশ্য— প্রকাণ্ড সব দৈত্যাকৃতি হিমশীতল পাথর। ঘন কৃষ্ণবর্ণ বালুকারাশি। যেদিকে যতদূর যাওয়া যায় একই ছবি। তারা তিনজন প্রতিটি পাথরের অবস্থান নিখুঁতভাবে জানে। তারা জানে ঠিক কোথায় বালির ঘন কালো রঙ হালকা গেরুয়া হয়েছে।

লী বলল, চল আমরা আরেকবার সেই ঘরটি দেখে আসি।

অয়ু এবং নীম উত্তর দিল না। লী বলল, এখন রওনা হলে সকালের মধ্যে আমরা পৌঁছে যাব।

সেই ঘরটি আমরা ছয় লক্ষ নয়শ' এগারো বার দেখেছি।

আরেকবার দেখব। ছয় লক্ষ নয়শ' বারো বার হবে।

অয়ু বলল, আমি যেতে চাই না। আমার পা-টিতে কোনো অনুভূতি নেই। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমরা যাও।

তুমি কী করবে ?

আমি বসে থাকব এখানে। তোমরা আমাকে একটি সমস্যা দিয়ে যাও। আমি সেই সমস্যা নিয়ে চিন্তা করব। বেশ একটি জটিল সমস্যা দিয়ে যাও।

তোমাকে একা ফেলে যাব ?

হ্যাঁ, এটি ভালোই হবে। আমি আশা করে থাকব তোমরা হয়তো নতুন কোনো খবর নিয়ে আসবে। আশায় আশায় সময় ভালো কাটবে।

নীম বলল, তোমার পায়ের ব্যথা কি অনেক বেড়েছে ?

অয়ু জবাব দিল না।

লী এবং নীম ঠান্ডা পাথরের গা বেয়ে নিচে নেমে এল। তারা অয়ুকে একটি সমস্যা দিয়ে এসেছে। সমস্যাটি হচ্ছে— 'আমাদের সঙ্গে সেই ঘরটির সম্পর্ক কী ?'

অয়ু ভাবতে শুরু করল। তার পায়ের ব্যথা ক্রমেই বাড়ছে। ব্যথা ভুলতে হলে সমস্যাটি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করতে হবে। অয়ু আরাম করে বসতে চেষ্টা করল। সে তার এগারোটি পা লম্বালম্বি করে চারদিকে ছড়িয়ে দিল। মাথার দু'পাশের চারটি 'লুখ' ঢুকিয়ে নিল শরীরের ভেতর। এখন লুখগুলির আর প্রয়োজন নেই। অয়ু কোনো শব্দ শুনতে চায় না। চারদিকে থাকুক সীমাহীন নিস্তব্ধতা। শব্দে চিন্তার ব্যাঘাত হবে। অয়ু ভাবতে শুরু করল।

ঘর সব মিলিয়ে ছ'টি। ছ'টি ঘরই প্রকাণ্ড, প্রায় আকাশছোঁয়া। এই ছয়ের সঙ্গে কি আমাদের কোনো যোগ আছে ? আমাদের পা এগারোটি। প্রতিটি পায়ের তিনটি করে আঙুল, মোট সংখ্যা তেত্রিশ। তিনটি কর্মী পায়ে আছে একটি করে বাড়তি আঙুল— সর্বমোট ছত্রিশ। তার বর্গমূল হচ্ছে ছয়। না, এই মিলটি চেষ্টাকৃত। এদিকে না ভাবাই উচিত। তাহলে ভাব যাক, এই ঘরগুলি কি আমাদের জন্যে তৈরি হয়েছে ? উত্তর হচ্ছে— না। এত প্রকাণ্ড ঘর আমাদের জন্যে হতে পারে না। কারণ এই ঘরগুলির

ভেতর দীর্ঘ সময় থাকা যায় না। অন্ধকার ঘর। অন্ধকারে আমরা থাকতে পারি না। আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে আলো দরকার। তার ওপর ঘরের মেঝেগুলি অসম্ভব মসৃণ। মসৃণ মেঝেতে আমরা চলাফেরা করতে পারি না। এই ঘর আমাদের জন্যে তৈরি হলে মেঝে হতো খসখসে।

অয়ু হঠাৎ অন্য একটি জিনিস ভাবতে বসল। সে দেখেছে কোনো একটি জটিল সমস্যা নিয়ে ভাববার সময় হঠাৎ করে অন্যকিছু ভাবলে ফল খুব ভালো হয়। আবার সমস্যাটিতে ফিরে গেলে অনেক নতুন যুক্তি আসে মাথায়। অয়ু ভাবতে লাগল, আকাশের কোনো সীমা আছে কি ? প্রতিটি জিনিসের সীমা আছে। পাথরগুলির সীমা আছে। ঘরগুলির সীমা আছে। ধূলিকণার সীমা আছে। কাজেই আকাশের একটি সীমা থাকা উচিত। এই যুক্তির ভেতর দুর্বলতা কী কী আছে ? প্রথম দুর্বলতা— যেসব জিনিসের সীমা আছে তাদের স্পর্শ করা যায়। কিন্তু আকাশ স্পর্শ করা যায় না। তাহলে যেসব জিনিস স্পর্শ করা যায় না সেসব কি সীমাহীন ? জটিল সমস্যা। তিনজন একসঙ্গে বসে ভাবতে হবে। অয়ু আবার ফিরে গেল ঘরের সমস্যায়। ঘরগুলির সঙ্গে তাদের সত্যি কি কোনো সম্পর্ক আছে ?

ঘরগুলি তৈরি হয়েছে এমনসব বস্তু দিয়ে যা এখানে পাওয়া যায় না। এই ব্যাপারটিতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এই একটি জিনিস তারা পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা করেছে। ঘরের কম্পনমাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি অত্যন্ত রহস্যময়। যে জিনিসগুলি এখানে আছে তাদের কম্পনমাত্রা এখানকার মতোই হওয়া উচিত। কিন্তু ঘরগুলি অন্যরকম। রহস্য! বিরাট রহস্য! অয়ু নিজের পায়ের যন্ত্রণার কথা ভুলে গেল। তাপমাত্রা যে অসম্ভব নিচে নেমে গেছে তা-ও ঠিক বুঝতে পারল না। কোনো একটি রহস্যময় সমস্যা নিয়ে ভাববার মতো আনন্দ আর কিসে হতে পারে ?

কিন্তু অয়ু বেশিক্ষণ ভাবতে পারল না। আচমকা সে সমস্ত শরীরে একটি তীব্র কম্পন অনুভব করল। যেন একটি শক্তিশালী আলো হঠাৎ তার শরীরে এসে পড়েছে। অয়ু চোখ মেলে স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। ঘরগুলির মতোই প্রকাণ্ড কোনো একটি জিনিস আকাশ থেকে নেমে আসছে। অয়ু দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করল। দ্রুত ভাবতে হবে। অত্যন্ত দ্রুত। অয়ুর মাথার দু'পাশের চারটি 'লুখ' বেরিয়ে মাথার চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। জিনিসটির কম্পনমাত্রা জানতে হবে। অয়ু দিশেহারা হয়ে গেল। জিনিসটির কম্পন নেই। এটা হতে পারে না। এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার। সব জিনিসের কম্পন আছে। তার কম্পনও থাকতে হবে।

দ্রুত ভাবতে হবে। দ্রুত। জিনিসটির মধ্যে আছে অকল্পনীয় শক্তি। কারণ তার উপস্থিতির জন্যে যে পাথরটির ওপর অয়ু বসে আছে তার কম্পনমাত্রা বেড়ে গেছে। এরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার কী করে হয় ? অয়ু বলল, কে, তুমি কে ?

উত্তর নেই। অয়ু আবার বলল, আমার নাম অয়ু। আমরা তিনজন এখানে থাকি। তুমি কে ?

জিনিসটি আকাশের গায়ে স্থির হয়ে আছে।

কম্পনহীন শক্তির আধার। তুমি আমার কথার জবাব দাও।

জবাব নেই। কোনো জবাব নেই। অয়ু লক্ষ করল— জিনিসটি থেকে দুটি তীব্র আলোকবিন্দু এসে পড়েছে নিচে। আলোকবিন্দু দুটি নড়াচড়া করছে।

দয়া করে আমার কথার জবাব দাও। প্রতিদানে আমি তোমাদের সমস্যার জন্যে ভাবতে বসব।

জবাব পাওয়া গেল না। অয়ু দেখল প্রকাণ্ড সেই জিনিসটি থেকে একটি ছোট্ট কিছু দ্রুত নিচে নেমে আসছে। যে জিনিসটি আসছে তার কম্পন আছে। অয়ু ভালো করে দেখবার জন্যে পাথরের গা বেয়ে নেমে এল। জিনিসটির কম্পনমাত্রা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানকার সঙ্গে মিল নেই। ঘরগুলির সঙ্গে মিল নেই।

মহাশূন্যযান থেকে যে স্কাউটশিপ গ্রহটিতে নেমে এল তার আরোহী দু'জন অবাক হয়ে মন্তব্য করল— এটা কেমন জায়গা ? কী কুৎসিত! এইসব জায়গায় স্কাউটশিপ পাঠানো অর্থহীন। শক্তি ও সম্পদের নিদারুণ অপচয়।

২

স্কাউটশিপের এনথ্রোমিটারের কাঁটাটি লাল ঘরে। যার অর্থ— এ গ্রহে মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করা সম্ভব নয়। শুধু মানুষ নয়, অক্সিজেন-নির্ভর কোনো প্রাণীর পক্ষেই সম্ভব নয়। এখানে বাতাসে আছে মিথেন এবং হাইড্রোজেন। খুব অল্পমাত্রায় হাইড্রোজেন সালফাইড। কোথাও কোনো পানির চিহ্ন নেই। বাতাসে অতি সূক্ষ্ম বেরিলিয়াম কণা ঘুরে বেড়াচ্ছে। এটিও বিচিত্র।

গ্রহটির ভূতাত্ত্বিক গঠন সম্পর্কে তথ্যাবলি মহাকাশযানের ভূতত্ত্ব বিভাগের কম্পিউটারে আসতে শুরু করেছে। কম্পিউটার রিপোর্ট পাওয়ার পরই স্কাউটশিপটি মাটিতে নামবে। রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ঠিক করা হবে স্কাউটশিপটির অবতরণের জায়গা। ঠিক করা হবে— শিপটির চারপাশে শক্তিবলয় থাকবে কি-না। স্কাউটশিপে শক্তিবলয় তৈরি করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার। পারতপক্ষে তা করা হয় না।

স্কাউটশিপটি ভূমি স্পর্শ করবার আগে আগে কম্পিউটার থেকে বলা হলো শক্তিবলয় তৈরি করতে। জীম বিরক্ত হয়ে জানতে চাইল, হঠাৎ করে শক্তিবলয় তৈরি করতে হবে কেন ?

কম্পিউটার সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, তোমরা যে জায়গায় নেমেছ, সেখানে অত্যন্ত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির রেডিয়েশন হচ্ছে। এর কারণ আমার এই মুহূর্তে জানা নেই। সেজন্যেই এই সাবধানতা।

মহাকাশযানের এই কম্পিউটারটি পুরুষকণ্ঠে কথা বলে। গলার স্বর কর্কশ। সাধারণত কম্পিউটারগুলি কথা বলে মেয়েদের গলায়— মিষ্টি স্বরে। কিন্তু গ্যালাকটিক মহাকাশযানগুলির জন্যে ভিন্ন ব্যবস্থা। সেখানে কম্পিউটারগুলি কথা বলে গম্ভীর সুরে— যেন ৫০ বছর বয়েসী অংকের প্রফেসর কথা বলছেন। কারণ সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক। গ্যালাকটিক মহাকাশযানগুলি দীর্ঘ সময় মহাশূন্যে থাকে। এই দীর্ঘ সময়ে অসংখ্যবার কম্পিউটারকে এমন সব সিদ্ধান্ত নিতে হয় যা ক্রু মেম্বারদের মতের সঙ্গে মিলে না। কম্পিউটারের ভারি আওয়াজ তখন প্রভাব ফেলে। মেয়েলি গলার মিষ্টি কথা যত সহজে অগ্রাহ্য করা যায় একটি বৃদ্ধের গম্ভীর গলার আওয়াজ তত সহজে করা যায় না।

জনি বলল, কম্পিউটার সিডিসি! বায়ুর চাপ কেমন?

১.৫ অ্যাটমোসফিয়ার। খুব বেশি নয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ০.৮৭G। তোমাদের কোনো বিশেষ ধরনের স্পেসস্যুট পরতে হবে না। স্কাউটশিপে যা আছে তাতেই চলবে।

কোনোরকম প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে?

এটি একটি মৃত জগৎ। কোনো প্রাণের চিহ্ন নেই।

তুমি কি নিশ্চিত?

জীববিদ্যা বিভাগ আমাকে যে-সব তথ্য দিয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে বলতে পারি যে, কার্বন বা সিলিকনভিত্তিক কোনো প্রাণের সৃষ্টি হয়নি।

উদ্ভিদ?

উদ্ভিদ নেই। বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড নেই। যা খানিকটা নিশ্চিতভাবেই বলে উদ্ভিদ বা প্রাথমিক স্তরের কোনো জীব এখানে নেই।

তাহলে আমরা এখানে যাচ্ছি কী জন্যে?

বৈজ্ঞানিক কৌতূহল।

বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তো আমরা মহাকাশযানে বসে থেকেই মিটাতে পারতাম। এখানে আমার নামার প্রয়োজন কী?

তোমার কি এখানে নামতে ভয় করছে?

জনি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল, না।

কোনো একটি বিচিত্র কারণে তার সত্যি সত্যি ভয় করছিল। স্কাউটশিপটি অবতরণের জায়গা থেকে প্রায় সাতশ' ফুট ওপরে স্থির হয়ে আছে। শক্তিবলয় তৈরি হতে সময় লাগবে। ততক্ষণ জনির চুপচাপ অপেক্ষা করা ছাড়া কিছু করার নেই। সে ডায়াল ঘুরিয়ে মহাকাশযানের অধিনায়ক কিম দুয়েন-এর সঙ্গে যোগাযোগ করল।

হ্যালো কিম দুয়েন।

হ্যালো জনি।

কতক্ষণ লাগবে শক্তিবলয় তৈরি হতে ?

নির্ভর করে কী ধরনের শক্তিবলয় তার ওপর।

প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে বসে আছি আমি। এত দেরি হচ্ছে কেন ?

3M শক্তির বলয় তৈরি হচ্ছে, এতে সময় লাগে জনি। তুমি কি আর কিছু বলবে ?

হ্যাঁ বলব। আমার সঙ্গে আরো একজন কারোর থাকা দরকার।

কী ব্যাপার জনি, একা একা ভয় লাগছে ?

ভয়ের প্রশ্ন নয়। প্রথম অবতরণ কখনো একা না করার নির্দেশ আছে।

তুমি একা নামছ না। তোমার সঙ্গে আছে L-2 F-12।

কিম দুয়েন, এটি তো একটি রোবট।

রোবট হলেও এতে একটি সিডিসি কম্পিউটার মস্তিষ্ক আছে। নয় কি ?

হ্যাঁ, তা আছে।

তাহলে ভয় পাচ্ছ কেন ?

ভয় পাচ্ছি এমন কথা তো বলিনি।

বলার অপেক্ষা রাখে না জনি। আমাদের এখানে আমরা তোমার হার্টবিট এবং ব্লাডপ্রেসার মাপতে পারছি।

কিম দুয়েন ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে হেসে উঠল। জনি চুপ করে রইল।

হ্যালো জনি, ঠিক এই মুহূর্তে তোমার ব্লাডপ্রেশার কত— জানতে চাও ?

জনি ডায়াল সুইচ অফ করে দিয়ে কপালের ঘাম মুছল। তার ভয় করছে ঠিকই কিন্তু তার পেছনে কারণ আছে। মুশকিল হচ্ছে কারণটি কাউকে বলা যাচ্ছে না। বলামাত্রই একটি মেডিক্যাল টিম বসবে। একজন সাইকিয়াট্রিস্টকে বলা হবে— জনি কুলম্যান, ক্রু নাম্বার তিনশত; ভূতত্ত্ববিদ ও স্কাউট অভিযাত্রীর ওপর একটি পূর্ণ মেডিক্যাল রিপোর্ট লিখতে। এসব হতে দেয়া যায় না।

জনি!

জনি কুলম্যান দেখল সিডিসি রোবটটির মস্তিষ্ক চালু করা হয়েছে। তার অর্থ হচ্ছে শক্তিবলয় তৈরি শেষ হয়েছে, স্কাউটশিপ এখন নিচে নেমে যাবে। জনি কুলম্যান রোবটটির দিকে ঠান্ডা চোখে তাকিয়ে বলল, হ্যালো সিডিসি।

তুমি কি ভয় পাচ্ছ জনি ? তোমার হার্টবিট স্বাভাবিকের চেয়েও বেশি মনে হচ্ছে।

জনি শান্তস্বরে বলল, আমি ভয় পাচ্ছি।

করণটি কি আমি জানতে পারি ?

জানতে পার। যেহেতু তুমি যাচ্ছ আমার সঙ্গে, সেহেতুে তোমাকে আমার বলা উচিত।

বলো। আমি শুনছি।

স্কাউটশিপে নিচে নামার সময় আমার মনে হলো একজন কেউ যেন আমার জন্যে অপেক্ষা করছে।

হুঁ।

সেটির একটি ছবিও যেন আমার মনে এল।

ছবিটি কী রকম ?

কুৎসিত। জিনিসটির অনেকগুলি পা আছে।

তুমি দেখতে পেলে জিনিসটিকে ?

না। ছবিটি আমার মনে হলো।

আর কী জানো জিনিসটি সম্পর্কে ?

ওর নাম জানি।

নামটিও তোমার মনে হলো ?

হ্যাঁ।

কী নাম ?

অয়ু।

স্কাউটশিপটি ভূমি স্পর্শ করা মাত্র সিডিসি বলল, তুমি মহাকাশযানে ফিরে যাবার পর অবশ্যই একজন সাইকিয়াট্রিস্টের সঙ্গে দেখা করবে। জনি কথা বলল না। সিডিসি বলল, তুমি রাগ করলে না তো আবার ? তোমরা মানুষরা অকারণেই রাগ কর। জনি চুপ করে রইল।

মহাকাশযান সময় ১৪টা ৩০ মিনিটে তারা দু'জন স্কাউটশিপ থেকে বের হয়ে এল। প্রকাণ্ড সব পাথরে ঢাকা ঘন কৃষ্ণবর্ণের ধূলিকণা চারদিকে। একটি মৃত পৃথিবী; কঠিন এবং কিছু পরিমাণে ভয়ংকর।

জনি স্কাউটশিপকে পেছনে ফেলে পঁচিশ গজের মতো এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। একটি সবুজাভ পাথরের আড়াল থেকে এটি কী বের হয়ে আসছে ? স্পেসস্যুটের আরামদায়ক শীতলতার মধ্যেও তাঁর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল।

জিনিসটি কুৎসিত। এগারোটি পা মাকড়সার মতো চারদিকে ছড়িয়ে আছে। শরীরের তুলনায় প্রকাণ্ড একটি মাথা। মাথার দু'পাশে গাছের ঘন শিকড়ের মতো কী যেন বের হয়ে আছে, সেগুলি সারাক্ষণই এদিক-ওদিক নড়ছে। জিনিসটির কোনো চোখ নেই, মুখ নেই। গায়ের বর্ণ ধূসর নীল। জনি কুলম্যান জরুরি সুইচ টিপল—

হ্যালো। হ্যালো। হ্যালো মহাকাশযান গ্যালাক্সি ওয়ান। হ্যালো। সিডিসি সিডিসি। হ্যালো সিডিসি।

জনি তার ডান হাতের আণবিক ব্লাস্ট থ্রোয়ার কার্যকর করে জিনিসটির দিকে তাকাল। যেটি প্রায় একশ' গজ দূরে পা ছড়িয়ে বসে আছে। মাথার দু'পাশের শিকড়ের মতো জিনিসগুলি ঘূর্ণায়মান গতিতে অতিদ্রুত ঘুরছে। জনি কুলম্যান কুল কুল করে ঘামতে লাগল।

৩

এরকম অসম্ভব ঘটনাও ঘটে ?

অয়ু সমগ্র ব্যাপারটি চোখের সামনে দেখল। প্রকাণ্ড বড় জিনিস থেকে ছোট্ট জিনিসটি নেমে এল মাটিতে। তার মধ্যে দু'টি কী যেন বসে আছে। তারা কে ? দু'জনের কম্পনাংক দু'রকম। একজনের মধ্যে... আরে এ কী! অয়ুর মনে হলো একজনের সমস্ত চিন্তাভাবনা সে বুঝতে পারছে।

এতে অবাক হবার কিছু নেই, অয়ু লী বা নীম দুজনের মনের কথাই বুঝতে পারে। কিন্তু যে জিনিসটির কথা সে বুঝতে পারছে সে জিনিসটি অয়ু বা লী'র মতো নয়। ওর একটি নাম আছে— 'জনি কুলম্যান'। অদ্ভুত নাম। জনি কুলম্যান অসম্ভব ভয় পাচ্ছে। ভয় পাচ্ছে কেন ? ছোট্ট ঘর থেকে ভয়ে ভয়ে নামছে। তার সঙ্গে যে আছে তার মনের কথা অয়ু কিছুই বুঝতে পারছে না। আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে, ঐটির মধ্যে আবার অসংখ্য তরঙ্গ। তরঙ্গগুলির দৈর্ঘ্য একেকটি একেক রকম। ওর নাম কী, অয়ু বুঝতে পারছে না। তবে বুঝতে পারছে, তার সঙ্গে আকাশের মহাকাশযানটির সম্পর্ক আছে। অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মাধ্যমে সম্পর্কটি রাখা হচ্ছে সর্বক্ষণ। অন্য লোকটি, যার নাম জনি কুলম্যান, সেও মাঝে মাঝে মহাকাশযানটির সঙ্গে সম্পর্ক রাখছে। তবে তা রাখা হচ্ছে অনেক বড় তরঙ্গদৈর্ঘ্যের তরঙ্গ দিয়ে। অর্থাৎ সে কথা বলছে। কথা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। তবে অয়ু যদি বেশ কিছু সময় এই সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা করে, তাহলে বুঝতে পারবে। ইস্! লী আর নীম যদি থাকত, তাহলে নিমিষের মধ্যে সমস্যাটির সমাধান হতো।

অয়ু মন দিল জনি কুলম্যানের দিকে। এত ভয় পাচ্ছে কেন ? কী যেন বলল অন্যটিকে। হাঁটছে সামনের দিকে। হাতে এটি কী ? অয়ু ভাবতে লাগল। পরিষ্কার কিছু বোঝা যাচ্ছে না। কেমন যেন অস্পষ্ট। অয়ু তার 'লুখ'গুলি ওর দিকে বাড়িয়ে ধরল। যে 'লুখ' তরঙ্গদৈর্ঘ্য বুঝতে পারে সেটিকে বিভিন্ন তরঙ্গমাত্রায় দোলাতে শুরু করল। হ্যাঁ, এইবার বুঝতে পারা যাচ্ছে। জনি কুলম্যান একজন ভূতত্ত্ববিদ। মাটি সম্পর্কে জানে। মাটি কী ? জনি কুলম্যান পাথরগুলি সম্পর্কে ভাবছে। পাথরগুলি সিলিকা ও এলুমিনিয়ামের, তার মধ্যে আছে কপার অক্সাইড। সিলিকা কী, এলুমিনিয়াম কী, আবার কপার অক্সাইড বা কী ? কপার অক্সাইড দেখে জনি কুলম্যান অবাক। কারণ এখানে অক্সিজেন নেই। অক্সিজেন না থাকলে কপার অক্সাইড থাকবে না কেন ? এই দুটির মধ্যে সম্পর্ক কী ? আহ্, এই জনি কুলম্যান

কত সুখী! কত রকম সমস্যা আছে তার মাথায়! নতুন নতুন সমস্যা নিয়ে ভাবছে। তাদের মতো না, একই সমস্যা নিয়ে তাদের মতো ভাবতে হয় না। আচ্ছা, ঐ জনি কুলম্যান কি বলতে পারবে আকাশের বাইরে কী আছে ? নিশ্চয়ই পারবে, কারণ তারা এসেছে আকাশের বাইরে থেকে।

অয়ু হঠাৎ পাথরের আড়াল থেকে বের হয়ে এল। তার প্রকাণ্ড শরীরটিকে অতি দ্রুত নিয়ে এল জনি কুলম্যানের সামনে। তারপর স্থির হয়ে দাঁড়াল সেখানে।

জনি কুলম্যান, আমাদের তিন বন্ধুর তরফ থেকে তোমাকে জানাচ্ছি অভিনন্দন।

জনি প্রথম খানিকক্ষণ নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না— এসব কি সত্যি ? না স্বপ্ন ? জনির মাথা ঝিমঝিম করছে। বুক মুখ শুকিয়ে কাঠ। সিডিসির গলা শোনা গেল, জনি ভয় পেও না, আমার হাতে আণবিক ব্লাস্টার আছে। ব্লাস্টার চালু করছি।

সিডিসি, ওটি কী ?

একটি প্রাণী নিঃসন্দেহে। প্রাণীটি লক্ষ করছে আমাদের। তুমি নড়াচড়া করবে না, যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখানে দাঁড়িয়ে থাক।

সিডিসি, অপেক্ষা করছ কেন ? আণবিক ব্লাস্টারের সুইচ টিপে দাও।

তুমি নার্ভাস হবে না। তোমার দিকে আগালেই আমি ব্যবস্থা করব। আমি প্রাণীটির ছবি তুলব প্রথম। মহাকাশযান থেকে আরেকটি টিম আসছে। ওরা প্রাণীটিকে ধরার চেষ্টা করবে।

জনি খানিকটা সংবিৎ ফিরে পেল। খুব সাবধানে (যাতে প্রাণীটির দৃষ্টি আকর্ষিত না হয়) যোগাযোগ সুইচ টিপল। ক্যাপ্টেনের গলা ভেসে আসল সঙ্গে সঙ্গে— হ্যালো জনি, আমরা সবকিছু লক্ষ করছি। জীব বিজ্ঞানীদের টিম নেমে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যে।

কী করব আমি, মেরে ফেলব প্রাণীটিকে ?

কী বলছ পাগলের মতো! জীবন্ত ধরতে হবে প্রাণীটিকে। এরকম অদ্ভুত প্রাণী এর আগে কখনো পাওয়া যায়নি। জীব বিজ্ঞানীরা খুবই অবাক।

জনি কুলম্যান দেখল, প্রাণীটি আরো খানিকটা এগিয়ে এসেছে। তার মনে হলো প্রাণীটি বলছে— আমাকে ভয় করার কিছুই নেই।

রোবট সিডিসি এক হাতে আণবিক ব্লাস্টার ধরে রেখেই অন্য হাতে বেশ কয়েকটি কাজ করল। প্রাণীটির ছবি মহাকাশযানে রিলের ব্যবস্থা করল। একটি সার্ভেয়ার সিস্টেম চালু করল যাতে অন্য যে-কোনো দিক থেকে এই জাতীয় কোনো প্রাণী পাচশ' গজের ভেতর এলে আগে থেকেই টের পাওয়া যায়। দ্বিতীয় স্কাউটশিপটি কোথায় নামবে তা-ও তাকেই বের করতে হচ্ছে। সবচে ভালো হতো

যদি প্রাণীটির পেছনে নামতে পারত। কিন্তু তা সম্ভব হচ্ছে না। জায়গাটি প্রকাণ্ড সব পাথরে ভর্তি। নামতে হবে প্রথম স্কাউটশিপটির কাছেই। ব্যাপারটি বিপজ্জনক। প্রাণীটি দ্বিতীয় স্কাউটশিপ দেখে ভয় পেয়ে জনিকে আক্রমণ করে বসতে পারে।

আক্রমণের ধারা কী হবে কে জানে। জন্তুটি মনে হচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক। স্বভাবতই সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। এতটা দূর থেকে তা সম্ভব হবে না। তাকে আরো কাছে এগিয়ে আসতে হবে। সেক্ষেত্রে অনেকটা সময় পাওয়া যাবে হাতে। আক্রমণের অন্য ধারায় এ হয়তো দূর থেকেই বিষজাতীয় কিছু ছুড়ে ফেলবে। তাহলে ভয়ের কিছু নেই, জনির স্পেসস্যুট আছে।

দ্বিতীয় স্কাউটশিপে ছিল টাইটেনিয়াম ইরিডিয়ামের তৈরি একটি প্রকাণ্ড খাঁচা। খাঁচাটি আনা হচ্ছে প্রাণীটিকে বন্দি করার জন্য। ড. জন ফেন্ডার (প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রধান) এবং মহাকাশযানের সিকিউরিটি বিভাগের একজন অফিসার খাঁচাটি নিয়ে আসছেন।

ড. জন ফেন্ডারের মুখ দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। দুশ্চিন্তার প্রধান কারণ, এই অদ্ভুত প্রাণীটির এখানে থাকার কথা নয়। তবু সে আছে। তার মানে সে একা নয়, আরো অনেকেই নিশ্চয় আছে। কিন্তু এরা খায় কী ? এই ঊষর গ্রহে এদের জন্যে কোনো খাদ্য থাকার কথা নয়।

ড. জন ফেন্ডার অন্য আরেকটি কারণেও যথেষ্ট বিব্রত। তার মনে হচ্ছে প্রাণীটি বুদ্ধিমান। এরকম মনে করার যথেষ্ট কারণ আছে। প্রথমত, এই অবস্থাতে যে-কোনো প্রাণীই পালিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করত। এটি তা করছে না, নিজ থেকে এগিয়ে এসেছে। কিন্তু আক্রমণ করছে না, বরং দূরে দাঁড়িয়ে গভীর আগ্রহের সঙ্গে সবকিছু লক্ষ করছে। ড. ফেন্ডার লক্ষ করেছে, প্রাণীটির সমস্ত মনোযোগ জনির দিকে। মাঝে মাঝে সে অবশ্যি তাকাচ্ছে রোবটটির দিকে। তা-ও খুব অল্প সময়ের জন্যে। তাহলে সে কি বুঝতে পারছে রোবটটি একটি যান্ত্রিক মানুষ ?

ড. জন ফেন্ডারের উদ্বেগ আরো বাড়ল, যখন সেন্ট্রাল কম্পিউটার থেকে হঠাৎ বলা হলো— প্রাণীটির গা থেকে বিটা রেডিয়েশন হচ্ছে। জন ফেন্ডার অবাক হয়ে বলল, তা কী করে হচ্ছে ?

কী করে হচ্ছে তা এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না, তবে হচ্ছে।

আরো কিছু আছে ?

আছে, তবে তা এখনো নিশ্চিতভাবে বলা ঠিক হবে না।

ঠিক না হলেও বলে ফেল।

প্রাণীটির শরীরে একটি চৌম্বকশক্তি থাকার সম্ভাবনা আছে।

নিশ্চিতভাবে কখন জানা যাবে ?

যখন প্রাণীটি এগিয়ে আসবে।

জন ফেন্ডার শুকনো মুখে বলল, চৌম্বকশক্তিটি কি শক্তিশালী ?

যথেষ্ট শক্তিশালী।

জন ফেন্ডার খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তোমার কি মনে হয় প্রাণীটি বুদ্ধিমান ?

সিডিসি সঙ্গে সঙ্গে বলল, প্রাণীটি বুদ্ধিমান হবার সম্ভবনা খুবই বেশি। তবে যে-সব তথ্য আমার কাছে আছে তা থেকে এই মুহূর্তে কিছু বলা ঠিক হবে না।

মহাকাশযান সময় ১৫টা ৩৫ মিনিটে দ্বিতীয় স্কাউটশিপ নামল। জন্তুটি লাফিয়েও উঠল না বা ভয় পেয়ে পালিয়েও গেল না। স্কাউটশিপ থেকে পা বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে জন ফেন্ডারের মনে হলো— 'প্রাণীটির নাম অয়ু, প্রাণীটির আরো দুটি বন্ধু আছে। একজনের নাম লী, অন্যজনের নাম নীম। এরা তিনজন ছাড়া এই গ্রহে অন্য কোনো প্রাণী নেই।'

এরকম মনে হওয়ার পেছনে কোনো কারণ নেই। তবু জন ফেন্ডারের মনে হলো এসব তথ্যের প্রতিটিই সত্য। জন ফেন্ডার কাঁপা গলায় বলল, হ্যালো জনি, ঐ জন্তুটির নাম কি অয়ু নাকি ?

হ্যাঁ, ওর নাম অয়ু।

জন ফেন্ডার গম্ভীর হয়ে বলল, কী করে জানলে ওর নাম অয়ু। কথা বলেছ নাকি ওর সঙ্গে ?

না, কথা বলিনি।

কথা না বলেই বুঝতে পারলে ?

জনি থেমে থেমে বলল, তা পারলাম এবং আমার মনে হয় তুমিও বুঝতে পেরেছ।

জন ফেন্ডার গম্ভীর হয়ে বলল, ব্যাপার কী জনি ?

ব্যাপার তো তোমারই জানার কথা। তুমি জীববিজ্ঞানের লোক।

তা ঠিক। তা ঠিক।

জন ফেন্ডারম্যান স্কাউটশিপ থেকে অনেকখানি এগিয়ে গেল প্রাণীটির দিকে, তারপর স্পষ্ট স্বরে বলল, হ্যালো অয়ু!

৪

লী ও নীম নিঃশব্দে হাঁটছিল।

হাঁটবার সময় এরা সচরাচর কথা বলে না। 'লুখ'গুলি শরীরের ভেতর লুকানো থাকে। নেহায়েত প্রয়োজন ছাড়া বের করে না।

সকালবেলার দিকে তারা ঘরগুলির সামনে এসে দাঁড়াল। ঝড় নেই। শান্তভাব চারদিকে। লী বলল, আজ কোন ঘরটির ভেতর প্রথম ঢুকবে ?

নীম জবাব না দিয়ে প্রথম ঘরটির ভেতর ঢুকে পড়ল। এই ঘরটি সবচেয়ে উঁচু। প্রায় আকাশছোঁয়া। লী বেশ অবাক হলো। তারা কখনো একা একা কোথাও যায় না। আজ নীম এরকম করল কেন ? লী ডাকল, নীম, নীম।

নীম সাড়াশব্দ করল না। লী খানিকক্ষণ ইতস্তত করে প্রথম ঘরটির ভেতর ঢুকল। আশ্চর্য, এই প্রকাণ্ড হলঘরের কোথাও নীম নেই। তাহলে সে কি দ্বিতীয় ঘরে চলে গেছে ? দ্বিতীয় ঘরেও তাকে পাওয়া গেল না। শুধু তাই নয়, ছ'টি ঘরের কোনোটিতেই নীম নেই।

লী অবশ্য অনায়াসে তাকে খুঁজে বের করতে পারে। 'লুখ'গুলি বের করে রাখলেই জানা যাবে কোথায় লুকিয়ে আছে নীম। কিন্তু লী'র ইচ্ছা করছে না। নীম এরকম করল কেন ?

লী ঘরের বাইরে এসে পা ছড়িয়ে বসে থাকল। তার কিছুই ভালো লাগছে না। ক্লান্তি লাগছে। এরকম করল কেন নীম ? কত দীর্ঘকাল তারা একসঙ্গে আছে। সেই কবেকার কথা! অস্পষ্টভাবে মনে পড়ে। মা ছিলেন বেঁচে। মায়ের চারপাশে তারা ঘুরঘুর করত। মা বলতেন, আমার লক্ষ্মীসোনারা, তোমরা একসাথে থাকবে। একা একা যাবে না কোথাও।

নীম চোখ ঘুরিয়ে বলত, একা একা গেলে কী হয় ?

একা একা থাকলে অনেক ঝামেলা হতে পারে। যদি একসঙ্গে থাক তাহলে তোমাদের তিনজনের 'লুখ' একসঙ্গে থাকবে। যদি তারা একমাত্রায় কাঁপে তাহলে তোমরা অনেক কিছু করতে পারবে। আমাদের 'লুখ' মহাশক্তিশালী।

কী করে কাঁপবে একসঙ্গে ?

তোমাদের নিজেদের তা শিখতে হবে। আমার লুখ নষ্ট হয়ে গেছে। আমি তোমাদের কিছু শেখাতে পারব না।

শুধু লুখ নয়, অনেক কিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাঁর। মা চোখে দেখতেন না। হাঁটতে পারতেন না। তবু যে কতদিন বেঁচে ছিলেন তাদের কত কিছুই না শেখাতেন। প্রথম শেখালেন কী করে সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে হয়।

প্রথমে লুখগুলি শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলবে, তারপর কোনো একটি জায়গায় যেখানে প্রচুর আলো আছে সেখানে পা ছড়িয়ে ভাবতে বসবে। একজন কী ভাবছে অন্যজন তা বুঝতে চেষ্টা করবে না।

বুঝতে চেষ্টা করলে কী হয় ?

ঠিকমতো ভাবা যায় না।

তাদের প্রথম সমস্যা দিলেন মা। সমস্যাটি অদ্ভুত— 'আমরা কে ? কোথেকে এসেছি ?' দিনের পর দিন এই সমস্যা নিয়ে ভাবতে লাগল তারা। প্রথম মুখ খুলল অয়ু। সে বলল, আমরা বুদ্ধিমান একটি প্রাণী।

মা বললেন, প্রাণী কী ?

যারা ভাবতে পারে তারাই প্রাণী।

মা বললেন, আমরা কোত্থেকে এসেছি ?

আমরা কোনো জায়গা থেকে আসি নি। এখানেই ছিলাম।

মা দুঃখিত হয়ে বললেন, তোমরা এখনো ভাবতে শেখনি। ভাবনাতে যুক্তি নেই তোমাদের।

ক্রমে ক্রমে তারা ভাবতে শিখল। কত অদ্ভুত অদ্ভুত সমস্যাই না মা দিতেন—

১. আলো আমাদের কাছে এত প্রিয় কেন ? কেন আমরা আলো ছাড়া ভাবতে পারি না ?

২. কেন ঘরগুলির কাছে আমাদের যেতে মানা ?

তখনো তারা ঘরগুলি দেখেনি, শুধু মায়ের কাছে শুনেছে। দু'টি ঘর আছে আকাশছোঁয়া। সে ঘরের কাছে যেতে মানা। কেন মানা ? মা তা বলবেন না। ভেবে বের করতে হবে।

যেদিন মায়ের শরীর একটু ভালো থাকত সেদিনই নতুন কিছু বলতেন। একদিন তারা গুনতে শিখল। শেখামাত্রই মা একটি সমস্যা দিয়ে দিলেন— 'পাঁচ সংখ্যার এমন দুটি রাশি বলো যাকে অন্য কোনো রাশি দিয়ে ভাগ দেয়া যায় না।'

নীম সঙ্গে সঙ্গে বলল, যে-কোনো রাশিকেই এক কিংবা সেই রাশি দিয়ে ভাগ দেয়া যায়।

তা যায়। ঐ দুটি রাশি ছাড়া অন্য কোনো রাশি দিয়ে ভাগ দেয়া যাবে না।

মা মারা যাবার আগে আগে অনেক কিছুই ওরা শিখে ফেলল। আবার অনেক কিছু শিখতে পারল না। মা বললেন, বেশিরভাগ জিনিসই শিখতে হয় নিজের চেষ্টায়। তোমরা দীর্ঘজীবী। অনেক সময় পাবে শিখবার। মৃত্যুর আগে আগে বলে গেলেন, একটি কথা সবসময় মনে রাখবে, তোমরা থাকবে একসঙ্গে। তোমাদের তিনজনের মিলিত শক্তি হচ্ছে অকল্পনীয় শক্তি। আরেকটি কথা, ঘরগুলির রহস্য বের করতে চেষ্টা করবে।

তাঁর মৃত্যু দেখে ওদের যাতে কষ্ট না হয় সেজন্য মা মৃত্যুর ঠিক আগে আগে ওদের একটি সমস্যা নিয়ে ভাবতে বললেন— 'মৃত্যু কী ?' তারা সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে থাকল, বুঝতেই পারল না কখন মা মারা গেলেন।

নীম বেরিয়ে আসতে দেরি করল। অনেকখানি দেরি করল। সূর্য তখন প্রায় মাথার ওপর। লী কিছুই বলল না। নীম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, চল ফিরে যাই।

তোমার যা দেখার দেখা হয়েছে ?

হয়েছে।

কী দেখলে ?

আজকে প্রথমবারের মতো একটা জিনিস লক্ষ করলাম।

বলো শুনি।

এই ঘরগুলি আকাশছোঁয়া।

আমার তো মনে হয় এ তথ্যটি আমরা প্রথম থেকেই জানি।

এই ঘরগুলির দেয়াল অসম্ভব মসৃণ।

এইটিও আমরা প্রথম থেকেই জানি।

আমার মনে হয় এরকম করা হয়েছে যাতে আমরা দেয়াল বেয়ে উঠতে না পারি।

লী চুপ করে রইল। নীম বলল, আমি ভেতরে গিয়ে আজকে কী করেছি জানো ?

না। জানতে চেষ্টা করিনি।

এই ঘরের যে কম্পনাঙ্ক, সেই কম্পনাঙ্কে আমি আমার 'লুখ' কাঁপিয়েছি।

লী স্তম্ভিত হয়ে গেল। যদি সত্যি তাই হয়, তাহলে ঘরটি ভেঙে গুঁড়িয়ে পড়ার কথা।

নীম বলল, ঘর ভাঙাই ছিল আমার উদ্দেশ্য। যাতে তুমি আঘাত না পাও সেজন্যই তোমাকে নিয়ে ঢুকিনি। কিন্তু ঘর ভাঙেনি। কেন ভাঙেনি জানো ?

না।

ভাঙেনি, কারণ ছ'টি ঘর আলাদা আলাদা করে এমনভাবে তৈরি করা যাতে সামগ্রিক কম্পনাঙ্ক অনেক নিচে নেমে গেছে। আমরা এত নিচে নামতে পারি না। তুমি কি কিছু বুঝতে পারছ লী ?

পারছি। যারা এই ঘরগুলি তৈরি করেছে তারা আমাদের হাত থেকে এদের রক্ষা করবার জন্যেই এরকম করেছে, এই বলতে চাও তুমি ?

হ্যাঁ।

তারা তাহলে কোথায় ?

সেই সমস্যা নিয়ে আমাদের তিনজনকে একসঙ্গে ভাবতে বসতে হবে।

লী এবং নীম নিঃশব্দে ফিরে চলল। লী ভেবে রেখেছিল নীমকে খুব একচোট গালমন্দ করবে। কিন্তু কিছুই করল না, অত্যন্ত দ্রুতপায়ে ফিরে চলল অয়ুর কাছে। তিনজন মিলে আবার ফিরে আসা দরকার। ঘরগুলির মাথার ওপর গিয়ে দেখা দরকার কী আছে সেখানে। অনেক সমস্যা জমে গেছে। ভাবতে বসা প্রয়োজন।

আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, জন্তুটি নিঃশব্দে খাঁচায় ঢুকে পড়ল। জন ফেন্ডার এবং জনি কুলম্যান বড়ই অবাক হলো। কোনো জন্তুকে খাঁচায় ঢুকানো অত্যন্ত পরিশ্রমের

ব্যাপার। প্রচুর যান্ত্রিক সহায়তা প্রয়োজন। প্রথমে একটি শক্তিশালী বৈদ্যুতিক চক্র তৈরি করা হয়, সেই চক্র ক্রমাগত ছোট করে খাঁচার মুখের সামনে আনা হয়। জন্তুটি যত বুদ্ধিমান তাকে খাঁচায় ঢুকানো ততই মুশকিল। এক্ষেত্রে কোনো কিছুরই প্রয়োজন হলো না। খাঁচার মুখ খোলামাত্র জন্তুটি খাঁচায় ঢুকে পড়ল। বৈদ্যুতিক চক্র তৈরি করার প্রয়োজনও হলো না। জনি কুলম্যান চেঁচিয়ে বলল, খাঁচার দরজা বন্ধ করে দাও।

কম্পিউটার সিডিসি বলল, যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে। খাঁচার দরজা বন্ধ হচ্ছে না।

কী জাতীয় গোলযোগ ?

সেকেন্ডারি মেগনেটিক ফিল্ড তৈরি হচ্ছে না।

এরকম হবে কেন ?

মনে হচ্ছে কারেন্ট ফ্লো করছে না। ভেরিয়াক দুটি অকেজো। পরীক্ষা করা হচ্ছে।

আমরা এখন কী করব ?

অপেক্ষা করবে। আমরা ত্রুটি সারাতে না পারলে অন্য আরেকটি খাঁচা পাঠাবে।

জনি কুলম্যানের বিরক্তির সীমা রইল না। কতক্ষণ এরকম অপেক্ষা করতে হবে কে জানে। জন্তুটি মনে হচ্ছে দিব্বি সুখে ঘুমিয়ে পড়েছে। গাছের ডালের মতো যে সব বিচিত্র জিনিস তার মাথার দু'পাশ দিয়ে বের হয়েছিল, সেগুলি আর দেখা যাচ্ছে না। শরীরের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলেছে নাকি ? জন ফেন্ডার বলল, প্রাণীটি বুদ্ধিমান নয়।

কী দেখে বলছ ?

প্রাণীটি ঘুমিয়ে পড়েছে। এরকম অস্বাভাবিক অবস্থায় কোনো প্রাণী ঘুমিয়ে পড়তে পারে না।

ঘুমুচ্ছে বুঝলে কী করে ?

চোখ বন্ধ। মাথার শুঁড়গুলিও নেই। নড়াচড়া করছে না।

তুমি কি নিঃসন্দেহ যে প্রাণীটি ঘুমুচ্ছে ?

না। তাছাড়া অসংখ্য প্রাণী আছে যারা কখনো ঘুমায় না। স্নায়বিক বিশ্রামের তাদের প্রয়োজন নেই।

১৮টা ২৫ মিনিটে গ্যালাক্সি ওয়ান থেকে জানানো হলো যে, খাঁচাটির দরজা ঠিক করা সম্ভব হয়নি। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অন্য একটি খাঁচা পাঠানো হচ্ছে। জন্তুটিকে নতুন খাঁচায় ঢুকানোর জন্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া হোক।

প্রয়োজনীয় কোনো ব্যবস্থা নেয়ার আগেই দেখা গেল ঠিক একই রকম দেখতে আরো দুটি প্রাণী এসে উপস্থিত হয়েছে এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করে ঢুকে পড়েছে খাঁচায়। ঢোকামাত্রই খাঁচার দরজা বন্ধ হয়ে গেল। জনি বলল, এসব কী হচ্ছে, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। এই দুটি আবার কোত্থেকে এল ?

জন ফেন্ডার বলল, তুমি নিশ্চয়ই আশা করনি একটিমাত্র এরকম প্রাণী এই গ্রহে ?

লক্ষ লক্ষ এরকম কুৎসিত প্রাণী এখানে, তা-ও আশা করিনি। আর ভাব দেখে মনে হচ্ছে সবাই খাঁচায় ঢুকে পড়বে।

মোটেই অস্বাভাবিক নয়। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীরা প্রায়ই দলপতিকে অনুসরণ করে।

জনি গম্ভীর হয়ে বলল, প্রাণীগুলি মোটেই নিম্নশ্রেণীর নয়। আমার মনে হয় প্রথম প্রাণীটি ইচ্ছা করে দরজা খোলা রেখেছিল যাতে অন্য দুটি এসে উঠতে পারে এবং সুযোগ বুঝে আমাদের সর্বনাশ করতে পারে।

তুমি শুধু শুধু ভয় পাচ্ছ জনি। এরা নিরীহ প্রাণী। হিংস্র নয়। হিংস্র হলে আমাদের আক্রমণ করে বসত।

আক্রমণ করেনি, কারণ এরা বুদ্ধিমান। এরা সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করবে।

জন ফেন্ডার হেসে উঠল। জনি বলল, তিনটি প্রাণীকে একসঙ্গে মহাকাশযানে নিয়ে আমরা হয়তো বোকামি করছি।

জনি, সে দায়িত্ব তোমার নয়। কেন শুধু শুধু ভাবছ ?

জীববিদ্যা গবেষণাগারের একপ্রান্তে প্রাণী তিনটিকে রাখা হলো। ঘরটি সিলঝিন সংকরের তৈরি। বায়ুর চাপ ০.৯৫ এটমসফিয়ার। বায়ুমণ্ডলীয় গঠন এমন রাখা হয়েছে যাতে প্রাণীগুলির কিছুমাত্র অস্বস্তি না হয়। খাদ্য এবং পুষ্টি বিভাগের ওপর ভার পড়েছে কী ধরনের খাদ্য প্রাণীটি গ্রহণ করে তা বের করা। সাইকিয়াট্রি বিভাগকে বলা হয়েছে প্রাণীটির বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট দিতে। রিপোর্টে যদি প্রাণীটিকে বুদ্ধিমান বলা হয় তবেই তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হবে।

গ্রহটিতে একটি নিরীক্ষা পরীক্ষাগার খোলা হয়েছে। পরীক্ষাগারের দায়িত্ব হচ্ছে, মাকড়সা জাতীয় এই প্রাণীগুলি ছাড়া অন্য কোনো প্রাণের বিকাশ হয়েছে কি-না সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। গ্রহটি ০২ টাইপ। এই জাতীয় গ্রহে প্রাণের উদ্ভব হয় না। কিন্তু যেহেতু একশ্রেণীর প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেহেতু এই নিরীক্ষা পরীক্ষাগার।

মাকড়সা জাতীয় প্রাণীগুলিকে মহাকাশযানে নিয়ে যাবার পরপরই তাদের ঘুমন্ত ভাব কেটে যায়। তারা মাথার দু'পাশের বিচিত্র শিকড়ের মতো জিনিসগুলি বের করে অস্থিরভাবে ছোটাছুটি করতে থাকে। কিন্তু অবস্থাটি সাময়িক। খানিকক্ষণ

পর এরা আবার ঘুমিয়ে পড়ে। চুপচাপ নিঝ্‌ঝুম। কিন্তু আবার জেগে উঠে আগের মতো ছোটাছুটি করতে থাকে। আবার নিঝ্‌ঝুম।

তাদের এ পর্যন্ত ছ'রকমের খাবার দেয়া হয়েছে। প্রোটিন, ফ্যাট এবং সেলুলুজ জাতীয় খাবার। প্রতিবারই তারা গভীর আগ্রহে খাবারের চারপাশে ভিড় করেছে। কিন্তু খাবার স্পর্শও করেনি। কিছুক্ষণ চুপচাপ থেকে আবার সেই আগের মতো ঘুমন্ত অবস্থা।

সাইকিয়াট্রি বিভাগ থেকে বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষার জন্যে প্রথম পরীক্ষাটির ব্যবস্থা করা হলো। এটি একটি সহজ পরীক্ষা (হলডেন ক্রিয়েটিভি টেস্ট-টাইট হইসি)। যার বুদ্ধিমত্তা পরীক্ষা করা হবে তাকে চৌষট্টিটি স্কয়ার দেয়া হয় এবং অন্য একজন প্রাণীটির সামনে ঠিক একই ধরনের চৌষট্টিটি স্কয়ার নিয়ে বসে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে সেগুলি নিয়ে একটি ত্রিভুজ, একটি আয়তক্ষেত্র এবং একটি সিলিন্ডার তৈরি করা হয়। এরপর এগুলিকে সমানুপাতিকভাবে বিভিন্ন ভাগ করে প্রাণীটিকে দেখানো হয়। সাধারণত নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণীরা বেশ কিছু দূর পর্যন্ত অনুসরণ করতে পারে। মধ্যম শ্রেণীর বুদ্ধিবিশিষ্ট প্রাণীরা সমানুপাতিক ভাগ পর্যন্ত করতে পারে। শেষ দুটি পর্যায় শুধুমাত্র বুদ্ধিমান প্রাণীরাই করতে পারে।

মাকড়সাশ্রেণীর প্রাণী তিনটি অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে স্কয়ারগুলি নাড়াচাড়া করতে লাগল। কিন্তু তার পরপরই স্কয়ারগুলি একপাশে সরিয়ে রেখে দিব্বি ঘুমোতে গেল।

হলডেনের দ্বিতীয় টেস্টেও একই ব্যাপার হলো। গোলাকার বল পাঁচটিকে নিয়ে তারা খানিকক্ষণ নাড়াচাড়া করে একপাশে রেখে ঘুমোতে গেল।

সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হলো— প্রাণীগুলির প্রাথমিক পর্যায়ের বুদ্ধিও নেই বলেই মনে হচ্ছে। সাইমেন্সের টেস্টগুলি না করা পর্যন্ত সঠিকভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না।

লী'র একটি মাত্র চিন্তা— এসব কী ?

বলাই বাহুল্য, এই লম্বাটে দুটি মাত্র পাবিশিষ্ট প্রাণীগুলি অনেক জানে। যারা এমন একটি অদ্ভুত জিনিসে করে হঠাৎ এসে হাজির হতে পারে তারা নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার, বুদ্ধিমান হওয়া সত্ত্বেও এরা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করছে না। এদের ভাবভঙ্গি এরকম যেন, কোথাও কোনো সমস্যা নেই। এদের কথার অর্থ বুঝতে পারলে ভালো হতো। নীমকে বলা হয়েছে কথার অর্থ বের করতে। সে এখন শুধু একটিমাত্র সমস্যা নিয়েই ভাবছে। এরা প্রতিটি জিনিসকে একটি নাম দিয়ে ডাকে— মহাকাশযান, রোবট সিডিসি, সাইকিয়াট্রি বিভাগ। একটির সঙ্গে আরেকটির সম্পর্ক কী করে, সেইটিই এখন জানতে হবে। ব্যাপারটি জটিল নয়, সময়সাপেক্ষ। নীম এখানকার প্রতিটি জীবের (যাদেরকে এরা মানুষ বলে ভাবছে) কথাবার্তা মন দিয়ে শুনছে এবং বিশ্লেষণ করছে।

এরা চৌষট্টিটি বস্তু দিয়েছে। উদ্দেশ্য কী তা বোঝা যাচ্ছে না। একজন অনেককিছু বানিয়ে বানিয়ে দেখাল। এরা কি চায় তারাও সেরকম কিছু বানিয়ে বানিয়ে দেখাবে ? তা কেন চাইবে ? নাকি তারা চায় এইসব বস্তুর কম্পনাংক কত তা বের করতে ? নীম প্রতিটির কম্পনাংক কত তা বের করল। তারপর তিনজন মিলে ভাবতে বসল এই কম্পনাংকগুলির অন্য কোনো অর্থ আছে কিনা। সমস্যাটি জটিল। সময় লাগল ভাবতে। কিন্তু উত্তর বের করার আগেই ওরা পাঁচটি গোলাকার বস্তু ঢুকিয়ে দিল। এদের ওজন এক নয়, কিন্তু কম্পনাংক এক। এটিও কি কোনো সমস্যা ? ওরা আবার ভাবতে বসল।

অয়ুর ওপর দায়িত্ব দেয়া হয়েছে— ওরা কে কী ভাবছে তা বের করতে। এর জন্যে ভাষা জানবার প্রয়োজন হয় না। লুখ দুটিকে সম্পূর্ণ সক্রিয় করতে হয়। অয়ু নিবিষ্ট মনে তাই করে যাচ্ছে। প্রতিটি মানুষের কথা জানবার পরই সে সমস্যা নিয়ে ভাবতে বসবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সে একটি অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করেছে— মানুষরা একে অন্যের মনের কথা বুঝতে পারছে না। ব্যাপারটি অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। জনি নামের মানুষটি জন ফেন্ডারের খুব কাছে দাঁড়িয়ে মনে মনে ভাবছে, জন ফেন্ডার একটি মহামূর্খ। কিন্তু জন ফেন্ডার তা বুঝতেও পারছে না।

তাদের সামনে এখন অনেক সমস্যা। সমস্যা মানেই হচ্ছে আনন্দ। কত কিছু ভাববার আছে এখন! আহ্ কী আনন্দ! অয়ুর পায়ে অসম্ভব যন্ত্রণা, কিন্তু তাতে কিছুই আসে যায় না।

কিম দুয়েন নিজের ব্যক্তিগত ঘরে একা একা বসেছিলেন। আজ সারাদিন প্রচুর ঝামেলা গিয়েছে, এখন খানিকটা বিশ্রাম করা যেতে পারে। তার ঘরের বাইরে দুটি ছোট ছোট লালবাতি জ্বলছে, যার মানে হচ্ছে বিশেষ কোনো জরুরি প্রয়োজন ছাড়া তাকে বিরক্ত করা যাবে না।

কিম দুয়েন একটি সিগারেট ধরিয়ে কম্পিউটার সিডিসি'র সবুজ বোতাম টিপে দিল। ঘুমুবার আগে সে সাধারণত সমস্ত দিনের ঘটনা নিয়ে কম্পিউটার সিডিসি'র সঙ্গে কথাবার্তা বলে। হালকা ধরনের কথাবার্তা— জটিল হিসাব-নিকাশ নয়। কোনো কোনো দিন দু'এক দান দাবা খেলা হয়। প্রায় সময়ই কিম দুয়েনের মনে থাকে না যে, সে কথাবার্তা বলছে একটি কম্পিউটারের সঙ্গে। যার মস্তিষ্ক ল্যাবরেটরিতে সিনক্রিয়ন কপোট্রন দিয়ে তৈরি। যার লজিক আছে, কিন্তু অনুভূতি নেই। আজ নিম্নলিখিত কথাবার্তা হলো—

হ্যালো সিডিসি!

হ্যালো ক্যাপ্টেন! দাবা খেলবে নাকি একদান ?

না। আজ খুবই ক্লান্ত।

বুঝতে পারছি। ক্লান্ত হবারই কথা। এবং খুব চিন্তিত হওয়ারও কারণ আছে।

কিম দুয়েন ঈষৎ সচকিত হয়ে বলল, চিন্তিত হওয়ার কারণ কী ?

যে-কোনো অজানা বুদ্ধিমান প্রাণীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের মধ্যে চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে। আলফা সেঞ্চুরির সুসভ্য প্রাণীদের সঙ্গে মানুষের প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা মনে আছে তো ?

কিম দুয়েন গম্ভীর হয়ে বলল, মনে আছে। কিন্তু সিডিসি, তুমি একটি জিনিস ভুল করছ, এরা বুদ্ধিমান প্রাণী নয়। নিচুস্তরের জীব। খাদ্য যোগাড় করতে গিয়েই এদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি ব্যয় হয়।

এখানে তুমি একটি ভুল করছ কিম দুয়েন। প্রাণীগুলি যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং খাদ্যের জন্যে এরা কিছুই করে না।

তার মানে ?

এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তুমি জানো, আমি অনুমান করে কিছু কখনো বলি না।

সাইকিয়াট্রি বিভাগ কিন্তু আমাকে লিখিত নোট দিয়েছে যে, ওরা হলডেন টেস্ট পাস করতে পারেনি।

হলডেন টেস্ট বুদ্ধিমত্তা মাপার জন্যে একটি চমৎকার ব্যবস্থা, কিন্তু তোমার মনে থাকা উচিত, হলডেন নিজেই বলেছেন— কোনো প্রাণী যদি অসম্ভব বুদ্ধিমান হয় তাহলে হলডেন টেস্ট তার কাছে অর্থহীন মনে হবে।

প্রাণীগুলি অসম্ভব বুদ্ধিমান— এরকম কোনো প্রমাণ কি পেয়েছ ?

না, এখনো পাইনি।

এমন কোনো কারণ কি ঘটেছে, যার জন্যে তোমার মনে হয় প্রাণীগুলি বিপজ্জনক হতে পারে ?

না, ঘটেনি। প্রাণীগুলি শান্ত প্রকৃতির, তবে...

তবে কী ?

তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, আমাদের খাঁচার দরজা আটকে ছিল কিছুক্ষণের জন্যে ?

মনে আছে।

তুমি নিশ্চয়ই জানো, আজ এক সেকেন্ডের বারো ভাগের এক ভাগ সময়ের জন্যে আমাদের কেন্দ্রীয় ইলেকট্রিসিটি ছিল না।

আমি জানি।

এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার নয় কি ?

হ্যাঁ, খুবই অস্বাভাবিক।

তুমি হয়তো এখনো খবর পাওনি, আমাদের প্রকৌশল বিভাগের কাছেও একটি সমস্যা আছে। তারা তা নিয়ে বর্তমানে চিন্তাভাবনা করছে।

কী সমস্যা ?

আমাদের পাওয়ার লাইনের ইলেকট্রিসিটিতে এ পর্যন্ত পনের বার সাইকেল বদল হয়েছে। যেন কেউ সাইকেল বদলে কিছু একটা পরীক্ষা করছে।

তুমি বলতে চাও, ঐ প্রাণীগুলি এসব করছে ?

আমি কিছু বলতে চাই না। প্রমাণ ছাড়া আমি কখনো কিছু বলি না। আমি শুধু তোমাকে একটি সম্ভাবনার কথা বলছি।

কিম দুয়েন সিডিসি'র সুইচ অফ করে প্রকৌশল বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করল।

কিম বলছি, সাইকেল বদলাবার একটি খবর শুনলাম।

তেমন গুরুত্বপূর্ণ কিছু নয় স্যার। সেজন্যই আপনাকে জানানো হয়নি। জোসেফসান জাংশানের ক্রটির জন্যে এরকম হতে পারে।

জোসেফসান জাংশানের কোনো ক্রটি কি ধরা পড়েছে ?

না স্যার, তা ধরা যায়নি।

তবে ?

কিম দুয়েন খানিকক্ষণ উত্তরের জন্যে অপেক্ষা করলেন। তারপর গম্ভীর মুখে যোগাযোগ করলেন সিকিউরিটি বিভাগের সঙ্গে।

হ্যালো, সিকিউরিটি ?

বলুন স্যার।

যে প্রাণীগুলিকে আমরা পরীক্ষার জন্যে ল্যাবরেটরিতে এনেছি সেগুলিকে মেরে ফেলবার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছি।

স্যার, আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না।

বুঝতে না পারার কোনো কারণ তো দেখছি না। আণবিক ব্লাস্টার দিয়ে ওদের মেরে ফেলুন।

এই জাতীয় নির্দেশ আপনি একা একা দিতে পারেন না স্যার। বিজ্ঞান একাডেমির অনুমোদন লাগবে।

মহাকাশযান যদি কোনো বিপদের মুখে পড়ে তাহলে সর্বাধিনায়ক হিসেবে একাডেমির অনুমোদন ছাড়াই আমি যে-কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারি। আইনের এই ধারাটি মনে আছে ?

জি স্যার, আছে।

বেশ। এখন যা বলেছি করুন। দায়িত্ব শেষ করবার পর আপনি নিজে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবেন।

ঠিক আছে স্যার।

আরেকটি কথা, আপনার কাছ থেকে আমি একটি লিখিত জবাবদিহি চাই।

স্যার, আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী চাচ্ছেন।

আমি জানতে চাই, ঠিক কী কারণে আমার নির্দেশ পাওয়া সত্ত্বেও আপনি তা মানতে দ্বিধাবোধ করলেন, বিজ্ঞান একাডেমির প্রশ্ন তুললেন ?

স্যার, আমি ভাবলাম এগুলি দুর্লভ প্রাণী হতে পারে। মেরে ফেলাটা হয়তো ঠিক হবে না।

এগুলি দুর্লভ প্রাণী নয়। আমরা মাত্র দু'ঘণ্টার মধ্যে তিনটি প্রাণী ধরেছি।

আমরা ধরিনি স্যার। ওরা নিজ থেকে ধরা দিয়েছে।

হুঁ। আপনার নাম কী ?

আমার নাম সুগিহারা স্যার। আমার ক্রমিক নম্বর ফ ২৩৭।

সুগিহারা, প্রাণীগুলিকে কি দেখেছেন ?

দেখেছি স্যার।

এ জাতীয় কুৎসিত প্রাণীর জন্যে আপনার এত মমতার কারণ কী ?

প্রাণীগুলি দেখতে কেমন সেটা বড় কথা নয়। আলফা সেঞ্চুরির সুসভ্য প্রাণীরা অত্যন্ত সুদর্শন ছিল।

সুগিহারা!

জি স্যার।

আপনি প্রাণীগুলিকে মেরে ফেলুন। আর আপনাকে যে কৈফিয়ত দিতে বলেছিলাম তা দেবার প্রয়োজন নেই।

ঠিক আছে স্যার।

হঠাৎ প্রচণ্ড শক্তিশালী ওমিক্রন রশ্মির দুটি ধারা প্রাণীদের ওপর ফেলা হলো। সিলঝিন নির্মিত খাঁচাটি অসহনীয় উত্তাপে দেখতে দেখতে মোমের মতো গলে গেল।

সুগিহারা নিজে গিয়ে কিম দুয়েনের কাছে খবর দিল, আণবিক ব্লাস্টার ব্যবহার করা হয়েছে।

সুগিহারার মুখ ম্লান। চোখ বিষণ্ন। ক্যাপ্টেন সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করল, সহজ সুরে বলল, মানুষকে প্রায়ই অনেক হৃদয়হীন কাজ করতে হয়। সুগিহারা কিছু বলল না। কিম দুয়েন খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, কিছু বলতে চান আমাকে ?

জি স্যার, চাই।

বলুন।

প্রাণীগুলি মারা যায়নি। ওমিক্রন রশ্মি ব্যবহারের পরেও বেঁচে আছে।

মহাকাশযান গ্যালাক্সি ওয়ানের বিপদসংকেতসূচক ঘণ্টা বাজতে শুরু করল।

৫

গ্যালাক্সি ওয়ানের নিয়ন্ত্রণকক্ষে জরুরি মিটিং বসেছে। একটি জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। তিনটি প্রাণী ঘুরে বেড়াচ্ছে স্বাধীনভাবে। এখন পর্যন্ত তারা কারো কোনো ক্ষতি করেনি। তাই বলে যে ভবিষ্যতেও করবে না, তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। সবচে' বড় কথা, অত্যন্ত শক্তিশালী রেডিয়েশনও এদের কিছুমাত্র কাবু করেনি। ছোটাছুটি করছে উৎসাহের সঙ্গে।

ক্যাপ্টেন কীম গম্ভীর মুখে বললেন, বর্তমান পরিস্থিতির ওপর একটি রিপোর্ট দেয়ার জন্যে আমি কম্পিউটার সিডিসি'কে বলেছি। আলোচনা শুরু করার আগে আমি সিডিসি'র রিপোর্টটি শুনতে চাই। আপনারাও মন দিয়ে শুনুন।

আমি সিডিসি বলছি। বর্তমান সমস্যাটি একটি জটিল এবং ভয়াবহ সমস্যা। তিনটি অসাধারণ বুদ্ধিমান প্রাণী গ্যালাক্সি ওয়ানে স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করছেন, আমি বুদ্ধিমান শব্দটির আগে অসাধারণ বিশেষণটি ব্যবহার করেছি। আপনাদের কারো কারো আপত্তি থাকতে পারে। কিন্তু আমার কাছে এমন সব প্রমাণ আছে যা সন্দেহাতীতভাবে বলবে প্রাণীগুলি বুদ্ধিমান।

প্রথম প্রমাণ   প্রাণীগুলি দ্রুত বুঝতে চেষ্টা করছে গ্যালাক্সি ওয়ান কী করে কাজ করে। কোনো একটি অদ্ভুত উপায়ে এরা ইলেকট্রনের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সেই ক্ষমতাবলে এরা গ্যালাক্সি ওয়ানের প্রতিটি যন্ত্রপাতির ইলেকট্রন প্রবাহ প্রভাবিত করেছে। অবশ্য খুব অল্প সময়ের জন্য। কিন্তু করেছে।

দ্বিতীয় প্রমাণ : তারা একটি ট্রেসারেক্ট তৈরি করেছে। কোনো ত্রিমাত্রিক বস্তু দিয়ে ট্রেসারেক্ট তৈরি করা যায় না, কিন্তু এরা করেছে। তিন নম্বর কক্ষে হলডেন কিউব দিয়ে তৈরি ট্রেসারেক্ট এখনো আছে। আপনারা কি আর কোনো প্রমাণ চান ?

না। ক্যাপ্টেন, আপনি আমাদের ট্রেসারেক্টটি দেখাবার ব্যবস্থা করুন।

ক্যাপ্টেন সুইচ টেপামাত্র তিন নম্বর কক্ষটির ত্রিমাত্রিক ছবি পর্দায় ভেসে উঠল। জিনিসটি যে ট্রেসারেক্ট এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে হলডেন কিউবগুলি (যেগুলি ট্রেসারেক্টের ষোলটি কোণে বসে আছে) ঠিক কী উপায়ে ঘুরছে ?

কম্পিউটার সিডিসি আবার কথা বলা শুরু করল।

আমি এখন আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি অন্য একটি দিকে। এই প্রাণীগুলি কোনো খাদ্য গ্রহণ করে না। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে— এরা শক্তি কোথায় পায় ? প্রশ্নটির উত্তরের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করছে।

সিডিসি কিছুক্ষণের জন্যে চুপ করে থাকল। সম্ভবত শুনতে চাইল কারো কোনো বক্তব্য আছে কি-না। কেউ কথা বলল না।

প্রাণীগুলি বুদ্ধিমান হলেও এরা এই প্রথম কোনো একটি বুদ্ধিমান প্রাণীর সংস্পর্শে এসেছে বলে আমার ধারণা।

এই ধারণার পেছনে কী কী যুক্তি আছে তোমার ?

আমার কাছে এই মুহূর্তে তিনটি প্রথম শ্রেণীর যুক্তি আছে। যুক্তিগুলি বলবার আগে আপনাদের একটি দুঃসংবাদ দিচ্ছি— আমাদের যে অনুসন্ধানী দলকে এই গ্রহে নামানো হয়েছিল তাদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আমার ধারণা প্রাণীগুলি ইচ্ছাকৃতভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করেছে।

নিয়ন্ত্রণকক্ষের জরুরি মিটিং আধাঘণ্টার জন্যে স্থগিত রাখা হলো।

অনুসন্ধানী দলের প্রধান ড. জুরাইন অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করছিলেন। ড. জুরাইন গ্যালাক্সি ওয়ানের প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রধান। তিনি অনুসন্ধানী দলের সঙ্গে আসতে চাননি। তিনটি অদ্ভুত প্রাণীকে কাছ থেকে পরীক্ষা করার সুযোগ ছেড়ে কে আসতে চায় অনুসন্ধানী দলের সঙ্গে ? তবু তাকে আসতে হয়েছে, কারণ এই গ্রহে আরো প্রাণী থাকার সম্ভাবনা। নানান ধরনের প্রাণী। শুধুমাত্র এক শ্রেণীর প্রাণের বিকাশ হবে— তা ভাবার কোনোই কারণ নেই। কাজেই ড. জুরাইনকে আসতে হয়েছে। এই গ্রহে প্রাণের বিকাশ কোন পথে হয়েছে, সেটা পরীক্ষা করার দায়িত্ব পড়েছে তাঁর ওপর। কিন্তু তিনি এখন পর্যন্ত অন্য কোনো প্রাণীর দেখা পাননি।

গত বারো ঘণ্টা ধরে অনুসন্ধানী হেলিকপ্টার উড়ছে। খানাখন্দ এবং প্রকাণ্ড সব পাথর ছাড়া এখন পর্যন্ত কিছু চোখে পড়েনি। না পড়ারই কথা। প্রাণের বিকাশ হবার জন্যে যা যা প্রয়োজন তার কিছুই এ গ্রহে নেই। তাহলে প্রশ্ন হয়— ঐ প্রাণী তিনটি এল কোত্থেকে ? আকাশ থেকে পড়েনি নিশ্চয়ই!

ড. জুরাইন, আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি ?

পারেন।

আমার মনে হচ্ছে, যে প্রাণী তিনটি দেখছি সেগুলি অন্য কোনো গ্রহ থেকে এখানে এসেছে। এরা এ গ্রহের প্রাণী নয়।

এরকম মনে হওয়ার কানো কারণ আছে কি ?

জি স্যার, আছে। প্রাণীগুলির চলাফেরার জন্যে এই গ্রহ উপযোগী নয়। সমস্ত গ্রহটি প্রকাণ্ড সব পাথরে ঢাকা। পাথরগুলি মসৃণ। প্রাণীটি মসৃণ জিনিসের ওপর দিয়ে চলাফেরা করতে পারে না। লক্ষ করেছেন নিশ্চয়ই— গ্যালাক্সি ওয়ানের মেঝেতে এরা বারবার পিছলে পড়ে যাচ্ছিল।

তুমি বলতে চাচ্ছ, প্রাণীটি এই গ্রহের অধিবাসী হলে মসৃণ জায়গায় চলাফেরার ক্ষমতা তার মধ্যে থাকত ? জীবনের বিকাশ হতো সেই দিকে ?

জি স্যার।

ভালো বলছে নিমায়ের। চমৎকার যুক্তি।

ধন্যবাদ স্যার।

নিমায়ের কল্পনাও করেনি ড. জুরাইন এত সহজে তার যুক্তি মেনে নেবেন। ড. জুরাইন একজন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। এরা বিশেষজ্ঞ ছাড়া অন্য কারো কথায় কান দেয় না। নিমায়ের একজন সামান্য সিকিউরিটি গার্ড, কিন্তু ড. জুরাইন তার যুক্তির প্রশংসা করলেন।

অনুসন্ধানকারী দলের সঙ্গে একটি প্রথম শ্রেণীর রোবট সব সময়ই থাকে, কিন্তু এ দলটির সঙ্গে ছিল না। এদের সঙ্গে একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর রোবট আছে। এই জাতীয় রোবট রুটিন কাজ করবার ব্যাপারে সুদক্ষ, কিন্তু এরা যুক্তির মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে না। এরা নিজ থেকে কখনো কোনো আলোচনায় অংশগ্রহণ করে না। প্রশ্ন করলেই শুধুমাত্র উত্তর দিয়ে থাকে। এইবার খানিকটা ব্যতিক্রম হলো। রোবটটি হঠাৎ কথা বলে উঠল, ড. জুরাইন, আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ড. জুরাইন অবাক হয়ে তাকালেন।

কী ব্যাপার ?

আমি একটি সুরেলা ধ্বনি পাচ্ছি। ধ্বনিটি ক্রমশই স্পষ্ট হচ্ছে।

ড. জুরাইনের বিস্ময়ের সীমা রইল না।

কই, আমি তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না! নিমায়ের, তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ ?

না স্যার।

রোবটটি শান্তস্বরে বলল, আপনাদের শ্রবণশক্তি আমার মতো তীক্ষ্ণ নয়। আপনারাও শুনবেন। আমরা সেই সুরেলা ধ্বনির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে সত্যি সত্যি সুরধ্বনি শোনা গেল। ড. জুরাইনের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করল। সুরটি খুবই চেনা। নিমায়ের উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, ড. জুরাইন, আপনি কি সুরটি চিনতে পারছেন ?

হুঁ।

কী ব্যাপার ড. জুরাইন ?

বুঝতে পারছি না।

সুরটি যে নিওলিথি সুর, সে-সম্পর্কে আপনার কি কোনো সন্দেহ আছে ?

না।

আপনার কি মনে হয়, আমরা এখানে নিওলিথি সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাব ?

হ্যাঁ। কোথাও না কোথাও দেখবে ছ'টি অদ্ভুতদর্শন আকাশছোঁয়া ঘর। বাতাস এসে সেই ঘরগুলোতে ধাক্কা দিচ্ছে আর তৈরি হচ্ছে এই অপার্থিব নিওলিথি সুর।

স্পেসস্যুটের শীতলতায়ও ড. জুরাইন ঘামতে থাকলেন।

স্যার, আমাদের উচিত গ্যালাক্সি ওয়ানের সঙ্গে যোগাযোগ করা। কথার উত্তর দিল রোবটটি। সে তার যান্ত্রিক শীতল স্বরে বলল, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ওদের সঙ্গে আমাদের কোনো যোগাযোগ নেই।

কখন থেকে যোগাযোগ নেই ?

এক ঘণ্টা বারো মিনিট তেইশ সেকেন্ড।

এতক্ষণ বলোনি কেন ?

আপনারা জানতে চাননি তাই।

ড. জুরাইন বহু কষ্টে রাগ সামলালেন। নিমায়ের চেঁচিয়ে উঠল, স্যার, দেখুন দেখুন!

নিওলিথি ঘর ছ'টি দেখা যাচ্ছে। অদ্ভুত সবুজ রঙ বেরুচ্ছে তার দেয়াল থেকে। মনে হচ্ছে সেই সবুজ রঙ সমস্ত অঞ্চলটিকেই যেন আলোকিত করে তুলেছে।

আহ্, কী অদ্ভুত!

স্যার, নিওলিথি সভ্যতার সমস্ত ঘরবাড়ি কি সবুজ পাওয়া গেছে ?

হ্যাঁ। তবে রঙের গাঢ়ত্বের তারতম্য আছে। কোনো কোনো জায়গায় রঙ হালকা সবুজ। কোথাও পাওয়া গেছে গাঢ় রঙ।

স্যার, আপনি কি স্বচক্ষে এর আগে নিওলিথি ঘর দেখেছেন ?

না। গ্যালাক্সি ওয়ানের কেউ দেখেনি।

মনের মধ্যে একটি অন্যরকম ভাব হয়।

তা ঠিক। খুবই ঠিক।

ঘরগুলি শুধু যে অদ্ভুত তাই নয়, এদের বিশালত্বও কল্পনাতীত। অপার্থিব সুরে ধ্বনি বেজে যাচ্ছে। যেন একটি বুকভাঙা হাহাকার। নিমায়েরের চোখে গভীর আবেগে জল এসে গেল।

তারা তিনজন তিন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এত কিছু দেখার আছে এখানে। এত কিছু আছে শেখার। ভাষাটা শিখে ফেললে অনেক সহজ হতো। কিন্তু এটি শিখতে সময় লাগছে। কারণ মানুষগুলি প্রায় সময়ই চিন্তা করে একরকম, কিন্তু বলে অন্যরকম। যেমন ক্যাপ্টেন কিম একবার সিকিউরিটির একজনকে জিজ্ঞেস করল, এই সম্পর্কে তোমার কী মত ?

লোকটি হাসিমুখে বলল, স্যার, এটি খুব ভালো ব্যবস্থা।

অথচ লোকটি মনে মনে ভাবছে— ব্যবস্থাটি একটুও কাজ করবে না। এরচে' মন্দ আর কিছু হতে পারে না।

কোনটি ঠিক এর মধ্যে ? ব্যবস্থাটি কি আসলেই মন্দ, না ভালো ? তাহলে মন্দের অর্থ কী, আবার ভালোর অর্থই বা কী ?

এছাড়াও এই মানুষগুলি কথা বলতে প্রচুর সময় নেয়। তারা যেমন একটি শব্দকেই অসংখ্য কম্পনের মধ্যে উচ্চারণ করে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করে, মানুষ তা পারে না। সামান্য মনের ভাব প্রকাশ করার জন্যেও এরা অনেকগুলি শব্দ পাশাপাশি ব্যবহার করে এবং এককেবার করে এককেরকম ভাবে। তাতে অর্থের কী তারতম্য হয় কে জানে! যেমন সামান্য খাওয়ার কথাই ধরা যাক। একবার বলছে, চল খাই। আবার বলছে— খাই চল। এর মানে কী ? এদের কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই ? আরেকটি মজার জিনিস হচ্ছে, এরা অকারণে কথা বলে। কোনো সমস্যা ছাড়াই কয়েকজন মিলে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। এদের ধরন-ধারণ এরকম যেন, চিন্তা করার মতো কোনো সমস্যা নেই। এইসব নিয়ে এদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলতে ইচ্ছা হয়।

অয়ু এখন পর্যন্ত যা শিখেছে, তার সাহায্যে মানুষদের সঙ্গে সে কথা বলতে পারে, কিন্তু এখনই সে বলতে চায় না। ভাষাটি ভালোমতো জানা দরকার। তারও আগে জানা দরকার, ওরা তাদের এত ভয় করছে কেন। ভয় করার কী আছে ?

অয়ু মনে মনে বলল, আমরা তো তোমাদের কোনো ক্ষতি করছি না। তোমাদের কাছ থেকে আমরা শিখতে চাই এবং তার বদলে আমরা তোমাদের সমস্যা নিয়ে চিন্তা করব।

আমরা তোমাদের জন্যে যে জিনিসটি তৈরি করেছি— যা দেখে তোমরা অবাক হচ্ছ এবং বলছ ট্রেসারেক্ট— এরচে' অনেক অনেক অদ্ভুত জিনিস আমরা তোমাদের জন্যে তৈরি করে দেব। এতদিন আমরা এসব তৈরি করিনি, আমরা জানতাম না এসবের কোনো মূল্য আছে। এখন বুঝতে পারছি আছে।

অয়ু কথাবার্তা গুছিয়ে ভেবে রাখতে চেষ্টা করে। একদিন এসব কথা বলতে হবে। ওরা কি শুনবে তাদের কথা ?

ওদের মনের ভাব ভালো নয়। সবাই চাচ্ছে কুৎসিত প্রাণীগুলি যেন শেষ হয়ে যায়। কেন এরকম করছে ওরা ? এত ভয় পাচ্ছে কেন ? ভয়ের তো কিছুই নেই। ভয় কিসের ?

এই মহাকাশযানের তিনটি স্তর আছে। অয়ুরা আছে সবচে' নিচের স্তরে। মানুষরা ভয় পেয়ে নিচের স্তরটি সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছে, যেন ওরা দ্বিতীয় বা প্রথম স্তরে যেতে না পারে। ব্যাপারটি অয়ুর কাছে হাস্যকর মনে হয়েছে। এদের সমস্ত দরজা চৌম্বকশক্তিতে লাগানো। অয়ু, নীম বা লী এদের যে-কেউ যে-কোনো চৌম্বকশক্তিকে প্রভাবিত করতে পারে। ইচ্ছা করলেই এরা দ্বিতীয় বা প্রথম স্তরে যেতে পারে। তা যাচ্ছে না, তার একমাত্র কারণ তারা মানুষদের আর ভয় পাইয়ে দিতে চায় না।

তাছাড়া নিজেদের স্তরেও অনেক কিছু দেখার এবং শেখার আছে। বেশ কিছু মানুষও আটকা পড়েছে এই স্তরে। মানুষগুলি ভয়ে অস্থির হয়ে আছে। একজনকে

অবশ্যি পাওয়া গেছে যার ভয়-টয় বিশেষ নেই। মোটাসোটা ফুর্তিবাজ লোক। অয়ু তার ঘরে ভুল করে ঢুকে পড়েছিল। এই লোকটি অন্যদের মতো লাফিয়ে উঠেনি বা চিৎকারও শুরু করেনি। হাসিমুখে বলেছে, আমার মাকড়সা বন্ধুটির খবর কী ? আমাকে ভক্ষণ করবার হেতু আগমন নাকি ?

অয়ু 'ভক্ষণ' শব্দটির অর্থ ধরতে পারেনি। লোকটি বলেছে, এসেছেন যখন তখন বসুন।

এর অর্থ বেশ বোঝা গেল। অয়ু লোকটি যেরকম আসনে বসে আছে সেরকম একটি আসনে উঠে বসল। লোকটি গম্ভীর হয়ে বলল, আপনি কি আমার কথা বুঝতে পেরে বসলেন ? না এটি একটি কাকতালীয় ব্যাপার ?

অয়ু 'কাকতালীয়' শব্দটিও বুঝতে পারল না। এদের ভাষা যথেষ্ট জটিল। এই শব্দটি সে আগে একবারও শোনেনি।

কিছু পান করবেন ? কমলালেবুর শরবত দিতে পারি; কিন্তু আসল নয়, নকল। সবই সিন্থেটিক।

অয়ু খুব ইচ্ছা করছিল লোকটিকে অবিকল মানুষের ভাষায় জবাব দেয়। বলে, আপনাকে ধন্যবাদ। খাদ্য গ্রহণ করার মতো শারীরিক ব্যবস্থা আমাদের নেই। আমরা সরাসরি শক্তি সংগ্রহ করে থাকি। আপনাদের সঙ্গে আমাদের কিছু মৌলিক পার্থক্য আছে।

কিন্তু অয়ু কিছু বলল না। লী বলে দিয়েছে যেন তা করা না হয়। তার ধারণা মানুষরা যখন টের পাবে তারা ওদের ভাষায় কথা বলতে পারে, তখন আরো ভয় পেয়ে যাবে। ওদের সঙ্গে যোগাযোগের আগে ওদের মনের বৈরীভাব প্রথমে দূর করতে হবে। নীম লী'র কথা মেনে নিতে পারেনি। নীম বলেছে, ওদের মনের ভয় দূর করার সবচে' ভালো পথ হচ্ছে ওদের সঙ্গে কথা বলা।

লী শান্ত স্বরে বলেছে, না। মানুষদের মনে ভয় ঢুকে গেছে। তারা ভাবছে আমরা হয়তো ওদের চেয়েও বুদ্ধিমান। এটি তারা মেনে নিতে পারছে না। আমরা ওদের ভাষায় কথা বলামাত্র ওদের ধারণা বদ্ধমূল হবে। যার ফল হবে অশুভ।

মানুষদের এই ধারণাটিকেও অয়ুর অদ্ভুত লাগে। মানুষদের কাণ্ডকারখানা দেখে তারা তিনজনই মুগ্ধ হয়েছে। এমন একটি মহাকাশযান তৈরি করতে সীমাহীন বুদ্ধির প্রয়োজন। লী'র মতে মানুষের জ্ঞান সীমাহীন। নীম তা স্বীকার করে না। তার ধারণা কম্পন সম্পর্কে মানুষরা জানে খুব কম। নীমের ধারণা ভুল নয়। এই বিষয়ে তারা সত্যি সত্যি কম জানে। কিন্তু তবু মানুষদের জ্ঞানের পরিমাণও কম নয়। নানান তথ্যাদি জমা করে রাখার জন্যে তারা যে কম্পিউটার তৈরি করেছে তা একটি আশ্চর্য জিনিস। কম্পিউটারটি যে শুধু তথ্যাদি জমা করে তা এখনো পরিষ্কার হয়নি। তবে হবে শিগগিরই। লী এবং নীম দুজনেই এই সমস্যাটি নিয়ে চিন্তা

করছে। অয়ুর বর্তমানে চিন্তা করবার মতো কোনো সমস্যা নেই। তাকে আবার সেই পুরনো সমস্যাটি দেয়া হয়েছে— 'ছ'টি আকাশছোঁয়া ঘরের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কী ?'

অনুসন্ধানকারী দলের সঙ্গে যোগাযোগ কেন বিচ্ছিন্ন হয়েছে তা বের করা গেল না। প্রথমে ধারণা করা হয়েছিল অদ্ভুত প্রাণীগুলি হয়তো কিছু একটা করেছে, সে ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। গ্যালাক্সি ওয়ানের সমস্ত যন্ত্রপাতি নিখুঁতভাবে কাজ করছে।

অনুসন্ধানকারী স্কাউটশিপটিতে কোনো ঝামেলা হয়েছে সেরকম ভাবা ঠিক না। কারণ যোগাযোগের বেশ কয়েকটি বিকল্প ব্যবস্থা আছে। মাইক্রোওয়েভ ও লেসার ছাড়াও অত্যন্ত জরুরি অবস্থার জন্যে আছে ওমিক্রন রশ্মির ব্যবহার। এর একটির সঙ্গে অন্যটির কোনো সম্পর্ক নেই। মাইক্রোওয়েভ ও লেসার কাজ না করলেও ওমিক্রন রশ্মি কাজ করবে।

কম্পিউটার সিডিসি যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হবার দু'টি সম্ভাব্য কারণ উল্লেখ করে জরুরি মন্ত্রণালয়ে তার রিপোর্ট পেশ করল।

প্রথম সম্ভাব্য কারণ— অনুসন্ধানী স্কাউটশিপটি অদ্ভুত প্রাণীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং তারা যাবতীয় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করেছে। সে সম্ভাবনা অবশ্যি খুবই কম। প্রথমত, স্কাউটশিপটি অনেক উঁচু দিয়ে উড়ছে। অদ্ভুত প্রাণীগুলি বৈদ্যুতিক ও চৌম্বকীয় শক্তিকে প্রভাবিত করতে পারলেও এদের কোনো প্রযুক্তিবিদ্যা নেই। এরা উড়ে যাওয়া একটি স্কাউটশিপের ক্ষতি হয়তোবা করতে পারবে না।

দ্বিতীয় কারণটি সিডিসি যথেষ্ট কুণ্ঠার সঙ্গে ব্যাখ্যা করল। সিডিসি বলল, আমি পুরনো তথ্যাদির ওপর নির্ভর করে দ্বিতীয় সম্ভাব্য কারণ ব্যাখ্যা করছি। ইন্টার গ্যালাকটিকা আর্কাইভে বলা হয়েছে যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত নিওলিথি সভ্যতার পঞ্চাশ হাজার গজের কাছাকাছি যখন কোনো স্কাউটশিপ বা মহাকাশযান যায় তখন তার যোগাযোগ ব্যবস্থা সাময়িকভাবে নষ্ট হয়ে যায়।

তার মানে তুমি বলতে চাচ্ছ এই গ্রহে নিওলিথি সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ আছে ?

আমি সম্ভাবনার কথা বলছি।

জন ফিভারম্যান বলল, আমরা সহজেই তোমার সম্ভাবনা প্রমাণ করতে পারি। আমাদের কাছে নিওলিথি সুরের বেশ কিছু রেকর্ড আছে। রেকর্ডগুলি বাজানো হলে যে তিনটি প্রাণী আমাদের কাছে আছে ওরা সেই সুর চিনতে পারবে।

তা ঠিক।

কম্পিউটার সিডিসি বলল, আমি জানতাম আপনারা এই সিদ্ধান্তে আসবেন। এই মুহূর্তে তৃতীয় স্তরে নিওলিথি সুর বাজানো হচ্ছে। ত্রিমাত্রিক পর্দা চালু করলে আপনারা প্রাণী তিনটির ওপর নিওলিথি সুরের প্রভাব লক্ষ করতে পারবেন।

স্রুরা তার ঘরের দরজা খোলা রেখেছে।

তার ধারণা হয়েছে প্রাণীগুলি ভয়াবহ নয়। এরা দেখতে কুৎসিত, শক্তিশালী রেডিয়েশনেও এদের কিছু হয় না, তবু খুব সম্ভবত নিরীহ। এখন পর্যন্ত ওরা কারো কোনো ক্ষতি করেনি। ওদের মধ্যে একজনের সঙ্গে তার বেশ ভাব হয়েছে। সেটির পায়ে কোনো আঘাত লেগেছে বা কিছু হয়েছে। একটি পা সবসময় সাবধানে গুটিয়ে রেখে চলাফেরা করে। সে প্রায়ই তার ঘরে এসে চুপচাপ বসে থাকে। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চারদিকে তাকায়।

আজও সে এসেছে এবং অন্যদিনের মতো উঠে বসেছে চেয়ারে।

স্রুরা হাসিমুখে বলল, কি বন্ধু, আবার এসেছ ? হুঁ। আজকে কী নিয়ে আলাপ করি ? তুমি তো আবার আলাপে অংশ নিতে পার না।

প্রাণীটি মনে হলো মাথা নাড়াল। যেন কথাবার্তা সব বুঝতে পারছে।

স্রুরা বলল, হুঁ, তোমার পা একটি মনে হচ্ছে জখম হয়েছে। আমি অবশ্যি এই বিষয়ে কিছু বলতে পারছি না। কারণ আমি ডাক্তার নই, আমি একজন হাইপার ডাইভ ইঞ্জিনিয়ার। হাইপার ডাইভ কী জানতে চাও ?

প্রাণীটি মাথা নাড়াল। যেন সে সত্যি সত্যি জানতে চায়।

হাইপার ডাইভ একটি অদ্ভুত জিনিস। আমরা এসেছি মিল্কওয়ে গ্যালাক্সি থেকে। সেটি তোমাদের এই এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে পাঁচ লক্ষ আলোকবর্ষ দূরে। হাইপার ডাইভ ছাড়া এত দূরে মানুষের পক্ষে আসা সম্ভব নয়। বুঝতে পারছ কিছু ?

না, বুঝতে পারছি না। অসুবিধা হচ্ছে।

স্রুরা মনে করল, সে ভুল শুনছে। সে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল প্রাণীটির দিকে।

কে কথা বলছে ?

আমি, আমি বলছি। আমার নাম অয়ু।

স্রুরা কপালের ঘাম মুছল। শুকনো গলায় বলল, তোমরা আমাদের কথা বুঝতে পার ?

কিছু কিছু পারি।

তোমরা কে ?

তোমার প্রশ্ন বুঝতে পারছি না স্রুরা।

এই গ্রহে তোমাদের মতো কি আরো প্রাণী আছে ?

না, এই গ্রহে অন্য কোনো প্রাণী নেই।

তোমরা আমাদের ভাষা শিখলে কী করে ?

শুনে শুনে শিখেছি।

শুনে শুনেই শিখে ফেললে ?

হ্যাঁ। তুমি কিন্তু হাইপার ডাইভ সংক্রান্ত বিষয়টি এখনো ব্যাখ্যা করনি।

ঠিক এই মুহূর্তে তোমাকে বোঝাতে পারব কিনা জানি না।

চেষ্টা করে দেখ। আমরা যে-কোনো যুক্তিপূর্ণ বিষয় বুঝতে পারি।

হুঁ, তা পার। আমাকে মানতেই হবে তোমরা তা পার। তবে হাইপার ডাইভ জানতে হলে তোমাকে চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণ জানতে হবে। তা কি তুমি জানো ?

না। তুমি আমাকে বুঝিয়ে দাও।

এখন নয়, এখন নয়। আমার মাথা ঘুরছে। আমাকে কিছুক্ষণ ভাবতে দাও।

ঠিক আছে।

আমার এখনো মনে হচ্ছে আমি স্বপ্ন দেখছি।

স্বপ্ন কী ?

পরে বলব, পরে বলব।

স্রুরা দেখল— অয়ু নামের প্রাণীটি নেমে যাচ্ছে। এই কদাকার কুৎসিত প্রাণীটির সঙ্গে সত্যি সত্যি এতক্ষণ কথা হলো! স্রুরা কপালের ঘাম মুছল। সুইচ টিপে গ্যালাক্সি ওয়ানের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা প্রয়োজন। কিন্তু স্রুরার ইচ্ছা করছিল না।

অয়ু ঘর থেকে বেরিয়েই লী'কে খুঁজে বের করল। মানুষদের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে, এটি তাকে জানানো প্রয়োজন। তৃতীয় স্তরে লম্বা করিডোরে কাউকে দেখা গেল না। অয়ু ধীর পায়ে এগোতে লাগল। শেষপ্রান্তে দু'জন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। এদের দু'জনের হাতেই দুটি অস্ত্র। কী জাতীয় অস্ত্র তা জানতে 'লুখ'গুলি বের করতে হয়, কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না। করিডোরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত তীব্র আগুনের হলকা বয়ে গেল। ব্যাপারটি পূর্বপরিকল্পিত, এ জন্যেই করিডোরে আজ একটি মানুষও নেই।

অয়ু তার পাগুলি গুটিয়ে ফেলল শরীরের ভেতর। উত্তাপের ফলে শরীরের অণুগুলির কম্পন দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, সেগুলি তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে হচ্ছে। উত্তাপ ছড়িয়ে দিতে হবে চারদিকে। লুখগুলি শরীরের ভেতর থাকায় বেশ অসুবিধা হচ্ছে। তার কষ্ট হতে থাকল। বাঁচার একমাত্র উপায় ঐ মানুষ দুটিকে মেরে ফেলা। কোনোই কঠিন কাজ নয়। অনায়াসে করা যেতে পারে।

কিন্তু তা করা যাবে না। চিন্তাটাই লজ্জাজনক। অয়ু প্রাণপণে শরীরের কোষগুলির কম্পন বদলাতে লাগল। ঠান্ডা মাথায় তা করা দরকার। একটু ভুল হলেই রক্ষা নেই। কিন্তু নীম এবং লী এরা কোথায় ? ওরা থাকলে অসুবিধা হতো না। তিনজন কাছাকাছি থাকলে যে-কোনো ধরনের কম্পনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যায়। এজন্যেই কি মা সবসময় বলতেন— তিনজন একসঙ্গে থাকবে, কাছাকাছি থাকবে।

অয়ু লক্ষ করল তার ভুল হতে শুরু করেছে। অসুস্থ পায়ের অনেকগুলি কোষ নষ্ট হয়ে গেছে। তীব্র যন্ত্রণা হচ্ছে। ভুল হবার সম্ভাবনা আরো বেড়ে যাবে। মানুষ দুটিকে মেরে নিজে বাঁচার চেষ্টা করাটাই কি এখন উচিত ? এটি একটা সমস্যা। কাজেই ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে এর উত্তর বের করতে হবে।

উত্তাপের তীব্রতা হঠাৎ করে কমে গেল। আহ্, কী শান্তি! অয়ু মাথা ঘুরিয়ে দেখল করিডোরের অন্যপ্রান্তে লী এবং নীম। ওদের সবকটি 'লুখ' বের করা। উত্তাপ এখন ওরাই সামলাচ্ছে। আর ভয় নেই।

লী উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, তুমি ঠিক আছ অয়ু ?

হ্যাঁ ঠিক আছি।

ভালো। আমার মনে হয় এখন থেকে আমাদের উচিত সবসময় একসঙ্গে থাকা।

হ্যাঁ।

আর ওদের সঙ্গে কথা বলাও উচিত। ওদের জানানো উচিত আমরা ওদের কোনো ক্ষতি করতে চাই না।

হুঁ, ওদের বলা উচিত। আমরা ওদের সঙ্গে থেকে ওদের কাছ থেকে শিখতে চাই।

হুঁ, তা চাই।

অয়ু, তোমার পা সম্ভবত নষ্ট হয়ে গেছে।

হ্যাঁ। অসহনীয় যন্ত্রণা হচ্ছে লী।

তোমাকে আমি একটি সমস্যা দিচ্ছি। তুমি সমস্যা নিয়ে চিন্তা করতে থাক। যন্ত্রণা ভুলে যাবে।

দাও, সমস্যা দাও।

লী খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সমস্যাটি বলল— সমস্যাটি আমি মানুষদের কাছ থেকে পেয়েছি। এদের কম্পিউটারে যে সমস্ত তথ্য আছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে আলোর গতিবেগ প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। এরা এসেছে পাঁচ লক্ষ আলোকবর্ষ দূর থেকে। এরা যদি আলোর গতিবেগে আসে তাহলেও এদের লাগবে পাঁচ লক্ষ বছর। কিন্তু ওদের তথ্য অনুযায়ী কোনো বস্তুর গতিবেগ আলোর গতিবেগের বেশি হতে পারে না। তুমি শুনছ তো মন দিয়ে ?

আমি শুনছি।

এখন তুমি ভেবে বের কর, এই দীর্ঘ পথ ওরা কী করে এত অল্প সময়ে পার হলো। সমস্যাটি অত্যন্ত জটিল। এটি নিয়ে ভাবতে বসলে তোমার পায়ের যন্ত্রণা আর টের পাওয়া যাবে না।

সমস্যাটি ভাবতে হলে আমাকে কিছু জানতে হবে।

তুমি ভাবতে শুরু কর। যখন কিছু জানার দরকার হবে, আমাদের জিজ্ঞেস করবে, আমরা জানিয়ে দেব।

অয়ু সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। আর ঠিক তখনি তৃতীয় স্তরের সবকটি ধাপে অপূর্ব নিওলিথি সুর বেজে উঠল। লী এবং নীম উৎকর্ণ হয়ে কয়েক মুহূর্ত শুনল। অয়ু বলল, ঘরের শব্দ আসছে। এই মানুষেরা আমাদের ঘরের শব্দ জানে।

নীম বলল, কে জানে আমাদের এই ঘর হয়তো এইসব মানুষই বানিয়েছে!

নতুন এই সমস্যা নিয়ে আমাদের ভাবতে বসা উচিত।

যে লোক দু'টি লেসাররশ্মি দিয়ে অয়ুকে আঘাত করেছে, ওরা স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়েছিল। তারা দু'জনেই সিকিউরিটির। প্রাণী তিনটিকে শেষ করে দেয়ার মূল পরিকল্পনা তাদেরই। নিয়ন্ত্রণ পরিষদ এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। শুধু নিয়ন্ত্রণ পরিষদ নয়, তৃতীয় স্তরের ক্রু-মেম্বাররাও কেউ কিছু জানে না। তাদেরকে বলা হয়েছে নিরাপত্তার খাতিরে কেউ যেন কোনো অবস্থাতেই করিডোরে না আসে।

আক্রমণ ফলপ্রসূ হয়নি, কিন্তু একটি জিনিস পরিষ্কার হয়েছে— যখন প্রাণীটি একা ছিল তখন সে উত্তাপ সহ্য করতে পারছিল না। কিন্তু আর দুটি প্রাণী এসে যোগ দেয়ামাত্র সব অন্যরকম হয়ে গেছে। লেসাররশ্মির কল্পনাতীত শক্তিও নিমিষের মধ্যে দুর্বল হয়ে গেল। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যবেক্ষণ এবং ক্যাপ্টেনকে জানানো প্রয়োজন। এই পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী কর্মপন্থা ঠিক করতে হবে।

সিকিউরিটি গার্ড দু'জন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল। প্রাণী তিনটির মধ্যে কী যেন কথাবার্তা হচ্ছে। মাথার ওপরে শুঁড়ের মতো জিনিসগুলি খুব দুলছে। একজন তার শুঁড় গুটিয়ে ফেলছে। একটি, এটি খুব সম্ভবত পালের গোদা, ঝিঁঝি পোকার মতো শব্দ করছে। এ কী, হঠাৎ করে নিউলিথি সুর বাজছে কেন? সবকটি চ্যানেলে বাজানো হচ্ছে।

গার্ড দু'জন অস্বস্তির সঙ্গে লক্ষ করল— প্রাণী তিনটি নিওলিথি সুর শুনে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এদের ভাবভঙ্গি এরকম যেন এ সুর তাদের চেনা। পালের গোদাটি থপ থপ শব্দে এগিয়ে আসছে। গার্ড দু'জনের শরীর দিয়ে শীতল স্রোত বয়ে গেল। লেসার গান দু'টি শক্ত করে ধরা আছে, তবু গানগুলি কাঁপছে। প্রাণীটি কি প্রতিশোধ নেবার জন্যে এগিয়ে আসছে?

লী এগিয়ে গেল অনেকখানি। গার্ডদের প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে থমকে দাঁড়াল এবং পরিষ্কার স্বরে বলল, আমরা তোমাদের সঙ্গে কথা বলতে চাই। তোমরা যে সুর বাজাচ্ছ সেই সুর সম্পর্কে জানতে চাই।

গার্ড দু'জন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ড. জুরাইন অবাক বিস্ময়ে নিওলিথি সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন। একে ধ্বংসস্তূপ বলা হয় কেন ? কোনো কিছুই ধ্বংস হয়নি। আকাশছোঁয়া ঘরগুলি এখনো অমলিন অবিকৃত। ঠিক কী উদ্দেশ্যে এইসব তৈরি হয়েছিল ? জানবার আজ আর কোনো উপায় নেই। নিওলিথি সভ্যতার জনকদের সন্ধান এখনো পাওয়া যায়নি, পাওয়া যাবে এমন আশা এখন আর কেউ করে না।

নিমায়ের বলল, ড. জুরাইন!

বলো।

ঠিক কতদিন আগে এইসব তৈরি হয়েছিল ?

সঠিক বলা যায় না। রেডিও অ্যাকটিভ ডেটিং করে দেখা গেছে, প্রায় সত্তর থেকে আশি লক্ষ বছর পুরনো। আমার ভুলও হতে পারে। আমি ঠিক জানি না।

কোথায় জানা যাবে ?

গ্যালাক্সি-ওয়ানের কম্পিউটার মেমোরি সেলে নিওলিথি সভ্যতা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্যাদি আছে।

তাহলে আমাদের রোবটটিও তো জানবে। সিডিসি মেমোরি সেলের অনেক কিছুই তো অনুসন্ধানী রোবটগুলির মেমোরি সেলে থাকে।

ঠিক বলেছ।

ড. জুরাইন তাঁর বাঁ পাশে দাঁড়ানো রোবটটির দিকে তাকাতেই রোবটটি বলল, হ্যাঁ, আমি জানি। আমিও নিওলিথি সভ্যতা সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি।

জানলে চুপ করে আছ কেন ?

আমাকে তো কিছুই জিজ্ঞেস করা হয়নি।

নিওলিথি সভ্যতা কত পুরনো ?

বিষয়টি আপেক্ষিক। চতুর্মাত্রিক সময় সমীকরণ হিসেবে কোনো বস্তুর স্থায়িত্বকাল হচ্ছে একটি ত্রৈরাশিক গুণিতক। যার প্রথম রাশিটি একটি আপেক্ষিক রাশি, যাকে...

ঠিক আছে, তুমি থাম।

তবে গ্রহগুলিতে নিওলিথি সভ্যতার প্রাচীনত্ব বের করা যায়। গ্রহগুলিতে ত্রৈরাশিক গুণিতকের মান আপেক্ষিক নয়।

যথেষ্ট হয়েছে, তুমি থাম। এখন থেকে যা জিজ্ঞেস করব, শুধু তার উত্তর দেবে এবং কম সংখ্যক বাক্য ব্যবহার করবে।

ঠিক আছে।

এখন বলো, এ পর্যন্ত ক'টি নিওলিথি সভ্যতার সন্ধান পাওয়া গেছে ?

সর্বমোট ন'টি। প্রথমটি পাওয়া গেছে মিল্কওয়ে গ্যালাক্সিতে। নবুথ সলের চতুর্থ গ্রহটিতে। সেটির বর্ণ হালকা সবুজ।

ঘর ছ'টি ছিল ?

যে ন'টি নিওলিথি সভ্যতা পাওয়া গেছে, তার প্রতিটিতে ঘরের সংখ্যা ছয়। প্রতিটি থেকেই অপূর্ব সুরধ্বনি হয় এবং প্রতিটির রঙ হচ্ছে সবুজ। এই কারণেই ইন্টার গ্যালাকটিকা এনসাইক্লোপিডিয়াতে নিওলিথি সভ্যতাকে বলা হয়েছে 'সবুজ সুরময় সভ্যতা'।

আকাশছোঁয়া এই ঘর-বাড়ি ছাড়া আর কী নিদর্শন আছে নিওলিথি সভ্যতার ?

আর কোনোই নিদর্শন নেই। এটি একটি মহারহস্যময় ব্যাপার। আকাশছোঁয়া এইসব প্রাসাদ কী করে তৈরি করা হয়েছে তা এখনো জানা যায়নি। নিওলিথি সভ্যতার জনকরা কোনো কিছুই লিখে রেখে যায়নি। কোনো বই নেই, যন্ত্রপাতি নেই, কিছুই নেই।

হুঁ, রহস্যময় তো বটেই!

আরো রহস্যময় হচ্ছে তাদের স্থান নির্বাচন। প্রতিটি সভ্যতা গড়ে উঠেছে জনমানবহীন গ্রহে। গ্রহগুলিতে গাছপালা পর্যন্ত নেই।

এই গ্রহটির ক্ষেত্রে সেটি সত্য নয়। এখানে আমরা তিনটি প্রাণী পেয়েছি।

তা ঠিক। তবে এরকম দু'একটি প্রাণের সন্ধান অন্যান্য নিওলিথি সভ্যতার ধ্বংসাবশেষেও পাওয়া গেছে।

ড. জুরাইন খুব আশ্চর্য হলেন। এটি একটি নতুন তথ্য।

কী ধরনের প্রাণের সন্ধান পাওয়া গেছে ?

প্রথম অভিযাত্রী দল যে নিওলিথি সভ্যতার সন্ধান পায় সেখানে দুটি প্রাণী পাওয়া গিয়েছিল। প্রাথমিক রিপোর্টে বলা হয়েছিল, প্রাণী দুটি অসম্ভব বুদ্ধিমান।

সেগুলি দেখতে কেমন ছিল ?

সরীসৃপ জাতীয়, লম্বা।

এটাই কি একমাত্র উদাহরণ ?

না, আরো আছে। এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জের রিবাত সলের সপ্তম গ্রহের যে নিওলিথি সভ্যতা পাওয়া গেছে, সেখানেও চারটি প্রাণী পাওয়া গিয়েছিল।

সেগুলি দেখতে কেমন ?

দ্বিপদ প্রাণী, অত্যন্ত খর্বাকৃতি। প্রাথমিক রিপোর্টে এদেরও প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে বলা হয়েছে।

এইসব প্রাণী সম্পর্কে তুমি আর কী জানো ?

এদের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায় না, কারণ কোনো এক বিচিত্র কারণে দুটি মহাকাশযান ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ধ্বংসের সময় প্রাণীগুলি মহাকাশযানে ছিল।

ড. জুরাইন নিমায়েরকে বললেন, তুমি কি ঘরগুলির ভেতর ঢুকে দেখতে চাও ?

হ্যাঁ চাই। আপনি চান না?

চাই, আমিও চাই। কিন্তু দু'জনে একসঙ্গে যাওয়া কি ঠিক হবে?

ড. জুরাইন, আমার মনে হয় দু'জনের একসঙ্গে যাওয়া ঠিক হবে না।

ড. জুরাইন অস্বস্তির সঙ্গে বললেন, ঘরগুলির ভেতর যারা যায় পরবর্তীকালে তাদের মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হয়। এই জাতীয় কথাবার্তা শুনেছি।

রোবটটি বলল, কথাটি আংশিক সত্য। কেউ কেউ মানসিক ভারসাম্য হারিয়েছে, সবাই হারায়নি।

মানসিক ভারসাম্য হারাবার কারণ কী?

নানান ধরনের মতবাদ আছে। কেউ কেউ বলেন জিনিসটির বিশালত্ব, নির্জনতা এবং সুরধ্বনি স্নায়ুকে প্রভাবিত করে। আবার দ্বিতীয় এক দলের ধারণা— ঘরগুলির ভেতর দাঁড়ালে বহুমাত্রিক জগৎ সম্পর্কে ধারণা হয়।

ড. জুরাইন ঘরের ভেতরে গিয়ে দাঁড়াবেন বলে মনস্থির করলেন। এরকম সুযোগ জীবনে আর আসবে না। নিওলিথি সভ্যতার খবর গ্যালাকটিক অ্যাম্পায়ারে পৌঁছামাত্র এগুলি সরকারি নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। এর ভেতর যাওয়ার আর কোনো উপায় থাকবে না। নিওলিথি সভ্যতার পঞ্চাশ হাজার গজের ভেতর যাওয়া গ্যালাকটিক আইন অনুযায়ী একটি প্রথম শ্রেণীর অপরাধ।

ড. জুরাইন নিমায়েরের হাত ধরে প্রথম ঘরটির ভেতর ঢুকলেন।

৬

নিয়ন্ত্রণকক্ষে সবাই গম্ভীর মুখে বসে আছে।

অতি অল্প সময়ে বেশ কিছু বড় বড় ঘটনা ঘটে গেল। জানা গেল, প্রাণীগুলি নিওলিথি সভ্যতার সঙ্গে পরিচিত। প্রাণীগুলি অসাধারণ বুদ্ধিমান এবং তারা মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে। ক্যাপ্টেন আবেগশূন্য স্বরে বললেন, প্রথম শ্রেণীর জরুরি অবস্থা তুলে নিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীর সতর্কতামূলক অবস্থা ঘোষণা করা হলো।

তৃতীয় স্তর খুলে দেয়া হলো এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হলো প্রাণীগুলির সঙ্গে সরাসরি কথা বলা হবে। কথাবার্তা হবে নিয়ন্ত্রণকক্ষে। পরিচালকমণ্ডলীর সব ক'জন সদস্য ছাড়াও এতে থাকবে মনস্তত্ত্ব ও সমাজবিদ্যা বিভাগের সদস্যরা। কম্পিউটার সিডিসিকেও আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে বলা হয়েছে। আর বলা হয়েছে স্রুরাকে। স্রুরাকে নেয়া হয়েছে তার ব্যক্তিগত আগ্রহের জন্যে। স্রুরা হচ্ছে একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে অয়ু নামধারী প্রাণীটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যোগাযোগ করেছে। একটিমাত্র কারণে স্রুরার আগ্রহের মূল্য দেয়া হয়েছে।

আলোচনা শুরু হলো গ্যালাক্সি ওয়ানের সময়সূচি অনুযায়ী ১২টা ৩৬ মিনিটে। তিনটি প্রাণীর মধ্যে এসেছে মাত্র দুটি। তারা গোলাকৃতি ডায়াসের মাঝখানে এসে

দাঁড়াল। তাদের মাথার ওপরে গাছের শিকড়ের মতো বিচিত্র জিনিসগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাঁপছে। প্রথম কথা বললেন ক্যাপ্টেন।

আমি আপনাদের তিনজনকেই আসতে বলেছিলাম। একজন দেখছি আসেননি।

সে অসুস্থ, কাজেই সে সমস্যা নিয়ে ভাবছে।

আপনার কথা বুঝতে পারছি না।

সে অসুস্থ, কাজেই সে ব্যথা ভুলে থাকবার জন্য সমস্যা নিয়ে ভাবছে।

কিছু মনে করবেন না। আমি এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না।

শারীরিক ব্যথাবোধ ভুলে থাকবার জন্যে আমরা সমস্যা নিয়ে চিন্তা করি।

কী ধরনের সমস্যা নিয়ে সে চিন্তা করছে ?

যাকে আপনারা হাইপার ডাইভ বলছেন, তাই নিয়ে।

নিয়ন্ত্রণকক্ষে একটি মৃদু গুঞ্জন উঠল। ক্যাপ্টেন বললেন, আপনারা নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিমান প্রাণী। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমরা সবাই বিশেষ গর্বিত ও আনন্দিত।

প্রাণীটি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমার মনে হচ্ছে আপনি ঠিক বলছেন না। আপনি মোটেই আনন্দিত নন। ঠিক এই মুহূর্তে আপনি আমাকে ঘৃণা করছেন এবং ভাবছেন— কী করে আমাদের তিনজনকে সবচে' কম পরিশ্রমে মেরে ফেলা যায়।

নিয়ন্ত্রণকক্ষে বড় রকমের একটি গুঞ্জন উঠল। সেই গুঞ্জনের মধ্যেই প্রাণীটি থেমে থেমে বলল, আমাদের একটি ক্ষমতা হচ্ছে— আমরা আপনাদের মনের কথা বুঝতে পারি।

ক্যাপ্টেন অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলেন না। দীর্ঘ নীরবতার পর প্রথম কথা বলল স্রুরা, আমি তোমাদের ঘৃণা করি না। তোমাদের অসাধারণ বুদ্ধি দেখে আমি সত্যি সত্যি মুগ্ধ।

আপনি ঠিক কথাই বলছেন। আপনার মতো আরো আটজন মানুষ এখানে আছেন যাদের মনে আমাদের সম্পর্কে কোনো খারাপ ধারণা নেই।

এবার কথা বললেন মনস্তত্ত্ব বিভাগের প্রধান হেরম্যান— আমাদের সম্বন্ধে আপনার ধারণা কী ?

প্রযুক্তিবিদ্যায় আপনাদের দক্ষতা সীমাহীন।

এছাড়া আর কী বলার আছে আপনার ?

আপনারা অত্যন্ত সন্দেহপ্রবণ।

হেরম্যান বললেন, কেন আমরা সন্দেহপ্রবণ বলতে পারেন ? অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি কী কারণে আমাদের এই সন্দেহপ্রবণতা ?

আত্মবিশ্বাসের অভাব এর একমাত্র কারণ। আপনাদের সভ্যতা যন্ত্রনির্ভর। যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার জন্যেই আপনাদের নিজের ওপর বিশ্বাস কম।

যন্ত্র কিন্তু আমাদেরই তৈরি।

আপনাদের তৈরি হলেও যন্ত্রের সঙ্গে আপনাদের যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আপনাদের তৈরি কম্পিউটারকে আপনারা সন্দেহের চোখে দেখেন।

কম্পিউটার সিডিসি বলল, আমি এক্ষেত্রে আপনাদের যুক্তি সমর্থন করছি।

হেরম্যান বললেন, আপনাদের সভ্যতা কি যন্ত্রনির্ভর নয় ?

আমরা আমাদের সভ্যতা সম্পর্কে কিছু জানি না।

বলতে চান আপনাদের কোনো সভ্যতা নেই ?

জ্ঞানের বিকাশকে যদি সভ্যতা বলেন তাহলে আমাদের সভ্যতা আপনাদের ভাষায় প্রথম শ্রেণীর। আমরা সমস্যার সমাধান করতে পারি।

যে-কোনো সমস্যার সমাধান করতে পারেন ?

হ্যাঁ, পারি।

আপনি একাই শুধু আমাদের সঙ্গে কথা বলছেন, আপনার সঙ্গী চুপ করে আছেন কেন ?

আমরা তিনজন একসঙ্গে কথা বলছি। আমার অসুস্থ সঙ্গী, যে আসেনি, সেও আলোচনায় অংশগ্রহণ করছে।

আপনি কিন্তু বলেছেন আপনার অসুস্থ সঙ্গী সমস্যা নিয়ে ভাবছেন।

সমস্যা নিয়ে ভাবার সময়ও আমরা ইচ্ছা করলে কিছু বাহ্যিক যোগাযোগ রাখতে পারি।

জীববিজ্ঞান পরিষদ থেকে পরবর্তী প্রশ্নগুলি হলো।

মোট কত ধরনের প্রাণের বিকাশ এখানে হয়েছে ?

এখানে কোনো প্রাণের বিকাশ হয়নি। আমরা তিনজন ছাড়া এখানে অন্য কোনো প্রাণী নেই।

আপনি কি এ ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত ?

আমরা নিশ্চিত। আমরা দীর্ঘদিন এই গ্রহে আছি।

কতদিন ধরে আছেন ?

আপনাদের হিসাবে তিনশত বছর।

জীবনধারণের জন্যে আপনাদের খাদ্য গ্রহণের প্রয়োজন হয় না ?

না।

আপনাদের শারীরবৃত্তির কার্যাবলি পরীক্ষার জন্য আমরা কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে চাই। এ ব্যাপারে আপনাদের আপত্তি আছে ?

না, আপত্তি নেই।

আপনারা এই গ্রহের বাসিন্দা?

আমরা সঠিক বলতে পারছি না।

আপনারা সব সমস্যার সমাধান করতে পারেন বলে বলেছেন। এ সমস্যাটির সমাধান করতে পারেননি?

না, পারিনি। তবে চেষ্টা চলছে। কিছু সমস্যা আছে যার সমাধান নেই। এটিও এ ধরনের একটা সমস্যা কি-না বলতে পারছি না।

সমাধান নেই, এ ধরনের একটা সমস্যার কথা আমাদের বলুন।

যেমন ধরুন, আকাশের বাইরে কী আছে?

আকাশ বলতে আপনি কি মহাশূন্য বোঝাচ্ছেন?

আমি বোঝাচ্ছি আমার চারপাশে যা আছে তা।

আপনাদের ধারণা— আকাশের বাইরে কী আছে সে সমস্যার সমাধান নেই?

হ্যাঁ, আমাদের ধারণা সেরকম। আমরা মনে করি আকাশের বাইরে আছে আরেকটি আকাশ, তার বাইরে আরেকটি আকাশ। তার বাইরে...।

আপনাদের যুক্তি বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, অসীম সম্পর্কে ধারণা করা সম্ভব নয়।

সমাধান নেই, এই জাতীয় অনেক সমস্যাই কি আপনাদের কাছে আছে?

হ্যাঁ আছে।

আমরা সেইসব সমস্যা জানতে আগ্রহী।

জাহাজের ক্যাপ্টেন বলল, আজকের মতো আলোচনা মুলতবি থাকবে। আমরা কাল নিওলিথি সভ্যতা প্রসঙ্গে কথা বলব।

লী নীমকে মৃদুস্বরে বলল, এরা কিন্তু একবারও বলল না ঠিক কী কারণে এরা আমাদের মেরে ফেলতে চেষ্টা করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে কিনা।

৭

ঘরগুলির ভেতরে আবছা অন্ধকার। প্রথম কিছুক্ষণ ড. জুরাইন কিছুই দেখতে পেলেন না। অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে বেশ সময় নিল, তবু পরিষ্কার কিছুই দেখা যাচ্ছে না। নিমায়ের অবাক হয়ে বলল, ভেতরে কিন্তু কোনো সুরধ্বনি নেই, লক্ষ করেছেন ড. জুরাইন?

কথা খুবই ঠিক। ভেতরটায় ছমছমানো নীরবতা। ড. জুরাইন বললেন, শুধু যে সুরধ্বনি নেই তা নয়, আমাদের কথাবার্তার কোনো প্রতিধ্বনিও হচ্ছে না। এরকম প্রকাণ্ড বন্ধ ঘরে প্রতিধ্বনি হওয়া উচিত।

স্যার, আরেকটি জিনিস লক্ষ করেছেন ?— আমাদের পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমাদের ওজন অনেক বেশি।

হুঁ, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রায় 2G-র কাছাকাছি।

স্যার, মানসিক ভারসাম্য হারাবার মতো আমি তো কিছুই দেখছি না। ভেতরটায় তেমন কোনো বিশেষত্ব নেই। তবে একটু ভয় ভয় করছে।

কী রকম ভয় ? কিছু কুৎসিত প্রাণী হঠাৎ বেরিয়ে এসে আক্রমণ করবে, এই জাতীয় ?

না স্যার, অন্যরকম ভয়।

দু'জনে ঘরটির ঠিক মাঝামাঝি এসে দাঁড়াল। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির জন্যে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তার ওপর মেঝেটি অসম্ভব পিচ্ছিল। ঘরের মাঝামাঝি একটি বৃত্তাকার দাগ দেখা গেল। দাগটি গাঢ় সবুজ রঙের এবং চাপা একধরনের আলো বের হচ্ছে।

বৃত্তের ভেতর এসে দাঁড়াতেই ড. জুরাইন প্রচণ্ড অস্থিরতা অনুভব করলেন। তাঁর মনে হলো, আবছা অন্ধকার ক্রমশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। ঘরময় হালকা নীলাভ আলো। সেই আলো বেড়ে যাচ্ছে। তিনি একধরনের কোলাহল শুনতে পেলেন। যে কোলাহল সমুদ্রগর্জনের মতো গম্ভীর ও বিলম্বিত। নিমায়ের উদ্বিগ্ন স্বরে বলল, স্যার, আপনার কী হয়েছে, এরকম করছেন কেন ?

ড. জুরাইনের সংবিৎ ফিরে এল। তিনি দেখলেন সব আগের মতোই আছে। কিছুই বদলায়নি। তিনি বললেন, শরীর ভালো লাগছে না। খুব সম্ভব আমার হেলুসিনেশন হচ্ছে।

আমার মনে হয় আপনার স্পেসস্যুটের অক্সিজেন ভাল্ব কাজ করছে না। অক্সিজেনের হঠাৎ অভাব হলে এরকম হয়।

হতে পারে, হওয়া খুবই সম্ভব।

কথা শেষ হবার আগেই আবার তাঁর আগের মতো হলো। এবার মনে হলো আলোর তীব্রতা অসম্ভব বেশি। সমুদ্রগর্জনের মতো সেই শব্দও স্পষ্ট হলো। ঝনঝন করে কানে বাজতে লাগল। নিমায়ের ডাকল, ড. জুরাইন, ড. জুরাইন! তিনি তার ডাক শুনতে পেলেন না। হঠাৎ তাঁর মনে হলো, তিনি অনেক কিছুই বুঝতে পারছেন। সৃষ্টিতথ্যের মূল রহস্য ক্রমে ক্রমেই তাঁর কাছে স্পষ্ট হয়ে আসছে। এতদিন যা তিনি জেনে এসেছেন তা মূল সত্যের আংশিক ছায়া মাত্র। নিমায়ের তাকে জড়িয়ে ধরে ব্যাকুল হয়ে ডাকল, ড. জুরাইন, ড. জুরাইন!

কেউ সাড়া দিল না।

৮

ক্যাপ্টেনের ঘর অন্ধকার।

তার ঘরের বাইরে তারকাকৃতির দু'টি লালবাতি জ্বলছে। যার মানে হচ্ছে দ্বিতীয় শ্রেণীর জরুরি অবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তাকে ডাকা যাবে না। ক্যাপ্টেন বিছানায় শুয়ে আছেন। তার ঘুম আসছে না। স্নায়ু উত্তেজিত হয়েছে। ঘুম আসবার কথা নয়। অনেকগুলি বড় বড় ঝামেলা সৃষ্টি হয়েছে। কোনোটিরই কিনারা হচ্ছে না।

সন্ধানী স্কাউটশিপ থেকে এখনো কোনো খবর পাওয়া যায়নি। নিওলিথি ধ্বংসস্তূপের কাছাকাছি থাকলে খবর পাওয়া যাবে না তা ঠিক, কিন্তু এত দীর্ঘ সময় সেখানে তারা থাকবে কেন ? দ্বিতীয় অনুসন্ধানী জাহাজ পাঠানোর ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এদিকে প্রাণী তিনটিকে তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। না পারবার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে। প্রাণীগুলি অসাধারণ বুদ্ধিমান। স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে এই নির্জন মৃত গ্রহে তারা যে-কোনোভাবেই হোক আটকে পড়েছিল। গ্যালাক্সি ওয়ান হচ্ছে তাদের একমাত্র মুক্তির পথ। একটি বুদ্ধিমান প্রাণী নিজের মুক্তির জন্যে যতদূর সম্ভব নিষ্ঠুরতা অবলম্বন করবে। প্রাণীর ধর্মই তাই। যে শ্রেষ্ঠ সে-ই টিকে থাকবে। এই সুবিশাল নক্ষত্রপুঞ্জ দুর্বলের জন্যে নয়। প্রাণীগুলি মানুষের তুলনায় উন্নত, এটি তিনি মানতে রাজি নন। তাদের মানসিক বুদ্ধিবৃত্তি উন্নত হতে পারে, সামগ্রিকভাবে মানুষের সঙ্গে এদের তুলনা করা ঠিক হবে না। কিন্তু যদি ওরা সত্যি মানুষের চেয়ে উন্নত হয় তাহলে ? সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেয়া যাচ্ছে না।

ক্যাপ্টেন চিন্তিত মুখে সুইচ টিপে সিডিসি'র সঙ্গে যোগাযোগ করলেন।

হ্যালো ক্যাপ্টেন!

হ্যালো!

ঘুম আসছে না ?

না।

এক হাত খেলবেন ?

তা খেলা যেতে পারে।

ত্রিমাত্রিক পর্দায় দাবার গুটি ভেসে উঠল। ক্যাপ্টেন ক্লান্তস্বরে বললেন, আমি আমার পুরনো খেলা খেলব। পন কুইন ফোর।

কম্পিউটার সিডিসি বলল, নতুন পরিস্থিতিতে নতুন খেলা খেলতে হয় ক্যাপ্টেন।

তার মানে ?

যখন পারিপার্শ্বিকতা বদলায় তখন নিজেকেও বদলাতে হয়। আসুন, আজ আমরা নতুন খেলা খেলি।

সিডিসি, তুমি হেঁয়ালিতে কথা বলছ।

স্যার, আমি একটি যন্ত্রবিশেষ। যন্ত্রের মধ্যে আছে যুক্তি। হেঁয়ালি নয়। হেঁয়ালি আপনাদেরই একচেটিয়া।

ক্যাপ্টেন সুইচ টিপে সিডিসি'র সঙ্গে কানেকশন কেটে দিলেন। তাঁর আর দাবা খেলতে ইচ্ছা হচ্ছে না। মাথা ধরেছে। ঘুমুনো দরকার।

কিন্তু ঘুম এল না। দীর্ঘ সময় কাটল এ-পাশ ও-পাশ করে।

কিছুক্ষণ কেবিনের এ-মাথা থেকে ও-মাথা পর্যন্ত পায়চারি করলেন। কেবিনের তাপমাত্রা নামিয়ে দিলেন দু' ডিগ্রি। তবু ঘুমের কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি সুইচ টিপে আবার ডাকলেন সিডিসিকে, হ্যালো সিডিসি!

হ্যালো ক্যাপ্টেন! খেলাটা তাহলে শুরু করবেন ?

না, আমি তোমাকে ডেকেছি ভিন্ন কারণে ?

বলুন।

তুমি যদি গ্যালাক্সি ওয়ানের ক্যাপ্টেন হতে তাহলে কী করতে ?

আমি ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করতাম।

ক্যাপ্টেনের ভ্রু কুঞ্চিত হলো। খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, প্রাণীগুলিকে নিয়ে কী করতে ?

ওদেরকে এই গ্রহে নামিয়ে দিয়ে ফিরে যেতাম।

কেন ? নামিয়ে দিতে কেন ?

যে-সব প্রাণীকে ওমিক্রন রশ্মি দিয়েও কাবু করা যায় না তারা গ্যালাক্সি ওয়ানের নিরাপত্তার একটি বিরাট হুমকি।

কিন্তু এরা বুদ্ধিমান প্রাণী।

বুদ্ধিমান প্রাণী বলেই এরা বিপজ্জনক।

এদেরকে এই গ্রহে নামিয়ে দিতে চাইলে এরা রাজি হবে ?

না, এরা রাজি হবে না। এই প্রান্তহীন গ্রহে এদের কিছু করার নেই। আমাদের সঙ্গে এসে এরা নতুন জীবন ফিরে পেয়েছে বলা চলে।

প্রাণীগুলিকে তোমার কেমন লাগছে সিডিসি ?

চমৎকার। এদেরকে দাবা খেলা শিখিয়ে আমি একবার বুদ্ধির শক্তি পরীক্ষা করিয়ে দেখতে চাই।

সিডিসি!

বলুন স্যার।

তুমি এ জাহাজের ক্যাপ্টেন হলে কী করতে ?

আমি এদের মেরে ফেলতে চেষ্টা করতাম।

এদের মেরে ফেলবার পেছনে তোমার কী কী যুক্তি আছে ?

আমার তিনটি যুক্তি আছে। কিন্তু আপনাকে একটি শুধু বলব।

বলো।

স্যার, আপনি হয়তো জানেন না যে, আরো দু' জায়গায় মানুষের সঙ্গে কল্পনাতীত বুদ্ধিমান প্রাণীর দেখা হয়েছে। সেখানেও নিওলিথি সভ্যতা ছিল। দু' জায়গাতেই মহাকাশযানের নাবিকরা বুদ্ধিমান প্রাণীগুলিকে জাহাজে তুলে নিয়ে আসছিল এবং দু'টি ক্ষেত্রেই হাইপার ডাইভের আগে আগে মহাকাশযান দু'টি বিনষ্ট হয়েছে। আমাদের সঙ্গে ওদের মিল লক্ষ করেছেন ?

ঐ ক্ষেত্রেও প্রাণীগুলি মাকড়সা জাতীয় ছিল ?

না, তা ছিল না।

নিওলিথি সভ্যতার সঙ্গে প্রাণীগুলির কী সম্পর্ক ?

আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো যথেষ্ট তথ্য আমার জানা নেই।

সিডিসি!

বলুন স্যার।

নিওলিথি সভ্যতা সম্পর্কে আরো জানতে চাই।

আমাদের লাইব্রেরিতে একটি মাইক্রো ফিল্ম করা বই আছে— 'অজানা সভ্যতা', সেটি পড়ে দেখতে পারেন। তাছাড়া যা যা জানতে চান আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন।

ক্যাপ্টেন সুইচ টিপে সিডিসি'র সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করলেন। বেরিয়ে এলেন হলঘরে— লাইব্রেরি থেকে বইটি নিতে। লাইব্রেরি তৃতীয় স্তরে। অনেকখানি হাঁটতে হবে।

তৃতীয় স্তরে ঢুকবার মুখেই তাঁর দেখা হলো লী'র সঙ্গে। তিনি সহজ স্বরে বললেন, হ্যালো!

ক্যাপ্টেন

কিছু বলবেন ?

আপনি মনে হচ্ছে একটি বইয়ের খোঁজে যাচ্ছেন।

ক্যাপ্টেন ইতস্তত করে বললেন, কোত্থেকে জানলেন ?

আপনার মস্তিষ্কের কম্পন থেকে। আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি, আমরা আপনাদের চিন্তার ধারা বেশ খানিকটা বুঝতে পারি।

হ্যাঁ, তা অবশ্যি বলেছেন।

আপনি যে বিষয় সম্পর্কে জানতে চাচ্ছেন আমিও সে বিষয়ে জানতে চাই।

আপনি নিশ্চয়ই মাইক্রোফিল্ম পড়তে জানেন না ? নাকি জানেন ?

না, জানি না। তবে আপনি যখন পড়বেন তখন আমি যদি আশেপাশে থাকি তাহলেই সব বুঝতে পারব।

নিওলিথি সভ্যতা সম্পর্কে আপনার আগ্রহের কারণ কী ?

আমরা কোত্থেকে এসেছি তা জানতে চাই। ক্যাপ্টেন, আমরা এই গ্রহের অধিবাসী নই। আমাদেরকে অন্য কোনো জায়গা থেকে এনে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছে। আমাদের ধারণা নিওলিথি সভ্যতার সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে।

আপনি কি ঘরগুলির ভেতর কখনো গিয়েছেন ?

না, তবে নীম একবার গিয়েছিল।

যাননি কেন ?

আমাদের ওপর নিষেধ ছিল। আমাদের মা নিষেধ করেছিলেন যে, কখনো তার আশেপাশে যেন না যাই।

আপনার মায়ের কথা তো আগে কখনো বলেননি ?

বলবার সুযোগ হয়নি।

ক্যাপ্টেন খানিকক্ষণ চুপ থেকে বললেন, আসুন আমার সঙ্গে। আমি লাইব্রেরিতে বসেই পড়ব। আপনি থাকুন আমার পাশে।

ক্যাপ্টেন, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

এ বইটি ছাড়াও অন্য কোনো বই যদি আপনার পড়তে ইচ্ছা হয় আপনি বলবেন, আমি ব্যবস্থা করব।

অসংখ্য ধন্যবাদ ক্যাপ্টেন। আপনার জন্যে আমি কি কিছু করতে পারি ?

ক্যাপ্টেন খানিকক্ষণ স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, আছে, আমার একটি সমস্যা আছে। আমি যথাসময়ে আপনাকে সমাধান করতে দেব।

আমরা তিনজন মিলে সে সমস্যার সমাধান করব। নিশ্চয়ই আমরা করব।

৯

অয়ুর পায়ের যন্ত্রণা অসম্ভব বেড়ে গেছে। সে কিছুক্ষণের জন্যে জেগেছিল, ব্যথার তীব্রতায় অস্থির হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করল। নীম পরীক্ষা করে দেখল, পা-টি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সেটা তেমন ভয়াবহ নয়, কিন্তু ভয়াবহ হচ্ছে শরীরের অন্য কোষগুলিও নষ্ট হতে শুরু করেছে। তার মায়েরও এরকম হয়েছিল। এমন কিছু কি নেই যা দিয়ে তীব্র ব্যথার উপশম হয় ? নীম অস্থির হয়ে উঠল। কিছু একটা করা প্রয়োজন, কিন্তু কিছু কি সত্যি করা যায় ?

তারা এখানে একা। অসাধারণ চিন্তাশক্তি থাকা সত্ত্বেও তারা কিছুই করতে পারেনি। দীর্ঘ দিবস দীর্ঘ রজনী তারা একটি প্রাণহীন গ্রহে ঘুরে বেড়িয়েছে। শুধু ঘুরে বেড়ানো। উফ্, শক্তি ও ক্ষমতার কী নিদারুণ অপচয়!

এর কি শরীর খুব খারাপ ?

নীম দেখল সুরা। এই লোকটির সঙ্গে অয়ুর ভালো চেনাজানা হয়েছে। নীম বলল, ও মারা যাচ্ছে।

সে-কী!

আমাদের মা নিজেও এভাবেই মারা গিয়েছিলেন।

নিশ্চয়ই এর চিকিৎসা আছে।

থাকলেও আমাদের জানা নেই।

আমি আমাদের মেডিক্যাল টিমকে বলছি এসে দেখতে।

আমার মনে হয় না এতে কোনো লাভ হবে। আমাদের শরীরের সঙ্গে তোমাদের কোনো মিল নেই।

না থাকুক, আমি ওদের আনছি।

নিওলিথি সভ্যতার ওপর লেখা বইটি আয়তনে ছোট। বৈজ্ঞানিক তথ্য বলতে বিশেষ কিছু নেই। কোনটি কবে আবিষ্কার হয়েছে, কোনটির কী রঙ, যে গ্রহগুলিতে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে তাদের আবহাওয়া, মাটির গঠন, প্রকৃতি— এইসব বিতং করে লেখা। কোনোটিতেই লেখা নেই— ঘরগুলির ভেতরটা কেমন ? যে আলো ঘর থেকে আসছে তার উৎস কী ? তরঙ্গদৈর্ঘ্যই বা কী ? বইটি লেখা হয়েছে সুখপাঠ্য উপন্যাসের কায়দায়, যেখানে যুক্তির চেয়েও আবেগের প্রাধান্য বেশি। তবে দুটি জিনিস জানা গেছে— ১. নিওলিথি সভ্যতা যে সব গ্রহে পাওয়া গেছে সে সব গ্রহের প্রতিটিতে দুটি করে সূর্য আছে। ২. যে সৌরমণ্ডলে নিওলিথি সভ্যতা আছে সেই সৌরমণ্ডলের কাছাকাছি আছে একটি ব্ল্যাকহোল।

বইপড়া শেষ হওয়ামাত্র ক্যাপ্টেন জিজ্ঞেস করলেন, কেমন লাগল বইটি ?

লী বলল, বইটি ভালো। আমি এখন জানতে চাই ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে। ব্ল্যাকহোল জিনিসটি কী ?

ব্ল্যাকহোল হচ্ছে একটি অন্ধকার নক্ষত্র যার মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সীমাহীন। যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অতিক্রম করে আলো পর্যন্ত বেরিয়ে আসতে পারে না। আটকা পড়ে থাকে।

লী খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, যদি তাই হয় তাহলে যেখানে ব্ল্যাকহোল থাকবে সেখানে অনেক অদ্ভুত কাণ্ড হবে।

ক্যাপ্টেন কৌতূহলী হয়ে বললেন, কী ধরনের অদ্ভুত কাণ্ড ?

ব্ল্যাকহোল হবে একটি টানেল। যার দু' মাথায় সময় হবে দু' রকম, তাই নয় ?

ক্যাপ্টেন অবাক হয়ে তাকালেন। এত অল্প তথ্যের ওপর নির্ভর করে সঠিক সিদ্ধান্তে আসা অসম্ভব ব্যাপার। তার একটু ঈর্ষা বোধ হলো।

মেডিক্যাল বোর্ডের প্রধান জীববিদ্যা বিভাগের দেয়া কার্ডটি বেশ কয়েকবার পড়লেন—

বহুপদ প্রাণী

সভ্যতা শ্রেণী	অজানা।
সমাজ শ্রেণী	অজানা।
বুদ্ধিমত্তা	হলডেন টেস্ট না-বাচক।
অবস্থান	নক্ষত্র FOv বর্ণালি লাল ও নীল আর = ৯.৭১৭ থিটা = ০০.০৭´১´´ ফাই = ২১০.২০´৩৭´´ গ্রহ = ছয় বয়স = ১১৪×১০^{১৭} সেকেন্ড
বায়োলজি	Si. S. Se. Cl. Ge. He. Cu, নিউট্রন স্ফটিক আচ্ছাদন ধাতু ও সিলিকন সংকর চৌম্বকীয় আধান।

এ প্রাণীটির চিকিৎসা করার পথ কোথায়? ব্যথা কমাবার জন্য স্নায়ুকে অবশ করে দেয়া যেতে পারে। কিন্তু স্নায়ুর গঠনপ্রকৃতি জানা নেই। জানতে হলে যে-সব পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হবে তার ব্যবস্থাও গ্যালাক্সি ওয়ানে নেই।

স্রুরা গম্ভীর হয়ে বলল, কিছুই করবার নেই?

না, কিছুই করবার নেই।

পা কেটে বাদ দেওয়া যায় না?

না, সম্ভব নয়। এদের শরীর সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না।

খুবই দুঃখের ব্যাপার ডাক্তার।

হ্যাঁ, দুঃখের।

ক্যাপ্টেন ডেকে পাঠিয়েছেন স্রুরাকে।

তাঁর ঘরের সামনে একটি লাল তারা। প্রথম শ্রেণীর জরুরি অবস্থা ছাড়া তাঁকে বিরক্ত করা যাবে না। নিশ্চয়ই কোনো জটিল বিষয় নিয়ে তিনি ব্যস্ত। দরজায় নক করতেই ক্যাপ্টেন বললেন, ভেতরে আস স্রুরা।

স্রুরা অবাক হয়ে দেখল ক্যাপ্টেনের চোখেমুখে ব্যস্ততার কোনো চিহ্ন নেই। শান্ত মুখভঙ্গি।

স্যার, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন ?

হ্যাঁ, এসো।

কী ব্যাপার স্যার ?

তোমার বন্ধুটি শুনলাম অসুস্থ।

জি স্যার।

আমাদের মেডিক্যাল বোর্ড কিছু করতে পারছে না ?

জি-না স্যার।

তোমার সঙ্গে এই প্রাণীগুলির বেশ ভালো সম্পর্ক আছে, ঠিক না ?

অয়ুর সঙ্গে আমার প্রায়ই কথাবার্তা হয়।

তোমাকে ওরা বন্ধু হিসেবে নিয়েছে মনে হয়।

স্যার, তা তো বলতে পারব না।

ক্যাপ্টেন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, প্রাণীগুলি যেখানে ইচ্ছা সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ব্যাপারটা আমার ভালো লাগছে না।

স্যার, আমি বুঝতে পারছি।

স্রুরা!

জি স্যার!

ওরা যদি নিচে ফিরে যেতে চায় সে ব্যবস্থাও করা যেতে পারে। ড. জুরাইনকে খুঁজবার জন্যে আমাদের দ্বিতীয় একটি দল নামবে। ওদের সঙ্গে যেতে পারে।

ওরা নিচে যেতে চায় না।

কী করে বুঝলে ?

আমি ওদের জিজ্ঞেস করেছিলাম স্যার। ওরা গ্রহে ফিরে যেতে চায় না। সেখানে ওদের কিছুই করার নেই, ওরা আমাদের সঙ্গে থাকতে চায়। আমাদের সঙ্গে থেকে ওরা নিজেদের সম্পর্কে জানতে চায়। ওদের ধারণা, ওরা অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছে।

আমার নিজেরও সেরকম ধারণা।

আমি কি স্যার যেতে পারি ?

হ্যাঁ যাও।

স্রুরা চলে যেতেই কম্পিউটার সিডিসি বলল, আপনি যা করছেন তা কিন্তু নিজ দায়িত্বে করছেন।

একটি প্রথম শ্রেণীর মহাকাশযানের পরিচালককে অনেক কিছুই নিজ দায়িত্বে করতে হয়।

স্যার, আপনি কি সত্যি সত্যি প্রাণীগুলিকে মেরে ফেলতে চান ?

হ্যাঁ।

এবং আপনার ধারণা, আপনার এ পরিকল্পনার কথা প্রাণীগুলি টের পাবে না ?

না, পাবে না। মনের কথা বুঝতে হলে প্রাণীগুলিকে অনেক কাছাকাছি রাখতে হয়। আমি যখন বই পড়ছিলাম, তখন লী নামের প্রাণীটি আমার গা ঘেঁসে ছিল।

আপনি যা করতে যাচ্ছেন তা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। এদের সাহায্যে আমরা নিওলিথি সভ্যতার রহস্য বের করতে পারতাম।

তুমি একটি সম্ভাবনার কথা বলছ, আমি ভাবছি একটি মহাকাশযানের নিরাপত্তার কথা। এর আগেও দুটি প্রথম শ্রেণীর মহাকাশযান নষ্ট হয়েছে। তুমি জানো কী জন্যে হয়েছে, ঠিক না ?

সিডিসি চুপ করে রইল। কিম দুয়েন ক্লান্তস্বরে বললেন, ওদের ক্ষমতা অসম্ভব বেশি। তুমি কি জানো, ওরা সিলঝিনের ন' ফুট পুরু একটি খণ্ড ফুটো করে ফেলেছে ?

জানি, ধাতুবিদ্যা বিভাগ থেকে ওদের সিলঝিন খণ্ডটি দেয়া হয়েছিল।

হ্যাঁ। আর তুমি নিশ্চয়ই জানো— আমাদের গ্যালাক্সি ওয়ানের বাইরের আবরণটি দু' ফুট পুরু সিলঝিনের তৈরি।

ওর বাইরে অবশ্যি শক্তিবলয় আছে।

তা থাকুক। ওরা ইলেকট্রিসিটি নিয়েও নাড়াচাড়া করেছে, করেনি ?

করেছে।

তাহলে আমি যদি নিরাপত্তার অভাব বোধ করি, তুমি আমাকে দোষ দেবে ?

সিডিসি উত্তর দিল না। ক্যাপ্টেন বললেন, বলো আমাকে তুমি দোষ দেবে ?

তা হয় না সিডিসি। এখানে নিওলিথি সভ্যতা আছে। পরীক্ষার জন্যে আমাদের নিচে নামতে হবে। খবর পাওয়া মাত্র আরো সব মহাকাশযান আসবে। এ অবস্থায় আমি ওদের নিচে নামিয়ে দিতে পারি না।

১০

স্নুরা অবজারভেশন টাওয়ারে গিয়েছিল মন ভালো করবার জন্যে। কোনো একটি বিচিত্র কারণে তার মন ভালো নেই। কেন জানি অস্বস্তি লাগছে। এরকম যখন হয়, তখন অবজারভেশন টাওয়ারে গিয়ে বসলে ভালো লাগে। বাইরের অদ্ভুত দৃশ্য মনকে অভিভূত করে দেয়।

এ গ্রহের চাঁদ তিনটি। তিনটি চাঁদের জ্যোৎস্না এমন অদ্ভুত লাগে দেখতে। কেমন একটি গোলাপি আলো প্রাণহীন গ্রহটিকে রাঙিয়ে তোলে।

স্নুরা একটি চেয়ার টেনে অবজারভেশন টাওয়ারের স্বচ্ছ কাঁচের পর্দার কাছে বসল।

স্রুরা!

স্রুরা চমকে দেখে নীম। সে কখন যে চুপি চুপি এসেছে, বুঝতেই পারা যায়নি। নীম বলল, বুঝতে পারছি কোনো একটি কারণে তোমার মন ভালো নেই।

তা ঠিক।

কোনো একটি সমস্যা নিয়ে ভাবতে বসে যাও। দেখবে ভালো লাগছে।

নীম, মন খারাপ হলে আমরা সমস্যা নিয়ে ভাবতে পারি না।

তোমাদের যতই দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি। মন খারাপ হলে কী কর তোমরা?

আমি কিছুই করি না। অনেকে গান-টান শোনে। কবিতা পড়ে।

কবিতা কী?

ছন্দ মিলিয়ে লেখা একধরনের ভাবপূর্ণ বিষয়।

উদাহরণ দিতে পার?

স্রুরা খানিক ভেবে বলল—

‘হে অনন্ত নক্ষত্রবীথি
বিদায়।
আজ রাতে তোমাকে বিদায়।’

নীম অবাক হয়ে বলল, এ তো নিতান্তই যুক্তিহীন কথা। রাতে বা দিনে কখনোই নক্ষত্রবীথিকে বিদায় দেয়া যাবে না। তারা থাকবেই।

স্রুরা কিছু বলল না। নীম বলল, তোমরা যুক্তি এবং অযুক্তি এ দুয়ের অদ্ভুত মিশ্রণ।

আমাদেরকে তোমার ভালো লাগছে না নীম?

নীম খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, লাগছে। তোমাদের ভালো লাগছে। তোমরা অনেক কিছুই জানো, আবার অনেক কিছুই জানো না। তোমাদের পাশে পাশে থেকে আমরা অনেক কিছুই শিখব। হয়তোবা নিওলিথি রহস্যও ভেদ করে ফেলব।

স্রুরা বলল, তুমি কি কখনো ঐ ঘরগুলির ভেতর গিয়েছিলে?

নীম সে-কথার জবাব না দিয়ে বলল, আমি তোমাদের কবিতা শিখতে চাই। তুমি কি দয়া করে নক্ষত্রবীথির কবিতাটি আবার বলবে?

১১

মহাকাশযানের প্রধান তাদের আলাদা আলাদা সেলে থাকতে বলছেন কেন— লী ঠিক বুঝতে পারল না। এখনো কি মানুষরা তাদের ভয় করছে? তাদের গা থেকে মৃদু বিটা রেডিয়েশন হয় এ কথা ঠিক, কিন্তু মেডিক্যাল বোর্ড তো স্পষ্টই বলছে এতে মানুষের ক্ষতির কোনো সম্ভাবনা নেই। ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করে সঠিক কারণ

জেনে নিলে হতো, কিন্তু ক্যাপ্টেনকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে দারুণ ব্যস্ত। তাদের একটি অনুসন্ধানী দল নিখোঁজ হয়েছে। সে দলে একজন প্রতিভাবান জীববিজ্ঞানী আছেন। যাকে বিজ্ঞান কাউন্সিল সর্বোচ্চ পদক দিয়েছে ছ'বছর আগে।

অবশ্য সেলে গিয়ে বসে থাকতে লী'র কোনো আপত্তি নেই। ক্যাপ্টেন তাকে মাইক্রোফিল্ম লাইব্রেরি ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন এবং একটি রোবট দিয়েছেন যে বইগুলি তাকে পড়ে শোনাবে। লোকটিকে শুরুতে যতটা খারাপ মনে হয়েছিল, এখন আর ততটা খারাপ মনে হচ্ছে না। সবচে' বড় কথা, তিনি তাকে একটি সমস্যাও দিয়েছেন— 'নিওলিথি সভ্যতা গড়ে উঠেছে দ্বৈত সূর্যের গ্রহে এবং কাছাকাছি আছে একটি ব্ল্যাকহোল। এদের সঙ্গে নিওলিথি সভ্যতার কি কোনো সম্পর্ক আছে, না ব্যাপারটি কাকতালীয় ?'

ভালো সমস্যা। তবে সমাধানের জন্যে অনেক কিছু জানতে হবে। দ্বৈত সূর্য কখন হয়, কেন হয় ? ব্ল্যাকহোল ব্যাপারটি কী ? ভাসা ভাসা জ্ঞান চলবে না। নীম এবং অয়ুর সাহায্য পেলে অনেক সহজ হতো। কিন্তু তা সম্ভব নয়। অয়ু অসুস্থ আর নীম নতুন একটি জিনিস নিয়ে মেতেছে। কম্পিউটার সিডিসি তাকে দাবা খেলা শিখিয়েছে এবং পরপর ছ'বার তাকে হারিয়ে দিয়েছে। তার ধারণা কোনো একটি জিনিস ইচ্ছা করে তাকে শেখানো হয়নি যার জন্যে সে হেরে যাচ্ছে। সিডিসি তাকে বলেছে— নিয়মকানুন সবই তোমাকে শিখিয়ে দিয়েছি, আর কিছুই শেখাবার নেই।

তাহলে জিততে পারছি না কেন ?

পারছ না, কারণ আমি সম্ভাব্য সমস্ত বিকল্প চাল চিন্তা করি। তুমি তা কর না।

এটিও নীম মানতে রাজি নয়। সিডিসি তাকে অনেকবার বলেছে, আমার সঙ্গে তুমি হারলে কিছুই যায় আসে না, আমার সঙ্গে কারোর জেতার কথা নয়। প্রতিবারই তুমি অন্যবারের চেয়ে ভালো খেলছ, কিন্তু তাতে লাভ নেই কিছুই।

নীম মাথা দুলিয়ে বলেছে, তোমাকে হারতেই হবে!

প্রাণী তিনটিকে সেলে রাখার ব্যাপারে ক্যাপ্টেনের মোটেই বেগ পেতে হলো না। নীম খানিকটা আপত্তি করছিল। লী বলল, ছোট জায়গায় আবদ্ধ হয়ে থাকাই আমাদের জন্যে ভালো। চুপচাপ এক জায়গায় থাকতে হলে বাধ্য হয়েই ভাবতে হবে। তোমার জন্যে সেটা খুব প্রয়োজন। তুমি ইদানীং সমস্যা নিয়ে ভাবতে চাও না।

লী বুঝতে পারে নীমের মধ্যে বড় রকমের পরিবর্তন হয়েছে। সেদিন দেখা গেল, মানুষদের লেখা কবিতার বই পড়ছে। নিছক আনন্দের জন্যেই নাকি পড়ছে। আশ্চর্য, নিছক আনন্দের জন্যেই কেউ কিছু করে ? সমস্যা নিয়ে ভাবার মধ্যেই তো আনন্দ। সিডিসি যখন লী'কে দাবা খেলা শেখাতে চাইল তখনো লী অবাক হয়ে বলেছিল, ব্যাপারটিতে সমস্যা আছে, কিন্তু তাতে লাভ কী ?

সিডিসি বলেছে, আনন্দটাই লাভ। জেতার আনন্দ।

কিন্তু কী শিখব আমরা ? জ্ঞানের বিকাশ হবে কীভাবে ?

তা বলা মুশকিল।

জবাব শুনে লী অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিল। কিন্তু নীম লাফিয়ে উঠেছে।

সিডিসি, আমাকে শেখাও। আমি শিখব, আমি শিখব।

লী'র মনে হলো কিছু একটা পরিবর্তন হয়েছে নীমের মধ্যে। কখন হয়েছে লী ভেবে বের করতে চেষ্টা করে। কখন হয়েছে পরিবর্তনটি ? ঘরগুলির ভেতর নীম একা একা গিয়েছিল। পরিবর্তন কি তখন হয়েছে, না তারও আগে ? কী দেখেছে ঘরের মধ্যে সে ?

লী কখনো জিজ্ঞেস করেনি। সবসময় ভেবেছে একদিন নীম বলবে নিজ থেকে। কিন্তু নীম বলেনি। আজ প্রথমবারের মতো লী জিজ্ঞেস করল, ঘরের ভেতর তুমি কী দেখেছিলে নীম ?

নীম চোখ মিটমিট করে বলল, আজ হঠাৎ জিজ্ঞেস করছ কেন ?

জানতে ইচ্ছে হচ্ছে।

এখন আমি কিছু বলছি না। যখন সময় আসবে তখন জানবে।

সময় কখন আসবে ?

খুব শিগগিরই আসবে। লী, ঘরের রহস্য আমি বের করে ফেলব।

তুমি কি এইসব নিয়ে ভাবো ?

হ্যাঁ ভাবি, সবসময়ই ভাবি।

নতুন যে-সব তথ্য পাওয়া গেছে সেগুলি কি তুমি জানো ?

দ্বৈত সূর্য এবং ব্ল্যাকহোল ? আমি জানি।

লী চুপ করে গেল। নীম মৃদুস্বরে বলল, আমি রহস্যের খুব কাছাকাছি আছি।

কী রকম কাছাকাছি ?

যেমন ধরো, এখন আমি নিশ্চিত জানি, আমরা ভিন্ন গ্রহের জীব... আমাদের এখানে এনে রাখা হয়েছে। এমন একটি গ্রহে এনে রাখা হয়েছে যেখানে বসে বসে চিন্তা করা ছাড়া আর আমাদের কিছুই করার নেই।

তা ঠিক। আমিও তাই মনে করি।

নীম হঠাৎ গম্ভীর স্বরে বলল, লী!

বলো!

তোমাকে আরেকটি ব্যাপার বলি— মন দিয়ে শোন। যদি কখনো আমাদের কাছে মনে হয়ে নিওলিথি সভ্যতা আমাদের পূর্বপুরুষদের তৈরি, তাহলে অবাক হয়ো না।

কী বলছ পাগলের মতো ?

ঠাট্টা করছিলাম।

ঠাট্টা আবার কী ?

মানুষদের কাছে শিখেছি। কোনো অবাস্তব ব্যাপার বিশ্বাসযোগ্যভাবে বলার নাম হচ্ছে ঠাট্টা। নিছক আনন্দের জন্যে করা হয়।

নীম মহানন্দে তার লুখ নাচাতে লাগল।

১২

ক্যাপ্টেনের ঘরের সামনে একটি লাল তারা এবং দুটি সবুজ তারা জ্বলজ্বল করছে। যার মানে— অবস্থা যত জরুরি হোক তাঁকে বিরক্ত করা চলবে না। তবু স্রুরা তাঁর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে সুইচ টিপল।

কে ?

আমি স্রুরা।

লাল তারা এবং সবুজ তারা দু'টি কি তোমার চোখে পড়ছে না ?

পড়ছে। কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে।

গ্যালাক্সি ওয়ানের নিয়ম ভঙ্গ করছ তুমি। ধারা ৩০১ উপধারা ৬ অনুযায়ী কী শাস্তি তুমি পাবে তা জানো ?

জানি।

তবু তুমি যাবে না ?

না। আপনি বলুন ঐ প্রাণী তিনটিকে আলাদা আলাদা সেলে কেন আটকিয়েছেন ?

আমি আটকাইনি, ওরা আপনি গিয়েছে।

আপনার উদ্দেশ্য কী ?

আমার একটিমাত্র উদ্দেশ্য— মহাকাশযানটির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা।

কিম দুয়েন!

বলো!

আপনি আমাকে ভেতরে আসতে দেবেন না ?

না। তোমার স্নায়ু উত্তেজিত, তোমাকে ভেতরে আসতে দেয়া ঠিক হবে না। এবং আমার মনে হচ্ছে তুমি তোমার এটমিক ব্লাস্টারটি সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ। শোন স্রুরা, তুমি একটি প্রথম শ্রেণীর অপরাধ করেছ। তোমার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। তুমি চলে যাও এখান থেকে। আমি সমস্ত ব্যাপারটা ভুলে যাব।

স্রুরা ভাঙা গলায় বলল, স্যার, আপনি আমাকে দিয়ে এই কাজটি কেন করালেন ?

ক্যাপ্টেন শান্তস্বরে বললেন, আমি ওদেরকে সেলে যাওয়ার কথা বলতে পারতাম না। এরা মনের কথা বুঝতে পারে। তোমাকে পাঠানো হয়েছে সেজন্যেই। তোমার মধ্যে ওদের জন্য ভালোবাসা ছাড়া আর কিছুই নেই।

খেলা খুব জমে উঠেছে। নীম তার হাতি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সিডিসি বলল, সাবধান হয়ে খেলো, তুমি ফাঁদে পা দিচ্ছ নীম।

তোমার ফাঁদ আমি কেয়ার করি না।

নীম তার হাতির ঠিক পেছনের ঘরে নৌকা টেনে আনল। সিডিসি বলল, এতে ভালো হবে না। আমি আমার ঘোড়া নিয়ে আসছি। নৌকা নিয়ে আক্রমণের সুযোগ পাবে না তুমি।

নীম চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইল। সত্যি সত্যি সে আটকা পড়ে গেছে। এখন একমাত্র পথ— কালো হাতিটি নিচে নামিয়ে নেয়া। তাতে কী লাভ হবে? নীম কালো হাতিটি সরাল।

আর ঠিক তখনই সুতীব্র ওমিক্রন রশ্মি ঝলসে উঠল। থার্মাল এক্সিলেটর কাঁপতে শুরু করল। নীম স্তম্ভিত হয়ে বলল, কী হচ্ছে এসব?

সিডিসি ধাতব স্বরে বলল, আমি চাল দিয়েছি। তুমি তোমার গজ সরাও নীম।

নীম অবাক হয়ে বলল, মানুষরা কি আমাদের মেরে ফেলতে চাচ্ছে?

সিডিসি বলল, তুমি দেরি করছ নীম।

আমার কথার জবাব দাও। তোমরা কি আমাদের মেরে ফেলতে চাচ্ছ?

হ্যাঁ।

নীম ব্যাকুল হয়ে ডাকল, লী! অয়ু! কোথায় তোমরা?

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। আহ্, কী অসহনীয় উত্তাপ!

সিডিসি বলল, দাও, কী চাল দেবে?

নীম তার একটি ঘোড়া এগিয়ে আনল। সিডিসি উৎফুল্ল স্বরে বলল, তুমি জিতে যাচ্ছ। বাহ্ চমৎকার! তুমি এই খেলাটিতে জিতে যাচ্ছ।

নীম ক্লান্তস্বরে বলল, তুমি ইচ্ছা করে ভুল চাল দিয়ে আমাকে জিতিয়ে দিচ্ছ। তার প্রয়োজন নেই। আমি এভাবে জিততে চাই না।

বেশ, তাহলে আমি চালটি ফিরিয়ে নিই।

সিডিসি, আমি আর পারছি না। আমাকে এখন কোনো সমস্যা নিয়ে ভাবতে হবে। ব্যথা ভুলে থাকবার অন্য পথ কিছু নেই।

নীমের শরীরের সিলিকন কোষ গলে যেতে শুরু করেছে। একটি অত্যন্ত জটিল সমস্যা নিয়ে ভাবতে শুরু করা দরকার। কিন্তু কোনো সমস্যা মাথায় আসছে না।

শুধু সুখ-কল্পনা আসছে। নীম যেন দেখতে পাচ্ছে বহুকাল আগের তার হারানো মা ফিরে এসেছেন। কোমল কণ্ঠে বলছেন, এসো আমার বাবারা, এসো আমার সোনারা। কোথায় আমার দুঃখী লী, কোথায় আমার মানিক অয়ু ? কোথায় আমার পাগলা নীম... ?

নীম ফিসফিস করে বলল, মানুষের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী এত হৃদয়হীন হয় কী করে ? কম্পিউটার সিডিসি!

বলো শুনছি।

আমি তোমাদের ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলতে চাই। আমি নিওলিথি সভ্যতার রহস্য ভেদ করেছি। মরবার আগে মানুষদের তা জানিয়ে যেতে চাই।

ওমিক্রন রশ্মি তীব্রতর হলো। নিওলিথি রহস্যের কথা আর নীমের বলা হলো না।

কম্পিউটার সিডিসি গ্যালাক্সি ওয়ানের প্রতিটি কক্ষে নিওলিথি সভ্যতার অপূর্ব বিষাদমাখা সুর বাজাতে শুরু করেছে। ক্যাপ্টেন একাকী তাঁর ঘরে বসে ছিলেন। সুরের জন্যেই হোক বা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, তাঁর চোখ দিয়ে টপ টপ করে জল পড়ছিল।

> *মাকড়সা জাতীয় এই তিনটি প্রাণী ছিল অসামান্য বুদ্ধিমত্তার অধিকারী। ছায়াপথ এবং এন্ড্রোমিডা নক্ষত্রপুঞ্জে এদের চেয়ে বুদ্ধিমান প্রাণী নেই বলে ধারণা করা হয়। এ জাতীয় প্রাণীর জন্ম এবং বিবর্তন সম্পর্কে কোনো তথ্য জানা নেই।*
>
> *গ্যালাকটিভ আর্কাইভস*
>
> *মাইক্রোফিল্ম কোড ২০৩৫-ক; ৭০ ল/২৩০*

উপাখ্যানমালা : মিসির আলি

দেবী

মাঝরাতের দিকে রানুর ঘুম ভেঙে গেল।

তার মনে হলো ছাদে কে যেন হাঁটছে। সাধারণ মানুষের হাঁটা নয়, পা টেনে-টেনে হাঁটা। সে ভয়ার্ত গলায় ডাকল, এই, এই। আনিসের ঘুম ভাঙল না। বাইরে টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। অল্প-অল্প বাতাস। বাতাসে জামগাছের পাতায় অদ্ভুত এক রকমের শব্দ উঠছে। রানু আবার ডাকল, এই, একটু ওঠ না। এই।

কী হয়েছে ?

কে যেন ছাদে হাঁটছে।

কী যে বলো! কে আবার ছাদে হাঁটবে ? ঘুমাও তো!

প্লিজ, একটু উঠে বসো। আমার বড় ভয় লাগছে।

আনিস উঠে বসল। প্রবল বর্ষণ শুরু হলো এই সময়। ঝমঝম করে বৃষ্টি। জানালার পর্দা বাতাসে পতপত করে উড়তে লাগল। রানু হঠাৎ দেখল, জানালার শিক ধরে খালি গায়ে একটি রোগামতো মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। মানুষটির দুটি হাতই অসম্ভব লম্বা। রানু ফিসফিস করে বলল, ওখানে কে ?

কোথায় কে ?

ঐ যে জানালায়।

আহ্, কী যে ঝামেলা করো! নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে।

একটু বাতিটা জ্বালাও না!

রানু, তুমি ঘুমোও তো।

আনিস শোবার উপক্রম করতেই ছাদে বেশ কয়েকবার থপথপ শব্দ হলো। যেন কেউ একজন ছাদে লাফাচ্ছে।

রানু চমকে উঠে বলল, কিসের শব্দ হচ্ছে ?

বানর। এ জায়গায় বানর আছে। কালই তো দেখলে ছাদে লাফালাফি করছিল।

আমার বড় ভয় করছে। একটু উঠে গিয়ে বাতি জ্বালাও না। পায়ে পড়ি তোমার।

আনিস বাতি জ্বালাল। ঘড়িতে বাজে দেড়টা। ছাদে আর কোনো শব্দ শোনা যাচ্ছে না। তবু রানুর ভয় কমল না। সে কেঁপে-কেঁপে উঠতে লাগল। আনিস বিরক্ত স্বরে বলল, এ-রকম করছ কেন ?

কেন যেন অন্যরকম লাগছে আমার। একটা খুব খারাপ স্বপ্ন দেখেছি।

কী স্বপ্ন ?

দেখলাম আমি যেন...

কথার মাঝখানে হঠাৎ রানু থেমে গেল। কে যেন হাসছে। ভারি গলায় হাসছে। রানু কাঁপা স্বরে বলল, হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছ? কে যেন হাসছে।

কে আবার হাসবে! বানরের শব্দ। কিংবা কেউ হয়তো জেগে উঠেছে দোতলায়।

আনিস লক্ষ করল, রানু খুব ঘামছে। চোখমুখ রক্তশূন্য। বালিশের নিচ থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল। দেশলাই জ্বালাতে-জ্বালাতে বলল, কী স্বপ্ন দেখছিলে?

দিনেরবেলা বলব।

কী যে সব কুসংস্কার তোমাদের! এখনো ভয় লাগছে?

হ্যাঁ।

ভয়টা কিসের? চোর-ডাকাতের, না ভূতের?

বুঝতে পারছি না।

ঠিক আছে, বাতি জ্বালানোই থাক। বাতি জ্বালিয়েই ঘুমাব আজকে। এখন বলো দেখি, কী স্বপ্ন দেখলে?

দিনেরবেলা বলব।

আহ্, বলো না! বললেই ভয় কেটে যাবে।

রানু আনিসের বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরল। থেমে-থেমে বলল, দেখলাম, একটা ঘরে আমি শুয়ে আছি। একটা বেঁটে লোক এসে ঢুকল। তারপর দেখলাম, সে আমার শাড়ি টেনে খুলে ফেলার চেষ্টা করছে।

আনিস শব্দ করে হাসল।

রানু বলল, হাসছ কেন?

হাসব না? এটা কি একটা ভয় পাওয়ার স্বপ্ন?

তুমি তো সবটা শোননি।

সবটা শুনতে হবে না। পরে কী হবে তা আমার জানা। তুমি যা দেখেছ তা হচ্ছে একটা সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসি। যুবক-যুবতীরা এরকম স্বপ্ন প্রায়ই দেখে।

আমি দেখি না।

তুমিও দেখ। মনে থাকে না তোমার।

আমি স্বপ্ন খুব কম দেখি। যা দেখি তা সব সময় সত্যি হয়। তোমাকে তো বলেছি অনেকবার।

আনিস চুপ করে রইল। রানু এই কথাটি প্রায়ই বলে। বিয়ের রাতে প্রথমবার বলেছিল। আনিস সেবারও হেসেছে। রানু অবাক হয়ে বলেছে, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করলেন না, না?

নাহ্।

আমি আপনার গা ছুঁয়ে বলছি, বিশ্বাস করুন আমার কথা।

রানু এমনভাবে বলল, যেন আনিসের বিশ্বাসের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করছে। আনিস শেষ পর্যন্ত হাসিমুখে বলল, ঠিক আছে বিশ্বাস করলাম, এখন দয়া করে আপনি-আপনি করবে না। রানু ফিসফিস করে বলল, আপনার সঙ্গে যে আমার বিয়ে হবে সেটাও আমি জানতাম।

এটাও স্বপ্নে দেখেছিলে ?

হুঁ। দেখলাম, একটি লোক খালি গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পেটের কাছে একটা মস্ত কাটা দাগ। লোকটিকে দেখেই মনে হলো, এর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আমি তাকে বললাম, কেটেছে কীভাবে ? আপনি বললেন, সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে ব্যথা পেয়েছিলাম।

আনিস সে রাতে দীর্ঘক্ষণ কোনো কথা বলতে পারেনি। তার পেটে একটা কাটা দাগ সত্যি-সত্যি আছে, এই মেয়েটির সেটা জানার কথা নয়। তবে সাইকেল থেকে পড়ে গিয়ে কাটেনি। জামগাছ থেকে পিছলে পড়ে কেটেছে। ব্যাপারটা কাকতালীয়, বলাই বাহুল্য। মাঝে-মাঝে এমন দু-একটা জিনিস খুব মিলে যায়। তবুও কোথায় যেন একটা ক্ষীণ অস্বস্তি থাকে।

বাইরে বৃষ্টি খুব বাড়ছে। ঝড়টড় হবে বোধহয়। শোঁ-শোঁ আওয়াজ হচ্ছে জানালায়। একটি কাচ ভাঙা। প্রচুর পানি আসছে ভাঙা জানালা দিয়ে, শীত-শীত করছে।

রানু, চল ঘুমিয়ে পড়ি।

সিগারেট শেষ হয়েছে ?

হ্যাঁ।

বিছানায় ওঠামাত্র প্রবল শব্দে বিদ্যুৎ চমকাল। বাতি চলে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। শুধু এ-অঞ্চল নয়, সমস্ত ঢাকাই বোধকরি অন্ধকার হয়ে গেল। আনিস বলল, ভয় লাগছে রানু ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, হাসির গল্পটল্প করো। এতে ভয় কমে যায়। বলো একটা গল্প।

তুমি বলো।

আনিস দীর্ঘ সময় নিয়ে একজন পাদ্রি, তিনটি ইহুদি ও তিনটি মেয়ের গল্প বলল। গল্পের এক পর্যায়ে শ্রোতাকে জিজ্ঞেস করতে হয়— পাদ্রি তখন কী বলল ?

এর উত্তরটি হচ্ছে পাঞ্চ লাইন। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করল না রানু। সে কি শুনছে না ? আনিস ডাকল, এই রানু, এই! রানু কথা বলল না। বাতাসের ঝাপ্টায় সশব্দে জানালার একটি পাল্লা খুলে গেল। আনিস বন্ধ করবার জন্যে উঠে দাঁড়াতেই রানু তাকে জড়িয়ে ধরে কাঁপা গলায় বলল, তুমি যেও না। খবরদার, যেও না!

কী আশ্চর্য, কেন ?

একটা-কিছু জানালার ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে।

কী যে বলো!

প্লিজ, প্লিজ।

রানু কেঁদে ফেলল। ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, তুমি গন্ধ পাচ্ছ না ?

কিসের গন্ধ ?

কর্পূরের গন্ধের মতো গন্ধ।

এটা কি মনের ভুল ? সূক্ষ্ম একটা গন্ধ যেন পাওয়া যাচ্ছে ঘরে। ঝনঝন করে আরেকটা কাচ ভাঙল। রানু বলল, ঐ জিনিসটা হাসছে। শুনতে পাচ্ছ না ? বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আনিস কিছু শুনতে পেল না।

তুমি বসো তো। আমি হারিকেন জ্বালাচ্ছি।

না, তুমি আমাকে ধরে বসে থাক।

আনিস অস্বস্তির সঙ্গে বলল, তুমি ঐ জানালাটার দিকে আর তাকিও না তো!

আনিস লক্ষ করল, রানু থরথর করে কাঁপছে, ওর গায়ের উত্তাপও বাড়ছে। রানুকে সাহস দেবার জন্যে সে বলল, কোনো দোয়া-টোয়া পড়লে লাভ হবে ? আয়াতুল কুরসি জানি আমি। আয়াতুল কুরসি পড়ব ?

রানু জবাব দিল না। তার চোখ বড়-বড় হয়ে উঠেছে। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে নাকি ? শ্বাস ফেলছে টেনে-টেনে।

এই রানু, এই।

কোনোই সাড়া নেই। আনিস হারিকেন জ্বালাল। রান্নাঘর থেকে খুটখুট শব্দ আসছে। ইঁদুর, এতে সন্দেহ নেই। তবু কেন জানি ভালো লাগছে না। আনিস বারান্দায় এসে ডাকল, রহমান সাহেব, ও রহমান সাহেব।

রহমান সাহেব বোধহয় জেগেই ছিলেন। সঙ্গে-সঙ্গে বেরোলেন।

কী ব্যাপার ?

আমার স্ত্রী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

কী হয়েছে ?

বুঝতে পারছি না

হাসপাতালে নিতে হবে নাকি ?

বুঝতে পারছি না।

আপনি যান, আমি আসছি। এক্ষুনি আসছি।

আনিস ঘরে ফিরে গেল। মনের ভুল, নিঃসন্দেহে মনের ভুল। আনিসের মনে হলো, সে ঘরের ভেতর গিয়ে দাঁড়ানোমাত্র কেউ-একজন যেন দরজার আড়ালে সরে পড়ল। রোগা, লম্বা একটি মানুষ। আনিস ডাকল, রানু। রানু তৎক্ষণাৎ সাড়া দিল, কী ?

ইলেকট্রিসিটি চলে এলো তখনই। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই রহমান সাহেব এসে উপস্থিত হলেন। উদ্বিগ্ন স্বরে বললেন, এখন কেমন অবস্থা ? রানু অবাক হয়ে বলল, কিসের অবস্থা ? কী হয়েছে ?

রহমান সাহেব অবাক হয়ে তাকালেন। আনিস বলল, তোমার শরীর খারাপ করেছিল, তাই ওঁকে ডেকেছিলাম। এখন কেমন লাগছে ?

ভালো।

রানু উঠে বসল। রহমান সাহেবের দিকে তাকিয়ে মৃদু স্বরে বলল, এখন আমি ভালো।

রহমান সাহেব তবুও মিনিট দশেক বসলেন। আনিস বলল, আপনি কি ছাদে দাপাদাপি শুনেছেন ?

সে তো রোজই শুনি। বাঁদরের উৎপাত।

আমিও তাই ভাবছিলাম।

খুব জ্বালাতন করে। দিনেদুপুরে ঘর থেকে খাবারদাবার নিয়ে যায়।

তাই নাকি ?

জি। নতুন এসেছেন তো! কয়েকদিন যাক, টের পাবেন। বাড়িঅলাকে বলেছিলাম গ্রিল দিতে। তা দেবে না। আপনার সঙ্গে দেখা হলে আপনিও বলবেন। সবাই মিলে চেপে ধরতে হবে।

জি, আমি বলব। আপনি কি চা খাবেন নাকি এক কাপ ?

আরে না না! এই রাত আড়াইটার সময় চা খাব নাকি, কী যে বলেন! উঠি ভাই। কোনো অসুবিধা দেখলে ডাকবেন।

ভদ্রলোক উঠে পড়লেন। রানু চাপা স্বরে বলল, এই রাত-দুপুরে ভদ্রলোককে ডেকে আনলে কেন ? কী মনে করলেন উনি!

তুমি যা শুরু করেছিল! ভয় পেয়েই ভদ্রলোককে ডাকলাম।

কী করেছিলাম আমি ?

অনেক কাণ্ড করেছ। এখন তুমি কেমন, সেটা বলো।

ভালো।

কী রকম ভালো ?

বেশ ভালো।

ভয় লাগছে না আর ?

নাহ্।

রানু বিছানা থেকে নেমে পড়ল। সে বেশ সহজ ও স্বাভাবিক। ভয়ের কোনো চিহ্নও নেই চোখেমুখে। শাড়ি কোমরে জড়িয়ে ঘরের পানি সরাবার ব্যবস্থা করছে।

সকালে যা করবার করবে। এখন এসব রাখ তো।

ইস্‌, কী অবস্থা হয়েছে দেখ না!

হোক, এসো তো এদিকে।

রানু হাসি-হাসি মুখে এগিয়ে এলো।

এখন আর তোমার ভয় লাগছে না ?

না।

জানালার পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে ছিল বলেছিলে ?

এখন কেউ নেই। আর থাকলেও কিছু যায় আসে না।

আনিস দ্বিতীয় সিগারেটটা ধরাল। হালকা গলায় বলল, এক কাপ চা করতে পারবে ?

চা, এত রাতে!

এখন আর ঘুম আসবে না, করো দেখি এক কাপ।

রানু চা বানাতে গেল। কিছুক্ষণের মধ্যেই পানি ফোটার শব্দ হলো। বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে ঝমঝম করে। রানু একা-একা রান্নাঘরে। কে বলবে এই মেয়েটিই অল্প কিছুক্ষণ আগে ভয়ে অস্থির হয়ে গিয়েছিল! ছাদে আবার ঝুপঝুপ শব্দ হচ্ছে। এই বৃষ্টির মধ্যে বানর এসেছে নাকি ? আনিস উঠে গিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিল। হালকা গলায় বলল, ছাদে বড় ধুপধাপ শব্দ হচ্ছে। রানু জবাব দিল না।

আনিস বলল, এই বাড়িটা ছেড়ে দেব।

সস্তায় এরকম বাড়ি আর পাবে না।

দেখি পাই কিনা।

চায়ে চিনি হয়েছে তোমার ?

হয়েছে। তুমি নিলে না ?

নাহ্‌, রাত-দুপুরে চা খেলে আমার আর ঘুম হবে না।

রানু হাই তুলল। আনিস বলল, এখন বলো তো তোমার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত।

কোন স্বপ্নের কথা ?

ঐ যে স্বপ্ন দেখলে! একটা বেঁটে লোক।

কখন আবার এই স্বপ্ন দেখলাম ? কী যে তুমি বলো!

আনিস আর কিছু বলল না। চা শেষ করে ঘুমোতে গেল। শীত-শীত করছিল। রানু পা গুটিয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো শুয়েছে। একটি হাত দিয়ে জড়িয়ে রেখেছে আনিসকে। তার ভারি নিশ্বাস পড়ছে। ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়। জানালায় নারকেল গাছের ছায়া পড়েছে। মানুষের মতোই লাগছে ছায়াটাকে। বাতাসে গাছের পাতা নড়ছে। মনে হচ্ছে মানুষটি হাত নাড়ছে। ঘরের ভেতর মিষ্টি একটা গন্ধ। মিষ্টি, কিন্তু অচেনা।

আনিস রানুকে কাছে টেনে আনল। রানুর মুখে আলো এসে পড়েছে। কী যে মায়াবতী লাগছে! আনিস ছোট্ট করে নিঃশ্বাস ফেলল। ওদের বিয়ে হয়েছে মাত্র ছ' মাস। আনিস এখনো অভ্যস্ত হয়ে ওঠেনি। প্রতি রাতেই রানুর মুখ তার কাছে অচেনা লাগে। অপরূপ রূপবতী একটি বালিকার মুখ, যাকে কখনো পুরোপুরি চেনা যায় না। আনিস ডাকল, রানু, রানু। কোনো জবাব পাওয়া গেল না। গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন রানু। আনিসের ঘুম এলো না। শুয়ে-শুয়ে ঠিক করে ফেলল, রানুকে ভালো একজন সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যেতে হবে। অফিসের কমলেন্দু বাবু এক ভদ্রলোকের কথা প্রায়ই বলেন, খুব নাকি গুণী লোক। মিসির সাহেব। দেখালে হয় একবার মিসির সাহেবকে।

রানু ঘুমের ঘোরে খিলখিল করে হেসে উঠল। অপ্রকৃতিস্থ মানুষের হাসি শুনতে ভালো লাগে না, গা ছমছম করে।

২

ভদ্রলোকের বাড়ি খুঁজে বের করতে অনেক দেরি হলো। কাঁঠালবাগানের এক গলির ভেতর পুরনো ধাঁচের বাড়ি। অনেকক্ষণ কড়া নাড়বার পর অসম্ভব রোগা এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন। বিরক্ত মুখে বললেন, কাকে চান ?

মিসির সাহেবকে খুঁজছি।

তাকে কী জন্য দরকার ?

জি, আছে একটা দরকার। আপনি কি মিসির সাহেব ?

হ্যাঁ। বলেন, দরকারটা বলেন।

রাস্তায় দাঁড়িয়ে সমস্যার কথা বলতে হবে নাকি ? আনিস অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। কিন্তু ভদ্রলোকের ভাবভঙ্গি এ-রকম যে, বাইরেই দাঁড় করিয়ে রাখবেন, ভেতরে ঢুকতে দেবেন না। আনিস বলল, ভেতরে এসে বলি ?

ভেতরে আসবেন ? ঠিক আছে আসুন।

মিসির সাহেব যেন নিতান্ত অনিচ্ছায় দরজা থেকে সরে দাঁড়ালেন। ঘন অন্ধকার। তিন-চারটা বেতের চেয়ার ছাড়া আসবাবপত্র কিছু নেই।

বসুন আপনি।

আনিস বসল। ভদ্রলোক বললেন, আজ আমার শরীর ভালো না। আলসার আছে। ব্যথা হচ্ছে এখন। তাড়াতাড়ি বলেন কী বলবেন।

আমার স্ত্রীর একটা ব্যাপারে আপনার কাছে এসেছি। আপনার নাম শুনেই এসেছি।

আমার নাম শুনে এসেছেন ?

জি।

আমার এত নামডাক আছে, তা তো জানতাম না! স্পেসিফিক্যালি বলুন তো কার কাছে শুনেছেন ?

আনিস আমতা-আমতা করতে লাগল। ভদ্রলোক অসহিষ্ণু স্বরে বললেন, বলুন, কে বলল ?

আমাদের অফিসের এক ভদ্রলোক। কমলেন্দু বাবু। আপনি নাকি তাঁর বোনের চিকিৎসা করেছিলেন।

ও আচ্ছা, চিনেছি, কমলেন্দু। শোনেন, আমি কিন্তু ডাক্তার না, জানেন তো ?

জি স্যার, জানি।

আচ্ছা, আগে এক কাপ চা খান, তারপর কথা বলব। রুগীটি কে বললেন ? আপনার স্ত্রী ?

জি।

বয়স কত ?

ষোল-সতের।

বলেন কী! আপনার বয়স তো মনে হয় চল্লিশের মতো, ঠিক না ?

আনিস শুকনো গলায় বলল, আমার সাঁইত্রিশ।

এরকম অল্পবয়সী মেয়ে বিয়ে করেছেন কেন ?

এটা আবার কেমন প্রশ্ন! আনিসের মনে হলো, কমলেন্দু বাবুর কথা শুনে এখানে আসাটা ঠিক হয়নি। ভদ্রলোকের নিজেরই মনে হয় মাথার ঠিক নেই। একজন অপরিচিত মানুষকে কেউ এ-রকম কথা জিজ্ঞেস করে ?

বলুন বলুন, এ-রকম অল্পবয়েসী মেয়ে বিয়ে করলেন কেন ?

হয়ে গেছে আর কী!

বলতে চান না বোঝা যাচ্ছে। ঠিক আছে, বলতে হবে না। চা'র কথা বলে আসি। চা খেয়ে তারপর শুরু করব।

ভদ্রলোক আনিসকে বাইরে বসিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। তারপর আর আসার নামগন্ধ নেই। আট-ন বছরের একটি বাচ্চা মেয়ে এক কাপ দারুণ মিষ্টি সর-ভাসা চা দিয়ে চলে গেল। তারপর আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। দেখতে-দেখতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। আনিস বেশ কয়েকবার কাশল। দু'বার গলা উঁচিয়ে ডাকল, বাসায় কেউ আছেন ? কোনো সাড়া নেই। কী ঝামেলা!

কমলেন্দু বাবু অবশ্য বারবার বলে দিয়েছেন— এই লোকের কথাবার্তার ঠিকঠিকানা নেই। তবে লোকটা অসাধারণ। আনিসের কাছে অসাধারণ কিছু মনে হয়নি। তবে চোখের দৃষ্টি খুব তীক্ষ্ণ। এইটি অবশ্য প্রথমেই চোখে পড়ে। আর দ্বিতীয় যে জিনিসটি চোখে পড়ে, সেটি হচ্ছে তার আঙুল। অস্বাভাবিক লম্বা-লম্বা সব ক'টা আঙুল।

এই যে, অনেকক্ষণ বসিয়ে রাখলাম।

না, ঠিক আছে।

ঠিক থাকবে কেন ? ঠিক না।

লোকটি এই প্রথমবার হাসল। থেমে-থেমে বলল, আলসার আছে তো, ব্যথায় কাহিল হয়ে শুয়ে ছিলাম। অমনি ঘুম এসে গেল।

আমি তাহলে অন্য একদিন আসি ?

না, এসেছেন যখন বসুন। চা দিয়েছিল ?

জি।

বেশ, এখন বলুন কী বলবেন।

আনিস চুপ করে রইল। এটা এমন একটা ব্যাপার, যা চট করে অপরিচিত কাউকে বলা যায় না। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, আপনার স্ত্রীর মাথার ঠিক নেই, তাই তো ?

জি-না স্যার, মাথা ঠিক আছে।

পাগল নন ?

জি-না

তাহলে আমার কাছে এসেছেন কেন ?

মাঝে-মাঝে সে অস্বাভাবিক আচরণ করে।

কী রকম অস্বাভাবিক ?

ভয় পায়। মাঝে-মাঝেই এরকম হয়।

ভয় পায় ? তার মানে কী ? কিসের ভয় ?

ভূতের ভয়।

ঠিক জানেন, ভয়টা ভূতের ?

জি-না, ঠিক জানি না। মনে হয় এরকম।

ভদ্রলোক একটি চুরুট ধরিয়ে খকখক করে কাশতে-কাশতে বললেন, বর্মা থেকে আমার এক বন্ধু এনেছে, অতি বাজে জিনিস।

আনিস কিছু বলল না। তবে এই ভদ্রলোকের স্টাইলটি তার পছন্দ হলো। ভদ্রলোক অবলীলায় অন্য একটি প্রসঙ্গ নিয়ে এসেছেন। এবং এমনভাবে কথা বলছেন, যেন আগের কথাবার্তা তাঁর কিছুই মনে নেই।

এরকম চুরুট চার-পাঁচটা খেলে যক্ষ্মা হয়ে যাবে। আপনাকে দেব একটা ?

জি-না।

ফেলে দিতে মায়া লাগে বলে খাই। খাওয়ার জিনিস না। অখাদ্য। তবে হাভানা চুরুটগুলি ভালো। হাভানা চুরুট খেয়েছেন কখনো ?

জি-না।

খুব ভালো। মাঝে-মাঝে আমার এক বন্ধু আমাকে দিয়ে যায়। ভদ্রলোক চুরুটে টান দিয়ে আবার ঘর কাঁপিয়ে কাশতে লাগলেন। কাশি থামতেই বললেন, এখন আমি আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করব। যথাযথ জবাব দেবেন।

জি আচ্ছা।

প্রথম প্রশ্ন, আপনার স্ত্রী কি সুন্দরী?

জি।

বেশ সুন্দরী?

জি।

আপনার স্ত্রী কখন ভয় পান— রাতে না দিনে?

সাধারণত রাতে। তবে একবার দুপুরে ভয় পেয়েছিল।

ভয়টা কীরকম সেটা বলেন।

মনে হয় কিছু একটা দেখে।

সব বার একই জিনিস দেখেন, না একেকবার একেক রকম?

এটা আমি ঠিক বলতে পারছি না।

এই সময় কি তিনি কোনো রকম গন্ধ পান?

আমি ঠিক বলতে পারছি না।

যখন সুস্থ হয়ে ওঠেন, তখন কি তার ভয়ের কথা মনে থাকে?

বেশির ভাগ সময়ই থাকে না, তবে মাঝে-মাঝে থাকে।

আপনার স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই খারাপ?

জি।

উনি প্রথম কখন ভয় পেয়েছিলেন, বলতে পারেন?

জি-না। তবে খুব ছোটবেলায়।

প্রথম ভয়ের ঘটনাটা আমাকে বলুন।

আমি সেটা জানি না।

আপনি অনেক কিছুই জানেন না মনে হচ্ছে। আপনার স্ত্রীকে একদিন নিয়ে আসুন।

আনিস কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, আমি তাকে আনতে চাই না।

কেন চান না?

সে খুব সেনসেটিভ। সে যদি টের পায় যে, তার এই অস্বাভাবিকতা নিয়ে আমি লোকজনের সাথে আলাপ করছি, তাহলে খুব মন খারাপ করবে।

দেখুন ভাই, আপনার স্ত্রীর সঙ্গে কথা না বলে কিছুই করা যাবে না। আপনার স্ত্রী অসুস্থ এবং আমার মনে হচ্ছে এই অসুখ দ্রুত বেড়ে যাবে। আপনি তাঁকে নিয়ে আসবেন।

আনিস উঠে দাঁড়াল। ক্ষীণ স্বরে বলল, আপনাকে কত দেব ?

ভদ্রলোক বিস্মিত হয়ে বললেন, কমলেন্দু বাবু কি আপনাকে বলেননি আমি ফিস নিই না ? এ কাজটি আমি শখের খাতিরে করি, বুঝতে পারছেন ?

জি, পারছি।

তবে আপনি যদি ভালো গোলাপের চারা পান, তাহলে আমাকে দিতে পারেন। আমার গোলাপের খুব শখ। সব মিলিয়ে ত্রিশটি ডিফারেন্ট ভেরাইটির চারা আমার কাছে আছে। একটা আছে দারুণ ইন্টারেস্টিং, ঘাসফুলের মতো ছোট সাইজের গোলাপ।

তাই নাকি ?

জি। ওরা বলে মাইক্রো রোজ। হল্যান্ডের গোলাপ। কড়া গন্ধ। দেখবেন ?

আরেকদিন দেখব। আজ দেরি হয়ে গেছে, আমার স্ত্রী একা থাকে।

ও, তাই নাকি ? শোনেন, একা তাকে রাখবেন না। কখনো যেন মেয়েটি একা না থাকে। এটা খুবই জরুরি।

রাস্তায় নেমে আনিসের মন খারাপ হয়ে গেল। খামোকা সময় নষ্ট। লোকটি তেমন কিছু জানে না। কমলেন্দু বাবু যে-সব আধ্যাত্মিক শক্তি-টক্তির কথা বলেছেন, সে-সব মনে হয় নেহায়েতই গালগল্প। তবে লোকটির কথাবার্তা বেশ ফোর্সফুল। রানুকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে একবার এনে দেখালে হয়। ক্ষতি তো কিছু নেই।

তাছাড়া ভদ্রলোক খুব সম্ভব ফ্যালনাও নন। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রির টিচার। একবারে কিছু না জেনে তো কেউ মাস্টারি করে না। কিছু নিশ্চয়ই জানেন। মানুষের চেহারা দেখে কিছু অনুমান করাটাও ঠিক না।

৩

আনিস অফিসে চলে গেলে রানুর খুব একলা লাগে। কিছুই করার থাকে না। গোছানো আলনা আবার নতুন করে গোছায়। বসার ঘরের বেতের সোফা ঝাড়ন দিয়ে ঝাড়ে। শোবার মেঝে ভেজা ন্যাকড়া দিয়ে মুছতে-মুছতে চকচকে করে ফেলে, তবু সময় কাটে না। এক সময় তেতলার বারান্দায় গিয়ে বসে। এ-বাড়ির ছোট বারান্দাটি তার খুব পছন্দ। গ্রিল দেওয়া বারান্দাটি গোলাকার। এখানে বসে অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায়। সামনেই একটা মেয়েদের স্কুল। টিফিন টাইমে মেয়েগুলোর কাণ্ডকারখানা দেখতে এমন মজা লাগে! রানু প্রায় সারা দুপুর বারান্দাতেই বসে থাকে। একা-একা ঘরে বসে থাকতে ভালো লাগে না। কেমন যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। একটু যেন ভয়ভয়ও লাগে।

অবশ্য যখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল নামতে থাকে, তখন ভয়ভয় ভাবটা কমে যায়। বিকেলবেলা বাড়িঅলার মেয়ে দুটি তাদের ভেতরের দিকের বাগানে বসে মজা করে চা খায়। চা খেতে-খেতে দুজনেই খুব হাসাহাসি করে। একেকদিন ওদের বাবাও সঙ্গে বসেন, রানুর দেখতে বেশ লাগে।

ছোট মেয়েটির সঙ্গে রানুর কিছুদিন আগে আলাপ হয়েছিল। বেশ মেয়েটি! খুব স্মার্ট। দেখতেও সুন্দর। একদিন দুপুরে রানু বারান্দায় এসে বসেছে, মেয়েটি এসে উপস্থিত। মুখে চাপা হাসি। হাতে কী-একটা বই। এসেই বলল, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এসেছি।

কী কথা ?

আপনি সারাদিন বারান্দায় বসে থাকেন কেন ?

সারাদিন কোথায় ? দুপুরবেলায় বসি। কিছু করার নেই তো, একা-একা লাগে।

তা ঠিক। বসব আপনার এখানে ? আজ আমি কলেজে যাইনি। বোটানি প্র্যাকটিক্যাল ছিল আজকে।

মেয়েটি খুব সহজভাবে বলল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একগাদা কথা বলল। তারপর যাবার সময় হঠাৎ বলল, আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করব ?

করো।

আপনি এত সুন্দর কেন ? যে আমার চেয়েও সুন্দরী, তাকে আমার ভালো লাগে না।

রানু কী বলবে ভেবে পেল না। মেয়েটি হাসতে-হাসতে বলল, আমাদের ক্লাসের মেয়েদের কী ধারণা জানেন ? তাদের ধারণা, আমি হচ্ছি বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দরী মহিলা। ওদের একদিন এনে আপনাকে দেখিয়ে দেব।

ঠিক আছে, দিও। আরেকটু বসো। চা খাবে ?

না, চা আমি বেশি খাই না। বেশি চা খেলে গায়ের রঙ ময়লা হয়ে যায়।

মেয়েটি যেমন হুট করে এসেছিল, তেমনি হুট করে নিচে নেমে গেল। বেশ লাগল রানুর। নতুন বাসাটা তার ভালোই লাগছে। পুরনো ঢাকায় হলেও বেশ নিরিবিলি। মালিবাগের বাসাটার মতো নয়। নিশ্বাস নেবার জায়গা ছিল না সেখানে। পাশ দিয়ে রাতদিন রিকশা যাচ্ছে, গাড়ি যাচ্ছে। জঘন্য! এই বাসাটা ভেতরের দিকে। বাড়িঅলা ভদ্রলোকও বেশ ভালোমানুষ। প্রথম দিনেই আনিসকে বলেছেন, আমার বাড়ি ভাড়া দেবার দরকার নেই। টাকার জন্যেই তো বাড়ি ভাড়া। টাকা যথেষ্ট আছে। তবু দু'ঘর ভাড়াটে রাখি। কারণ এত বড় বাড়িতে মানুষ না-থাকলে ভালো লাগে না। কবরখানা-কবরখানা ভাব চলে আসে। তবে সবাইকে আমি বাড়ি ভাড়া দিই না। আপনাকে দিচ্ছি, কারণ আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে।

ভাড়াও খুব কম। মাত্র ছয় শ' টাকা। তিন-রুমের এত বড় একটা বাড়ি ছয় শ' টাকায় পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। রানু এখানে এসে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। তার সবচেয়ে পছন্দ হয়েছে বাথরুম। বড় ঝকঝকে একটা বাথরুম। বাসাটা রানুর খুব পছন্দ হয়েছিল। আনিস যখন বলল, কী, নেব ? পছন্দ হয় ?

হয়।

ভালো করে ভেবে বলো নেব কিনা। দুদিন পর যদি বলো পছন্দ না, তাহলে মুশকিলে পড়ব। মালিবাগের বাসাটা ভালো ছিল। শুধু-শুধু বদলানো।

এই বাসাটাও ভালো।

রানু খুব খুশি মনে নতুন বাসা সাজাল। নিজেই পরদা কিনে আনল, সারা রাত জেগে সেলাই করল। তার উৎসাহের সীমা নেই।

বুঝলে রানু! সবার সঙ্গে মিলেমিশে থাকবে। অন্যদের বাসায় যাবে-টাবে। একা একা থাকার অভ্যেসটা ভালো না। যাবে তো ?

যাব।

একা থাকলেই মানুষের মধ্যে নানান রকম প্রবলেম দেখা যায়, বুঝলে ? সব ভাড়াটেদের সঙ্গে খাতির রাখবে।

ভাড়াটে তো মাত্র একজন।

ঐ ওনার বাসাতেই যাবে। বাড়িঅলার বাসায়ও যাবে।

আচ্ছা যাব।

রানু অবশ্যি যায়নি কোথাও। তার ভালো লাগে না। অন্যদের মতো সে কারো সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে না। অন্যদের সামনে কেমন যেন আড়ষ্ট লাগে। বারান্দার বেতের চেয়ারটাতে বসে থাকতেই বেশি ভালো লাগে। দুপুরটাই যা কষ্টের। দুপুরটা কেটে গেলেই অন্যরকম একটা শান্তি লাগে।

কিন্তু আজকের দুপুরটা দীর্ঘ। কিছুতেই আর কাটছে না। বারান্দায় বসে থাকতেও ভালো লাগছে না। মেয়েদের স্কুলটাও কী কারণে যেন বন্ধ। চারদিক চুপচাপ। বড্ড ফাঁকা। কিছুক্ষণ শুয়ে থাকলে কেমন হয় ?

ঘরের ভেতরটা কেমন যেন অন্যরকম। রানু ভেতরে ঢুকে জানালার পর্দা ফেলে দিল। অনেকখানি অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার ও চুপচাপ। আর তখন স্পষ্ট গলায় কেউ ডাকল— রানু, রানু। কয়েক মুহূর্ত রানু নড়ল না। অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু যে ডেকে উঠেছে, সে দ্বিতীয়বার আর ডাকল না।

রানুর এ-রকম চারদিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে একজন অশরীরী কেউ ডেকে ওঠে। অসংখ্যবার শুনেছে এই ডাক। কে সে! কোত্থেকে আসে সে! রানু ফিসফিস করে বলল, কে ? কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

কে তুমি ?

জানালার পরদাটা শুধু কাঁপছে। বিকেল হয়ে আসছে। রানু ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বাগানে বাড়িঅলার বড় মেয়েটি হাঁটছে। নীলু বোধহয় ওর নাম। এই মেয়েটি তার বোনের মতো নয়। গম্ভীর। কথাবার্তা প্রায় বলেই না। তবুও ওকে দেখলেই রানুর মনে হয়— মেয়েটি বড় ভালো। মায়াবতী মেয়ে।

রানু দেখল— বিষণ্ন ভঙ্গিতে মেয়েটি একা-একা বসে আছে। তার ইচ্ছা হলো নিচে নেমে ওর সঙ্গে কথা বলে। কিন্তু সে গেল না।

৪

নীলু দু'বার বিজ্ঞাপনটা পড়ল। বেশ একটা মজার বিজ্ঞাপন।

কেউ কি আসবেন ?

> আমি একজন নিঃসঙ্গ মানুষ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর একা জীবন-যাপন করছি। সময় আর কাটে না। আমার দীর্ঘ দিবস ও দীর্ঘ রজনীর নিঃসঙ্গতা কাটাতে কেউ আমাকে দু'লাইন লিখবেন ?
>
> জিপিও বক্স নাম্বার ৭৩

দৈনিক পত্রিকায় এরকম বিজ্ঞাপন দেবার মানে কী ? সাপ্তাহিক কাগজগুলিতে এইসব থাকে; ছেলেছোকরাদের কাণ্ড। এই লোকটি নিশ্চয় ছেলেছোকরা নয়। বুড়ো-হাবড়াদের একজন।

বাবা, এটা পড়েছ ?

নীলু জাহিদ সাহেবের হাতে কাগজটা গুঁজে দিল।

বাবা, এই বিজ্ঞাপনটি পড় তো!

জাহিদ সাহেব নিজেও ভ্রু কুঞ্চিত করে দু'বার পড়লেন। তাঁর মুখের ভঙ্গি দেখে মনে হলো বেশ বিরক্ত হয়েছেন।

পড়েছ ?

হুঁ, পড়লাম।

কী মনে হয় বাবা ?

কী আবার মনে হবে ? কিছুই মনে হয় না। দেশটা রসাতলে যাচ্ছে। খবরের কাগজঅলারা এইসব ছাপে কীভাবে!

নীলু হাসিমুখে বলল, ছাপাবে না কেন ?

দেশটা বিলাত-আমেরিকা নয়, বুঝলি ? আর ভালো করে পড়লেই বোঝা যায়, লোকটার একটা বদ মতলব আছে।

কই, আমি তো বদ মতলব কিছু বুঝছি না।

জাহিদ সাহেব গম্ভীর হয়ে বললেন, দেখিস, তুই আবার চিঠি লিখে বসবি না।

নীলু মুখ নিচু করে হাসল।

হাসছিস কেন ?

এমনি হাসছি।

চিঠি লিখবার কথা ভাবছিস না তো মনে মনে ?

উঁহু।

নীলু মুখে উঁহু বললেও মনে মনে ঠিক করে ফেলল, গুছিয়ে একটা চিঠি লিখবে। দেখা যাক না কী হয়। কী লেখে লোকটি।

রাতে ঘুমোতে যাওয়ার আগে সে সত্যি একটা চিঠি লিখে ফেলল। মোটামুটি বেশ দীর্ঘ চিঠি।

> জনাব,
>
> আপনার বিজ্ঞাপনটি পড়লাম। লিখলাম কয়েক লাইন। এতে কি আপনার নিঃসঙ্গতা কাটবে ? আমার বয়স আঠার। আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। আমরা দু'বোন। আমার ছোট বোনটির নাম বিলু। সে হলিক্রস কলেজে পড়ে। আমরা দু'বোনই খুব সুন্দরী। এই যা, এটা আপনাকে লেখা ঠিক হলো না। তাই না ? নাকি সুন্দরী মেয়েদের চিঠি পেলে আপনার নিঃসঙ্গতা আরো দ্রুত কাটবে ?
>
> নীলু

চিঠিটি লিখেই তার মনে হলো যে, এরকম লেখাটা ঠিক হচ্ছে না। চিঠির মধ্যে একটা বড় মিথ্যা আছে। সে সুন্দরী নয়। বিলুর জন্যে কথাটা ঠিক, তার জন্যে নয়। নীলু ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে দ্বিতীয় চিঠিটি লিখল।

> জনাব,
>
> আমার নাম নীলু। আমার বয়স কুড়ি। আপনার নিঃসঙ্গতা কাটাবার জন্যে আপনাকে লিখছি। কিন্তু চিঠিতে কি কারো নিঃসঙ্গতা কাটে ? আপনার বয়স কত, এটা দয়া করে জানাবেন।
>
> নীলু

দ্বিতীয় চিঠিটিও তার পছন্দ হলো না। তার মনে হলো, সে যেন কিছুতেই গুছিয়ে আসল জিনিসটি লিখতে পারছে না। রাতে শুয়ে শুয়ে তার মনে হলো, হঠাৎ করে সে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ছে কেন ? চিঠি লেখারই বা কী দরকার ? সে নিজেও কি খুব নিঃসঙ্গ ? হয়তো বা। এ বাড়িতে আর দুটিমাত্র প্রাণী। বিলু আর বাবা। বাবা দিনরাত নিজের ঘরেই থাকেন। মাসের প্রথম দিকের কয়েকটা দিন বাড়িভাড়ার

টাকা আদায়ের জন্যে অল্প যা নড়াচড়া করেন। তারপর আবার নিজের ঘরেই বন্দি। আর বিলু তো আছে তার অসংখ্য বন্ধুবান্ধব নিয়ে। শুধু মেয়েবন্ধু নয়, তার আবার অনেক ছেলেবন্ধুও আছে।

মহানন্দে আছে বিলু। তবে সে একটু বাড়াবাড়ি করছে। কাল তার কাছে একটি ছেলে এসেছিল, সে রাত আটটা পর্যন্ত ছিল। এ-সব ভালো নয়। নীলু উঁকি দিয়ে দেখেছে, ছেলেটি ফরফর করে সিগারেট টানছে। হাত নেড়ে নেড়ে খুব কথা বলছে। আর বিলু হাসতে-হাসতে ভেঙে পড়ছে। ভাত খাওয়ার সময় নীলু কিছু বলবে না বলবে না করেও বলল, ছেলেটা কে রে?

কোন ছেলে?

ঐ যে রাত আটটা পর্যন্ত গল্প করলি?

ও, সে তো রুবির ভাই! মহা চালবাজ। নিজেকে খুব বুদ্ধিমান ভাবে, আসলে মহা গাধা।

বলতে-বলতে খিলখিল করে হাসে বিলু।

মহাগাধা হলে এতক্ষণ বসিয়ে রাখলি কেন?

যেতে চাচ্ছিল না তো কী করব?

বলতে বলতে বিলু আবার হাসল। বিলু এমন মেয়ে, যার ওপর কখনো রাগ করা যায় না। নীলু কখনো রাগ করতে পারে না। মাঝে মাঝে বাবা দু'একটা কড়া কথা বলেন। তখন বিলু রাগ করে খাওয়া বন্ধ করে দেয়। সে এক মহা যন্ত্রণা! একবার রাগ করে সে পুরো দু'দিন দরজা বন্ধ করে বসে ছিল। কত সাধাসাধি, কত অনুরোধ! শেষ পর্যন্ত মগবাজারের ছোট মামাকে আনতে হলো। ছোট মামা বিলুর খুব খাতিরের মানুষ। তার সব কথা সে শোনে। তিনি এসে যখন বললেন, দরজা না খুললে মা আমি কিন্তু আর আসব না। এই আমার শেষ আসা— তখন দরজা খুলল। এরকম জেদি মেয়ে।

নীলুর কোনো জেদ-টেদ নেই। কালো এবং অসুন্দরী মেয়েদের জেদ কখনো থাকে না। এদের জীবন কাটাতে হয় একাকী।

নীলু বাতি নিভিয়ে ঘুমোতে চেষ্টা করল। ছোটবেলায় বাতি নেভানোর সঙ্গে সঙ্গে তার ঘুম আসত, এখন আর আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত এপাশ-ওপাশ করতে হয়।

পাশের খাটে টেবিলল্যাম্প জ্বালিয়ে চোখের ওপর একটা গল্পের বই ধরে আছে বিলু। অনেক রাত পর্যন্ত পড়বে। পড়তে-পড়তে হঠাৎ এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে, বাতি নেভাবে না। মশারি ফেলবে না। নীলুকেই উঠে এসে বাতি নেভাতে হবে, মশারি ফেলতে হবে।

বিলু ঘুমো, বাতি নেভা।

একটু পরে ঘুমাব।

কী পড়ছিস ?

শীর্ষেন্দুর একটা বই। দারুণ!

দিনে পড়িস। আলো চোখে লাগছে।

দিনে আমার সময় কোথায় ? তুমি ঘুমাও-না!

নীলু ঘুমাতে পারল না। শুয়ে-শুয়ে তাকিয়ে রইল বিলুর দিকে। দিনে দিনে কী যে সুন্দর হচ্ছে মেয়েটা! একই বাবা-মা'র দু'মেয়ে— একজন এত সুন্দর আর অন্যজন এত অসুন্দর কেন ? নীলু ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল।

আপা।

কী ?

দারুণ বই, তুমি পড়ে দেখ।

প্রেমের ?

হ্যাঁ। প্রেমের হলেও খুব সিরিসাস জিনিস। দারুণ!

তাই নাকি ?

হুঁ, একজন খুব রূপবতী মেয়ের গল্প।

তোর মতো একজন ?

ধুর, আমি আবার সুন্দর নাকি ? আমাদের তিনতলার ভাড়াটের বৌটির মতো বলতে পার। রানু নাম, দেখেছ ?

না তো, খুব সুন্দরী ?

ওরে বাপ, দারুণ! হেমা মালিনীর চেয়েও সুন্দরী।

তুই মেয়েটিকে একবার আসতে বলিস তো আমাদের বাড়িতে! দেখব।

বলব। তুমি নিজে একবার গেলেই পার। মেয়েটা ভালো। কথাবার্তায় খুব ভদ্র। ওর বরকে দেখেছ, আনিস সাহেব ?

হুঁ।

ঐ লোকটা বোকা ধরনের। বোকার মতো কথাবার্তা। আমাকে আপনি-আপনি করে বলে।

কলেজে পড়িস, তোকে আপনি বলবে না ?

ফ্রক-পরা কাউকে এরকম একজন বুড়ো মানুষ আপনি বলবে নাকি ?

বুড়ো নাকি ?

চল্লিশের ওপর বয়স হবে।

মেয়েটার বয়স কত ?

খুব কম। চৌদ্দ-পনের হবে।

বিলু বাতি নিভিয়ে দিল এবং নিমিষেই ঘুমিয়ে পড়ল। নীলু জেগে রইল অনেক রাত পর্যন্ত। কিছুতেই তার ঘুম এলো না। ইদানীং তার ঘুম খুব কমে গেছে। রোজই মাঝরাত না হওয়া অবধি ঘুম আসে না।

রানু চুলায় ভাত চড়িয়ে বসার ঘরে এসে দেখে বাড়িঅলার বড় মেয়েটি ঘরের ভেতর।

না জিজ্ঞেস করেই ঢুকে পড়লাম ভাই। আমার নাম নীলু।

আসুন, আসুন। আপনাকে আমি চিনি। আপনি বাড়িঅলার বড় মেয়ে। আজ ইউনিভার্সিটি যাননি?

উঁহু। আজ ক্লাস নেই। আপনার সঙ্গে গল্প করতে এলাম। কী করছিলেন?

ভাত রান্না করছি।

চলুন, রান্নাঘরে গিয়ে বসি। বিলুর কাছ থেকে আপনার খুব প্রশংসা শুনি। বিলুর ধারণা, আপনি হচ্ছেন হেমা মালিনী।

রানু অবাক হয়ে বলল, হেমা মালিনীটি কে?

আছে একজন। সিনেমা করে। সবাই বলে খুব সুন্দর। আমার কাছে সুন্দর লাগে না। চেহারাটা অহঙ্কারী।

রানু মুখ টিপে হাসতে হাসতে বলল, সুন্দরী মেয়েরা তো অহঙ্কারীই হয়।

আপনিও অহঙ্কারী?

রানু হাসতে হাসতে বলে, হ্যাঁ। কিন্তু আমাকে আপনি আপনি বলতে পারবেন না। তুমি করে বলতে হবে।

নীলু লক্ষ করল মেয়েটি বেশ রোগা, কিন্তু সত্যিই রূপসী। সচরাচর দেখা যায় না। চোখ দুটি কপালের দিকে ওঠানো বলে— দেবী প্রতিমার চোখের মতো লাগে। সমগ্র চেহারায় খুব সূক্ষ্ম হলেও কোথাও যেন একটি মূর্তি মূর্তি ভাব আছে।

কী দেখছেন?

তোমাকে দেখছি ভাই। তোমার চেহারায় একটা মূর্তি মূর্তি ভাব আছে।

রানু মুখ কালো করে ফেলল। নীলু অবাক হয়ে বলল, ও কী! তুমি মনে হয় মন খারাপ করলে?

না, মন খারাপ করব কেন?

কিন্তু এমন মুখ কালো করলে কেন? আমি কিন্তু কমপ্লিমেন্ট হিসেবে তোমাকে বলেছি। তোমার মতো সুন্দরী মেয়ে আমি খুব বেশি দেখিনি। তবে একবার একটি বিহারি মেয়েকে দেখেছিলাম। আমার ছোটমামার বিয়েতে। অবশ্য সে মেয়েটি তোমার মতো রোগা ছিল না। ওর স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল।

আপনি কি একটু চা খাবেন?

তুমি আমাকে আপনি করে বলছ কেন ? তোমার কি মনে হয় আমার বয়স অনেক বেশি ?

না, তা মনে হয় না।

তুমিও আমাকে তুমি বলবে। আর তোমার যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আমি মাঝে-মাঝে তোমার কাছে আসব।

রানু চায়ের কাপ সাজাতে-সাজাতে মৃদু স্বরে বলল, আমাকে মূর্তি-মূর্তি লাগে, এটা বললে কেন ?

নীলু অবাক হয়ে বলল, এমনি বলেছি। টানাটানা চোখ তো, সে জন্যে। তুমি দেখি ভাই রাগ করেছ।

একটা কারণ আছে নীলু। তোমাকে আমি একদিন সব বলব, তাহলেই বুঝবে। চায়ে কতটুকু চিনি খাও ?

তিন চামচ।

নীলু অনেকক্ষণ বসল, কিন্তু কথাবার্তা আর তেমন জমল না। রানু কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে। কিছুতেই মন লাগাতে পারছে না। সহজ হতে পারছে না। নীলু বেশ কয়েকবার অন্য প্রসঙ্গ আনতে চেষ্টা করল। ভাসা-ভাসা জবাব দিল রানু। এবং একসময় হালকা স্বরে বলল, আমার একটু অসুখ আছে নীলু।

কী অসুখ ?

মাঝে-মাঝে আমি ভয় পাই।

ভয় পাই মানে ?

রানু মাথা নিচু করে বলল, ছোটবেলায় একবার নদীতে গোসল করতে গিয়েছিলাম, তারপর থেকে এরকম হয়েছে।

কী হয়েছে ?

রানু জবাব দিল না।

বলো, কী হয়েছে ?

অন্য একদিন বলব। আজ তুমি তোমার কথা বলো।

আমার তো বলার মতো কোনো কথা নেই।

তোমার বন্ধুদের কথা বলো।

আমার তেমন কোনো বন্ধুও নেই। আমি বলতে গেলে একা একা থাকি। অসুন্দরী মেয়েদের বন্ধুটন্ধু থাকে না।

রঙ খারাপ হলে মানুষ অসুন্দর হয় না নীলু।

আমি নিজে কী, সেটা আমি ভালোই জানি।

নীলু উঠে পড়ল। রানু বলল, আবার আসবে তো ?

আসব। তুমি তোমার ভয়ের কথাটথা কী বলছিলে, সেইসব বলবে।

বলব।

নীলু পাঠাবে না পাঠাবে না করেও চিঠিটি পাঠিয়ে দিল। কিন্তু তার পরপরই দুশ্চিন্তার সীমা রইল না। কে জানে, বুড়ো-হাবড়া লোকটি একদিন হয়তো বাসায় এসে হাজির হবে। দারুণ লজ্জার ব্যাপার হবে সেটা। নিতান্তই ছেলেমানুষি কাজ করা হয়েছে। চার-পাঁচ দিন নীলুর খুব খারাপ কাটল। দারুণ অস্বস্তি। বুড়োমতো কোনো মানুষকে আসতে দেখলেই চমকে উঠত, এটিই সেই লোক নাকি ? যদি সত্যি সত্যি কেউ এসে পড়ে, তাহলে সে ভেবে রেখেছে বলবে— এই চিঠি তো আমার নয়। অন্য কেউ তামাশা করে এই ঠিকানা দিয়েছে। আমি এ-রকম অজানা-অচেনা কাউকে চিঠি লিখি না।

কেউ অবশ্যি এলো না। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। চিঠিরও কোনো উত্তর নেই। লোকটি হয়তো চিঠি পায়নি। ডাকবিভাগের কল্যাণে আজকাল তো বেশিরভাগ চিঠিই প্রাপকের হাতে পৌঁছায় না। এতে ক্ষতি যেমন হয়, লাভও তেমনি হয়। কিংবা হয়তো এমন হয়েছে, ঐ লোক অসংখ্য চিঠি পেয়ে পছন্দমতো চিঠিগুলোর উত্তর দিয়েছে। নীলুর তিন লাইনের চিঠি তার পছন্দ হয়নি। সে হয়তো লম্বা-লম্বা চমৎকার সব চিঠি পেয়েছে। ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কিছু লেখা সব চিঠিতে।

দশদিনের মাথায় নীলুর কাছে চিঠি এসে পড়ল। খুবই দামি একটা খামে চমৎকার প্যাডের কাগজে চিঠি। গোটা গোটা হাতের লেখা। কালির রঙ ঘন কালো। মাখন-রাঙা সে কাগজে লেখাগুলো মুক্তার মতো ফুটে আছে। এত সুন্দর হাতের লেখাও মানুষের হয়! চিঠিটি খুবই সংক্ষিপ্ত।

> কল্যাণীয়াসু,
>
> তোমার চমৎকার চিঠি গভীর আগ্রহ নিয়ে পড়েছি। একজন ব্যথিত মানুষের আবেদনে তুমি সাড়া দিয়েছ— তোমাকে ধন্যবাদ। খুব সামান্য একটি উপহার পাঠালাম। প্লিজ, নাও।
>
> আহমেদ সাবেত

উপহারটি সামান্য নয়। অত্যন্ত দামি একটি পিওর পারফিউমের শিশি।

নীলু ভেবে পেল না, এই লোকটি কি সবাইকে এরকম একটি উপহার পাঠিয়েছে ? যারাই চিঠির জবাব দিয়েছে তারাই পেয়েছে ? কিন্তু তাও কি সম্ভব ? নাকি নীলু একাই চিঠির জবাব দিয়েছে ? নীলুর বড় লজ্জা করতে লাগল। সে পারফিউমের শিশিটি লুকিয়ে রাখল এবং খুব চেষ্টা করতে লাগল সমস্ত ব্যাপার ভুলে যেতে। সে চিঠিটি কুচিকুচি করে ছিঁড়ে ফেলে দিল জানালা দিয়ে। কেন এমন একটা বাজে ঝামেলায় জড়াল ?

কিন্তু দিন সাতেক পর নীলু আবার একটি চিঠি লিখল। একটি বেশ দীর্ঘ চিঠি। সেখানে শেষের দিকে লেখা— আপনি কে, কী করেন, কিছুই তো জানাননি। আপনার বিজ্ঞাপনটিও দেখছি না। তার মানে কি এই যে আপনার নিঃসঙ্গতা এখন দূর হয়েছে ?

নীলু বেশ কিছু দিন অপেক্ষা করল চিঠির জবাবের জন্যে। কিন্তু কোনো জবাব এলো না। কেন জানি নীলুর বেশ মন খারাপ হলো। আরেকটি চিঠি লেখার ইচ্ছা হতে লাগল। কিন্তু তাও কি হয় ? একা-একা সে শুধু চিঠি লিখবে ? তার এত কী গরজ পড়েছে ?

৫

দুপুর-রাতে আনিসের ঘুম ভেঙে গেল। হাত বাড়াল অভ্যেসমতো। পাশে কেউ নেই। আনিস ডাকল, রানু, রানু। কোনো সাড়া নেই। বাথরুম থেকে একটানা পানি পড়ার শব্দ হচ্ছে। বাথরুমে নাকি ? আনিস উঁকি দিল বাথরুমে— কেউ নেই। কোথায় গেল! আনিস গলা উঁচিয়ে ডাকল, রানু। বসার ঘর থেকে ক্ষীণ হাসির শব্দ এলো। বসার ঘর অন্ধকার। রানু কি সেখানে একা-একা বসে আছে নাকি ?

আনিস বসার ঘরে ঢুকে বাতি জ্বেলেই সঙ্গে-সঙ্গে বাতি নিভিয়ে ফেলল। রানু বসার ঘরের ছোট টেবিলে চুপচাপ বসে আছে। তার গায়ে কোনো কাপড় নেই।

এই রানু!

উঁ।

কী হয়েছে ? তোমার কাপড় কোথায় ?

খুলে ফেলেছি। বড্ড গরম লাগছে।

আনিস এসে রানুর হাত ধরল। হিমশীতল হাত। একটু-একটু যেন কাঁপছে।

এসো রানু, ঘুমোতে যাই।

আমার ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না। তুমি যাও।

কাল আমরা একজন ডাক্তারের কাছে যাব, কেমন ?

কেন ?

তোমার শরীর ভালো না রানু।

আমার শরীর ভালোই আছে।

না, তুমি খুব অসুস্থ। এসো আমার সঙ্গে। কাপড় পরে ঘুমোতে এসো।

রানু কোনো আপত্তি করল না। সঙ্গে-সঙ্গেই উঠে এলো। কাপড় পরল এবং বাধ্য মেয়ের মতো বিছানায় শুয়ে প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ল। জেগে রইল আনিস। রানুর শরীর দ্রুত খারাপ হচ্ছে। আগে তো এ-রকম কখনো হয়নি! মিসির আলি-টালি নয়, বড় কোনো ডাক্তারকে দেখানো দরকার।

খুটখুট করে শব্দ হচ্ছে রান্নাঘরে। ইঁদুরের উপদ্রব। তবু কেন জানি শব্দটা অন্যরকম মনে হচ্ছে। যেন কেউ হাঁটছে রান্নাঘরে। থপথপ শব্দও হলো কয়েকবার। আনিস বলল, কে ? রান্নাঘরের শব্দটা হঠাৎ থেমে গেল। আনিস বলল, কে ? কে ? মনের ভুল নাকি ? আনিস যেন স্পষ্ট শুনল, রান্নাঘর থেকে কেউ-একজন বলল, আমি। স্পষ্ট এবং তীক্ষ্ণ আওয়াজ। মেয়েলি স্বর। নাকি রানুই বলছে ঘুমের ঘোরে ? এটাই হয়েছে। রানুরই গলা।

আনিস হাত বাড়িয়ে রানুকে কাছে টানল। রানু বলল, হাতটা সরিয়ে নাও গরম লাগছে। তার মানে কি রানু জেগে ছিল এতক্ষণ ?

রানু!

উঁ।

তুমি কি জেগে ছিলে ?

হ্যাঁ।

আমি যখন বললাম কে কে, তখন কি তুমি বলেছ, আমি ?

হ্যাঁ, বলেছি।

কিন্তু তুমি জবাব দিলে কেন ? তোমাকে তো কিছু জিজ্ঞেস করিনি। আমি জানতে চাচ্ছিলাম রান্নাঘরে কেউ আছে কিনা।

রানু ফিসফিস করে বলল, আমি তো রান্নাঘরেই ছিলাম। আমি রান্নাঘর থেকেই জবাব দিয়েছি।

আনিস চুপ করে গেল। বিছানায় উঠে বসে পরপর দুটি সিগারেট শেষ করল। বাথরুমে গিয়ে বাতি জ্বালিয়ে রেখে এলো। রান্নাঘরের বাতিও জ্বালিয়ে দিয়ে এলো। থাকুক, সারা রাত বাতি জ্বালানো থাকুক।

রানু!

কী ?

কাল তুমি আমার সঙ্গে একজন ডাক্তারের কাছে যাবে, কেমন ?

ঠিক আছে, যাব।

ডাক্তার সাহেব যা-যা জানতে চান, সব বলবে।

রানু জবাব দিল না। মনে হলো সে ঘুমিয়ে পড়েছে। শান্ত নির্বিঘ্ন ঘুম। কিন্তু রান্নাঘরে আবার শব্দ হচ্ছে। আনিসের মনে হলো সে স্পষ্ট চুড়ির টুনটুন শব্দ শুনছে। কাচের চুড়ির আওয়াজ। আনিস কয়েকবার ডাকল, কে, কে ওখানে ? কেউ কোনো জবাব দিল না। বাথরুম থেকে একটানা জল পড়ার শব্দ আসছে। বাড়িঅলাকে বলতে হবে কল ঠিক করে দিতে। একজন কাজের মানুষ রাখতে হবে। পুরুষমানুষ নয়, মেয়েমানুষ— যে রাত-দিন থাকবে। আত্মীয়স্বজন কাউকে এনে রাখলে ভালো

হতো। কিন্তু আনিসের তেমন কোনো আত্মীয়স্বজন নেই, যারা এখানে এসে থাকবে। আনিসের ঘুম এলো শেষরাতের দিকে।

মিসির সাহেবের সঙ্গে তারা প্রায় দু'ঘণ্টা সময় কাটাল।

রানু খুব সহজ-স্বাভাবিক আচরণ করল। এর প্রধান কৃতিত্ব সম্ভবত মিসির সাহেবের। তিনি খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে কথাবার্তা বললেন। এক পর্যায়ে রানু বলল, আপনি আমাকে তুমি করে বলবেন, আমি আপনার মেয়ের বয়সী।

মেয়ের বয়সী হলে কী, আমার তো মেয়ে নেই। বিয়েই করিনি।

রানু কিছু একটা বলতে গিয়েও বলল না। ভদ্রলোক সেটি লক্ষ করলেন।

তুমি কিছু বলতে চাচ্ছিলে ?

জি-না।

কিছু বলতে চাইলে বলতে পার।

না, আমি কিছু বলব না।

মিসির সাহেব চায়ের ব্যবস্থা করলেন। চা খেতে-খেতে নিতান্তই সহজ ভঙ্গিতে বললেন, আনিস সাহেব বলেছিলেন, তুমি যা স্বপ্নে দেখ তা-ই সত্যি হয়।

হুঁ।

যা স্বপ্নে দেখ তা-ই হয় ?

শুধু স্বপ্ন না, যা আমার মনে আসে তা-ই হয়।

বলো কী!

আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না, না ?

বিশ্বাস হবে না কেন ? পৃথিবীতে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার আছে। পৃথিবীটা বড় অদ্ভুত।

বলতে বলতে মিসির আলি ড্রয়ার খুলে চৌকা ধরনের চারটি কার্ড বের করলেন। হাসিমুখে বললেন, রানু এই কার্ডগুলোতে ডিজাইন আঁকা আছে। আমি একেকটি টেবিলের ওপর রাখব, ডিজাইনগুলি থাকবে নিচে। তুমি না দেখে বলতে চেষ্টা করবে।

রানু অবাক হয়ে বলল, না দেখে বলব কীভাবে ?

চেষ্টা করে দেখ। পারতেও তো পার। বলো দেখি এই কার্ডটিতে কী আঁকা আছে ?

কী আশ্চর্য, কী করে বলব ?

আন্দাজ করো। যা মনে আসে তা-ই বলো।

একটা ক্রস চিহ্ন আছে। ঠিক হয়েছে ?

তা বলব না। এবার বলো এটিতে কী আছে ?

খুব ছোট-ছোট সার্কেল।

ক'টি, বলতে পারবে ?

মনে হচ্ছে তিনটি। চারটিও হতে পারে।

মিসির সাহেব কার্ডগুলি ড্রয়ারে রেখে সিগারেট ধরালেন। তাঁকে কেমন যেন চিন্তিত মনে হতে লাগল। আনিস বলল, ও কি বলতে পেরেছে ? মিসির সাহেব তার জবাব না দিয়ে বললেন, রানু, এবার তুমি বলো, প্রথম ভয়টা তুমি কীভাবে পেলে। সবকিছু বলবে, কিছুই বাদ দেবে না, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করছি।

রানু চুপ করে রইল।

তুমি নিশ্চয়ই চাও, তোমার অসুখটা সেরে যাক। চাও না ?

চাই।

তাহলে বলো। কোনোকিছু বাদ দেবে না।

রানু তাকাল আনিসের দিকে। মিসির আলি বললেন, আনিস সাহেব, আপনি না হয় পাশের ঘরে গিয়ে বসেন। ঐ ঘরে অনেক বইপত্র আছে, বসে-বসে পড়তে থাকুন। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির কারেন্ট ইস্যুটা আছে, গতকালই এসেছে।

রানু বলতে শুরু করল। মিসির আলি শুনতে লাগলেন চোখ বন্ধ করে। একটি প্রশ্নও জিজ্ঞেস করলেন না। মাঝখানে একবার শুধু বললেন, পানি খাবে ? তৃষ্ণা পেয়েছে ? রানু মাথা নাড়ল। তিনি পানির জগ এবং গ্লাস নিয়ে এলেন। শান্ত স্বরে বললেন, চোখে-মুখে পানি দিয়ে নাও, ভালো লাগবে। রানু সে-সব কিছুই করল না। শান্ত ভঙ্গিতে বসে রইল। কথা বলতে লাগল স্পষ্ট স্বরে।

রানুর প্রথম গল্প

আমার বয়স তখন এগারো-বারো বৎসর। আমি মধুপুরে আমার এক চাচার বাড়িতে বেড়াতে গেছি। চাচাতো বোনের বিয়েতে। চাচাতো বোনটির নাম হচ্ছে অনুফা। খুবই ভালো মেয়ে। কিন্তু চাচা বিয়ে ঠিক করেছেন একটা বাজে ছেলের সঙ্গে। ছেলের প্রচুর জায়গা-টায়গা আছে, কিন্তু কিছুই করে না। দেখতেও বাজে, দাঁত উঁচু, মুখে বসন্তের দাগ। দারুণ বেঁটে। অনুফা আপার এই নিয়ে খুব মন-খারাপ। প্রায়ই এই নিয়ে কাঁদে। আমি তাকে সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আমি নিজে একটি বাচ্চা মেয়ে, তাকে কী সান্ত্বনা দেব ? তবে আমার সঙ্গে অনুফা আপার খুব ভাব ছিল। আমাকে অনেক গোপন কথাটথা বলত।

যাই হোক, গায়ে-হলুদের দিন খুব রঙ খেলা হলো। আমাদের ওদিকে রঙ খেলা হচ্ছে— উঠোনে কাদা ফেলে তাতে গড়াগড়ি খাওয়া। সারাদিন রঙ খেলে কাদা মেখে সবাই ভূত হয়ে গেছি। ঠিক করা হলো সবাই মিলে নদীতে গোসল সেরে আসবে। চাচা অবশ্যি আপত্তি করলেন— মেয়েছেলেরা নদীতে যাবে কী ?

চাচার আপত্তি অবশ্যি টিকল না। আমরা মেয়েরা সবাই দল বেঁধে নদীতে গোসল করতে গেলাম। বাড়ি থেকে অল্প কিছু দূরেই নদী। আমরা প্রায় ত্রিশ-চল্লিশ জন মেয়ে, খুব হৈচৈ হচ্ছে। সবাই মিলে মহানন্দে পানিতে ঝাঁপাঝাঁপি করছি। সেখানেও খুব কাদা ছোড়াছুড়ি শুরু হলো। ঠিক তখন একটা কাণ্ড হলো, মনে হলো একজন কে যেন আমার পা জড়িয়ে ধরছে। নির্ঘাত কেউ তামাশা করছে। আমি হাসতে-হাসতে বললাম— অ্যাই, ভালো হবে না। ছাড় বলছি, ছাড়। কিন্তু যে পা ধরেছে সে ছাড়ল না, হঠাৎ মনে হলো সে টেনে আমার পায়জামাটা খুলে ফেলতে চেষ্টা করছে। তখন আমি চিৎকার দিলাম। সবাই মনে করল কোনো-একটা তামাশা হচ্ছে। কেউ কাছে এলো না। কিন্তু ততক্ষণে আমার পায়জামাটা খুলে ফেলেছে আর, আর...। [এই সময় মিসির সাহেব বললেন, বুঝতে পারছি তারপর কী হলো ?]

সবার প্রথম অনুফা আপা ছুটে এসে আমাকে ধরলেন, তারপর অন্যরা ছুটে এলো। যে আমার পা জড়িয়ে ধরেছিল, সে আমাকে শক্ত করে চেপে ধরে গভীর জলের দিকে টেনে নিতে লাগল। তারপর আমার কিছু মনে নেই।

জ্ঞান হবার পর শুনেছি ওরা আমাকে বহু কষ্টে টেনে পাড়ে তুলেছে এবং দেখেছে একটা মরা মানুষ আমাকে জড়িয়ে ধরে রেখেছে। ঐ মরা মানুষটাকে গ্রামের লোকেরা নদীর পাড়ে মাটি চাপা দিয়েছিল। সেইসব কিছুই অবশ্যি আমি দেখিনি, শুনেছি। কারণ আমার কোনো জ্ঞান ছিল না। চাচা আমার চিকিৎসার জন্যে আমাকে ঢাকা নিয়ে এসেছিলেন। সবাই ধরে নিয়েছিল আমি বাঁচব না। কিন্তু বেঁচে গেলাম। এইটুকু আমার প্রথম ভয়ের গল্প।

রানু গল্প শেষ করে পুরো এক গ্লাস পানি খেল। মিসির আলি সাহেব বললেন, ঐ লোককে তুমি দেখনি ?

জি-না।

গ্রামের অন্যরা তো দেখেছে, কী রকম ছিল দেখতে ?

আমি জানি না, কাউকে জিজ্ঞেস করিনি। কেউ আমাকে কিছু বলেনি।

এরপর কি তুমি কখনো তোমার চাচার বাড়ি গিয়েছিলে ?

জি-না, কখনো যাইনি।

আরেকটা কথা তুমি বলছিলে। ঐ লোকটি তোমার পায়জামা টেনে খুলে ফেলতে চেষ্টা করছিল। তোমাকে যখন টেনে তোলা হলো তখন কি পায়জামা পরনে ছিল ?

জি-না, ছিল না।

মিসির আলি সাহেব সিগারেট ধরিয়ে নিচু গলায় বললেন, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে কোনো একটি জিনিস তুমি আমাকে বলোনি। কিছু-একটা বাদ দিয়ে গেছ।

রানু জবাব দিল না।

যে-জিনিসটা বাদ দিয়েছ, সেটা আমার শোনা দরকার। সেটা কী, বলবে ?

অন্য আরেকদিন বলব।

ঠিক আছে, অন্য একদিন শুনব। তোমাকে আসতে হবে না, আমি গিয়ে শুনে আসব।

রানু কিছু বলল না। মিসির আলি সাহেব কিছুক্ষণ ভুরু কুঁচকে থেকে হঠাৎ বললেন, যখন তুমি একা থাক, তখন কি কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলে ?

হ্যাঁ।

মিসির আলি খুব উৎসাহ বোধ করলেন।

ব্যাপারটা গুছিয়ে বলো।

মাঝে-মাঝে কে যেন আমাকে নাম ধরে ডাকে।

পুরুষদের গলায় ?

জি-না। মেয়েদের গলায়।

শুধু ডাকে, অন্য কিছু বলে না ?

জি-না।

এবং যে ডাকে তাকে কখনো দেখা যায় না।

জি-না।

এটা প্রথম কখন হয় ? অর্থাৎ প্রথম কখন শুনলে ? নদীর ব্যাপারটা ঘটার আগেই ?

হুঁ।

কত দিন আগে ?

আমার ঠিক মনে নেই।

আচ্ছা ঠিক আছে, আজ এই পর্যন্তই।

রানুরা উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি ভারি গলায় বললেন, আবার দেখা হবে। রানু কিছু বলল না। আনিস বলল, আমরা তাহলে যাই ?

আচ্ছা, ঠিক আছে।

মিসির আলি ওদের রিকশা পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এলেন। ওরা রিকশায় উঠবার সময় তিনি হঠাৎ বললেন, রানু! যে তোমার পা জড়িয়ে ধরেছিল, ওর নাম কী ?

ওর নাম জালালউদ্দিন।

কী করে জানলে, ওর নাম জালালউদ্দিন ?

রানু তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না। মিসির আলি সাহেব বললেন, ঠিক আছে, পরে কথা হবে।

রিকশায় ওরা দুজনে কোনো কথা বলল না। আনিসের একবার মনে হলো, রানু কাঁদছে। সে সিগারেট ধরিয়ে সহজ স্বরে বলল, ভদ্রলোককে তোমার কেমন লাগল রানু ?

ভালো। বেশ ভালো লোক। উনি আসলে কী করেন ?

উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন পার্ট-টাইম টিচার। ক্লিনিক্যাল সাইকিয়াট্রি পড়ান। খুব জ্ঞানী লোক।

ইউনিভার্সিটির টিচাররা এমন রোগা হয়, তা তো জানতাম না! আমার ধারণা ছিল তাঁরা খুব মোটাসোটা হন।

রানু শব্দ করে হাসল। আনিস বলল, আজ বাইরে খাওয়া-দাওয়া করলে কেমন হয় ?

শুধু-শুধু টাকা খরচ।

তোমার গিয়ে রান্না চড়াতে হবে না। চল না, কিছু পয়সা খরচ হোক।

কোথায় খাবে ?

আছে আমার একটা চেনা জায়গা। নানরুটি আর কাবাব। কী বলো ?

৬

মিসির আলি সাহেব দেখলেন তাঁর ঘরের সামনে চারটি মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

কোনো টিউটোরিয়েল ক্লাস আছে নাকি ? আজ বুধবার, টিউটোরিয়েল ক্লাস থাকার কথা নয়। তবে কে জানে হয়তো নতুন রুটিন দিয়েছে। তিনি এখনো নোটিশ পান নি।

এই, তোমাদের কী ব্যাপার ?

মেয়েগুলো জড়সড় হয়ে গেল।

কী, তোমাদের সঙ্গে কোনো ক্লাস আছে ?

জি-না স্যার।

তাহলে কী ? কিছু বলবে ?

স্যার, নোটিশ-বোর্ডে আপনি একটি নোটিশ দিয়েছিলেন, সেই জন্যে এসেছি।

কিসের নোটিশ ?

তিনি ভুরু কোঁচকালেন। মেয়েগুলো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগল।

কী নোটিশ দিয়েছিলাম ?

স্যার, আপনি লিখেছেন— কারো এক্সট্রাসেন্সরি পারসেপশনের ক্ষমতা আছে কিনা আপনি পরীক্ষা করে বলে দেবেন।

মিসির আলি সাহেবের সমস্ত ব্যাপারটা মনে পড়ল। মাস দুয়েক আগে এ রকম একটা নোটিশ দিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু এই প্রথম চারজনকে পাওয়া গেল, যারা

উৎসাহী এবং সব ক'টি মেয়ে। মেয়েগুলো রোগা। তার মানে কি অকল্টের ব্যাপারে রোগা মেয়েরাই বেশি উৎসাহী? তিনি মনে-মনে একটা নোট তৈরি করলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁর মনে হলো বিষয়টি ইন্টারেস্টিং। একটা সার্ভে করা যেতে পারে।

এসো তোমরা। ঘরে এসো। তোমরা তাহলে জানতে চাও তোমাদের ইএসপি আছে কিনা?

মেয়েগুলো কথা বলল না। যেন একটু ভয় পাচ্ছে। মুখ সবারই শুকনো।

বসো তোমরা। চেয়ারে আরাম করে বসো।

ওরা বসল। মিসির আলি সাহেব একটা সিগারেট ধরালেন। নিচু গলায় বললেন, সব মানুষের মধ্যেই ইএসপি কিছু পরিমাণ থাকে। টেলিপ্যাথির কথাই ধর। তোমাদের নিজেদেরই হয়তো এ-বিষয়ে অভিজ্ঞতা আছে। সহজ উদাহরণ হচ্ছে, ধর একদিন তোমাদের কারো মনে হলো আজ অমুকের সাথে দেখা হবে। যার সঙ্গে দেখা হবার কথা মনে হচ্ছে, সে কিন্তু এখানে থাকে না। থাকে চিটাগাং। কিন্তু সত্যি-সত্যি দেখা হয়ে গেল। কী, হয় না এরকম?

মেয়েগুলো কথা বলল না। এর মধ্যে একজন রুমাল দিয়ে কপাল মুছতে লাগল। মেয়েটি ঘামছে। নার্ভাস হয়ে পড়ছে মনে হয়। নিশ্চয়ই ব্লাড-প্রেসার বেড়ে গেছে। মিসির আলি বিস্মিত হলেন। নার্ভাস মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললেন, এই বিষয়ের চর্চা এখনো বিজ্ঞানের পর্যায়ে পড়ে না। বেশির ভাগ সিদ্ধান্তই অনুমানের ওপর। তবে আমেরিকায় একটি ইউনিভার্সিটি আছে— ডিউক ইউনিভার্সিটি। ওরা কিছু-কিছু এক্সপেরিমেন্টাল কাজ শুরু করেছে। মুশকিল হচ্ছে, ফলাফল সবসময় রিপ্রডিউসিবল নয়।

মিসির আলি সাহেব ড্রয়ার খুলে দশটি চৌকো কার্ড টেবিলে বিছালেন। হাসিমুখে বললেন, পরীক্ষাটি খুব সহজ। এই কার্ডগুলোতে বিভিন্ন রকম চিহ্ন আছে। যেমন ধর ক্রস, স্কয়ার, ত্রিভুজ, বিন্দু। কোনটিতে কী আছে সেটা অনুমান করতে চেষ্টা করবে। দু-একবার কাকতালীয়ভাবে মিলে যাবে। তবে ফলাফল যদি স্ট্যাটিসটিক্যালি সিগনিফিকেন্ট হয়, তাহলে বুঝতে হবে তোমাদের ইএসপি আছে। এখন এসো দেখি, কে প্রথম বলবে? তোমার কী নাম?

নীলুফার।

হ্যাঁ নীলুফার, তুমিই প্রথম চেষ্টা করো। যা মনে আসে তা-ই বলো।

আমার কিছু মনে আসছে না।

তাহলে অনুমান করে বলো।

মেয়েটি ঠিকমতো বলতে পারল না। তার সঙ্গীরাও না। মিসির আলি হাসতে-হাসতে বললেন, নাহ্ তোমাদের কারো কোনো ইএসপি নেই। ওরা যেন তাতে খুশিই হলো। মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, না থাকাই ভালো। আধুনিক মানুষদের এ-সব থাকতে নেই। এতে অনেক রকম জটিলতা হয়।

কী জটিলতা ?

আছে, আছে।

বলুন না স্যার।

মিসির আলি লক্ষ করলেন, নীলুফার নামের মেয়েটিই কথা বলছে। স্পষ্ট সতেজ গলা।

অন্য আরেকদিন বলব! আজ তোমরা যাও।

নীলুফার বলল, এমন কিছু কি স্যার আছে, যা করলে ইএসপি হয় ?

লোকজন বলে, প্রেমে পড়লেও এই ক্ষমতাটা অসম্ভব বেড়ে যায়। আমি ঠিক জানি না। তোমরা যদি কেউ কখনো প্রেমে পড়, তাহলে এসো, পরীক্ষা করে দেখব।

কথাটা বলেই মিসির আলি অপ্রস্তুত বোধ করলেন। ছাত্রীদের এটা বলা ঠিক হয়নি। কথাবার্তায় তাঁর আরো সাবধান হওয়া উচিত। এ রকম হালকা ভঙ্গিতে কথা বলা ঠিক হচ্ছে না।

স্যার, আমরা যাই ?

আচ্ছা ঠিক আছে, দেখা হবে।

মিসির আলি নিচের টিচার্স লাউঞ্জে চা খেতে এলেন। বেলা প্রায় তিনটা। লাউঞ্জে লোকজন নেই। পলিটিক্যাল সায়েন্সের রশিদ সাহেব এক কোনায় বসে ছিলেন। তিনি অস্পষ্ট স্বরে ডাকলেন, এই যে মিসির সাহেব, অনেকদিন পর মনে হয় এলেন এদিকে। চা খাবেন ?

হুঁ।

কে যেন বলছিল, আপনি নাকি ভূতে-ধরা সারাতে পারেন। ঠিক নাকি ?

জি-না। আমি ওঝা নই।

রাগ করলেন নাকি ? আমি কথার কথা বললাম।

না, রাগ করব কেন ?

আচ্ছা মিসির আলি সাহেব, আপনি ভূত বিশ্বাস করেন ?

না।

রশিদ সাহেব উৎসাহিত হয়ে উঠলেন।

আত্মা, আত্মায় বিশ্বাস করেন ?

না ভাই, আমি একজন নাস্তিক।

আত্মা নেই— এই জিনিসটা কি প্রমাণ করতে পারবেন ? কী কী যুক্তি আছে আপনার হাতে ?

মিসির আলি একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। রশিদ সাহেব বললেন, আত্মা যে আছে, এর পক্ষে বিজ্ঞানীদের কিছু চমৎকার যুক্তি আছে।

থাকলে তো ভালোই। বিজ্ঞানীরা জড়জগৎ বাদ দিয়ে আত্মা-টাত্মা নিয়ে উৎসাহী হলেই কিন্তু ঝামেলা। রশিদ সাহেব, আমার মাথা ধরেছে। এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না। কিছু মনে করবেন না।

মিসির আলি চা না খেয়েই উঠে পড়লেন। তাঁর সত্যি-সত্যি মাথা ধরেছে। প্রচণ্ড ব্যথা। বড় রকমের কোনো অসুখের একটা পূর্বলক্ষণ।

৭

নীলু ইউনিভার্সিটি থেকে ফিরে এসে দেখে, তার বিছানার ওপর চমৎকার একটি প্যাকেট পড়ে আছে। ব্রাউন কাগজে মোড়া প্যাকেটে গোটা-গোটা করে তার নাম লেখা। নীলুর বুক কেঁপে উঠল, বিলুর চোখে পড়েনি তো ? বিলুর খুব খারাপ অভ্যাস আছে, অন্যের চিঠি খুলে-খুলে পড়বে। হাসাহাসি করবে।

নীলু দরজা বন্ধ করেই প্যাকেটটি খুলল। ছোট্ট চিঠি, কিন্তু কী চমৎকার করেই না লেখা :

> কল্যাণীয়াসু,
>
> ইচ্ছা করেই তোমাকে আমি কম লিখি। তোমার চিঠি পড়ে পড়ে খুব মায়া জন্মে যায়। এ বয়সে আমার আর মায়া বাড়াতে ইচ্ছে করে না। মায়া বাড়ালেই কষ্ট পেতে হয়। আরেকটি সামান্য উপহার পাঠালাম। গ্রহণ করলে খুব খুশি হব।
>
> আহমেদ সাবেত

উপহারটি বড় সুন্দর। নীল রঙের একটি ডায়েরি। অসম্ভব নরম প্লাস্টিকের কভার, যেখানে ছোট্ট একটি শিশুর ছবি। পাতাগুলো হালকা গোলাপি। প্রতিটি পাতায় সুন্দর সুন্দর দু'লাইনের কবিতা। ডায়েরিটির প্রথম পাতায় ইংরেজিতে লেখা

> I wish I could be eighteen again
>
> A.S

পড়তে গিয়ে কেন জানি নীলুর চোখে জল এলো। একজন সম্পূর্ণ অজানা অচেনা মানুষের জন্যে মন কেমন করতে লাগল। লোকটি দেখতে কেমন কে জানে ? সুন্দর নয় নিশ্চয়ই। বয়স্ক মানুষ, হয়তো চুলটুল পেকে গেছে। তাতে কিছু যায় আসে না। মানুষের বয়স হচ্ছে তার মনে। মন যতদিন কাঁচা থাকে, ততদিন মানুষের বয়স বাড়ে না। এই লোকটির মন অসম্ভব নরম। শিশুর মতো নরম। নীলুর মনে হলো এই লোকটি স্বামী হিসেবে অসাধারণ ছিল। তার স্ত্রীকে সে নিশ্চয়ই সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবেসেছে।

নীলু রাতেরবেলা দরজা বন্ধ করে দীর্ঘ একটা চিঠি লিখল— আপনি এমন কেন ? নিজের কথা তো কিছুই লেখেননি। অথচ আমি আমার সমস্ত কথা লিখে বসে আছি।

তবু মনে হয় সব বুঝি লেখা হলো না। অনেক কিছু বুঝি বাকি রয়ে গেল। আপনি আমাকে এত সুন্দর-সুন্দর উপহার দিয়েছেন, কিন্তু আমি তো আপনাকে কিছুই দিইনি। আমার কিছু একটা দিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু আমি তো জানি না আপনি কী পছন্দ করেন। আচ্ছা, আপনি কি টাই পরেন ? তাহলে লাল টকটকে একটা টাই আপনাকে দিতে পারি। জানেন, পুরুষ মানুষের এই একটি জিনিসই আমি পছন্দ করি। কিন্তু হয়তো আপনি টাই পরেন না, ঢিলেঢালা ধরনের মানুষদের মতো চাদর গায়ে দেন। আপনার সম্পর্কে আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। একদিন আসুন না আমাদের বাসায়, এক কাপ চা খেয়ে যাবেন। জানেন, আমি খুব ভালো চা বানাতে পারি। অন্য কেউ চা বানিয়ে দিলে আমার বাবা খেতে পারেন না। সব সময় আমাকে বানাতে হয়। গত রোববারে কী হলো, জানেন ? রাত তিনটেয় বাবা আমাকে ডেকে তুলে বললেন— মা, এক কাপ চা বানা তো, বড্ড চায়ের তৃষ্ণা পেয়েছে।

আপা, দরজা বন্ধ করে কী করছ ?

নীলু অপ্রস্তুত হয়ে দরজা খুলল। বিলু দাঁড়িয়ে আছে। সন্দেহজনকভাবে তাকাচ্ছে।

কী করছিলে ?

কিছু করছিলাম না।

বিলু বিছানায় এসে বসল, আপা, তোমার মধ্যে একটা পরিবর্তন লক্ষ করছি।

কী পরিবর্তন ?

অস্থির-অস্থির ভাব। লক্ষণ ভালো না আপা। বলো তো কী হয়েছে ?

কী আবার হবে ? তোর শুধু উল্টোপাল্টা কথা।

কিছু একটা হয়েছে আপা। আমি জানি।

কী যে বলিস!

আমার কাছে লুকোতে পারবে না আপা। আমার চোখকে ফাঁকি দেওয়া মুশকিল।

যা ভাগ, পাকামো করিস না।

বিলু গেল না। কাপড় ছাড়তে-ছাড়তে বলল, রানু আপাকেও আমি বললাম তোমার পরিবর্তনের কথা। তারও ধারণা, তুমি কারো প্রেমে পড়েছ।

হুঁ, আমার তো খেয়েদেয়ে কাজ নেই। তাছাড়া প্রেমটা আমার সঙ্গে করবে কে ? চেহারার এই তো অবস্থা।

খারাপ অবস্থাটা কী ? রঙটা একটু ময়লা। এছাড়া আর কী ?

নীলু ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল।

নিশ্বাস ফেলছ কেন আপা ? নিজের চেহারা সম্পর্কে তোমার এমন খারাপ ধারণা থাকা উচিত না। সবাই তো আর রানু আপার মতো হয় না, হওয়া উচিত নয়।

উচিত নয় কেন ?

সুন্দরী মেয়েদের অনেকরকম প্রবলেম থাকে।

কী প্রবলেম ?

রানু আপার মাথা খারাপ— সেটা তুমি জানো ?

কী বলছিস এসব ?

ঠিকই বলছি। আকবরের মা একদিন দুপুরে কী জন্যে যেন গিয়েছিল, শোনে রানু আপা নিজের মনে হাসছে এবং কথা বলছে।

তাই নাকি ?

হুঁ। রহমান সাহেবের স্ত্রী বললেন, একদিন নাকি আনিস সাহেব গভীর রাতে রহমান সাহেবকে ডেকে নিয়ে গেলেন তার স্ত্রীর খুব অসুখ, এই কথা বলে। রহমান সাহেব গিয়ে দেখেন অসুখ-টসুখ কিছু নেই, দিব্যি ভালো মানুষ।

নীলু মৃদু স্বরে বলল, রানুর মতো সুন্দরী হলে আমি পাগল হতেও রাজি।

বিলু হেসে ফেলল। হাসতে হাসতে বলল, কথাটা ঠিক বলেছ আপা।

রানু প্রসঙ্গে পাওয়া সব তথ্য লিখে রাখবার জন্যে মিসির আলি সাহেব মোটা একটা খাতা কিনে এনেছেন। খাতাটির প্রথম পাতায় লেখা—

একজন মানসিক রোগীর পর্যায়ক্রমিক মনোবিশ্লেষণ। দ্বিতীয় পাতায় কিছু ব্যক্তিগত তথ্য যেমন—

নাম : রানু আহমেদ।

বয়স : সতের বৎসর (রূপবতী)

বৈবাহিক অবস্থা : বিবাহিতা (তের মাস আগে বিয়ে হয়)

স্বাস্থ্য : রুগ্‌ণা।

ওজন : আশি পাউন্ড।

স্বামী আনিস আহমেদ। দি জেনিথ ইন্টারন্যাশনালের ডিউটি অফিসার। বয়স ৩৭, স্বাস্থ্য ভালো।

তৃতীয় পাতার হেডিং হচ্ছে— 'অডিটরি হেলুসিনেশন।' এর নিচে লাল কালি দিয়ে একটা বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন আঁকা। এই পাতায় অনেক কিছুই লেখা হয়েছে, আবার কাটাকুটি করা হয়েছে। যেন মিসির আলি সাহেব মনস্থির করতে পারছেন না কী লিখবেন। দু'টি লাইন শুধু পড়া যায়। লাইন দু'টির নিচে লাল কালি দিয়ে দাগ দেয়া।

> মেয়েটির অডিটরি হেলুসিনেশন হচ্ছে সে একা থাকাকালীন শুনতে পায় কেউ যেন তাকে ডাকছে।

পরের কয়েক পাতায় রানুর সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের খুঁটিনাটি প্রতিটি বিষয় লেখা। এ পাতাগুলি পড়লেই বোঝা যায়, মিসির আলি নামের এই লোকটির স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। অতি তুচ্ছ ব্যাপারগুলোও লেখা আছে। যেমন, এক জায়গায় লেখা— মেয়েটি বেশ কয়েকবার শাড়ির আঁচল টেনেছে। দু'বার শব্দ করে আঙুল ফুটিয়েছে। আমি লক্ষ করলাম মেয়েটি পানি খেল মাথা নিচু করে। বেশ খানিকটা নিচু করে। যেন পানি পান করার ব্যাপারটি সে আড়াল করতে চায়।

নদীতে গোসলের গল্পটি লেখা আছে। গল্পের শেষে বেশকিছু প্রশ্ন করা আছে। যেমন—

- একজন মৃত মানুষ পানিতে ভেসে থাকবে। ডুবে থাকবে না। গল্পে মৃত মানুষটির ডুবে-ডুবে চলার কথা আছে। এরকম থাকার কথা নয়।
- পাজামা খুলে ফেলার কথা আছে। কিশোরীরা সাধারণত শক্ত গিঁট দিয়ে পাজামা পরে। গিঁট খুলতে হলে ফিতা টানতে হবে। ঐ মানুষটি কি ফিতা টেনেছিল, না পাজামাটাই টেনে নামিয়েছে?
- মৃত লোকটির কি কোনো পোস্টমর্টেম হয়েছিল?
- তার আনুমানিক বয়স কত ছিল?
- প্রথম অসুস্থতার সময় কি মেয়েটি ঘুমের মধ্যে কোনো কথাবার্তা বলত? কী বলত?
- মেয়েটি বলল লোকটির নাম জালালউদ্দিন। কীভাবে বলল? লোকটির নাম তো জানার কথা নয়। নাকি পরে শুনেছে?
- জালালউদ্দিন জাতীয় নামের কারো সঙ্গে কি এই মেয়েটির পূর্বপরিচয় ছিল?

প্রশ্নের শেষে তিনটি মন্তব্য লেখা আছে। মন্তব্যগুলো সংক্ষিপ্ত। প্রথম মন্তব্য— মেয়েটি যে-ঘটনার কথা বলেছে, তা বিশ্বাসযোগ্য নয়। দ্বিতীয় মন্তব্য— এই ঘটনা অন্য যে-সব ব্যক্তি প্রত্যক্ষ করেছে তাদের সঙ্গে প্রথমে আলাপ করতে হবে। দ্বিতীয় মন্তব্যটি লাল কালি দিয়ে আন্ডারলাইন করা ও পাশে লেখা— অত্যন্ত জরুরি। তৃতীয় মন্তব্য— মেয়েটির অবশ্যই কিছু পরিমাণ এক্সট্রাসেন্সরি পারসেপশন আছে। সে কার্ডের সব ক'টি চিহ্ন সঠিকভাবে বলতে পেরেছে। আমি এরকম আগে কখনো দেখিনি। এই বিষয়ে আমার ধারণা হচ্ছে, মানসিকভাবে অসুস্থ রোগীদের এই দিকটি উন্নত হয়ে থাকে। আমি এর আগেও যে ক'টি অসুস্থ মানুষ দেখেছি, তাদের সবার মধ্যেই এই ক্ষমতাটি কিছু পরিমাণে লক্ষ করেছি। দি জার্নাল অব প্যারাসাইকোলজির তৃতীয় ভল্যুমে (১৯৭৩) এই প্রসঙ্গে রিভিউ পেপার আছে। অথর জন নান এবং এফ টলম্যান।

৮

সোহাগী হাইস্কুলের হেডমাস্টার সাহেব দারুণ অবাক হলেন। রানুর ব্যাপারে খোঁজখবর করার জন্যে এক ভদ্রলোক এসেছেন— এর মানে কী ? অতদিন আগে কী হয়েছিল, না-হয়েছিল, তা কি এখন আর কারো মনে আছে ? আর মনে থাকলেও এইসব ব্যাপার নিয়ে এখন ঘাঁটাঘাঁটি করাটা বোধহয় ঠিক নয়। কিন্তু যে ভদ্রলোক এসেছেন, তাঁকে মুখের ওপর না বলতেও বাধছে। ভদ্রলোক হাজার হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক। মানী লোক। তা ছাড়া এত দূর এসেছেন, নিশ্চয়ই কোনো কারণ আছে। মুখে বলছেন রানু অসুস্থ এবং তিনি রানুর একজন চিকিৎসক। কিন্তু এটা ঠিক বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। কারণ মাসখানেক আগেই রানুকে তিনি দেখে এসেছেন। কিছুমাত্র অসুস্থ মনে হয়নি। আজ হঠাৎ এমন কী হয়েছে যে ঢাকা থেকে এই ভদ্রলোককে আসতে হলো ?

রানুর কী হয়েছে বললেন ?

মানসিকভাবে অসুস্থ।

আমি তো সেদিনই তাকে দেখে এলাম।

যখন দেখেছেন তখন হয়তো সুস্থই ছিল।

কী জানতে চান আপনি, বলেন।

নদীতে গোসলের সময় কী ঘটেছিল, সেটা বলেন।

সে-সব কি আর এখন মনে আছে ?

ঘটনাটা বেশ সিরিয়াস এবং নিশ্চয়ই আপনাদের মধ্যে বহুবার আলোচিত হয়েছে, কাজেই মনে থাকার কথা। আপনার যা মনে আসে তাই বলেন।

হেডমাস্টার গম্ভীর স্বরে ঘটনাটা বললেন। রানুর গল্পের সঙ্গে তাঁর গল্পের কোনো অমিল লক্ষ করা গেল না। শুধু ভদ্রলোক বললেন, মেয়েরা গোসল করতে গিয়েছিল দুপুরে, সন্ধ্যায় নয়।

পায়জামা খোলার ব্যাপারটি বলেন। পায়জামাটা কি পাওয়া গিয়েছিল ?

আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি না।

রানু বলছিল, নদীতে গোসল করবার সময় সেই মরা মানুষটি তার পায়জামা খুলে ফেলে।

আরে না না, কী বলেন!

ওর পরনে পায়জামা ছিল ?

হ্যাঁ, থাকবে না কেন ?

আপনার ঠিক মনে আছে তো ?

মনে থাকবে না কেন ? পরিষ্কার মনে আছে। আপনি অন্য সবাইকেও জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।

ঐ মরা মানুষটি সম্পর্কে কী জানেন ?

কিছুই জানি না রে ভাই। থানায় খবর দিয়েছিলাম। থানা হচ্ছে এখান থেকে দশ মাইল। সেই সময় যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো ছিল না। থানাঅলারা আসে দু'দিন পরে। লাশ তখন পচে-গলে গিয়েছে। শিয়াল-কুকুর কামড়াকামড়ি করছে। থানাঅলারা এসে আমাদের লাশ পুঁতে ফেলতে বলে। আমরা নদীর ধারেই গর্ত করে পুঁতে ফেলি।

আচ্ছা, ঐ লাশটি তো উলঙ্গ ছিল, ঠিক না ?

জি-না ঠিক না। হলুদ রঙের একটা প্যান্ট ছিল আর গায়ে গেঞ্জি ছিল।

মিসির সাহেবের ভুরু কুঞ্চিত হলো।

আপনার ঠিক মনে আছে তো ভাই ?

আরে, এটা মনে না থাকার কোনো কারণ আছে ? পরিষ্কার মনে আছে।

লাশটি কি বুড়ো মানুষের ছিল ?

জি না, জোয়ান মানুষের লাশ।

আর কিছু মনে পড়ে ?

আর কিছু তো নেই মনে পড়ার।

আপনার ঐ মেয়েটির সঙ্গে কথা বলতে চাই, অনুফা যার নাম। শুনেছি ওর শ্বশুরবাড়ি কাছেই।

হরিণঘাটায়। আপনি যেতে চান হরিণঘাটা ?

জি।

কখন যাবেন ?

আজকেই যেতে পারি। কত দূর এখান থেকে ?

পনের মাইল। বেবিট্যাক্সি করে যেতে পারেন।

রাতে ফিরে আসতে পারব ?

তা পারবেন।

বেশ, তাহলে আপনি আমাকে ঠিকানা দিন।

দেব। বাড়িতে চলেন, খাওয়া-দাওয়া করেন।

আমি হোটেল থেকে খেয়েদেয়ে এসেছি।

তা কি হয়! অতিথি মানুষ, আসুন আসুন।

ভদ্রলোক বাড়িতে নিয়ে গেলেন ঠিকই, কিন্তু বড়ই গম্ভীর হয়ে রইলেন।

মাথার ওপর হঠাৎ এসে পড়া উপদ্রবে তাঁকে যথেষ্ট বিরক্ত মনে হলো। ভালো করে কোনো কথাই বললেন না। অকারণে বাড়ির একজন কামলার ওপর প্রচণ্ড হম্বিতম্বি শুরু করলেন।

কিন্তু অনুফার বাড়িতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার ঘটল। মেয়েটি আদর-যত্নের একটি মেলা বাধিয়ে ফেলল। মিসির আলি অবাক হয়ে দেখলেন, মেয়েটির স্বামী সন্ধ্যাবেলাতেই জাল নিয়ে পুকুরে নেমে গেছে। অনুফা পরিচিত মানুষের মতো আদুরে গলায় বলল, রাতে ফিরবেন কি— কাল সকালে যাবেন। লোকজন মিসির আলিকে দেখতে এলো। এরা বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। মেয়েটিও মনে হয় বেশ ক্ষমতা নিয়ে আছে। সবাই তার কথা শুনছে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে তাঁকে গোসলের জন্যে গরম পানি করে দেওয়া হলো। একটা বাটিতে নতুন একটা গায়ে মাখার সাবান। মোড়কটি পর্যন্ত ছেঁড়া হয়নি। বাংলাঘরে নতুন চাদর বিছিয়ে বিছানা করা হলো। মেয়েটির বৃদ্ধ শ্বশুর একটি ফর্সি হুক্কাও এনে দিলেন এবং বারবার বলতে লাগলেন, খবর না দিয়ে আসার জন্যে ঠিকমতো খাতির-যত্ন করতে না পেরে তিনি বড়ই শরমিন্দা। তবে যদি কালকের দিনটা থাকেন, তবে তিনি হরিণঘাটার বিখ্যাত মাগুর মাছ খাওয়াবেন। খাওয়াতে না পারলে তিনি বাপের ব্যাটা না— ইত্যাদি ইত্যাদি।

মিসির আলির বিস্ময়ের সীমা রইল না। তিনি সত্যি-সত্যি একদিন থেকে গেলেন। মিসির আলি সাহেব এরকম কখনো করেন না।

৯

রানু মৃদু স্বরে বলল, ভেতরে আসব?

এসো রানু, এসো।

গল্প করতে এলাম।

খুব ভালো করেছে।

নীলু উঠে গিয়ে রানুর হাত ধরল। রানু বলল, তুমি কাঁদছিলে নাকি, চোখ ভেজা! নীলু কিছু বলল না। রানু বলল, এত কিসের দুঃখ তোমার যে দুপুরবেলায় কাঁদতে হয়?

তোমার বুঝি কোনো দুঃখ-টুঃখ নেই?

উঁহু। আমি খুব সুখী।

রানু হাসতে লাগল। নীলু হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, তুমি বলেছিলে, একটা খুব অদ্ভুত কথা আমাকে বলবে।

বলেছিলাম নাকি?

হ্যাঁ। আজ সেটা বলতে হবে। তারপর আমি আমার একটা অদ্ভুত কথা বলব।

রানু হাসতে লাগল।

হাসছ কেন রানু?

তোমার অদ্ভুত কথাটা আমি জানি, এই জন্যে হাসছি।

কী আবোলতাবোল বলছ! তুমি জানবে কী ?

জানি কিন্তু।

নীলু গম্ভীর হয়ে বলল, জানলে বলো তো।

তোমার একজন প্রিয় মানুষ তোমার সঙ্গে দেখা করতে রাজি হয়েছে। ঠিক না ?

নীলু দীর্ঘ সময় কোনো কথাবার্তা বলল না। রানু বলল, কি ভাই, বলতে পারলাম তো ?

হ্যাঁ, পেরেছ।

ও কি বাসায় আসবে ?

বলব তোমাকে। তার আগে তুমি বলো, তুমি কী করে জানলে ? বিলু তোমাকে বলেছে ? কিন্তু বিলু তো কিছু জানে না!

আমাকে কেউ কিছু বলেনি।

তাহলে তুমি জানলে কী করে ?

আমি স্বপ্ন দেখেছি।

স্বপ্ন দেখেছি মানে ?

নীলু, মাঝে-মাঝে আমি স্বপ্ন দেখি। সেগুলি ঠিক স্বপ্নও নয়। তবে অনেকটা স্বপ্নের মতো। সেগুলি সব সত্যি। গত রাতে স্বপ্নে দেখলাম, তুমি একটি চিঠি পেয়ে খুব খুশি। সেই চিঠিতে একটি লাইন লেখা আছে, যার মানে হচ্ছে— তোমার সঙ্গে আমার দেখা হবে বা এই রকম কিছু।

এসব কি তুমি সত্যি-সত্যি বলছ রানু ?

হ্যাঁ। কবে তাঁর সঙ্গে তোমার দেখা হবে ?

আজ বিকেলে। আমি নিউ মার্কেটের বইয়ের দোকানের সামনে একটা সবুজ রুমাল হাতে দাঁড়িয়ে থাকব। তিনি আমাকে খুঁজে বের করবেন।

বাহ্, খুব মজার ব্যাপার তো!

রানু হাসতে লাগল। এক সময় হাসি থামিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, শুধু গল্প-উপন্যাসেই এসব হয়। বাস্তবে এই প্রথম দেখছি। তোমার ভয় করছে না ?

ভয় করবে কেন ?

তোমার কিন্তু নীলু ভয় করছে। আমি বুঝতে পারছি। বেশ ভয় করছে। করছে না ?

নাহ্।

রানু ইতস্তত করে বলল, ইচ্ছা করলে তুমি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পার। আমি দূরে থাকব।

থাক, দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না।

মনে হলো নীলু রানুর কথাবার্তা সহজভাবে নিতে পারছে না। তার চোখ-মুখ গম্ভীর। রানু বলল, কী নেবে ?

না। আমার একা যাবার কথা, একাই যাব।

আর যদি গিয়ে দেখ, খুব বাজে ধরনের একটা লোক। তখন কী করবে ?

বাজে ধরনের লোক মানে ?

অর্থাৎ যদি গিয়ে দেখ দাঁত পড়া, চুল পাকা এক বুড়ো ?

তোমার কি সেরকম মনে হচ্ছে ?

রানু মাথা দুলিয়ে হাসল, কিছু বলল না। নীলুকে দেখে মনে হলো রানুর ব্যবহারে সে বেশ বিরক্ত হচ্ছে। দুটো বাজতেই সে বলল, এবার তুমি যাও, আমি সাজগোজ করব।

এখনই ? চারটা বাজতে তো দেরি আছে।

তোমার মতো সুন্দরী তো আমি না। আমাকে সময় নিয়ে সাজতে হবে।

রানু উঠে পড়ল। নীলু সত্যি সাজতে বসল। কিন্তু কী যে হয়েছে তার, চোখে পানি এসে কাজল ধুয়ে যাচ্ছে। আইল্যাশ পরার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একা-একা পরা সম্ভব নয়। অনেক বেছেটেছে একটা শাড়ি পছন্দ করল। সাদার ওপর নীলের একটা প্রিন্ট। আগে সে কখনো পরেনি।

নীলু মা, কোথাও যাচ্ছ নাকি ?

নীলু তাকিয়ে দেখল— বাবা।

কোথাও যাচ্ছ গো মা ?

একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। তোমার কি চা লাগবে ?

হলে ভালো হতো। থাক, তুই ব্যস্ত।

চা বানাতে আর কয় মিনিট লাগবে! তুমি বসো, আমি বানিয়ে আনছি।

নীলুর বাবা চেয়ার টেনে নীলুর ঘরেই বসলেন।

চা কি চিনি ছাড়া আনব বাবা ?

না, এক চামচ চিনি দিস। একটু আধটু চিনি খেলে কিছু হবে না।

নীলু চা নিয়ে এসে দেখে বাবা ঝিমুচ্ছেন। ঝিমুনিরও বেশি, প্রায় ঘুমাচ্ছেন বলা চলে। বাবা যেন বড় বেশি দ্রুত বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন। বড় মায়া লাগল নীলুর।

বাবা, তোমার চা।

কোনো বন্ধুর বাড়ি যাচ্ছিস মা ?

নীলু খানিক ইতস্তত করে বলল, তোমাকে আমি পরে বলব বাবা।

সন্ধ্যার আগেই আসবি তো ?

হ্যাঁ, বাবা।

গাড়ি নিয়ে যাবি ?

না, গাড়ি নেব না।

নিয়ে যা না। ড্রাইভার তো দিনরাত বসে বসেই মায়না খায়।

বাবা, আমি গাড়ি নেব না।

নীলুর সাজ শেষ হলো ঠিক সাড়ে তিনটায়। আয়নায় তাকিয়ে নিজেকে তার পছন্দই হলো। যে-মেয়েটিকে দেখা যাচ্ছে, সে বেশ রূপসী। তার মায়া-কাড়া দু'টি চমৎকার চোখ আছে। কিশোরীদের মতো ছোট একটি চিবুক। ভালোই তো! এরকম একটি মেয়েকে পুরুষরা কি ভালোবাসে না ? নাকের কাছে মুক্তোর মতো কিছু ঘামের বিন্দু। নীলু তার সবুজ রুমাল দিয়ে সাবধানে ঘাম মুছে ফেলল। তারপর উঠে এলো তিনতলায়।

রানু, রানু।

রানু যেন তৈরি হয়েই ছিল। সে বেরিয়ে এলো সঙ্গে সঙ্গে।

তুমি যাবে বলেছিলে আমার সঙ্গে। চল।

চল।

রানু তালা লাগাল। নীলু মৃদু স্বরে বলল, তুমি জানতে আমি আসব ?

হ্যাঁ, জানতাম।

সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা অপেক্ষা করল। কারো দেখা পাওয়া গেল না। এক সময় নীলু বলল, এখন চলে যেতে চাও রানু ?

আরো খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি। তোমার তো এখনো যেতে ইচ্ছা করছে না।

এক জায়গায় দাঁড়িয়ে না থেকে চল হাঁটি।

তারা বেশ কয়েকবার নিউ মার্কেট চক্কর দিয়ে ফেলল। কেউ এগিয়ে এসে বলল না, তোমাদের মধ্যে নীলু কে ?

রানু, তোমার কি হাঁটতে টায়ার্ড লাগছে ?

না।

রানু, তুমি তো অনেক কিছু বুঝতে পার, তাই না ?

মাঝে-মাঝে পারি।

লোকটি এসেছে কিনা বুঝতে পারছ না ?

না নীলু, পারছি না। আমি সব সময় পারি না।

রানু লক্ষ করল, নীলুর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে তার সবুজ রুমাল দিয়ে চোখ চেপে ধরল।

রানু গাঢ় স্বরে বলল, কাঁদে না নীলু।

কান্না এলে কী করব ?

মনটা শক্ত করো ভাই। পৃথিবীটা খুব ভালো জায়গা নয়।

লোকজন তাকাচ্ছে ওদের দিকে। রানু নীলুর হাত ধরে বাইরে নিয়ে এলো। বেশ অস্বস্তিকর অবস্থা।

তার প্রায় চারদিন পর নীলু একটি চিঠি পেল।

> প্রিয় নীলু
>
> ঐদিন তোমাকে দেখলাম। তুমি তো ভারি মিথ্যুক! কেন বললে তুমি দেখতে সুন্দর নও ? তোমাকে বর্ষার জলভারে নত আকাশের মতো লাগছিল। আমি ছুটে যেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু তোমার বান্ধবীকে দেখে থমকে দাঁড়িয়েছি। কথা ছিল একা আসবে। তাই নয় কি ?
>
> শুধু আমরা দু'জন থাকব। আমাকে দেখে যদি তোমার কথা বলতে ইচ্ছে করে, তাহলে কোনো একটি রেস্টুরেন্টে বসে দু'জনে চা খেতে-খেতে গল্প করব। আর যদি তোমার আমাকে পছন্দ না হয়, তাহলে তুমি তোমার সবুজ রুমালটি তোমার হ্যান্ডব্যাগে লুকিয়ে ফেলবে।
>
> তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। আমি মন খারাপ করব ঠিকই, কিন্তু বিদায় নেব হাসিমুখে, এবং আর কোনোদিনই তুমি আমাকে দেখবে না। তবে নীলু, আমার কেন জানি মনে হচ্ছে, আমাকে তুমি অপছন্দ করবে না। এরকম মনে করার কোনোই কারণ নেই, তবু মনে হচ্ছে। খুব সম্ভব উইশফুল থিংকিং। না মেয়ে ?

নীলু চিঠিটি সমস্ত দিনে প্রায় একশ'বার পড়ল এবং প্রতিবারই তার কাছে নতুন মনে হলো। রাতে সে অদ্ভুত সুন্দর একটি স্বপ্ন দেখল— যেন পুরনো আমলের একটি পালতোলা জাহাজে সে বসে আছে। জাহাজের পালটি গাঢ় সবুজ রঙের। প্রচণ্ড বাতাস দিচ্ছে। বাতাসে জাহাজ ছুটে চলেছে বিদ্যুৎগতিতে। নীলুর একটু ভয়ভয় লাগছে, কারণ জাহাজে আর কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নীলু এক সময় বলল, আমার ভয় লাগছে এই জাহাজে। আর কেউ কি আছে ? সঙ্গে সঙ্গে একটি ভারি পুরুষালি গলা শোনা গেল, ভয় নেই নীলু। আমি আছি। স্বপ্ন এত সুন্দর হয়!

নীলুর ঘুম ভেঙে গেল। বাকি রাত সে আর ঘুমোতে পারল না। বালিশে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বিলু জেগে উঠে বলল, কী হয়েছে রে আপা ?

নীলু ভেজা গলায় বলল, পেট ব্যথা করছে। এখন একটু কম। তুই ঘুমো।

১০

অনুফার কাছ থেকে নতুন কিছু জানা গেল না। সেও খুব জোর দিয়ে বলল, রানুর পরনে পায়জামা ছিল এবং মৃত লোকটির পরনেও কাপড় ছিল।

আপনি লোকটিকে দেখেছেন ?

হ্যাঁ। কিন্তু আপনি করে বলছেন কেন ? মুরব্বি মানুষ আপনি। আমি আপনার মেয়ের বয়েসী।

লোকটিকে কেমন দেখলে বলো তো !

চাচা, আমার কিছু মনে নেই। সেই সময় আমি ঘোরের মধ্যে ছিলাম। পরদিন আমার বিয়ে।

হ্যাঁ, তা আমি জানি। লোকটিকে নদীর পারে পুঁতে রাখা হয়, তাই না ?

জি। তারপর অনেকদিন কেউ ওদিকে যেত না। সবাই বলাবলি করত, রাতে কী জানি দেখতে পায়।

কী দেখতে পায় ?

ছায়া-ছায়া কী নাকি দেখে। তবে এইসব সত্যি না চাচা। সব মনগড়া।

তাই নাকি ?

জি। ভূতপ্রেত বলে কিছু নেই।

মিসির আলি বড়ই অবাক হলেন। গ্রামের কোনো মেয়ে এইভাবে চিন্তা করে না। এতটা মুক্তচিন্তা তাদের থাকার কথা নয়। মিসির আলি বললেন, তুমি পড়াশোনা কত দূর করেছ ?

চাচা, আমি আইএ পড়ার সময় আমার বিয়ে হয়। তারপর আর পড়াশোনা হয়নি। গ্রামে বিয়ে হয়েছে তো! পড়াশোনা করার আমার খুব শখ ছিল।

মানুষের সব শখ মেটা উচিত নয়। একটা কোনো ডিসস্যাটিসফেকশন থাকা দরকার।

কেন ?

তাহলে বেঁচে থাকতে ইচ্ছে করে। সব শখ মিটে গেলে বেঁচে থাকার প্রেরণা নষ্ট হয়ে যায়। যে-সব মানুষের শখ মিটে গেছে, তারা খুব অসুখী মানুষ।

অনুফা চুপ করে রইল। মিসির আলি মৃদু স্বরে বললেন, এবার রানুর কথা বলো।

কী কথা জানতে চান ?

সব কথা।

ও খুব অদ্ভুত মেয়ে। ও মানুষের ভবিষ্যৎ বলতে পারে।

কীভাবে বলে ?

তা জানি না, তবে বলতে পারে। একবার কী হয়েছে, শোনেন। আমি আর ও গল্প করছি, সে হঠাৎ গল্প থামিয়ে বলল— কিছুক্ষণের মধ্যে আমাদের বাড়িতে শ্রীপুরের খালারা বেড়াতে আসবেন। আর সত্যি-সত্যি তাঁরা এলেন।

এটা তো এমনিতেও হতে পারে। মানুষ বেড়াতে আসে না?

তা আসে। কিন্তু শ্রীপুরের খালা পাঁচ বছর পর প্রথম এসেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে আমাদের কী একটা ঝগড়া চলছিল।

ও, তাই নাকি?

জি। আরেক গল্প বলি শোনেন, তখন আমি ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে রানুদের ওখানে বেড়াতে গিয়েছি— না, এটা আপনাকে বলা যাবে না।

বলা যাবে না কেন?

গল্পটা ভালো না।

অনুফার স্বামীকেও মিসির আলি সাহেবের বেশ লাগল। গোঁয়ারগোবিন্দ ধরনের লোক। স্ত্রীর খুবই অনুগত। সে মিসির আলিকে নিয়ে প্রচুর ঘুরল। লোকটির যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিও দেখা গেল। মধুপুর থানার ওসি সাহেব ওর কথাতেই পুরনো ফাইলপত্র ঘেঁটে দেখালেন যে, একটি মরা লাশ পাওয়ার খবরের এফআইআর করা হয়েছিল। তখন ওসি ছিলেন ব্রজগোপাল হালদার, তাঁর নোটে লেখা—

> একটি কলেরায় মৃত মানুষের লাশ (৩০/৩৫) মধুপুরের নিমশাসা গ্রামে পাওয়া যায়। লাশটির পচন ধরে গিয়েছিল। প্রাথমিক পরীক্ষার পর আমি লাশটি পুঁতিয়া ফেলিবার নির্দেশ দিই। লাশটির কোনো পরিচয় জানা যায় নাই।

মিসির আলি বললেন, কলেরায় মৃত, এটা বোঝা গেল কী করে?

ওসি সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, সেটা আমি কী করে বলব? রিপোর্ট তো আমার লেখা না। ব্রজগোপাল বাবুকে জিজ্ঞেস করেন। তিনি জানবেন।

তাঁকে কোথায় পাওয়া যাবে?

পুলিশ ডাইরেক্টরেটে খোঁজ করেন। তবে এইসব খোঁজাখুঁজির কোনো অর্থ নেই। দশ বৎসর আগের ঘটনা মনে করে বসে আছেন নাকি? পুলিশকে আপনারা কী মনে করেন বলেন তো?

ঘটনাটা অস্বাভাবিক। সে জন্যই হয়তো তার মনে থাকবে।

একটা ডেড বডি পাওয়া গেছে পানিতে, এর মধ্যে আপনি অস্বাভাবিক কী দেখলেন? বাংলাদেশে প্রতিদিন কয়টা ডেড বডি পাওয়া যায় জানেন?

জি-না, জানি না।

পুলিশের লাইনে ডেড বডি পাওয়াটা খুব স্বাভাবিক ঘটনা, বুঝলেন?

মিসির আলি মধুপুরে আরো একদিন থাকলেন। দেখে এলেন, যে জায়গায় লোকটিকে পোঁতা হয়েছিল সেই জায়গা দেখার মতো কিছু নয়। ঘন কাঁটাবন হয়েছে, যার মানে হচ্ছে এই জায়গাটিকে বেশ কিছুদিন লোকজন ভয়ের চোখে দেখেছে। হাঁটাচলা বন্ধ করে দিয়েছে নিশ্চয়ই।

মিসির আলি অনেকের সঙ্গেই কথা বললেন— যদি নতুন কিছু পাওয়া যায়। নতুন কোনো তথ্য, যা কাজে লাগবে। কিন্তু কিছুই জানা গেল না। দশ বৎসর দীর্ঘ সময়। এই সময়ে মানুষ অনেক কিছু ভুলে যায়।

মধুপুর থেকে তিনি গেলেন রানুদের আদি বাড়িতে। সেখানে যাবার তাঁর একটি উদ্দেশ্য, খুঁজে দেখা— জালালউদ্দিন নামে কাউকে পাওয়া যায় কিনা। এই লোকটিকে পাওয়া খুবই প্রয়োজন।

আনিস লক্ষ করল, রানু ইদানীং বেশ স্বাভাবিক। এর প্রধান কারণ বোধহয় বাড়িঅলার দু'টি মেয়ে। ওদের সঙ্গে সে বেশ মিলেমিশে আছে। গল্পের বই আনছে।

ভালোমন্দ কিছু রান্না হলেই আগ্রহ করে নিচে নিয়ে যাচ্ছে। বাড়িঅলাদের সঙ্গে বেশি মেলামেশা আনিসের পছন্দ নয়। বাড়িঅলাদের সে সব সময় শত্রুপক্ষ বলেই মনে করে। কয়েকবার ভেবেছিল বলবে মেলামেশাটা কমাতে। না-বলে ভালোই হয়েছে, এতে যদি অসুখটা চাপা পড়ে তো ভালোই।

কাজের একটি ছেলে পাওয়া গেছে— জিতু মিয়া। এই ছেলেটিও রানুকে বেশ ব্যস্ত রাখছে। ছেলেটির বয়স দশ-এগার, তবে মহাবোকা। কোনো কাজই করতে পারে না। করার আগ্রহও নেই। রানু ক্রমাগত বকাঝকা করেও কিছু করাতে পারে না। তবে তার সময় বেশ কেটে যায়।

সন্ধ্যাবেলা সে আবার জিতু মিয়াকে নিয়ে পড়াতে বসে। জিতু ঘুমঘুম চোখে পড়ে 'স্বরে অ স্বরে আ'। এই পড়াটি গত এক সপ্তাহ ধরে চলছে। জিতু মিয়া কিছুই মনে রাখতে পারছে না। কিন্তু তাতে রানুর উৎসাহে ভাটা পড়ছে না।

আনিস একদিন ঠাট্টা করে বলেছে, তুমি দেখি একে বিদ্যাসাগর বানিয়ে ফেলছ! রানু তাতে বেশ রাগ করেছে। গম্ভীর হয়ে বলেছে, ঠাট্টা করছ কেন ? বিদ্যাসাগর তো একদিন হতেও পারে।

অবশ্য অদূর-ভবিষ্যতে তেমন কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। ভবিষ্যৎ-বিদ্যাসাগর রোজ রাতেই পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়ছে, এবং রানু প্লেটে খাবার বেড়ে প্রতি রাতেই প্রাণান্ত চেষ্টা চালাচ্ছে। এতটা বাড়াবাড়ি আনিসের ভালো লাগে না। কিন্তু সে কিছু বলে না। থাকুক একটা কিছু নিয়ে ব্যস্ত।

এর মধ্যে একদিন আনিস গিয়েছিল মিসির আলি সাহেবের কাছে। ভদ্রলোক বেশ কিছুদিন ঢাকায় ছিলেন না। সবে ফিরেছেন। তাঁর চোখ হলুদ, গা হলুদ। আনিস অবাক হয়ে বলেছে, হয়েছে কী আপনার ?

জন্ডিস। জন্ডিস বাধিয়ে বসেছি।

বলেন কী!

ইনফেকটাস হেপাটাইটিস। লিভারের অবস্থা কাহিল রে ভাই! আপনার স্ত্রী কেমন আছেন ?

ভালো।

আর ভয়টয় পাচ্ছেন না ?

জি-না।

খুব ভালো খবর। আমি একটু সুস্থ হলেই যাব আপনার বাসায়।

জি আচ্ছা।

আমি কিছু খোঁজখবর পেয়েছি। মনে হয় আপনার স্ত্রীর সমস্যাটি ধরতে পেরেছি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ, একটু ভালো হলেই এ নিয়ে কথা বলব।

রানু মিসির আলি সাহেবের জন্ডিসের খবরে খুবই মন-খারাপ করল।

আহা, বেচারা একা-একা কষ্ট করছে। চল একদিন দেখে আসি। যাবে ?

ঠিক আছে, যাব একদিন।

কবে যাবে ? কাল যাবে ?

এত ব্যস্ত হচ্ছ কেন ? জন্ডিস যখন হয়েছে, তখন বেশ কিছুদিন থাকবে। একদিন দেখে এলেই হবে।

আমি এই অসুখের ভালো ওষুধ জানি। অড়হড়ের পাতার রস। সকালবেলা এক গ্লাস করে খেলে তিনদিনে অসুখ সেরে যাবে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আমার দাদা এই ওষুধটা দিতেন। তুমি কিছু অড়হড়ের পাতা ঐ লোকটিকে দিয়ে এসো না।

ঢাকা শহরে আমি অড়হড়ের পাতা কোথায় পাব ? কী যে বলো!

খুঁজলেই পাবে। জংলা গাছ সব জায়গায় হয়।

আনিস যথেষ্ট বিরক্ত হলো। রানুর এই একটা প্রবলেম— কোনো একটা জিনিস মাথায় ঢুকলে ওটা নিয়েই থাকবে। আনিস বলল, আচ্ছা, দেখি।

দেখাদেখি না, তুমি খুঁজবে। আর শোন, কাল তো তোমার অফিস নেই, চল ওনাকে দেখে আসি।

এত ব্যস্ত কেন ? ভদ্রলোক তো আর পালিয়ে যাচ্ছেন না।

রানু থেমে থেমে বলল, আমি অন্য একটা কারণে যেতে চাই।

কী কারণ ?

ভদ্রলোক আমার সম্পর্কে খোঁজখবর করার জন্যে মধুপুর গিয়েছিলেন, কী খোঁজ পেলেন জানতে ইচ্ছা করছে।

মধুপুরের খবর পেলে কীভাবে ? স্বপ্নে ?

না, স্বপ্নটপ্ন না। অনুফা চিঠি দিয়েছে।

কবে চিঠি পেয়েছ ?

গতকাল।

আনিস চুপ করে গেল। রানু তার নিজের চিঠিপত্রের কথা আনিসকে কখনো বলে না। বিয়ের পর রানু তার আত্মীয়স্বজনের যত চিঠিপত্র পেয়েছে তার কোনোটিই সে আনিসকে পড়তে দেয়নি। এ নিয়ে আনিসের গোপন ক্ষোভ আছে।

কী, আমাকে নিয়ে যাবে ?

আমি আগে গিয়ে দেখি ভদ্রলোকের অবস্থা কেমন।

মিসির আলিকে পাওয়া গেল না। বাড়িতে তার এক ছোট ভাই ছিল, সে বলল, ভাইয়াকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অবস্থা বেশি ভালো না। বিলরুবিন নাইন পয়েন্ট ফাইভ। লিভার খুবই ড্যামেজড।

১১

মিসির আলি হাসপাতালে এসেছেন একগাদা বই নিয়ে। তার ধারণা ছিল বই পড়ে সময়টা খুব খারাপ কাটবে না। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে সে রকম হয়নি। ডাক্তাররা বই পড়তে নিষেধ করেননি, কিন্তু দেখা গেল বই পড়া যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলেই মাথার ভেতর ভোঁতা একধরনের যন্ত্রণা হয়। যন্ত্রণা নিয়ে বই পড়ার কোনো মানে হয় না। তবু তিনি মৃত্যুবিষয়ক একটি বই পড়ে ফেললেন এবং মৃত্যু ব্যাপারটিতে যথেষ্ট উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন। তার স্বভাবই হচ্ছে কোনো বিষয় একবার মনে ধরে গেলে সে বিষয় সম্পর্কে চূড়ান্ত পড়াশোনা করতে চেষ্টা করা।

মৃত্যু সাবজেক্টটি তার পছন্দ হয়েছে, কিন্তু এ বিষয়ে পড়াশোনা করতে পারছেন না। বইপত্র নেই। ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরিতে কিছু থাকার কথা, কিন্তু আনাবেন কাকে দিয়ে ? তাকে কেউ দেখতে আসছে না। তিনি এমন কোনো জনপ্রিয় ব্যক্তি নন যে তার অসুস্থতার খবরে মানুষের ঢল নামবে। তাছাড়া অসুখের খবর তিনি কাউকে জানাননি। হাসপাতালে ভর্তি হবার ইচ্ছাও ছিল না। কিন্তু ঘরে দেখাশোনার লোক নেই। কাজের মেয়েটি তিনি মধুপুর থাকাকালীন বেশকিছু জিনিসপত্র নিয়ে ভেগে গেছে। এমন অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হওয়া ছাড়া উপায় কী ?

বিকেলবেলা তাঁর কাছে কেউ আসে না। সবারই আত্মীয়স্বজন আসে দেখতে, তার কাছে কেউ আসে না। এই সময়টা তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকেন এবং এখনো মানুষের সঙ্গ পাবার জন্যে তার মন কাঁদে দেখে নিজের কাছেই লজ্জিত বোধ করেন।

আজ সারাদিন মিসির আলির খুব খারাপ কেটেছে। তার রুমমেট ছাব্বিশ বছরের ছেলেটি সকাল ন'টায় বিনা নোটিশে মারা গেছে। মৃত্যু যে এত দ্রুত মানুষকে ছুঁয়ে দিতে পারে তা তার ধারণাতেও ছিল না। ছেলেটা ভোরবেলায় নাশতা চেয়েছে, তার সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তাও বলেছে। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন, আজ কেমন আছ ?

আজ বেশ ভালো।

লিভার ব্যথা করছে না ?

নাহ্, তবে তলপেটের দিকে একটা চাপা ব্যথা আছে।

খুব বেশি ?

না, খুব বেশি না। আপনি এটা কী বই পড়ছেন ?

এটা একটা সায়েন্স ফিকশন— 'ফ্রাইডে দি থার্টিন্থ'। বেশ ভালো বই। তুমি পড়বে ?

জি-না। ইংরেজি বই আমার ভালো লাগে না। বাংলা উপন্যাস পড়ি।

কার লেখা ভালো লাগে ? এ দেশের— মানে বাংলায়, কার লেখা তোমার পছন্দ ?

নিমাই ভট্টাচার্য।

তাই নাকি ?

ছেলেটি আর জবাব না দিয়ে কাতরাতে থাকে। সকাল সাড়ে আটটায় বলল, একজন ডাক্তার পাওয়া যায় কিনা দেখবেন ? তিনি অনেকক্ষণ বোতাম টিপলেন, কেউ এলো না। শেষ পর্যন্ত নিজেই গেলেন ডিউটি রুমে। ফিরে এসে দেখেন ছেলেটি মরে পড়ে আছে।

মৃত্যুর সময় পাশে কেউ থাকবে না, এর চেয়ে ভয়াবহ বোধহয় আর কিছু নেই। শেষ বিদায় নেবার সময় অন্তত কোনো একজন মানুষকে বলে যাওয়া দরকার। নিঃসঙ্গ ঘর থেকে একা-একা চলে যাওয়া যায় না। যাওয়া উচিত নয়। এটা হৃদয়হীন ব্যাপার।

এতদিন যে-ছেলেটি ছিল, এখন আর সে নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই তার সমস্ত চিহ্ন এ-ঘর থেকে সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বিছানায় নতুন বালিশ ও চাদর দিয়ে গেছে— হয়তো সন্ধ্যার মধ্যে কোনো নতুন পেশেন্ট এসে পড়বে।

মিসির আলি সমস্ত দিন কিছু খেতে পারলেন না। বিকেলের দিকে তার গায়ে বেশ টেম্পারেচার হলো। প্রথমবারের মতো মনে হলো একজন-কেউ তাকে দেখতে এলে খারাপ লাগবে না। ভালোই লাগবে। কেউ না-এলে একজন রোগী হলেও আসুক, একা-একা এই কেবিনে রাত কাটানো যাবে না। ঠিক এই সময় ইতস্তত ভঙ্গিতে রানু এসে ঢুকল।

আপনি ভালো আছেন ?

না, ভালো না। তুমি কোত্থেকে ?

বাসা থেকে। ইস! আপনার এ কী অবস্থা!

অবস্থা খারাপ ঠিকই। আনিস সাহেব কোথায় ?

ও আসেনি, আমি একাই এলাম। ওর কাছ থেকে ঠিকানা নিয়েছি।

বসো তুমি। ঐ চেয়ারটায় বসো। ফ্লাস্কে চা আছে। খেতে চাইলে খেতে পার।

উঁহু, চা-টা খাব না। আপনার কাছে একটা খবর জানতে এসেছি।

কোন খবরটি ?

মধুপুরে গিয়ে আপনি কী জানলেন ?

তেমন কিছু জানতে পারিনি।

তবু যা জেনেছেন তা-ই বলুন। আমার খুব জানতে ইচ্ছা করছে। অনুফা লিখেছে, আপনি নাকি হাজার-হাজার মানুষকে নানারকম প্রশ্ন করেছেন।

মিসির আলি হাসলেন।

হাসলে হবে না, আমাকে বলতে হবে।

প্রথম যে-জিনিসটি জানলাম— সেটি হচ্ছে, তুমি অনেকগুলো ভুল তথ্য দিয়েছ।

আমি কোনো ভুল তথ্য দিইনি।

তুমি নিজে হয়তো জান না সেগুলো ভুল। যেমন পায়জামা খোলার ব্যাপারটি— এরকম কোনো কিছু ঘটে নি।

রানু চোখ লাল করে বলল, ঘটেছে।

না রানু, ঘটে নি। এটা তোমার কল্পনা। তাছাড়া তুমি উলঙ্গ একটি ডেড বডির কথা বলেছ— সেটাও ঠিক না।

কিন্তু আমি জানি, এগুলো ঠিক।

না রানু। এইসব তুমি নিজে ভেবেছ এবং আমার ধারণা এ-জাতীয় স্বপ্ন তুমি মাঝে-মাঝে দেখ। দেখ না ?

কী রকম স্বপ্নের কথা বলছেন ?

মিসির আলি কয়েক মুহূর্তে ইতস্তত করলেন। স্পষ্ট গলায় বললেন, তুমি প্রায়ই স্বপ্ন দেখ না— একজন নগ্ন মানুষ তোমার কাপড় খোলার চেষ্টা করছে ?

রানু উত্তর দিল না। মাথা নিচু করে থাকল।

বলো রানু। জবাব দাও।

হ্যাঁ, দেখি।

কখনো কি ভেবে দেখেছ এরকম স্বপ্ন কেন দেখ ?

না, ভাবিনি।

আমি ভেবেছি এবং কারণটাও খুঁজে বের করেছি। আজ সেটা বলতে চাই না, অন্য একদিন বলব।

না, আপনি আমাকে আজই বলেন।

মিসির আলি ফ্লাস্ক থেকে চা ঢাললেন। শান্ত স্বরে বললেন, চা খেতে-খেতে শোন। চায়ে ক্যাফিন আছে। ক্যাফিন তোমার নার্ভগুলোকে অ্যাকটিভ রাখবে।

রানু চায়ের পেয়ালা নিল, কিন্তু চুমুক দিল না। মাথা নিচু করে বসে রইল। মিসির আলি ঠান্ডা গলায় বলতে লাগলেন, রানু তোমাকে নিয়ে এই গল্পটি আমি তৈরি করেছি। তুমি মন দিয়ে শোন। তুমি যখন বেশ ছোট— নয়, দশ বা এগার বছর বয়স, তখন একজন বয়স্ক লোক তোমাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নির্জন কোনো জায়গায় নিয়ে গিয়েছিল। তোমাদের গ্রামে এরকম একটা নির্জন জায়গার খোঁজে আমি গিয়েছিলাম। সেখানে জঙ্গলের কাছে একটা ভাঙা বিষ্ণুমন্দির দেখেছি। মনে হয় ঐ জায়গাটাই হবে। কারণ সাপের ভয়ে ওখানে কেউ যেত না। রানু, তুমি কি আমার কথা শুনছ ?

শুনছি।

তারপর সেই বয়স্ক মানুষটি মন্দিরে তোমাকে নিয়ে গেল।

আমাকে কেউ নিয়ে যায়নি। আমি নিজেই গিয়েছিলাম। ঐ মন্দিরে খুব সুন্দর একটি দেবীমূর্তি আছে। আমি ঐ মূর্তি দেখার জন্যে যেতাম।

তারপর কী হয়েছে, বলো।

রানু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তীব্র স্বরে বলল, আমি বলব না, আপনি বলুন।

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, ঐ লোকটি তখন টেনে তোমার পায়জামা খুলে ফেলল।

রানুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

ঐ লোকটির নাম ছিল জালালউদ্দিন।

রানু কিছু বলল না। মিসির আলি বললেন, তোমার অসুখ শুরু হলো সেদিন থেকে। তোমার মনের মধ্যে ব্যাপারটি গেঁথে গেল, পরবর্তী সময়ে গোসলের সময়

যখন মরা মানুষটি তোমার পায়ে লেগে গেল, তখন তোমার মনে পড়ল মন্দিরের দৃশ্য। বুঝতে পারছ ?

রানু জবাব দিল না।

অসুখের মূল কারণটি আলোয় নিয়ে এলেই অসুখ সেরে যায়; এ-জন্যেই আমি এটা তোমাকে বললাম। তুমি নিজেও এখন গোড়া থেকে সমস্ত ব্যাপারটি নিয়ে চিন্তা করবে। তোমার অসুখ সেরে যাবে।

রানু মৃদু স্বরে বলল, আপনি কি ঐ লোকটির সঙ্গে কথা বলেছেন ?

বলেছি।

ও কী বলেছে ?

তেমন কিছু বলেনি।

না, বলেছে, আপনি আমাকে বলতে চাচ্ছেন না। এতটা যখন বলেছেন, তখন বাকিটাও বলুন।

রানু তীব্র চোখে তাকাল। মিসির আলি বললেন, দেখ রানু, আমি খুবই যুক্তিবাদী মানুষ। অলৌকিক কোনো কিছুতে বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি সব কিছুরই একটি ব্যাখ্যা আছে। জালালউদ্দিন যা বলেছে, তাও নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করা যায়।

ব্যাখ্যা পরে করবেন। আগে বলুন, সে কী বলেছে।

সে বলেছে, হঠাৎ সে দেখে মূর্তিটি ছুটে এসে তোমার মধ্যে মিলিয়ে গেছে। তোমার গা থেকে আগুনের হলকা বেরোচ্ছে। জালালউদ্দিন তখন ছুটে পালিয়ে যায়।

আপনি জালালউদ্দিনের কথা বিশ্বাস করেন না ?

না। ওর মনে পাপবোধ ছিল। মন্দিরটি নিয়ে মূর্খ মানুষদের মনে অনেক রকম ভয়-ভীতি আছে। তা থেকেই সে একটা হেলুসিনেশন দেখেছে। তুমি নিজে তো কিছু দেখনি।

না।

তাহলেই হলো। জালালউদ্দিন কী দেখেছে না-দেখেছে, সেটা তার প্রবলেম, তোমার নয়।

রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, কিন্তু একটা জিনিস কী জানেন ? ঐ ঘটনার পর থেকে আমি অসম্ভব সুন্দর হয়ে গেলাম।

মিসির আলি শব্দ করে হাসলেন। হাসতে-হাসতে বললেন, সুন্দর তুমি সব সময়ই ছিলে। ঘটনাটি ঘটেছে তোমার বয়ঃসন্ধিতে। বয়ঃসন্ধির পর মেয়েদের রূপ খুলতে শুরু করে। এখানেও তাই হয়েছে।

কিন্তু ঐ দেবীমূর্তিটিকে এর পর আর খুঁজে পাওয়া যায়নি।

তুমি কিন্তু খুব ছেলেমানুষের মতো কথা বলছ রানু। মূর্তিটি চুরি গেছে, কেউ নিয়ে পালিয়ে গেছে, ব্যস।

মূর্তিটি চুরি যায়নি।

তুমি নিশ্চয়ই বিশ্বাস কর না— একটা পাথরের মূর্তি তোমার মধ্যে ঢুকে আছে ? কী, কর ?

রানু তীব্র কণ্ঠে বলল, আমার দিকে ভালো করে তাকিয়ে বলুন, আমাকে কি অনেকটা মূর্তির মতো দেখায় না ?

না রানু, মূর্তির মতো দেখাবে কেন ? অসম্ভব রূপবতী একটি তরুণী— এর বেশিকিছু না। তোমার মতো রূপবতী মেয়ে এ-দেশেই আছে এবং তারা সবাই রক্ত-মাংসের মানুষ।

রানু উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি বললেন, চলে যাচ্ছ রানু ?

হ্যাঁ।

অসুখ সারলে তোমাদের ওখানে একবার যাব।

না, আপনি আসবেন না। আপনার আসার কোনো দরকার নেই।

রানু ঘর ছেড়ে চলে গেল। মিসির আলি ক্ষীণস্বরে বললেন, ভেরি ইন্টারেস্টিং। তার ভ্রু কুঞ্চিত হলো। তিনি ব্যাপারটি ঠিক বুঝতে পারছেন না। যতটা সহজ মনে হয়েছিল এখন ততটা মনে হচ্ছে না। তিনি মৃত্যুবিষয়ক বইটি আবার পড়তে শুরু করলেন। সাবজেক্টটি তাকে বেশ আকর্ষণ করেছে। ফ্যাসিনেটিং টপিক।

১২

গভীর রাতে আনিস জেগে উঠল। শুনশান নীরবতা চারদিকে। রানু হাত-পা ছড়িয়ে বাচ্চা মেয়ের মতো ঘুমোচ্ছে। জানালার আলো এসে পড়েছে তার মুখে। অদ্ভুত সুন্দর একটি মুখ। শুধু তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। আনিস ছোট্ট একটি নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল। বাথরুমে যেতে হবে।

বাথরুমে পানি জমে আছে। পাইপ জ্যাম হয়ে গেছে। বাড়িঅলাকে বলতে হবে। আনিস নোংরা পানি বাঁচিয়ে সাবধানে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করেই শুনল ঝুমঝুম করে শব্দ হচ্ছে। নূপুর বাজছে যেন। এর মানে কী ? মনের ভুল কি ? মনের ভুল হবার কথা নয়। বেশ বোঝা যাচ্ছে নূপুর পায়ে দিয়ে ঝমঝম করতে-করতে কেউ একজন এ-ঘর ও-ঘর করছে। শব্দটা অনেকক্ষণ ধরেই হচ্ছে। মনের ভুল হবার কথা নয়।

বাথরুমের দরজা খুলতেই শব্দটা চট করে থেমে গেল। শুধু একটা তীব্র ফুলের গন্ধ আনিসকে অভিভূত করে ফেলল। একটু আগেও তো এরকম সৌরভ ছিল না। আনিসের মাথা ঝিমঝিম করতে লাগল। বিস্ময়ের ঘোর অবশ্যি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো

না। আনিসের মনে পড়ল একতলার বাগানে হাস্নাহেনার প্রকাণ্ড একটা ঝাড় আছে। বাতাসের ঝাপটায় ফুলের গন্ধই উড়ে এসেছে বারান্দায়। আনিস কিছুক্ষণ একা একা বারান্দায় দাঁড়িয়ে রইল— নূপুরের শব্দ আবার যদি পাওয়া যায়।

দোতলার একটা বাচ্চা ছেলে শুধু কাঁদছে। তার মা তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে। একটা রিকশা গেল টুনটুন করে। ব্যস, আর কিছু শোনা গেল না।

শোবার ঘরে রানু ঘুমোচ্ছে। মড়ার মতো। জানালা খোলা। ঠান্ডা হাওয়া আসছে ঘরে। আনিস জানালা বন্ধ করতে গিয়ে শুনল, রান্নাঘর থেকে জিতু মিয়া সাড়াশব্দ দিচ্ছে। কান্না চাপার আওয়াজ।

জিতু মিয়া।

জিতু ফুঁপিয়ে উঠল। আনিস রান্নাঘরে ঢুকে বাতি জ্বালাল। জিতু মশারির ভেতর জবুথবু হয়ে বসে আছে।

জিতু, কী হয়েছে রে?

কিছু হয় নাই।

বসে আছিস কেন?

ঘুম আহে না।

স্বপ্ন দেখেছিস?

জিতু মাথা নাড়ল।

কী স্বপ্ন?

একজন মাইয়া মানুষ পাকের ঘরে হাঁটতে আছিল।

এই দেখেছিস স্বপ্নে?

স্বপ্নে দেখি নাই। নিজের চোখে দেখলাম।

দূর ব্যাটা, অন্ধকারে তুই মানুষ দেখলি কীভাবে? যা, ঘুমো।

জিতু শুয়ে পড়ল। আনিস বলল, ভয়ের কিছু নেই, আমি জেগে আছি, ঘুমো তুই।

আচ্ছা।

আর শোন, রান্নাঘরে বাতি জ্বালানো থাকুক।

আচ্ছা।

জিতু শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার নিঃশ্বাস ভারি হয়ে এলো। আনিস একটি সিগারেট ধরাল। ঘুম চটে গেছে। তাকে এখন দীর্ঘ সময় জেগে থাকতে হবে। এক পেয়ালা চা খেতে পারলে মন্দ হতো না। রাত তো বাজে প্রায় সাড়ে তিনটা। বাকি রাতটা তার জেগেই কাটবে মনে হয়। সিগারেট টানতে ভালো লাগছে না। পেটের ভেতর পাক দিয়ে উঠছে।

ঘুমের মধ্যে রানু শব্দ করে হাসল। আনিস মৃদু স্বরে ডাকল, এই রানু। রানু খুব স্বাভাবিক ভঙ্গিতে বলল, কী ?

জেগে আছ নাকি ?

হ্যাঁ।

কী আশ্চর্য, কখন জাগলে ?

অনেকক্ষণ। তুমি বাথরুমে গেলে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকলে।

আমাকে ডাকলে না কেন ?

শুধু-শুধু ডাকব কেন ?

আনিস সিগারেট টানতে লাগল। রানু বলল, বড্ড গরম লাগছে। জানালা বন্ধ করলে কেন ?

গরম কোথায় ? বেশ ঠান্ডা তো!

আমার গরম লাগছে। ফ্যানটা ছাড় না।

এই ঠাণ্ডার মধ্যে ফ্যান ছাড়ব কী, কী যে বলো!

রানু ছোট একটি নিঃশ্বাস ফেলে বলল, তুমি যখন বাথরুমে ছিলে তখন কি নূপুরের শব্দ শুনেছ ?

আনিস ঠাণ্ডা স্বরে বলল, না তো, কেন ?

না, এমনি। আমি শুয়ে-শুয়ে শুনছিলাম।

ঘুমাও রানু।

আমার ঘুম আসছে না।

ঘুম না এলে উঠে বসো, গল্প করি। চা খাওয়া যেতে পারে, কী বলো ?

রানু উঠে বসল কিন্তু জবাব দিল না। আনিস দেখল রানু কোন ফাঁকে গায়ের কাপড় খুলে ফেলেছে। ক্লান্ত স্বরে বলল, বড্ড গরম লাগছে। তুমি আমার দিকে তাকিও না। প্লিজ!

এইসব কী রানু ? ঘরে একটা বাচ্চা ছেলে আছে।

কী করব, বড্ড গরম লাগছে। তুমি বরং রান্নাঘরের বাতি নিভিয়ে সব অন্ধকার করে দাও।

না, বাতি জ্বালানো থাক।

আনিস দ্বিতীয় সিগারেট ধরাল। রানু বলল, আমাদের গ্রামে একটা মন্দির আছে, তার গল্প এখন শুনবে না ?

আহ্, মন্দির-ফন্দিরের গল্প এখন শুনব না।

আহ্, শোন না! আমার বলতে ইচ্ছে করছে। আমি যখন খুব ছোট, তখন একা একা যেতাম সেখানে।

কী মন্দির ? কালীমন্দির ?

নাহ্, বিষ্ণুমন্দির বলত ওরা। তবে কোনো বিষ্ণুমূর্তি ছিল না। একটি দেবী ছিল। হিন্দুরা বলত রুকমিনী দেবী।

তুমি মন্দিরে যেতে কী জন্যে ?

এমনি যেতাম। ছোট বাচ্চা পুতুল খেলে না ?

কী করতে সেখানে ?

দেবীমূর্তির সাথে গল্পগুজব করতাম। ছেলেমানুষি খেলা আর কী!

বলতে-বলতে রানু খিলখিল করে হেসে উঠল। আনিস স্পষ্ট শুনল সঙ্গে-সঙ্গে ঝমঝম করে কোথাও নূপুর বাজছে। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, শুনতে পাচ্ছ ?

কী শুনব ?

নূপুরের শব্দ শুনছ না ?

আনিস দৃঢ় স্বরে বলল, না। তুমি ঘুমাও রানু।

আমার ঘুম আসছে না।

শুয়ে থাক। তুমি অসুস্থ।

রানু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, হ্যাঁ, আমি অসুস্থ।

তোমাকে খুব বড় ডাক্তার দেখাব আমি।

আচ্ছা।

এখন শুয়ে থাক।

রানু মৃদু স্বরে বলল, আমি ঐ দেবীকে গান গেয়ে শোনাতাম।

ঐসব অন্যদিন শুনব।

আজ রাতে আমার বলতে ইচ্ছে করছে।

আনিস এসে রানুর হাত ধরল। গা পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে। আনিস অবাক হয়ে বলল, তোমার গা তো পুড়ে যাচ্ছে!

হুঁ, বড্ড গরম লাগছে। ফ্যানটা ছাড়বে ?

আনিস উঠে গিয়ে জানালা খুলে দিল। ঘর ভর্তি হয়ে গেল ফুলের গন্ধে। আর তখনি রানু অত্যন্ত নিচু গলায় গুনগুন করে কী যেন গাইতে লাগল। অদ্ভুত অপার্থিব কোনো-একটা সুর যা এ-জগতের কিছু নয়। অন্য কোনো ভুবনের। রান্নাঘর থেকে জিতু ডাকতে লাগল, ও ভাইজান, ভাইজান!

আনিস রানুকে জোর করে বিছানায় শুইয়ে গায়ের চাদর টেনে দিল। জিতুকে বলল, এ ঘরে যেন না আসে। তারপর নেমে গেল নিচে, বাড়িঅলার মেয়েটিকে খবর দিয়ে আসতে।

নীলু এলো সঙ্গে সঙ্গে। আনিস দেখল রানু শিশুর মতো ঘুমাচ্ছে। জিতু মিয়া শুধু জেগে আছে। কাঁদছে ব্যাকুল হয়ে। নীলুর সঙ্গে তার বাবাও আসছেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, হয়েছেটা কী ? আনিস ভাঙা গলায় বলল, বুঝতে পারছি না, কেমন যেন করছে।

কী করছে ?

আনিস জবাব দিল না। নীলু বলল, বাবা, তুমি শুয়ে থাক গিয়ে, আমি এখানে থাকি। রাত তো বেশি নেই। ভদ্রলোক কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে নিচে নেমে গেলেন। যাবার সময় বলে গেলেন, হাসপাতালে নিতে হলে বলবেন, ড্রাইভারকে ডেকে তুলব।

জি আচ্ছা।

রানু বাকি রাতটা ঘুমিয়ে কাটাল। একবারও জাগল না। নীলু সারাক্ষণ তার পাশে রইল। আনিসের সঙ্গে তার কথাবার্তা কিছু হলো না। আনিস বসার ঘরের সোফায় বসে ঝিমুতে লাগল।

১৩

মিসির আলি লোকটির ধৈর্য প্রায় সীমাহীন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েই তিনি দ্বিতীয় দফায় রানুদের গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তার সঙ্গে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের এক ভদ্রলোক, জয়নাল সাহেব। উদ্দেশ্য রুকমিনী দেবীর মন্দির সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা।

জয়নাল সাহেব মন্দির দেখে বিশেষ উল্লসিত হলেন না। তিন শ' বৎসরের বেশি এর বয়স হবে না। এরকম ভগ্নস্তূপ এ দেশে অসংখ্য আছে। মিসির আলি বললেন, তেমন পুরনো নয় বলছেন ?

না রে ভাই। ইটের সাইজ দেখলেই বুঝবেন। ভেঙে টেঙে কী অবস্থা হয়েছে দেখেন!

যত্ন হয়নি। মন্দির যিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তিনি হয়তো মারা গেছেন কিংবা তার উৎসাহ মিইয়ে গেছে।

গ্রামের লোকজনের কাছ থেকে অল্প কিছু তথ্য পাওয়া গেল— পালবাবুদের প্রতিষ্ঠিত মন্দির। পালরা স্বপ্নে আদিষ্ট হয়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। তার পরপরই তাদের ভাগ্য বিপর্যয় শুরু হয়। তিন-চার বছরের মধ্যে পালরা নির্বংশ হয়ে পড়ে। দেবীকে তুষ্ট করার জন্যে তখন এক রাতে কুমারী বলির আয়োজন করা হয়। বারো বছরের একটা কুমারীকন্যাকে অমাবস্যার রাত্রিতে মন্দিরের সামনে বলি দেওয়া হয়। দেবীর তুষ্টি হয় না তাতেও। পাথরের মূর্তি এত সহজে বোধহয় তুষ্ট হয় না। তবে গ্রামের মানুষেরা নাকি বলি দেওয়া মেয়েটিকে এর পর থেকে গ্রামময় ছুটোছুটি

করতে দেখে। ময়মনসিংহ থেকে ইংরেজ পুলিশ সুপার এসে মন্দির তালাবন্ধ করে পালদের দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যান।

পালরা অত্যন্ত ক্ষমতাবান ছিল। কাজেই ছাড়া পেয়ে এক সময় আবার গ্রামে ফিরে আসে। কিন্তু মন্দির তালাবন্ধই পড়ে থাকে।

ইতিহাস এইটুকুই। মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত মূর্তি সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা গেল না। দু-এক ঘর নিম্নবর্ণের হিন্দু যারা ছিল, তারা বিশেষ কিছু বলতে পারে না। হরিশ মণ্ডল বলল, বাবু, আমরা কেউ ঐদিকে যাই না। ঐ মন্দিরে গেলে নির্বংশ হতে হয়, কে যাবে বলেন ?

আপনি তো শিক্ষিত লোক, এইসব বিশ্বাস করেন ?

করি না, কিন্তু যাইও না।

মূর্তিটা আপনি দেখেছেন ?

আমি দেখি নাই, তবে আমার জ্যাঠা দেখেছে।

তিনি কি নির্বংশ হয়েছেন ?

না, তার তিন ছেলে। এক ছেলে নান্দিনা হাইস্কুলের হেডমাস্টার।

মূর্তিটা কেমন ছিল বলতে পারেন ?

শ্বেতপাথরের মূর্তি। কৃষ্ণনগরের কারিগরের তৈরি। একটা হাত ভাঙা ছিল।

মূর্তি নাকি হঠাৎ উধাও হয়েছে ?

কেউ চুরিটুরি করে নিয়ে বিক্রি করে ফেলেছে। গ্রামে চোরের তো অভাব নেই। এ-রকম একটা মূর্তিতে হাজারখানেক টাকা হেসেখেলে আসবে। সাহেবরা নগদ দাম দিয়ে কিনবে।

আচ্ছা, একটা বাচ্চা মেয়েকে যে বলি দেওয়া হয়েছিল, সে নাকি অমাবস্যার রাত্রে ঘুরে বেড়ায় ?

বলে তো সবাই। চিৎকার করে কাঁদে। আমি শুনি নাই। অনেকে শুনেছে।

অমাবস্যার রাত্রে একটা পাঁচ-ব্যাটারির টর্চ আর একটা মোটা বাঁশের লাঠি নিয়ে মন্দিরের চাতালে বসে রইলেন। তিনি কিছুই শুনলেন না। শেয়ালের ডাক শোনা গেল অবশ্যি। শেষ রাত্রের দিকে প্রচণ্ড বাতাস বইতে লাগল। বাতাসে শিস দেবার মতো শব্দ হলো। সে-সব নিতান্তই লৌকিক শব্দ। অন্য জগতের কিছু নয়। রাত শেষ হবার আগে-আগে বর্ষণ শুরু হলো। ছাতা নিয়ে যাননি। মন্দিরের ছাদ ভাঙা। আশ্রয় নেবার জায়গা নেই। মিসির আলি কাকভেজা হয়ে গেলেন।

ঢাকায় ফিরলেন প্রচণ্ড জ্বর নিয়ে। ডাক্তার পরীক্ষা করে শুকনো মুখে বললেন, মনে হচ্ছে নিউমোনিয়া। একটা লাংস এফেকটেড, ভোগাবে।

মিসির আলিকে সত্যি-সত্যি ভোগাল। তিনি দীর্ঘদিন শয্যাশায়ী হয়ে রইলেন।

১৪

বইপাড়াতে এসময় লোকজন তেমন থাকে না। আজ যেন আরো নির্জন। নীলু একা-একা কিছুক্ষণ হাঁটল। তার খুব ঘাম হচ্ছে। বারবার সবুজ রুমালটি বের করতে হচ্ছে। চারটা দশ বাজে। চিঠিতে লিখেছে সে চারটার মধ্যেই আসবে, কিন্তু আশেপাশে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। নীলু অবশ্যি কারো মুখের দিকে তাকাতেও পারছে না। কাউতে তাকাতে দেখলেই বুকের মধ্যে ধক করে উঠছে।

নীলু একটা বইয়ের দোকানে ঢুকে পড়ল। গল্পের বই তার তেমন ভালো লাগে না। ভালো লাগে বিলুর। বিলুর জন্যে একটা কিছু কিনলে হয়। কিন্তু কী কিনবে ? সবই হয়তো ওর পড়া। ঐ দিন শীর্ষেন্দুর কী-একটা বইয়ের কথা বলছিল। নামটা মনে নেই।

আচ্ছা, আপনাদের কাছে শীর্ষেন্দুর কোনো বই আছে ?

জি-না। আমরা বিদেশী বই রাখি না।

নীলু অন্য একটা ঘরে ঢুকল। শুধু-শুধু দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। সে একটা কবিতার বই কিনে ফেলল। অপরিচিত কবি, তবে প্রচ্ছদটি সুন্দর। একটি মেয়ের ছবি। সুন্দর ছবি। নামটি সুন্দর— প্রেম নেই। কেমন অদ্ভুত নাম। প্রেম নেই আবার কী ? প্রেম থাকবে না কেন ?

দাড়িঅলা একজন রোগা ভদ্রলোক তখন থেকেই তার দিকে তাকাচ্ছে। লোকটির কাঁধে একটি ব্যাগ। এই কি সে! নীলুর মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। নীলু বইয়ের দাম দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে এলো। তার পেছনে ফেরারও সাহস নেই। পেছনে ফিরলেই সে হয়তো দেখবে বুড়ো দাড়িঅলা গুটিগুটি আসছে।

না, লোকটি আসছে না। নীলুর মনে হলো, ভয়ানক মোটা এবং বেঁটে একজন কে যেন তাকে অনুসরণ করছে। তার দিকে তাকাচ্ছে না, কিন্তু আসছে তার পিছুপিছু। নীলুর তৃষ্ণা পেয়ে গেল। বড্ড টেনশন। বাড়ি ফিরে গেলে কেমন হয় ? কিন্তু বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। নীলু ঘড়ি দেখল, পাঁচটা পাঁচ। তার মানে কি যে সে আসবে না ? কথা ছিল নীলু থাকবে ঠিক এক ঘণ্টা।

সে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। ভালোই হয়েছে। দেখা না-হওয়াটাই বোধহয় ভালো। দেখা হবার মধ্যে একটা আশাভঙ্গের ব্যাপার আছে। না-দেখার রহস্যময়তাটাই না হয় থাকুক। নীলু ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাঁটতে শুরু করল।

নীলু।

নীলু দাঁড়িয়ে পড়ল।

একটু দেরি হয়ে গেল। তুমি ভালো আছ নীলু ?

চকচকে লাল টাই-পরা যে-ছেলেটি হাসছে, সে কে ? লম্বা স্বাস্থ্যবান একটি তরুণ। ঝলমল করছে। তার লাল টাই উড়ছে। বাতাসে মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে। সেন্টের

গন্ধ। পুরুষ মানুষের গা থেকে আসা সেন্টের গন্ধ নীলুর পছন্দ নয়। কিন্তু আজ এত ভালো লাগছে কেন?

চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছ কেন? কিছু বলো।

আপনি বলেছিলেন আপনি বুড়ো।

আমরা সবাই কিছু-কিছু মিথ্যা বলি। আমাকে নীলু নামের একটি মেয়ে লিখেছিল, সে দেখতে কুৎসিত।

লোকটি হাসছে হা হা করে। এত সুন্দর করেও মানুষ হাসতে পারে। নীলুর এক ধরনের কষ্ট হতে লাগল। মনে হতে লাগল সমস্তটাই একটা সুন্দর স্বপ্ন, খুবই ক্ষণস্থায়ী। যেন এক্ষুনি স্বপ্ন ভেঙে যাবে। নীলু দেখবে সে জেগে উঠেছে, পাশের বিছানায় বিলু ঘুমাচ্ছে মশারি না ফেলে। কিন্তু সে-রকম কিছু হলো না। ছেলেটি হাসিমুখে বলল, কোথাও বসে এক কাপ চা খেলে কেমন হয়? খাবে?

নীলু মাথা নাড়ল— সে খাবে।

তুমি কিন্তু সবুজ রুমালটি ব্যাগে ভরে ফেলছ। আমি যেতে ঠিক সাহস পাচ্ছি না।

নীলু অস্বাভাবিক ব্যস্ত হয়ে রুমাল বের করতে গেল। একটা লিপস্টিক, একটা ছোট চিরুনি, কিছু খুচরো পয়সা গড়িয়ে পড়ল নিচে। ছেলেটি হাসিমুখে সেগুলো কুড়োচ্ছে। নীলু মনে-মনে বলল— যেন এটা স্বপ্ন না হয়। আর স্বপ্ন হলেও যেন স্বপ্নটা অনেকক্ষণ থাকে। নীলুর খুব কান্না পেতে লাগল।

নিউ মার্কেটের ভেতর চা খাওয়ার তেমন ভালো জায়গা নেই। ওরা বলাকা বিল্ডিংয়ের দোতলায় গেল। চমৎকার জায়গা! অন্ধকার-অন্ধকার চারদিক। পরিচ্ছন্ন টেবিল। সুন্দর একটি মিউজিক হচ্ছে।

চায়ের সঙ্গে কিছু খাবে নীলু?

নাহ্।

এরা ভালো সমুচা করে। সমুচা দিতে বলি? আমার খিদে পেয়েছে। কী, বলব?

বলুন।

ছেলেটি হাসল। নীলুর খুব ইচ্ছা করছিল, জিজ্ঞেস করে— হাসছ কেন তুমি? আমি কি হাস্যকর কিছু করেছি? কিন্তু নীলু কিছু বলল না। ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, আসলে আমি বিজ্ঞাপনটা মজা করবার জন্যে দিয়েছিলাম, কেউ জবাব দেবে ভাবিনি।

আমি ছাড়া কেউ কি লিখেছিল?

তা লিখেছে। মনে হচ্ছে এ দেশের মেয়েদের কাজকর্ম বিশেষ নেই। সুযোগ পেলেই ওরা চিঠি লেখে। এই কথা বললাম বলে তুমি আবার রাগ করলে না তো?

নাহ্।

গুড। আমি কিন্তু শুধু তোমার চিঠির জবাব দিয়েছি। অন্য কারোর চিঠির জবাব দিইনি। আমার কথা বিশ্বাস করছ তো?

করছি।

বেয়ারা চায়ের পট দিয়ে গেল। ছেলেটি বলল, দাও, আমি চা বানিয়ে দিচ্ছি। ঘরে বানাবে মেয়েরা, কিন্তু বাইরে পুরুষেরা— এ-ই নিয়ম।

নীলু লক্ষ করল, ছেলেটি তার কাপে তিন চামচ চিনি দিয়েছে। নীলু একবার লিখেছে সে চায়ে তিন চামচ চিনি খায়। ছেলেটি সেটা মনে রেখেছে। কী আশ্চর্য!

চায়ে এত চিনি খাওয়া কিন্তু ভালো না।

নীলু কিছু বলল না।

এর পর থেকে চিনি কম খাবে।

নীলু ঘাড় নাড়ল।

তারা সন্ধ্যা পর্যন্ত বসে রইল। নীলু একবার বলল, সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে, উঠি?

ছেলেটি বলল, আরেকটু বসো, আমি বাসায় পৌঁছে দেব, আবার সঙ্গে গাড়ি আছে। নীলু আর কিছু বলল না।

একটু দেরি হলে তোমাকে আবার বাসায় বকবে না তো?

নাহ্ বকবে না। আমি মাঝে-মাঝে অনেক রাত করে বাসায় ফিরি।

সেটা ঠিক না নীলু। শহর বড় হচ্ছে, ক্রাইম বাড়ছে। ঠিক না?

হ্যাঁ, ঠিক।

ঐ দিন কী হলো জানো— আমার পরিচিত এক মহিলার কান থেকে টেনে দুল নিয়ে গেছে, রক্তারক্তি কাণ্ড!

আমি বাইরে গেলে গয়না-টয়না পরি না।

না-পরাই উচিত। আচ্ছা নীলু, তুমি কি আজ তোমার বাবার সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেবে?

আপনি যদি চান, দেব।

আমি নিশ্চয়ই চাই। তুমি কি চাও?

চাই, বলতে গিয়ে নীলুর চোখ ভিজে উঠল। ছেলেটিকে এখন কত-না পরিচিত মনে হচ্ছে! সে যদি এখন হাত বাড়িয়ে নীলুর হাত স্পর্শ করে, তাহলে কেমন লাগবে নীলুর? ভালোই লাগবে। কিন্তু ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র। সে এমন কিছুই করবে না।

নীলু, আমি তোমার জন্যে একটা উপহার এনেছিলাম। কিন্তু তার আগে বলো, তুমি কী এনেছ? তুমি বলেছিলে লাল টাই আনবে। ভুলে গেছ, না?

না, ভুলব কেন?

আমি তোমার জন্যেই লাল টাই পরে এসেছি। যদিও লাল রঙ আমার পছন্দ নয়। আমার পছন্দ হচ্ছে— নীল।

নীল আমারও পছন্দ।

তবে হালকা নীল, কড়া নীল নয়।

নীলু এই প্রথম অল্প হাসল। হালকা নীল তার নিজেরও পছন্দ। ছেলেটি হাসতে-হাসতে বলল, আমার সবচে' অপছন্দ হচ্ছে সবুজ রঙ। কিন্তু দেখ, আজ সবুজ রঙটাও খারাপ লাগছে না।

তারা উঠে দাঁড়াল সাড়ে আটটার দিকে। হেঁটে-হেঁটে এলো নিউমার্কেটের গেটে। ছোট্ট একটা হোন্ডা সিভিক সেখানে পার্ক করা। ছেলেটি ঘড়ি দেখে বলল, রাত কি বেশি হয়ে গেল নীলু ?

না, বেশি হয়নি।

তোমার বাবা দুশ্চিন্তা না-করলে হয়। আমি চাই না আমার জন্যে কেউ বকা খাক। অবশ্যি এক-আধ দিন বকা খেলে কিছু যায়-আসে না, কী বলো ?

নীলু হাসল। ছেলেটিও হাসল। মার্জিত হাসি।

সরাসরি বাসায় যাবে, নাকি যাবার আগে আইসক্রিম খাবে ? ধানমণ্ডিতে একটা ভালো আইসক্রিমের দোকান দিয়েছে।

আজ আর যাব না।

ঠিক আছে, চল বাসায় পৌঁছে দিই।

ছেলেটি নীলুকে তাদের গেটের কাছে নামিয়ে দিল। নীলুর খুব ইচ্ছে করছিল তাকে বসতে বলে, কিন্তু তার বড্ড লজ্জা করল। বিলু নানান প্রশ্ন শুরু করবে।

১৫

স্যার, ভেতরে আসব ?

এসো। কী ব্যাপার ?

মিসির আলি মেয়েটিকে ঠিক চিনতে পারলেন না। তিনি কখনো তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের চিনতে পারেন না।

স্যার, আমার নাম নীলু, নীলুফার।

ও, আচ্ছা।

মিসির আলি পরিচিত ভঙ্গিতে হাসলেন। কিন্তু নামটি তার কাছে অপরিচিত লাগছে। এও এক সমস্যা। কারো নাম তিনি মনে রাখতে পারেন না। তার ভ্রূ কুঞ্চিত হলো। নামে মনে না-করতে পারার একটিই কারণ— মানুষের প্রতি তার আগ্রহ নেই। আগ্রহ থাকলে নাম মনে থাকত।

স্যার, আপনি কি আমাকে চিনতে পারছেন ? আমি সেকেন্ড ইয়ারের। একদিন এসেছিলাম আমরা চার বন্ধু।

ও হ্যাঁ। এসেছিলে তোমরা। মনে পড়েছে। আজ কী ব্যাপার ?

মেয়েটি ইতস্তত করতে লাগল। তার মানে কী ? কমবয়েসী মেয়েদের তিনি এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেন। তরলমতি মেয়েরা মাঝে-মাঝে অনেক অদ্ভুত কাণ্ডকারখানা করে বসে।

তোমার কী ব্যাপার, বলো।

স্যার, আমি ঐ ইএসপির টেস্টটা আবার দিতে চাই।

একবার তো দিয়েছ। আবার কেন ?

মিসির আলি বিস্মিত হলেন। এই মেয়েটির মতিগতি তিনি বুঝতে পারছেন না।

স্যার, আমার মনে হয়, এবার পরীক্ষা করলে দেখা যাবে— আমার ইএসপি আছে।

এরকম মনে হবার কারণ কী ?

মেয়েটি উত্তর না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। লক্ষণ ভালো নয়। মিসির আলি গম্ভীর গলায় বললেন, এখন আমি একটু ব্যস্ত আছি। অন্য একদিন এসো।

মেয়েটি তবুও কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইল।

তুমি কি অন্যকিছু বলতে চাও ?

জি-না স্যার। আমি যাই। স্লামালিকুম।

মিসির আলি গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। এ মেয়েটিকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। এরা সহজেই একটা ঝামেলা বাধিয়ে দিতে পারে। এরকম সুযোগ দেওয়া ঠিক না।

বারোটায় একটা ক্লাস ছিল। মিসির আলি গিয়ে দেখলেন কোনো ছাত্র-ছাত্রী নেই। কোনো স্ট্রাইক হচ্ছে কি ? এরকম কিছু শোনেননি। সামনে হয়তো টার্ম পরীক্ষা আছে। টার্ম পরীক্ষা থাকলে ছাত্ররা দল বেঁধে আসা বন্ধ করে দেয়। মিসির আলি ভ্রু কুঁচকে খালি ক্লাসে মিনিট পাঁচেক বসে রইলেন। গত রাতে অসুস্থ শরীরে এই ক্লাসটির জন্যে পড়াশোনা করেছেন। এ-অবস্থা হবে জানলে সকাল-সকাল শুয়ে পড়তে পারতেন। ছাত্রশূন্য একটি ক্লাসে তিনি খাতাপত্র নিয়ে গম্ভীর হয়ে বসে আছেন— হাস্যকর দৃশ্য। অনেকেই করিডোর দিয়ে হাঁটবার সময় তাকে কৌতূহলী হয়ে দেখল। পাগল-টাগল ভাবছে বোধহয়। মিসির আলি উঠে পড়লেন।

আজকের দিনটিই শুরু হয়েছে খারাপভাবে। একটি কাজও ঠিকমতো হচ্ছে না। মিসির আলি ক্রমেই বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলেন। তার কপালের মাঝখানে ব্যথা শুরু হলো। এই উপসর্গটি নতুন। ব্লাড-প্রেসার-ট্রেসার হয়েছে বোধহয়। ডাক্তার দেখাতে হবে।

তিনি বাড়ি ফিরলেন তিনটার দিকে। এই অসময়েও বসার ঘরে কে যেন বসে আছে। সমস্ত দিনটিই যে খারাপ যাবে, এটা হচ্ছে তার প্রমাণ। গ্রামের বাড়ি থেকে টাকাপয়সা চাইতে কেউ এসেছে নির্ঘাত।

কে ?

জি, আমি আনিস।

আনিস সাহেব, আপনি এই সময়ে! অফিস নেই ?

ছুটি নিয়ে এলাম।

ব্যাপার কী ?

রানুর শরীরটা বেশি খারাপ। ভাবলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করে যাই।

ভালোই করেছেন। বসেন, চা-টা দিয়েছে ?

জি, চা খেয়েছি। আপনার ভাই ছিলেন এতক্ষণ।

বসুন, আমি কাপড় ছেড়ে আসি।

লোকটি জড়সড় হয়ে বসে আছে। মিসির আলি লক্ষ করলেন, তার চোখের নিচে কালি পড়েছে। তার মানে রাতে ঘুমাতে পারছে না। এরকম হওয়ার কথা নয়। মিসির আলি চিন্তিত মুখে ভেতরে ঢুকলেন। তার ফিরে আসতে অনেক সময় লাগল।

এখন বলেন, ব্যাপারটা কী ?

আনিস ইতস্তত করে বলল, ভূতপ্রেত বলে সত্যি কিছু আছে ?

এই কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ?

আনিস মুখ কালো করে বলল, অনেক রকম কাণ্ডকারখানা হচ্ছে। আমি কনফিউজড হয়ে গেছি।

অর্থাৎ এখন ভূতপ্রেত বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন ?

আনিস চুপ করে রইল।

এর কারণটা বলেন, শুনি।

নানারকম শব্দ হয় ঘরে।

তাই নাকি ? আপনি নিজে শোনেন ?

জি, শুনি। গন্ধও পাই, ফুলের গন্ধ।

আপনি পান, না আপনার স্ত্রী পান ?

রানু প্রথম পায়, তারপর আমি পাই।

মিসির আলি চুরুট ধরালেন। আনিস বলল, গত রাতে ঘরের মধ্যে কেউ যেন নূপুর পায়ে হাঁটছিল।

এই নূপুরের শব্দ প্রথম কে শোনে ? আপনার স্ত্রী ?

জি।

তারপর আপনাকে বলার পর আপনি শুনতে পান।

জি।

আনিস সাহেব, এটাকে বলা হয় ইনডিউসড অডিটরি হেলুসিনেশন। আপনার মন দুর্বল। আপনার স্ত্রী যখন বলেন শব্দ শুনতে পাচ্ছেন, তখন আপনিও তা শুনতে থাকেন। ব্যাপারটি আপনার মনোজগতে। আসলে কোনো শব্দ হচ্ছে না।

আনিস দীর্ঘ সময় চুপ করে থেকে বলল, আপনি যদি একবার আসেন আমাদের বাসায়, আপনি নিজেও শুনবেন।

না ভাই, আমি শুনব না। আমি খুব শক্ত ধরনের মানুষ। খুবই যুক্তিবাদী লোক আমি।

আপনি আসেন-না একবার।

ঠিক আছে, যাব।

কবে আসবেন ? আজ আসতে পারবেন ?

আমি কাল-পরশুর মধ্যে একবার যাব।

আমাদের বাড়িঅলার খুব সুন্দর ফুলের বাগান আছে। প্রচুর গোলাপও আছে। বিকেলের দিকে গেলে সেটাও দেখতে পারবেন।

মিসির আলি কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বললেন, বড় ফুলের বাগান ?

জি।

আনিস সাহেব, এমন কি হতে পারে না, বাতাসে নিচের বাগান থেকে ফুলের সৌরভ ভেসে আসে, সেই সৌরভকে আপনি একটি আধ্যাত্মিক রূপ দেন ? হতে পারে ?

পারে, কিন্তু শব্দটা ?

কোনো একটা ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে। মস্তিষ্ক খুব অদ্ভুত জিনিস, আনিস সাহেব। সে আপনাকে এমন সব জিনিস দেখাতে বা শোনাতে পারে, যার আসলে কোনো অস্তিত্ব নেই। আপনি কি উঠছেন ?

জি।

আচ্ছা ঠিক আছে, যান। আমার নিজেরও মাথা ধরেছে। দুটো প্যারাসিটামল খেয়েছি, লাভ হচ্ছে না। জ্বরও আসছে বলে মনে হয়। শরীরটা গেছে। বেশি দিন বাঁচব না।

১৬

পত্রিকা খুলে নীলু অবাক হলো। সেই বিজ্ঞাপনটি আবার ছাপা হয়েছে। কথাগুলো এক। জিপিও বক্স নাম্বারও ৭৩। শিরোনামটিও আগের মতো— কেউ কি আসবেন ? এর মানে কী ? নীলুর ধারণা ছিল, এই বিজ্ঞাপনটি আর কোনো দিন ছাপা হবে না। এর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু এখন তা মনে হচ্ছে না। নীলুর ইচ্ছা হলো দরজা বন্ধ করে কিছুক্ষণ কাঁদার। সে মুখ কালো করে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। বারান্দায় তার জন্যে একটা বড় ধরনের চমক অপেক্ষা করছিল। মিসির আলি সাহেব দাঁড়িয়ে। তিনি বললেন, এখানে কি আনিস সাহেব থাকেন ?

স্যার আপনি ? আমাকে চিনতে পেরেছেন ?

ও ইয়ে, তুমি। আমার ছাত্রী। কোন ইয়ার ?

থার্ড ইয়ার স্যার। নীলু আমার নাম। নীলুফার ।

ও আচ্ছা। নীলুফার— তোমাদের তেতলায় আনিস সাহেব থাকেন নাকি ?

জি।

তাঁর কাছে এসেছি। উঠবার রাস্তা কোন দিকে ?

নীলু তাঁকে সঙ্গে করে তিনতলায় নিয়ে গেল।

ফেরবার পথে আমাদের বাসা হয়ে যাবেন স্যার। যেতেই হবে।

আচ্ছা দেখি।

দেখাদেখি না স্যার, আপনি আসবেন।

আনিস ঘরে ছিল না। রানু তাঁকে নিয়ে বসাল। সে খুবই অবাক হয়েছে। মিসির আলি বললেন, খুব অবাক হয়েছেন মনে হচ্ছে ?

আপনি-আপনি করে বলছেন কেন ?

ও আচ্ছা, তুমি-তুমি করে বলতাম, তাই না ? ঠিক আছে। এখন বলো, আমাকে দেখে অবাক হয়েছ ?

হ্যাঁ।

খুব অবাক হয়েছ ?

জি। আপনি আসবেন ভাবতেই পারিনি।

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে হাসিমুখে বললেন, তুমি তো শুনেছি সব কিছু আগে বলে দিতে পার, এটি তো পারার কথা ছিল।

রানু থেমে-থেমে বলল, আপনি লোকটি বেশ অদ্ভুত!

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। আপনার যুক্তিও খুব ভালো, বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয়।

বিশ্বাস করলেই পার। আনিস সাহেব কখন আসবেন ?

এসে পড়বে।

আমাকে একটু চা খাওয়াও। আর শোন, তোমাদের একটা কাজের ছেলে আছে নাকি ? ওকে পাঠাও তো আমার কাছে।

ওকে কী জন্যে ?

কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করব।

মিসির আলি : কী নাম ?

জিতু : জিতু মিয়া।

মিসির আলি   দেশ কোথায় ?

জিতু : টাঙ্গাইল।

মিসির আলি   শুনলাম দু'একদিন আগে তুমি নাকি রাতেরবেলা কী একটা দেখে ভয় পেয়েছ ?

জিতু : জি, পাইছি।

মিসির আলি : কী দেখেছ ?

জিতু   পাকের ঘরে একজন মেয়েমানুষ। হাঁটাচলা করতাছে।

মিসির আলি : সুন্দরী ?

জিতু : জি, খুব সুন্দর!

মিসির আলি : রান্নাঘরে তো বাতি জ্বালানো ছিল ?

জিতু : জি না।

মিসির আলি : অন্ধকারে তুমি মানুষ কীভাবে দেখলে ?

জিতু : নিশ্চুপ।

মিসির আলি   আচ্ছা জিতু মিয়া, তুমি যাও। শোন, এক প্যাকেট সিগারেট নিয়ে এসো আমার জন্যে। ক্যাপস্টান। নাও, টাকাটা নাও।

জিতু মিয়া চলে গেল। রানু ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, ইউনিভার্সিটির সব মাস্টাররাই কি আপনার মতো বুদ্ধিমান ?

না। আমার নিজের বুদ্ধি একটু বেশি। আচ্ছা, এখন যে খুটখাট শব্দ শোনা যাচ্ছে, এই শব্দটার কথাই কি আনিস সাহেব আমাকে বলেন ?

রানু জবাব দিল না। মিসির আলি কান পেতে শুনলেন।

শব্দটা তো বেশ স্পষ্ট। রান্নাঘর থেকে আসছে না ?

হুঁ।

এই শব্দটার কথাই আনিস সাহেব বলেন, তাই না ?

বোধহয়। আপনি রান্নাঘর দেখবেন ? আপনি যাওয়ামাত্রই শব্দ থেমে যাবে।

শব্দটা বেশিরভাগই রান্নাঘরে হয় ?

জি।

ইঁদুর-মারা কিছু বিষ ছড়িয়ে দিও, আর শব্দ হবে না। ওটা ইঁদুরের শব্দ। রান্নাঘরে খাবারের লোভে ঘোরাঘুরি করে। সে জন্যেই শব্দটা বেশি হয় রান্নাঘরে। বুঝলে ?

হুঁ।

যুক্তিটা পছন্দ হচ্ছে না মনে হয়।

যুক্তি ভালোই। আরেক কাপ চা খাবেন ?

নাহ্, এখন উঠব। আনিস সাহেব মনে হয় আজ আর আসবেন না।

না, আপনি আরেকটু বসুন। আপনাকে একটা গল্প বলব।

আজ আর না, রানু। মাথা ধরেছে।

মাথা ধরলেও আপনাকে শুনতে হবে। বসুন, আমি চা আনছি। প্যারাসিটামল খাবেন ?

ঠিক আছে।

চা আসবার আগেই আনিস এসে পড়ল। তার অফিসে নাকি কী একটা ঝামেলা হয়েছে। দশ হাজার টাকার একটা চেকের হিসাবে গণ্ডগোল। চেকটা ইস্যু হয়েছে আনিসের অফিস থেকে। আনিসের চোখে-মুখে ক্লান্তি। মিসির আলি বললেন, আপনি বিশ্রাম-টিশ্রাম করেন। আমার জন্যে ব্যস্ত হবেন না। আমি রানুর কাছ থেকে একটা গল্প শুনব।

কী গল্প ?

জানি না কী গল্প। ভয়ের কিছু হবে।

রানু বলল, না, ভয়ের না। তুমি গোসল-টোসল সেরে এসে চা খাও।

আমি গল্পটা শুনতে পারব না ?

নাহ্। সব গল্প সবার জন্যে না।

আনিসের কপালে সূক্ষ্ম ভাঁজ পড়ল। সে কিছু বলল না। বাথরুমে ঢুকে পড়ল। রানু তার গল্প শুরু করল খুব শান্ত গলায়। মিসির আলি তাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ করতে লাগলেন।

রানুর দ্বিতীয় গল্প

আমার তখন মাত্র বিয়ে হয়েছে। সপ্তাহখানেকও হয়নি। সেই সময় এক কাণ্ড হলো।

আমার বিয়ে হয়েছিল শ্রাবণ মাসের ছ'তারিখে। ঘটনাটা ঘটল শ্রাবণ মাসের চৌদ্দ তারিখ। সকালবেলা আমার এক মামাশ্বশুর এসে ওকে নিয়ে গেলেন মাছ মারতে। নৌকায় করে মাছ মারা হবে। নৌকা বড় গাঙ দিয়ে যাবে সোনাপোতার

বিলে। বড়শি ফেললেই সেখানে বড় বড় বোয়াল মাছ পাওয়া যায়। বর্ষাকালের বোয়ালের কোনো স্বাদ নেই জানেন তো ? কিন্তু সোনাপোতার বোয়ালে বর্ষাকালেই নাকি সবচেয়ে বেশি তেল হয়।

দুপুরের পর থেকেই হঠাৎ করে খুব দিন খারাপ হলো। বিকেল থেকে বাতাস বইতে লাগল। আমরা সবাই চিন্তিত হয়ে পড়লাম। ওরা আর ফেরে না। সন্ধ্যার পর থেকে শুরু হলো প্রচণ্ড ঝড়। বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেল।

আমাদের বাড়িটা হচ্ছে কাঠের। কাঠের দোতলা। আমি একা-একা দোতলায় উঠে গেলাম। দোতলার কোনার দিকের একটা ঘরে আজেবাজে জিনিস রাখা হয়।

স্টোররুমের মতো। কেউ সেখানে যায়-টায় না। আমি ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে কাঁদতে শুরু করলাম। তখন হঠাৎ একটি মেয়ের কথা শুনতে পেলাম। মেয়েটি খুব নিচুস্বরে বলল— সোনাপোতার বিলে ওদের নৌকা ডুবে গেছে। কিছুক্ষণ আগেই ডুবেছে। এটা শোনার পর আমি অজ্ঞান হয়ে যাই।

মিসির আলি বললেন, এইটুকুই গল্প ?

হ্যাঁ।

গল্পের কোনো বিশেষত্ব লক্ষ করলাম না।

বিশেষত্ব হচ্ছে, সেদিন সন্ধ্যায় ওদের সত্যি-সত্যি নৌকাডুবি হয়েছিল। এর কোনো ব্যাখ্যা আছে আপনার কাছে ?

আছে। ঝড়বৃষ্টি হচ্ছিল, কাজেই তোমার মনে ছিল অমঙ্গলের আশঙ্কা। অবচেতন মনে ছিল নৌকাডুবির কথা। অবচেতন মনই কথা বলেছে তোমার সঙ্গে। মানুষের মন খুব বিচিত্র রানু। আমি উঠলাম।

মিসির আলি উঠে দাঁড়ালেন। রানু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল, একতলার নীলু নামের যে মেয়েটি আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছে, সে আপনার জন্যে বারান্দায় অপেক্ষা করছে। যাবার সময় ওর সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

মিসির আলি বিস্মিত হয়ে বললেন, তাতে কী!

রানু বলল, নীলু এই মুহূর্তে কী ভাবছে তা আমি বলতে পারব। ওকে জিজ্ঞেস করলেই দেখবেন আমি ঠিকই বলেছি। আমি অনেক কিছুই বলতে পারি।

নীলু কী ভাবছে ?

নীলু ভাবছে একজন অত্যন্ত সুপুরুষ যুবকের কথা।

সেটাই তো স্বাভাবিক। একজন অবিবাহিত যুবতী একজন সুপুরুষ যুবকের কথাই ভাবে। এটা বলার জন্যে কোনো অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার দরকার হয় না, রানু।

মিসির আলি নেমে গেলেন। নীলু সত্যি-সত্যি বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে খুব অনুরোধ করল যাতে স্যার এক কাপ চা খেয়ে যান। কিন্তু মিসির আলি বসলেন না।

তাঁর প্রচণ্ড মাথা ধরেছে। প্যারাসিটামল কাজ করছে না। সারাজীবন তিনি এত ওষুধ খেয়েছেন যে ওষুধ তাঁর ওপর এখন আর কাজ করে না। খুব খারাপ লক্ষণ।

১৭

নীলুর বাবা বারান্দায় বসেছিলেন। নীলুকে বেরোতে দেখে তিনি ডাকলেন, নীলু, কোথায় যাচ্ছ মা ?

একটু বাইরে যাচ্ছি।

কিন্তু এইটুকু বলতেই নীলুর গলা কেঁপে গেল। গাল লাল হলো। তিনি তা লক্ষ করলেন। বিস্মিত গলায় বললেন, বাইরে কোথায় ? নীলু জবাব দিল না।

কখন ফিরবে মা ?

আটটা বাজার আগেই ফিরব।

গাড়ি নিয়ে যাও।

গাড়ি লাগবে না। তোমার কিছু লাগবে বাবা, চা বানিয়ে দিয়ে যাব ?

না, চা লাগবে না। একটু সকাল-সকাল ফিরিস মা। শরীরটা ভালো না।

সকাল-সকালই ফিরব।

বিকেলের আলো নরম হয়ে এসেছে। সব কিছু দেখতে অন্য রকম লাগল নীলুর চোখে। নিউ মার্কেটের পরিচিত ঘরগুলিও যেন অচেনা। যেন ওদের এক ধরনের রহস্যময়তা ঘিরে আছে।

কেমন আছ নীলু ?

নীলু তৎক্ষণাৎ তাকাতে পারল না। তার লজ্জা করতে লাগল। তার ভয় ছিল আজ হয়তো সে আসবে না। প্রিয়জনের দেখা তো এত সহজে পাওয়া যায় না।

আজ তুমি দেরি করে এসেছ। পাঁচ মিনিট দেরি। তোমার তার জন্যে শাস্তি হওয়া দরকার।

কী শাস্তি ?

সেটা আমরা চা খেতে খেতে ঠিক করব। খুব চায়ের পিপাসা হয়েছে।

কোথায় চা খাবেন ?

এইখানে কোথাও। আর শোন নীলু, চা খেতে খেতে তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। খুব জরুরি কথা।

এখন বলুন। হাঁটতে-হাঁটতে বলুন।

নাহ্। এই কথা হাঁটতে হাঁটতে বলা যায় না। বলতে হয় মুখোমুখি বসে। চোখের দিকে তাকিয়ে।

নীলুর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। নিশ্বাস ভারি হয়ে এলো। সে কোনোমতে বলল, ঠিক আছে, চলুন কোথাও বসি।

কী বলতে চাই তা কি বুঝতে পারছ ?

নাহ্।

বুঝতে পারছ, নীলু। মেয়েরা এইসব জিনিস খুব ভালো বুঝতে পারে।

নীলুর গা কাঁপতে লাগল। অন্য এক ধরনের আনন্দ হচ্ছে। অন্য এক ধরনের সুখ। মনে হচ্ছে পৃথিবীতে এখন আর কেউ নেই। চারিদিকে সীমাহীন শূন্যতা। শুধু তারা দু'জন হাঁটছে। হেঁটেই চলেছে। কেমন যেন এক ধরনের কষ্টও হচ্ছে বুকের মধ্যে।

ওরা একটি রেস্টুরেন্টে গিয়ে বসল।

চায়ের সঙ্গে আর কিছু খাবে ?

না।

খাও না! কিছু খাও।

সে বয়কে ডেকে কী যেন বলল। নীলু শুনতে পেল না। কোনো কিছুতেই তার মন বসছে না। সব তার কাছে অস্পষ্ট লাগছে।

কী নীলু, কিছু বলো। চুপ করে আছ কেন ?

কী বলব ?

যা ইচ্ছা বলো।

নীলু ইতস্তত করে বলল, আপনি ঐ বিজ্ঞাপনটা আবার দিয়েছেন কেন ?

সে হাসল শব্দ করে।

দেখেছ বিজ্ঞাপনটা ?

হ্যাঁ।

মন-খারাপ হয়েছে ?

নীলু কিছু বলল না।

বলো, মন-খারাপ হয়েছে ?

হ্যাঁ।

সে আবার শব্দ করে হাসল। তার পর ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, আমি পত্রিকার অফিসে টাকা দিয়ে রেখেছিলাম। কথা ছিল প্রতি মাসে দু'বার করে ছাপবে। তোমার সঙ্গে দেখা হবার পর তার আর প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু সেটা বলা হয়নি। আগামী কাল বন্ধ করে দেব। এখন খুশি তো ?

নীলু জবাব দিল না।

বলো, এখন তুমি খুশি ? এইভাবে চুপ করে থাকলে হবে না, কথা বলতে হবে। বলো, তুমি খুশি ?

হুঁ।

সে আরেক দফা চায়ের অর্ডার দিয়ে একটা সিগারেট ধরাল। খানিকক্ষণ দু'জনেই কোনো কথা বলল না। বাইরে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। পৃথিবী বড় সুন্দর গ্রহ। এতে বেঁচে থাকতে সুখ আছে।

নীলু!

হুঁ।

তোমাকে যে কথাটি আমি বলতে চাচ্ছিলাম সেটি বলি ?

বলুন।

দেখ নীলু, সারা জীবন পাশাপাশি থেকেও এক সময় একজন অন্যজনকে চিনতে পারে না। আবার এমনও হয়, এক পলকের দেখায় একে অন্যকে চিনে ফেলে। ঠিক না ?

নীলু জবাব দিল না।

বলো, ঠিক না ?

হ্যাঁ।

তোমাকে প্রথম দিন দেখেই...।

সে চুপ করে গেল। নীলুর চোখে জল এলো।

নীলু, আজ যদি তোমাকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই, তাহলে তোমার আপত্তি আছে ?

নীলু ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল। জবাব দিল না। সে মুখ ঘুরিয়ে বসেছিল। সে তার চোখের জল তাকে দেখাতে চায় না।

বলো নীলু, আপত্তি আছে ?

আমাকে আটটার মধ্যে বাড়ি ফিরতে হবে।

আটটার আগেই আমরা বাড়ি ফিরব। এসো উঠি।

সে নীলুর হাত ধরল। ভালোবাসার স্পর্শ, যার জন্যে তরুণীরা সারা জীবন প্রতীক্ষা করে থাকে।

১৮

রানু আজ অসময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুম যখন ভাঙল তখন দিন প্রায় শেষ। আকাশ লালচে হতে শুরু করেছে। সে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। নিচের বারান্দায় বিলু হাঁটছে একা-একা। রানুর কেমন জানি অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। যেন কোথাও কিছু একটা

অস্বাভাবিকতা আছে, সে ধরতে পারছে না। নিচে থেকে বিলু ডাকল, রানু ভাবি, চা খেলে নেমে এসো, চা হচ্ছে।

চা খাব না।

আস না বাবা! ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার বলব। কুইক।

রানু নেমে গেল। তার মাথায় সূক্ষ্ম একটা যন্ত্রণা হচ্ছে। কিছুই ভালো লাগছে না। বমিবমি ভাব হচ্ছে।

বারান্দায় নীলুর বাবাও ছিলেন। ওপর থেকে তাকে দেখা যায়নি। তিনি নরম স্বরে বললেন, এখন তুমি কেমন আছ মা ?

জি, ভালো।

আমি আনিস সাহেবকে বলেছি বড় একজন ডাক্তার দেখাতে। পিজির একজন প্রফেসর আছেন, আমার আত্মীয়, তাঁকে আমি বলে দেখতে পারি। তুমি আলাপ করো আনিসের সাথে, কেমন ?

জি, করব।

বিলু বলল, বাবা ঘরে গিয়ে তুমি চা খাও। তোমার ঠান্ডা লেগে যাবে। আমরা দু'জন বাগানে বসি। ভদ্রলোক চলে গেলেন সঙ্গে সঙ্গে।

রানু বলল, নীলু কোথায় ?

ওর এক বন্ধুর বাড়ি গেছে।

বন্ধুর বাড়ি যাওয়া এমন কোনো ব্যাপার নয়, তবু কেন জানি রানুর বুকে ধক করে একটা ধাক্কা লাগল। ভোঁতা এক ধরনের যন্ত্রণা হতে লাগল মাথায়। বিলু বলল, রানু ভাবি, তোমাকে একটা গোপন কথা বলছি। টপ সিক্রেট, কাউকে বলবে না।

না, বলব না।

ইভেন নীলু আপাকেও নয়। কারণ কথাটা তাকে নিয়েই।

ঠিক আছে কাউকে বলব না।

নীলু আপা ডুবে-ডুবে জল খাচ্ছে। আজকে সকালে টের পেয়েছি।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ। নীলু আপার ট্রাঙ্ক ঘাঁটতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি। জনৈক ভদ্রলোক দারুণ সব রোমান্টিক চিঠি লিখেছে নীলু আপাকে। খুব লদকা-লদকি।

বিলু হাসল। রানু কিছু বলল না। তার মাথার যন্ত্রণাটা ক্রমেই বাড়ছে।

দু-একটা চিঠি পড়ে দেখতে চাও ?

না, না। অন্যের চিঠি।

আহ্ পড় না, কেউ তো জানতে পারছে না। আমরা ব্যাপারটা টপ সিক্রেট রাখব, তাহলেই তো হলো।

না বিলু, আমি চিঠি পড়ব না।

পড়ব না বললে হবে না। পড়তেই হবে। দাঁড়াও আমি নিয়ে আসছি। যে আলো আছে তাতে দিব্যি পড়তে পারবে।

বিলু ঘর থেকে চিঠি নিয়ে এলো। রানু চিঠিটি হাতে নিয়ে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বিলু অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে ?

না, কিছু হয়নি।

এরকম করছ কেন ?

মাথা ধরেছে। বড্ড মাথা ধরেছে।

প্যারাসিটামল এনে দেব ? তুমি চিঠিটা পড়ে আমাকে বলো ভদ্রলোক সম্পর্কে তোমার কী ধারণা।

রানু চিঠি পড়ল। বিলু বলল, বলো, তোমার কী মনে হয় ?

রানু কিছু বলল না। এক হাতে মাথার চুল টেনে ধরল।

তোমার কী হয়েছে ?

বড্ড শরীর খারাপ লাগছে। আমি এখন যাই।

চা খাবে না ?

না। বিলু, নীলু কখন ফিরবে— বলে গেছে ?

না। সন্ধ্যার আগে আগেই ফিরবে বোধহয়। তোমার কি শরীর বেশি খারাপ লাগছে ?

হ্যাঁ।

তা হলে যাও, শুয়ে থাক গিয়ে।

রানু ওপরে উঠে এলো। ঘর অন্ধকার। বাতি জ্বালাতে ইচ্ছে হলো না। শুয়ে পড়ল বিছানায়। আনিস আজ ফিরতে দেরি করবে। তার অফিসে কী সব নাকি ঝামেলা হচ্ছে ? রানু ডাকল, জিতু— জিতু মিয়া। কেউ সাড়া দিল না। জিতু কি বাসায় নেই ? জিতু— জিতু। কোনো উত্তর নেই। জিতু মিয়া ইদানীং বেশ লায়েক হয়েছে। রানু কিছু বলে না বলেই হয়তো বিকেলে খেলতে গিয়ে সন্ধ্যা পার করে বাড়ি ফেরে। বকাঝকা তার গায়ে লাগে না।

রান্নাঘরে খুটখুট শব্দ হচ্ছে। ইঁদুর। নিশ্চয়ই ইঁদুর। তবু রানু বলল, কে ? খুটখুট শব্দ থেমে গেল। ইঁদুর ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু সেই গন্ধটা আবার পাওয়া যাচ্ছে। কড়া ফুলের গন্ধ। রানুর ইচ্ছে হলো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে। রানু দুর্বল গলায় ডাকল, জিতু, জিতু মিয়া! আর ঠিক তখন কে একজন ডাকল, রানু রানু! এই ডাক রানুর চেনা। এই জীবনে সে অনেকবার শুনেছে। তবে এটা কিছু নয়। প্রফেসর সাহেব বলছেন, অডিটরি হেলুসিনেশন। আসলেই তাই। এছাড়া আর কিছু নয়।

রানু! রানু!

কে ? তুমি কে ?

রানুর মনে হলো কেউ একজন যেন এগিয়ে আসছে। তার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ছোট্ট-ছোট্ট পা নিশ্চয়ই। হালকা শব্দ। পায়ে কি নূপুর আছে ? নূপুর বাজছে ?

রানু।

রানু চোখ বন্ধ করে ফেলল। এসব সত্যি নয়, চোখের ভুল। রানু দুর্বল গলায় বলল, তুমি কে ?

আমাকে তুমি চিনতে পারছ না ?

না।

কিশোরীর গলায় মৃদু হাসি শোনা গেল।

তাকাও রানু। তাকালেই চিনবে।

আমি চিনতে চাই না।

তোমার বন্ধু নীলুর খুব বিপদ রানু। একদিন তোমার যে বিপদ ঘটতে যাচ্ছিল, তার চেয়েও অনেক বড় বিপদ।

দরজায় ধাক্কা পড়ছে। জিতু এসেছে বোধহয়। রানু তাকাল, কোথাও কেউ নেই। ফুলের গন্ধ কমে আসছে। জিতু মিয়া বাইরে থেকে ডাকল, আম্মা, আম্মা! রানু উঠে দরজা খুলল।

আপনের কী হইছে ?

কিছু হয়নি।

রানু এসে শুয়ে পড়ল। তার গায়ে প্রচণ্ড জ্বর। সে বিছানায় ছটফট করতে লাগল। কখন আসবে আনিস ? কখন আসবে ?

জিতু!

জি।

নিচে গিয়ে দেখে আয় তো— নীলু ফিরেছে নাকি।

জিতু ফিরে এসে জানাল, এখনো আসেনি। রানু একটি নিশ্বাস ফেলে ঘড়ি দেখল, আটটা বাজতে চার মিনিট বাকি। কখন আসবে আনিস ?

১৯

সারাটা পথ নীলু চুপ করে রইল। একবার সে বলল, কী ব্যাপার, এত চুপচাপ যে ? নীলু তারও জবাব দিল না। তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। সে আছে একটা ঘোরের মধ্যে।

গান শুনবে ? গান দেব ?

নীলু মাথা নাড়ল। সেটা হ্যাঁ কী না, তাও স্পষ্ট হলো না।

কী গান শুনবে? কান্ট্রি মিউজিক? কান্ট্রি মিউজিকে কার গান তোমার পছন্দ?

নীলু জবাব দিল না।

আমার ফেবারিট হচ্ছে জন ডেনভার। জন ডেনভারের রকি মাউন্টেন হাই গানটা শুনেছ?

না।

খুব সুন্দর! অপূর্ব মেলোডি!

সে ক্যাসেট টিপে দিতেই জন ডেনবারের অপূর্ব কণ্ঠ শোনা গেল, ক্যালিফোর্নিয়া রকি মাউন্টেন হাই।

কেমন লাগছে নীলু?

ভালো।

শুধু ভালো না। বেশ ভালো।

সেও জন ডেনভারের সঙ্গে গুনগুন করতে লাগল। নীলুর মনে হলো, ওর গানের গলাও তো চমৎকার! একবার ইচ্ছে হলো জিজ্ঞেস করে— গান জানেন কিনা? কিন্তু সে কিছু জিজ্ঞেস করল না। তার কথা বলতে ইচ্ছে হচ্ছে না। গাড়ি কোন দিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছে তাও সে লক্ষ করছে না। একবার শুধু ট্রাফিক সিগনালে গাড়ি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। একজন ভিখিরি এসে ভিক্ষা চাইল। সে ধমকে উঠল কড়া গলায়। তারপর আবার গাড়ি চলল। নীলু ফিসফিস করে বলল, কটা বাজে?

সাতটা পঁয়ত্রিশ। তোমাকে আটটার আগেই পৌঁছে দেব।

আপনার বাড়ি মনে হয় অনেক দূর?

শহর থেকে একটু দূরে বাড়ি করেছি। কোলাহল ভালো লাগে না। 'ফার ফ্রম দি ম্যাডিং ক্রাউড' কার লেখা জানো?

নাহ্।

টমাস হার্ডির। পড়ে দেখবে, চমৎকার! অথচ ট্র্যাজেডি হচ্ছে, টমাস হার্ডিকেই নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়নি। তুমি তার কোনো বই পড়েছ?

না।

পড়ে দেখবে। খুব রোমান্টিক ধরনের রাইটিং।

গাড়ি ছুটে চলেছে মিরপুর রোড ধরে। হঠাৎ নীলু বলল, আমার ভালো লাগছে না।

কী বললে?

আমার ভালো লাগছে না, আমি বাসায় যাব।

সে তাকাল নীলুর দিকে। একটি হাত বাড়িয়ে ক্যাসেটের ভল্যুম বাড়িয়ে দিল। গাড়ির গতি কমলো না।

আমি বাসায় যাব।

আটটার সময় আমি তোমাকে বাসায় পৌঁছে দেব।

না, আজ আমি কোথাও যাব না। প্লিজ গাড়িটা থামান! আমি নেমে পড়ব।

কেন ?

আমার ভালো লাগছে না। প্লিজ!

সে তাকাল নীলুর দিকে। নীলু শিউরে উঠল। এ কেমন চাউনি! যেন মানুষ নয়, অন্য কিছু।

প্লিজ, গাড়িটা একটু থামান!

কোনোরকম ঝামেলা না করে চুপচাপ বসে থাক। কোনোরকম শব্দ করবে না।

আপনি এরকম করে কথা বলছেন কেন ?

গাড়ির গতি ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে। ঝড়ের গতিতে পাশ দিয়ে দুটো ট্রাক গেল। লোকটি তার একটি হাত রাখল নীলুর ঊরুতে। নীলু শিউরে উঠে দরজার দিকে সরে গেল। লোকটি হাসল। এ কেমন হাসি।

গাড়ি থামান। আমি চিৎকার করব।

কেউ এখন তোমার চিৎকার শুনবে না।

আপনি কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ?

আমি ভয় দেখাচ্ছি না।

আমি আপনাকে বিশ্বাস করে গাড়িতে উঠেছি।

আরো কিছুক্ষণ থাক। বেশিক্ষণ নয়, এসে পড়েছি বলে।

কী করবেন আপনি ?

তেমন কিছু না।

নীলু এক হাতে দরজা খুলতে চেষ্টা করল। লোকটি তাকিয়ে দেখল কিন্তু বাধা দিল না। দরজা খোলা গেল না। নীলু প্রাণপণে বলতে চেষ্টা করল, আমাকে বাঁচাও। কিন্তু বলতে পারল না। প্রচুর ঘামতে লাগল। প্রচণ্ড তৃষ্ণা বোধ হলো।

২০

আনিস এলো রাত সাড়ে আটটায়। ঘর অন্ধকার। কারো কোনো সাড়াশব্দ নেই। রানু বাতিটাতি নিভিয়ে অন্ধকারে বসে আছে। জিতু মিয়া মশারি খাটিয়ে শুয়ে পড়েছে।

রানু, কী হয়েছে ?

রানু ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, তুমি এত দেরি করলে!

কেন, কী হয়েছে ?

নীলুর বড় বিপদ।

আনিস কিছু বুঝতে পারল না। অবাক হয়ে তাকাল। রানু থেমে-থেমে বলল, নীলুর খুব বিপদ।

কিসের বিপদ ? কী বলছ তুমি ?

রানুর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। সে গুছিয়ে কিছু বলতে পারছে না।

রানু, তুমি শান্ত হয়ে বসো। তারপর ধীরেসুস্থে বল— কী ব্যাপার। কী হয়েছে নীলুর ?

ও একজন খারাপ লোকের পাল্লায় পড়েছে। লোকটা ওকে মেরে ফেলবে।

রানু ফোঁপাতে লাগল। আনিস কিছুই বুঝতে পারল না। নীলুর বাবার সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই তার কথা হয়েছে। ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করেছেন, কী, এত দেরি যে ? যার মেয়ের এত বড় বিপদ, সে এরকম স্বাভাবিক থাকবে কী করে ?

আনিস বলল, ওরা তো কিছু বলে না!

ওরা কিচ্ছু জানে না। আমি জানি, বিশ্বাস করো— আমি জানি।

আমাকে কী করতে বলো ?

আমি বুঝতে পারছি না। আমি কিছু বুঝতে পারছি না।

জিনিসটা কি তুমি স্বপ্নে দেখছ ?

না। কিন্তু আমি দেখেছি।

কী দেখেছ ?

আমি সেটা তোমাকে বলতে পারব না।

তুমি যদি চাও আমি নিচে গিয়ে ওদের বলতে পারি। কিন্তু ওরা বিশ্বাস করবে না।

রানু চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে রইল। ওর শরীর অল্প-অল্প করে কাঁপছে। আনিস বলল, নাকি মিসির আলি সাহেবের কাছে যাবে ? উনি কোনো একটা বুদ্ধি দিতে পারেন। যাবে ?

রানু কাঁপা গলায় বলল, তুমি নিজে কি আমার কথা বিশ্বাস করছ ?

হ্যাঁ, করছি।

একতলার বারান্দায় বিলু বসে ছিল। ওদের নামতে দেখেই বিলু বলল, ভাবি, নীলু আপা এখনো ফিরছে না। বাবা খুব দুশ্চিন্তা করছেন।

রানু কিছু বলল না।

তোমরা কোথায় যাচ্ছ ভাবি ?

রানু তারও কোনো জবাব দিল না। রিকশায় উঠেই সে বলল, আমাকে ধরে রাখ, খুব ভালো লাগছে।

আনিস তার কোমর জড়িয়ে বসে রইল। রানুর গা শীতল। রানু খুব ঘামছে। জ্বর নেমে গেছে।

২১

রানু চোখ বড় বড় করে বলল, আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না— তাই না?

মিসির আলি চুপ করে রইলেন।

আগে আপনি বলুন— আপনি কি আমার কথা বিশ্বাস করছেন?

বিশ্বাসও করছি না, আবার অবিশ্বাসও করছি না। তুমি নিজে যা সত্যি বলে মনে করছ, তাই বলছ। তবে আমি এত সহজে কোনো কিছু বিশ্বাস করি না।

কিন্তু যদি সত্যি হয়, তখন?

মিসির আলি সিগারেট ধরিয়ে কাশতে লাগলেন।

বলুন, যদি আমার কথা সত্যি হয়, যদি মেয়েটা মারা যায়?

মিসির আলি শান্ত স্বরে বললেন, ঠিক এই মুহূর্তে কী করা যায়, তা তো বুঝতে পারছি না। মেয়েটি কোথায় আছে, তা তো তুমি জানো না। নাকি জানো?

না, জানি না।

ছেলেটির নামধামও জানো না?

ছেলেটি দেখতে খুব সুন্দর। আমার এ রকম মনে হচ্ছে।

এই শহরে খুব কম করে হলেও দশ হাজার সুন্দর ছেলে আছে।

আমরা কিছুই করব না?

পুলিশের কাছে গিয়ে বলতে পারি একটি মেয়ে হারিয়ে গেছে এবং আশঙ্কা করা যাচ্ছে দুষ্ট লোকের খপ্পরে পড়েছে। কিন্তু তাতেও একটা মুশকিল আছে, ২৪ ঘণ্টা পার না হলে পুলিশ কাউকে মিসিং পারসন হিসেবে গণ্য করে না।

রানু আবার বলল, কিছুই করা যাবে না?

মিসির আলি গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলেন। তিনি লক্ষ করলেন রানুর চোখমুখ শক্ত হয়ে উঠেছে। সে ঘনঘন নিশ্বাস ফেলছে।

রানু, তুমি যদি ঐ লোকটির কোনো ঠিকানা কোনোভাবে এনে দিতে পার, তাহলে একটা চেষ্টা চালানো যেতে পারে।

ঠিকানা কোথায় পাব?

তা তো রানু আমি জানি না। যেভাবে খবরটি পেয়েছ, সেইভাবেই যদি পাও। রানু উঠে দাঁড়াল। মিসির আলি সাহেব বললেন, যাচ্ছ নাকি?

হ্যাঁ, বসে থেকে কী করব?

নীলুদের সব ক'টি ঘরে আলো জ্বলছে। রাত প্রায় এগারোটা বাজে। নীলুর বাবা পাথরের মূর্তির মতো বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে আছেন। রানুদের ঢুকতে দেখে এগিয়ে এলেন। কিন্তু কিছু বললেন না। রানু মাথা নিচু করে তিনতলায় উঠে গেল। নীলুদের ঘরে ঘনঘন টেলিফোন বাজছে। দু'টি গাড়ি এসে থামল। মনে হয় ওরা খুঁজতে শুরু করেছেন। পুলিশের কাছে নিশ্চয়ই লোক গিয়েছে। নীলুর বাবা অস্থির ভঙ্গিতে বাগানে হাঁটছেন।

২২

ছোট্ট একটি ঘর। কিন্তু দু'শ' পাওয়ারের একটি বাতি জ্বলছে ঘরে। চারদিক ঝলমল করছে। লোকটি একটি চেয়ারে বসে আছে। নীলু লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে না, কারণ লোকটি বসে আছে তার পেছনে। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাবার কোনো উপায় নেই। মাঝে মাঝে দূরের রাস্তা দিয়ে দ্রুতগামী ট্রাকের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নীলু থেমে থেমে বলল, আপনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন ?

কেউ কোনো জবাব দিল না।

আমি আপনার কোনো ক্ষতি করিনি। কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন ? প্লিজ আমাকে যেতে দিন। আমি কাউকে কিছু বলব না। কেউ আপনার কথা জানবে না।

পেছনে চেয়ার একটু নড়ে উঠল। ভারি গলায় লোকটি কথা বলল, কেউ জানলেও আমার কিছু যায়-আসে না।

কেন আপনি এরকম করছেন ?

আমি একজন অসুস্থ মানুষ। মাঝে মাঝে আমাকে এরকম করতে হয়।

আপনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন ?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লোকটি হাত বাড়িয়ে বাতি নিভিয়ে দিল। চারদিকে ঘন অন্ধকার। নীলু চাপা স্বরে ডাকল, মা, মাগো!

চুপ করে থাক, কথা বলবে না।

কেন এরকম করছেন আপনি ?

আমি একজন অসুস্থ মানুষ। পৃথিবীতে কিছু অসুস্থ মানুষ থাকে।

আপনি কি আমার মতো আরো অনেক মেয়েকে এইভাবে ফাঁদ পেতে এনেছেন ?

কোনো জবাব পাওয়া গেল না। লোকটি এগিয়ে এসে নীলুর গায়ে হাত রাখল। এই কি সেই ভালোবাসার স্পর্শ ? নীলু ডাকল, মা, মাগো!

চুপ করে থাক।

আপনি মানুষ, না অন্যকিছু ?

বেশির ভাগ সময়ই আমি মানুষ থাকি, মাঝে মাঝে অন্যরকম হয়ে যাই।

লোকটি শব্দ করে হাসল। কী কুৎসিত হাসি! ঘরে একটুও বাতাস নেই। দম বন্ধ হয়ে আসছে। নীলু প্রাণপণে তার একটা হাত ছুটিয়ে আনতে চেষ্টা করছে। যতই চেষ্টা করছে দড়িগুলো ততই যেন কেটে-কেটে বসে যাচ্ছে।

কেন, কেন আপনি এরকম করছেন ?

বলেছি তো নীলু! অনেকবার বললাম তোমাকে। আমি অসুস্থ।

কী করবেন আপনি ?

অন্যদের যা করেছি তাই করব।

কী করেছেন অন্যদের।

লোকটি হেসে উঠল। নীলু কাতর স্বরে বলল, আপনি দয়া করুন, আমি আপনার পায়ে পড়ি। প্লিজ। আমি আপনার কথা কাউকে বলব না।

তা কি হয় ?

বিশ্বাস করুন। আমি আমার কথা রাখি। কাউকে আমি আপনার কথা বলব না।

লোকটি ফিরে যাচ্ছে। নীলু কি বেঁচে যাবে ? লোকটি কি তাকে ছেড়ে দেবে ? নীলু গুছিয়ে চিন্তা করতে পারছে না। সব কেমন যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। লোকটি ড্রয়ার খুলল। ঘর অন্ধকার, নীলু কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কিন্তু সে নিশ্চিত জানে, তার একটি হাতে ধারালো কিছু একটা আছে। ক্ষুরজাতীয় কিছু। লোকটি সেটি বাঁ হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। আসবে, সে এক সময় এগিয়ে আসবে তার কাছে। খুব কাছে কোথাও রিকশার টুনটুন শোনা গেল। নীলু প্রাণপণে চেঁচাল, বাঁচাও। আমাকে বাঁচাও। কিন্তু গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরোল না।

২৩

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রানুর অবস্থা খারাপ হতে লাগল। বারবার বলতে লাগল— উফ্, বড্ড গরম লাগছে। আনিস সমস্ত দরজা-জানালা খুলে দিল, ফ্যান ছেড়ে দিল, তবু তার গরম কমলো না। রানু কাতর স্বরে বলল, তুমি আমাকে ধরে থাক, আমার বড্ড ভয় লাগছে।

এই তো আমি তোমাকে ধরে আছি। কিসের এত ভয়, রানু ?

আমার সামনে ঐ লোকটি বসে আছে— আমি স্পষ্ট দেখছি। ওর হাতে একটা ক্ষুর।

রানু ফোঁপাতে শুরু করল। ওকে ডাক্তারের কাছে নেওয়া উচিত। যত তাড়াতাড়ি নেওয়া যায় ততই ভালো। আনিস ডাকল, জিতু— জিতু মিয়া! কিন্তু জিতু মিয়ার ঘুম ভাঙল না। রানু বলল, তুমি আমাকে একা রেখে কোথাও যেতে পারবে না। আমার বড় ভয় লাগছে।

কোনো ভয় নেই রানু।

লোকটি ক্ষুর হাতে বসে আছে। তবু তুমি বলছ ভয় নেই ?

এইসব তোমার কল্পনা। এসো, তোমার মাথায় একটু পানি দিই ?

তুমি কোথাও যেতে পারবে না। ঐ লোকটি এখন উঠে দাঁড়িয়েছে। তুমি আমাকে শক্ত করে ধরে থাক। আরো শক্ত করে ধর।

আনিস তাকে জড়িয়ে ধরে বসে রইল। রানু ক্ষীণ কণ্ঠে বলল, আমি তোমাকে একটা কথা কখনো বলিনি। একবার একজন লোক আমাকে মন্দিরে নিয়ে গিয়েছিল।

রানু, এখন তোমাকে কিছুই বলতে হবে না। দয়া করে চুপ করে থাক।

না, আমি বলতে চাই।

সকাল হোক। সকাল হলেই শুনব।

মাঝে মাঝে আমার মনে হয় একজন কেউ আমার সঙ্গে থাকে।

রানু, চুপ করে থাক।

না, আমি চুপ করে থাকব না। আমার বলতে ইচ্ছে করছে। যে আমার সঙ্গে থাকে, তার সঙ্গে আমি অনেকবার কথা বলেছি। কিন্তু আজ সে কিছুতেই আসছে না।

তার আসার কোনো দরকার নেই।

তুমি বুঝতে পারছ না, তার আসার খুব দরকার।

রাত দেড়টার দিকে নিচ থেকে বিলুর কান্না শোনা যেতে লাগল। অনেক লোকজনের ভিড়। কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে। রানু বলল, বিলু কাঁদছে। বড় খারাপ লাগছে আমার।

রানু, তুমি একটু শুয়ে থাক। আমি জিতুকে ডেকে দিচ্ছি।

তুমি কোথায় যাবে ?

আমি একজন ডাক্তার নিয়ে আসব। আমার মোটেই ভালো লাগছে না।

তুমি আমাকে ফেলে রেখে কোথাও যেতে পারবে না।

রানুর কথা জড়িয়ে যেতে লাগল। একসময় বিছানায় নেতিয়ে পড়ল। আনিস ছুটে গেল ডাক্তার আনতে। বড় রাস্তার মোড়ে একজন ডাক্তারের বাসা আছে। ডাক্তার সাহেবকে পাওয়া গেল না। আনিস ফিরে এসে ঘরে ঢোকবার মুখেই তীব্র ফুলের গন্ধ পেল। ঘরের বাতি নেভানো। কে নিভিয়েছে বাতি ? আনিস ঢুকতেই রানু বলল, ও এসেছে।

কে ? কে এসেছে ?

তুমি গন্ধ পাচ্ছ না ?

আনিস এগিয়ে এসে রানুর হাত ধরল। গা ভীষণ গরম। রানু বলল, ও নীলুর কাছে যাবে।

রানু, শুয়ে থাক।

উঁহু, শোব কীভাবে ? ও একা যেতে ভয় পাচ্ছে। আমিও যাব ওর সঙ্গে। ও আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

বলতে-বলতে রানু খিলখিল করে হাসল।

আনিস বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাকল, রহমান সাহেব, রহমান সাহেব! ভাই একটু আসুন, আমার বড় বিপদ।

রহমান সাহেব ঘরে ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে এলেন। তিনি অবাক হয়ে বললেন, কী হয়েছে ?

আপনি একটু আসুন, আমার স্ত্রী কেমন করছে।

ভদ্রমহিলা সঙ্গে সঙ্গে এলেন। এবং ঘরে ঢুকেই অবাক হয়ে বললেন, নূপুরের শব্দ না ? রানু কিশোরী মেয়ের গলায় খিলখিল করে হাসল।

কী হয়েছে ওনার ?

আপনি একটু বসুন ওর পাশে। আমি ডাক্তার নিয়ে আসি।

আনিস ছুটে বেরিয়ে গেল। ফুলের সৌরভ তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। রানু হাসিমুখে বলল, আমার সময় বেশি নেই, ঐ লোকটি এগিয়ে আসছে।

কোন লোক ?

আপনি চিনবেন না। না চেনাই ভালো।

ভদ্রমহিলা রানুর হাত ধরলেন। উত্তাপে গা পুড়ে যাচ্ছে। তিনি কী করবেন ভেবে পেলেন না।

আনিস ডাক্তার নিয়ে ফেরার আগেই রানু মারা গেল।

২৪

ঘর অন্ধকার। কিন্তু চোখে অন্ধকার সয়ে আসছে। আবছা মতো সব কিছু দেখা যায়। বাড়িটা কোথায় ? শহর থেকে অনেক দূরে কি ? কোনো শব্দ নেই। কত রাত এখন ? বাড়িতে এখন ওরা কী করছে ? বিলু কি ঘুমিয়েছে মশারি ফেলে ? না, না— আজ কেউ ঘুমায় নি, আজ সবাই ছোটাছুটি করছে। সবাই খুঁজছে নীলুকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়তো পুলিশের গাড়ির শব্দ শোনা যাবে। বাবা এসে বলবেন— কোনো ভয় নেই মা-মণি।

চেয়ার নড়ার শব্দ হল। লোকটি কি উঠে দাঁড়িয়েছে ? তার হাতে ওটা কী ? নীলু মনে মনে বলল, বাবা, আমি একজন অসুস্থ লোকের হাতে আটকা পড়েছি, আমাকে বাঁচাও। আমার আর মোটেও সময় নেই বাবা। তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি করতে হবে।

লোকটি এগিয়ে আসছে। পেছন থেকে সে খুব ধীর গতিতে এগিয়ে এলো সামনে। এখন নীলু আবছাভাবে লোকটির মুখ দেখতে পাচ্ছে। কী সুন্দর একটি মুখ! নীলু বিড়বিড় করে বলল, প্লিজ, দয়া করুন। লোকটি অদ্ভুত শব্দ করল। এটি কি হাসির শব্দ ? নীলুর গা গোলাচ্ছে। নীলু চিৎ হয়ে থাকা অবস্থাতেই মুখ ভর্তি করে বমি করল। দুঃস্বপ্ন, সমস্তটাই একটা দুঃস্বপ্ন। এক্ষুনি ঘুম ভেঙে যাবে। আর নীলু দেখবে— বিলু বাতি জ্বালিয়েই ঘুমিয়ে পড়েছে। তার বুকের ওপর একটা গল্পের বই। এখানে যা ঘটছে, তা সত্যি হতেই পারে না!

লোকটি তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত বাড়াল। নীলু চাপা গলায় বলল, আমার গায়ে হাত দেবেন না, প্লিজ। লোকটি হেসে উঠছে শব্দ করে। আর ঠিক তখনই নূপুরের শব্দ শোনা গেল। যেন কেউ একজন এসে ঢুকেছে এ ঘরে।

লোকটি ভারি গলায় বলল, কে, কে ওখানে ? তার উত্তরে অল্পবয়সী একটি মেয়ে খিলখিল করে হেসে উঠল। লোকটি চেঁচাল, কে, কে ? কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। শুধু ঘরের শেষ প্রান্তের একটা জানালা খুলে ভয়ানক শীতল একটা হাওয়া এসে ঢুকল ঘরে। সে হাওয়ায় ভেসে এলো অদ্ভুত মিষ্টি একটা গন্ধ।

নীলুর মনে হলো একটি মেয়ে যেন নূপুর পায়ে দিয়ে তার চারপাশ দিয়ে ঘুরতে শুরু করেছে। ঘুরতে-ঘুরতে একবার মেয়েটি তাকে স্পর্শ করল, আর তক্ষুনি নীলুর মনে হলো— আর কোনো ভয় নেই।

নীলু দেখল, লোকটি ক্রমেই দেয়ালের দিকে সরে যাচ্ছে। একবার সে চাপা স্বরে বলল, তুমি কে ? মিষ্টি একটি হাসি শোনা গেল তখন। ফুলের গন্ধ আরো তীব্র হলো। অন্য কোনো ভুবন থেকে ভেসে এলো নূপুরের ধ্বনি। লোকটি গা ঠেকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, এসব কী হচ্ছে! কে, এখানে কে ? কেউ তার কথার জবাব দিল না। একটি দুষ্টু মেয়ে শুধু হাসতে লাগল। ভীষণ দুষ্টু একটি মেয়ে। তার পায়ে নূপুর। তার গায়ে অপার্থিব এক ফুলের গন্ধ। মেয়েটি এবার দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে যাচ্ছে লোকটির দিকে। লোকটির কর্কশ কণ্ঠ শোনা গেল, এইসব কী ? কে, কে ? তার উত্তরে সমস্ত ঘরময় মিষ্টি খিলখিল হাসি ঝমঝম করতে লাগল। লোকটি চাপা গলায় বলে উঠল, আমাকে বাঁচাও। বাঁচাও। দুষ্টু মেয়েটি আবার হাসল, যেন খুব একটা মজার কথা।

পরিশিষ্ট

থার্ড ইয়ার অনার্সের এই ক্লাসটি মিসির আলি সাহেবকে দেওয়া হয়েছে। সাইকোলজি ফিফ্‌থ পেপার। মিসির আলি হাসিমুখে ক্লাসে ঢুকলেন। তার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। রানু বসে আছে সেকেন্ড বেঞ্চে। তার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হলো। তিনি মেয়েটির দিকে তাকালেন এবং তাকিয়ে রইলেন। মনে হলো, মেয়েটির ঠোঁটের কোনায় হাসি লেগে আছে। মিসির আলি কাঁপা গলায় বললেন, তোমার নাম কী ?

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল। স্পষ্ট স্বরে বলল, আমার নাম নীলু। নীলুফার। রোল নাম্বার থার্টি টু।

আমি একটি মেয়েকে চিনতাম। তুমি দেখতে অবিকল তার মতো।

নীলুফার শান্ত স্বরে বলল, আমি জানি।

মিসির আলি সাহেব কপালের ঘাম মুছলেন। সমস্ত ব্যাপারটি ভুলে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে করতে বললেন, আমি তোমাদের পড়াব ফিফ্‌থ্‌ পেপার। খুব ইন্টারেস্টিং একটি টপিক—

রানুর মতো দেখতে মেয়েটি তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। মেয়েটির মুখে মৃদু হাসি।

পুনর্কথন

অমানুষ

প্রস্তাবনা

স্কুল ছুটি হওয়া মাত্র বাচ্চা ছেলেটি ছুটে বেরিয়ে এল। তার বয়স ছ'-সাত। ভারি মিষ্টি চেহারা। বাইরে বৃষ্টি পড়ছিল। ছেলেটি তার সবুজ রঙের রেইনকোটের হুড উঠিয়ে দৌড়াতে শুরু করল। উত্তর দিকের দু'নম্বর গেটে তাদের ড্রাইভার এঞ্জেলো গাড়ির দরজা খুলে অপেক্ষা করছিল। ছেলেটি উঠে বসতেই গাড়ি চলতে শুরু করল। এঞ্জেলো আজ অন্যদিনের চেয়েও দ্রুত চালাচ্ছে। এত তাড়া কিসের তার ? ছেলেটি হঠাৎ দারুণ অবাক হলো। যে গাড়ি চালাচ্ছে সে এঞ্জেলো নয়। ভয়-পাওয়া গলায় বলল, 'তুমি কে ?' লোকটি জবাব দিল না। ততক্ষণে হাইওয়েতে এসে পড়েছে। তেমন ট্রাফিক নেই, গাড়ি চলছে উল্কার মতো।

ছেলেটির নাম পাপিনো মেচেটি। এইমাত্র তাকে অপহরণ করা হলো। পোর্ট সিটি কার্সিকায় গত দু'মাসে এটি হচ্ছে চতুর্থ শিশু অপহরণ।

মেয়েটির মধ্যে কিছু-একটা আছে যা পুরুষদের অভিভূত করে দেয়। রূপের বাইরে অন্যকিছু।

অসামান্য রূপসী মেয়েদেরকেও প্রায় সময়ই বেশ সাধারণ মনে হয়। এই মেয়েটি সেরকম নয়। এবং সে নিজেও তা জানে।

মেয়েটির চোখ দুটি ছোট ছোট এবং বিশেষত্বহীন। গালের হাড় উঁচু হয়ে আছে। ছোট্ট কপাল কিন্তু তবু কী অদ্ভুত দেখতে! কী মোহময়ী!

তার পরনে সাধারণ কালো রঙের একটি লম্বা জামা। পিঠের অনেকখানি দেখা যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হয় মেয়েটির গায়ের রং ঈষৎ নীলাভ। দেখলেই হাত দিয়ে ছুঁতে ইচ্ছে করে।

মেয়েটি প্রকাণ্ড জানালার পাশে দাঁড়িয়ে দূরে তাকিয়ে ছিল। তাকে দেখে বোঝার উপায় নেই সে কিছু ভাবছে কিনা। এই জাতীয় মেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছুই বোঝা যায় না। এদের চোখ সাধারণত ভাবলেশহীন হয়ে থাকে।

মামণি!

মেয়েটি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল অ্যানি এসে ঢুকেছে। অ্যানির পায়ে ঘাসের স্লিপার। চলাফেরা নিঃশব্দ।

অ্যানি!

কী মামণি ?

তোমাকে বলেছি না ঘরে ঢুকতে হলে জিজ্ঞেস করে ঢুকবে ?

অ্যানি লজ্জিত ভঙ্গিতে চোখ বড় বড় করে মা'র দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েটি অবিকল মায়ের মতো দেখতে। শুধু চোখ দুটি আরো উজ্জ্বল, আরো গভীর।

অ্যানি, তুমি এগারোয় পড়েছ, এখন তোমার অনেক কিছু শিখতে হবে, ঠিক না?

জি, মা।

এখানে আমি তোমার বাবার সঙ্গে থাকতে পারতাম। পারতাম না?

পারতে।

আমাদের অনেক ব্যাপার আছে যা তোমার দেখা বা শোনা উচিত নয়।

অ্যানির গাল লাল হয়ে উঠল। সে মায়ের দিকে সরাসরি তাকাতে পারল না।

কিছু বলবার জন্যে এসেছিলে, অ্যানি?

হুঁ।

বলে ফ্যালো।

মা, ঘরে বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে না। বড্ড একা একা লাগে। আমি আবার স্কুলে যেতে চাই।

তুমি তো একা থাকছ না, মিস মারিয়াটা আছেন। আছেন না?

মিস মারিয়াটাকে আমার ভালো লাগে না। মা, আমি স্কুলে যেতে চাই।

বললেই তো যেতে পারছ না। তোমার নিরাপত্তার ব্যাপারে আমি নিশ্চিত না হয়ে তোমাকে স্কুলে পাঠাব না। যাও, এখন শুয়ে পড়োগে।

অ্যানি তবুও দাঁড়িয়ে রইল। রুন বড্ড বিরক্ত হলো। তার গলার স্বরে অবিশ্যি সেই বিরক্তি প্রকাশ পেল না।

অ্যানি, তুমি আর কিছু বলবে?

আমি স্কুলে যেতে চাই মা।

সে কথা তো আমি একবার শুনেছি। আবার বলছ কেন? যাও ঘুমুতে যাও। একই কথা বারবার শুনতে ভালো লাগে না।

অ্যানি নিঃশব্দে চলে গেল। রুন মেয়ের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল। তার মেয়েটি অসামান্য রূপসী হয়েছে। এরকম রূপবতীদের অনেকরকম ঝামেলার মধ্যে বড় হতে হয়। তার নিজের যখন মাত্র দশ বছর বয়স তখন তার মুখে রুমাল বেঁধে তাকে জোর করে...। না, এইসব নিয়ে তার এখন আর ভাবতে ভালো লাগে না। রুন অল্পখানিকটা মার্টিনি ঢেলে গ্লাস হাতে করে সিঁড়ির কাছে আসতেই দেখল ভিকির গাড়ি এসে ঢুকছে।

ভিকি ব্যবসার ব্যাপারে রোম গিয়েছিল। তার আরো দুদিন পরে ফেরার কথা। রুন অবিশ্যি মোটেই অবাক হলো না। ভিকি প্রায়ই এরকম করে। অসময়ে এসে উপস্থিত হয়। রুনের বিষয়ে তার কিছু সন্দেহ আছে। অসময়ে এসে দেখতে চায়

রুনের সঙ্গে পুরুষমানুষ কেউ আছে কি না। রুন হাসিমুখে বলল, আগেই এসে পড়লে যে?

কাজ হয়নি তাই ফিরে এলাম।

ডিনার দিতে বলব?

ভিকি ক্লান্তস্বরে বলল, খেয়ে এসেছি। ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে রুন।

মার্টিনি তৈরি করে দেব? অলিভ আছে।

দাও।

মার্টিনির গ্লাসটি এক চুমুকে শেষ করল ভিকি। তার মানে সে কোনো-একটি বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত। ব্যবসা নিয়ে? কিন্তু ব্যবসা তো তার অনেকদিন থেকেই খারাপ যাচ্ছে। এটা তো নতুন কিছু নয়।

রুন!

শুনছি, বলো।

বসো। সামনের চেয়ারটাতে বসো। তোমার সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় কিছু কথাবার্তা বলা দরকার। জরুরি।

রুন বসল না। আরেক গ্লাস মার্টিনি তৈরি করে পাশে এসে দাঁড়াল। ভিকি গম্ভীর স্বরে বলল, তোমাকে খরচ কমাতে হবে, রুন। অনেকটাই কমাতে হবে।

রুন খিলখিল করে হেসে উঠল।

হাসির কথা না। এই পেইন্টিংটি আমি রোমে যাবার পর কিনেছ তুমি। ওর দাম কত?

খুব সস্তা। নয় লক্ষ লিরা!

ভিকির মুখ পলকের জন্যে ছাই হয়ে গেল।

নয় লক্ষ লিরা!

হুঁ। কার আঁকা দেখবে, মেতিস! অদ্ভুত না? মোতিস এ-ছবি আর আঁকেনি। তোমার ভালো লাগছে না?

ভিকি বহু কষ্টে রাগ সামলাল। রেগে গেলে রুনের সঙ্গে তর্ক করা অসম্ভব। রুনকে বোঝাতে হবে। ঠাণ্ডা মাথায়, পরিষ্কার যুক্তি দিয়ে।

রুন, দয়া করে একটা জিনিস বুঝতে চেষ্টা করো। আমার অবস্থা ভালো না। খারাপ। খুবই খারাপ।

কী রকম খারাপ?

এবছরও লোকসান দিয়েছি। এদিকে ব্যাংকের কাছে বিরাট বড় দেনা।

কত বড়?

প্রায় এক কোটি লিরা।

রুন নিঃশব্দে হাসল। ভিকি ভেবে পেল না এই অবস্থায় এমন স্বাভাবিক ভঙ্গিতে কেউ হাসে কী করে।

হাসছ কেন ?

তোমার নার্ভাস অবস্থা দেখে।

বাস্তবকে বুঝতে শেখো, রুন। প্লিজ।

রুন হাসিমুখে সামনের চেয়ারটায় বসল। এমন অবস্থা তোমার হলো কেমন করে ? তোমাদের এতদিনের সিল্ক ইন্ডাস্ট্রির হঠাৎ করে এমন ভগ্নদশা হলো কেন ?

ভিকি ক্লান্তস্বরে বলল, আমাদের মেশিনপত্র সমস্তই পুরনো। আমাদের নতুন স্পিনিং মেশিন কিনতে হবে। 'খরাটস' জাতীয় মেশিন। নতুন মেশিন না বসালে আমরা হংকং-এর চীনাদের সঙ্গে পারব না। ওরা এখন অর্ধেক খরচে চমৎকার সিল্ক দিচ্ছে বাজারে।

কিনলেই হয় নতুন মেশিন।

টাকা পাব কোথায় ? ব্যাংক থেকে লোন নিতে হবে। তার জন্যে গ্যারান্টি দরকার। সেইজন্যেই বলছি খরচপত্র কমাও।

হংকং-এর চীনাদের জন্যে আমার জীবনযাত্রা বদলাতে হবে ?

বদলাতে বলছি না, খরচপত্র কমাতে বলছি।

রুন উঠে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। ভিকি দেখল সে ক্লসেটের কাছে দাঁড়িয়ে কাপড় খুলে ফেলছে। ভিকি চোখ ফেরাতে পারছে না। যত দিন যাচ্ছে রুনের বয়স কমছে। রুন হালকা সুরে বলল, চলো, ঘুমুতে যাই।

বসো একটু। রাত বেশি হয়নি।

গায়ে কোনো কাপড় নেই অথচ কী সহজ ভঙ্গিতে রুন চলাফেরা করছে। ভিকি একটু চিন্তিত বোধ করল। রুন তাকে মন্ত্রমুগ্ধ করতে চাইছে। নিশ্চয়ই কোনো-একটা কারণ আছে। কী হতে পারে সেটি ? রুন একটি সিগারেট ধরিয়ে ভিকির সামনের চেয়ারটায় বসল। নরম স্বরে বলল, অ্যানি স্কুলে যেতে চাইছে।

যাক। যাওয়াই তো উচিত।

মেয়র‍্যানদের মেয়ের মতো ওকেও যদি কিডন্যাপ করে নিয়ে যায়, তখন ?

ভিকি বিরক্ত হয়ে বলল, মেয়র‍্যানরা হচ্ছে ইতালির সবচে' ধনী পরিবার। ওদের মেয়েদের কিডন্যাপ করে দুকোটি লিরা মুক্তিপণ চাওয়া যেতে পারে। কিন্তু আমার কী আছে ?

রুন গম্ভীর স্বরে বলল, তোমার যে কিছু নেই তা তো না। আর যারা কিডন্যাপ করে তারা জানে না। আমি নিজেও তো জানতাম না তোমার এই অবস্থা।

ভিকি একটি সিগারেট ধরাল। মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে। রুনের সঙ্গে তর্ক করতে হলে মাথা শান্ত রাখতে হয়। ভিকি ধীরস্বরে বলল, রুন, যারা কিডন্যাপিং করছে তারা মাফিয়ার লোকজন, তা তো জানো ?

জানি।

মাফিয়ারা সমস্ত খোঁজখবর রাখে। কার কী অবস্থা তা তাদের অজানা নয়, বুঝতে পারছ ? কাজেই তুমি নিশ্চিন্তে অ্যানিকে স্কুলে পাঠাতে পার।

রুন উঠে দাঁড়াল। কী চমৎকার একটি শরীর। কে বলবে এই মেয়েটির বয়স চল্লিশ ? সিলিঙের নরম আলো যেন ঠিকরে পড়ছে তার গায়ে। জলকন্যার মতো লাগছে। রুন গম্ভীর গলায় বলল, সুইজারল্যান্ডে একটি চমৎকার স্কুল আছে। জেনেভার কাছে। অনেক ইতালিয়ান ছেলেমেয়ে সেখানে পড়ে। আমি অ্যানিকে সেই স্কুলে দিতে চাই। টেয়ারদের ছোট মেয়েটি ভর্তি হয়েছে সেখানে। চমৎকার স্কুল।

ভিকি স্তম্ভিত হয়ে গেল। এসব কী বলছে সে! দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বলল, আসল জিনিসটাই তুমি বুঝতে পারছ না। আমার টাকা নেই। মেয়েকে সুইজারল্যান্ডে রেখে পড়ানো আমার সাধ্যের বাইরে। তাছাড়া অ্যানিরও ভালো লাগবে না। এত দূরে সে একা একা থাকতে পারবে না।

একা একা থাকবে কেন ? আমিও থাকব। একটা অ্যাপার্টমেন্ট ভাড়া করব জেনেভার কাছে। তুমি হপ্তায় হপ্তায় এসে দেখে যাবে। প্লেনে মাত্র একঘণ্টা লাগে।

এতক্ষণ আমি কী বলেছি তা তুমি বুঝতে চেষ্টা পর্যন্ত করনি রুন। টাকা কোথায় আমার ?

রুন পা দোলাতে দোলাতে বলল, এখানকার বাড়িটা বিক্রি করে ফ্যালো। এত সুন্দর বাড়ি, প্রচুর দাম পাবে। সেই টাকার অর্ধেক দিয়ে জেনেভায় একটা বাড়ি কেনা যায়।

ভিকি থেমে থেমে বলল, আমার এই বাড়িটাও ব্যাংকের কাছে মর্টগেজড। আমার ধারণা ছিল তুমি তা জানো।

রুন উত্তর দিল না। উঠে গিয়ে আরেকটা সিগারেট ধরাল। ভিকি বলল, অ্যানিকে মিলানের স্কুলেই যেতে হবে। এই হচ্ছে শেষ কথা।

বেশ, সে যাবে মিলানের স্কুলে। তুমি তার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করো।

নিরাপত্তার ব্যবস্থা— তার মানে ?

ওর একটা বডিগার্ড রেখে দাও। এখন তো সবারই আছে। নিখমুদের দু'মেয়ের জন্যেই বডিগার্ড আছে।

রুন, তুমি কি জানো কত খরচের ব্যাপার সেসব ?

আমি জানি না। জানতে চাই না। তুমি যদি অ্যানির বডিগার্ডের ব্যবস্থা না করো তাহলে ওকে আমি সুইজারল্যান্ডে নিয়ে যাব।

রুন, বডিগার্ড রাখা মানেই সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। সবাই ভাববে, ওদের অনেক টাকাপয়সা।

রুন হাসিমুখে বলল, ভাবলে অসুবিধে কী ?

রুন, প্লিজ একটা জিনিস দ্যাখো। হাজার হাজার ছেলেমেয়ে ইতালিতে স্কুলে যায় যাদের বাবা-মা আমাদের চেয়ে অনেক ধনী, কিন্তু তাদের ছেলেমেয়েদের জন্যে কোনো বডিগার্ড নেই।

না থাকুক। আমার কিছুই যায় আসে না। ওরা তো আর আমার ছেলেমেয়ে না।

আমার অসুবিধেটা তুমি দেখছো না। একটা বাড়তি খরচ। শুধুশুধু একটা ঝামেলা।

রুন দৃঢ়স্বরে বলল, আজকাল সব ছেলেমেয়ের জন্যে বডিগার্ড আছে। এরেডোসের আছে, টুরেল্লার আছে, এমনকি কেয়োলিনদের পর্যন্ত আছে।

ভিকি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। ব্যাপারটা এতক্ষণে পরিষ্কার হয়েছে। বডিগার্ড একটি মর্যাদার মাপকাঠি হয়ে দাঁড়িয়েছে। দামি একটা গয়নার মতো। রুন ভিকির গলা জড়িয়ে ধরল, তুমি একবার এতরার সঙ্গে কথা বলো। সে নিশ্চয়ই তোমার টাকাপয়সার ঝামেলা মেটাবার ব্যাপারে সাহায্য করবে। ও তো অনেককেই বুদ্ধি দেয়।

ভিকি উত্তর দিল না। রুনের এই দূর সম্পর্কের ভাইটিকে সে সহ্য করতে পারে না। তার ধারণা, রুনের সঙ্গে ঐ ভাইটির গোপন মেলামেশা আছে। এই ভাইটির কথা উঠলেই রুনের মধ্যে একটা গদগদ ভাব দেখা যায়। রুন আরেকবার বলল, বুঝলে ভিকি, তুমি এতরার সঙ্গে কথা বলো। সে তোমাকে চমৎকার বুদ্ধি বাতলাবে।

রুন এসে ভিকির কোলে বসে পড়ল। গলা জড়িয়ে ধরে বলল, আর গম্ভীর হয়ে থাকার দরকার নেই। হাসো এবার।

ভিকি হাসতে পারল না। টেনে টেনে বলল, বডিগার্ডের ব্যাপারটি নিয়ে তুমি কি এতরার সঙ্গে কথা বলেছ?

উঁহু।

ভিকির মনে ক্ষীণ একটা আশা হলো। যদি এতরাকে দিয়ে রুনকে বোঝানো যায় তা হলে হয়তো কাজ হবে। এতরা যদি বলে— বডিগার্ড রাখার ব্যাপারটি হাস্যকর তা হলে রুন নিশ্চয়ই শুনবে। ভিকি এটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

অ্যানির ঘুম ভাঙল খুব ভোরে।

সে একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে নিচে নেমে এল। কী আশ্চর্য, বাগানে বেতের চেয়ারে বাবা বসে আছেন। সে চেঁচিয়ে ডাকল, বাবা।

কীরে বেটি? এত সকালে ঘুম ভেঙেছে?

হুঁ।

ভালো ঘুম হয়নি রাতে?

না। দুঃস্বপ্ন দেখেছি বাবা।

কী দেখেছিস ?

অ্যানি জবাব দিল না। ভিকি মেয়ের কোমর জড়িয়ে ধরে বলল, দেখেছিস একটা প্রকাণ্ড দৈত্য তাড়া করছে। তাই না ?

অ্যানি হাসল কিন্তু কোনো উত্তর দিল না। সে যে-দুঃস্বপ্ন দেখেছে সেরকম দুঃস্বপ্নের কথা কাউকে বলা যায় না। নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতে হয়; সবচে' প্রিয় যে-বান্ধবী তাকেও বলা যায় না।

অ্যানির একটু মন-খারাপ হলো। তার যত বয়স বাড়ছে ততই গোপন জিনিসের সংখ্যা বাড়ছে। যেমন এতরা চাচার কথাই ধরা যাক। ইদানীং এতরা চাচা তাকে দেখলেই আদর করার ছলে জড়িয়ে ধরেন। মুখে কী মিষ্টি মিষ্টি কথা, আরে আমাদের অ্যানির মনটা খারাপ কেন ? কী হয়েছে আমাদের অ্যানির ?

অ্যানি পরিষ্কার বুঝতে পারে এ সবই হচ্ছে ভান। এতরা চাচাকে এখন আর একটুও ভালো লাগে না। সেদিন এসে মাকে বলল, ওয়াল্ট ডিজনির একটা মুভি হচ্ছে, অ্যানিকে দেখিয়ে আনব বলে ভাবছি।

মা মহাখুশি। হাসতে হাসতে বলল, বেশ হয়। বেচারি একা একা থাকে। নিয়ে যাও।

অ্যানি বলল, সে যাবে না। তার মুভি দেখতে ভালো লাগে না। শেষ পর্যন্ত অবিশ্যি যেতে হলো। মায়ের অবাধ্য হওয়ার সাহস তার নেই।

মুভিহল অন্ধকার হতেই এতরা চাচা তার কোমর জড়িয়ে ধরলেন। অ্যানি স্তম্ভিত হয়ে লক্ষ করল মাঝে মাঝে সেই হাত নিচে নেমে যাচ্ছে। এইসব কথা কাকে বলবে সে ? মাকে ? মা নিশ্চয়ই উলটো তার ওপর রাগ করবেন। কারণ এতরা চাচাকে মা খুব পছন্দ করেন। এটাও অ্যানির ভালো লাগে না। এতরা চাচা সময়ে অসময়ে আসে বাড়িতে। মা তাকে নিয়ে দক্ষিণের গেস্টহাউসে চলে যান। গেস্টহাউসে গিয়ে দরজা বন্ধ করার কী মানে ? এমন কী কথা তার সঙ্গে যা দরজা বন্ধ করে বলতে হয় ?

ভিকি দেখল অ্যানি গম্ভীর হয়ে বসে আছে। সে হালকা স্বরে বলল, আমার মামণি এত গম্ভীর কেন ?

অ্যানি চাপাস্বরে বলল, এখানে চুপচাপ বসে থাকতে আমার ভালো লাগছে না বাবা। আমি স্কুলে যেতে চাই।

খুব শিগগিরই যাবে মা।

কবে ?

তোমার মা চাচ্ছেন তোমার জন্যে একজন বডিগার্ড রাখতে। এই ব্যাপারটি নিয়ে আমরা চিন্তাভাবনা করছি। যদি না রাখলে চলে তা হলে তুমি এই হপ্তা থেকে যেতে পারবে। আর যদি রাখতে হয় তা হলে একটু দেরি হবে।

অ্যানি মুখ উজ্জ্বল করে বলল, বডিগার্ড রাখলে খুব মজা হবে বাবা।

মজা কিসের?

ঐ লোকটি কেমন বন্দুক-টন্দুক হাতে নিয়ে থাকবে। ভাবতে আমার মজা লাগছে বাবা।

মামণি, এর মধ্যে মজার কিছু নেই। সমস্ত ব্যাপারটি হাস্যকর। খুবই হাস্যকর।

আমার কাছে তো বেশ লাগছে বাবা।

ভিকি কিছু বলল না। অ্যানি বলল, তুমি কি চা খাবে? চা আনব তোমার জন্যে?

চা বানাতে পারো তুমি?

হুঁ, খুব পারি।

বেশ তো, খাওয়া যাক এক কাপ চা।

অ্যানি হাসিমুখে রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল। ভিকির একটু মন-খারাপ হলো। অ্যানি এখানে খুব নিঃসঙ্গ। ভিকি তাকে সময় দিতে পারে না। রুনও পারে না। মেয়েটির কোনো সঙ্গীসাথী নেই।

চা ভালো হয়েছে বাবা?

চমৎকার হয়েছে।

মনে হচ্ছে একটু বেশি কড়া হয়েছে।

আমার কড়া চা পছন্দ।

অ্যানি হাসিমুখে বলল, আমি যদি বলতাম চা বেশি হালকা হয়েছে তা হলে তুমি বলতে আমার হালকা চা পছন্দ— ঠিক না বাবা?

তা ঠিক।

ভিকি, অ্যানি দুজনেই গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

রেস্টুরেন্টটি ছোট কিন্তু শহরে নামি রেস্টুরেন্টগুলির মধ্যে এটি একটি। এরা ইতালি শহরে সবচে' ভালো 'প্রসকিউটু' (কচি বাছুরের গোশত) রান্না করে— এ ধরনের একটা কথা চালু আছে। ভিকি প্রসকিউটু পছন্দ করে না, কিন্তু তবু এখানে এসেছে। কারণ এ রেস্টুরেন্টটি এতরার খুব প্রিয়, সে প্রায় রোজই এখানে লাঞ্চ খেতে আসে।

ভিকি বেশ খানিকক্ষণ বসে থাকবার পর এতরা এসে উপস্থিত। চমৎকার একটা নীল রঙের শার্টের উপর হালকা গোলাপি একটা টাই পরেছে এতরা। কে বলবে এই লোকটির বয়স চল্লিশের ওপর।

দেরি করে ফেললাম নাকি, ভিকি?

না, খুব দেরি না।

লাঞ্চের অর্ডার দিয়েছ?

এখনো দিইনি। কী খেতে চাও তুমি ?

এতরা হাসিমুখে বলল, আমার বাঁধা মেনু ভিটেলো টনাটু, প্রসকিউটু এবং এক বোতল বারগুন্ডি।

বারগুন্ডির গ্লাসে চুমুক দিয়ে এতরা ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, এখন বলো, তোমার সমস্যাটা কী ?

ভিকি ইতস্তত করতে লাগল। নিজের সমস্যা অন্যের কাছে বলতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু এতরার যত দোষই থাকুক, ওর মাথাটা খুব পরিষ্কার। তা ছাড়া, ওর ভালো 'কানেকশন' আছে। প্রচুর লোকজনের সঙ্গে ওর চেনাজানা।

কী ব্যাপার, চুপ করে আছ যে ? বলো।

তুমি বোধহয় জানো না আমার ব্যবসার অবস্থা খুব খারাপ যাচ্ছে।

ঠিক জানি না বললে ভুল হবে। তবে কতটা খারাপ তা জানি না।

বেশ খারাপ।

এত খারাপ হলো কী করে ?

ভিকি জবাব দিল না। এতরা বলল, আমার কাছে ঠিক কী পরামর্শ তুমি চাও ?

আমার যা দরকার তা হচ্ছে মোটা অঙ্কের কিছু টাকা।

মোটা অঙ্কের টাকা জোগাড় করা তোমার জন্যে কঠিন হবার কথা নয়। তোমার স্ত্রীর প্রচুর টাকা আছে।

আমি ওর কাছে হাত পাততে চাই না।

বুঝলাম। স্ত্রীর কাছে হাত না পাতাই ভালো, তাতে দাম কমে যায়।

এতরা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, তুমি ব্যাংকে চেষ্টা করেছ ? তোমার যা নামডাক তাতে ব্যাংক থেকে সহজেই মোটা টাকা লোন পাবে। ভরাডুবি না হওয়া পর্যন্ত ব্যাংক তোমাকে টাকা দেবে। তুমিও সেটা জানো, জানো না ?

ভিকি উত্তর দিল না। এতরা বলল, তুমি কি চেষ্টা করেছ ?

বিশেষভাবে করিনি।

তা হলে করো। টাকার সমস্যা কোনো সমস্যা নয়। অন্তত তোমার জন্যে নয়। তুমি চাইলে আমি দু'একজন ব্যাংকারের সাথে কথা বলতে পারি। অবিশ্যি আমি তার কোনো প্রয়োজন দেখি না। তোমাকে সবাই চেনে।

আমাকে না। আমার বাবাকে চেনে।

একই কথা। তোমার বাবাকে চিনলেই তোমাকে চেনা হয়। এখন বলো, তোমার আসল প্রবলেম কী ? তোমার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে তোমার মনে আরো কিছু আছে।

ভিকি আরেকটা বারগুন্ডির অর্ডার দিয়ে চুপ করে রইল। যেন ভাবছে সমস্যাটি বলা ঠিক হবে কিনা।

চুপ করে আছ কেন, বলে ফ্যালো।

ভিকি দীর্ঘ সময় নিয়ে বডিগার্ডসংক্রান্ত সমস্যাটি বলল। এতরা হাসিহাসি মুখে শুনল। তার ভাব দেখে মনে হলো, সে খুব মজা পাচ্ছে। ভিকি বলল, এখন বলো, আমার কী করা উচিত।

একটা বডিগার্ড রাখো। এই একমাত্র সমাধান।

ভিকি বড্ড বিরক্ত হলো। এতরা এই কথা বলবে তা সে ভাবেনি। তার ধারণা ছিল বডিগার্ড রাখার হাস্যকর দিকটি এতরার চোখে পড়বে। এতরা একটি সিগারেট ধরিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, বডিগার্ডের ব্যাপারটি এখন রুনের একটি প্রেস্টিজের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। রুনকে আমি যতটুকু জানি তাতে মনে হচ্ছে বডিগার্ড না রাখা পর্যন্ত সে শান্ত হবে না। একজন বুদ্ধিমান স্বামীর প্রধান কাজ হচ্ছে স্ত্রীকে শান্ত রাখা।

কিন্তু এত টাকা আমি পাব কোথায়?

রীতিমতো প্রফেশনাল লোক রাখলে অনেক টাকা লাগবে, বলাই বাহুল্য। কিন্তু তোমার তো আর প্রথম সারির লোকের প্রয়োজন নেই, ঠিক না?

ঠিক।

কাজেই কোনোরকম একজন কাউকে কয়েক মাসের জন্যে রেখে দাও। রুন শান্ত হলেই ছাড়িয়ে দাও, ব্যস চুকে গেল।

এরকম লোক কোথায় পাওয়া যায়?

এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করলেই পাওয়া যাবে। আমার ওপর ছেড়ে যাও। আমি জোগাড় করে দেব। আগামী হপ্তায় তুমি তোমার বডিগার্ড পাবে। ঠিক আছে?

ভিকি কিছু বলল না। এতরা উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, আর কোনো সমস্যা আছে? থাকলে বলে ফ্যালো।

না, আর কিছু নেই।

তা হলে এই কথা রইল। সোমবার তুমি বডিগার্ড পাবে। এখন তা হলে উঠি। চমৎকার লাঞ্চের জন্যে ধন্যবাদ। আর শোনো ভিকি, তুমি মুখ এমন হাঁড়ির মতো করে রাখবে না। একটু হাসো। তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি গভীর সমুদ্রে পড়েছ।

এতরা বেরিয়ে গেল। ভিকি নিজের মনে বলল, আমি গভীর সমুদ্রেই পড়েছি। অতলান্তিক জলে।

এতরা তার কথা রাখল। হপ্তা শেষ হবার আগেই একজন বিদেশী মানুষ এসে হাজির।

তোমার সঙ্গে বন্দুক আছে?

হ্যাঁ।

দেখাতে পারো?

লোকটি জ্যাকেটের পকেট থেকে একটা ছোট রিভলভার বের করল। ভিকি মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইল সেটার দিকে।

কী নাম এটির ?

বেরেটা ৪৮।

ভিকি শিশুর মতো আগ্রহে রিভলভারটি হাতে তুলে নিল। কী সুন্দর। ছিমছাম! ছোট্ট একটি জিনিস।

এর লাইসেন্স আছে ?

আছে।

এর মধ্যে কি গুলি ভরা আছে ?

আছে।

তুমি এই জাতীয় রিভলভার আগে ব্যবহার করেছ ?

করেছি।

কী সর্বনাশ! তুমি আগে বলবে তো ?

ভিকি সাবধানে রিভলভারটি নামিয়ে রাখল। শুকনো গলায় বলল, তোমার কাগজপত্র কী আছে দেখি।

লোকটি কাগজপত্রের একটা চামড়া-বাঁধানো ফাইল নামিয়ে রাখল। ভিকি প্রথমবারের মতো পূর্ণদৃষ্টিতে তাকাল লোকটির দিকে।

লোকটি ইতালিয়ান নয়। বিদেশী। গায়ের চামড়া কালো। পুরু ঠোঁট। বড় বড় চোখ। অদ্ভুত একধরনের কাঠিন্য আছে। কোথায় সে কাঠিন্যটি তা ধরা যাচ্ছে না। ভিকি নিচুস্বরে বলল, তুমি কি কখনো মানুষ মেরেছ ?

হ্যাঁ।

ভিকির গা শিরশির করে উঠল।

কতজন মানুষ মেরেছ ?

এর উত্তর জানা কি সত্যি প্রয়োজন ?

না-না, উত্তর না দিলেও হবে। এমনি জিজ্ঞেস করলাম।

ভিকি ফাইল খুলল।

নাম : জামশেদ হোসেন।

বয়স : ৫৫

ভিকি অনেকক্ষণ নামটির দিকে তাকিয়ে রইল। কী অদ্ভুত নাম!

তোমার দেশ কোথায় ?

ফাইলে লেখা আছে। ফাইল খুললেই পাবে।

হ্যাঁ, লেখা আছে ফাইলে। পরিষ্কার সব লেখা। লোকটি কথাবার্তা বেশি বলতে চায় না। এটা ভালো। বডিগার্ড এরকমই হওয়া উচিত। ভিকি পড়তে শুরু করল।

জাতীয়তা : বাংলাদেশী।

সেটি আবার কোন দেশ ?

ইন্ডিয়া ও বার্মার মাঝামাঝি ছোট্ট একটা দেশ।

তোমার পাসপোর্ট আছে ? ইতালিতে যে আছ তার কাগজপত্র আছে ?

আছে।

কী ধরনের কাগজপত্র ?

লোকটি গম্ভীর স্বরে বলল, আমি ফ্রেঞ্চ লিজিওনে দীর্ঘদিন ছিলাম। তারপর কিছুদিন ছিলাম ইতালিয়ানদের সঙ্গে জিরান্ডায়, আলজিয়ার্সে। আমার কাগজপত্র সেই সূত্রে পাওয়া।

ভিকি অবাক হয়ে বলল, আলজিয়ার্সে কিসে ছিলে ?

ফার্স্ট প্যারাট্রুপ রেজিমেন্টে।

বলো কী! তুমি বাংলাদেশের লোক হয়ে লিজিওনে ঢুকলে কী করে ?

লোকটি জবাব দিল না। ভিকি বলল, লিজিওনে ঢোকার আগে তুমি কোথায় ছিলে ?

অনেক জায়গায় ছিলাম। আমি একজন ভাড়াটে সৈনিক, মি. ভিকি। যে পয়সা দিয়েছে আমি তার জন্যেই যুদ্ধ করেছি। আমি কোথায় ছিলাম, কী ছিলাম সেসব জিজ্ঞেস করার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না। আমাকে যদি তোমার পছন্দ হয় তা হলে রাখতে পারো। পছন্দ না হলে বিদেয় হব।

ভিকি অনেকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারল না। এতরা এই লোকটিকে পাঠিয়েছে। কিন্তু মনে হচ্ছে ঠিক লোক পাঠায়নি। অবস্থা যা তাতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে এই লোকটি খাঁটি পেশাদার লোক।

ভিকি নিঃশব্দে কাগজপত্র পড়তে লাগল।

অসাধারণ লিজিওনারি হিসেবে তাকে পরপর দুবার অর্ডার অব ভেলর দেয়া হয়।

ভিকি বড়ই অবাক হলো। এতরা এই লোকটিকে পাঠানোর আগে আরো দুজনকে পাঠিয়েছিল। ভিকি তাদের সঙ্গে দু'একটি কথা বলেই বিদেয় করে দিয়েছে। সে দুজন রাস্তার গুণ্ডা ছাড়া কিছুই না। কেউ জীবনে কখনো বন্দুক ধরেছ কি না সে সম্পর্কেও সন্দেহ আছে। বডিগার্ড হিসেবে ওদের রাখলে রুন রেগে আগুন হতো, বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই লোকটি অদ্ভুত। ভিকি বলল, তুমি কি কফি খাবে ?

না।

খাও-না! খাও। ভালো কফি।

লোকটি চুপ করে রইল। ভিকি কফি আনতে বলে নিচুস্বরে জানাল, তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। কিন্তু একটি কথার জবাব দাও। এত কম টাকায় তুমি কাজ করতে রাজি হচ্ছ কেন ?

লোকটি কফিতে চুমুক দিয়ে বলর, মিঃ ভিকি, আমি একজন অ্যালকোহলিক। বডিগার্ড হিসেবে আমার কোনোই মূল্য নেই এখন। বয়স হয়েছে। শরীর নষ্ট হয়ে গেছে।

ভিকি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল।

মি. এতরা আমাকে বলেছেন তোমার যেনতেন একজন লোক হলেই চলে। প্রফেশনাল লাগবে না।

তা ঠিক। আসলে আমার স্ত্রীর চাপে পড়েই একজন বডিগার্ড রাখতে হচ্ছে। আমার মেয়েকে কিডন্যাপ করার কোনো কারণ নেই। স্ত্রীদের চাপে পড়ে আমাদের অনেক কিছুই করতে হয়। ভালো কথা, তুমি কি বিবাহিত ?

না।

ভালো, খুব ভালো।

লোকটি নিঃশব্দে কফি খেয়ে যাচ্ছে। ভিকি বলল, ইয়ে, তুমি কি বড় রকমের অ্যালকোহলিক ?

হ্যাঁ।

মাতাল হয়ে যাও ?

না।

আরেকটি কথা তোমাকে বলা দরকার। এমন হতে পারে যে তিনমাস পর তোমাকে আমার দরকার হবে না। এতরা নিশ্চয়ই তোমাকে বলেছে সেটা ?

হ্যাঁ, বলেছে।

আরেকটি কথা। তোমাকে রাখব কিনা সেটি নির্ভর করছে আমার স্ত্রীর ওপর। বুঝতেই পারছ, ওর জন্যেই তোমাকে রাখা।

বুঝতে পারছি।

চল, আমার স্ত্রীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দিই। অবশ্যি তোমাকে আমার পছন্দ হয়েছে। বেশ পছন্দ হয়েছে। তোমার নামটি যেন কী ?

জামশেদ। জামশেদ হোসেন।

অদ্ভুত নাম। এর অর্থ কী ?

আমার জানা নাই।

রুন অবাক হয়ে বিদেশী লোকটির দিকে তাকাল। লম্বা। রোগা। একটু যেন কুঁজো হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার চুল সাদাকালো, ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। পরনে

কালো রঙের একটি জ্যাকেট, জ্যাকেটের মাঝখানের বোতামটি নেই তবে জ্যাকেট এবং ট্রাউজার দুটিই বেশ পরিষ্কার। রুন কঠিন স্বরে বলল, তুমি তো ইতালিয়ান নও।

না।

ভিকি বলল, ইতালিয়ান না হলেও চমৎকার ইতালিয়ান বলতে পারে।

রুন বলল, তোমার বয়সও অনেক বেশি!

হ্যাঁ, পঞ্চান্ন।

ভিকি হড়বড় করে বলল, বয়স হলেও এই লাইনে সে একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি। কাগজপত্র দেখলেই বুঝবে। আজকাল এই লাইনে অভিজ্ঞ লোক পাওয়া খুব মুশকিল।

রুন বলল, তোমার দেশ কোথায় ?

বাংলাদেশ।

সেটি আবার কোথায় ?

উত্তর দিল ভিকি, বার্মা এবং ইন্ডিয়ার মাঝামাঝি একটি ছোট্ট দেশ। রুন, তুমি বরং মি. জামশেদের কাগজপত্রগুলো দ্যাখো।

রুন বলল, তুমি কি আজ থেকে কাজে লাগতে পারবে ?

হ্যাঁ।

দোতলার একটি ঘরে তুমি থাকবে। অ্যানিকে স্কুলে নিয়ে যাবে এবং ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। তোমার সঙ্গে বন্দুক আছে ?

আছে।

এসো, তোমাকে ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি।

রুন বেরিয়ে গেল। জামশেদ গেল তার পিছুপিছু। ভিকি সোফায় বসে ঘামতে লাগল। রুন ফিরে এসে একটা ঝগড়া বাধাবে, জানা কথা। এসেই চিৎকার শুরু করবে, এই বুড়ো হাবড়াকে কোত্থেকে ধরে এনেছ ?

কিন্তু সেরকম কিছুই হলো না। রুন ফিরে এসে শান্তস্বরে বলল, লোকটিকে আমার পছন্দ হয়েছে। তবে...

তবে কী ?

লোকটির দিকে তাকালে কেমন যেন অস্বস্তি লাগে।

বিদেশী লোক, তাই।

না, তা নয়। অন্য একধরনের অস্বস্তি। অস্বস্তি ঠিক না, ভয় বলতে পারো।

ভিকি অবাক হয়ে বলল, কী আশ্চর্য, ভয় লাগবে কেন ?

জানি না কেন। শুধু মনে হচ্ছিল একটা পেশাদার খুনি। কত লোককে যে মেরেছে কে জানে!

ভিকি চুপ করে রইল। রুন বলল, লোকটির চোখ দেখেছ। পাথরের তৈরি বলে মনে হয়। ঠিক না ?

আমি বুঝতে পারছি না কী বোঝাতে চাচ্ছ তুমি।

ওর মনে দয়ামায়া রহম বলে কিছু নেই।

এরকম লোকই তো তুমি চেয়েছিলে, রুন।

রুন চিন্তিত মুখে বলল, তা অবিশ্যি ঠিক।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল ভিকি। বড় ঝামেলা চুকেছে। মাস দু'এক পর বিদেয় দিলেই হবে। এই টাইপের লোকদের নিজের ঘরে রাখা ঠিক না। তাছাড়া বিদেশী লোক। বিদেশীদের বিশ্বাস করতে নেই।

মিস মারিয়াটা, আমাদের ঘরে যে নতুন একজন মানুষ এসেছে তাকে তুমি দেখেছ ?

না।

আমিও দেখেনি। সে কিন্তু বিদেশী, মিস মারিয়াটা।

তুমি পড়ায় মন দিচ্ছ না অ্যানি।

আজকে আমার পড়তে ইচ্ছে করছে না।

ইচ্ছা না করলেও পড়তে হবে।

অ্যানিকে অ্যালজেব্রার বই খুলতে হলো। সে দুতিনটা অঙ্ক শেষ করেই বলল, মিস মারিয়াটা, ঐ বিদেশী কিন্তু ভয়ঙ্কর লোক। ফটফট গুলি করে মানুষ মারে।

মানুষ মারা যদি তার কাজ হয় তা হলে তো মারবেই। সবারই তার নিজের কাজ করতে হয়। ঠিক না ?

হ্যাঁ ঠিক। ওর কাজ কিন্তু মানুষ মারা না। ওর কাজ হচ্ছে আমাকে দুষ্ট লোকের হাত থেকে রক্ষা করা। সেরকম কোনো লোক দেখলেই সে একেবারে শেষ করে দেবে। ড্রুম ড্রুম।

মিস মারিয়াটার মধ্যে কোনো উৎসাহ দেখা গেল না। সে আবার পড়াতে শুরু করল। অ্যানি ছাড়া পেল সন্ধ্যার আগে-আগে। এবং ছাড়া পাওয়ামাত্র ছুটে গেল দোতলায়। লোকটির ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। অনেকক্ষণ দরজার পাশে দাঁড়িয়েও অ্যানি কিছুই শুনল না। লোকটি অসময়ে ঘুমুচ্ছে নাকি ? অ্যানি দরজায় টোকা দিতেই ভারি গলায় লোকটি কথা বলল, কে ?

আমি কি তোমার ঘরে আসতে পারি ?

খুট করে দরজা খুলে গেল।

আমার নাম অ্যানি।

কোনো উত্তর নেই। লোকটি তাকিয়ে আছে শুধু।

আমি কি তোমার ঘরে একটু বসতে পারি ?

লোকটি দরজা থেকে সরে দাঁড়াল। অ্যানি হাসিমুখে বলল, তোমাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। আমার কথা বলার লোক নেই।

লোকটি ভারীস্বরে বলল, বাচ্চাদের সঙ্গে আমি কথা বলতে পারি না। বাচ্চাদের আমি পছন্দ করি না।

অ্যানি স্তম্ভিত হয়ে গেল। থেমে থেমে বলল, আমি বাচ্চা নই। আমার এপ্রিল মাসে বারো হবে।

লোকটি কথা বলল না। অ্যানি বলল, আমি যদি কিছুক্ষণ তোমার ঘরে বসি তা হলে কি তুমি বিরক্ত হবে ?

হ্যাঁ।

অ্যানির চোখে প্রায় জল এসে পড়ছে। সে বহু কষ্টে নিজেকে সামলাল। লোকটি মৃদুস্বরে বলল, একটি জিনিস তোমাকে বুঝতে হবে, অ্যানি। আমি নতুন কেনা কোনো খেলনা না। আমাকে রাখা হয়েছে তোমার নিরাপত্তার জন্যে, এইটুকুই আমি দেখব, এর বেশি না। যদি এ জিনিসটি পরিষ্কার বুঝতে পারো তা হলে তা তোমার জন্যেও ভালো আমার জন্যেও ভালো।

অ্যানি ধরাগলায় বলল, তুমি কি আমাকে চলে যেতে বলছো ?

হ্যাঁ।

অ্যানির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। সে প্রায় ছুটে বেরিয়ে গেল।

রুন এসে ঢুকল তার কিছুক্ষণ পর। সে ইতস্তত করে বলল, অ্যানি খুব কাঁদছে।

লোকটি জবাব দিল না। রুন বলল, আমার এই মেয়েটি খুব সেনসেটিভ, ওর সঙ্গে ভাব করতে হবে খুব ধীরে ধীরে। একবার ভাব হলেই বুঝবে খুব মিষ্টি মেয়ে ও।

মিসেস রুন, আমি তোমার মেয়ের সঙ্গে ভাব করতে আসিনি। ওসব আমি পারি না। আমার দ্বারা ওসব হয় না।

ও।

তোমরা যে-কাজের জন্যে আমাকে রেখেছো সে-কাজ আমি ঠিকমতো করতে চেষ্টা করব, এর বেশি আমার কাছে কিছু আশা করবে না।

রুন আরো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু লোকটি আর কথা বলল না। রুন ভাবল এই বিদেশী লোকটিকে রাখা হয়তো ঠিক হয়নি।

মিস মারিয়াটাও একই কথা বলল, বিদেশীদের কখনো বিশ্বাস করতে নেই, মিসেস রুন।

মিস মারিয়াটার অবিশ্যি সবকিছুতেই বাড়াবাড়ি। সে গলা খাদে নামিয়ে বলেই ফেলল, কোনো একদিন হয়তো দেখা যাবে এই লোকই আপনাদের গুলি করে মেরে রেখে পালিয়েছে।

রুন বিরক্ত হয়ে বলেছে, আমাদের মারবে কেন ?

মিসেস রুন, ওদের কোনো কারণ-টারণ লাগে না, ওরা হচ্ছে 'বর্ন কিলার'। ওরা স্বাভাবিক মানুষ না, মিসেস রুন।

কথাটি একেবারে মিথ্যা নয়। ভাড়াটে সৈনিকরা অস্বাভাবিক মানুষ তা বলাই বাহুল্য। বন্য পশুর মতো জীবন কাটিয়ে হঠাৎ করে কেউ পোষ মানে না। এর পিছনে নিশ্চয়ই কোনো রহস্য আছে।

মিসেস রুন, লোকটাকে বিদেয় করে দিন।

দেখা যাক কী করা যায়। আমার কাছে তেমন কিছু খারাপ মনে হচ্ছে না।

ভালোও তো মনে হচ্ছে না, ঠিক না ?

রুনের মনে একটি কাঁটা বিঁধে রইল। অস্পষ্ট সন্দেহের একটি তীক্ষ্ণ কাঁটা।

হ্যালো, রুন ?

হ্যাঁ।

আমি এতরা।

হ্যালো, এতরা।

নতুন বডিগার্ড কি কাজ শুরু করেছে ?

হ্যাঁ, করেছে।

পছন্দ হয়েছে তোমার ?

রুন জবাব দিল না। এতরা বলল, হ্যালো, জবাব দিচ্ছ না কেন ?

রুন ইতস্তত করে বলল, ভালোই তো।

অ্যানির পছন্দ হয়েছে ?

পছন্দ হওয়াহওয়ির কী আছে ? বডিগার্ডের সঙ্গে তার সম্পর্ক কী ? স্কুলে নিয়ে যাবে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। ব্যস।

এতরা গলার স্বর একধাপ নামিয়ে ফেলল, শোনো, একটা প্রবলেম হয়েছে।

কী প্রবলেম ?

আমি এজেন্সিতে খোঁজ নিয়েছিলাম। আমার মনে হচ্ছে লোকটিকে রাখা ঠিক হবে না।

কেন ?

ও একজন ডেঞ্জারাস লোক। আগে বুঝতে পারিনি।

রুন শান্তস্বরে বলল, এরকম কাজের জন্যে তো ডেঞ্জারাস লোকই দরকার।

তা দরকার, তবু আমার মনে হচ্ছে একে ছাড়িয়ে দেয়া ভালো। আমি সন্ধ্যাবেলা এসে আলাপ করব। তুমি থাকছো তো?

হ্যাঁ, সেও থাকবে।

এতরার মনে হলো রুন খানিকটা নিরাশ হলো।

আচ্ছা, আমি আসব সন্ধ্যায়।

লাঞ্চের সময় রুন দেখল অ্যানি অস্বাভাবিক গম্ভীর। কিছুই মুখে দিচ্ছে না।

রান্না পছন্দ হচ্ছে না তোমার, অ্যানি?

পছন্দ হবে না কেন! বেশ ভালো রান্না।

তবে খাচ্ছ না কেন?

আমার ভালো লাগছে না।

রুন খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, লোকটা কি তোমাকে কোনো কড়া কথা বলেছে?

না।

ওর ঘর থেকে বের হয়ে তুমি খুব কাঁদছিলে, তাই জিজ্ঞেস করছি।

এমনি কাঁদছিলাম। ও আমাকে কোনো কড়া কথা বলেনি।

রুন অবাক হয়ে বলল, লোকটিকে তোমার পছন্দ হয়েছে নাকি?

হ্যাঁ, পছন্দ হয়েছে।

অ্যানি স্পষ্টস্বরে আবার বলল, লোকটিকে আমার ভালুকের মতো লাগে মা। প্রকাণ্ড একটা বুড়ো ভালুক।

এই ভালুক কিন্তু তুলোভরা ভালুক না যে সারাদিন কোলে করে ঘুরে বেড়াবে। এই ভালুকের ধারালো নখ আছে।

অ্যানি খিলখিল করে হেসে ফেলল।

হাসছো কেন?

এমনি হাসছি।

কারণ ছাড়া হাসা এবং কারণ ছাড়া কান্না এসব মোটেই ভালো লক্ষণ না। কাল থেকে তুমি রীতিমতো স্কুলে যেতে শুরু করবে। লোকটি নিয়ে যাবে এবং নিয়ে আসবে। ওর সঙ্গে বেশি মিশতে চেষ্টা করবে না। এই লোকটি মেলামেশা বেশি পছন্দ করে না।

তুমি লোকটি লোকটি বলছ কেন মা? ওর একটি নাম আছে। জামশেদ। মি. জামশেদ বলবে।

ঐসব বিদেশী নাম আমার মুখে আসে না।

চেষ্টা করলেই আসবে। বলো আমার সঙ্গে— জামশেদ।

বলেছি তো বিদেশী নাম আমি উচ্চারণ করতে পারি না।

মা, ওকে যদি আমি বুড়ো ভালুক বলি, তা হলে কি ও রাগ করবে ?

জানি না। তুমি বড্ড বাজে কথা বলো।

মিস মারিয়াটা বলছিলেন, বুড়ো ভালুক নাকি ঠান্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারে।

এরকম বলার কারণ কী ?

মিস মারিয়াটার এরকম মনে হচ্ছে। আমার কিন্তু তা মনে হয় না মা।

মনে না হলেই ভালো।

আমার কাছে মনে হয়, বুড়ো ভালুক খুব একটা চমৎকার মানুষ।

রুন উঠে পড়ল। বসে থাকলেই অ্যানির বকবকানি শুনতে হবে। বড্ড বেশি কথা বলছে সে। মোটেই ভালো লক্ষণ নয়।

গাড়ি চলছে থার্ড অ্যাভিনিউ দিয়ে।

পেছনের সিটে অ্যানি বসে আছে। তার সঙ্গে দূরত্ব রেখে বসেছে জামশেদ। জামশেদ তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দুপাশের পথঘাট লক্ষ করছে। সুবিধাজনক জায়গাগুলো দেখবার চেষ্টা। যেসব জায়গায় হঠাৎ করে হামলা হতে পারে। অত্যন্ত ব্যস্ত রাস্তা। এখানে গাড়ির উপর হামলা চালানোর সম্ভাবনা খুবই কম। যদি কিডন্যাপিং-এর চেষ্টা হয় তবে তা হবে স্কুলের আশপাশে। ব্যস্ত রাস্তায় নয়। তবু রাস্তা সম্পর্কে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

জামশেদ তার হাঁটুর উপর মেট্রোপলিটান ম্যাপটি বিছিয়ে দিল। লাল পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে লাগল থার্ড অ্যাভিনিউতে ক'টি এক্সিট আছে তার ওপর। পেট্রোল পাম্প ক'টি আছে তাও দেখতে হবে। বড় ভ্যানজাতীয় গাড়ি লুকিয়ে রাখার সবচেয়ে সহজ জায়গা হচ্ছে পেট্রোল পাম্প। নষ্ট হয়ে গেছে এই অজুহাতে প্রকাণ্ড একটা গাড়ি সেখানে দীর্ঘ সময় ফেলে রাখা যায়। এতে কারোর মনে কোনোরকম সন্দেহ জাগে না।

স্কুল পর্যন্ত তিনটি পেট্রোল পাম্প দেখা গেল। জামশেদ ড্রাইভারের দিকে ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞেস করল, স্কুলে যাবার তো অনেকগুলো পথ আছে। তুমি কি সব সময় থার্ড অ্যাভিনিউ দিয়ে যাও ?

হ্যাঁ। এই রাস্তায় ট্রাফিক কম।

এর পর থেকে কখনো পরপর দুদিন এক রাস্তায় যাবে না। আমাদের এমন ব্যবস্থা করতে হবে যেন কেউ আগে থেকে বুঝতে না পারে আমরা কোন রাস্তায় যাব।

ঠিক আছে। আমি একেকদিন একেক রাস্তায় যাব।

জামশেদ ইতস্তত করে বলল, রওনা হবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করবে কোন রাস্তা। আমি বলে দেব। তুমি কিছু ঠিক করবে না।

ড্রাইভারটি আহত স্বরে বলল, আমি কুড়ি বছর ধরে এদের গাড়ি চালাচ্ছি। তুমি আমাকেও বিশ্বাস করছ না ?

না। আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

যে কাউকে বিশ্বাস করতে পারে না, তার পৃথিবীতে বাস করা কষ্টকর। পৃথিবীতে বাস করতে হলে মানুষকে বিশ্বাস করতে হয়।

জামশেদ ছোট একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, ঠিক আছে তোমার পছন্দের রাস্তাতেই যাবে।

ধন্যবাদ। তুমি আমাকে তা হলে বিশ্বাস করতে পারছো ?

না। আমি তো বলেছি আমি কাউকে বিশ্বাস করি না।

ও।

সিসিলিয়ান ড্রাইভার অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে পড়ল।

অ্যানি সারা পথে চুপচাপ বসে ছিল। একটা কথা জানবার জন্যে তার খুব ইচ্ছা করছিল। লোকটির হাতে এরকম একটা লম্বা কাটা দাগ কোত্থেকে হলো ? দুহাতেই গভীর দাগ। যেন কেউ একটা ধারালো কিছু দিয়ে কবজির নিচ থেকে দুটি হাত কেটে ফেলতে চেষ্টা করেছিল। অ্যানি শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেসই করে ফেলল, মি. জামশেদ, আমি কি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

কোনো উত্তর নেই।

শুধু একটি কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

করো।

তোমার হাতে কী হয়েছে ?

আলজিয়ার্সে আমি একবার গ্রেফতার হয়েছিলাম, তখন হাত কেটে গিয়েছিল।

কারা তোমাকে গ্রেফতার করেছিল ?

উত্তর নেই।

তারা কি তোমাকে মারধোর করেছিল ?

হ্যাঁ, করেছিল।

অ্যানি ভয়ে ভয়ে হাত বাড়িয়ে জামশেদের হাতের কাটা দাগ স্পর্শ করল। জামশেদ কঠিন ভঙ্গিতে হাত সরিয়ে নিল। রুক্ষস্বরে বলল, কেউ আমার গায়ে হাত রাখলে আমার ভালো লাগে না। আর কখনো গায়ে হাত দেবে না। আর শুধুশুধু প্রশ্ন করবে না। মনে রাখবে কথাটা। আমার এসব ভালো লাগে না।

অ্যানি জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। তার চোখ ছাপিয়ে জল আসছে। সে চায় না কেউ দেখে ফেলুক। কেউ দেখে ফেললে বড় লজ্জার ব্যাপার হবে।

শোনো অ্যানি, কাঁদবে না। কাঁদার মতো কিছু হয়নি। অকারণে কান্না আমি সহ্য করতে পারি না।

অ্যানি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, তুমি কখনো কাঁদ না ?

উত্তর নেই।

যখন আমার মতো ছোট ছিলে তখনো কাঁদনি ?

জামশেদ থেমে থেমে বলল, পৃথিবীটা খুব ভালো জায়গা নয়। অনেকরকমের দুঃখকষ্ট আছে পৃথিবীতে। এখানে ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে কেঁদে বুক ভাসালে হয় না। তুমি যখন বড় হবে তখন জানবে অনেক কুৎসিত ও কদর্য ব্যাপার হয় এখানে।

অ্যানি ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, তুমি আমাকে যত ছোট ভাবছ আমি তত ছোট না। আমি অনেক কুৎসিত ব্যাপারের কথা জানি কিন্তু আমি কাউকে সেসব বলতে পারি না। আমার কোনো বন্ধু নেই।

দোতলার লবিতে বসে জামশেদ কফি খাচ্ছিল। মারিয়া নামের যে-মেয়েটি কফি নিয়ে এসেছে সে কিছুক্ষণ গল্প জমাবার চেষ্টা করেছে কিন্তু তা সঙ্গত কারণেই জমেনি। জামশেদের সঙ্গে কখনো গল্প জমে না।

জামশেদ চারদিক তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখছিল। বাড়িটি সেরকম সুরক্ষিত নয়। চারদিকের দেয়াল নিচু! যে-কেউ অনায়াসে দেয়াল টপকাতে পারবে। তার ওপর কোলাপসেবল গেটটিতে বেশির ভাগ সময়ই তালা থাকে না। ভিকির সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলতে হবে। তিনটি জিনিস করা দরকার। দেয়াল কমপেক্ষ তিন ফুটের মতো বাড়াতে হবে এবং গেটে সর্বক্ষণ তালা দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং একটি ভালো জাতের কুকুরের ব্যবস্থা করতে হবে।

জামশেদ কফি খেতে খেতে ভাবল, শরীর যদি আগের মতো থাকত, তাহলে এসবের দরকার হত না। কিন্তু শরীর আগের মতো নেই, নষ্ট হয়ে গেছে। এখন একধরনের আলস্য বোধ হয়। দারুণ ক্লান্তি লাগে। মাঝে মাঝে দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছা করে। কেউ কি এখনো আছে যে তাকে চিনতে পারবে ? এ জাতীয় ভাবনা ইদানীং তার হয়। তখনই তাকে নেশা করতে হয়। সস্তা ধরনের নেশা, ঝাঁঝালো ব্ল্যাক নাইট কিংবা টক রাম। লিভার অতি দ্রুত পচিয়ে ফেলবার মহৌষধ। লিভারটি সুস্থ রেখেই বা কী লাভ। জীবন ফুরিয়ে আসছে। ঘণ্টা বেজে গিয়েছে, কান পাতলে শোনা যায়। এ সময়ে কোনোকিছুর জন্যেই কোনো মমতা থাকে না।

জামশেদ উঠে দাঁড়াল। মারিয়া সিঁড়ি দিয়ে নামছিল। সেখান থেকেই চেঁচিয়ে বলল, কফিপটে আরো কফি আছে। খেতে চাইলে ঢেলে নাও। জামশেদ তার উত্তরে

কিছু বলল না। সে নিজের ঘরে চলে এলো। এ ঘরের জানালাগুলো ছোট ছোট। অর্থাৎ ঘরটি ভৃত্যশ্রেণীর লোকদের জন্যে। তাতে কিছুই যায় আসে না। ঘরটি প্রশস্ত এবং লাগোয়া বাথরুম আছে। বাথরুমটি ঝমঝকে পরিষ্কার। তা ছাড়া বুকশেলফ আছে একটি, প্রচুর ইংরেজি পেপারব্যাক সেখানে। বই পড়ার তার তেমন অভ্যেস নেই। তবু মাঝেমধ্যে চেষ্টা করে দেখা যেতে পারে।

তুমি হাততালি দেবে, মারিয়া। তোমার হাততালির সঙ্গে আমি দৌড়াব। শব্দ করে হাততালি দেবে।

জামশেদ তাকিয়ে দেখল অ্যানি লনে দৌড়াতে শুরু করেছে। সিঁড়ির কাছে কোমরে হাত দিয়ে মারিয়া দাঁড়িয়ে আছে। জামশেদ অবাক হয়ে লক্ষ করল মেয়েটি বেশ ভালো দৌড়াচ্ছে। দেখে যতটা দুর্বল মনে হয় ততটা দুর্বল নয় সে। বেশ ভালোই ছুটছে। তবে স্টার্টিং হচ্ছে না। মেয়েটির রিফ্লেক্স অ্যাকশন ভালো না। অনেকখানি নষ্ট করছে শুরুতেই। জামশেদের হঠাৎ ইচ্ছে হলো নিচে নেমে যেতে, আর ঠিক তক্ষুনি অ্যানি চেঁচিয়ে বলল, মি. জামশেদ, আমি স্কুল স্পোর্টসে নাম দিয়েছি। ওয়ান হানড্রেড মিটার।

জামশেদ জানালার পাশ থেকে সরে এল। তার এখন সুটকেস খুলে কনিয়াকের বোতলটি বের করার ইচ্ছা হচ্ছে। প্রবল ইচ্ছা। জামশেদ ঘরের দরজা বন্ধ করে সুটকেস খুলল। নিচে অ্যানি খুব হৈচৈ করছে। চেঁচিয়ে বলছে, মারিয়া, তোমাকেও দৌড়াতে হবে আমার সঙ্গে। একা একা দৌড়াব নাকি ? উঁহু, তা হচ্ছে না। মারিয়া স্প্যানিশ ভাষায় কী যেন বলল। তার উত্তরে অ্যানি গলা কাঁপিয়ে হাসতে লাগল। জামশেদের কাছে মনে হয় অ্যানি মেয়েটি বেশ ভালো।

ভিকি একটা দুঃসংবাদ পেয়েছে।

ওরিয়েন্ট মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ম্যানেজার টেলিফোন করে বলেছে এক কোটি লিরা ঋণ আপাতত দিতে পারছে না ওরা। তবে নতুন স্পিনিং মেশিন কেনা হলে সেই মেশিন বন্ধক রেখে কিছু দেয়া যেতে পারে।

ভিকি আকাশ থেকে পড়ল। খবরটি অপ্রত্যাশিত। ওরিয়েন্ট মার্কেন্টাইল ব্যাংকের ম্যানেজারের সঙ্গে খোলাখুলি কথা হয়েছিল। যোগাযোগ এতরার করে দেয়া। ম্যানেজার বলেছিল, ঋণ পাবার কোনো অসুবিধা হবে না। হঠাৎ করে এরকম হলো কেন কে জানে!

ভিকি কী করবে ভেবে পেল না। সিল্ক ইন্ডাস্ট্রি বিক্রি করে দেয়াই সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি। সিনথেটিক কাপড়ের ব্যবসাতে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কিন্তু তার জন্যে যে সাহস দরকার সে সাহস ভিকির নেই। তাদের তিন পুরুষের ব্যবসা হচ্ছে সিল্ক নিয়ে। সিল্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসা সম্ভব নয়। ডুবলেও সিল্কের মধ্যেই ডুবতে হবে।

হ্যালো, এতরা ?

হ্যাঁ। কী ব্যাপার, এই সাতসকালে ?

ওরিয়েন্ট মার্কেন্টাইল লোন দিচ্ছে না।

বলো কী!

হ্যাঁ। আজকেই কথা হয়েছে।

কী জন্যে দিচ্ছে না কিছু বলেছে ?

না।

আচ্ছা, আমি জিজ্ঞেস করে জানব।

ভিকি ক্লান্ত স্বরে বলল, এখন আমার কী করণীয় সেটা বলো।

বিদেশী ব্যাংকগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করা উচিত। ওদের হার্ট অনেক বড়। ঋণ চাইলে এত ধানাইপানাই করে না। তুমি আমেরিকান এক্সপ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ করো। মি. অলিভার লরেন্স নামে এক ভদ্রলোক আছেন সেখানে। ওঁর সঙ্গে কথা বলো।

দেখি।

দেখাদেখির কিছু নেই। আজকেই যোগাযোগ করো। আচ্ছা, একটা কথা, মিলান শপিং মলে তোমার একটা ঘর আছে না ?

আছে।

সেটাও কি মর্টগেজড ?

হ্যাঁ।

কোন ব্যাংক ?

সিটি ব্যাংক।

তোমার অবস্থা তো করুণ বলেই মনে হচ্ছে। যাক, ঘাবড়াবার কিছু নেই। একটা কিছু হবেই। ব্যাংক ছাড়াও তো ঋণ দেবার লোক আছে।

ভিকি শঙ্কিত গলায় বলল, আমি ব্যাংক ছাড়া বাইরের কোনো লোন নিতে চাই না।

না চাওয়াই উচিত। ইন্টারেস্টের রেট খুবই চড়া।

সেজন্যে না। মাফিয়াদের সঙ্গে জড়াতে চাই না।

এতরা খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, জলে নামলে কুমিরের সঙ্গে ভাব রাখাই ভালো।

এতরা, ভাব বেশি করতে চাই না।

আচ্ছা-আচ্ছা, ঠিক আছে। ভিকি!

শুনছি।

এই রোববারে বাচ্চাদের জন্যে একটা মেলা হচ্ছে। সার্কাস, ম্যাজিক-শো এইসব হবে, চিলড্রেন্স নাইট। একটা বড় জাহাজ ভাড়া করছে ওরা। জাহাজের মধ্যেই সব ব্যবস্থা। তুমি অ্যানি এবং রুন এদের নিয়ে ঘুরে আসো। মন ভালো থাকবে।

আমি এই ক'দিন কোথাও বেরুব না।

অ্যানির ভালো লাগত।

তুমি যেতে চাইলে অ্যানিকে নিয়ে যেতে পারো। আমি কোথাও নড়ব না।

মি. অলিভার লরেন্স লোকটি অত্যন্ত মিষ্টভাষী। সে ভিকির ঋণের কাগজপত্র সব হাসিমুখে দেখল। কফি খাওয়াল। মিডল ইস্টের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করে শেষ পর্যায়ে বলল, মি. ভিকি, ইতালিয়ানরা পারতপক্ষে বিদেশী ব্যাংকের কাছে লোন চায় না। এদিক দিয়ে তারা খুব জাতীয়তাবাদী। বিদেশী ব্যাংকের কাছে ওরা তখনই আসে যখন দেশী ব্যাংক ওদের ঋণ দেয় না। কথাটা কি ঠিক নয় ?

হ্যাঁ, তা ঠিক।

আপনাকে স্থানীয় ব্যাংকগুলো লোন দিচ্ছে না কেন, মি. ভিকি ?

ভিকি সরাসরি কোনো জবাব দিতে পারল না। লরেন্স অলিভার হাসিমুখে বলল, আমার মনে হয় পিওর সিল্ক থেকে আপনার সরে আসা উচিত। পিওর সিল্কের বাজার ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে।

ভিকি চুপ করে রইল। লরেন্স অলিভার বলল, আপনাদের যে পারিবারিক নামডাক আছে, তার ওপর নির্ভর করেই আমরা আপনাকে লোন দিতে রাজি আছি, তবে আপনাকে পিওর সিল্ক থেকে সরে আসতে হবে।

ভিকি ক্লান্তস্বরে বলল, তা সম্ভব নয়।

সম্ভব নয় কেন ?

মি. লরেন্স, সিল্ক ব্যবসা আমাদের অনেক দিনের ব্যবসা। আমার দাদা ছিলেন রাস্তার ছোকরা। সিল্ক ব্যবসা করেই তিনি কোটিপতি হয়েছিলেন। তিন-পুরুষের সেই ব্যবসা আমি নষ্ট করব তা হয় না।

লরেন্স অলিভার মৃদু হাসল।

আপনি হাসছেন কেন ?

হাসছি কারণ আপনি ব্যবসার জন্যে ফিট নন। আপনি সেন্টিমেন্টাল।

সেন্টিমেন্টাল হওয়া কি খুব দোষের ?

ভিকি চুপ করে গেল।

আমি দুঃখিত যে কিছু করতে পারছি না। তবে আপনি যদি ব্যবসার ধারা বদলাতে চান, তা হলে আমার সঙ্গে দেখা করবেন। আমি নিশ্চয়ই সাহায্য করব।

ভিকি মৃদুস্বরে বলল, তা সম্ভব নয়।

রুন ত্রিশ হাজার লিরা দিয়ে নতুন একটা ড্রেস কিনেছে। অনেকটা জাপানি কিমানোর মতো দেখতে। হালকা সবুজ রঙের ওপর নীল নকশা। ঘরে আনার পর তার মনে হলো, ঘন সবুজের ওপর ঘন নীল নকশার যে ড্রেসটি ছিল, সেটিও সন্ধ্যাবেলার জন্যে চমৎকার। রুন সেটাও কিনে আনল। একই ডিজাইনের উপর আরো দুটো ড্রেস ছিল। সে দুটোও কিনে ফেলবে কি না এই বিষয়ে সে ঠিক মনস্থির করতে পারল না। সবগুলি কিনে ফেলবার পেছনে সবচেয়ে বড় যুক্তি হচ্ছে, তা হলে তাকে দেখে অন্য কেউ একই ডিজাইনের পোশাক সঙ্গে সঙ্গে কিনতে পারবে না। আর না কেনার পেছনে যুক্তি হচ্ছে, ভিকি রাগ করবে।

ভিকি অবিশ্যি রাগ করল না, ভাবলেশহীন চোখে তাকিলে দেখল। রুন হালকা গলায় বলল, খরচ একটু বেশি পড়ে গেল, কিন্তু দ্যাখো-না, এত চমৎকার ডিজাইন রোজ রোজ পাওয়া যায় না। আর সবুজ রঙের গাম্ভীর্যটুকু দ্যাখো। চোখ ফেরানো যায় না। তুমি খুশি হয়েছ তো ?

হ্যাঁ, হয়েছি।

না, ঠিক খুশি হওনি। একটু রাগ তোমার মধ্যে আছে। কিন্তু আমি ড্রেসটা গায়ে দিয়ে আসি, দেখবে কী অদ্ভুত লাগে। ভালো কথা, ঐ লোকটা তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায়। খুব নাকি জরুরি।

কোন লোকটা ?

আমাদের বডিগার্ড। ওর নাম মনে থাকে না আমার।

কী চায় সে ?

আমি জানি না। আমাকে কিছু বলেনি।

বেশ, ডাকো।

ভিকি মন দিয়ে ওর কথা শুনল। লোকটি ঘরের চারদিকের দেয়াল তিনফুট উঁচু করতে চায়, একটি কুকুর রাখতে চায়।

মি. ভিকি, তোমার বাড়ি খুবই অরক্ষিত। যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে তবে তোমার বাড়িতেই ঘটবে।

জামশেদ, তুমি একটা কথা ভুলে যাচ্ছ। আমার মেয়েকে কেউ কিডন্যাপ করবে না। তোমাকে আমি রেখেছি শুধু আমার স্ত্রীকে খুশি করবার জন্যে। তুমি তার কাছে একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতীক।

এই কথা তুমি কিন্তু আমাকে আগে বলোনি।

এখন বললাম। এখন থেকে জেনে রাখো।

ও।

এখানে থাকতে তোমার কেমন লাগছে ?

জামশেদ জবাব দিল না।

ভিকি বলল, অ্যানি অবিশ্যি খুব খুশি। তোমাকে ওর খুব পছন্দ হয়েছে।

জামশেদ অবাক হয়ে তাকাল। তাকে পছন্দ করবার তেমন কোনো কারণ নেই। বরং অপছন্দই হবার কথা।

তোমাকে ও কী বলে ডাকে জানো ? বুড়ো ভালুক।

বুড়ো ভালুক ?

তোমাকে নাকি ওর বুড়ো ভালুকের মতো লাগে।

ও।

আমার মেয়েটিকে কেমন লাগে তোমার ? চমৎকার না ?

শিশুদের আমি ঠিক পছন্দ করি না, মি. ভিকি। ওদেরকে কখনোই ভালো লাগে না।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ।

পছন্দ না করার কারণ কী ?

আছে হয়তো কোনো কারণ। আমি ঠিক জানি না। কারণ নিয়ে কখনো ভাবিনি।

রুন দারুণ বিরক্ত হলো।

একজন লোক আগ্রহ করে নিতে চাইছে, কিন্তু মেয়ে যাবে না। এর মানে কী ? কতরকমের মজার ব্যবস্থা আছে। সারারাত জেগে সার্কাস-টার্কাস দেখবে, তা না, অ্যানি মুখ গোঁজ করে আছে।

কেন যাবে না, অ্যানি ?

আমার ভালো লাগে না।

ভালো না লাগার কী আছে এখানে ?

বললাম তো আমার কোথাও যেতে ইচ্ছা করছে না।

সার্কাস দেখতে তোমার ভালো লাগে না ?

অ্যানি চুপ।

পুতুলনাচ দেখতে ভালো লাগে না ?

কোনো জবাব নেই।

তার ওপর প্যান্টোমাইম আছে।

অ্যানি টেনে টেনে বলল, তুমি যদি যাও তা হলে আমি যাব।

রুন বিরক্ত স্বরে বলল, আমি তোমার কোনো অজুহাত শুনতে চাই না। তুমি যাবে এবং হাসিমুখে যাবে। একটা লোক এত টাকা খরচ করে টিকিট এনেছে, না, সে যাবে না! দিনরাত ঘরে বসে থেকে এটা তোমার হয়েছে।

মা, আমি কোথাও যেতে চাই না।

এ ব্যাপারে আমি আর কথা বলতে চাই না। তুমি তোমার কাপড় গুছিয়ে রাখো। সন্ধ্যাবেলা এতরা চাচা তোমাকে তুলে নিয়ে যাবে।

অ্যানি তার বাবাকে গিয়ে ধরল, বাবা, আমি ঐ জাহাজে যেতে চাই না।

কেন মা ?

আমার ভালো লাগছে না।

শরীর খারাপ ?

না, শরীর ঠিকই আছে।

তা হলে কি মন-খারাপ ?

হুঁ।

মন-খারাপ হলে তো যাওয়াই উচিত। তা হলে মন ভালো হবে। তাছাড়া বহু টাকা খরচ করে তোমার এতরা চাচা টিকিট কেটেছেন। সেটা দেখতে হবে না ?

আমার একটুও ইচ্ছা করছে না বাবা।

ইচ্ছে না করলেও আমাদের অনেক কিছু করতে হয়। তুমি না গেলে তোমার মা খুব রাগ করবেন। তোমার মা রাগ করলে কী অবস্থা হয় তা তো তুমি জানোই। জানো না ?

জানি।

যাও মা, ঘুরে আস। বেশ লাগবে তোমার। মনে হবে কেন যে আগে আসতে চাই নি!

রাত দশটার পর জামশেদ দরজা বন্ধ করে দেয়। আজকেও করে দিয়েছে। সুটকেস খোলা হয়েছে। হুইসকির পেটমোটা বোতল বের হয়েছে। বোতলের মুখ খোলবার আগেই দরজায় আলতো করে টোকা পড়ল।

কে ?

কোনো উত্তর নেই। জামশেদ বোতলটা ব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলল।

কে ?

কোনো উত্তর নেই। জামশেদ দরজা খুলে দেখে ঘাসের স্লিপার পায়ে দিয়ে অ্যানি দাঁড়িয়ে আছে শুকনোমুখে।

কী ব্যাপার ?

আমি তোমার সঙ্গে একটা কথা বলতে চাই।

কথাটা সকালে বললে হয় না ?

না।

এসো, ভেতরে এসে বলো।

অ্যানি নিঃশব্দে ভেতরে এলো। জামশেদ দেখল মেয়েটির চোখ ফোলা। নিশ্চয়ই দীর্ঘ সময় ধরে কাঁদছে।

কী বলবে বলো।

কাল সন্ধ্যায় এতরা চাচা আমাকে একটা জাহাজে নিয়ে যাবে। সেখানে সারারাত ধরে সার্কাস-টার্কাস হবে।

অ্যানি দম নেয়ার জন্যে থামল। জামশেদ কিছুই বলল না।

আমি সেখানে যেতে চাই না।

ও।

ঐ লোকটা ভালো না। আমি অনেক কিছু বুঝতে পারি। আমি আগের মতো ছোট না।

তুমি তোমার বাবা-মাকে বলেছ ?

বলেছি। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি ?

তুমি কি বলেছ এতরা চাচা লোকটি খারাপ ?

না।

অ্যানি ফুঁপিয়ে উঠল। জামশেদ ভারি গলায় বলল, যাও, ঘুমুতে যাও। অনেক রাত হয়েছে। নাও, এই তোয়ালেটা দিয়ে চোখ মোছো।

অ্যানি চোখ মুছে শান্তস্বরে বলল, শুভ রাত্রি, মি. জামশেদ।

শুভ রাত্রি।

এতরা এসে পড়ল পাঁচটার মধ্যেই। তার গায়ে চমৎকার একটা সার্জের কোট। পিঠে বাটিকের কাজ-করা চামড়ার একটা ব্যাগ।

অ্যানি, তৈরি তো ?

রুন বলল, হ্যাঁ, তৈরি হচ্ছে। আর ঝামেলার কথা বলো কেন, হঠাৎ করে বলছিল সে যাবে না। তার নাকি ভালো লাগছে না।

কী আশ্চর্য, ভালো লাগছে না কেন ? কোথায়, অ্যানি কোথায় ?

সাজগোজ করছে।

যাচ্ছে তো এখন ?

হ্যাঁ, যাচ্ছে।

যাক, তাও ভালো।

অ্যানি লাল রঙের একটি ম্যাক্সিজাতীয় ড্রেস পরেছে। ড্রেসটির জন্যেই হোক বা অন্যকোনো কারণেই হোক অ্যানিকে বেশ বড় বড় লাগছে। পনেরো-ষোলো বছরের তরুণীর মতো। রুন অবাক হয়ে বলল, বাহ্, চমৎকার লাগছে তো! গালে কি তুমি রুজ দিয়েছ, অ্যানি ?

নাহ্।

রুজ ছাড়াই গাল এমন লাল দেখাচ্ছে ? আশ্চর্য তো! এতরা, দ্যাখো, আমার মেয়েকে দ্যাখো। পরীর মতো লাগছে না ?

হুঁ, তা লাগছে। মেয়ে মায়ের মতোই হয়েছে।

গেটের পাশে জামশেদ দাঁড়িয়ে ছিল। এতরা অ্যানিকে নিয়ে গেটের কাছে আসতেই সে বলল, মি. এতরা, অ্যানিকে যে তুমি জাহাজে নিচ্ছ, সেখানকার নিরাপত্তার ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি তো কিছু জানি না।

তোমার জানার কোনো দরকার আছে কি ?

আছে। আমাকে বেতন দিয়ে রাখা হয়েছে অ্যানির নিরাপত্তার জন্যে। কাজেই অ্যানি যেখানে যাবে আমিও সেখানে যাব।

এতরা স্তম্ভিত হয়ে গেল। বলে কী এই উজবুক!

আমি একে নিয়ে যাচ্ছি এটা কি যথেষ্ট নয় ?

না মি. এতরা, মোটেই যথেষ্ট নয়। আমি সঙ্গে যাচ্ছি।

এতরা দেখল, লোকটির কালো চোখ পাথরের মতো কঠিন। এ যাবেই সঙ্গে, এতে ভুল নেই।

অ্যানির ফ্যাকাসে ঠোঁটে যেন রক্ত ফিরে এসেছে। সে মনে হচ্ছে অন্যদিকে তাকিয়ে হাসি গোপন করতে চেষ্টা করছে।

তোমাকে সঙ্গে নেয়ার জন্য কোনো বাড়তি টিকিট নেই।

তা হলে আজ যাওয়াটা বাতিল করতে হবে।

আমার মনে হয় একটা ছোট ব্যাপারকে এখানে অনেক বড় করে দেখা হচ্ছে।

আমার তা মনে হয় না মি. এতরা।

এতরা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল। জামশেদ শান্তস্বরে বলল, চেষ্টা করলে এখনো হয়তো আরো একটি টিকিট জোগাড় করা যেতে পারে।

এত সময় আমার নেই। আমি একজন ব্যস্ত মানুষ।

তা হলে বরং অন্য কোনোদিন হবে।

এতরা জবাব দিল না।

ভিকি অনেক রাতে ঘুমুতে এসে দেখে রুন জেগে আছে। ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। রুন এত রাত পর্যন্ত জাগে না। রাত জাগলে তার চোখের নিচে কালি পড়ে। এটি সে হতে দেয় না। শরীর ঠিক রাখবার জন্যে অনেক কঠিন নিয়ম মেনে চলে সে।

ভিকি বলল, কী ব্যাপার, এখনো জেগে আছ যে ? দেড়টা বাজে।

তোমার জন্যে জেগে আছি।

কিছু হয়েছে নাকি ?

ঐ লোকটার চাকরি নট করে দাও।

কার চাকরি নট করব ?

জামশেদ না কী যেন নাম— অ্যানির বডিগার্ড।

ব্যাপারটা কী ?

অত্যন্ত অভদ্র ব্যবহার করেছে সে।

কার সঙ্গে ? তোমার সঙ্গে ?

না, এতরার সঙ্গে। এতরা ভীষণ রেগে গেছে।

ঘটনাটা খুলে বলল রুন। ভিকি গম্ভীর হয়ে বলল, এটা বলার জন্যেই তুমি এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে আছো ?

ঘটনাটা তোমার কাছে খুব সাধারণ মনে হচ্ছে ? এতবড় অপমান করল সে এতরাকে। শেষ পর্যন্ত এতরা অ্যানিকে রেখে গেল।

এতরার অপমানিত বোধ করার তো কোনো কারণ নেই। লোকটি তার ডিউটি করেছে।

ডিউটি ? কিসের ডিউটি ?

অ্যানির নিরাপত্তার দিকে লক্ষ রাখার ডিউটি। লক্ষ রাখা— যাতে কেউ অ্যানিকে কিডন্যাপ না করে।

রুন রেগে গিয়ে বলল, কে কিডন্যাপ করবে অ্যানিকে ?

আমারও তো সেই প্রশ্নই ছিল। কিন্তু তখন তুমিই আমাকে অন্যরকম বুঝিয়েছ।

বেশ, আমি ভুল করেছি।

বডিগার্ডের ভূত তোমার ঘাড় থেকে নেমেছে ?

রুন জবাব দিল না।

বডিগার্ডের আর তা হলে প্রয়োজন নেই ?

না।

খুব ভালো।

এখন বলো কবে তাড়াচ্ছ লোকটাকে ?

বললেই তো আর হুট করে তাড়ানো যায় না। চাকরি থেকে বরখাস্ত করতে হলে খুব ভালো কারণ থাকতে হবে। নয়তো ইউনিয়নের ঝামেলায় পড়ব।

কিন্তু চাকরি দেবার সময় তো তুমি বলেছিলে টেম্পোরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট, বলোনি ?

হ্যাঁ, তা বলেছি। কিন্তু টেম্পোরারি অ্যাপায়েন্টমেন্টেও তিনমাস শেষ হবার আগে নোটিশ দেয়া যায় না। তুমি এত ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন ?

এতরা খুব রাগ করেছে।

একে তো এতরাই জোগাড় করে এনেছিল।

এতরা আমাকে বলেছে ঐ লোকটি না বিদেয় হওয়া পর্যন্ত সে এ-বাড়িতে আসবে না।

না আসুক। তার আসতেই হবে এমন কোনো কথা আছে ?

তার মানে ? কী বোঝাতে চাচ্ছ তুমি ?

কিছুই বোঝাতে চাচ্ছি না। ভোর হোক তখন দেখা যাবে। এখন ঘুমাও। অসংখ্য ঝামেলা আমার মাথায়। এইসব সামান্য ব্যাপার নিয়ে হৈচৈ করতে ভালো লাগছে না।

তোমার আবার কী ঝামেলা ?

ব্যাংক থেকে লোন পাওয়া যাচ্ছে না।

একটা থেকে না পাওয়া গেলে অন্যটা থেকে পাওয়া যাবে।

ভিকি কথা না বাড়িয়ে ঘুমুতে গেল। রুন মাথার চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে বলল, ঐ লোকটি মনে হলো অ্যালকোহলিক। মারিয়া জানালা দিয়ে দেখেছে রাতেরবেলা বোতল নিয়ে বসে ও।

একটুআধটু ড্রিংক তো সবাই করে।

তা করে, কিন্তু কেউ দরজা-টরজা লাগিয়ে করে না। আমি এ-বাড়িতে কোনো মাতালকে রাখব না।

সকাল হোক, আলাপ করে ঠিক করব কী করা যায়। এখন দয়া করে ঘুমুতে যাও।

টুক টুক করে টোকা পড়ছে দরজায়।

জামশেদ ভারিস্বরে বলল, কে ?

আমি। আমি অ্যানি।

কী চাই ?

আমি তোমাকে ধন্যবাদ দিতে এসেছি।

ঠিক আছে। এবার যাও।

আমি তোমার জন্য কয়েকটা গোলাপ ফুল এনেছিলাম।

ফুল লাগবে না। তুমি যাও।

অ্যানি তবুও দীর্ঘ সময় দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রইল। মারিয়া কফির পেয়ালা হাতে বাইরে বেরিয়ে দেখল অ্যানি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপারটা তার ভালো লাগল না। একটা ভয়ঙ্কর লোকের দরজার সামনে ভোরবেলায় ফুল-হাতে দাঁড়িয়ে থাকাটা চট করে চোখে লাগে। ব্যাপারটা রুনকে বলতে হবে। মারিয়া ডাকল, অ্যানি!

হ্যালো, মারিয়া।

কী করছো একা একা ?

কিছু করছি না।

ফুল কার জন্যে ?

অ্যানি হাসিমুখে বলল, বুড়ো ভালুকের জন্যে।

হঠাৎ ফুল কেন ? কোনো বিশেষ কারণ আছে ?

আছে। তোমাকে বলা যাবে না।

মারিয়ার ভ্রু কুঞ্চিত হলো। ব্যাপারটা তার মোটেও ভালো লাগছে না।

জামশেদকে একদিনের ছুটি দেয়া হয়েছে।

তার ছুটির প্রয়োজন ছিল না তবু নিতে হলো। ভিকি বারবার বলল, ঘুরেটুরে আসো। সারাক্ষণ ঘরে বন্দি হয়ে থাকার দরকার নেই। অ্যানির স্কুল নেই, সে বাড়িতেই থাকবে।

জামশেদের যাবার তেমন জায়গা নেই। মিলান শহরটিকে সে খুব ভালো চেনে না। দশ বছর আগে এখানের অলিগলি চেনা ছিল। এখন আর নেই। দশ বছর খুব দীর্ঘ সময়, এই সময়ে খুব চেনা জিনিসও খুব অচেনা হয়ে যায়।

রাস্তাঘাট বদলে গেছে। শহর অনেক পরিচ্ছন্ন হয়েছে। ডেলকা নদীর দুপাশে বস্তিজাতীয় যেসব ঘরবাড়ি ছিল তার কোনো চিহ্নও নেই। আকাশছোঁয়া দালান উঠেছে দুপাশে। প্রশস্ত ছয় লেনের রাস্তা। ঝলমলে নিওন আলো।

সন্ধ্যার আগে জামশেদ একতলা একটা রেস্টুরেন্টের সামনে এসে দাঁড়াল। রেস্টুরেন্টটি শহরের উপকণ্ঠে একটি দরিদ্র অঞ্চলে। অল্প আলোর একটি বাতি জ্বলছে। সে-আলোতে রেস্টুরেন্টের নাম অস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে— 'পিজা অ্যান্ড লাসানিয়া হাউস'। লেখাটি ইংরেজিতে।

রেস্টুরেন্ট ফাঁকা। এক কোনায় একটি বুড়োমতো ভদ্রলোক ঝিমুচ্ছে। অন্য প্রান্তে একটি অল্পবয়েসী মেয়ে একা একা বসে আছে। মেয়েটি ঘনঘন ঘড়ি দেখছে। নিশ্চয়ই কারো জন্যে অপেক্ষা করছে সে।

কাউন্টারে অল্পবয়স্ক একটি ছোকরা বসে আছে। জামশেদ কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল, আমি একজন আমেরিকানের খোঁজ করছি, তার নাম বেন ওয়াটসন।

ছেলেটি সন্দেহভরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। থেমে থেমে বলল, কী জন্যে খোঁজ করছেন ?

ও আমার পরিচিত।

বেন এখানে নেই।

সে এখানে আছে। কখন আসবে সে ?

জানি না।

আমি তার জন্যে অপেক্ষা করব।

ইচ্ছা হলে করুন।

জামশেদ একটি অন্ধকার কোনা বেছে নিল বসবার জন্যে। কাউন্টারের ছেলেটি এসে জিজ্ঞেস করল, কিছু খাবে ? ভালো পিজা আছে।

না।

কনিয়াক আছে। দেব ?

দিতে পার।

লিরা আছে তো তোমার কাছে ?

আছে।

এখানে আগে দাম দিতে হয়।

জামশেদ হাজার লিরার একটি নোট বের করল।

ছেলেটি নোট নিতে নিতে বলল, বেন ওয়াটসনের সঙ্গে তোমার কী দরকার ?

আছে একটা দরকার।

তুমি কি পুলিশের লোক ?

না।

জামশেদ লক্ষ করল মাস্তান ধরনের একটি ছেলে ঢুকেছে। ঠিকমতো দাঁড়াতেও পারছে না— টলছে। ছেলেটি গিয়ে দাঁড়িয়েছে মেয়েটির টেবিলের সামনে। নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলা বাধাতে চায়। জামশেদ কানখাড়া করল।

মিস আমি কি তোমার টেবিলে বসতে পারি ?

আমি একজনের জন্য অপেক্ষা করছি। তুমি দয়া করে অন্য টেবিলে বসো।

যার জন্যে অপেক্ষা করছ সে তো আসছে না।

আসবে।

যখন আসবে তখন ছেড়ে দেব।

জামশেদ লক্ষ করল মেয়েটির মুখ ফ্যাকাসে হয়ে উঠছে। মেয়েটি উঠে দাঁড়াল।

উঠছ কেন ?

আমি অন্য কোথাও বসব।

কেন, আমাকে পছন্দ হচ্ছে না ?

পছন্দ অপছন্দের কথা না। আমি বাড়ি চলে যাব।

এখনই বাড়ি যাবে কেন ? রাত তো মাত্র শুরু।

কাউন্টারের ছেলেটি বলল, অ্যাই, ঝামেলা করবে না।

ঝামেলা ?

এটা মাতলামির জায়গা না।

কী, তুই আমাকে মাতাল বললি ?

মাতাল-টাতাল বলিনি। যাও, অন্য কোথাও যাও।

এইখানে এই মেয়ের হাত ধরে বসে থাকব, দেখি কোন শালা কী বলে।

লোকটি পকেট থেকে আধহাত লম্বা একটি ছোরা বের করল।

মেয়েটির মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেল। বুড়ো ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে এই ঝামেলায় থাকতে চায় না। কাউন্টারের ছেলেটিও ভয় পেয়েছে।

জামশেদ উঠে এগিয়ে গেল। খুব ঠান্ডাস্বরে বলল, মেয়েটিকে ছেড়ে দাও।

কেন ? তুই ফুর্তি করতে চাস ?

ওর হাত ছাড়ো।

মাতালটা হাত ছেড়ে দিল কিন্তু নিমিষেই বাঁ হাতে ছোরাটা তুলল। তোলার ভঙ্গিই বলে দিচ্ছে ছোরা সে অতীতে অনেকবার ব্যবহার করেছে। আজকেও করবে। কারণ মদের প্রভাবে তার বুদ্ধি ঘোলা হয়ে গেছে।

জামশেদ দ্রুত ভাবতে চেষ্টা করল। ছোকরা লেফট হ্যান্ডার কি না তা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অনেক সময় প্রতিপক্ষকে ধোঁকায় ফেলবার জন্যে এই কাণ্ডটি করা হয়। আক্রমণের ঠিক আগের মুহূর্তে ছোরা চলে আসে ডান হাতে।

জামশেদ একদৃষ্টে মাতালটির দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। অপেক্ষার মতো কষ্টকর কিছুই নেই। তা ছাড়া বয়সের জন্যে ইন্দ্রিয় আগের মতো সজাগ রাখা যায় না। জামশেদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। এগিয়ে আসছে, এখন ঝাঁপিয়ে পড়বে। যা ভাবা গিয়েছিল তা-ই, সে তার ডান হাতটিই ব্যবহার করবে। ধোঁকা দেবার উদ্দেশ্যেই বাঁ হাতে রেখেছে ছুরি। হাতবদল হবার আগমুহূর্তেই কিছু-একটা করতে হবে।

মেয়েটি কুলকুল করে ঘামছিল। সে দেখল, ছুরি-হাতে বাঘের মতো বয়স্ক লোকটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে মাতালটি। মেয়েটি চোখ বন্ধ করে ফেলল। চোখ মেলে যে-দৃশ্য দেখল তার জন্যে সে প্রস্তুত ছিল না। দেখল বয়স্ক লোকটি নিজের জায়গায় ফিরে যাচ্ছে। চার-পাঁচ ফুট দূরে চিত হয়ে পড়ে আছে মাতালটি। খুব সম্ভব তার নাক ভেঙে গেছে। গলগল করে রক্ত পড়ছে। সে দারুণ অবাক হয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখছে বয়স্ক লোকটিকে।

জামশেদ তার টেবিলে ফিরে আসতেই ছেলেটি দৌড়ে এল।

স্যার, ভালো কনিয়াক আছে, দেব ?

না।

টাকা লাগবে না।

না। আমি এখন উঠব।

স্যার, আপনি যদি কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেন তা হলে বেনের সঙ্গে দেখা হবে। বেন ওয়াটসন একটার দিকে আসবে।

জামশেদ উঠে দাঁড়াল।

স্যার, একটু যদি বসেন।

না, এখন আমি যাব।

বেন ওয়াটসনকে আপনার কথা কী বলব ?

কিছু বলতে হবে না।

আপনার নাম ?

আমার নাম বলার কোনো প্রয়োজন নেই।

আপনি কি আবার আসবেন ?

হ্যাঁ, আসতে পারি। না-ও আসতে পারি।

জামশেদ রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়েই মেয়েটিকে দেখতে পেল। সে খুব সম্ভব জামশেদের জন্যে অপেক্ষা করছিল। জামশেদকে বের হতে দেখেই দ্রুতপায়ে এগিয়ে এল। আমি আপনাকে ধন্যবাদ দেবার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।

ধন্যবাদ দেবার কোনো প্রয়োজন নেই।

আমি কি আপনার নাম জানতে পারি ?

জামশেদ সে কথার উত্তর না দিয়ে মৃদুস্বরে বলল, মেয়েদের এত রাতে একা একা বাইরে থাকাটা ঠিক না।

আমি আমার এক বন্ধুর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। আমার বন্ধু একজন পুলিশ অফিসার।

ও।

আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। শুভ রাত্রি।

শুভ রাত্রি।

রুন কখনো সকালে উঠতে পারে না। ন'টার সময় বেড-টি খেয়ে সে খবরের কাগজ পড়তে বসে। খেলাধুলা এবং আইন আদালত এই দুটি অংশ পড়তে পড়তে দশটা বেজে যায়। রোজই সে দাঁত ব্রাশ করতে যায় দশটার পর।

আজ একটা বিচিত্র কারণে রুটিনের ব্যতিক্রম হলো। শেষ রাতের দিকে রুন একটি ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন দেখল। যেন সে এবং অ্যানি সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছে। কিন্তু অ্যানির গায়ে কোনো কাপড় নেই। সে খুব বিরক্ত হয়ে বলছে, এইসব কী অসভ্যতা, অ্যানি। ছি!

ঠিক তখন অ্যানি ভয়-পাওয়া স্বরে বলল, মা, পালাও! ওরা আমাদের ধরতে আসছে।

রুন চমকে পিছনে ফিরে দেখল তিনটি বদ্ধ উন্মাদ ছুটে আসছে তাদের দিকে। ওদের গায়েও কোনো কাপড় নেই। রুন দৌড়াতে শুরু করল। কিন্তু অ্যানি সেরকম দৌড়াতে পারছে না। পাগলগুলো শেষ পর্যন্ত অ্যানিকে ধরে ফেলল। রুন শুনল, অ্যানি প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে, জামশেদ আমাকে বাঁচাও।

রুন এই সময় জেগে উঠল। পরপর দু'পেগ ব্রান্ডি খেয়ে বাইরে এসে দেখল ভোর হয়েছে। অ্যানি জগিং সুট পরে দৌড়াচ্ছে বাড়ির সামনের খোলা মাঠটায়। রুন একবার ভাবল অ্যানিকে ডাকে। কিন্তু ডাকল না। রেলিঙে ভর দিয়ে তাকিয়ে রইল, স্বপ্নের ঘোর তার তখনো কাটেনি। এখনো গা কাঁপছে।

রুন দেখল জামশেদ নিচে নেমে যাচ্ছে। হাত-ইশারা করে ডাকছে অ্যানিকে। কী যেন বলছে। উপর থেকে ঠিক শোনা যাচ্ছে না। রুন নিচে নেমে এল। জামশেদ ভারি গলায় উপদেশ দিচ্ছে অ্যানিকে।

তুমি ভালোই দৌড়াচ্ছ, কিন্তু শুরুটা ভালো হচ্ছে না। দৌড়ের শুরুটাই আসল। ঠিক সময় শুরু করতে হবে। সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ রাখতে হবে।

অ্যানি বলল, তুমি কি আমাকে শেখাবে ? আমি জানি আমি ভালো দৌড়াতে পারি, কিন্তু শুরুটা আমার সত্যি সত্যি খারাপ।

রুন দেখল জামশেদ গম্ভীর হয়ে আছে। এই লোকটি কি সহজ হতে জানে না ?

আমাকে তুমি শেখাবে ? প্লিজ।

হ্যাঁ, শেখাব। এসো আমার সঙ্গে।

রুন লক্ষ করল অ্যানির সমস্ত চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এসব মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। মেয়েটি ক্রমে ক্রমেই অপরিচিত এই ভয়ঙ্কর লোকটির দিকে ঝুঁকে পড়ছে।

রুন ভিকিকে টেলিফোন করল দুপুরে। ভিকি টাকাপয়সার কী-একটা সুরাহা করবার জন্যে রোমে গিয়েছে। গতকালই ফেরার কথা ছিল, ফেরেনি।

হ্যালো, ভিকি ?

হ্যাঁ। কী ব্যাপার ?

গতকাল রাতে আমি একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি।

তা-ই নাকি ?

হ্যাঁ। শোনো কী দেখলাম...

ভিকি ভ্রু কুঁচকে শুনতে লাগল। লং ডিসটেন্স কল। প্রচুর বিল উঠবে কিন্তু উপায় নেই, শুনতেই হবে। স্বপ্নের কথা ভিকিকে দশ মিনিট ধরে শুনতে হলো। সবশেষে রুন বলল, আমার খুব ভয় লাগছে।

ভয়ের কিছু নেই। স্বপ্ন স্বপ্নই।

হোক স্বপ্ন। তুমি আজকেই চলে আসবে।

আমি আসতে পারছি না। টাকার কোনো ব্যবস্থা করতে পরিনি।

কবে আসবে ?

দেখি।

টেলিফোন রেখে দেয়ার আগে ভিকি বলল, বড্ড ঝামেলায় পড়ে গেছি। তুমি কিছু টাকার ব্যবস্থা করতে পারো নাকি, রুন ?

আমি, আমি কোত্থেকে করব ?

তোমার তো অনেক গয়নাটয়না আছে।

রুন জবাব না দিয়ে টেলিফোন রেখে দিল। ভিকি ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল।

রুন আজ কিছু কেনাকাটা করবে বলে ভেবে রেখেছিল। কিন্তু মত বদলাল। দুঃস্বপ্ন দেখার পর তার আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করছিল না। সে ঠিক করল আজ সারাদিন সে ঘরেই থাকবে। আজ রান্না করলে কেমন হয় ? অনেক দিন কোনো রান্নাবান্না করা হয়নি। কিন্তু রান্না করার ইচ্ছাটা স্থায়ী হলো না। রুন টিভি খুলে টিভির সামনে বসে রইল। কিছুক্ষণ পর টিভি দেখতেও ভালো লাগল না। সমস্ত দিন ঘরে বসে থাকাটা এমন ক্লান্তির ব্যাপার তা তার জানা ছিল না। দুপুরের দিকে অতিষ্ঠ হয়ে সে এতরাকে টেলিফোন করল, এতরা, তুমি কি সন্ধ্যার পর আসতে পার ?

নিশ্চয়ই পারি। কী ব্যাপার ?

ব্যাপার কিছু নয়, গল্পগুজব করা যাবে।

বাইরে কোথাও খেতে চাও ? বনভিলে চমৎকার একটা রেস্টুরেন্ট আছে।

না, আজ আমি কোথাও বেরুব না ঠিক করেছি।

এতরা খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, ভিকি ফেরেনি ?

নাহ্।

কবে ফিরবে জানো ?

আমি ঠিক জানি না। কাল ফিরতে পারে।

ভিকি তো শুনলাম দারুণ ঝামেলায় পড়েছে।

কী ঝামেলা ?

ওর একটা সিল্ক কারখানা শুনলাম বন্ধ হয়ে গেছে।

রুন অবাক হয়ে বলল, কই, আমি তো কিছু জানি না!

তোমাকে কিছু বলেনি ?

না।

আচ্ছা, আমি এসে বলব।

রুনের একটু মন-খারাপ হলো। ভিকি তা হলে সত্যি সত্যি বড়রকমের ঝামেলায় পড়েছে। তাকে সাহায্য করা উচিত। রুন ইচ্ছা করলেই তা পারে। মোটা অঙ্কের টাকা রুনের আছে। তার নিজস্ব টাকা। এবং অত টাকা যে আছে তা ভিকি নিজেও জানে না। রুনের বাবা বলে দিয়েছিল, কিছু-কিছু জিনিস স্বামীদের জানাতে নেই। একটি হচ্ছে স্ত্রীদের ব্যাংক-ব্যালেন্স। তোমার টাকাটা হচ্ছে তোমার দুঃসময়ের জন্যে, ভিকির দুঃসময়ের জন্যে নয়।

রুন বলেছিল, কিন্তু বাবা, ধরো, ভিকি একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়ল, তখন ?

তখন তুমি ওকে ছেড়ে চলে আসবে।

বাবার কথা এখন মনে না রাখলেও চলবে। বাবা মারা গেছে, কাজেই খবরদারি করবার জন্যে ছুটে আসবে না। রুন তার ব্যাংকে টেলিফোন করল, আমি মোটা অঙ্কের কিছু টাকা তুলতে চাই।

কতদিনের মধ্যে ?

এক সপ্তাহ।

ক্যাশ হলে পারা যাবে না।

ক্যাশ নয়, ক্রসড চেক করে দিলে হবে। পারা যাবে ?

কোন কারেন্সি ?

ইতালিয়ান হলেই হবে। পারা যাবে ?

যাবে। তবে আপনার একটা চিঠি লাগবে।

বেশ। চেক রেডি করে রাখুন।

আপনার ঠিকানায় পাঠাব ?

না, শুধু রেডি করে রাখুন।

রুন টাকার পরিমাণ এবং ক্রসড চেকের নাম বলল। ব্যাপারটা যে এত সহজে হবে তা তার ধারণা ছিল না। সুইস ব্যাংকগুলি খুব এফিসিয়েন্ট।

এতরা এল রাত ন'টার দিকে। রুন হালকা গোলাপি একটা স্কার্ট পরে বসে ছিল লবিতে। এতরা হাসিমুখে বলর, আমরা যত বুড়ো হচ্ছি তুমি ততই রূপসী হচ্ছ।

রুন তরল গলায় হাসল। এতরা রুনের কাঁধে হাত রাখল। কাঁধে সে হাত স্থায়ী হলো না, নিচের দিকে নেমে আসতে লাগল। রুন কিছু বলল না। লবি অন্ধকার, কেউ কিছু দেখছে না। এতরা হালকা গলায় বলল, ভিকি বেচারা মহাবিপদে পড়েছে।

রুন বলল, ঠিক কত টাকা হলে সে বিপদ থেকে মুক্তি পায় ?

কেন জিজ্ঞেস করছো ?

জানবার জন্যে।

সাময়িক মুক্তি না চিরকালের জন্যে মুক্তি ?

চিরকালের জন্যে মুক্তি।

অনেক টাকার ব্যাপার। ওয়ান মিলিয়ন ইউ এস ডলার।

এত টাকা ?

হ্যাঁ। সে ঝামেলাটা পাকিয়েছে বড় করেই।

এতরা রুনের জামার হুক খুলতে চেষ্টা করল। রুন তেমন বাধা দিল না। একবার শুধু অস্পষ্ট স্বরে বলল, আহ্ কী করছ ?

কিছুই করছি না, রুন। এতরা আরো এগিয়ে এলো।

রুন বলল, ভিকি একটা অপদার্থ, তবু মনে হয় আমি ওকে পছন্দ করি।

তা হয়তো করো।

ইদানীং বেচারা ঘুমাতে পারছে না। আমি ওকে সাহায্য করতে চাই।

এতরা রুনের কথা ঠিক শুনতে পায়নি। সে জামার হুকটি খুলে ফেলেছে। জলপরীর মতো একটা অর্ধনগ্ন নারী পাশে থাকলে কথাবার্তায় মন দেয়া যায় না। এতরা সে-রাতটা এখানেই কাটাল।

অ্যানিদের স্কুলে আজ বার্ষিক স্পোর্টস। অ্যানি তার বাবা এবং মা দুজনের জন্যে দুটি টিকিট এনেছে। ভিকি বলেছে সে যেতে পারবে না, তার প্রচুর ঝামেলা। রুন হ্যাঁ না কিছুই বলে নি। খুব সম্ভব সেও যাবে না। রোদে বসে থাকলে রুনের মাথা ধরে। তাছাড়া যেদিন স্পোর্টস ঠিক সেদিনই হোটেল শেরাটনে গোলাপ ফুলের প্রদর্শনী হচ্ছে। এই প্রদর্শনীটি অন্য প্রদর্শনীগুলোর চেয়ে আলাদা। চিত্রতারকাদের বাড়ির গোলাপ প্রদর্শনী। এতরা দুটি টিকিট জোগাড় করেছে। বাচ্চাকাচ্চাদের দৌড়-ঝাঁপ দেখার চেয়ে হোটেল শেরাটনে যাওয়া বহুগুণে শ্রেয়। কিন্তু সেন্টিমেন্টের ব্যাপার

আছে। অ্যানির এই স্পোর্টস নিয়ে খুব আগ্রহ। দু-তিন মাস আগে থেকেই বলে রেখেছে, যেতেই হবে। এখন তাকে, না, বলাটাই এক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু রুন ঠিক করে ফেলল ব্যাপারটা ঝুলিয়ে না রেখে মিটিয়ে ফেলাই ভালো। রাতে খাবার টেবিলে রুন প্রসঙ্গটা তুলল, অ্যানি, তোমার স্পোর্টস কবে ?

সতেরো তারিখ। তোমাকে তো বলেছি আগে।

তুমি কিসে কিসে আছ ?

একশো মিটার দৌড়।

আর কিছুতে না ?

না। তুমি যাচ্ছ তো মা ?

রুন ইতস্তত করে বলল, খুব চেষ্টা করব আমি, কিন্তু...

অর্থাৎ যাচ্ছ না। আমি আগেই জানতাম যাবে না।

এর মানে কী ? তুমি আগেই জানতে মানে ?

মানে কিছু নেই। তোমরা কেউ যাবে না তা আমি আগেই জানতাম।

অ্যানি থালা সরিয়ে উঠে দাঁড়াল।

ডিনার শেষ করো অ্যানি।

আমার খিদে নেই।

অ্যানি, তোমার বয়স হচ্ছে। এখন তুমি আর ছেলেমানুষ নও। সবার সুবিধা-অসুবিধা তোমার বুঝতে পারা উচিত।

অ্যানি জবাব না দিয়ে ছুটে চলে গেল নিজের ঘরে। মারিয়া টেবিল থেকে থালা সরাতে সরাতে বলল, অ্যানি এবার একশো মিটার স্পোর্টসে প্রাইজ পাবে।

তা-ই বুঝি ?

হ্যাঁ, ম্যাডাম। ঐ লোকটি খুব ভালো শেখায়।

দৌড়ানোর মধ্যে আবার শেখানোর কী আছে ?

তা জানি না, তবে লোকটি যত্ন করে শেখাচ্ছে।

রুন গম্ভীর হয়ে গেল। মারিয়া হঠাৎ বলল, লোকটি খুব খারাপ না ম্যাডাম।

খারাপ হবে কেন ?

না, মানে লোকটি অ্যানিকে পছন্দ করে।

রুন চোখ তুলে তাকাল। মারিয়া কফি ঢালতে ঢালতে বলল, অ্যানির যে-রাতে জ্বর এল, সে-রাতে একবার সে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে জ্বর কত ?

তা-ই বুঝি ?

হুঁ। ওর কাছ থেকে তা আশা করা যায় না, ঠিক না ম্যাডাম ?

জামশেদ সারা দুপুর একটা বই পড়তে চেষ্টা করছে, 'দি ইয়েলো নাইট'। পড়া মোটেও আগাচ্ছে না। অভ্যেস না থাকলে যা হয়। বইটির কাভারে লেখা আছে 'এই সত্যি ভূতের গল্প কেউ যেন রাতে না পড়ে।' যাদের ব্লাডপ্রেশার বা হার্টের অসুখ আছে তারা যেন ভুলেও এ বই না পড়ে। জামশেদ বহু কষ্টে ধীরে ধীরে এগুচ্ছে এবং যতই এগুচ্ছে ততই তার মেজাজ খারাপ হচ্ছে। এমন সব আজগুবি জিনিসও লেখা হয় এবং লোকজন কিনে এনে পড়ে। একটি একুশ বছরের মেয়ের সঙ্গে প্রতিরাতে একটি পিশাচ এসে ঘুমায়। গাঁজাখুরিরও সীমা থাকা দরকার। জামশেদ বই বন্ধ করে বিরক্তমুখে বারান্দায় চলে এল। তার প্রচণ্ড তৃষ্ণা বোধ হচ্ছে। এমন তৃষ্ণা যা সময়-অসময় মানে না, হঠাৎ জেগে উঠে চেতনা আচ্ছন্ন করে ফেলে। কিন্তু এখন যদি দরজা বন্ধ করে বোতল খুলে বসে তা হলে আর নিজেকে সামলানো যাবে না। জামশেদ প্রাণপণে তৃষ্ণা ভুলে থাকতে চেষ্টা করল। ব্যস্ত থাকলে কাজ হবে হয়তো। সে নিচে নেমে এল। লনের এক প্রান্তে অ্যানি বসে ছিল। তার বসার ভঙ্গিটি অদ্ভুত— যেন কাঁদছে। এবং কান্না লুকানোর চেষ্টা করছে। জামশেদ একবার ভাবল তাকে ডাকবে না। তবু ডাকল এবং আশ্চর্য, ডাকল খুব নরম স্বরে, কী করছো, অ্যানি ?

কিছু করছি না।

কাঁদছিলে নাকি ?

অ্যানি তার জবাব না দিয়ে বলল, তুমি কি কাল আমার স্পোর্টস দেখবে, না গাড়িতে বসে থাকবে ?

লোকজনের ভিড় আমার পছন্দ হয় না। আমি গাড়িতে থাকব।

জামশেদের কথা শেষ হবার আগেই অ্যানি প্রায় ছুটে চলে গেল। সারা বিকেল এবং সারা সন্ধ্যা তার আর দেখা পাওয়া গেল না।

রাত দশটায় জামশেদ রান্নাঘরে উঁকি দিল। মারিয়ার বিস্ময়ের সীমা রইল না। জামশেদকে কখনো এখানে আসতে দেখা যায় না। সে অবাক হয়ে বলল, কী, কফি খাবে ? কফির জন্যে এসেছ ?

না। অ্যানি কোথায় ?

ঘুমুতে গেছে।

ঘুমিয়ে পড়েছে ?

না, এখনো ঘুমায়নি। আমি দুধ নিয়ে যাব। দুধ খেয়ে শোবে।

জেগে আছে তা হলে ?

হ্যাঁ। কী ব্যাপার ? কিছু বলবে অ্যানিকে ?

তুমি অ্যানিকে বলবে যে আমি ওর স্পোর্টস দেখতে যাব।

মারিয়া বলল, আমি এক্ষুনি ওকে বলছি।

এক্ষুনি বলার দরকার নেই।

মারিয়া বলল, আমি খুব খুশি হয়েছি যে তুমি যাচ্ছ। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুক। অ্যানি মেয়েটি খুব নিঃসঙ্গ।

জামশেদ জবাব দিল না, গম্ভীরমুখে উপরে উঠে এলো।

একশো মিটার দৌড় হচ্ছে তিন নম্বর ইভেন্ট। অ্যানি খুব নার্ভাস হয়ে গেছে। সব মিলিয়ে প্রতিযোগী পাঁচজন। এদের মধ্যে নিন্তি নামের মেয়েটি হরিণের মতো দৌড়ায়।

মাঠে নামবার আগে জামশেদ বলল, যখন দৌড়াতে শুরু করবে তখন একটি জিনিসই শুধু খেয়াল রাখবে। সামনের লাল ফিতা। ঠিক আছে ?

ঠিক আছে।

ভয় লাগছে ?

হ্যাঁ। মনে হচ্ছে আমি হেরে যাব।

কাউকে তো হারতেই হবে।

আমার হারতে ভালো লাগে না।

স্টার্টিং ফায়ার হতেই অ্যানি বিদ্যুতের মতো ছুটল। জামশেদ হাসল— চমৎকার স্টার্টিং! অপূর্ব! অ্যানি নিমেষের মধ্যে প্রতিযোগীদের পেছনে ফেলে দিল। কিন্তু অঘটন ঘটল— অ্যানি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। একটা হাহাকার উঠল দর্শকদের প্যাভিলিয়ন থেকে। অ্যানির আশাহত চোখের সামনে প্রতিযোগীরা ছুটে বেরিয়ে গেল। লাফিয়ে উঠল জামশেদ— উঠে দাঁড়াও, দৌড়াও। বোকা মেয়ে, দৌড়াও।

অ্যানি উঠে দাঁড়িয়েছে। জামশেদ তৃতীয়বার চেঁচাল, দৌড়াও। অ্যানি ছুটতে শুরু করল। পৌঁছাল সবার শেষে।

অ্যানি কাঁদতে কাঁদতে দর্শকদের প্যাভিলিয়নদের দিকে আসছে। জামশেদ এগিয়ে গেল। একটি ছোট্ট শিশুর মতো অ্যানি জামশেদকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে উঠল।

বাড়ি ফেরার পথে জামশেদ বলল, আমি খুব খুশি হয়েছি যে পড়ে যাবার পরও তুমি উঠে দাঁড়িয়েছ এবং দৌড়াতে শুরু করেছ।

তাতে কিছুই যায় আসে না।

তাতে অনেক কিছুই যায় আসে, অ্যানি।

অ্যানি ফ্রকের হাতায় চোখ মুছল। জামশেদ বলল, পৃথিবীতে বেশির ভাগ মানুষই হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। খুব অল্প কিছু মানুষ উঠে দাঁড়াতে পারে।

অ্যানি চাপাস্বরে বলল, ওরা এসে পৌঁছায় সবার শেষে।

আপাতদৃষ্টিতে এরকম মনে হয়। সত্যিকার অর্থে ওরাই কিন্তু জয়ী।

অ্যানি জবাব দিল না। জামশেদ বলল, সমুদ্রের দিকে যেতে চাও, অ্যানি ? ওখানে বালির উপর বসে আইসক্রিম খাওয়া যেতে পারে। কী, চাও যেতে ?

চাই।

এসো, আজকের দিনটি আমরা খুব ফুর্তি করে কাটাই। মিউজিয়ামে গেলে কেমন হয় ?

মিউজিয়াম আমার ভালো লাগে না।

তাহলে চলো চিড়িয়াখানায় যাওয়া যাক। চিড়িয়াখানা ভালো লাগে ?

লাগে।

যাবে ?

হুঁ।

অ্যানি তাকিয়ে দেখল, বুড়ো ভালুকের পাথরের মতো চোখ দুটি কোনো এক আশ্চর্য উপায়ে তরল হয়ে যেতে শুরু করেছে।

ভিকি পরপর দুরাত ঘুমাতে পারে নি। এক সপ্তাহের মধ্যেই একটা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত তাকে নিতে হবে। সিল্কের ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত। তিন-পুরুষের একটা ব্যবসা গুটিয়ে ফেলার সিদ্ধান্ত হঠাৎ নেয়া যায় না। এর জন্যে অনিদ্রায় কাতর হতে হয়।

রুন দেখল, ভিকি রাত ন'টার দিকে ড্রাইভারকে গাড়ি বের করে আনতে বলছে।

কোথায় যাচ্ছ ?

একটা কাজে যাচ্ছি।

টাকার জোগাড় করতে ?

না। ওটা আর জোগাড় হবে না।

আশা ছেড়ে দিয়েছ মনে হচ্ছে ?

ভিকি জবাব দিল না। রুন বলল, একটা কাজ করলে কেমন হয় ? আমাকে ভালো একটা রেস্টুরেন্টে নিয়ে যাও না!

ভিকি নিঃশব্দে টাইয়ের নট বাঁধতে লাগল।

কী, কথার জবাব দিচ্ছ না যে ? চল না সমুদ্রের ধারে যে একটা চাইনিজ রেস্টুরেন্ট আছে সেখানে গিয়ে লবস্টার খেয়ে আসি।

ভিকি ক্লান্তস্বরে বলল, রুন, তুমি বুঝতে পারছ না আমি একটা দারুণ সমস্যার মধ্যে আছি। এমন হতে পারে যে চাইনিজ রেস্টুরেন্টে লবস্টার আর কোনোদিনই আমরা খেতে পাব না।

রুন হাসিমুখে বলল, কিন্তু এমন তো হতে পারে যে হঠাৎ করে তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

আমার বেলা হঠাৎ করে কিছু হয় না।

একেবারে আশা ছেড়ে দেয়া ঠিক না। চল যাই। রুন ভিকির হাত ধরল।

প্লিজ রুন, আমাকে বিরক্ত করো না। খুব খারাপ সময় যাচ্ছে।

সময় ভালোও তো হয়ে যেতে পারে। কথা শোন আমার।

ভিকি কোনো কথা শুনল না। বিরক্তমুখে নিচে নেমে গেল। তার বেশ মাথা ধরেছে। রুনের ন্যাকামি শুনতে এতটুকুও ভালো লাগছে না।

এতরা চোখ কপালে তুলে বলল, এ কী চেহারা হয়েছে তোমার?

ভিকির চেহারা সত্যি সত্যি খারাপ হয়েছে। বুড়োটে দেখাচ্ছে। চোয়াল ঝুলে পড়েছে। চোখের দৃষ্টিও নিষ্প্রভ। এতরা সরু গলায় বলল, একেবারে ভেঙে পড়েছ মনে হচ্ছে?

তা ভেঙেছি। সেটাই স্বাভাবিক নয় কি?

না। তোমার যা হচ্ছে তা খুব অস্বাভাবিক। তুমি কোনো সমাধানের দিকে না তাকিয়ে অন্যদিকে তাকাচ্ছ।

সমাধান কিছু নেই।

এতরা মিটিমিটি হাসল। হাসিমুখেই বলল, চমৎকার একটা ডিনারের অর্ডার দাও। সেইসঙ্গে জার্মান কিছু হোয়াইট ওয়াইন আনতে বলো। তোমাকে সমাধান দিচ্ছি।

ভিকির কোনো ভাবান্তর হলো না। সে সিগারেট ধরিয়ে ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে রইল। এতরা খানিকটা ঝুঁকে এসে বলল, প্রথম শ্রেণীর সমাধান আছে আমার কাছে, ঠান্ডা মাথায় শুনতে হবে।

বলো, শুনি।

বলছি। তার আগে নার্ভগুলি ঠান্ডা করাবার জন্যে এক পশলা মার্টিনি হোক। মার্টিনি উইথ অলিভ।

এতরা হাতের ইশারায় ওয়েট্রেসকে ডাকল।

কী তোমার সমাধান?

বলছি। শর্ত হচ্ছে সবটা বলা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি কোনো প্রশ্ন করতে পারবে না। প্রথমে কোনো সাড়াশব্দ না করে শুনবে। ঠিক আছে?

ঠিক আছে।

তা হলে শুরু করছি।

এতরা লম্বা একটা চুমুক দিল মার্টিনিতে। নিচুস্বরে বলতে শুরু করল, তুমি নিশ্চয়ই জানো, ইংল্যান্ডের একটা ইনস্যুরেন্স কোম্পানি অদ্ভুত অদ্ভুত সব ইনস্যুরেন্স পলিসি বিক্রি করে। জানো তো?

জানি।

ওরা ইদানীং একটা নতুন ইনস্যুরেন্স পলিসি বিক্রি করতে শুরু করেছে। ধনী বাবা-মারা তাঁদের সন্তানদের নিরাপত্তা ইনস্যুরেন্স করছেন।

তা-ই নাকি ? জানতাম না তো!

ইনস্যুরেন্স করবার পর যদি ইনস্যুর-করা ছেলেমেয়েরা কিডন্যাপ হয় তাহলে কিডন্যাপারদের দাবি অনুযায়ী সব টাকা ইনস্যুরেন্স কোম্পানি দিয়ে দেয়। বুঝতে পারছো ?

পারছি।

এতরা আরেকটি ডাবল মার্টিনির অর্ডার দিয়ে বলল, এতক্ষণ যা বললাম তা হচ্ছে তোমার সমস্যার সমাধান।

তার মানে ?

ব্যস্ত হয়ো না। বুঝিয়ে দিচ্ছি।

ভিকি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। এতরা সহজ ভঙ্গিতে বলতে লাগল, তুমি অ্যানির জন্যে ঐ একটি পলিসি কিনবে। এক মিলিয়ন ডলারের একটি পলিসি। তারপর কিছু দুষ্টলোক অ্যানিকে চুরি করে এক মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ দাবি করবে। ইনস্যুরেন্স কোম্পানি এক মিলিয়ন ডলার দেবে তা তো বুঝতেই পারছ। সেখান থেকে পাঁচ লাখ ডলার পাবে তুমি, আর বাকিটা যাবে কিডন্যাপের ব্যবস্থা যারা করবে তাদের হাতে।

ভিকি নিঃশব্দে তাকিয়ে রইল। এতরা হাসিমুখে বলল, পরিকল্পনা দায়িত্বে যারা থাকবে তারা সবাই খুব বিশ্বাসী। আমার নিজের লোক বলতে পার।

ভিকি কোনো জবাব দিল না।

অবিশ্যি ইনস্যুরেন্স কোম্পানির কিছু বিধিনিষেধ আছে। যেমন পলিসি বিক্রি করবার আগে ওদের দেখাতে হবে যে তুমি তোমার মেয়ের নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করেছ। যেমন, ওর জন্যে চব্বিশ ঘণ্টার বডিগার্ড আছে, বাড়িতে পাহারাদার কুকুর আছে, বুঝতে পারছো ?

ভিকি কিছু বলল না, চুপচাপ বসে রইল। এতরা বলল, ডিনারের অর্ডার দেয়া যাক, কী বলো ? এমন মনমরা হয়ে গেলে কেন ?

তোমার সমাধানটি আমার পছন্দ হয়নি।

ভালো। পছন্দ যে হতেই হবে এমন কোনো কথা নেই। আমরা নতুন সমাধানের কথা চিন্তা করব। তবে ভিকি, এতক্ষণ আমরা যে-কথাবার্তা বললাম তা যেন তৃতীয় কোনো প্রাণী জানতে না পারে।

জানবে না।

রুনকেও বলবে না।

এতরা, আমি আমার নিজস্ব ব্যাপারগুলোর কথা ঘরে বলে বেড়াই না।

গুড। আর শোনো, যদি তোমার মনে হয় আমার পরিকল্পনাটি প্রথম শ্রেণীর তা হলে বিনা দ্বিধায় আমাকে জানাবে। বুঝতে পারছি অ্যানির নিরাপত্তার বিষয়েই তুমি বেশি চিন্তিত। অ্যানিকে আমি আমার নিজের মেয়ের মতোই দেখি, ওর নিরাপত্তার যথাযোগ্য ব্যবস্থা নেয়া হবে বলাই বাহুল্য।

ভিকি গম্ভীরমুখে ডিনারের অর্ডার দিল। ডিনার ছিল সাদামাটা কিন্তু ডিনারশেষে প্রচুর ড্রিংকসের ব্যবস্থা হলো। এবং একসময় ভিকি বলল, তুমি যে-পরিকল্পনার কথা বলছ তার পেছনে তোমার কী স্বার্থ ?

আমার দুটি স্বার্থ। বন্ধুর উপকার হবে। তাছাড়া, আমিও কিছু টাকা পাব। দশ হাজার ডলার। বিরাট কিছু নয়, তবে মন্দও নয়।

ভিকি হঠাৎ বলল, আমি রাজি আছি।

ভালো। আমি জানতাম তুমি রাজি হবে।

ভিকি উত্তর দিল না।

কোনোরকম ঝামেলা ছাড়া এতবড় একটা দান একমাত্র জুয়ার টেবিলেই পাওয়া সম্ভব। এতরা টেনে টেনে হাসতে লাগল। আরেক রাউন্ড হবে ?

ভিকি জবাব দিল না।

আরেক রাউন্ড হোক। ভিকি, তোমাকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছে। ফুর্তির জন্যে কোথাও যেতে চাও ? দুটি স্প্যানিশ মেয়ে আছে, আমার পরিচিত। অপূর্ব! এবং বিশেষ পারদর্শী।

ফুর্তির জন্যে আমি কখনো বাইরে যাই না।

ঠিক ঠিক। খুবই ঠিক।

এতরা হাতের ইশারায় ওয়েট্রেসকে ডাকল। সে মনে হলো কিঞ্চিৎ নেশাগ্রস্ত।

জামশেদের ঘরে মৃদু নক হলো। অন্ধকার কাটেনি এখনো। এত ভোরে কে আসবে ? জামশেদ ঘড়ি দেখল, ছ'টা বাজতে এখনো দশ মিনিট বাকি।

কে ?

আমি। আমি অ্যানি।

কী ব্যাপার ?

আমি তোমাকে শুভ জন্মদিন জানাতে এসেছি।

কিসের শুভ জন্মদিন ? জামশেদ বিরক্তমুখে গায়ে রোব জড়াল। দরজা খুলল অপ্রসন্ন মুখে।

অ্যানি হাসিমুখে একটা প্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে আছে। সে ক্ষীণস্বরে বলল, ভেতরে আসব ?

না।

অ্যানি ইতস্তত করতে লাগল। জামশেদ ভারিস্বরে বলল, আমার জন্মদিন কবে তা আমি কেন আমার বাবা-মাও জানেন না।

কিন্তু আমি যে তোমার কাগজপত্রে দেখলাম ৪ঠা জুলাই তোমার জন্মদিন।

একটা-কিছু লিখতে হয় সেজন্যেই লেখা। বুঝতে পারছো ?

পারছি।

হাতে ওটা কী, জন্মদিনের উপহার ?

হুঁ।

ঠিক আছে, দাও।

অ্যানি মৃদুস্বরে বলল, তোমার জন্মদিন কবে তা কেউ জানে না কেন ?

অনেকগুলি ভাইবোন আমরা— কার কবে জন্ম এসব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় আমার মা-র ছিল না।

ক'জন ভাইবোন ?

জামশেদের ভ্রু কুঞ্চিত হলো। সে একবার ভাবল জবাব দেবে না। কিন্তু জবাব দিল।

ন'জন। দু'টি বোন।

তুমি ক'নম্বর ?

চার। আর কিছু জিজ্ঞেস করবে ?

অ্যানি হালকা স্বরে বলল, জন্মদিনে এমন রাগী গলায় কথা বলছো কেন ?

তোমাকে তো বলেছি আজ আমার জন্মদিন নয়।

তুমি তো জানো না কবে সেটা। এমন তো হতে পারে আজই সেই দিন।

তাতে কিছু আসে যায় না।

অ্যানি অস্পষ্টভাবে হাসল।

কী এনেছি তোমার জন্যে খুলে দেখবে না ?

জামশেদ প্যাকেট খুলে ফেলল।

এটা একটা ভিডিও গেম। তুমি তো একা একা থাকতে পছন্দ করো, সেজন্যে কিনেছি। একা একা খেলতে পারবে। কী করে খেলতে হয় আমি তোমাকে শিখিয়ে দেব।

ঠিক আছে।

তুমি হাতমুখ ধুয়ে আসো, আমি তোমাকে শিখিয়ে দিচ্ছি। আজকে আমি তোমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট করব।

জামশেদ কিছু বলল না। অ্যানি হাসিমুখে বলল, আমাদের দুজনের ব্রেকফাস্ট আজ এখানে দিয়ে যাবে। এবং তোমার জন্মদিন উপলক্ষে আজ খুব চমৎকার ব্রেকফাস্ট তৈরি হচ্ছে।

জামশেদ হাতমুখ ধুতে গেল। বাথরুম থেকে বেরুতেই চোখে পড়ল ভিকি লনে একা একা হাঁটছে। এত ভোরে ভিকি কখনো ওঠে না। জামশেদের মনে হলো, ভিকি যেন একটু বেশিরকম বিচলিত। জামশেদের সঙ্গে ভিকির একবার চোখাচোখি হলো। ভিকি বাঁ হাত উঠিয়ে কী যেন বলল ঠিক বোঝা গেল না।

সাত কোর্সের একটি স্প্যানিশ ব্রেকফাস্ট তার টেবিলে অত্যন্ত চমৎকারভাবে সাজানো। অ্যানি কফিপট থেকে কফি ঢালছে। জামশেদ ছোট একটা নিশ্বাস ফেলল। অ্যানি বলল, তুমি কিন্তু একবার বলোনি, থ্যাঙ্ক ইউ।

থ্যাঙ্ক ইউ।

এর মধ্যে একটা জিনিস আমার তৈরি। কোনটি বলতে পারবে?

তুমি রান্না করতে পার?

না। মারিয়া বলে দিয়েছে আমি রান্না করেছি।

জামশেদ কফির পেয়ালায় চুমুক দিল। অ্যানি আবার বলল, আজ কিন্তু তুমি রাগ করতে পারবে না। আজ আমার সঙ্গে গল্প করতে হবে।

জামশেদ জবাব দিল না।

অ্যানি একটু গম্ভীর হয়ে বলল, আমি জানি তুমি আমাকে একটুও পছন্দ করো না। আমি এলেই বিরক্ত হও। তবু আজ আমি অনেকটা সময় তোমার ঘরে বসে থাকব।

ঠিক আছে।

এবং তোমাকে নিয়ে বিকেলে মলে শপিং করতে যাব। আমি বাবাকে বলে রেখেছি।

অ্যানির কথা শেষ হবার আগেই দরজায় ছায়া পড়ল। ভিকি এসে দাঁড়িয়েছে।

মি. জামশেদ, শুভ জন্মদিন।

জামশেদ শুকনো স্বরে বলল, ধন্যবাদ।

অ্যানি তোমার জন্মদিন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই হৈচৈ করছিল।

জামশেদ ঠান্ডাস্বরে বলল, তুমি কি ভেতরে এসে আমাদের সঙ্গে এক কাপ কফি খাবে?

না, ধন্যবাদ। আমি তোমার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

নিশ্চয়ই।

জামশেদ ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ভিকি বারান্দার এক প্রান্তে সরে গেল। সিগারেট ধরাল একটি। জামশেদের মনে হলো, লোকটা বিশেষ চিন্তিত। সিগারেট ধরাবার সময় তার হাত কাঁপছিল। এর কারণ কী ?

বলো কী বলবে।

না, তেমন কিছু নয়।

ভিকি অস্পষ্টভাবে হাসল। জামশেদ বলল, তোমাকে চিন্তিত মনে হচ্ছে।

না, চিন্তিত না। চিন্তিত হবার কী আছে ?

ভিকি রুমাল বের করে কপালের ঘাম মুছল। ফ্যাকাসেভাবে হেসে বলল, এবার বেশ গরম পড়বে, কী বলো ?

জামশেদ জবাব দিল না। ভিকি ইতস্তত করে বলল, তোমাকে একটি কথা বলতে চাই। ইয়ে, মানে, তেমন জরুরি কিছু নয়।

বলো।

ধরো যদি এমন পরিস্থিতি হয় যে তুমি দেখছো কেউ অ্যানিকে কিডন্যাপ করার চেষ্টা করছে, তখন আমার মনে হয় সবচেয়ে ভালো হবে তুমি যদি চুপচাপ থাক।

কেন ?

না, মানে— তুমি যদি গুলি করতে শুরু করো তাহলে বুলেট অ্যানির গায়ে লাগার সম্ভাবনা, ঠিক না ?

আশঙ্কা যে একেবারে নেই তা নয়। তবে ভিকি, আমাকে রাখা হয়েছে অ্যানির নিরাপত্তার জন্যে, ঠিক না ?

হ্যাঁ, তা ঠিক।

তুমি নিশ্চয়ই আশা করো না এরকম পরিস্থিতিতে আমি মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে থাকব।

না না, তা কেন ? তা তো হতেই পারে না।

ভিকি আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। জামশেদ বলল, তুমি কি কোনোকিছু নিয়ে চিন্তিত ?

না না, চিন্তিত হব কেন ?

ভিকি দুর্বলভাবে হাসল। জামশেদ ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না।

ভিকি কিছু-একটা নিয়ে বিশেষভাবে চিন্তিত।

রুনের চোখেও ব্যাপারটা ধরা পড়ল। সাধারণত এসব ছোটখাটো জিনিস তার চোখে পড়ে না। কিন্তু পরিবর্তনটি হঠাৎ এবং স্পষ্ট। চোখে না পড়ে উপায় নেই। তার ওপর ক'দিন আগে ভিকি দু'টি প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ান কুকুর কিনে এসেছে। এর কারণ

বোধগম্য নয়। ভিকি কুকুর পছন্দ করে না। হঠাৎ করে কুকুরের প্রতি তার এরকম প্রেমের কারণ কী? রুন কোনো ব্যাপার নিয়ে বেশিক্ষণ ভাবতে পারে না। তবু সে এ ব্যাপারটি নিয়ে অনেক চিন্তাভাবনা করল। ভিকিকে সে ঠিক ভালো না বাসলেও পছন্দ করে। স্বামী হিসেবে সে চমৎকার। এবং যতদূর মনে হয় মাঝে মাঝে জুয়ার টেবিলে বসা ছাড়া তার অন্যকোনো বদঅভ্যেস নেই।

রুন বিকেলে একটু বিশেষ সাজসজ্জা করল। এ জাতীয় পোশাকে কুমারী মেয়েদেরই ভালো লাগে। কিন্তু রুনকে এখনো কুমারী মেয়ে বলেই ভ্রম হয়। রুন বড় একটি খাম হাতে নিয়ে ভিকির ঘরে উঁকি দিল।

হ্যালো, ভিকি!

হ্যালো।

কী ব্যাপার, তুমি দেখি একেবারে মাছের মতো হয়ে গেছ।

ভিকি জবাব দিল না। রুন সামনের চেয়ারটিতে বসতে বসতে বলল, খুব সম্ভব গতরাতে তোমার ঘুম হয়নি। চোখ লাল। ব্যাপারটা কী, আমি জানতে চাই।

তেমন কিছু না।

বিজনেস নিয়ে চিন্তিত?

হ্যাঁ।

কোনো সুরাহা হয়নি?

না।

বুদ্ধিমান এতরা কোনো বুদ্ধি দিতে পারল না?

ভিকি ঈষৎ চমকাল। কিছু বলল না। রুন গম্ভীর গলায় বলল, আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই।

ভিকি চোখ তুলে তাকাল।

আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দেব। কিন্তু একটি শর্ত আছে।

কী শর্ত?

তুমি তোমার মুখে যে ভয়াবহ চিন্তার মুখোশ পরে আছো এটি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। কথাটা বলে রুন খিলখিল করে হেসে উঠল। আর ঠিক তখন টেলিফোন এল। বালজাক অ্যাভিনিউর মোড়ে অ্যানিকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। ছোটখাটো একটা খণ্ড-প্রলয় হয়ে গেছে সেখানে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে তিনজন মারা গেছে। সংখ্যা এর চেয়ে বেশিও হতে পারে।

এক মিলিয়ন ডলার মুক্তিপণ চেয়ে প্রথম টেলিফোনটি এল রাত এগারোটায়।

এগারোটা পঁচিশে সেন্ট্রাল হাসপাতাল থেকে টেলিফোন এল। জামশেদ নামের যে-দেহরক্ষীকে গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে আনা হয়েছে তার অবস্থা সংকটাপন্ন। নিকট আত্মীয়স্বজনদের খবর দেয়া প্রয়োজন।

অ্যানির অপহরণ সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে 'লা বেলে' পত্রিকায়। রিপোর্টটিতে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য আছে। মধ্যবয়স্ক এই স্কুল-শিক্ষকটি ঘটনার সময় কফিশপে কফি খাচ্ছিলেন। তাঁর চোখের সামনেই সমস্ত ব্যাপার ঘটল।

তাঁর প্রতিবেদনটি ছিল এরকম

আমি যেখানে কফি খাচ্ছিলাম, আইসক্রিম পার্লারটি ছিল তার সামনে। জুলাই মাসের গরমের জন্যেই খোলা উঠানে কফির টেবিল বসানো হয়েছিল। আমি আমার এক বান্ধবীর জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। ঘনঘন তাকাচ্ছিলাম রাস্তার দিকে।

চারটা ত্রিশ মিনিটে নীলরঙা একটি ছোট পনটিয়াক এসে আইসক্রিম পার্লারে থামল। গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল অত্যন্ত রূপসী একটি বালিকা। বালিকাটি কাউন্টারে আইসক্রিমের অর্ডার দিয়ে যখন অপেক্ষা করছিল, তখন আমি লক্ষ করলাম একটি প্রকাণ্ড সবুজ রঙের ওপেল গাড়ি আইসক্রিম পার্লারের পশ্চিমদিকে থামল।

তিনটি লোক নেমে এল গাড়ি থেকে। দুজন ছুটে গেল মেয়েটির দিকে, তৃতীয়জন ফাঁকা আওয়াজ করতে লাগল। তার হাতে হালকা একটি স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ছিল। গুলি ছুড়বার আগ পর্যন্ত আমি তা লক্ষ করিনি।

গুলির শব্দ আসামাত্র চারদিকে ছুটাছুটি শুরু হলো। আমি নিজেও উঠে দাঁড়ালাম। কফিশপের মালিক চেঁচিয়ে বলল— সবাই মাটিতে শুয়ে পড়ুন। বিপদের সময় কারোর কিছু মনে থাকে না। আমারও থাকল না। আমি দৌড়ে খোলা রাস্তায় এসে পড়লাম। তখন বাচ্চা মেয়েটিকে দুজন ওপেল গাড়িটির দিকে টেনে নিচ্ছে এবং মেয়েটি চ্যাঁচাচ্ছে প্রাণপণে। যে-দুজন মেয়েটিকে টানছে তাদের একজন মেয়েটির গালে চড় কষাল। এই সময় স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র-হাতে তৃতীয় ব্যক্তিটিকে দেখলাম মাটিতে গড়িয়ে পড়েছে। আমি অবাক হয়ে দেখলাম কালো রঙের একটি মানুষ ওদের দিকে ছুটে যাচ্ছে। মানুষটির বাঁ হাতে একটি পিস্তল।

এই সময়ে সবুজ ওপেল গাড়িটি থেকে আরো দুজন লোক বন্দুক-হাতে লাফিয়ে নামল। কালো লোকটি ছুটন্ত অবস্থাতেই গুলি ছুড়ল। এরকম অব্যর্থ হাতের নিশানা কারো থাকতে পারে তা আমার জানা ছিল না। লোক দুটিকে নিমিষের মধ্যে লুটিয়ে পড়তে দেখলাম।

কালো লোকটি বুনো মোষের মতো ছুটছিল। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়াল। সবুজ গাড়িটির দরজা খুলে লম্বা-চুলের একটা লোক কয়েক পশলা গুলি করল কালো লোকটিকে। আমি দেখলাম কালো লোকটি উবু হয়ে পড়ে গিয়েছে।

'লা বেলে' পত্রিকাটিতে দুটি ছবি ছাপা হয়েছে। একটি অ্যানির, অন্যটি জামশেদের। জামশেদ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে অসম্ভব সাহসী এই লোকটি মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করছে। সেন্ট্রাল হাসপাতালে তাকে রাখা হয়েছে কড়া পুলিশ নিরাপত্তায়। ডাক্তাররা ইতোমধ্যে দু'বার তার ফুসফুসে অস্ত্রোপচার করেছে। তৃতীয় দফা

অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হতে পারে। সেন্ট্রাল হাসপাতালের সার্জারি বিভাগের সচিব জন নান বলেছেন জামশেদের সুস্থ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। তবে সম্ভাব্য সকল চেষ্টা চলছে।

অ্যানির ছবির নিচে তার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে যে অ্যানি ভিকি হচ্ছে বিখ্যাত সিল্ক ব্যবসায়ী অ্যারন ভিকির নাতনি। তার বয়স বারো বছর এবং তার মুক্তির জন্যে এক মিলিয়ন ইউ এস ডলার মুক্তিপণ চাওয়া হয়েছে।

অ্যানির যে-ছবিটি ছাপা হয়েছে সেটি তার গত জন্মদিনের ছবি। মাথায় হ্যাপি বার্থডে টুপি। মুখভরতি হাসি। ছবিটিতে অ্যানিকে দেবশিশুর মতো লাগছে।

বেন ওয়াটসন খবরটি দুবার পড়ল। তার ভ্রু কুঞ্চিত হলো। ছবিটিতে যে কালোমতো লোকটিকে দেখা যাচ্ছে, সে যে 'জাম্‌স্' এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের ছাড়াছাড়ি হয় লিসবনে, প্রায় পনেরো বছর আগে। পনেরো বছর দীর্ঘ সময়। এই সময়ের মধ্যে পুরনো অনেকের সঙ্গে দেখা হয়েছে, শুধু 'জাম্‌স্'-এর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি।

বেন ওয়াটসন 'লাসানিয়া ও পিজা হাউজ' থেকে বেরুল রাত এগারোটায়। তখন তার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট ও বিষণ্ন। জাম্‌স্ বড় ধরনের ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছে। তার পাশে দাঁড়ানো উচিত।

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বেন ওয়াটসনকে জানাল, রোগীর অবস্থা ভালো নয় এবং যেহেতু রোগী ইনটেনসিভ কেয়ারে আছে সেহেতু দেখা হবে না। বেন ওয়াটসন সারারাত হাসপাতালের লাউঞ্জে বসে কাটাল। জাম্‌স্ বোধহয় এ-যাত্রা টিকবে না।

ভোরবেলায় জানা গেল ফুসফুসে রক্তক্ষরণ হচ্ছে। তৃতীয় অপারেশন হলো ভোর সাতটায়।

এক মিলিয়ন ইউ এস ডলার পৌঁছে দেয়া হয়েছে। ইনস্যুরেন্স কোম্পানি সুটকেস ভরতি করে দশ ডলারের নোটের বান্ডিল যথাসময়ে দেয়ায় কোনোরকম ঝামেলা হয়নি। সুটকেসভরতি ডলার এতরাকে দেয়া হয়েছে। এবং টাকা দেবার এক ঘণ্টায় ভেতর ভিকি টেলিফোন পেয়েছে যে অ্যানিকে রাত ন'টার আগেই ফোরটিনথ অ্যাভিনিউর মোড়ে একটি কমলা রঙের সিডান গাড়ির (যার নম্বর এফ ২৩৪) পেছনের সিটে পাওয়া যাবে। ওরা টেলিফোনে অ্যানির গলাও শুনিয়েছে। অ্যানি বলেছে, সে ভালো আছে এবং কেউ তার সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করেনি। অ্যানি জামশেদের কথাও জানতে চেয়েছে। জামশেদ এখনো বেঁচে আছে শুনে খুশি হয়েছে।

ভিকি সন্ধ্যা থেকেই ফোরটিনথ অ্যাভিনিউর মোড়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রাত এগারোটা বেজে গেল কারো দেখা পাওয়া গেল না।

সে বেশ কয়েকবার এতরাকে টেলিফোন করল। কেউ ফোন ধরল না। ভিকির বুক কাঁপতে লাগল। রাত যতই বাড়তে লাগল একধরনের শীতল ভীতি তাকে কুঁকড়ে দিতে লাগল। অ্যানি বেঁচে আছে তো ? আদরের অ্যানি, ছোট্ট অ্যানি সোনা।

ঠিক ক'ঘণ্টা পার হয়েছে অ্যানির মনে নেই। সে মনে রাখার চেষ্টাও করেনি। চিন্তা করতে পারছে না। অনেক কিছুর মতো চিন্তা করবার শক্তিও নষ্ট হয়ে গেছে। কোনো স্মৃতি নেই মাথায়। শুধু মনে আছে বুড়ো ভালুক ডান হাতে পিস্তল নিয়ে দৈত্যের মতো ছুটে আসছিল। কী ভয়াবহ কিন্তু কী চমৎকার ছবি! একসময় ছবিটি নষ্ট হয়ে গেল। জামশেদ গড়িয়ে পড়ল মাটিতে।

অ্যাই মেয়ে, কিছু খাবে ?

বলেছি তো আমি কিছু খাব না।

ঠিক আছে।

অ্যানি লক্ষ করল লোক তিনটি তার সঙ্গে মোটামুটি ভদ্র ব্যবহার করছে। প্রথম তাকে নিয়ে গেছে শহরের বাইরে, একটা ছোট্ট একতলা বাড়িতে। সে-বাড়িতে বুড়োমতো একজন লোক বসে ছিল, অ্যানিকে দেখেই সে ফুঁসে উঠে বলল, এর জন্যে আমার সেরা তিনটি মানুষ মারা গেছে ?

অ্যানির সঙ্গের লোকটি তার উত্তরে বিদেশী ভাষায় বুড়োকে কী কী যেন সব বলল। অ্যানি কিছুই বুঝল না। অ্যানিরা সেখানে ঘণ্টাখানেক থেকে আবার রওনা হলো। অ্যানিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল একটি বদ্ধ ওয়াগনে করে। কোথায় যাচ্ছে, অ্যানি কিছুই বুঝতে পারল না। অ্যানির সঙ্গে যে বেঁটেমতো লোকটি ছিল সে একসময় বলল, তুমি ছাড়া পাবে শিগগিরিই। ভয়ের কিছু নেই।

অ্যানির ঠোঁট টেপ দিয়ে আটকানো, সে এর জবাবে কিছু বলতে পারল না। লোকটি থেমে থেমে বলল, মেয়ে হিসেবে তুমি অত্যন্ত লোভনীয় কিন্তু কড়া নির্দেশ আছে, আমাদের কিছুই করবার নেই।

যাত্রাবিরতি হলো একটি হোটেলজাতীয় স্থানে। অ্যানিকে বলা হলো হাতমুখ ধুয়ে নিতে।

অ্যানি মাথা নাড়ল। সে কিছুই করতে চায় না। হঠাৎ বেঁটে লোকটি এসে প্রকাণ্ড একটি চড় কষাল। অ্যানি হতভম্ব হয়ে গেল। সে নিঃশব্দে হাতমুখ ধুয়ে এল। বাথরুমের আয়নায় দেখল তার বাঁ গাল লাল হয়ে ফুলে উঠেছে।

টয়লেট থেকে বেরুতেই বেঁটে লোকটা বলল, এখন থেকে যা বলব শুনবি। নয়তো সেফটিপিন দিয়ে তোর চোখ গেলে দেব।

অ্যানি বহু কষ্টে কান্না সামলাল। এখান থেকেই ওরা অ্যানির বাবাকে টেলিফোন করল। এবং একসময় অ্যানিকে বলল বাবার সঙ্গে কথা বলতে।

মামণি, তুমি ভালো আছ ?

হ্যাঁ।

ওরা তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করছে না তো ?

না।

অ্যানি শুনল তার বাবা কাঁদতে শুরু করেছে। সে কোনোদিন তার বাবাকে কাঁদতে শোনেনি। তার বুক ব্যথা করতে লাগল। টেলিফোন কেড়ে নেয়া হলো এই সময়। বেঁটে লোকটা বলল, তোমাকে আমরা পাশের ঘরে রেখে যাব। চিৎকার চ্যাঁচামেচিতে কোনো লাভ হবে না— কেউ শুনতে পাবে না। তোমার হাত-পা অবিশ্যি বাঁধা থাকবে, বুঝতে পারছ ?

পারছি।

তবে ভয়ের কিছু নেই। ঘণ্টা দু'একের মধ্যে তুমি ছাড়া পাবে। ঠিক আছে ?

অ্যানি জবাব দিল না।

তুমি কি কিছু খাবে ?

না।

ভালো।

লোকগুলি উঠে দাঁড়াতেই অ্যানি বলল, আমার সঙ্গে যে-কালো রঙের একজন ছিল, তাকে তোমরা গুলি করেছ, সে কি বেঁচে আছে ?

জানি না।

এটা কোন জায়গা ?

তা দিয়ে তোমার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

তোমরা কি আমাকে মেরে ফেলবে ? আমার এক বন্ধুকে ধরে নিয়ে মেরে ফেলেছিল।

লোকগুলি হেসে উঠল যেন খুব একটা মজার কথা।

ড. জন নানের ধারণা ছিল না যে এরকম গুরুতর আহত একজন মানুষ সেরে উঠতে পারে। তিনি বেন ওয়াটসনকে বললেন, আপনার এই বন্ধুটির জীবনীশক্তি অসাধারণ। এবং আমার মনে হচ্ছে সে সেরে উঠবে।

ধন্যবাদ, ডাক্তার। সে কি আগের মতো চলাফেরা করতে পারবে ?

তা বলা কঠিন।

আমি কি ওর সঙ্গে কথা বলতে পারি ?

আপনার বন্ধু কথা বলতে পারবে কি না জানি না। তবে আপনি দেখা করতে পারবেন।

হ্যালো, জাম্‌স্! চিনতে পারছো ?

জামশেদ উত্তর দিল না। তার চোখে অবিশ্যি কয়েকবার পলক পড়ল।

ডাক্তার বলছে তুমি সেরে উঠবে। তুমি কি আমার কথা বুঝতে পারছো ?

জামশেদ মাথা নাড়াল।

খুব কষ্ট হচ্ছে ?

জামশেদ চুপ করে রইল।

অবশ্য কষ্ট হলেও তুমি স্বীকার করবে না, তোমাকে আমার চিনতে বাকি নেই। হা হা হা।

নার্স এসে বেন ওয়াটসনকে সরিয়ে নিয়ে গেল। যাবার আগে সে ফুর্তিবাজের ভঙ্গিতে বলল, আমি থাকব হাসপাতালের আশপাশেই, কোনো চিন্তা নেই।

জামশেদের ভাবলেশহীন মুখেও ক্ষীণ একটি হাসির রেখা দেখা গেল।

জামশেদের জবানবন্দি নেবার জন্যে পুলিশের যে অল্পবয়স্ক অফিসারটি লাউঞ্জে বসে ছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তাকে অনেকবার চলে যেতে বলল। রোগীর কথা বলার মতো অবস্থা নয়। গুলি লেগেছে দু-জায়গায়, ডান ফুসফুসের নিচের অংশে এবং তলপেটে। তলপেটের জখমটিই হয়েছে মারাত্মক। ভাগ্যক্রমে বুলেট ছিল বত্রিশ ক্যালিবারের। এর চেয়ে ভারী কিছু হলে আর দেখতে হতো না। রোগী যে এখন পর্যন্ত ঝুলে আছে তার কারণ লোকটির অসাধারণ প্রাণশক্তি। কথা বলার মতো অবস্থা তার আদৌ হবে কি না কে জানে ? কিন্তু পুলিশ অফিসারটি দিনে চার-পাঁচবার করে আসছে। ডাক্তার দেখা হবে না বলা সত্ত্বেও বসে থাকছে।

তৃতীয় দিনে সে রোগীর সঙ্গে কথাবার্তা বলার অনুমতি পেল। ডাক্তার জন নান বারবার বললেন, খুব কম কথায় সারবেন। মনে রাখবেন, লোকটি গুরুতর অসুস্থ।

জামশেদ চোখ মেলে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল পুলিশ অফিসারটির দিকে।

আজ কি একটু ভালো বোধ করছেন ?

জামশেদ মাথা নাড়ল।

আপনি জানেন না, যে-তিনটে লোক মারা গেছে তাদের ধরবার জন্য পুলিশবাহিনী গত চার বছর ধরে চেষ্টা করছে। এরা মাফিয়াচক্রের সঙ্গে জড়িত। এই লোক তিনটির নামে গোটা দশেক খুনের মামলা আছে। এরা বন্দুক চালাতে দারুণ ওস্তাদ। অবিশ্যি আপনি নিজেও একজন ওস্তাদ।

জামশেদ ম্লান হাসল। থেমে থেমে বলল, ওরা আমার জন্যে প্রস্তুত ছিল না বলে এরকম হয়েছে। ওরা কোনো প্রতিরোধ আশা করেনি।

তা ঠিক। ওরা কল্পনা করেনি অব্যর্থ নিশানার একজন-কেউ লাফিয়ে পড়বে। পুলিশ অফিসার হঠাৎ অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল। আমার স্ত্রী আপনাকে চিনতে পেরেছে।

আপনার ছবি ছাপা হয়েছে পত্রিকায়। সেটা দেখে চিনল। একবার আপনি তাকে সাহায্য করেছিলেন, আপনার কি মনে আছে ?

জামশেদ কিছু মনে করতে পারল না।

একবার এক রেস্টুরেন্টে একটা মাতালের পাল্লায় পড়েছিল সে। আপনি তার সাহায্যের জন্যে এগিয়ে এসেছিলেন।

মনে পড়েছে।

আমরা এই ঘটনার কিছুদিন পরই বিয়ে করি। আমার স্ত্রীর খুব ইচ্ছা ছিল বিয়েতে আপনাকে নিমন্ত্রণ করার, কিন্তু আপনার ঠিকানা আমরা জানতাম না।

জামশেদ ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। পুলিশ অফিসার বলল, আপনাকে অনেক কিছু জিজ্ঞেস করার আছে। কিন্তু এখন আর বিরক্ত করব না। শুধু এটুকু বলে যাচ্ছি যে আপনার নিরাপত্তার জন্যে ভালো ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দুজন সশস্ত্র পুলিশ আপনাকে পাহারা দিচ্ছে।

জামশেদ ক্লান্ত স্বরে বলল, মেয়েটির খোঁজ পাওয়া গেছে ?

না, এখনো পাওয়া যায় নি। মেয়ের বাবার বিশেষ অনুরোধে পুলিশ খোঁজখবর করছে না। আমরাও মেয়েটির নিরাপত্তার কথা ভেবে চুপ করে আছি।

টাকা দেয়া হয়েছে ? আপনি কিছু জানেন ?

আমার যতদূর মনে হচ্ছে টাকা দেয়া হয়েছে। তবে নিশ্চিতভাবে আমরা কিছু বলতে পারছি না। মেয়ের বাবা আমাদের পরিষ্কার কিছু বলছে না।

অ্যানির মনে হলো হাত-পা বাঁধা অবস্থায় সে অনন্তকাল ধরে এখানে পড়ে আছে। সে মনে-মনে অনেকবার বলল, আমি কাঁদব না, কিছুতেই কাঁদব না।

কিন্তু বারবার তার চোখ ভিজে উঠতে লাগল। রাত কত হয়েছে কে জানে! ঘরে কোনো ঘড়ি নেই, কোনোরকম সাড়াশব্দও আসছে না। নিশ্চয়ই জনমানব শূন্য কোনো জায়গা। বাড়িতে একা একা নিজের ঘরে ঘুমুতেও ভয় লাগত তার। মাঝরাতে যতবার ঘুম ভাঙত, ততবার ডাকত— মারিয়া, মারিয়া। যতক্ষণ পর্যন্ত না মারিয়া সাড়া দিচ্ছে ততক্ষণ তার ঘুম আসত না। মনে হতো নিশ্চয়ই খাটের নিচে ভূতটুত কিছু লুকিয়ে আছে।

আশ্চর্য, সেরকম কোনো ভয় লাগছে না। লোকগুলো চলে যাবার পর বরং অনেক কম লাগছে। বেঁটে লোকটা সারাক্ষণ কীভাবে তাকাচ্ছিল তার দিকে। বেশ কয়েকবার গায়ে হাত দিয়েছে। ভাবখানা এরকম যেন অজান্তে হয়েছে। একবার অ্যানি বলে ফেলল, আপনার হাত সরিয়ে নিন।

বেঁটে লোকটা হাত সরিয়ে নিল, সঙ্গের দুজন হেসে উঠল হা হা করে। বেঁটে লোকটা তখন অত্যন্ত কুৎসিত একটা কথা বলল। এমন কুৎসিত কথা কেউ বলতে পারে ?

পাশের ঘরে টেলিফোন বাজছে। কেউ ধরছে না। আবার বাজছে আবার বাজছে। চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে একসময় ঘুমিয়ে পড়ল অ্যানি। অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখল সে। যেন জামশেদ এসেছে এ-ঘরে। তার হাতে ভয়ালদর্শন একটি অস্ত্র। জামশেদ বলছে, "মামণি অ্যানি, তুমি শুধু একটি একটি করে মানুষ আমাকে চিনিয়ে দিবে। তারপর দ্যাখো আমি কী করি। আমি হচ্ছি জামশেদ। বন্ধুরা আমাকে কী ডাকে জানো ? বুড়ো ভালুক। আমি ভালুকের মতোই ভয়ঙ্কর— হা হা হা।"

অ্যানির ঘুম ভেঙে গেল। অ্যানি অবাক হয়ে দেখল দরজা খুলে এতরা চাচা ঢুকছেন। এটাও কি স্বপ্ন ? না, স্বপ্ন নয় তো! সত্যি সত্যি তো এতরা চাচা! অ্যানি দেখল এতরা চাচার হাসিহাসি মুখ। এতরা চাচা অ্যানির মুখের টেপ খুলে দিয়ে নরম গলায় বললেন, কী, চিনতে পারছো তো ?

অ্যানি ফুঁপিয়ে উঠল।

খুব ঝামেলা গেছে, না ? ইস, হাতে দেখি দাগ বসে গেছে! কাঁদে না। দুষ্টু মেয়ে, কাঁদে না।

এতরা কাছে টেনে নিল অ্যানিকে। ভয়ের আর কিছুই নেই। সব ঝামেলা মিটেছে।

আপনি কি আমাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছেন ?

তোমার কী মনে হয় ?

অ্যানি এতরার কাঁধে মাথা রাখল।

তোমাকে ছাড়িয়ে নিতেই এসেছি।

বলতে বলতে এতরা অ্যানির বুকে তার বাঁ হাত রাখল। অ্যানি কয়েক মুহূর্ত কিছু বুঝতে পারল না। এতরা চাচা কি ডান হাতে তার জামার হুক খোলার চেষ্টা করছে ?

অ্যানি সরে যেতে চেষ্টা করল কিন্তু তার আগেই এতরা তাকে প্রায় নগ্ন করে ফেলল। অ্যানি বুঝতে পারছে একটা রোমশ হাত তার প্যান্টির ভেতর ঢুকে যাচ্ছে।

প্যান্টি খুলে ফেলতে এতরাকে মোটেই বেগ পেতে হলো না। সে নরম স্বরে বলল, তোমাকে একটুও ব্যথা দেব না। দেখবে ভালোই লাগবে তোমার।

অ্যানি চিৎকার বা কিছুই করল না। সে তার অসম্ভব সুন্দর নগ্ন শরীর নিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এতরা যখন টেনে তাকে তার কোলে বসাল, তখন শুধু সে ফিসফিস করে তার মাকে ডাকতে লাগল।

ভিকি টেলিফোনে প্রায় কেঁদে ফেলল। হ্যালো এতরা, হ্যালো।

শুনছি।

কই, ওরা তো আমার অ্যানিকে ছাড়ছে না।

এত অস্থির হচ্ছ কেন ?

অস্থির হব না, কী বলছ তুমি!

শোনো ভিকি, মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে এখন। সমস্ত ব্যাপারটাই জট পাকিয়ে গেছে, বুঝতে পারছ না ?

না, আমি বুঝতে পারছি না।

ঠিক আছে, তুমি ক্যাফে ইনে চলে আসো। টেলিফোনে সব বলা যায় না।

অ্যানি বেঁচে আছে তো ?

আরে তুমি বলছ কি এসব!

ভিকি এবার গলা ছেড়ে কাঁদতে শুরু করল।

হ্যালো ভিকি, তুমি চলে আসো ক্যাফে ইনে। আমি থাকব সেখানে। ভালো কথা, রুন কেমন আছে ? সে নিশ্চয়ই খুব বিচলিত ?

ওকে ট্রাংকুলাইজার দিয়ে রাখা হয়েছে।

ঠিক আছে, তুমি চলে এসো।

ক্যাফে ইন বেন্টিলা পোর্ট-লাগোয়া ছোট্ট একটি কফি শপ। সারাদিন কফি এবং পটেটো চিপস বিক্রি হয়। সন্ধ্যার পর দু-তিন ঘণ্টার জন্যে ফ্রায়েড লবস্টার পাওয়া যায়। ভিড় হয় সন্ধ্যার পর। বসার জায়গা পাওয়া যায় না।

ভিকি এসে দেখল, এতরা একটা ছোট্ট কামরা রিজার্ভ করে তার জন্যে বসে আছে। এতরার মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। ভিকি এসে বসল, কিন্তু দীর্ঘ সময় কোনো কথা বলতে পারল না। এতরা বলল, কিছু খাবে ? হট সস দিয়ে লবস্টার চলবে ? মেক্সিকান রেসিপি। চমৎকার!

ভিকি ঠান্ডা গলায় বলল, আমার মেয়ে কোথায় ?

তুমি এমনভাবে জিজ্ঞেস করছো যাতে মনে হয় তোমার মেয়েকে আমি লুকিয়ে রেখেছি।

তুমি জানো না সে কোথায় আছে ?

আমি কী করে জানব ?

সে কোথায় আছে তার কিছুই জানো না ?

না। তবে তোমাকে বলেছি ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ আছে।

ভিকি ক্লান্তস্বরে বলল, আমি সমস্ত ব্যাপারটা পুলিশকে জানাতে চাই।

সেটা তোমার ইচ্ছা। একটা কথা আমার মনে হয় তুমি ভুলে যাচ্ছ, মূল পরিকল্পনাতে তুমিও আছ। পুলিশ তা ঠিক পছন্দ করবে না। এবং সবচেয়ে অপছন্দ করবে তোমার স্ত্রী রুন।

এতরা একটি সিগারেট ধরাল। আড়চোখে ভিকির দিকে তাকিয়ে বলল, ধরো এখন যদি তোমার মেয়ের কিছু হয় পুলিশ সবার আগে ধরবে তোমাকে।

আমার মেয়ের কিছু হয় মানে ?

কথার কথা বলছি। কিছু হবে না, মেয়ে ঘরে ফিরে আসবে। তুমি বৃথাই এতটা ভেঙে পড়ছো।

ভিকি চুপচাপ তাকিয়ে রইল।

এতরা বলল, মনে হচ্ছে মূল পরিকল্পনার একটু অদলবদল হয়েছে। ওদের তিনটা লোক মারা গেছে। বাছা-বাছা লোক। এটা তো মূল পরিকল্পনায় ছিল না। দিকটা তো তোমাকে দেখতে হবে। সমস্ত ব্যাপারটা জট পাকিয়ে গেছে।

ভিকির চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগল।

জিনিসটা যে এরকম দাঁড়াবে তা আমার ধারণার বাইরে ছিল। তোমার ঐ বেকুব বডিগার্ড যেভাবে গুলি ছুড়ছিল তাতে অ্যানির মারা পড়ার সম্ভাবনা ছিল সবচেয়ে বেশি। ভাগ্যক্রমে গুলি লাগেনি।

ভিকি উঠে দাঁড়াল।

কী ব্যাপার, যাচ্ছ নাকি ?

হুঁ।

বসো আরো খানিকক্ষণ ?

না।

পুলিশের কাছে সব খুলে বলবে বলে ঠিক করেছ নাকি ?

আমি কিছুই ঠিক করিনি।

ভিকি বাড়ি ফিরে গেল না। একা একা ঘুরে বেড়াল দীর্ঘ সময়। তারপর হঠাৎ কী মনে করে চলে গেল হাসপাতালে। অসময়ে তাকে হাসপাতালে ঢুকতে দেবার কথা নয়, কিন্তু আশ্চর্য, সে জামশেদের সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনেই তাকে ঢুকবার পাশ দেয়া হলো।

লবিতে যে-পুলিশ অফিসার বসে ছিল সে এগিয়ে এলো, আপনি নিশ্চয়ই ভিকি ?

হ্যাঁ।

জামশেদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এসেছেন।

হ্যাঁ।

তার আগে কি আমি আপনাকে দুএকটি কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

আমি খুব ক্লান্ত। আমি কোনো আলোচনায় এই মুহূর্তে যেতে চাই না।

ঠিক আছে, ঠিক আছে। পরে কথা বলব। আমি অ্যানি অপহরণের তদন্তকারী দলের একজন সদস্য।

ও।

যান, আপনি ভেতরে চলে যান। জামশেদ সতেরো নম্বর কেবিনে আছে। ভালোই আছে।

ধন্যবাদ।

ভিকি মৃদুস্বরে বলল, এখন কি শরীর ভালো ?

জামশেদ মাথা নাড়ল। ভালো।

আমি আগেও একবার এসেছিলাম। তোমার তখন জ্ঞান ছিল না।

আমি জানি। আমি খবর পেয়েছি।

হাসপাতাল থেকে কবে ছাড়া পাবে ?

আরো সপ্তাহখানেক লাগবে।

তারপর কী করবে কিছু ঠিক করেছ ?

না।

ভিকি চুপচাপ হয়ে গেল। জামশেদ তাকে নীরবে লক্ষ করতে লাগল। ভিকি একসময় বলল, তোমার এখানে সিগারেট খাওয়া যেতে পারে ? কেউ কোনো আপত্তি করবে না তো ?

নাহ্।

ভিকি সিগারেট ধরাল। টানতে লাগল অপ্রকৃতিস্থের মতো। জামশেদ বলল, তুমি মনে হচ্ছে এখনো কোনো খবর পাওনি।

কিসের খবর ?

তুমি বাড়ি ফিরে যাও।

কী হয়েছে ?

জামশেদ বলল, একটা খারাপ সংবাদ আছে তোমার জন্যে।

অ্যানি কি মারা গেছে ?

হ্যাঁ।

কখন খবর পাওয়া গেল ?

আধ ঘণ্টা আগে।

ও।

ভিকি উঠে দাঁড়াল। জামশেদ বলল, অ্যানির ডেডবডি পাওয়া গেছে একটি গাড়ির লাগেজ কেবিনে।

ও।

ভিকি, আমি একটি কথা তোমাকে বলতে চাই।

বলো।

তোমার সঙ্গে কিছুদিন হয়তো আমার দেখা হবে না। আমি হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে শরীর সারাবার জন্যে অনেক দূরে কোথাও যাব। তারপর আবার ফিরে আসব।

ও।

ফিরে আসব প্রতিশোধ নেবার জন্যে। আবার আমাদের দেখা হবে।

ভিকির চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল। জামশেদ তাকিয়ে রইল। তার চোখ পাথরের চোখের মতো। সে-চোখে ভালোবাসা, স্নেহ, মমতা এই জাতীয় অনভূতির কোনো ছায়া পড়ে না। সে মৃদুস্বরে দ্বিতীয়বার বলল, আমি আবার ফিরে আসব।

রাত প্রায় দুটোর দিকে এতরার শোবার ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল। এত রাতে অকাজে কেউ ফোন করে না, নিশ্চয়ই জরুরি কিছু। এতরা বিছানা ছেড়ে উঠে এল। সে প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। টেলিফোনের শব্দে জেগেছে।

হ্যালো, আমি এতরা, কাকে চান ?

আপনাকেই চাই।

আপনি কে বলছেন ?

ওপাশ থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। কিন্তু গলার আওয়াজ শুনে মনে হয় বিদেশী কেউ। ভাঙা-ভাঙা ইতালিয়ান বলছে।

হ্যালো, কে আপনি ?

আমি কে সেটা জানা কি খুব প্রয়োজন ? তারচে' বরং কীজন্যে টেলিফোন করেছি সেটা বলে ফেলি।

আমাকে কিছু বলতে হলে আগে আপনার পরিচয় দিতে হবে। রাতদুপুরে এভাবে মানুষের সঙ্গে কথা বলা যায় না। কে আপনি ?

ওপাশের লোকটি সে-প্রশ্নের জবাব দিল না। অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলল, বারো বছরের অ্যানি নামের কোনো মেয়েকে চেনেন ?

আপনি কে ?

বারো বছরের ঐ মেয়েটির খুব রহস্যময়ভাবে মৃত্যু হয়েছে।

কে আপনি ?

আমি ঐ মেয়েটির একজন বন্ধু। আমার নাম জামশেদ। চিনতে পারছেন ?

এতরা একবার ভাবল টেলিফোন নামিলে রাখে। কিন্তু তাতে লাভ হবে কি ? লোকটি আবার টেলিফোন করবে।

রহস্যময় কিছু তো আমি জানি না। মেয়েটি মারা পড়েছে কিডন্যাপারদের হাতে। এবং আমি যতদূর জানি ওর মৃত্যুর জন্যে তুমি বহুলাংশে দায়ী। তুমি ছিলে মেয়েটার দেহরক্ষী। তুমি তাকে রক্ষা করতে পারোনি। ঠিক না ?

ঠিক।

আজ তার মৃত্যুর পর বন্ধু সেজেছ ? এবং রাতদুপুরে টেলিফোন করে আমাকে বিরক্ত করছো ?

তা অবিশ্যি করছি এবং করার একটি কারণ আছে।

কী কারণ ?

কারণ হচ্ছে— আমার ধারণা মেয়েটির মৃত্যুর সঙ্গে তোমার যোগ আছে। হ্যালো, টেলিফোন রেখে দিচ্ছ নাকি ?

না।

আমি তোমাকে এর জন্যে খানিকটা শাস্তি দিতে চাই।

তুমি কোত্থেকে টেলিফোন করছো ?

কেন, পুলিশে খবর দিতে চাও ? সেটা মনে হয় খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। শোনো এতরা—।

এতরা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। লোকটি নিশ্চয়ই আবার টেলিফোন করবে। পুলিশকে বলা দরকার যাতে কলটি কোত্থেকে করা হচ্ছে পুলিশ তা ধরতে পারে। পাবলিক বুথ থেকে করা হলে ধরা যাবে না। তবে জানা যাবে কলটি কোন এরিয়া থেকে আসছে।

এতরা নাম্বার ডায়াল করল তবে পুলিশের কাছে নয়। হাসপাতালে। সিটি হসপিটাল।

রিসিপশন, আমি একজন রোগী সম্পর্কে জানতে চাই। আমি খুবই উদ্বিগ্ন।

এক্ষুনি জেনে দিচ্ছি।

ওর নাম জামশেদ। বিদেশী।

বেড নাম্বার এবং কেবিন নাম্বার ?

সেটি ঠিক বলতে পারছি না।

ঠিক আছে, ধরে থাকুন। ডিউটি রেজিস্টার দেখে বলছি।

এতরা টেলিফোন কাঁধে নিয়েই নিজের জন্যে একটি মার্টিনি বানাল। ওদের নাম খুঁজে বের করতে সময় লাগবে।

হ্যালো!

বলুন শুনছি।

আপনি যে-রোগীর কথা জানতে চেয়েছেন সে তো ডিসচার্জ নিয়ে চলে গেছে।

ও, তা-ই বুঝি ? কবে ?

আজ সকালেই।

ধন্যবাদ। যাবার সময় কোনো ফরওয়ার্ডিং অ্যাড্রেস রেখে গেছে কি ? চিঠিপত্র এলে যাতে ঐ ঠিকানায় পাঠানো যায় ?

না, এরকম কিছু নেই।

আচ্ছা, ঠিক আছে। অসংখ্য ধন্যবাদ।

এতরা টেলিফোন রেখে দিল। ব্যাপারটা ক্যানটারেলাকে জানানো উচিত। ক্যানটারেলা মাঝারি ধরনের বস। মাঝারি ধরনের হলেও তার যোগাযোগ ভালো। বিশেষ করে কিছুদিন ধরেই ভিকানডিয়ার সঙ্গে তার খুব ভালো সম্পর্ক যাচ্ছে। প্রথম দিকে এটাকে সবাই গুজব বলেই মনে করত কারণ ভিকানডিয়া মাঝারি ধরনের কারো সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে না। কিন্তু এটা গুজব নয়— সত্যি।

এতরা ঘড়ি দেখল। দুটো ত্রিশ। রাত অনেক হয়েছে। তবু ক্যানটারেলাকে পাওয়া যাবে। রাত দুটো পর্যন্ত সে থাকে জুয়ার আড্ডায়। বাড়ি ফেরে তিনটায়, ঘুমুতে যায় চারটায়। ঘড়ি-ধরা কাজ। খানিক ইতস্তত করে টেলিফোন ডায়াল করল।

হ্যালো, কে ?

আমি এতরা।

এতরা ? এত রাতে কী ব্যাপার ?

একটা সমস্যা হয়েছে আমার।

সমস্যা ? কী সমস্যা ?

জামশেদ নামের ঐ লোকটি আমাকে টেলিফোনে ভয় দেখিয়েছে।

একটা মেয়েকে তুমি রেপ করে মেরে ফেলবে আর কেউ তোমাকে ভয়ও দেখাতে পারবে না ?

এতরা শুকনো গলায় বলল, ব্যাপারটা সেরকম না।

সেরকম না মানে ?

এটা একটা অ্যাকসিডেন্ট।

তা-ই বুঝি ?

ক্যানটারেলা উচ্চস্বরে হাসল। মদ খেয়ে টং হয়ে আছো নিশ্চয়ই। এতরা নিচুস্বরে বলল, ভিকানডিয়া বলেছেন তিনি ব্যাপারটা সামলে দেবেন।

সামলানো তো হয়েছে। হয়নি ? কোনো পুলিশ রিপোর্ট হয়নি। কেউ গ্রেফতার হয়নি। তোমার নাম পর্যন্ত কেউ জানে না। ঠিক কি না ?

হুঁ।

তা হলে চিন্তা করছো কেন ?

ঐ টেলিফোনটার জন্যে চিন্তা করছি।

শোনো, এখন থেকে চলাফেরা করবার সময় বডিগার্ড নিয়ে চলাফেরা করবে, ব্যস। দু-তিনজন লোক সাথে থাকলেই নিশ্চিন্ত।

আচ্ছা, তা-ই করব।

এতরা, একটা কথা।

বলুন।

বারো বছরের মেয়েটির সঙ্গে ঐ কর্ম করবার সময় তোমার কেমন লেগেছিল ? অভিজ্ঞতাটা কি আনন্দদায়ক ছিল ?

ক্যানটারেলা টেলিফোন ফাটিয়ে হাসতে লাগল যেন খুব একটা মজার কথা। এতরার ইচ্ছা করছিল টেলিফোন নামিয়ে রাখতে, কিন্তু তা করা যাবে না। এমন কিছুই করা যাবে না, যা ক্যানটারেলাকে রাগিয়ে দিতে পারে।

হ্যালো, এতরা।

বলুন।

আমরা খারাপ লোক সবাই জানে। কিন্তু তুমি একটা নিম্নশ্রেণীর অপরাধী! কেঁচোজাতীয়। বুঝতে পারছ ?

পারছি।

একজন অপরাধী অন্য অপরাধীকে বাঁচিয়ে রাখে। এই জন্যই তোমাকে প্রোটেকশন দেয়া হয়েছে।

এইসব কথা কি টেলিফোনে বলা ঠিক হচ্ছে ?

কেন, পুলিশ শুনে ফেলবে ? টেলিফোন কানে নিয়ে বসে থাকা পুলিশের কাজ নয়। আর তা ছাড়া পুলিশের বড়কর্তা এবং ছোটকর্তাকে কী পরিমাণ টাকা আমরা দিই সে-সম্পর্কে তোমার ধারণা আছে ?

না।

না থাকাই ভালো।

ক্যানটারেলা টেলিফোন নামিয়ে রাখল খট করে। বাকি রাতটা এতরার কাটল না-ঘুমিয়ে। পরপর চার গ্লাস রাম খেল এবং ভোরের দিকে বাথরুম বমি করে ভাসিয়ে দিল। দিনটি শুরু হচ্ছে খারাপভাবে।

মঙ্গলবার হচ্ছে এতরার মাদারস ডে। প্রতি মঙ্গলবার মায়ের কাছে তাকে ঘণ্টা তিনেক কাটাতে হয়। দুপুরের লাঞ্চ খেতে হয়। হাসিমুখে কথা বলতে হয়। এবং মায়ের কাছে প্রতিজ্ঞা করতে হয় পরের রোববার থেকে সে নিয়মিত চার্চে যাবে।

এই মঙ্গলবারেও বুড়িকে দেখা গেল বাড়ির সামনে, বারান্দায় ছেলের জন্যে অপেক্ষা করছে। বুড়ির মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

এতরা, এত দেরি কেন আজকে ?

বেশি দেরি তো নয় মা। আধঘণ্টা।

আধঘণ্টাও অনেক সময়। এগারোটার আগেই তোমার আসার কথা। এখন বাজে এগারোটা চল্লিশ।

মা, আমি খুব দুঃখিত। আর দেরি হবে না।

কফি বানিয়ে রেখেছিলাম। জুড়িয়ে পানি হয়ে গেছে বোধ করি।

কফি খাব না মা।

কেন ? কফি খাবে না কেন ? শরীর খারাপ নাকি ? না, শরীর ঠিক নেই। কেমন শুকনো দেখাচ্ছে। দেখি, গায়ের টেম্পারেচার দেখি। এই তো জ্বরজ্বর মনে হচ্ছে।

জ্বর নয়। রোদের মধ্যে গাড়ি চালিয়ে এসেছি তাই গা-গরম লাগছে।

এতরা, তুমি মিথ্যা কথা বলে আমাকে ভোলাতে চেষ্টা করছো। এটা ঠিক না। চাদর দিচ্ছি শুয়ে পড়ো।

মা, তুমি শুধুশুধু ব্যস্ত হচ্ছ।

আমি মোটেই শুধুশুধু ব্যস্ত হচ্ছি না। তোমাকে যা করতে বলছি, করো। আমাকে রাগীও না।

এতরাকে চাদর গায়ে দিয়ে শুয়ে পড়তে হলো। বুড়ি বড় এক পেয়ালা কফি হাতে নিয়ে তার সামনে চেয়ার টেনে বসল।

তুমি চার্চে যাওয়া শুরু করেছ ?

এতরা জবাব দিল না।

এখনো শুরু করনি ? ইদানীং তোমাকে নিয়ে একটা দুঃস্বপ্ন দেখতে শুরু করেছি। আমার মনে হয় তোমার চার্চে যাওয়া শুরু করা উচিত।

কী দুঃস্বপ্ন দেখেছ ?

দেখলাম তুমি রাস্তা দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছ। তোমার গায়ে কোনো কাপড় নেই। তোমাকে তাড়া করছে একজন মানুষ। ওর হাতে প্রকাণ্ড একটা ভোজালি।

যে তাড়া করছে সে কেমন লোক ?

স্বপ্নের ভেতর সবকিছু এত স্পষ্ট দেখা যায় না। আমি শুধু ভোজালিটা দেখলাম।

লোকটা কি বিদেশী ? গায়ের রঙ কেমন ?

বুড়ি ঠান্ডাস্বরে বলল, এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন ? তোমার কি কোনো বিদেশীর সঙ্গে ঝামেলা হয়েছে ?

না, ঝামেলা হবে কেন ? কফি দাও।

বুড়ি কফি পারকুলেটর চালু করে তার ছেলেকে তীক্ষ্ণচোখে দেখতে লাগল। এতরা ঘামছে। চোখের দৃষ্টি অন্যরকম। নিশ্চয়ই কোনো ঝামেলায় জড়িয়েছে।

এঞ্জেল ফসিলো লোকটি খর্বাকৃতির। চোখের মণি ঈষৎ সবুজ। দলের কাছে সে বিড়াল-ফসিলো নামে পরিচিত। বিড়ালের একটি গুণ তার আছে, সে অসম্ভব ধূর্ত। মাফিয়াদের মধ্যে নিম্নশ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তির লোকজনই বেশি। এরকম ধূর্তের সংখ্যা কম। বস ভিকানডিয়া তাকে একটু বিশেষ স্নেহের চোখে দেখেন এই একটিমাত্র কারণেই। ধূর্ত মানুষ সাধারণত সাহসী হয় না। ফসিলোও সাহসী নয়। তবে তার সাহসের একটা ভান আছে। অকারণে মারপিট শুরু করে। কথা বলে অত্যন্ত উদ্ধত ভঙ্গিতে। যে-কোনো বিপজ্জনক কাজে আগ বাড়িয়ে যাওয়ার উৎসাহ দেখায়। সাহসের অভাব গোপন রাখবার যথাসাধ্য চেষ্টা করে।

আজ এঞ্জেল ফসিলোকে খুব খুশি-খুশি দেখাচ্ছে। খুশির কারণ রহস্যাবৃত। বস ভিকানডিয়ার সঙ্গে আজ বিকেলে কিছু কথাবার্তা হয়েছে। টেলিফোনে নয়, মুখোমুখি। এটি ফসিলের খুশির কারণ হতে পারে। কারণ ভিকানডিয়া তার ভিলায় কাউকে ঢুকতে দেন না এবং মুখোমুখি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। বসদের নানানরকম সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। নিজের লোকদেরও নিরাপদ দূরত্বে সরিয়ে রাখতে হয়। ভাগ্যবান কয়েকজনই শুধু অল্প সময়ের জন্যে তাঁর দেখা পায়। ফসিলো সম্ভবত ভাগ্যবানদের দলে পড়তে শুরু করেছে। এটা খুশি হবার মতোই ঘটনা।

এঞ্জেল ফসিলো শিস দিতে দিতে গাড়ি থেকে নামল। তার গাড়িটা ছোট। কালো রঙের টু-সিটার ডজ। অন্য সবার মতো দরজা লক করল না। কারণ গাড়িচুরির মতো অপরাধ যারা করে তারা সবাই ফসিলোর টু-সিটারটা ভালোভাবে চেনে। এতে তারা হাত দেবে না।

ফসিলো গম্ভীর ভঙ্গিতে এগিয়ে গেল। এটি একটি নতুন নাইট ক্লাব। মেক্সিকান এক ব্যবসায়ী এমাসেই চালু করেছেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই জমিয়ে ফেলেছেন। প্রচুর ভিড় হচ্ছে। এত অল্প সময়ে নাইট ক্লাবটি জমে যাওয়ার মূলে আছে দুটি মেক্সিকান যুবতী। এরা প্রত্যেকেই অসম্ভব রূপসী। প্রতি রাতেই তিনটে শো করে। নাচের শো। নাচের পোশাক বিচিত্র। সমস্ত গা ঢাকা থাকে কিন্তু সবার বাঁ-স্তনটি থাকে নগ্ন। এই বিচিত্র পোশাক সবার কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় মনে হয়েছে।

ফসিলোকে ঢুকতে দেখেই নাইট ক্লাবের ম্যানেজার হাসিমুখে এগিয়ে এলো।

সিনোর ফসিলো যে! কী সৌভাগ্য! আসুন আসুন।

ফসিলো ঘাড় ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। স্টেজ অন্ধকার হয়ে আসছে। নাচ শুরু হবে এখনই। ফসিলো মৃদুস্বরে বলল, এক বুক দেখিয়েই শুনলাম পুরুষদের পাগল করে দেয়া হচ্ছে।

হ্যাঁ হ্যাঁ সিনোর, দুটো খুলে দিলে কি আর রহস্য থাকে ? সব রহস্যই হচ্ছে অর্ধেকে। এখন বলেন, কী দিয়ে আপনার সেবা করতে পারি।

আমি কোথায় থাকি জানেন ?

জানব না, কী বলেন! ফমি ভিলায়। ঠিক বলেছি তো ?

ঠিক। ঐখানে আপনাদের নাচের মেয়েদের একজনকে আজ রাতে পাঠাবেন।

কিন্তু সেনোর, ওরা ঠিক ঐ ধরনের কাজ করে না। ওরা আসলে নাচতেই এসেছে। ভদ্র পরিবারের মেয়ে, সিনোর।

আপনার শো শেষ হয় ক'টায় ?

এই ধরেন দুটায়, কোনো কোনো রাতে তিনটেও বেজে যায়।

ঠিক আছে, তিনটের পরই পাঠাবেন।

ফসিলো তার সবুজ চোখ দিয়ে অন্যরকম ভঙ্গিতে তাকাল ম্যানেজারের দিকে। ম্যানেজার সঙ্গে সঙ্গে বলল— ঠিক আছে, ঠিক আছে। নিয়ম থাকেই ভাঙার জন্যে। এখন বলুন কোনটিকে পাঠাব ? ভালোমতো দেখেশুনে বলুন।

দেখার সময় নেই আমার। যেটা সবচে' রোগা সেটাকে পাঠাবেন। রোগা মেয়েই আমার পছন্দ।

কিছু পান করবেন না ? খুব ভালো শেরি আছে।

নাহ্।

লক্ষ রাখবেন আমাদের দিকে, সিনোর, আপনাদের ভরসাতেই বিজনেস চালু করা। হে হে হে।

ফসিলো বেরিয়ে এল। রাত প্রায় এগারোটা বাজে। বাড়ি ফেরার আগে ঘণ্টা দুই জুয়া খেলা যেতে পারে। ভাগ্য খুলতে শুরু করেছে কি না তা জুয়ার টেবিলে না-বসা পর্যন্ত বলা যাবে না। মিরান্ডায় একটি ভালো জুয়ার আসর বসে।

ফসিলো গাড়ির দরজা বন্ধ করে চাবির জন্যে পকেটে হাত দিতেই অনুভব করল, তার ঘাড়ের কাছে ধাতব কিছু-একটা লেগে আছে। কাঠ হয়ে বসে রইল ফসিলো।

পেছন থেকে ভারি গলায় কেউ-একজন বলল, যেভাবে বসে আছ ঠিক সেভাবেই বসে থাকো। এক চুলও নড়বে না।

ফসিলো নড়ল না। ঘাড়ের পেছনে রিভলভারের নল লেগে থাকলে এমনিতেই নড়াচড়া বন্ধ হয়ে যায়।

আমি যা বলব ঠিক তা-ই করবে। গাড়ি স্টার্ট দাও। ফসিলো গাড়ি স্টার্ট দিল।

মিলানের বুলেভার দিকে এগিয়ে যাও। রোড নাম্বার ১২ দিয়ে এক্সিট নেবে। তোমার পেছনে যেটা ধরে আছি তার নাম বেরেটা থার্টি টু।

দেখতে দেখতে গাড়ি বারো নম্বর রোডে গিয়ে হাইওয়েতে এক্সিট নিল। ফসিলো মৃদুস্বরে বলল, তুমি যা করছ তার ফলাফল সম্পর্কে তোমার ধারণা নেই সম্ভবত। তুমি বোধহয় জানো না আমি কে?

তুমি এঞ্জেল ফসিলো। বন্ধুরা তোমাকে বিড়াল-ফসিলো বলে।

ফসিলোর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমল। হাত-পা কেমন যেন ঠান্ডা হয়ে আসছে। ফসিলো বুঝতে পারছে না লোকটি কী চায়। উদ্দেশ্য কী? সে বসেছে এমনভাবে যে রিয়ার ভিউ মিররে তাকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না। গলার স্বর শুনে মনে হচ্ছে বিদেশী। একটু টেনে কথা বলছে।

সেন্ট জেনিংসে এক্সিট নেবে।

ফসিলো সেন্ট জেনিংসে এক্সিট নিল। শেষ পর্যন্ত গাড়ি থামল পুরনো ধরনের একটি একতলা বাড়ির সামনে। কোথায় এসেছে ফসিলো মনে রাখতে চেষ্টা করছে। বাড়িটি হালকা হলুদ রঙের, টালির ছাদ। অনেকখানি জায়গা আছে সামনে। এসব খুঁটিনাটি লক্ষ করে লাভ কী? ফসিলোর মনে হলো এ বাড়ি থেকে সে আর ফিরে যেতে পারবে না। নাইট ক্লাবের মেয়েটা হয়তো তার বাড়িতে গিয়ে বসে থাকবে। রোগা একটি মেয়ে যার বয়স খুবই কম। হয়তো ষোলো-সতেরো। ফসিলো বলল, তুমি কী চাও?

লোকটি শীতল স্বরে বলল, বিশেষ কিছু না। কয়েকটা প্রশ্ন করব।

এঞ্জেল কোনো প্রশ্নের জবাব দেয় না।

সেটা দেখা যাবে।

শুয়োরের বাচ্চাদের কী করে শায়েস্তা করতে হয় তাও আমরা জানি।

জানলে ভালোই।

কথা শেষ হবার আগেই ফসিলোর মাথায় প্রচণ্ড শব্দে রিভলভারের হাতল দিয়ে আঘাত করা হলো। ব্যথা বোধ হবার আগেই ফসিলোর কাছে চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল।

জ্ঞান হলো অল্পক্ষণের মধ্যেই। চোখ মেলেই দেখল নাইলন কর্ড দিয়ে তাকে শক্ত করে বাঁধা হয়েছে চেয়ারের সঙ্গে। সামনেই একটি কাঠের টেবিল। টেবিলের উপর দুটি পেতলের আট ইঞ্চি সাইজ পেরেক এবং একটা হাতুড়ি। চেয়ারের উল্টোদিকে যে বসে আছে ফসিলো তাকে চিনতে পারল। এই লোকটাকে সে আগে দেখেছে। বারো বছরের সেই মেয়েটির বডিগার্ড ছিল।

ফসিলো, আমাকে চিনতে পারছো?

ফসিলো জবাব দিল না।

নিশ্চয়ই আশা করো নি তোমার সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে?

কী চাও তুমি ?

বলেছি তো কয়েকটি প্রশ্ন করব।

প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে কোনো লাভ নেই। এঞ্জেল ফসিলোর মুখ থেকে কেউ কিছু বার করতে পারে না।

চেষ্টা করতে দোষ নেই, কী বলো ?

ফসিলো জবাব দিল না। সে দ্রুত নিজের অবস্থা বুঝে নিতে চেষ্টা করছে। সামনে বসে থাকা লোকটা কথাবার্তা বলছে নিরুত্তাপ ভঙ্গিতে। এমন একটা ব্যাপার ঘটছে কিন্তু তার মধ্যে কোনোরকম উত্তেজনা নেই।

ফসিলো, এই পেতলের পেরেকটি দেখতে পাচ্ছ ? এই পেরেকটি এখন আমি তোমার হাতের তালুতে ঢুকিয়ে দেব। তারপর প্রশ্ন শুরু করব। একেকটা প্রশ্ন করবার পর দশ সেকেন্ড সময় দেব। দশ সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর না পাওয়া গেলে একেকটি করে আঙুল কেটে ফেলব।

ফসিলো নিজের কানকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। এইসব কি সত্যি সত্যি ঘটছে ? নাকি কোনো দুঃস্বপ্ন ? ফসিলো কিছু বুঝে ওঠার আগেই লোকটা তার বাঁ হাত টেবিলের ওপর টেনে এনে মুহূর্তের মধ্যে পেরেক বসিয়ে দিল। হাত গেঁথে গেল টেবিলের সঙ্গে। ফসিলো শুধু দেখল একটি হাতুড়ি দ্রুত নেমে আসছে। পরক্ষণেই অকল্পনীয় ব্যথা। যেন কেউ হ্যাঁচকা টান দিয়ে হাত ছিঁড়ে নিয়েছে। ফসিলো জ্ঞান হারাল।

ফসিলোর জ্ঞান ফিরতে সময় লাগল। তার অবস্থা ঘোর-লাগা মানুষের মতো। এসব কি সত্যি সত্যি ঘটছে ? হাত কি সত্যি সত্যি পেরেক দিয়ে লাগিয়ে দেয়া হয়েছে টেবিলে ? ফুলে-ওঠা হাত, উপরে জমে-থাকা চাপ-চাপ রক্ত দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না। শুধু যখন একটু নড়াচড়াতেই অকল্পনীয় একটা ব্যথা সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে তখনই মনে হয় এটি সত্যি সত্যি ঘটছে।

সামনের টেবিলে বসে-থাকা লোকটা নির্বিকার ভঙ্গিতে সিগারেট টানছে যেন কিছুই হয়নি। লোকটির হাতে নোটবই আর কলম।

ফসিলো, তোমাকে এখন প্রশ্ন করতে শুরু করব। মনে রাখবে প্রশ্ন করার ঠিক দশ সেকেন্ডের মধ্যে উত্তর চাই। প্রথম প্রশ্ন, অ্যানিকে কিডন্যাপ করবার জন্যে কে পাঠিয়েছিল তোমাদের ?

বস ভিকানডিয়া।

তোমরা ক'জন ছিলে ?

পাঁচজন। দুজনকে তুমি মেরে ফেলেছিলে।

যে-তিনজন বেঁচে আছে তাদের একজন তুমি। বাকি দুজন কে ?

উইয়ি ও নিওরো।

ওদেরকে কোথায় গেলে পাওয়া যাবে ?

ফসিলো চারটি ঠিকানা বলল। কখন গেলে ওদের পাওয়া যাবে তা বলল। ওদের সঙ্গে কীসব অস্ত্রশস্ত্র থাকে তাও বলল।

ঐ মেয়েটিকে তুমি রেপ করেছিলে ?

ফসিলো হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়ল।

ক'বার ?

ফসিলো উত্তর দিল না।

বলো ক'বার ?

বেশ কয়েকবার।

তোমার সঙ্গীরাও ?

হ্যাঁ।

এরকম করার নির্দেশ ছিল তোমাদের ওপর ?

না। আসলে সমস্ত ব্যাপারটাই এলোমেলো হয়ে গেছে। র‍্যানসমের টাকার ব্যাপারে কীসব ঝামেলা হয়েছে। মেয়েটাকে বেশ কিছুদিন রাখতে হলো। এর মধ্যে একদিন এতরা ওকে রেপ করল। আমরা ভাবলাম একবার যখন হয়েই গেছে... তার ওপর মেয়েটি ছিল অসম্ভব রূপসী।

মেয়েটির মৃত্যুর পর বস ভিকানডিয়া কী করল ?

বস খুব রাগলেন।

শুধুই রাগলেন ?

আমাদের প্রত্যেকের ত্রিশ হাজার লিরা করে পাওয়ার কথা। আমরা ওটা পাইনি।

বলো, এখন তোমার বসের কথা বলো।

কী জানতে চাও ?

তুমি যা জানো সব বলো। ভিকানডিয়াই কি এখন সবচে' শক্তিশালী ?

হ্যাঁ।

কারা কারা ওর ডানহাত ?

ফসিলোর কথা জড়িয়ে যেতে শুরু করছে। হাতের ব্যথা ছড়িয়ে পড়ছে সারা শরীরে। ফসিলো বলল, তুমি আমাকে নিয়ে কী করবে ?

মেরে ফেলব।

কীভাবে মারবে ?

তুমি আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিয়েছ কাজেই তোমাকে সামান্য করুণা করব। কীভাবে তুমি মরতে চাও সেটা বলো। সেইভাবে ব্যবস্থা করব।

ফসিলো কিছু বলতে পারল না। তার মুখ দিয়ে ফেনা বেরুতে লাগল। আরো কিছুক্ষণ পর বেরটা থার্টি টু থেকে একটি বুলেট ফসিলোর মাথার একটি বড় অংশ উড়িয়ে দিল।

হ্যালো, তুমি কে ?

চিনতে পারছ না ? আমার নাম জামশেদ।

কী চাও তুমি ?

তোমাকে একটা খবর দিতে চাই। এঞ্জেল ফসিলোকে চেন ?

এতরা জবাব দিল না।

ওকে মেরে ফেলা হয়েছে।

আমাকে এসব শোনাচ্ছ কেন ?

ভাবলাম তোমার কাছে খবরটা ইন্টারেস্টিং মনে হতে পারে। তাছাড়াও আমি আরেকটি জিনিস জানতে চাই। অ্যানির কিডন্যাপিং পরিকল্পনাটি কি তোমার ?

এতরা টেলিফোন নামিয়ে রাখল। সে ভেবেছিল আবার রিং হবে। কিন্তু কেউ রিং করল না। শুধু দুপুরবেলা মায়ের টেলিফোন এলো— এতরা, ঐ স্বপ্নটা আমি আবার দেখেছি।

কী স্বপ্ন ?

ঐ যে তুমি একটা রাস্তা দিয়ে উলঙ্গ হয়ে দৌড়াচ্ছ। আর তোমার পেছনে পেছনে একজন লোক ভোজালি নিয়ে ছুটি আসছে।

ও।

তুমি কি কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছ ?

না।

চার্চে যাবার কথা মনে আছে ?

আছে, আছে।

এতরা টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

রিনালো পুলিশের হমিসাইডের লোক। অনেক ধরনের বিকৃত মৃতদেহ দেখে তার অভ্যেস আছে। তবুও ফসিলোর লাশের সামনে সে ভ্রু কুঁচকে দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে রইল। খুনটা করা হয়েছে অত্যন্ত ঠাণ্ডা মাথায়। হাতের তালুতে পেরেক বসিয়ে দেবার ব্যাপারটি তাকে ভাবাচ্ছে। মাফিয়াদের দলগত বিরোধ শুরু হলো ? হলে মন্দ হয় না। নিজেরা নিজেরা খুনোখুনি করে মরুক। কিন্তু ব্যাপারটা সেরকম নাও হতে

পারে। ফসিলোর হাতে বসানো পেরেক দেখে মনে হয় কেউ তার কাছ থেকে কথা আদায় করতে চেয়েছে। কিন্তু ফসিলো এমন কোনো ব্যক্তি নয় যার কাছে মূল্যবান খবর আছে। সে ভিকানডিয়ার একজন অনুগত্য ভৃত্য মাত্র।

রিনালো নোটবই খুলে দুটো পয়েন্ট লিখে রাখল। এক, পেট্রোল পুলিশকে সতর্ক করে দিতে হবে। যদি এই খুনটা মাফিয়াদের দলগত বিরোধ থেকে হয়ে থাকে তা হলে অল্প সময়ের মধ্যে বেশকিছু খুনোখুনি হবে। দুই, ভিকানডিয়ার কাছে যত টেলিফোন এখন থেকে যাবে ও আসবে সবগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। এটা খুব জরুরি। দলের কেউ মারা পড়লে বসদের টেলিফোনের সংখ্যা খুব বেড়ে যায়। অধিকাংশ কলই হয় অর্থহীন ধরনের। তবু তার মধ্যেও অনেক খবরাখবর থাকে।

রিনালো সন্ধ্যার দিকে ভিকানডিয়ার ভিলায় টেলিফোন করল। রিনালোকে জানানো হলো ভিকানডিয়া ঘরে নেই। কোথায় আছে তাও জানা নেই। রিনালো বলল, আমি হমিসাইডের একজন ইন্সপেক্টর, আমার নাম রিনালো।

ও আপনি! ধরুন, দেখি উনি আছেন কি না।

ভিকানডিয়ার মধুর গলা পাওয়া গেল সঙ্গে সঙ্গে।

কে বলছেন ?

আমি রিনালো, হমিসাইড ইন্সপেক্টর।

বড় আনন্দিত হলাম। কিন্তু কী করতে পারি আপনার জন্যে ?

ফসিলো মারা গেছে শুনেছেন ?

কোন ফসিলো ?

এঞ্জেল ফসিলো।

মারা গেছে ? আহা! মৃত্যু বড় কুৎসিত জিনিস, মিস্টার রিনালো।

তা ঠিক। খবরটা কি আপনি আমার কাছ থেকেই প্রথম শুনলেন, না আগেই শুনেছেন ?

আগেই শুনেছি।

ভিকানডিয়া, আপনি কি এই ধরনের আরো মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন ?

মৃত্যু একটি বাজে ব্যাপার, মিস্টার রিনালো। কিন্তু আমরা সবাই মারা যাই। তাই নয় কি ?

আপনি আমার কথার জবাব দেননি। এই ধরনের আরো মৃত্যুর আশঙ্কা করছেন কি ?

আশা ও আশঙ্কা এই দুটো জিনিস নিয়েই তো আমরা সবাই বাঁচি।

রিনালো টেলিফোন নামিয়ে রাখল। এই ধরনের কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া মুশকিল। এদিক দিয়ে ক্যানটারেলার কথাবার্তা সহজ স্বাভাবিক। বাড়তি দার্শনিকতা নেই। প্রশ্নের জবাব দিতে কোনোরকম দ্বিধা নেই।

ক্যানটারেলা, এই ধরনের হত্যাকাণ্ড কি আরো হবে?

মনে হয় না, মি. রিনালো। এটা দলগত কোনো বিরোধ নয়।

আপনি কি এই ব্যাপারে পুরোপুরি নিশ্চিত?

মোটামুটিভাবে নিশ্চিত। বস ভিকানডিয়ার বয়স হয়েছে। তিনি এখন সবরকম বিরোধ এড়িয়ে চলেন।

কারো সঙ্গেই তার কোনো বিরোধ নেই বলতে চান?

বিরোধ নেই তা নয়, তবে যে-ক'টা বড় ফ্যামিলি এখন আছে তাদের সবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো।

তাহলে আপনার ধারণা এই হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে বড় ফ্যামিলির স্বার্থ জড়িত নয়?

সেরকমই ধারণা। অবিশ্যি আমার ধারণা ভুলও হতে পারে।

আচ্ছা ঠিক আছে।

আর কিছু জিজ্ঞেস করবার নেই আপনার?

আপাতত না।

ভালো কথা, মেয়েমানুষের ব্যাপারে আপনার উৎসাহ আছে? আমার জানামতে কয়েকটি মেয়ে আছে, সঙ্গিনী হিসেবে ওদের তুলনা নেই। ভারতীয় মেয়ে। জানেন তো ভারতীয় মেয়েরা কেমন মধুর স্বভাবের হয়।

এইসব বিষয়ে আমার তেমন কোনো উৎসাহ নেই।

বলেন কী! পুলিশে চাকরি করলেই একেবারে শুষ্কং কাষ্ঠং হতে হবে এমন তো কোনো কারণ নেই। তাছাড়া যেসব মেয়ের কথা বলছি ওরা লাইসেন্সড গার্লস। বেআইনি কোনো ব্যাপার নেই।

রিনালো টেলিফোন নামিয়ে রাখল। একজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে এজাতীয় কথাবার্তা বলার ব্যাপারে ওদের কোনো দ্বিধা-সংকোচ নেই এটাই আশ্চর্য। তারচেয়েও বড় আশ্চর্য, এদের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দাঁড় করানো যায় না। কেউ ওদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে না। প্রমাণ জোগাড় করা যাবে না। এরা আইনের ধরাছোঁয়ার বাইরের একটি সম্প্রদায়ে পরিণত হয়ে পড়েছে।

রিনালো ছোট্ট একটি নিশ্বাস ফেলল।

মেয়েটির নাম নিমো। বয়স সতেরো-টতেরো হবে কিন্তু দেখায় আরো কম। রাত দশটার মতো বাজে। এমন কিছু রাত নয়, কিন্তু চারদিক চুপচাপ হয়ে গেছে। অঞ্চলটি শহরের উপকণ্ঠে। লোকচলাচল কম। বাংলো প্যাটার্নের এই বাড়িটির চারদিকে উঁচু দেয়াল। দু'জন রক্ষী পাহারা দেয় পালা করে। এই বাড়িটির সঙ্গে

বাইরের যোগাযোগ নেই বললেই হয়। কিন্তু নিমোকে সে ব্যাপারে খুব একটা উদ্বিগ্ন মনে হয় না। এরকম বন্দিজীবন মনে হয় তার ভালোই লাগছে।

খুটখুট করে টোকা পড়ল দরজায়।

নিমো বলল, কে ? কোনো জবাব পাওয়া গেল না। উইয়ি এসে গেছে নাকি ? উইয়ি সাধারণত রাত এগারোটার দিকে এসে বাকি রাতটা কাটায়। আজ একটু সকাল-সকাল এসে পড়ল নাকি ? নিমো আবার বলল, কে, উইয়ি ? খুট খুট করে দুবার শব্দ হলো কিন্তু কেউ জবাব দিল না। রক্ষীদের কেউ এসেছে কি ? কিন্তু ওদের কি এত সাহস হবে ? উইয়ির কঠিন আদেশ আছে যেন ওরা বাড়ির কম্পাউন্ডের ভেতর না ঢোকে। সে-আদেশ অমান্য করবার সাহস ওদের হবে না। কিন্তু মাঝে মাঝে সবারই কি একটু-আধটু আদেশ অমান্য করতে ইচ্ছে করে না ? নিমোর তো সব সময়ই ইচ্ছে করে। আচ্ছা, রক্ষীদের কেউ যদি হয় তাহলে দরজা খোলামাত্র ভয়ানক অবাক হবে। ওরা নিশ্চয়ই স্বপ্নেও ভাবেনি সম্পূর্ণ নগ্নদেহের একটি মেয়ে দরজা খুলে দেবে। এরকম দৃশ্য শুধু স্বপ্নেই দেখা যায়। বাস্তবে দেখা যায় না। নিমো হাসিমুখে দরজা খুলে দিল।

দরজার ওপাশে অপরিচিত একজন লোক রিভলভার উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। নগ্নদেহের নিমোকে দেখে তার কোনো ভাবান্তর হলো না। ভারি গলায় বলল, অসময়ে তোমাকে বিরক্ত করছি। খুবই লজ্জিত। কোনোরকম চ্যাঁচামেচি করবে না।

নিমো কোনো শব্দ করল না। লোকটা ঘরে ঢুকে পড়ল।

নিমো মৃদুস্বরে বলল, তোমার নাম কী ?

জাম্‌স্। জামশেদ।

তুমি কী চাও ? আমার সঙ্গে কোনো টাকাপয়সা নেই।

আমি টাকাপয়সার জন্যে আসিনি।

তা হলে কীজন্যে এসেছ ? আমার সঙ্গে বিছানায় যাবার জন্যে ?

না।

নিমো দেখল লোকটা তার দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না।

তুমি ঢুকলে কীভাবে ?

ঢুকতে খুব একটা অসুবিধে হয়নি।

নিমো দেখল লোকটার মুখে ছোট্ট একটা হাসি। এর মধ্যে হাসির কী আছে ?

কী চাও তুমি ?

তোমার কাছে উইয়ি নামের যে-লোকটি আসবে ওর মাথায় আমি বেরেটা থার্টি টুর তিনটি বুলেট ঢুকিয়ে দেব। সেজন্যেই এসেছি।

উইয়ি যে এখানে আসে তা তো তোমার জানার কথা নয়।

নিমো আবার লক্ষ করল, লোকটির মুখে হালকা একটু হাসি।

উইয়িকে মারতে চাও কেন ?

ও বারো বছরের একটি মেয়েকে রেপ করে মেরে ফেলেছে। মেয়েটার নাম অ্যানি।

নিমোর মুখ সাদা হলে গেল। কী বলছে এই লোক ? নিমো চাপাস্বরে বলল, উইয়ি এরকম হতেই পারে না।

তুমি কি উইয়ির স্ত্রী ?

না। তবে আমরা শিগগিরই বিয়ে করব। তুমি হাসছো কেন ? এর মধ্যে হাসির কী আছে ?

তোমার মতো বেশ কয়েকটা মেয়ে আছে উইয়ির। ওদের সবাই হয়তো জানে উইয়ির সঙ্গে তাদের বিয়ে হবে।

নিমো জবাব দিল না। লোকটি একটি সিগারেট ধরাল, আর ঠিক তখনই বাড়ির সামনে থামল বড় একটি গাড়ি। সিগারেট অ্যাশট্রেতে গুঁজে দিল লোকটি।

এই মেয়ে, শোনো। তুমি সব সময় যেভাবে দরজা খোলো ঠিক সেইভাবেই খুলবে। খোলামাত্রই চেষ্টা করবে প্রথম সুযোগেই দূরে সরে যেতে।

আর যদি দূরে না সরি ? যদি উইয়িকে জড়িয়ে ধরে থাকি ?

তা হলে তোমাদের দুজনকে গুলি করব।

কী ঠান্ডা কণ্ঠস্বর! কোনো সন্দেহ নেই এই লোক দুজনকে মারতে তিলমাত্র দ্বিধা করবে না। নিমো দেখল লোকটা দরজা বন্ধ করে বাঁদিকের ড্রেসিংটেবিলের কাছে সরে গেছে। উইয়ির ভারী পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। নিমোর ইচ্ছা হলো প্রাণপণে চেঁচিয়ে উইয়িকে সাবধান করে। কিন্তু তার গলা দিয়ে কোনো স্বর বেরুল না। উইয়ি যখন দরজার টোকা দিয়ে বলল, 'কোথায় আমার ময়না পাখি, দেখন হাসি।' তখন সে অন্যদিনের মতোই দরজা খুলে দিল। উইয়ি ঘরে ঢুকল নিমোকে জড়িয়ে ধরে। আর সেই সময় একটা ভারী গলার স্বর শোনা গেল, ভালো আছ, উইয়ি ? আমাকে চিনতে পারছো আশা করি ?

উইয়ি নিমোকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত হাত ঢোকাল প্যান্টের পকেটে আর তখনই পরপর তিনবার গুলি হলো।

নিমো কিছু বুঝতে পারছে না। সবকিছু স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। সে দেখছে উইয়ির প্রকাণ্ড দেহটা খাটের পাশে কাত হয়ে পড়ে যাচ্ছে। বিদেশী লোকটা কী যেন বলছে তাকে। কী বলছে ? সবকিছু অস্পষ্ট ধোঁয়াটে।

এই মেয়ে তুমি কাপড় পরে নাও। পুলিশ আসবে এক্ষুনি। ওদের সামনে এরকম ন্যাংটো অবস্থায় বের হওয়া ঠিক হবে না।

লোকটা বাতি নিভিয়ে অন্ধকারে বের হয়ে গেল। খুব ছুটাছুটি হচ্ছে বাইরে। রক্ষী দুজন দৌড়ে আসছে সম্ভবত। উইয়ির গাড়িতেও যে একজন দেহরক্ষী সব সময় থাকে সেও ছুটে আসছে। নিমোর মনে হলো সে এখন প্রচুর গোলাগুলি শুনবে। কিন্তু সেরকম কিছুই শুনল না। সে কি জ্ঞান হারাচ্ছে? উইয়ির পড়ে-থাকা বিরাট শরীরের দিকে তাকিয়ে মুখভরতি করে বমি করল। গা গুলাচ্ছে। ঘরবাড়ি কেমন যেন দুলছে। নিমো দ্বিতীয়বার বমি করল।

রিনালোর অফিসঘরটি ঠান্ডা। এয়ারকুলার আছে। তার ওপর একটি ফ্যান ঘুরছে। তবু নিমো ঘামতে লাগল।

পুলিশি ব্যাপারে নিমোর কোনো পূর্ব অভিজ্ঞতা নেই। ভাসাভাসা একটি ধারণা যে পুলিশ অফিসাররা নির্দয় প্রকৃতির হয় এবং উল্টোপাল্টা প্রশ্ন করে সহজেই ফাঁদে ফেলে দেয়। কিন্তু এই অফিসারের বয়স অল্প এবং সে প্রশ্ন করছে খুবই আন্তরিক ভঙ্গিতে। কফি খেতে দিয়েছে। কথা বলছে নরম গলায়, যদিও কথাগুলোর শুনতে তার মোটেও ভালো লাগছে না।

তুমি কি একজন প্রোসটিটিউট?

জি-না।

না বলছ কেন? তুমি তো থাকছিলে রক্ষিতার মতো। উইয়ির হাতে পড়বার আগেও অনেক পুরুষের সঙ্গে থেকেছ। থাকোনি?

নিমো চুপ করে রইল।

তুমি কি জানতে উইয়ি পতিতাবৃত্তির একটা বড় অংশ পরিচালনা করে?

না।

উইয়ির সঙ্গে যেসব মেয়ে থাকে তারা পরে বিভিন্নরকম পতিতাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে বা পড়তে বাধ্য হয় এটা তুমি জানতে না?

জি না। উইয়ি আমাকে বিয়ে করবে বলেছিল।

তা কি তুমি এখনো বিশ্বাস করো?

আমার বিশ্বাস অবিশ্বাস উইয়ি বেঁচে থাকলে প্রমাণ হতো। সেটা তো এখন প্রমাণ করবার কোনো পথ নেই।

যে-লোকটা উইয়িকে মারল সে একজন বিদেশী?

হ্যাঁ।

কী করে বুঝলে?

টেনে টেনে কথা বলছিল। তার চেহারাও বিদেশীদের মতো। নামটাও সেরকম।

সে তোমাকে তার নাম বলেছে?

হ্যাঁ।

কী নাম ?

আমার মনে নেই।

সে বলেছে অ্যানির মৃত্যুর জন্যে সে শাস্তি দিচ্ছে ?

হ্যাঁ।

আচ্ছা, সে কি তার নাম জামশেদ বলেছে ?

আমার মনে পড়ছে না।

লোকটার কোনো বৈশিষ্ট্য তোমার মনে পড়ে ?

লোকটি খুবই ঠান্ডা মাথায় সমস্ত ব্যাপারটা ঘটাল। সে এতটুকুও উত্তেজিত ছিল না।

গুলি করবার আগে লোকটি কোনো কথাবার্তা বলেছে ?

বলেছে, কিন্তু আমার মনে নেই।

এই জাতীয় হত্যাকাণ্ড সে আরো করবে কি না তা বলেছে ?

আমার মনে পড়ছে না।

কফি খাও। কফি ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে।

নিমো কফিতে চুমুক না দিয়ে তার কপালের ঘাম মুছল।

ভিকি খবরের কাগজের প্রথম পাতায় ছাপা খবরটার অর্থ ঠিক বুঝতে পারল না। তাকে দ্বিতীয়বার খবরটি পড়তে হলো। শিরোনাম হচ্ছে 'একক যুদ্ধ'। অসীম সাহসী একজন প্রৌঢ় যার নাম জামশেদ, সে একাকী যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এমন সব অপরাধীর বিরুদ্ধে, যাদের পুলিশ কিছুই বলে না বা বলবার ক্ষমতা রাখে না। বেশ বড় খবর। সেখানে অ্যানির মৃত্যু-প্রসঙ্গ আছে। এবং ভয়ঙ্কর দুজন অপরাধী যারা অল্প কিছুদিনের ভেতর মারা গেল তাদের কথাও আছে। নিমো নামের মেয়েটার ক্ষুদ্র একটি সাক্ষাৎকারও আছে।

ভিকি দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে রইল চেয়ারে। আজ ছুটির দিন, রুনকে নিয়ে তার বে ল্যান্ডে যাবার কথা। সেখানে একটি ছোট্ট কটেজ ভাড়া নেয়া হয়েছে। কিন্তু ভিকির আর যেতে ইচ্ছে করছিল না। ইচ্ছে করছিল, রুনকে পাশে বসিয়ে অ্যানির পুরনো দিনের ছবিগুলি দেখে। কিংবা কবরখানায় গিয়ে অ্যানির ছোট্ট কবরটিতে কিছু ফুল দিয়ে আসে। ফুলের সঙ্গে থাকবে এই খবরের কাগজটি, যেখানে অনাত্মীয় একটা বিদেশীর কথা আছে। যে ছোট্ট অ্যানির ভালোবাসার উত্তর দিতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। ভিকির চোখ দিয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। রুন ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে বলল, কী হয়েছে ?

এই খবরটা পড়ো।

রুন নিঃশব্দে পড়ল। তার চেহারা দেখে মনে হলো না তার কোনো ভাবান্তর হয়েছে। ভিকি মৃদুকণ্ঠে বলল, বে ল্যান্ডে যাবে আজ ?

নাহ্।

কী করবে ? সিমেট্রিতে যাবে ?

নাহ্। বলেই অনেকদিন পর গভীর ভালোবাসায় রুন তার স্বামীকে জড়িয়ে ধরল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমার মেয়ে আর অন্ধকার কফিনে শুয়ে শুয়ে কাঁদবে না। অন্তত একজন তার ভালোবাসার সম্মান রেখেছে। আমার মামণির আজ খুব আনন্দের দিন।

রিনালো অফিসে এসেই শুনল তাকে ক'বার টেলিফোনে খোঁজ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে অফিসে পৌঁছামাত্রই যেন সে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে। বিশেষ প্রয়োজন। রিনালো দেখল নাম্বারটা অপরিচিত। কে হতে পারে ? ডায়াল ঘোরানো মাত্রই মৃদু স্বর শোনা গেল, ভিকানডিয়া বলছি।

আমি রিনালো, কী ব্যাপার ?

আজকের খবরের কাগজ দেখেছেন, মি. রিনালো ?

হ্যাঁ।

বিশেষ কোনো খবর আপনার চোখে পড়েছে কি ?

কোনটির কথা বলছেন ? লাওসের হাঙ্গামা ?

না। লাওস নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। আপনি কি দেখেননি খবরের কাগজের লোকরা কীভাবে একজনকে হিরো বানিয়ে ছেড়ে দিয়েছে ?

জামশেদের কথা বলছেন ?

হ্যাঁ।

দেখেছি। কিন্তু এ ব্যাপারে আমাকে টেলিফোন করবার কারণটা ঠিক ধরতে পারছি না।

আপনার কি মনে হয় না ব্যাপারটা নিয়ে একটু বেশি বাড়াবাড়ি করা হচ্ছে ?

আপনি ভুল জায়গায় টেলিফোন করছেন। আমি খবরের কাগজের লোক নই।

মি. রিনালো, আমি ঠিক জায়গাতেই টেলিফোন করেছি।

তার মানে ?

আপনি নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন কোনো কাগজেই এত বড় একটা হিরোর কোনো ছবি ছাপা হয়নি। এবং আমি যতদূর জানি পুলিশ বিভাগ ছবি ছাপাতে নিষেধ করেছে।

পুলিশ বিভাগের স্বার্থ ?

লোকটা বিদেশী। ছবি ছাপা হলেই সে পরিচিত হয়ে পড়বে। দ্রুত ধরা পড়বে। আপনারা চান না সে ধরা পড়ুক।

আপনার এরকম অনুমানের কোনো ভিত্তি আছে কি ?

কিছুটা আছে। আমরা ওর ছবি দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে চেয়েছিলাম। পত্রিকাওয়ালারা সেটা ছাপতে রাজি নয়। 'অপরাধীকে ধরিয়ে দিন' এই শিরোনামে বিজ্ঞাপন।

আপনারা এই জাতীয় বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছেন ?

বিজ্ঞাপনটা দেয়া হয়েছিল উদ্বিগ্ন জনসাধারণের নামে।

ও, তা-ই বুঝি ?

হ্যাঁ, মি. রিনালো। আমরাও জনগণ। ট্যাক্স দিয়ে বাস করছি।

মি. ভিকানডিয়া!

বলুন।

আমার কেন জানি ধারণা হচ্ছে, এই একটা লোকের জন্যে আপনারা কিছুটা বিচলিত হয়েছেন।

মোটেই না। পত্রিকাওয়ালারা জিনিসটাকে একটা সেন্টিমেন্টাল রূপ দিতে চাচ্ছে, সেখানেই আমার আপত্তি।

লোকটা কিন্তু সহজ পাত্রও নয়, মি. ভিকানডিয়া।

আড়াল থেকে গুলি করার মধ্যে কোনো বাহাদুরি দেখি না।

বাহাদুরি দেখানোর তার কোনো ইচ্ছাও বোধহয় নেই। ভালো কথা, আপনি এখনো হয়তো খবর পাননি, নিওরোর মৃতদেহ পাওয়া গেছে।

কী বলছেন ?

নিওরো, যে অ্যানির কিডন্যাপিং-এ জড়িত ছিল, তার ডেডবডি পাওয়া গেছে। বুলেটের সাইজ থেকে মনে হয় সেটা বেরেটা থার্টি টু জাতীয় অস্ত্র থেকে এসেছে।

কখন পাওয়া গেছে ডেডবডি ?

অল্প কিছু আগে। ঘণ্টাখানেক হবে।

বস ভিকানডিয়া দীর্ঘ সময় চুপ থেকে বলল, আপনাকে খুব খুশি মনে হচ্ছে।

পুলিশের লোক সহজে খুশি হয় না, অখুশিও হয় না।

জামশেদকে ধরবার কী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে ?

এসব পুলিশের ব্যাপার। ও নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ না-করাই ভালো।

আমার মনে হচ্ছে পুলিশ ওকে ধরবার কোনোরকম চেষ্টাই করছে না। করছে কি ?

রিনালো শব্দ করে হাসল। জবাব দিল না।

হ্যালো রিনালো!

রিনালো টেলিফোন নামিয়ে রাখল।

প্রতিটি প্রভাতী সংবাদপত্রের প্রথম পাতায় নিওরোর মৃত্যুসংবাদ ছাপা হলো। ছবি ছাপা হলো অ্যানির। অ্যানির হত্যাকাণ্ড ও মৃত্যুর সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিরা কীভাবে সাজা পাচ্ছে সে-বিবরণ লেখা হলো। শুধুমাত্র জামশেদের কোনো ছবি নেই। তার চেহারার কোনো বিবরণও নেই। একটি পত্রিকায় পোস্ট এডিটরিয়েল লেখা হলো জামশেদকে নিয়ে। সম্পাদক লিখলেন— আমরা আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া কখনো সমর্থন করি না। যারা আইন নিজের হাতে নেয় তারা আমাদের কাছে অপরাধী। কিন্তু যখন দেখি বিচারের বাণী নীরবে কাঁদে, আইন অপরাধীদের স্পর্শ করে না তখন ব্যথিত হই। সে-সময় কোনো সাহসী মানুষ যদি আইন নিজের হাতে তুলে নেয়, তখন তাকে সমর্থন না করলেও একধরনের শ্রদ্ধা ও মমতা বোধ করি তার জন্যে। সেও অপরাধী। কিন্তু অপরাধী হলেও তাকে ঘৃণা করতে আমাদের বিবেক সায় দেয় না। আমরা আশা করছি আমাদের জীর্ণ পুলিশবাহিনী জামশেদের ঘটনা থেকে একটা বড় শিক্ষা গ্রহণ করবে। তাদের ভবিষ্যৎ কর্মধারা এরকম হবে যেন আমাদের অপরাধীদের ওপর আস্থা স্থাপন করতে না হয়।

লা বেলে পত্রিকায় আরেকটি মজার খবর ছাপা হলো। দুটি নাগরিক কমিটি বৈঠকে বসে ঠিক করেছে, জামশেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে তারা সবরকম সাহায্য দেবে। বৈঠকের শেষে তারা জামশেদের জন্যে বিশেষ প্রার্থনার ব্যবস্থা করেছে।

শহরে এখন অনেক গাড়ি দেখা যেতে লাগল যেগুলোর গায়ে নতুন ধরনের সব স্টিকার, 'জামশেদ, আমরা আছি তোমার সাথে', 'তুমি চালিয়ে যাও, জামশেদ' 'এই গাড়িটিতে জামশেদের জন্যে একটি আসন আছে'।

সকাল থেকেই মেঘ করেছিল।

দুপুরের দিকে ঝুমঝুম করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। এতরা একবার ভাবল আজ আর মা'র কাছে যাবে না। টেলিফোনে খোঁজ নেবে। এই ভাবনা অবিশ্যি বেশিক্ষণ স্থায়ী হলো না। আজ মঙ্গলবার মা'র কাছে না গেলেই নয়। এতরা বিরক্তমুখে গাড়ি বের করতে বলল। দিনকাল এমন হয়েছে হুটহাট করে কোথাও যাওয়া যায় না। তিন-চারজন দেহরক্ষী সঙ্গে রাখতে হয়। গাড়িতে বসতে হয় মাথা নিচু করে। সব সময় একটা আতঙ্ক। এরকম অবস্থায় মানুষ থাকতে পারে ? সবচেয়ে ভালো হয় মাসখানেকের জন্যে অন্য কোথাও চলে গেলে। এর মধ্যে নিশ্চয়ই সব ঝামেলা মিটে যাবে। একটিমাত্র মানুষ কী করে এরকম একটা ঝামেলা সৃষ্টি করে কে জানে! খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। অবিশ্যি ক্যানটারেলা বলেছে তিনদিনের মাথায় লোকটিকে খুঁজে

বের করা হবে। এবং জীবিত অবস্থায় চামড়া তুলে নিয়ে সমুদ্রের নোনা জলে গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে রাখা হবে। ক্যানটারেলার কথায় বিশ্বাস করা যায়, এরা ফালতু কথা কম বলে।

এতরা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই নিচে থেকে একজন চেঁচিয়ে বলল, স্যার, আমরা তিনজনই কি সঙ্গে যাব ?

হ্যাঁ।

তাহলে কুকুর সামলাবার জন্যে কেউ থাকবে না। কুকুর দুটো কি চেইন দিয়ে আটকে রাখব ?

রাখো। সবকিছুই আমাকে জিজ্ঞেস করছো কেন ? নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে কাজ করবে।

এতরা ভ্রু কুঞ্চিত করল। যে-তিনজন দেহরক্ষী রাখা হয়েছে তাদের বুদ্ধিবৃত্তি নিম্নস্তরের বলেই এতরার ধারণা। সারাক্ষণ কাথাবার্তা বলছে। ফুর্তিবাজের ভঙ্গি। কোথাও যখন বের হয় এমন ভাব করে যেন পিকনিকে যাচ্ছে। ইডিয়েটস। এতরা ভারী গলায় বলল, কুকুর বাঁধা হয়েছে ?

জি স্যার।

ভালো করে বাঁধো। আর শোনো, দিনেরবেলা এরা যেন বাঁধা থাকে। এদের ছাড়বে সন্ধ্যা সাতটার পর। বুঝতে পারছো ?

খুব পারছি, স্যার।

এতরা বিষণ্ন ভঙ্গিতে নিচে নেমে এল। কুকুর দুটো তাকে দেখামাত্র গোঁগোঁ শব্দে একটা রাগী আওয়াজ করল। এতরার ভ্রু দ্বিতীয়বার কুঞ্চিত হলো। এই কুকুর দুটোকে সে পছন্দ করে না। এদের শীতল চোখের দিকে তাকালেই এতরার কেমন যেন দম বন্ধ হয়ে আসে। এরকম একটা ভয়াবহ জীবকে মানুষের বন্ধু নাম দেয়ার কী মানে ? এতরা ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল। সময়টা তার খারাপ যাচ্ছে। যেসব জিনিস সে পছন্দ করে না, তার চারপাশেই এখন সেসব জিনিস। অটোম্যাটিক অস্ত্র-হাতে কয়েকজন নির্বোধ অথচ ভয়াবহ মানুষ। দুটো হিংস্র কুকুর যারা মনিবকে দেখে গোঁগোঁ গর্জন করে। কোনো মানে হয় ?

এতরার মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। তার মুখ হাসিহাসি, এর মানে ঘরে কেউ লুকিয়ে নেই। তবু একটা ক্ষীণ সন্দেহ থেকে যায়। হয়তো সাবমেশিনগান হাতে জামশেদ নামের কুকুরটা ঘাপটি মেরে বসে আছে রান্নাঘরে। বিচিত্র কিছুই নয়। ওই কুকুরটার পক্ষে সবই সম্ভব। এতরা ক্ষীণস্বরে বলল, তোমরা দুজন গিয়ে ভালো করে খুঁজে দেখবে, কেউ কোথাও লুকিয়ে আছে কি না। তারপর গাড়িতে বসে না থেকে বাড়ির চারপাশে ঘুরবে। চোখকান খোলা রাখবে।

বৃষ্টি পড়ছে সিনোর।

পড়ুক।

দুজন গম্ভীরমুখে নেমে গেল। কী বিরক্তিকর অবস্থা! স্বাধীনভাবে চলাফেরা করা যায় না। সারাক্ষণ একটা দম-বন্ধ-করা আতঙ্ক। এরকম কিছুদিন চললে পাগল হয়ে যেতে হবে।

এতরার মা ব্যাপারস্যাপার দেখে খুবই অবাক। হচ্ছে কী এসব?

কিছুই হয়নি। একটু সাবধানে চলাফেরা করছি। এতে অবাক হবার কী আছে?

হঠাৎ করে এত সাবধানতারই-বা কী আছে?

এতরা জবাব দিল না। মুখ কালো করে বসে রইল।

আমার মনে হয় তোমার ওজনও কমেছে। দশ পাউন্ড ওজন কমেছে।

ওজন ঠিক আছে।

মোটেই ঠিক নেই। আমি ওজনের যন্ত্র আনছি, মেপে দ্যাখো।

থাক, মাপতে হবে না।

অবশ্যই হবে। কথার ওপর কথা বলবে না। যা বলছি করো।

বুড়ি ওজনের যন্ত্র নিয়ে এল। দেখা গেল সত্যি আট পাউন্ড ওজন কম।

সাতদিনে আট পাউন্ড ওজন কমেছে, এর মানে কী?

কমেছে, আবার বাড়বে। এই নিয়ে এত হৈচৈ কেন?

ইদানীং তোমার কোনো শত্রু তৈরি হয়েছে কি?

নাহ্।

ঠিক করে বলো।

দু'একজন হয়তো আছে, সে তো সবারই থাকে। দুষ্ট লোকের অভাব আছে নাকি পৃথিবীতে!

তা ঠিক।

বুড়ি কফি তৈরি করতে লাগল। ক্রিম মেশাতে মেশাতে আড়চোখে দু'একবার তাকাল ছেলের দিকে। এতরার চোখে কেমন যেন দিশাহারা ভাব। বুড়ি কফির কাপ নামিয়ে রেখে বলল, পৃথিবীতে ভালো লোকও আছে।

আছে নাকি?

হ্যাঁ। ঐ বিদেশী লোকটার কথাই ধরো।

কার কথা বলছো!

ঐ যে জামশেদ না কী যেন নাম।

এতরা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বলল, ও ভালো লোক সে-ধারণা তোমার হলো কোত্থেকে?

সবাই তো বলছে।

সবাই মানে পত্রিকাওয়ালার বলছে। ওরা দিনকে রাত করতে পারে। একটা খুনি বদমাশকে স্বর্গীয় দূত বানিয়ে দেয়।

একটা বিদেশী লোক একা একা যুদ্ধ করছে এটা তোমার চোখে পড়ে না!

এতরা কফির কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বিকৃত করল।

কী, কথা বলছো না যে ?

মানুষ মারাটা কোনো স্বর্গীয় দূতের কাজ না।

যাদের মারছে তারা কি মানুষ ? তারা তো পশুরও অধম।

এতরা গম্ভীর হয়ে গেল। বাইরে বৃষ্টির বেগ বাড়ছে। বৃষ্টি দেখে মেজাজ আরো খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বুড়ি বলল, আরেক কাপ কফি দেব ?

না।

চিলি দিয়ে বিন রেঁধেছি, দুপুরে আমার সঙ্গে লাঞ্চ করবে।

উঁহু, আমার কাজ আছে।

এইরকম আবহাওয়ায় আবার কিসের কাজ ? দুর্যোগের দিনে কাজ থাকে শুধু দুষ্ট লোকের।

স্বর্গীয় দূতদের কোনো কাজ থাকে না ?

তুমি মনে হয় কোনো কারণে লোকটার ওপর রেগে আছ ?

না, রাগব কেন ?

লোকটা স্বর্গীয় দূত হয়তো না, কিন্তু বিরল একজন মানুষ। চার্চে ওর জন্যে প্রার্থনা করা হয়েছে।

প্রার্থনা করা হয়েছে ?

হ্যাঁ।

এতরা সরু চোখে তাকিয়ে রইল।

কী প্রার্থনা করা হয়েছে ?

প্রার্থনা করা হয়েছে যাতে তার কোনো বিপদ-আপদ না হয়।

একজন ভয়ঙ্কর খুনির নিরাপত্তার জন্যে আজকাল তাহলে গির্জায় প্রার্থনাও হয় ? পবিত্র খ্রিষ্টান ধর্মের প্রচুর উন্নতি হয়েছে দেখি!

বুড়ি কিছু বলল না। রান্নাঘরে চলে গেল। লাঞ্চ সেরে বাড়ি ফিরতে ফিরতে তিনটে বেজে গেল। মেঘ কেটে আকাশ পরিষ্কার হয়ে গেছে। ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে। আরামদায়ক শীতলতা চারদিকে। এরকম দিনে ঘুমুতে ইচ্ছা করে। কিন্তু ঘুমানো যাবে না। অনেক কাজ আছে। দেশের বাইরে চলে যাবার একটা ব্যবস্থা না করলেই নয়। এরকম আতঙ্কের সঙ্গে সহবাস করা যায় না। এর চেয়ে পাসপোর্ট নিয়ে এক্ষুনি কোনো ট্রাভেল এজেন্সিতে যাওয়া দরকার। যদি সম্ভব হয় তাহলে আজ বিকেলেই

ইংল্যান্ড চলে যাওয়া যায়। এখানে আর কিছুদিন থাকলে সত্যি সত্যি পাগল হয়ে যেতে হবে।

এতরা ঘরে ঢোকামাত্র তার সেক্রেটারি বলল, স্যার, আপনাকে এক্ষুনি মি. ভিকির বাড়িতে যেতে হবে। খুব জরুরি।

ব্যাপার কী ?

তা স্যার জানা যায়নি। মিসেস রুন দুবার টেলিফোন করেছেন। শুধু বলেছেন খুব জরুরি।

এতরার প্রথমেই মনে হলো এটা একটা ট্র্যাপ। কেউ রুনের মুখের ওপর পিস্তল ধরে টেলিফোন করিয়েছে। সস্তা ধরনের ট্র্যাপ বলাই বাহুল্য। অবিশ্যি একটা কথা কিন্তু থেকে যায়। দিনেদুপুরে এরকম ফাঁদ পাতে না কেউ। ফাঁদ পাতা হয় অন্ধকারে।

কীরকম জরুরি তার কোনো আভাসও দেয়নি কেউ ?

না স্যার।

ঠিক আছে, গাড়ি বের করতে বলো।

আরেকটি কথা স্যার।

বলো।

লয়েড ইনস্যুরেন্স থেকে দুজন লোক এসেছিলেন।

কী ব্যাপারে ?

পরিষ্কার করে কিছু বলেননি। তবে আমার অনুমান মিঃ ভিকির মেয়ে অ্যানির নিরাপত্তা ইনস্যুরেন্স প্রসঙ্গে কিছু বলতে চান। তাঁরা আজ সন্ধ্যার পর আসবেন বলে গেছেন।

আমি সন্ধ্যার পর কারো সঙ্গে দেখা করি না। ওরা এলে ফিরে যেতে বলবে।

ঠিক আছে স্যার।

বেল টিপতেই রুন নিজে এসে দরজা খুলল। মনে হলো সে এতক্ষণ এতরার জন্যেই অপেক্ষা করছিল। রুনের সাজসজ্জা সাধারণ তবু এতেই তাকে অপরূপ লাগছে। পারিবারিক চূড়ান্ত বিপর্যয়ের ছাপ কোথায়ও নেই। একটু রোগা হয়েছে তাতে তার বয়স যেন আরো কম লাগছে। এতরা হালকা গলায় বলল, কেমন আছ রুন ?

ভালো।

একটু মনে হয় ওয়েট লুজ করেছ।

তা করেছি।

ভিকি কেমন আছে ?

ও ভালো নেই। ওর জন্যেই তোমাকে ডেকেছি।

কী হয়েছে ভিকির ?

চলো, নিজেই দেখবে।

ভিকি বারান্দায় একটি রকিংচেয়ারে দোল খাচ্ছিল। তার হাতে নেভানো একটা চুরুট। এতরা বলল, হ্যালো ভিকি! ভিকি তাকাল একবার, তাকিয়েই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল। এতরা বলল, শরীর ঠিক আছে তো, ভিকি ? ভিকি কোনো উত্তর দিল না। তার দৃষ্টি অস্বাভাবিক স্থির। যেন এ জগতের কোনোকিছুর সঙ্গে তার কোনো যোগ নেই।

রুন বলল, অবস্থাটা বুঝতে পারছো ?

পারছি। কবে থেকে এরকম হয়েছে ?

গতরাত থেকে। হঠাৎ করেই অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে পড়েছে। কারো সঙ্গে কোনো কথাবার্তা নেই। কাল সারারাত ঘুমায়নি। যতবার আমার ঘুম ভেঙেছে আমি দেখেছি সে বারান্দায় রকিংচেয়ারে বসে আছে।

ডাক্তার দেখিয়েছ ?

না।

দেরি না করে ডাক্তার ডাকা উচিত।

আমি বড্ড ভয় পাচ্ছি এতরা।

ভয়ের কিছু নেই। ঠিক হয়ে যাবে।

রুন ক্লান্তস্বরে বলল, একটার পর একটা আঘাতে ওর এরকম হয়েছে। ওর ব্যবসাটা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়েছে, জানো বোধহয় ?

না, জানি না।

সব জলে গেছে। লিও স্ট্রিটের বাড়িটাও বিক্রি করতে হয়েছে। বাড়ি মর্টগেজড ছিল, টাকাপয়সাও তেমন পাওয়া যায়নি।

এতরা চুপ করে রইল। রুন বলল, এসো ভেতরে গিয়ে বসি। কফি খাবে ?

খেতে পারি।

তোমার নিজের স্বাস্থ্যও খুব খারাপ হয়েছে।

এতরা ক্ষীণস্বরে বলল, নানান ঝামেলা যাচ্ছে।

তোমার আবার ঝামেলা কিসের ?

এতরা চুপ করে গেল। রুন কফির কাপ নামিয়ে রেখে স্বাভাবিক স্বরে বলল, আমার ধারণা ছিল ভিকির প্রতি আমার প্রেমট্রেম কিছুই নেই। ধারণাটা সত্যি নয়। ওকে আমি ভালোবাসি।

তা-ই নাকি ?

হ্যাঁ। অ্যানির মৃত্যুর পর ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়েছে। ঠিক এই মুহূর্তে দুটো লোককে আমি ভালোবাসি। একজন হচ্ছে ভিকি, অন্যজন হচ্ছে অ্যানির বিদেশী দেহরক্ষী।

এতরা কিছু বলল না। রুন থেমে থেমে বলল, ঐ বিদেশী মানুষটার প্রতি আমি খুব অবিচার করেছি। শেষের দিকে ওকে আমি মনেপ্রাণে ঘৃণা করেছি। বেশ কয়েকবার চেষ্টা করেছি ওকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দিতে।

তাই নাকি ?

হ্যাঁ।

এতরা একটা সিগারেট ধরিয়ে সরু গলায় বলল, ঐ বিদেশীর সঙ্গে কি এখন তোমার কোনো যোগাযোগ আছে ?

না।

কখনো টেলিফোন করেও কিছু বলেনি তোমাকে ?

না। ওরা ভিন্ন ধরনের মানুষ এতরা। নিজের বিশ্বাসের জন্যে কাজ করে। কারো ধার ধারে না।

এতরা উঠে দাঁড়াল। গম্ভীর গলায় বলল, আমাকে জরুরি কাজে ইংল্যান্ডে যেতে হচ্ছে রুন। হপ্তাখানেকের মধ্যে আসব।

রুন কোনো জবাব দিল না। গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল ঠিকই। কিন্তু আগের মতো যাবার আগে জড়িয়ে ধরে চুমু খাওয়ার কোনো আগ্রহ দেখাল না।

রাত এগারোটা ত্রিশ মিনিটে থাই এয়ারলাইন্সের একটি বিমানে করে এতরা ইতালি ছেড়ে গেল।

রাত বারোটার লেট নাইট বুলেটিনে জানানো হলো, জামশেদ নামের বিদেশী দেহরক্ষীটিকে পুলিশ পোর্ট সিটির এক বাড়ি থেকে গ্রেফতার করেছে। বাড়িটা শহর থেকে প্রায় দেড়শো মাইল দূরে। ফ্রান্স সীমান্তে। ইতালি থেকে সে পালাতে চেয়েছিল কি না কে জানে!

বস ভিকানডিয়াকে রাত আটটার পর জাগাবার নিয়ম নেই। বছর তিনেক আগে যখন দুটো বড় পরিবারের ভেতর হঠাৎ করে যুদ্ধ বেধে গেল, তখনই শুধু তাকে একবার রাত তিনটেয় ঘুম থেকে ডেকে তোলা হয়েছিল। ভিকানডিয়া জিজ্ঞেস করেছিল, সব মিলিয়ে এ-পক্ষের ক'জন মারা গেছে ? উত্তর শুনে ঘুমুতে গিয়েছিল। ভঙ্গিটা এমন যেন কিছুই হয়নি।

জামশেদের গ্রেফতার হবার খবর সে তুলনায় তেমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ খবর নয়। কিন্তু তবু কী মনে করে যেন তাকে জাগানো হলো। ভিকানডিয়া খবর শুনে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে পড়ল। এটিও তার স্বভাববিরুদ্ধ। ভিকানডিয়া কখনো গম্ভীর হয় না। তার বড় ছেলে এবং ছোট মেয়ের জামাই ক্যানটারেলা পরিবারের সাথে এক সংঘর্ষে নিহত

হয়। সে-খবর পেয়েও ভিকানডিয়ার কোনো বাহ্যিক পরিবর্তন হয়নি। সহজ স্বরে বলেছিল— যে-মৃত্যু হঠাৎ করে আসে সে-মৃত্যুসংবাদ হচ্ছে সুসংবাদ। দীর্ঘদিন রোগ ভোগ করে মরে অভাগারা।

হয়তো ভিকানডিয়ার বয়স হয়ে যাচ্ছে। বয়স হলেই মন দুর্বল হয়। তখন জামশেদের মতো প্রায় তুচ্ছ একজন মানুষের গ্রেফতারের সংবাদে মুখ অন্ধকার হয়।

ভিকানডিয়া গরম এক কাপ কড়া কফি দিতে বলল। ক্যানটারেলাকে খবর দিতে বলল। বিশেষ জরুরি, যেন এখনিই চলে আসে।

ক্যানটারেলাকে পাওয়া গেল না। যে-কয়েকটি জুয়ার আড্ডায় তার যাতায়াত সেগুলোর কোনোটাইতেই সে নেই। পতিতাপল্লীতে তাকে পাওয়ার কথা নয়। মেয়েদের ব্যাপারে তার উৎসাহ নেই। দুষ্ট লোকের ধারণা ক্যানটারেলা পুরুষত্বহীন। এরকম হাতির মতো জোয়ান একটি লোককে নিয়ে এ জাতীয় অপবাদ কী করে রটে কে জানে!

ভিকানডিয়া রাত দুটোয় আবার খোঁজ করল ক্যানটারেলাকে পাওয়া গেছে কি না। না, পাওয়া যায়নি। সবক'টা নাইট ক্লাবে দেখা হয়েছে। শহরের ভেতরের ব্রথেলগুলোতেও দেখা হচ্ছে। ভিকানডিয়া গম্ভীরমুখে বলল, ফাজিনকে আসতে বলো।

ফাজিন ভিকানডিয়ার ভাইয়ের ছেলে। ভিকানডিয়ার মৃত্যুর পর এ-পরিবারের অনেক দায়িত্ব ফাজিনের ওপর বর্তাবে। সেই হিসেবে ফাজিনের গুরুত্ব অনেকখানি। ভিকানডিয়া এমন সব জিনিস নিয়ে ফাজিনের সঙ্গে কথা বলে, যা কোনো মাফিয়া বস কখনো করে না। তাছাড়া ফাজিন ভিকানডিয়ার বাড়ির একতলাতে থাকে। এটিও একটি অদ্ভুত ব্যাপার। কোনো বস পরিবারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ সদস্যের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকে না।

ফাজিন ঘুমুচ্ছিল। সে হাতমুখ ধুয়ে কাপড় বদলাল। এত রাতে যখন তাকে ডেকে তোলা হয়েছে, তখন নিশ্চয়ই জরুরি কিছু হয়েছে। হয়তো এক্ষুনি বেরুতে হবে। তৈরি হয়ে যাওয়াটাই ভালো।

চাচা, আমাকে ডেকেছেন?

হুঁ, বসো। জামেশেদ গ্রেফতার হয়েছে, শুনেছ?

জি।

এই প্রসঙ্গে তোমার মতামত কী?

ফাজিন বুঝতে পারল না ঠিক কী জানতে চাচ্ছে ভিকানডিয়া। জামশেদ গ্রেফতার হয়েছে, এর আবার মতামত কী!

মনে হচ্ছে এ ব্যাপারে তোমার কোনো মতামত নেই?

আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী জানতে চাচ্ছেন?

বুঝতে না পারার তো কিছুই নেই। আমি সহজ ইতালিয়ান ভাষাতেই প্রশ্ন করছি। নাকি মাতৃভাষা ভুলে গেছ?

ফাজিন চুপ করে রইল। ভিকানডিয়া গম্ভীর গলায় বলল, সমস্ত ব্যাপারটাই যে বানানো, তুমি বুঝতে পারছ না?

বানানো?

তোমাকে যতটা বুদ্ধিমান আমি ভাবতাম তুমি ততটা বুদ্ধিমান নও।

ফাজিন চোখ নামিয়ে নিল। ভিকানডিয়া একটা চুরুট ধরিয়ে শান্তস্বরে বলল, সমস্ত ব্যাপারটাই পুলিশের একটা চাল। একটা বড়রকমের ধাপ্পাবাজি।

তা-ই কি?

হ্যাঁ, তা-ই। যে-লোকটিকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না, ইতালিয়ান পুলিশ ফট করে তাকে গ্রেফতার করে ফেলল? আমাদের পুলিশ এত কর্মদক্ষ কোনোকালেই ছিল না।

এরকম একটা চাল দেবার পিছনে যুক্তিটি কী?

খুব সহজ যুক্তি। আমাদের বিভ্রান্ত করা। পুলিশের ভেতর কিছু-কিছু অর্বাচীন ছোকরা ঢুকে গেছে, যারা আমাদের কেঁচোর মতো ঘেন্না করে। জামশেদকে গ্রেফতারের খবর এইসব ছোকরারা ছড়িয়েছে, যাতে আমরা অসতর্ক হই এবং আরো কয়েকজন মারা পড়ি। বুঝতে পারছ?

পারছি।

ওরা দেখাতে চায় যে, মাফিয়ারা সর্বেসর্বা নয়। আমার মনে হয় ঐসব অর্বাচীন ছোকরাদের একটা শিক্ষা দেয়া দরকার।

কীরকম শিক্ষা দিতে চান?

ওদের মধ্যে রিনালো নামে এক ছোকরা আছে যে নিজেকে বিশেষ বুদ্ধিমান বলে মনে করে। তাকে নিশ্চয়ই চেন?

হ্যাঁ, চিনি।

ওর দুটো মেয়ে আছে— যমজ। ঐ দুটো মেয়ের একটাকে কাল দুপুরের আগেই মেরে ফেলবে এবং রিনালোকে টেলিফোন করে মিষ্টি গলায় বলবে ভবিষ্যতে যেন সে আরো সাবধানে কাজকর্ম করে। তাকে বলবে, সবাইকে সন্তুষ্ট রাখার ক্ষমতা একটা ভালো ক্ষমতা।

ফাজিন কিছুক্ষণ চুপ থেকে বলল, আপনি যা বলছেন তা করা হবে, কিন্তু তা করার আগে আমাদের বোধহয় নিশ্চিত হওয়া উচিত যে, জামশেদের গ্রেফতারের ব্যাপারটা একটি ধাপ্পা। হয়তো সে সত্যি সত্যি গ্রেফতার হয়েছে।

সে গ্রেফতার হয়নি। আর না হলেও কিছু যায় আসে না। ঐ ছোকরাকে একটু ভড়কে দেয়া দরকার।

ঠিক আছে। আমি কি এখন উঠব ?

হ্যাঁ। রাতদুপুরে অকারণে আমার সামনে বসে থাকার কোনো কারণ দেখি না।

জামশেদকে রাখা হয়েছে কড়া পাহারায়। কিন্তু তাকে মোটেই ভয়াবহ মনে হচ্ছে না। বরং ফুর্তিবাজ ধরনের লোক বলেই মনে হচ্ছে। ক্রমাগত কফি খাচ্ছে, চুরুট টানছে। জিপসি মেয়েদের নিয়ে চমৎকার অশ্লীল রসিকতা করে সবাইকে হাসিয়েছে। কে বলবে এই সেই ভয়াবহ লোক। যে-অফিসার তাকে গ্রেফতার করেছে সে ক্রমেই চিন্তিত হতে শুরু করল। কোথাও ভুল হয়নি তো ?

ভুল হবার কথা অবিশ্যি নয়। সে গভীর রাতে একটি টেলিফোন পেয়ে দলবল নিয়ে ছুটে গেছে। ফোনকলটা ছিল সংক্ষিপ্ত— জামশেদ অমুক ঠিকানায় রাত কাটাবে। আপনারা ঘণ্টাখানেকের মধ্যে এলে তাকে ধরতে পারবেন। সে তখুনি নয়জনের একটি স্কোয়াড নিয়ে গিয়েছে। আর সত্যি আউটহাউসে একজনকে পাওয়া গেছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল।

তাকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করা হলো, কী নাম ?

লোকটি বলল, জামশেদ।

দেশ ?

বাংলাদেশ।

তুমিই কি সেই বিখ্যাত জামশেদ ?

বিখ্যাত কি না জানি না তবে আমিই সেই লোক।

তোমার সঙ্গে অস্ত্রটস্ত্র কী আছে ?

আপাতত একটা বারো ইঞ্চি ড্যাগার ছাড়া কিছুই নেই।

তোমাকে গ্রেফতার করা হলো।

ভালো কথা। এতে কি তোমার প্রমোশনের কোনো সুবিধা হবে ?

গ্রেফতারের ঘটনাটা এক ঘণ্টার ভেতর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। পুলিশ কমিশনার বিশেষ নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেবার জন্যে আদেশ দিলেন। পুলিশি তদন্ত সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কোনো পত্রিকা, রেডিও বা টিভি ইন্টারভিউ যেন না দেয়া হয় সেরকম নির্দেশ দেয়া হলো। তদন্তকারী অফিসার হিসেবে নিয়োগ করা হলো হমিসাইড ইন্সপেক্টর রিনালো ও কিনসিকে। এদের পাঠানো হলো পোর্ট সিটিতে।

রিনালো এসে পৌঁছাল ভোর ছ'টায়। তার সঙ্গে জামশেদের কথাবার্তা হলো এরকম—

রিনালো তুমি জামশেদ ?

জামশেদ হ্যাঁ।

রিনালো : জামশেদ যখন হাসপাতালে ছিল তখন প্রায়ই তার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। তোমাকে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

জামশেদ (নিশ্চুপ)।

রিনালো এই কাণ্ডটি কেন করেছ ?

জামশেদ : (নিশ্চুপ)

রিনালো তোমার নিজের বুদ্ধিতেই করেছ, না অন্য কারোর বুদ্ধিতে ?

জামশেদ : নিজের বুদ্ধিতে। আসল জামশেদকে সাহায্য করবার জন্যে করেছি।

রিনালো তোমার ধারণা এতে তার সাহায্য হবে ?

জামশেদ হ্যাঁ, আমার তা-ই ধারণা।

রিনালো : তুমি একটি মহাবেকুব। তুমি যে কী পরিমাণ জটিলতার সৃষ্টি করেছ সে সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা নেই।

রিনালো মহাবিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। ঠিক তখনই এল টেলিফোন। মিহি সুরে একজন বলল, ভিকানডিয়া আপনাকে গভীর সমবেদনা জানাচ্ছেন। এবং আশা করছেন আপনি ভবিষ্যতে এমন কিছু করবেন না যাতে এ জাতীয় দুঃখ আপনাকে আরো পেতে হয়।

রিনালো কিছুই বুঝতে পারল না। তার যমজ মেয়েদের একটি মারা গেছে গাড়ির নিচে চাপা পড়ে, এই খবর তখনো তার কাছে এসে পৌঁছায়নি।

ক্যানটারেলা কয়েক মুহূর্ত নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না। এটা কি স্বপ্ন ? না চোখে ভুল দেখছে ? সন্ধ্যা থেকে এ পর্যন্ত তিন-চার পেগ হুইসকি খেয়েছে শুধু। এতে তার কোনো নেশা হয় না। কিন্তু নেশা ছাড়া এরকম একটি দৃশ্য দেখা সম্ভব নয়। ক্যানটারেলা দেখল তার সোফায় একজন কে বসে আছে। ঘর অন্ধকার। তবু বোঝা যাচ্ছে লোকটার হাত খালি নয়। লোকটি বলল, আমাকে চিনতে পারছো ?

হ্যাঁ। তুমি কেমন আছ ?

ভালো। তুমি ভালো আছ, ক্যানটারেলা ?

ভালোই আছি। এ জায়গার ঠিকানা কোথায় পেলে, জামশেদ ?

বলছি। তার আগে তুমি পকেট থেকে তোমার ছোট্ট মিসিমার পিস্তলটা আমার পায়ের কাছে ফেলে দাও। অন্য কিছুই করতে চেষ্টা করবে না।

ক্যানটারেলা পিস্তলটা বের করে ছুড়ে দিল। মৃদুস্বরে বলল, তুমি ওস্তাদ লোক, জামশেদ। সাহসী ও বুদ্ধিমান। দুটো জিনিস একসঙ্গে হয় না। সাহসী লোকরা হয় বোকা। আমি বুদ্ধিমান, সে কারণেই আমার সাহস কম। তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে আমি এক পেগ হুইসকি খেতে চাই। আমার চিন্তা করার শক্তি নষ্ট হয়ে

যাচ্ছে। ক্যানটারেলা অনুমতির অপেক্ষা না করেই দক্ষিণের দেয়ালের দিকে এগিয়ে গেল। ছোট্ট একটি ঘরোয়া ধরনের বার আছে সেখানে।

জামশেদ, তুমিও কি একটু চেখে দেখবে ?

মদ খাওয়া আমি ছেড়ে দিয়েছি।

এরকম একটা পরিস্থিতিতে খাওয়া উচিতও নয়। ভালো কথা, তুমি কি আমাকে মেরে ফেলবে ? কথাবার্তা খোলাখুলি হওয়া প্রয়োজন।

জামশেদ ভারী গলায় বলল, না, তোমাকে আমি মারব না।

আমিও তা-ই ভাবছিলাম। তুমি অনেক খোঁজখবর নিয়েছ, কাজেই আমি নিশ্চিত ছিলাম অ্যানি অপহরণ এবং মৃত্যুর ব্যাপারে আমার ভূমিকার কথা তুমি জানো।

আমি জানি।

কতটুকু জানো ?

আমি জানি তুমি প্রথম থেকেই এর বিরোধিতা করেছ। অ্যানির মৃত্যুর খবর পেয়ে তুমি ছুটে গিয়েছিলে এতরাকে গুলি করে মারবার জন্যে। ভিকানডিয়া হস্তক্ষেপ না করলে এতরা সেই রাতেই মরত।

হ্যাঁ, তুমি অনেক খবরই রাখো। তবে আমি নিজে এতরাকে মারবার জন্য যাইনি। লোক পাঠিয়েছিলাম। নিজের হাতে আমি মানুষ কখনো মারিনি। আমার সাহস কম।

জামশেদ বলল, আমি কয়েকটি জিনিস তোমার কাছ থেকে জানতে চাই।

আমার মনে হয় না আমি তোমাকে কিছু বলব।

বলবে। আমি জানি মানুষের কাছ থেকে কী করে কথা আদায় করতে হয়।

তোমার কায়দাটা কী ?

খুব সহজ কায়দা, ক্যানটারেলা। আমি চুলের কাঁটা দিয়ে তোমার বাঁ চোখটি উপরে ফেলব। আমার ধারণা তা করবার আগেই তুমি কথা বলা শুরু করবে।

তা ঠিক। সত্যি কথা বলতে কি, আমি এখনি কথা বলতে চাই। কী জানতে চাও ?

মূল পরিকল্পনাটি কার ?

বস ভিকানডিয়ার। তবে পরিকল্পনাটা কার্যকর করেছে ফাজিন। এরা দুজনেই ঘটনার মূল নায়ক। এতরা হচ্ছে খলনায়ক।

এখন বলো কীভাবে ভিকানডিয়াকে হত্যা করা সম্ভব, কীভাবে তার কাছে যাওয়া যায় ?

বলছি। তার আগে তুমি কি দয়া করে বলবে এবাড়ির ঠিকানা কী করে পেলে ? বস ভিকানডিয়া এবং তার লোকজন পর্যন্ত এবাড়ির ঠিকানা জানে না। আমি যখন পালিয়ে থাকতে চাই তখনই শুধু এবাড়িতে আসি।

জামশেদ ভারী গলায় বলল, আমাকে এ-শহরের অনেকেই এখন সাহায্য করতে চায়। অচেনা লোকজনের কাছ থেকেও এখন আমি খবরাখবর পাই।

তুমি খুবই ভাগ্যবান, জামশেদ। তবে আজ তোমার ভাগ্যটা খারাপ।

ক্যানটারেলার কথা শেষ হবার আগেই জামশেদ ছিটকে পড়ল মেঝেতে। কখন যে অন্ধকারে দুজন মানুষ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে জামশেদ কিছুই বুঝতে পারেনি। ক্যানটারেলা বলল, ওকে ভালো করে বেঁধে ফ্যালো।

ঠিক আছে স্যার।

জ্ঞান আছে কি ?

না, জ্ঞান নেই। নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে।

নিচের ঘরে নিয়ে বন্ধ করে রাখো। আর একজন ডাক্তার ডাকো।

ডাক্তার ?

হ্যাঁ, ডাক্তার। কারণ আমি একজন ভদ্রলোক। আর একটি কথা, তোমরা আসতে এত দেরি করলে কেন ? আমি তো ঘরে মানুষ দেখেই বেল টিপলাম।

দেরি করিনি স্যার। সঙ্গে সঙ্গেই এসেছি, সুযোগের অপেক্ষা করছিলাম।

ভালো। খুব ভালো। তোমরা ভালো পুরস্কার পাবে।

ক্যানটারেলা এগিয়ে গিয়ে খানিকটা নির্জলা হুইসকি ঢালল গলায়।

জামশেদের জ্ঞান ফিরল ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। সে তাকাল চারদিকে। ছোট্ট একটি ঘর। সে শুয়ে আছে বিছানায়। তার গায়ে একটি পরিষ্কার চাদর। মাথার কাছে চল্লিশ পাওয়ারের একটি বাল্ব জ্বলছে। পায়ের কাছে ছোট্ট একটি টেবিলে এক জগ পানি। শক্ত লোহার দরজা। ভারী দুটো তালা ঝুলছে সেখানে। এঘর থেকে বের হওয়া সম্ভব নয়। জামশেদ কয়েকবার ডাকল, কেউ আছে এখানে ? কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। জামশেদ ঢকঢক করে পুরো জগ পানি খেয়ে ঘুমুতে গেল। বড় ঘুম পাচ্ছে।

ভিকানডিয়ার সঙ্গে ক্যানটারেলার দেখা হয় পরদিন সকাল দশটার দিকে। ভিকানডিয়া গর্জে উঠল, কোথায় ছিলে কাল সারারাত ? সমস্ত শহর চষে ফেলা হয়েছে তোমার জন্যে।

ক্যানটারেলা চুপ করে রইল। ভিকানডিয়া বলল, ঘটনা খুব দ্রুত ঘটছে, বুঝতে পারছো তো ?

পারছি।

পুলিশ জানিয়েছে ওরা যে-লোকটাকে ধরেছে সে জামশেদ নয়।

ভোরবেলার খবরের কাগজে তা-ই পড়লাম।

এখন আমাদের কাজ কী বুঝতে পারছো ? যেভাবেই হোক জামশেদকে ধরা।

ক্যানটারেলা শান্তস্বরে বলল, সে যদি এ-শহরে থাকে তাহলে ধরা পড়বেই।

তোমার ধারণা সে এ-শহরে নেই ?

এই বিষয়ে আমার কোনো ধারণা নেই।

শহর থেকে বেরুবার সব কটা পয়েন্টে আমাদের লোক থাকবে। এবং আমাদের আরেকটি কাজ করতে হবে। জামশেদের ছবি বড় করে ছাপিয়ে সমস্ত শহরময় ছড়িয়ে দিতে হবে।

ছবি পাওয়া গেছে ?

হ্যাঁ, ছবি জোগাড় হয়েছে। ছবির নিচে লেখা থাকবে, ওকে ধরিয়ে দিন।

তাতে কোনো লাভ হবে না। এ-শহরের লোকজন ওকে ধরিয়ে দেবে না।

ভিকানডিয়া সরু গলায় বলল, তোমার বুদ্ধিবৃত্তির ওপর থেকে আমার আস্থা কমে যাচ্ছে। আমরা শুধু ছবিই ছাপাব না, ছবির সঙ্গে এ-ও লিখে দেব, একে ধরিয়ে দিতে পারলে পঁচিশ হাজার ইউ এস ডলার পুরস্কার দেয়া হবে। পুরস্কারের টাকাটা আমরা একটা ব্যাংকে জমা করে দেব। তাও লেখা থাকবে।

কানটারেলা চুপ করে রইল। ভিকানডিয়া বলল, তোমার ধারণা এতে কাজ হবে ?

হতে পারে।

সন্দেহ থাকলে টাকার পরিমাণ বাড়িয়ে পঞ্চাশ হাজার ইউ এস ডলার করে দাও। টাকায় সবই হয়।

তা হয়।

আমি এই ঝামেলার দ্রুত নিষ্পত্তি দেখতে চাই।

আমরাও চাই, ভিকানডিয়া।

টুনটুন করে ডোরবেল বাজছে।

এতরার ভ্রু কুঞ্চিত হলো। কে হতে পারে ? রাত প্রায় নয়টা। রুম সার্ভিস হবে না নিশ্চয়ই। দরজার পিপ হোল দিয়ে যে-লোকটিকে দেখা যাচ্ছে, সে ব্রিটিশ। অত্যন্ত ভদ্র চেহারা। এ তার কাছে কী চায় ?

এতরা দরজা খুলতেই বাইরে দাঁড়ানো লোকটি বলল, আপনাকে বিরক্ত করবার জন্যে আন্তরিক দুঃখিত।

কে আপনি ?

বলছি। তার আগে ভেতরে এসে বসতে পারি কি ?

আমার পক্ষে বেশি সময় দেয়া সম্ভব নয়। আমি আজ সকালেই ইংল্যান্ডে এসে পৌঁছেছি। অসম্ভব ক্লান্ত।

আজ সকালে এসেছেন কথা ঠিক নয়, মি. এতরা। আপনি এসেছেন পরশু। আমি ভেতরে আসতে পারি ?

আসুন।

ভদ্রলোক ভেতরে এসেই বললেন, আমি হচ্ছি লয়েডস ইনস্যুরেন্সের একজন তদন্তকারী অফিসার। আমার নাম রেমন্ড কিন।

এতরা কিছু বলল না। লোকটি অত্যন্ত সহজ ভঙ্গিতে সোফায় বসে হাসিমুখে বলল, অ্যানি নামের একটি মেয়ের ইনস্যুরেন্স পলিসির ব্যাপারে আপনাকে দু'একটি কথা জিজ্ঞেস করব। অবিশ্যি আপনি যদি অনুমতি দেন।

আপনি কী করে জানলেন যে আমি এখানে আছি ? আমার ঠিক এই মুহূর্তে এখানে থাকার কথা নয়।

মি. এতরা, এটা জানার জন্যে আমাদেরকে শার্লক হোমস হবার প্রয়োজন হয় না। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবার জন্যে দুজন গিয়েছিলেন ইতালি। তাঁরা ট্রাভেল এজেন্টের মাধ্যমে জেনেছে আপনি ইংল্যান্ডের টিকিট কেটেছেন। আমি তাই এখানকার হোটেলগুলিতে খোঁজ করেছি। আপনি যদি অন্য কোনো নামে হোটেল রিজার্ভেশন করতেন তা হলে অবিশ্যি আমার পক্ষে খুঁজে বের করা সম্ভব হতো না।

আমি অন্য নামে সিট রিজার্ভ করব কেন ?

কথার কথা বলছি মি. এতরা। অবশ্যি ইচ্ছা থাকলেও আপনি তা পারতেন না। কারণ হোটেল সিট রিজার্ভেশনের সময় বিদেশী নাগরিকদের পাসপোর্ট দেখাতে হয়।

এতরা সিগারেট ধরাল। তার কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমছে।

মি. এতরা, এখন কি আমি দু'একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

না, এখন পারেন না। আমি খুবই ক্লান্ত। আপনাকে কাল আসতে হবে। রাত নটা আলোচনার জন্যে ভালো সময় নয়।

রেমন্ড কিন সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, আমি কাল সকালে আসব। বিরক্ত করবার জন্যে অত্যন্ত দুঃখিত।

দশটার পর আসবেন। আমি অনেক দেরি করে উঠি।

আমি আসব ঠিক সাড়ে দশটায়। ইতালি সম্পর্কে কিছু গল্পগুজবও করা যাবে।

ইতালি সম্পর্কে গল্পগুজব করার কিছু নেই।

থাকবে না কেন ? আমি দুদিন আগের খবর জানি সেখানে জামশেদ নামের একটি লোক গ্রেফতার হয়েছে পুলিশের কাছে। এ নিয়ে ইতালিতে তুমুল উত্তেজনা।

এতরা চাপা স্বরে বলল, জামশেদ গ্রেফতার হয়েছে ?

হ্যাঁ, হয়েছে। আমরা জামশেদের ব্যাপারেও উৎসাহী। অ্যানির ইনস্যুরেন্সের বিষয়ে ওকেও দরকার। কাজেই আমরা ওর ব্যাপারে খোঁজ রাখার চেষ্টা করছি। মি. এতরা!

বলুন।

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে আপনিও জামশেদের ব্যাপারে বেশ উৎসাহী।

না, আমি উৎসাহী নই। আমি উৎসাহী হব কী জন্যে ?

ও, সরি। আমারই ভুল হয়েছে। আচ্ছা মি. এতরা, আমরা কাল ভোরে কথা বলব।

দশটার পর।

ঠিক সাড়ে দশটায় আমি আসব। গুড নাইট।

এতরা টেলিফোনে রুম সার্ভিসকে কফি দিতে বলল। তার দুমিনিট পরেই বলল কফি দেবার প্রয়োজন নেই। তার কিছুই ভালো লাগছে না। তার কেন জানি প্রচণ্ড ভয় করতে লাগল। ইংল্যান্ডে আসার পরিকল্পনাটি কাঁচা। তার উচিত ছিল দেশেই থাকা। দেশে নিরাপত্তার ব্যবস্থা আরো জোরদার করা যেত।

এখন ফিরে গেলে কেমন হয় ? কাল সকাল দশটার আগেই রওনা হয়ে গেলে মন্দ হয় না। ইনস্যুরেন্স কোম্পানির ঐ ছাগলটির সঙ্গে কোনো কথা বলার ইচ্ছে হচ্ছে না।

এতরা রাত তিনটায় হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এল। ভোর সাড়ে চারটায় ফ্রান্সের কনকর্ডের একটি টিকিট পাওয়া গেছে। সেখান থেকে বাসে করে ইতালি চলে যাওয়া যাবে। ভালো লাগছে না, কিছুই ভালো লাগছে না।

জামশেদ সমস্ত দিন শুয়ে রইল।

প্রচণ্ড খিদে। কিন্তু কোনো খাবার নেই। এক জগ পানি ছিল তা শেষ হয়েছে অনেক আগেই। জামশেদের শুয়ে থাকা কিংবা বসে বসে বন্ধ দরজার দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছু করবার নেই। চুপচাপ বসে থাকার ব্যাপারটি খুবই বিরক্তিকর। জামশেদ ঘুমুতে চেষ্টা করছে। কিন্তু ঘুম আসছে না। স্নায়ু উত্তেজিত। সে মনে-মনে পরবর্তী পরিকল্পনা ঝালিয়ে নিতে গিয়ে বাধা পেল। পরবর্তী পরিকল্পনা করাও অর্থহীন। এখান থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে না। অলৌকিক কোনো ব্যাপার বা সৌভাগ্য এসব জিনিসে জামশেদের বিশ্বাস নেই। কাজেই পরবর্তী কোনো পরিকল্পনা তৈরির আগে বরং মৃত্যুর জন্যে মানসিক প্রস্তুতি নেয়াই ভালো।

কী হয় মৃত্যুর পর ? মৃত্যুর ওপারেও কি কোনো জগৎ আছে ? সুখী কোনো ভুবন ? যেখানে কষ্ট নামক ব্যাপারটি নেই। ক্ষুধার কষ্ট নেই। গ্লানি ও বঞ্চনার কষ্ট নেই। আনন্দ ও উল্লাসের একটি অপরূপ ভুবন। ভাবতে ভাবতে জামশেদের ঘুম এসে গেল। অদ্ভুত একটি স্বপ্ন দেখল সে।

যেন অ্যানি ছুটতে ছুটতে আসছে, তার বন্ধ ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে বলছে, এই ভালুক, তুমি এখানে আটকা পড়ে আছ কেন ?

বুদ্ধির দোষে আটকা পড়েছি।

এমন বোকা কেন তুমি ?

অ্যানি মাথা দুলিয়ে খুব হাসতে লাগল। রিনরিনে মিষ্টি গলায় হাসি। ঘুম ভেঙে উঠে বসল জামশেদ।

এখন কি দিন না রাত বোঝার উপায় নেই। ঘরে সব সময় বাতি জ্বলছে। কোনোরকম শব্দটব্দও কানে এসে পৌঁছাচ্ছে না। ক্ষুধার তীব্রতাও ক্রমে ক্রমে মরে যাচ্ছে। তার মনে হচ্ছে এই ঘরে সে আছে আটচল্লিশ ঘন্টারও বেশি সময় ধরে। ত্রিশ ঘণ্টা পার হলে খিদে মরে যায়। শুধু তৃষ্ণা থাকে। তৃষ্ণাও কমে আসে পঞ্চাশ ঘণ্টায়।

না খেয়ে থাকার অভিজ্ঞতা জামশেদের আছে। একবার সে এবং বেন ওয়াটসন না খেয়ে সাতদিন ছিল। সে ছিল একটি ছেলেমানুষি ব্যাপার। বেন ওয়াটসন একদিন বলল, জাম্‌স্‌, একটা বাজি ধরলে কেমন হয় ?

কিসের বাজি ?

না খেয়ে থাকার বাজি। কে বেশি সময় থাকতে পারে।

কত টাকা বাজি ?

পঞ্চাশ ইউ এস ডলার।

ঠিক আছে।

বেন ওয়াটসনের কাজই হচ্ছে বাজি ধরা। সবকিছুতেই সে একটা বাজি ধরে ফেলবে। এবং অবধারিতভাবে হারবে। না খেয়ে থাকার বাজিতেও তা-ই হলো।

ত্রিশ ঘণ্টার মাথায় ওয়াটসন পঞ্চাশ ডলারের নোট এনে মুখ কালো করে বলল, আবার হারলাম। এসো এবার খানাপিনা করা যাক।

জামশেদ বলল, তুমি খাওয়াদাওয়া করো। আমি দেখতে চাই না-খেয়ে কতদিন থাকা যায়।

আর দেখাদেখি কি, তুমি তো জিতবেই।

বাজি-টাজি না। পরীক্ষা করতে চাই, না-খেয়ে কতদিন থাকা যায়।

জামশেদ ঝুলে রইল সাতদিন পর্যন্ত। যেন ওয়াটসন চিন্তায় চিন্তায় অস্থির। সামান্য বাজি ধরা থেকে এ কী ঝামেলায় পড়া গেল! শেষমেশ পাঁচশো ডলার নিয়ে সাধাসাধি, যেন জামশেদ কিছু-একটা মুখে দেয়। ইস, কীসব দিন গিয়েছে!

সে বিছানায় উঠে বসল। আবার শুয়ে পড়ল। উঠে বসা এবং শুয়ে থাকা এই দুটি মাত্র কাজ তার। প্রথম দিকে খানিক হাঁটাহাঁটি করা যেত, এখন আর যায় না। শোয়ামাত্রই ঝিমুনি এসে গেল জামশেদের। আর প্রায় তার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো অ্যানি দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার মুখ কেমন যেন বিষণ্ণ। কথা বলছে টেনে টেনে।

বুড়ো ভালুক।

উঁ ?

খুব কষ্ট হচ্ছে ?

তা হচ্ছে, অ্যানি।

মানুষের এত কষ্ট কেন বুড়ো ভালুক ?

কী জানি অ্যানি।

আমি কারোর কষ্ট দেখতে পারি না। খুব কান্না পায়।

জামশেদের মনে হলো অ্যানি কাঁদতে শুরু করেছে। সে হাত বাড়াল অ্যানিকে সান্ত্বনা দিতে, তখনই তন্দ্রা কেটে গেল। আবার সেই আগের ছোট্ট ঘর। চল্লিশ পাওয়ারের হলুদ একটা বাতি। জামশেদের পেটে পাক দিয়ে উঠল। বমি হবে বোধহয়। হয়, এরকম হয়। একটা সময় আসে যখন শরীর বিদ্রোহ করতে শুরু করে। চোখ কিছু দেখতে চায় না। পা চলতে চায় না। মস্তিষ্ক স্থবির হয়ে আসে। জামশেদ মেঝেতে বমি করল।

বস ভিকানডিয়া ঠান্ডাস্বরে বলল, একটি লোক হাওয়া হয়ে যেতে পারে না।

ফাজিন জবাব দিল না।

লোকটি নিশ্চয়ই কোনো মন্ত্রটন্ত্র জানে না। নাকি তোমরা বলতে চাও সে অলৌকিক ক্ষমতাধর কোনো মানুষ ?

সে খুব সম্ভব ইতালিতে নেই। ইতালিতে এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে তাকে খোঁজা হয়নি। আমার ধারণা সে জীবিত নেই।

এরকম ধারণা হবার কারণ কী ?

কোনো কারণ নেই, আমার মনে হচ্ছে এরকম।

কারণ ছাড়াই যারা বিভিন্ন জিনিস ভাবে ওরা ছাগল সম্প্রদায়ভুক্ত বলেই আমি মনে করি।

ফাজিন কিছু বলল না। ভিকানডিয়া তিক্তস্বরে বলল, ওর বন্ধু ওয়াটসন কী বলছে ?

ও কিছুই বলছে না।

বলাবার চেষ্টা করেছ ?

হ্যাঁ করেছি। পেন্টাথল ইনজেকশন দিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। ও কিছু জানে না। জানলে বলতো।

কী বলে সে ?

সে বলে যে ওর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ নেই। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে জামশেদ ওর সঙ্গে দুরাত ছিল।

সেই দুরাত ওদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে ?

বিশেষ কোনো কথাবার্তা হয়নি। জামশেদ কথা বলে কম।

ভিকানডিয়া চুরুট ধরাল। ফাজিন বলল, ওয়াটসনকে নিয়ে এখন কী করব ?

আমাকে জিজ্ঞেস করছো ? এইসব ছোট জিনিস নিয়ে কেন তোমরা আমাকে বিরক্ত করো ? যদি দেখো ওকে ধরে রেখে আর কোনো লাভ নেই তা হলে আপদ বিদেয় করো। বস্তায় ভরতি করে ফেলে দাও সমুদ্রে।

ভিকির অবস্থা খারাপ হয়েছে। খাওয়াদাওযা বন্ধ। রাতে ঘুমুতে পারে না। সমস্ত রাত বারান্দায় চেয়ার পেতে বসে থাকে। রুন দিশাহারা হয়ে গেল। ডাক্তাররা তেমন কিছু ধরতে পারেন না। মানসিক অসুস্থতার কোনো লক্ষণ নেই। ডাক্তারদের সঙ্গে কথাবার্তা সহজ-স্বাভাবিক মানুষের মতো। কিন্তু রুনের সঙ্গে কথা বলার সময় কথা জড়িয়ে যায়। একটি কথা শুরু করে অন্য একটি কথায় চলে যায়। রুন কয়েকবার চেষ্টা করেছে ভিকিকে নিয়ে সুইজারল্যান্ডের দিকে যেতে। বাইরে হয়তো অন্যরকম হবে। আবার হয়তো ভিকি আগের মতো হয়ে উঠবে।

ভিকির ব্যবসা নষ্ট হয়ে গেছে— তাতে কিছুই যায় আসে না। ব্যবসা আবার হবে। রুনের নিজের যথেষ্ট টাকা আছে। কোনোকিছু না করেই সে-টাকায় নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে। অবিশ্যি পুরুষমানুষ বসে থাকতে পারে না। পুরুষমানুষদের কিছু-একটা করতে হয়। কাজেই আবার যাতে ভিকি উঠে দাঁড়াতে পারে রুন সে-চেষ্টা করবে।

রুন!

রুন দেখল ভিকি উঠে আসছে। পা ফেলছে এলোমেলোভাবে। রুন এগিয়ে গিয়ে ভিকিকে ধরে ফেলল। একটা অন্যায় করেছি, রুন। তোমাকে আজ সেটা বলতে চাই।

রুন বলল, অন্যায় করে থাকলে করেছ। আমরা সবাই কখনো-না-কখনো ভুল করি।

আমি যা করেছি সেটা তোমার শোনা দরকার।

আমি কিছুই শুনতে চাই না। আমি চাই তুমি আগের মতো হও।

রুন প্লিজ, আমার কথা শোনো।

না, কোনো কথা শুনতে চাই না আমি।

রুন ভিকিকে গভীর আবেগে জড়িয়ে ধরল। ছেলেমানুষের মতো চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল ভিকি।

জামশেদ তুমি বেঁচে আছ ?

জামশেদ চোখ মেলল। পরিষ্কার কিছু দেখা যাচ্ছে না। সব যেন ঘোলাটে লাগছে।

আমি ক্যানটারেলা। তোমার জন্যে খাবার এনেছি। নাও, খাও। প্রথম খাও ফলের রস। তারপর দুধ খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো। শরীরে একটু শক্তি হোক আমি আবার আসব।

জামশেদ কথাবার্তাও ঠিক বুঝতে পারছে না। তবুও সে উঠে বসতে চেষ্টা করল।

নড়াচড়া করবে না, শুয়ে থাকো। আমি দুঃখিত যে তোমাকে ছ'দিন না-খেয়ে থাকতে হলো। উপায় ছিল না। খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেলেই তোমাকে ওরা খুঁজে বের করে ফেলত। তবে আমি জানতাম ছ'দিনে তোমার কিছুই হবে না।

ক্যানটারেলা কমলার রস জামশেদের মুখের কাছে ধরল। মৃদুস্বরে বলল, একসঙ্গে বেশি খাবে না, অল্প কিছু মুখে দাও। তারপর কিছু সময় বিশ্রাম করো। আবার কিছু খাও। একজন ডাক্তার নিয়ে এসেছি, সে বোধহয় তোমার শিরা দিয়ে কিছু খাবারদাবার ঢোকাবে।

জামশেদের মনে হলো ক্যানটারেলার পাশে যেন অ্যানি দাঁড়িয়ে আছে হাসিমুখে। সে যেন বলছে, খাও, বুড়ো ভালুক, খাও। এমন বোকার মতো তাকিয়ে থেকো না।

জামশেদ গ্লাসে চুমুক দিল।

জামশেদ, এখন কি সুস্থ বোধ করছো ?

জামশেদ চোখ মেলল। ক্যানটারেলা দাঁড়িয়ে আছে। জামশেদ বলল, আজ কত তারিখ ?

বারো। বারোই আগস্ট। তুমি কি এখন সুস্থ বোধ করছ ?

করছি।

ভালো, খুবই ভালো। আরো বিশ্রাম নাও, আমি পরে আসব।

আমার যথেষ্ট বিশ্রাম হয়েছে।

আরো হোক। একটু ব্রান্ডি খাবে ? এতে স্নায়ু টানটান হয়ে ওঠে।

আমার স্নায়ু এমনিতেই টানটান।

ঠিক আছে, তা হলে ব্র্যান্ডি খেতে হবে না। বিশ্রাম নাও। ডাক্তার বলেছে দিন দুয়েকের মধ্যে তুমি আগের ফর্মে ফিরে আসবে।

জামশেদ ক্লান্তস্বরে বলল , মনে হচ্ছে তুমি চাও, আমি দ্রুত আগের ফর্মে ফিরে আসি।

হ্যাঁ, আমি চাই। তোমাকে আমার দরকার আছে। আজ রাতে একবার আসব। তখন বলা যাবে কেন দরকার।

এতরা ইতালিতে ফিরে এসে হকচকিয়ে গেল। জামশেদ ধরা পড়ে নি। শুধু তা-ই নয়, সে নাকি বাতাসে মিলিয়ে গেছে। ক্যানটারেলার সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে।

ক্যানটারেলার কথাবার্তাও অস্পষ্ট। কিংবা এতরা এখন আর আগের মতো চিন্তাভাবনা করতে পারে না বলেই সব কথাবার্তাই অস্পষ্ট মনে হয়। এদের দুজনের মধ্যে কথোপকথন ছিল এরকম—

এতরা : তুমি তো বলেছিলে তিনদিনের ভেতর ওকে ধরবে, তারপর চামড়া খুলে সমুদ্রে ডুবিয়ে রাখবে।

ক্যানটারেলা বলেছিলাম নাকি ?

এতরা হ্যাঁ।

ক্যানটারেলা লোকটি মন্ত্রটন্ত্র জানে। বিপদের সময় ফস্ করে অদৃশ্য হয়ে যায়।

এতরা কী বলছ এসব ? ঠাট্টা করছ নাকি ?

ক্যানটারেলা ঠাট্টা ? না, আমি ঠাট্টা-ফাট্টা করি না।

এতরা প্লিজ ক্যানটারেলা, ঠাট্টা-তামাশা সহ্য করার ক্ষমতা এখন আমার নেই।

ক্যানটারেলা না থাকারই কথা। কারণ তুমি সম্ভবত নেক্সট টার্গেট।

এতরা কী বলছ এসব ?

ক্যানটারেলা ঠিকই বলছি।

এতরা তুমি পাগলের মতো প্রলাপ বকছো ?

ক্যানটারেলা হতে পারে। হওয়াই সম্ভব, হা হা হা।

এতরা হাসছ কীজন্যে ? এর মধ্যে হাসির কী হয়েছে ?

ক্যানটারেলা একটা পুরনো জোক মনে করে হাসছি। শুনতে চাও ? একবার একটা লোক নাপিতের দোকানে গিয়ে জিজ্ঞেস করল (এই জায়গায় এতরা খট করে রিসিভার নামিয়ে রাখল)।

পরপর দুরাত এতরার এক ফোঁটা ঘুম হলো না। খুট করে কোনো শব্দ হতেই সে লাফিয়ে ওঠে। তার মনে সন্দেহ, গার্ডরা হয়তো পাহারা দেবার নাম করে ঘুমুচ্ছে। সে প্রতি দুঘণ্টা পরপর নিচে নেমে যায় খোঁজ নিতে। কোনো একটা কামরায় বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

দ্বিতীয় রাতে কড়া এক ডোজ লিব্রিয়াম খেল। কিন্তু তাতেও কিছু হলো না। শেষরাতের দিকে তন্দ্রার মতো হলো। কিন্তু সে-তন্দ্রা বিভীষিকার তন্দ্রা, এতরা স্পষ্ট দেখল জামশেদ সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় এক হাতে একটি ধারালো তলোয়ার নিয়ে তার দিকে ছুটে আসছে। সে দৌড়াচ্ছে প্রাণপণে। দুজনের দূরত্ব ক্রমেই কমে আসছে। এতরার বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা লাফাচ্ছে, যেন এক্ষুনি ফেটে চৌচির হবে।

এতরা জেগে উঠে বিকট স্বরে কেঁদে উঠল, আহ্, বেঁচে থাকা কী কষ্টের ব্যাপার!

জামশেদ, তুমি কি এখন পুরোপুরি সুস্থ ?

হ্যাঁ।

পাঞ্জা লড়বে এক হাত ? দেখতে চাই সুস্থ কি না।

নাহ্।

ঠিক আছে। তোমার জন্যে ভালো চুরুট আনিয়ে রেখেছি। হাভানা চুরুট, নাও।

জামশেদ হাত বাড়িয়ে চুরুট নিল। শীতল স্বরে বলল, ক্যানটারেলা, এখন বলো কী বলতে চাও।

বলছি। তার আগে একটু মার্টিনি হলে কেমন হয় ?

আমি এখন মদ খাই না।

ভালো। তোমার জন্যে কফি দিতে বলি ?

বলো।

ক্যানটারেলা চুরুট ধরিয়ে হাসিমুখে বলল, তোমাকে ছোট্ট একটা গল্প বলতে চাই, জামশেদ।

গল্পে আমার কোনো আগ্রহ নেই, মি. ক্যানটারেলা।

জামশেদ তাকিয়ে রইল। ক্যানটারেলা মৃদুস্বরে বলল, আমি যখন খুব ছোট, তখন ভিকানডিয়া পরিবারের সঙ্গে আমাদের পরিবারের একটা বড় ধরনের ঝামেলা শুরু হয়। মাফিয়া পরিবারগুলির ঝামেলার নিষ্পত্তি কীভাবে হয় তা হয়তো তুমি জানো। এক পরিবারকে শেষ হয়ে যেতে হয়। আমাদেরও অবস্থা হলো সেরকম। শেষ পর্যন্ত কোনো উপায় না দেখে আমার বাবা সন্ধির ব্যবস্থা করল। সন্ধির শর্তগুলির মধ্যে একটি হলো— আমার মাকে যেতে হবে ভিকানডিয়ার ঘরে। রক্ষিতার মতো। আমার মা বিশেষ রূপসী ছিলেন। ভিকানডিয়ার শুরু থেকেই মা'র প্রতি আগ্রহ ছিল। পারিবারিক বিরোধের এটিও একটি কারণ। গল্পটি তোমার কেমন লাগছে, জামশেদ ?

জামশেদ জবাব দিল না। ক্যানটারেলা থেমে বলল, আমার মা'র বেশিদিন দুঃখ ভোগ করতে হলো না। অল্পদিন পরই তার মৃত্যু হলো। আমরাও ধীরে ধীরে সব ভুলে যেতে শুরু করলাম। একসময় ভিকানডিয়া আমাকে স্নেহ করতে শুরু করলেন। পুরাতন স্মৃতি কিছু আর মনে রইল না।

তারপর হঠাৎ একদিন তুমি এসে উদয় হলে। তোমার কাণ্ডকারখানা দেখে পুরনো সব কথাবার্তা আমার মনে পড়তে শুরু করল। বিশেষ করে মনে পড়তে লাগল আমার মাকে। তিনি আমাকে কী ডাকতেন জানো ? তিনি ডাকতেন 'ন্যাংটো বাবা' বলে। কীরকম অদ্ভুত নাম, দেখলে ?

জামশেদ তাকিয়ে দেখল ক্যানটারেলার চোখ দিয়ে জল পড়ছে। ক্যানটারেলা ধরাগলায় বলল, জামশেদ, আমার শরীরটা হাতির মতো কিন্তু আমার সাহস নেই।

আমি পৃথিবীর সবচে’ বলশালী কাপুরুষদের একজন। সেজন্যেই তোমাকে আমার প্রয়োজন।

জামশেদের চুরুট নিভে গিয়েছিল। সে আবার চুরুট ধরাল। ক্যানটারেলা মৃদুস্বরে বলল, ভিকানডিয়ার প্রাসাদে ঢোকার ব্যবস্থা আমি করে দেব। বেরুবার ব্যবস্থা করতে পারব না। এটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে জার্নি। তুমি ঢুকতে পারবে, বেরুতে পারবে না।

জামশেদ শান্তস্বরে বলল, বেরুতে না পারলেও ক্ষতি নেই।

আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছি। রওনা হতে হবে আজ রাতেই। আজ রাত ন'টায় বিশেষ কারণে ভিকানডিয়ার ঘরের সব বাতি হঠাৎ করে নিভে যাবে।

জামশেদ কিছু বলল না। ক্যানটারেলা ঠান্ডা গলায় বলল, তুমি যদি ফিরে না আসতে পারো, তা হলে এতরার ব্যবস্থা আমি করব। তুমি এ ব্যাপারে কিছুমাত্র চিন্তা করবে না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি।

ঠিক আছে।

জামশেদ, আরেকটি কথা। যদি তুমি ফিরে না আসতে পারো তাহলে তোমার ডেডবডি কি দেশে ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা করব ?

নাহ্।

কাউকে কিছু বলতে হবে ?

নাহ্।

কোনোকিছুই বলার নেই তোমার ?

জামশেদ মৃদুস্বরে বলল, যদি সম্ভব হয় অ্যানির পাশে একটু জায়গা রাখবে। মেয়েটি বড্ড ভীতু। আমি পাহারায় থাকলে হয়তো শান্তিতে ঘুমুবে।

ক্যানটারেলা তাকিয়ে রইল, কিছু বলল না।

গভীর রাতে এতরার ঘুম ভেঙে গেল। ঝনঝন করে টেলিফোন বাজছে। যেন ভয়াবহ কোনো খবর এসেছে টেলিফোনে। এতরা কাঁপা গলায় বলল, হ্যালো।

এতরা, খবর শুনেছ ?

কী খবর ?

বস ভিকানডিয়াকে খুন করা হয়েছে। কে করেছে বুঝতে পারছ তো ?

কে ? জামশেদ ?

ঠিক ধরেছ। তবে তোমার জন্যে একটি সুখবর আছে। জামশেদও মারা যাচ্ছে। খুব বেশি হলে ঘণ্টাখানেক টিকে থাকবে। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ ?

পাচ্ছি।

একবার সিটি হাসপাতালে এসে দেখবে না কত লক্ষ লক্ষ মানুষ এসে জমা হয়েছে এই বিদেশী মানুষটির খবর নিতে ?

তুমি কে ?

ইতালির সবচে' বড় বড় ডাক্তাররা ছুটে এসেছেন। তিনটি আলাদা আলাদা মেডিক্যাল বোর্ড হয়েছে। এরকম মরায় সুখ আছে, তাই না ?

তুমি কে ?

আমাকে চিনতে পারছ না ?

না। তুমি কি ক্যানটারেলা ?

টেলিফোন লাইন কেটে গেল। আবার দুঘণ্টা পর ঝনঝন করে বেজে উঠল।

হ্যালো, এতরা ?

হ্যাঁ।

সুসংবাদ, জামশেদ মারা গেছে।

তুমি কে ?

আমি ওর প্রেতাত্মা। জামশেদের মতো লোকগুলি মরেও মরে না। দীর্ঘকাল বেঁচে থাকে। আমি কিছুক্ষণের মধ্যে আসছি।

এতরা কাঁপা গলায় বলল, তুমি ক্যানটারেলা ?

না, আমি জামশেদ। আমি আসছি।

রাত চারটায় ছোট্ট একটি সাদা রঙের ওপেল গাড়ি এতরার বাসার সামনে থামল। ক্যানটারেলা নেমে এলো গাড়ি থেকে। নিচের গার্ডরা কেউ তাকে আটকাল না। এতরা বারান্দায় বসে শুনল সিঁড়ি বেয়ে ভারী পায়ে কে যেন উঠে আসছে উপরে।

ইস্টার্ন সিমেট্রিতে অ্যানি নামের মেয়ের কবরের পাশে একজন বিদেশীর কবর আছে। তার গায়ে চার লাইনের একটি ইতালিয়ান কবিতা যার অর্থ অনেকটা এরকম—

এখানে একজন মানুষ ঘুমিয়ে আছে। তাকে শান্তিতে ঘুমুতে দাও।

কবরটির পাশেই দুটি প্রকাণ্ড চেরিফুলের গাছ। বসন্তকালে কবরটি সাদা রঙের চেরিফুলে ঢাকা পড়ে থাকে। বড় চমৎকার লাগে দেখতে।

শিশুতোষ রচনা

তোমাদের জন্য রূপকথা

কানী ডাইনি

ডাইনিরা কত দিন বাঁচে তোমরা জানো ?

জানো না, তাই না ? কেউ কিন্তু জানে না।

কিছু কিছু ডাইনি অল্প বয়সে মরে যায়। আবার কিছু আছে সহজে মরে না। পাঁচ শ' ছ' শ' এমনকি হাজার বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। তখন অবশ্যি তারা খুব কষ্টে পড়ে যায়। গায়েব জোর কমে যায়, হাঁটা-চলা করতে পারে না। চোখে ছানি পড়ে ভালো দেখতে পায় না। মন্ত্রটন্ত্র ভুলে যেতে শুরু করে। এক মন্ত্রের জায়গায় অন্য মন্ত্র বলে। আগের শব্দ বলে পরে, পরেরটা বলে আগে, মন্ত্র কাজ করে না।

কটক পাহাড়ে এ রকম একটি হাজার বছরের বুড়ি ডাইনি থাকত। তার একটা মাত্র চোখ। তাই তার নাম কানী ডাইনি। বয়স খুব বেশি হয়ে যাওয়ায় কোনো মন্ত্রই এখন আর ঠিকমতো বলতে পারে না। তার কষ্টের আর সীমা নেই।

একদিন তার গায়ে আকাশ-পাতাল জ্বর। শরীর দুর্বল। এদিকে প্রচণ্ড খিদের যন্ত্রণায় চোখে আঁধার দেখছে, খাবারের কী ব্যবস্থা করবে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ মনে হলো, খাবারদাবারের একটা মন্ত্র তো তার জানা আছে। এক নিশ্বাসে এই মন্ত্রটি বলে বুড়ো আঙুল আকাশের দিকে উঁচু করে কোনো খাবার চাইলেই খাবার চলে আসবে। এখন সমস্যা হয়েছে এক নিশ্বাসে বলা। আজকাল তার দম ফুরিয়ে গেছে। এক নিশ্বাসে কিছু বলতে পারে না। তবু সে বিছানায় উঠে বসল। চোখ বন্ধ করে এক নিশ্বাসে বলল—

'ইরকিম বিরকিম
নাগা খিরকিম
এলট বেলট ইলবিল ঝাঁ
পোলাও-কোরমা এসে যা।'

বলেই সে বুড়ো আঙুল উঁচু করল। কিচ্ছু হলো না! পোলাও-কোরমা এলো না। তার মানে মন্ত্র ভুল হয়েছে। আগের শব্দ পরে এসেছে, পরেরটা এসেছে আগে। হয়তো ইরকিম বিরকিম হবে না। হবে বিরকিম ইরকিম। এলট বেলটের জায়গায় হয়তো হবে বেলট এলট। বুড়ি আবার পড়ল—

'বিরকিম ইরকিম
নাগা খিরকিম
বেলট এলট ইলবিল ঝাঁ
পোলাও-কোরমা এসে যা।'

তাতেও লাভ হলো না।

কানী ডাইনি কতভাবেই না চেষ্টা করল। ইলবিলের জায়গায় বলল– খিলখিল, ঝাঁর জায়গায় খাঁ। কিছুতেই কিছু হয় না। বুড়ি শেষ পর্যন্ত পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসল।

এদিকে কী হয়েছে শোনো। কটক পাহাড়ের নিচেই মনপুকুর গ্রাম। সেই গ্রামের ছোট্ট একটা মেয়ের নাম হচ্ছে মৌ। মৌ খুব ভালো মেয়ে। তার একটাই দোষ, শুধু গল্প শুনতে চায়। ভাত খাবার সময় বলবে, একটা গল্প বলো মা, গল্প না বললে ভাত খাব না। ঘুমুবার সময় বলবে, গল্প না বললে ঘুমুব না। পাঠশালায় যাবার সময় বলবে, গল্প না বললে, পাঠশালায় যাব না। মৌয়ের বাবা-মা সবাই বিরক্ত। কত আর গল্প বলা যায়? শেষমেশ একদিন মৌয়ের বাবা রাগ করে বললেন, আর গল্প-গল্প করলে চড় খাবি।

মৌয়ের খুব মন খারাপ হলো। দুপুরে সে রাগ করে বলল, আমি কিচ্ছু খাব না। মৌয়ের মা বললেন, এত সাধাসাধি করতে পারব না। না খেলে না খাবি।

মৌ ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, আমি বাড়ি ছেড়ে চলে যাব।

কোথায় যাবি?

কটক পাহাড়ে যাব।

যেতে চাইলে যা। ওখানে থাকে কানী ডাইনি। মন্ত্র পড়ে তোকে যখন পাথর বানিয়ে ফেলবে, তখন মজা টের পাবি।

এই বলে মৌয়ের মা ঘরের কাজকর্ম করতে গেলেন আর মৌ করল কী— সত্যি-সত্যি বাড়ি থেকে বেরিয়ে কটক পাহাড়ের দিকে হাঁটতে শুরু করল। নদীর ধার দিয়ে পায়ে চলার সুন্দর পথ। সে হাঁটছে তো হাঁটছেই, পথ আর ফুরায় না। অচেনা লোকজনের সঙ্গে দেখা হয়। তারা অবাক হয়ে বলে, এই মেয়ে যাচ্ছ কোথায়?

কটক পাহাড়ে।

বলো কী! তুমি এইটুকু বাচ্চা মেয়ে, একা যাচ্ছ কটক পাহাড়ে?

হ্যাঁ যাচ্ছি। গেলে কী হয়?

ঐ পাহাড়ে থাকে কানী ডাইনি। ভীষণ পাজি।

আমি ঐ ডাইনীর কাছেই যাচ্ছি।

কী সর্বনাশের কথা! এই মেয়ে, থামো।

মৌ থামে না, হাঁটতে থাকে। সবাই ভাবে কিছুদূর গিয়েই ফিরে আসবে। বাচ্চা মেয়ে, ও কি আর সত্যি-সত্যি কটক পাহাড়ে যাবে!

মৌ কিন্তু থামে না। সন্ধ্যার আগে আগে পৌঁছে যায় কটক পাহাড়ের নিচে। কী সুন্দর পাহাড়! কত রকম ফলের গাছ। পেকে টসটস করছে রকমারি ফল। ডাইনির ভয়ে কেউ এদিকে আসে না। গাছের ফল গাছেই পেকে ঝরে পড়ে। কাক এবং বাদুড়ে খায়।

ফুলেরই-বা বাহার কত! লাল ফুল, নীল ফুল, হলুদ ফুল। পাহাড় আলো হয়ে আছে। কিছুদূর পরপর পাহাড়ি ঝরনা। পরিষ্কার টলটলে পানি। ভারি মিষ্টি। এমন একটা চমৎকার জায়গায় ডাইনির ভয়ে কেউ আসে না ভেবেই মৌয়ের মন খারাপ হয়ে গেল। সে ঠিক করল, এরপর থেকে সে রোজ এখানে আসবে। কোঁচড় ভর্তি করে ফল পাড়বে। ফেলে-ছড়িয়ে খাবে। কিছু বাড়িতে নিয়ে যাবে। সবাই যখন বলবে— এসব কোথায় পেলি ? সে কিচ্ছু বলবে না, মুখ টিপে হাসবে। গাঁয়ের সব ছেলেমেয়েরা তাকে ধরবে— আমায় নিয়ে চল্ না মৌ। একবারটি নিয়ে চল্ না। মৌ তাদের আনবে না।

পাহাড়ে ঘুরতে-ঘুরতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো। সূর্য অসম্ভব লাল হয়ে ডুবি-ডুবি করতে লাগল। আলো গেল কমে। আর ঠিক তখন মৌ শুনল, কে যেন ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে কাঁদছে। মৌয়ের বুক ধক করে উঠল। সে বলল, কে, কে ? কেউ জবাব দিল না। কিন্তু কান্নার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মৌ দেখল পাহাড়ের ঠিক চুড়োয় দু'টা ছাতিম গাছ। তার নিচে ভাঙা কুঁড়েঘর। কান্নার শব্দ ওখান থেকেই আসছে। মৌ পা টিপে টিপে এগুল।

কুঁড়েঘরের দরজা খোলা। বিছানায় পা ছড়িয়ে ফোকলা দাঁতের এক বুড়ি হাপুস নয়নে কাঁদছে। মাঝে-মাঝে মাথা ঝাঁকাচ্ছে, তখন তার মাথার সাদা চুল ঘূর্ণির মতো তৈরি করছে, সুন্দর লাগছে দেখতে। ঘরের ভেতরে রাজ্যের ময়লা। ঠিক মাঝখানে বিশাল এক পেতলের কড়াই। চারদিকে হাঁড়িকুড়ি। একটা কাচের জগে থিকথিক করছে কালো একটা জিনিস। বিশ্রী গন্ধ আসছে সেখান থেকে।

মৌ বলল, কাঁদছ কেন বুড়ি মা ?

অমনি ডাইনির কান্না থেমে গেল। সে চোখ পিট-পিট করে তাকাতে লাগল। মনে-মনে বলল, কীরকম মিষ্টি-মিষ্টি গন্ধ আসছে মেয়েটার গা থেকে। নিশ্চয়ই মানুষের মেয়ে। এরকম মিষ্টি গন্ধ মানুষের গায়েই থাকে। যখন এ রকম গন্ধ পাওয়া যায়, তখন একটা ছড়া বলতে হয়। সেই ছড়ার প্রথম লাইনটা তার কিছুতেই মনে পড়ছে না। শুধু শেষ লাইনটা মনে আসছে। কানী ডাইনি শেষ লাইনটা বলল, মানুষের গন্ধ পাঁউ।

মৌ অবাক হয়ে বলল, মানুষের গন্ধ পাঁউ আবার কী ?

তোর গায়ে মানুষের গন্ধ।

আমি মানুষ, তাই আমার গায়ে মানুষের গন্ধ। তুমি আমাকে তুই তুই করে বলছ কেন ?

সেই দিনের পুঁচকি মেয়েকে আপনি করে বলতে হবে ?

বেশ তো, তুমি করে বলো। কাঁদছিলে কেন ?

ইচ্ছে হয়েছে কেঁদেছি। তোর তাতে কী ?

ওমা! আবার তুই করে বলছ ? ছিঃ।

ছিঃ ছিঃ করবি না। তুই করে বলা আমার অভ্যেস।

তাই বুঝি ? তা কাঁদছিলে কেন ? কাঁদাও বুঝি তোমার অভ্যেস ?

কাঁদছি খিদের যন্ত্রণায়! তোর কোঁচড়ে কী ? পাকা পেয়ারা! দে তো খেয়ে দেখি।

মৌ পেয়ারা দিল। একটা আপেল ছিল, তাও দিল। কানী ডাইনির দাঁত নেই, খুব কষ্ট হলো খেতে। তবু খাবার পর বড় ভালো লাগল। হাসিমুখে বলল, এই মেয়ে তোর নাম কী ?

মৌ!

মৌ! ওয়াক থু। মৌ আবার কেমন নাম ? শুনেই বমি এসে যাচ্ছে। তোর বাপ-মা আর নাম পেল না! তোর নাম নাকেশ্বরী রাখলেই হতো। তোর কেমন লম্বা নাক। হি হি হি।

মৌ কাঁদো-কাঁদো হয়ে বলল, এরকম ঠাট্টা করছ কেন ?

ঠাট্টা করছি বেশ করছি। তোর নাম দিলাম কোদালমুখী। তোর মুখটা কোদালের মতো, এই জন্য কোদালমুখী নাম। হি হি হি।

আর তোমার মুখটা হচ্ছে ডাইনির মতো।

কানী ডাইনি খসখসে গলায় বলল, আমার মুখ ডাইনির মতো হবে না তো কিসের মতো হবে ? মানুষের মতো হবে ? ডাইনির মুখ হয় ডাইনির মতো।

তুমি কি ডাইনি নাকি ?

ডাইনি না তো কি ? এক্ষুনি এমন মন্ত্র বলব যে তুই পাথর হয়ে যাবি।

পাথর বানানোর মন্ত্র জানো ?

জানব না মানে ? একশ' বার জানি। এখন ভুলে গেছি।

ভুলে গেছ!

হ্যাঁ। সব মন্ত্র ভুলে গেছি। একটা মন্ত্র শুধু জানি।

কোনটা জানো ?

ঘর ঝাঁট দেয়ার মন্ত্র। বলব ?

বলো।

মনে মনে বলতে হবে। শব্দ করে বললে তুই শিখে ফেলবি। মন্ত্র শেখাতে নেই।

এই বলেই কানী ডাইনি বিড়বিড় করে কী এক মন্ত্র পড়ল, অমনি ঘরের কোনের ঝাঁটাটা আপনাআপনি নড়াচড়া শুরু করল। কী সুন্দর হেলেদুলে ঘর ঝাঁট দিচ্ছে। মৌ মুগ্ধ হয়ে গেল।

বুড়ি মা, তুমি আর কী মন্ত্র জানো ?

সব জানতাম। আকাশে ওড়ার মন্ত্র, বৃষ্টি নামাবার মন্ত্র, ভয় দেখানোর মন্ত্র। এখন সব ভুলে গেছি!

লিখে রাখোনি কেন ? লিখে রাখলে তো আর ভুলতে না।

লিখব কী করে ? আমি কি লেখাপড়া জানি ? এই মেয়ে নাকেশ্বরী, তুই আমাকে একগ্লাস ঠান্ডা পানি খাওয়াবি ? তেষ্টা পেয়েছে।

নাকেশ্বরী ডাকলে পানি এনে দেব না।

তাহলে কী ডাকব ? কোদালমুখী ? পেতকি দন্তী ? কুঁৎ-কুঁৎ চোখী।

ছিঃ বুড়ি মা ছিঃ, বাচ্চা মেয়ের সঙ্গে কেউ এরকম করে ? আমি তোমাকে পানি এনে দেব না, কিচ্ছু করব না। আমি এখন বাসায় যাব। সন্ধ্যা হয়ে গেছে দেখছ না ? মা বকবে।

তুই যেতে পারবি না, মন্ত্র পড়ে তোকে পাথর বানিয়ে দেব।

মন্ত্র তোমার মনেও নেই।

কানী ডাইনি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। মন্ত্র তার সত্যি-সত্যি মনে নেই। মৌ বলল, একটা কাজ যদি তুমি কর, তাহলে পানি এনে দেব।

কী কাজ ?

একটা গল্প বলো।

কিসের গল্প ?

ডাইনির গল্প।

কানী ডাইনি সঙ্গে-সঙ্গে গল্প শুরু করল। কী সুন্দর গল্প! একটা দুষ্ট ডাইনি কী করে এক রাজকন্যাকে টিয়েপাখি বানিয়ে রাখল। আর অন্য দেশের এক রাজপুত্রকে বানাল 'হুতুম'— তার গল্প। শেষমেশ দু'জনেই মানুষ হয়ে গেল। আর মহা ধুমধামে তাদের বিয়ে হলো। এত সুন্দর গল্প। আর কানী ডাইনিটা কী চমৎকার করেই না গল্পটা বলেছে। মৌ মুগ্ধ হয়ে বলল, তুমি এত সুন্দর গল্প জানো ?

কানী ডাইনি কড়া গলায় বলল, গল্প কোথায় রে! সত্যি কথা বললাম। আমিই তো রাজকন্যাকে টিয়া বানিয়েছিলাম। টিয়া বানানো খুব সোজা। পাখিমন্ত্র বলে পানির ছিটা দিতে হয়।

মৌ কানী ডাইনিকে পানি এনে খাওয়াল! গল্পটা তার এত পছন্দ হলো যে, শেষ পর্যন্ত সে বলেই ফেলল, বুড়ি মা তুমি আমার সঙ্গে যাবে ?

কোথায় ?

আমাদের গাঁয়ে। আমাদের বাড়িতে থাকবে।

আরে এই নাকেশ্বরী বলে কী! তোদের বাড়ি গিয়ে আমি করব কী ?

তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। শুধু সন্ধ্যাবেলা আমাদের গল্প শোনাবে। আর আমরা সব ছেলেমেয়েরা তোমার কত যত্ন করব! চুলে বিলি দিয়ে দেব। আঙুল মটকাব। পিঠ চুলকে দেব। আর যখন যা খেতে চাইবে খাওয়াব।

সত্যি বলছিস ?

সত্যি না তো কী ? এক সত্যি দুই সত্যি তিন সত্যি।

গাঁয়ের মানুষরা আমাকে ধরে মারবে না তো ?

মারবে কেন শুধু-শুধু!

কানী বুড়ি অনেকক্ষণ চিন্তা করল। মন্ত্রটন্ত্র ভুলে এমন অবস্থা হয়েছে যে, এখানে থাকলে না খেয়ে মরতে হবে। তারচে' মেয়েটার সঙ্গে চলে যাওয়া অনেক ভালো। কানী ডাইনি লাঠিতে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল।

এদিকে মৌদের বাড়িতে কান্নাকাটি পড়ে গেছে। সন্ধ্যা হয়ে গেছে, এখনো মৌ ফিরছে না। গাঁয়ের সবার মুখ কালো। সবার ধারণা, মৌ ডাইনির খপ্পরে পড়েছে। গাঁয়ের মানুষ কী করবে ভেবে পাচ্ছে না! কটক পাহাড়ে যাওয়া দরকার, কিন্তু সাহসে কুলোচ্ছে না।

এ রকম যখন অবস্থা তখন দেখা গেল মৌ ফিরছে। তার পেছনে-পেছনে লাঠি ঠুকঠুক করে আসছে কানী ডাইনি।

সেই থেকেই কানী ডাইনি মৌদের বাড়িতে থাকে। সন্ধ্যা হতেই রাজ্যের ছেলেপুলে জড়ো হয়। কানী ডাইনি কত মজার-মজার গল্প করে। কিছু কিছু গল্প খুব ভয়ের। কিন্তু তাদের মোটেও ভয় লাগে না। একটা গল্প শেষ হতেই বাচ্চারা চেঁচায়— আরেকটা বলো, আরেকটা বলো।

কানী ডাইনি বিরক্ত হয়ে বলে, চেঁচাবি না তা। এরকম চেঁচালে মন্ত্র পড়ে পাথর বানিয়ে দেব।

বাচ্চারা খিলখিল করে হাসে। কানী ডাইনিকে তারা মোটেও ভয় পায় না। খুব ভালোবাসে।

রানি কলাবতী

এক দেশে এক রাজা ছিলেন।

রাজা থাকলেই রানি থাকতে হয়। তাও একজন নয়, দু'জন। একজন ভালো একজন মন্দ। সুয়োরানি ও দুয়োরানি। কিন্তু আমাদের এই রাজার ছিল একটি রানি। তাঁর চুল ছিল কালবোশেখির মেঘের মতো। চোখ ছিল নীলকান্তমণির মতো। গায়ের রঙ ছিল হলুদ কলাবতী ফুলের মতো। তাই তার নাম কলাবতী কন্যা। রাজা তাঁকে খুব ভালোবাসতেন। আদর করে ডাকতেন কলাবতী-কেশবতী-মায়াবতী রানি।

তাঁরা দু'জন খুব সুখেই ছিলেন। রাজার খুব গানের শখ। তিনি থাকতেন গান-বাজনা নিয়ে। দেশ-বিদেশের বড়-বড় সব গাইয়েরা থাকত তাঁর চারপাশে। কারো গলা বাঁশির মতো চিকন, কারো গলা ঢোলকের শব্দের মতো ভারি। তাঁদের কাজ ছিল একটি— রাজাকে গান শোনানো। কেউ গাইতেন সূর্য ওঠার আগে আগে, কেউ দুপুরে, কেউ সন্ধ্যায়, আবার কেউ কেউ গভীর রাতে— যখন চারদিক চুপচাপ

শুনশান! রাজা চোখ বন্ধ করে গান শুনতেন। আনন্দে এক-একবার তাঁর কান্না পেয়ে যেত। খুব যখন তাঁর ভালো লাগত, তিনি চাপা গলায় বলতেন, 'মধু! মধু!!' বড় আনন্দে সময় কাটছিল রাজার। তাঁর সুখের কোনো সীমা ছিল না।

রানির সময়ও বড় আনন্দে কাটছিল। তাঁরও সুখের সীমা ছিল না। রানির ছিল সাজবার শখ। সাজগোজ করতে-করতেই তাঁর দিন কাটত। সেই সাজেরও কত কায়দা। খুব ভোরে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজবাড়ির মালীরা নিয়ে আসত এক হাজার একটা টাটকা জলপদ্ম। সেই পদ্ম বেটে তৈরি হতো পদ্মমাখন। সাতজন দাসী সেই পদ্মমাখন মাখিয়ে দিত রানির গায়ে। পদ্মমাখন মেখে রানি গা ধুতেন কালো গাইয়ের টাটকা দুধে।

প্রজাপতির পাখা থেকে রঙ এনে সেই রঙ মাখানো হতো রানির গালে। নীলকান্তমণি গুঁড়া করে সেই নীল গুঁড়া দেয়া হতো রানির চোখের পাতায়। ঠোঁটে দেয়া হতো রক্তচন্দনের লাল রঙ। সাজ শেষ হতে সন্ধ্যা হয়ে যেত। রানি তখন চুল বেঁধে, নীলাম্বরী শাড়ি পরে দাসীকে বলতেন, তোমাদের রাজাকে ডেকে নিয়ে এস। খবর পেয়েই ছুটে আসতেন রাজা। রানি বলতেন, আজ আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ? রাজা হেসে বলতেন, মধু! মধু!!

রানি আনন্দে হেসে ফেলতেন। তারপর ডাকতেন রাজপুরীর শত দাসীদের। হাসিমুখে বলতেন, আজ আমাকে কেমন দেখাচ্ছে ? ওরা সবাই একসঙ্গে বলত, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

আমার মতো রূপবতী কাউকে কি তোমরা এর আগে দেখেছ ?

আমরা দেখিনি।

তোমরা সত্যি বলছ তো ?

সত্যি সত্যি সত্যি।

একসময় সন্ধ্যা মিলাত। একটি দু'টি করে তারা ফুটত আকাশে। রানি কলাবতী একা-একা হাঁটতে শুরু করতেন নীল পুকুরের দিকে। নীল পুকুর রাজবাড়ি থেকে একটু দূরে। সেই পুকুরের পানি ঘন নীল। কাচের মতো স্বচ্ছ। সেই পানিতে কখনো ঢেউ ওঠে না। রানি কলাবতী ছাড়া আর কেউ নামে না সেই পানিতে। নিয়ম নেই।

প্রতি সন্ধ্যায় নীল পুকুরে যান শুধু রানি। শ্বেতপাথরের বাঁধানো ঘাটে খানিকক্ষণ বসে থাকেন। চারদিক কী অদ্ভুত নীরব। তাঁর কেন জানি মন কেমন করে। তিনি ছোট নিশ্বাস ফেলে একসময় এগিয়ে যান পুকুরের জলের কাছে। নীল জলে রানির মুখের ছবি ভেসে ওঠে। কী অপূর্ব একটি মুখ! রানি মুগ্ধ হয়ে নিজেকে দেখেন এবং ফিসফিস করে বলেন,

আমি এক রূপবতী,
কেশবতী কন্যা আমার নাম।

আমায় দেখে লজ্জা পায়
ফুলগুলি সব মুখ লুকায়
আমার মতো কে আছে কোথায় ?

তারপর রানি কী করেন ? পুকুরের পানিতে পা ডুবিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকেন। একসময় চারদিক গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে যায়। পুকুরের চারপাশের বকুল গাছে লাখ লাখ জোনাকি জ্বলতে থাকে এবং নিভতে থাকে। রানি তখন জলে গা ভাসিয়ে দেন। মনের আনন্দে সাঁতার কাটেন। পানি ছিটিয়ে-ছিটিয়ে নিজের মনেই খেলা করেন।

একদিন হয়েছে কী, সেজেগুজে রানি গিয়েছেন নীল পুকুরে। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। শ্বেতপাথরের ঘাটে বসবার সঙ্গে-সঙ্গেই আকাশে চাঁদ উঠল। রুপোর থালার মতো কী বিশাল একটা চাঁদ! কী তার জোছনা! যেন লাখ লাখ আলোর ফুল আকাশ থেকে ঝরে-ঝরে পড়ছে। নীল পুকুরের স্থির জলে চাঁদের ছায়া। কী অদ্ভুত দৃশ্য!

রানি রোজকার মতো জলে উঁকি দিলেন। তাঁর মুখের ছায়া যেখানে পড়েছে, তার পাশেই চাঁদের প্রতিবিম্ব। চিকচিক ঝিকমিক করছে। রানি সেদিকে তাকিয়ে বললেন, মাগো, চাঁদটা কী কুৎসিত! তার সারা গায়ে কী সব বিচ্ছিরি দাগ। এগুলোকেই বোধহয় চাঁদের কলঙ্ক বলে। এই বিশ্রী দাগ নিয়ে চাঁদ মানুষকে মুখ দেখায় কী করে ? আমি হলে জলে ডুবে মরতাম।

চাঁদ রানির কথা শুনল। তার খুব মন খারাপ হলো। রানি আবার বললেন, দাগওয়ালা এই নোংরা চাঁদটা পানিতে। আমি এখন কী করে পানিতে নামি!

রানির এই কথায় চাঁদের চোখে জল এলো। সে ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে বলল,

‘মেঘ ভাই মেঘ ভাই
মনে বড় কষ্ট পাই।’

অমনি বিশাল একটা মেঘ এসে চাঁদকে জড়িয়ে ধরল। চাঁদ ঢাকা পড়ল মেঘের আড়ালে। রানি বললেন, বাঁচলাম। মেঘ এখন যদি সরে যায় তাহলে বড্ড ঝামেলা হবে। কলঙ্ক-ধরা চাঁদটা আবার দেখা যাবে।

এই কথায় চাঁদ সত্যি-সত্যি কেঁদে ফেলল। কাঁদতে-কাঁদতে বলল,

‘বাতাস ভাই বাতাস ভাই
মনে বড় কষ্ট পাই।’

অমনি দমকা একটা বাতাস এসে মেঘে ঢাকা চাঁদকে উড়িয়ে নিয়ে চলে গেল। চারদিক অন্ধকার হয়ে গেল। রানি বললেন, আপদ বিদেয় হয়েছে— ভালো হয়েছে। এই বলে তিনি জলে নামলেন। মনের আনন্দে অনেকক্ষণ সাঁতার কাটলেন। গুনগুন করে গান গাইলেন। পানি ছুড়ে ছুড়ে নিজের মনে খেলা করলেন। মাঝপুকুর থেকে পদ্মফুল তুলে এনে খোঁপায় গুঁজলেন। তারপর ফিরে এলেন রাজপুরীতে।

রাজপুরীতে পা দিয়েই তিনি একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করলেন। যার সঙ্গে দেখা হয় সে-ই যেন কেমন করে তাকিয়ে থাকে। চোখে চোখ পড়লে চোখ ফিরিয়ে

নেয়। দাসীরা এ চায় ওর দিকে, ও চায় এর দিকে। রানী বললেন, কী হয়েছে? এই, তোরা এরকম করছিস কেন?

কেউ জবাব দেয় না। রানি চিন্তিতমুখে নিজের মহলে ঢুকলেন। ভেজা কাপড় ছাড়লেন। চুল শুকোলেন। সোনার কাঁকন হাতে বসলেন আয়নার সামনে। আয়নায় চোখ পড়তেই তাঁর বুক কেঁপে উঠল। কাকে তিনি দেখছেন আয়নায়! এ কে? এই ছবি কি তাঁর? সমস্ত মুখে চাঁদের কলঙ্কের মতো কুৎসিত কালো-কালো দাগ। রানি সোনার চিরুনি ছুড়ে ফেলে চেঁচিয়ে কেঁদে উঠলেন।

রাজা তখন রাজদরবারে। পশ্চিম দেশের এক বড় ওস্তাদ গাইছেন, ভীমপলশ্রী। অপূর্ব সুরধ্বনিতে চারদিক মুখরিত। রাজা বললেন, মধু! মধু!! ঠিক তখন রাজপুরীর দাসী এসে নকিবের কানে কানে কী যেন বলল। নকিব এসে ফিসফিস করে বলল কোটালকে। কোটাল বলল সেনাপতিকে। সেনাপতি সেই কথা তুলে দিল প্রধানমন্ত্রীর কানে। প্রধানমন্ত্রী তুলল রাজার কানে। ফিসফিস করে বলল, মহারাজ।

রাজা বিরক্ত হয়ে তাকালেন। মন্ত্রী আমতা-আমতা করে বললেন, আপনাকে একটু অন্দরমহলে যেতে হয়।

কেন?

রানি কলাবতী কেমন জানি করছেন।

কী করছেন?

খুব কাঁদছেন।

রানি কলাবতী কাঁদছেন? বলছ কী তুমি!

রাজা গানের আসর ভেঙে ছুটে গেলেন রানিমহলে। রানিমহল অন্ধকার। দীপ জ্বলেনি। শুধু একটি পিলসুজ মিটিমিটি করে জ্বলছে রানির ঘরে। রাজা ঢুকতে গেলেন রানিমহলে, ঢুকতে পারলেন না। চারজন দাসী দরজা আটকে দাঁড়িয়ে আছে। তারা ঠান্ডা গলায় বলল, ভেতরে ঢুকতে নিষেধ আছে মহারাজ।

কার নিষেধ?

রানিমার নিষেধ।

রাজা ওদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে ঘরে ঢুকলেন। রানি কলাবতী দুহাতে মুখ ডেকে মূর্তির মতো বসে আছেন। তাঁকে ঘিরে বসে আছে পঞ্চাশজন দাসী। দাসীদের মুখে কোনো কথা নেই। তাদের চোখ ছলছল করছে। রাজা কাতর গলায় বললেন, রানি কলাবতী, কী হয়েছে তোমার?

রানি জবাব না দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলেন।

রানি কি হয়েছে তুমি আমাকে বলো।

রানি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, আমার সারা মুখ কুৎসিত কালো-কালো দাগে ভরে গেছে।

সে-কী!

কিছুতেই এই দাগ উঠছে না। ঘেন্নায় আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। আপনি আমায় বিষ এনে দিন। আমি বিষ খেয়ে মরব।

তোমার হাত সরাও রানি। দেখি কেমন দাগ।

না না না। আমার এই নোংরা মুখ আমি কাউকে দেখাব না।

রানি চিৎকার করে কেঁদে উঠলেন। দাসীরাও কাঁদতে শুরু করল। রাজা চিন্তিত মুখে দরবারে ফিরে এলেন। পশ্চিম দেশের গায়ক তখনো ভীমপলশ্রী গাইছেন। সুরের বান ডেকেছে। কিন্তু সেই সুর রাজার কানে অসহ্য শোনাল। রাজা মুখ বিকৃত করে বললেন, এই গাধাটা এখনো চেঁচাচ্ছে কেন ? থামতে বলো।

সেনাপতি গায়কের মাথায় প্রচণ্ড চাঁটি দিয়ে গায়ককে থামিয়ে দিল। বেচারা ফ্যালফ্যাল করে রাজার দিকে তাকিয়ে রইল। তার গান রাজা এত পছন্দ করেন, কিন্তু আজ এই অবস্থা কেন ?

রাজা রাগী গলায় বললেন, মন্ত্রী, সেনাপতি এবং কোটাল— এই তিনজন ছাড়া সব বিদেয় হও। দেখতে-দেখতে দরবার খালি হয়ে গেল। রাজা বললেন, রাজবৈদ্যকে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রাজবৈদ্য রাজাকে কুর্নিশ করে দাঁড়াল। তাঁর বয়স আশি। লাঠিতে ভর না দিয়ে তিনি দাঁড়াতে পারেন না। চোখে ভালো দেখতে পান না। কানেও তেমন শুনতে পান না। কিন্তু তাঁর রাজ্যজোড়া নাম। হেন অসুখ নেই যার ওষুধ তিনি জানেন না।

লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা তাঁর বাৎসরিক বেতন। রাজা বললেন, মহাজ্ঞানী রাজবৈদ্য।

বলুন মহারাজা।

রানি কলাবতীর মুখে কালো-কালো দাগ। এই দাগ কিছুতেই যাচ্ছে না। রানি কেঁদে কেঁদে চোখ ফুলিয়েছেন। আপনি কি এই দাগ দূর করতে পারেন ?

অবশ্যই পারি। দাগ-বিমোচন মলম একবার ব্যবহার করলেই দাগ দূর হবে।

মলম কি আপনার কাছে আছে ?

না নেই। তৈরি করতে হবে।

বেশ তৈরি করুন।

দাগ-বিমোচন মলম তৈরিতে তিনটি জিনিস লাগে মহারাজা। আপনি ঐ তিনটি জিনিস এনে দিন, আমি মলম তৈরি করে দিচ্ছি।

জিনিসগুলোর নাম বলুন, আমি আনাবার ব্যবস্থা করছি।

প্রথমে যে জিনিসটি লাগবে তা হচ্ছে— বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।

রাজা অবাক হয়ে বললেন, বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি! কী বলছেন এসব ? কোথায় পাওয়া যায় ?

তা তো মহারাজ বলতে পারব না।

রাজা তাকালেন কোটালের দিকে। অমনি কোটাল রাজাকে কুর্নিশ করে বেরিয়ে পড়ল। সে আনবে বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি।

রাজা বললেন, আর কী লাগবে রাজবৈদ্য ?

আর লাগবে শেয়ালের ডান শিং।

শেয়ালের ডান শিং! শেয়ালের শিং হয় তাই তো জানতাম না।

এ দেশে হয় না, কিন্তু কোনো এক দেশে নিশ্চয়ই হয়। না হলে শেয়ালের শিংয়ের কথা চিকিৎসা বিদ্যার বই-এ লেখা থাকবে কেন ?

রাজা তাকালেন সেনাপতির দিকে। অমনি সেনাপতি রাজাকে কুর্নিশ করে ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেলেন শেয়ালের শিং-এর সন্ধানে।

রাজবৈদ্য, তোমার আর কী লাগবে ?

আর একটি মাত্র জিনিস লাগবে মহারাজা, নেই-দেশে নেই-গাছের নেই-রঙের ফুল।

সে আবার কী!

তা তো বলতে পারব না মহারাজা। আমি নিজে কখনো দেখিনি। পুঁথিপত্রে পড়েছি। এই জিনিস ছাড়া দাগ-বিমোচন মলম তৈরি অসম্ভব।

রাজা তাকালেন মন্ত্রীর দিকে। মন্ত্রী উল্কার বেগে বেরিয়ে পড়লেন।

যায় যায় যায়
দিন যায়
মাস যায়
বছর যায়।

মন্ত্রী, সেনাপতি, কোটাল কেউ ফেরে না। রাজার মনে শান্তি নেই। প্রজাদের মনেও শান্তি নেই। আনন্দ-উৎসব রাজা এখন আর সহ্য করতে পারেন না। গান শুনলে রাগে দাঁত কিড়মিড় করেন। দক্ষিণ দেশের এক গায়ক একদিন মনের ভুলে ভৈরবীতে টান দিয়েছিলেন। শুনতে পেয়ে রাজা মুখ কুঁচকে বললেন, চেঁচাচ্ছে কে ?

নগর-গুপ্তচর ফিসফিস করে বলল, দক্ষিণ দেশের বিখ্যাত গায়ক সুর-সাগর, সুর-সম্রাট, সুর-প্রাণ, মহা মহিম...

গুপ্তচরের কথা শেষ হবার আগেই রাজা বললেন, গাধাটার চেঁচানো বন্ধ করো। আর ওর মাথা কামিয়ে ওকে দেশ থেকে বের করে দাও। সবাইকে বলে এস— কেউ যেন আর ভ্যা ভ্যা করে আমাকে বিরক্ত না করে। অসহ্য, অসহ্য। গায়ক ও বাদকের দল মুখ কালো করে রাজ্য ছেড়ে চলে গেল।

রাজ্যের লোক হাসতেও ভুলে গেল। কারণ রাজা এখন হাসিও সহ্য করতে পারেন না। কেউ হাসলেই চেঁচিয়ে বলেন, এমন বিশ্রী করে কে হাসছে ? ওর মাথাটা

কামিয়ে সেই মাথায় পচা গোবর ঢেলে দাও। রাজ্যের লোক ভয়ে-ভয়ে দিন কাটায়। রাজা চিন্তিত মুখে শুধু বাগানে হাঁটেন। মাঝে-মাঝে রানিমহলে গিয়ে কাতর গলায় বলেন, এসো রানি বাগানে এসো। দেখে যাও কত চমৎকার ফুল ফুটেছে।

রানি ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলেন, আমি কিচ্ছু দেখব না। এই কলঙ্কভরা মুখ আমি কাউকে দেখাব না। যতদিন না আমার মুখের কুৎসিত দাগ দূর হচ্ছে ততদিন আমি ঘর থেকে বেরুব না। খাব না, খাব না— ঘরে বাতি জ্বালব না।

রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন আর বাগানে হাঁটেন।

যায় যায় যায়
দিন যায়
মাস যায়
বছর যায়।

দ্বিতীয় বছরের শুরুতে কোটাল ফিরে এল। তার মুখ মলিন, পোশাক ছেঁড়া। শরীর শুকিয়ে দড়ি দড়ি। রাজা বললেন, পেয়েছ বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি ?

কোটাল শুকনো গলায় বলল, জি না।

বলো কী তুমি!

আমি বহু ঘুরেছি মহারাজা। দেশ থেকে দেশান্তরে গেছি। বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি পাইনি। ও জিনিস হয় না মহারাজ, তবে...?

তবে কী ?

আমি এক জ্ঞানী পাথরের দেখা পেয়েছি।

জ্ঞানী পাথর ?

হ্যাঁ, জ্ঞানী পাথর। পাথর হয়েও সে মানুষের মতো কথা বলে। সবাইকে জ্ঞানের কথা শোনায়।

কী বলল সেই জ্ঞানী পাথর ?

বলল, রানি কলাবতীর মুখে আছে তিনটি দাগ। যেদিন তাঁর মনে হবে তাঁর চেয়েও সুন্দর কিছু পৃথিবীতে আছে, সেদিন একটি দাগ মুছে যাবে।

রাজা বিরক্ত হয়ে বললেন, রানির চেয়ে রূপবতী কেউ নেই, শুধু-শুধু তাঁর এ রকম অদ্ভুত কথা মনে হবে কেন ?

সভাসদরা বলল, একেবারে খাঁটি কথা বলেছেন মহারাজা। আমাদের এই কোটাল কোনো কাজের নয়। একে দেশ থেকে বের করে দিন।

রাজা তা-ই করলেন। তারও অনেকদিন পরে এল সেনাপতি। রাজা বললেন, খালি হাতে এসেছ, না শেয়ালের শিং এনেছ ?

সেনাপতি আমতা-আমতা করে বলল, খালি হাতে এসেছি।

কেন ?

শেয়ালের শিং হয় না মহারাজা। পৃথিবীর কেউ শেয়ালের শিঙের কথা শোনেনি। তবে মহারাজা, আমার সঙ্গে দেখা হয়েছে এক জ্ঞান-বৃক্ষের।

কার সঙ্গে দেখা হয়েছে ?

একটা গাছের সঙ্গে। তবে এই গাছ সাধারণ গাছ নয় মহারাজা। এই গাছ মানুষের মতো কথা বলতে পারে।

কী বলল সেই গাছ ?

গাছ বলল, যদি কোনোদিন রানির মনে গভীর আনন্দ হয়, যদি রানি মনের আনন্দে কেঁদে ফেলেন, তাহলে তাঁর মুখ থেকে একটি দাগ আপনা-আপনি মুছে যাবে।

রাজা বিরক্ত গলায় বললেন, রানি মনের দুঃখে কাতর। এর মধ্যে তাঁর মনে আনন্দ আসবে কোত্থেকে ? এ তো দেখি মূর্খের মতো কথা বলছে।

সভাসদরা সবাই একসঙ্গে বলল, মূর্খ নয়, মহারাজ— এ হচ্ছে মহামূর্খ। একেও দেশ থেকে বের করে দিন। একজন নাপিত ডাকিয়ে মাথাটাও কামিয়ে দিন। শাস্তি হোক।

রাজা বললেন, বেশ তা-ই হবে।

রাজার খাস নাপিত এসে মনের আনন্দে শিস দিতে-দিতে সেনাপতির মাথা কামিয়ে দিল। রাজ্যের লোক হৈ হৈ করে তাকে দেশ থেকে বের করে দিল।

তার অনেকদিন পর ফিরল মন্ত্রী।

রাজা হাসিমুখে বললেন, পেয়েছ ?

মন্ত্রী বলল, হ্যাঁ।

সভায় হৈচৈ উঠল, পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে।

রাজা বললেন, দেখি জিনিসটা কেমন ?

জিনিসটা তো মহারাজা আনতে পারিনি।

সে-কী! কেন ?

পাত্রের অভাবে। নেই-দেশের নেই-গাছের নেই-রঙের ফুল তো আর যে-কোনো পাত্রে আনা যায় না। সেই ফুল আনতে হয় নেই-পাত্রে।

সভাসদরা বলল, অত্যন্ত খাঁটি কথা। এটা আগেই খেয়াল করা উচিত ছিল।

রাজা বললেন, তুমি তো আরেক সমস্যায় ফেললে মন্ত্রী, নেই-পাত্র কোথায় পাব ?

সমস্যায় তো আমি আপনাকে ফেলিনি মহারাজ। সমস্যায় ফেলেছে আমাদের রাজবৈদ্য। বেছে-বেছে এমন সব জিনিসের কথা বলেছে, যার কোনোটিই পাওয়া

যায় না। এই কাজটা সে করেছে ইচ্ছে করে যাতে তাকে দাগ-বিমোচন মলম বানাতে না হয়। আমার ধারণা, দাগ-বিমোচন মলম কী করে তৈরি করা যায় তা-ই সে জানে না।

রাজার মুখ গম্ভীর হলো। তিনি ঘনঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগলেন। খুব রেগে গেলে তিনি এরকম করেন। একসময় তাঁর রাগ কিছুটা কমল। তিনি সভাসদদের দিকে তাকিয়ে বললেন, কী শাস্তি দেয়া যায়? সভাসদরা একবাক্যে বলল,

হেঁটোয় কণ্টক দাও
উপরে কণ্টক।
ডালকুত্তাদের মাঝে
করহ বণ্টক।

রাজা বললেন, তা-ই হোক।

অমনি রাজার সেপাইরা রাজবৈদ্যকে ধরে মাঠে নিয়ে গেল। পেছনে ছুটল সমস্ত সভাসদ। কাউকে শাস্তি পেতে দেখলে তাদের বড় ভালো লাগে।

দরবারে রইলেন শুধু রাজা এবং মন্ত্রী। রাজা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, কী করা যায় মন্ত্রী?

উপায় একটা আছে মহারাজা।

কী উপায়?

এক জ্ঞানবৃদ্ধ আমাকে উপায় বলে দিয়েছে।

কী বলেছেন জ্ঞানবৃদ্ধ?

বলেছেন, রানি কলাবতী যদি কখনো নিজের মন থেকে বলেন, আমার মুখের দাগ যেমন আছে থাকুক, আমি দাগ মেটাতে চাই না, তখনি শুধু একটা দাগ আপনাআপনি মুছে যাবে।

রাজা বললেন, এই দাগ নিয়েই রানীর মনে এত কষ্ট, সে কী করে বলবে এই দাগ থাকুক?

তা বলা সম্ভব নয় মহারাজা।

রাজা খুবই মন খারাপ করলেন।

মন খারাপ করলেন রানি কলাবতী। এক সন্ধ্যাবেলায় তাঁর একশ' দাসীকে ডেকে বললেন, কোটাল, সেনাপতি, মন্ত্রী— তিনজনই ফিরে এসেছে, তোরা কি তা জানিস?

জানি রানি মা।

দাগ-বিমোচন মলম তৈরি হচ্ছে না, তাও কি তোরা জানিস?

জানি রানি মা।

তাহলে আর বেঁচে থেকে কী লাভ বলো?

দাসীরা কেউ কোনো কথা বলল না। রানি ধরা গলায় বললেন, আমি ঠিক করেছি নীলপুকুরে ডুবে প্রাণত্যাগ করব।

এই কথা শুনে দাসীরা সব কাঁদতে শুরু করল। রানি বললেন, কান্না বন্ধ করে আমাকে সাজিয়ে দে। শেষবারের মতো আমি সাজব, তারপর ডুবে মরব নীল পুকুরের জলে।

দাসীরা চোখের জল মুছে রানিকে সাজাতে বসল। গায়ে দিল পদ্মবাটা। সেই পদ্ম কালো গরুর দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলল। গালে মাখল প্রজাপতির পাখার রঙ। ঠোঁটে রক্তচন্দন। চোখের পাতায় নীলকান্তমণির গুঁড়া। গলায় পরিয়ে দিল মুক্তোর মালা। রানি বললেন, কেমন দেখাচ্ছে রে আমাকে, সত্যি করে বল।

খুব কুৎসিত দেখাচ্ছে রানি মা, কালো দাগগুলো আরো জঘন্য হয়ে ফুটে উঠেছে।

রানি গভীর দুঃখে কাতর হলেন। একশ' সখীকে পেছনে ফেলে একা-একা রওনা হলেন নীল পুকুরের দিকে।

সে রাত ছিল ভরা জোছনার রাত। আকাশে পূর্ণ চন্দ্র। কী তার আলো! দিঘির নীল জলে ভাসছে রুপোর থালা। যেন বিশাল এক চন্দ্রকান্তমণি জলের চাদর গায়ে জড়িয়ে ঘুমুচ্ছে। রানি মুগ্ধ হয়ে দেখলেন সেই ছবি। ফিসফিস করে বললেন, কী সুন্দর, কী সুন্দর! আমার চেয়েও কত সুন্দর জিনিসই না পৃথিবীতে আছে।

এইটুকু বলতেই তাঁর মুখের একটি দাগ মুছে গেল। তিনি তা দেখতেই পেলেন না, কারণ তিনি তাকিয়ে আছেন আকাশের চাঁদের দিকে। ঠিক তখন দুধ সাদা এক খণ্ড মেঘ চাঁদের গা ঘেঁসে উঠে গেল। আলো-আঁধারীর কী মন-কাড়া ছবিই না তৈরি হলো ঐ মেঘে। আনন্দে রানির চোখে জল এল। অমনি তাঁর মুখের আরেকটি দাগ মুছে গেল। রানি তা বুঝতে পারলেন না।

তখন আকাশের চাঁদ ফিসফিস করে বলল, কাঁদছ কেন রানি কলাবতী ? মনের দুঃখে কাঁদছ ?

না।

তাহলে কী মনের আনন্দে কাঁদছ ?

হ্যাঁ।

তোমার মনে কেন এত আনন্দ হলো কলাবতী ?

তোমাকে দেখে। তুমি এত সুন্দর, তাই দেখে এত আনন্দ হচ্ছে।

তাই বুঝি ?

হ্যাঁ, তাই। আজ তোমাকে এত সুন্দর লাগছে কেন, বলতে পার ?

নিশ্চয়ই পারি। ভালো করে তাকিয়ে দেখ রানী, আমার মুখে কোনো কলঙ্ক নেই। এই জন্যেই আমাকে এত সুন্দর লাগছে।

তোমার কলঙ্কগুলো কোথায় গেল ?

চাঁদ জবাব না দিয়ে মৃদু হাসল, রানি বুঝলেন চাঁদের কলঙ্ক কোথাও যায় নি। এসেছে তাঁর মুখে। আশ্চর্যের ব্যাপার, রানির এখন আর তেমন কষ্ট হলো না। তিনি বললেন, তোমার কলঙ্কগুলো থাকুক আমার মুখে। তুমি এ রকম সুন্দরই থাকো। যেই রানি এই কথা বললেন, অমনি শেষ দাগটিও রানির মুখ থেকে মুছে গেল। তিনি তা বুঝতে পারলেন না। মুগ্ধ হয়ে চাঁদের দিকে তাকিয়ে রইলেন। চাঁদ বলল, রানি কলাবতী, আজ তুমি জলে নামবে না ?

ইচ্ছে করছে না।

একবার জলে তোমার ছায়া দেখবে না ?

ইচ্ছে করছে না।

ইচ্ছে না করলেও তুমি তাকাও জলের দিকে। মাত্র একটি বার।

রানি তাকালেন। কী সুন্দর একটি মুখ! তার পাশেই রুপোর থালার মতো চাঁদ। কাকে বেশি সুন্দর দেখাচ্ছে বলা মুশকিল।

চাঁদ মধুর স্বরে বলল, রানি কলাবতী, ঘরে ফিরে যাও। তোমার কলঙ্ক আমি ফিরিয়ে নিলাম।

লক্ষ লক্ষ জোনাকি জ্বলতে ও নিভতে লাগল। মধুর বাতাস বইতে লাগল। সে বাতাসে বকুলের মিষ্টি সুবাস।

বোকা দৈত্য

তোমরা জেলে এবং দৈত্যের গল্পটা নিশ্চয়ই জানো।

ঐ যে এক জেলে ছিল, জাল ফেলে তুলেছে এক কলসি। সেই কলসির মুখ খুলতেই কুণ্ডলি পাকিয়ে কালো ধোঁয়া বেরুতে লাগল। সেই ধোঁয়া জমাট বেঁধে হলো এক দৈত্য। দৈত্য বলল, এখন আমি তোর ঘাড় মটকাব। এতদিন বন্দি হয়ে আছি, তুই আমাকে উদ্ধার করিসনি কেন ? পাজির পাজি। এখন মজা টের পাবি।

কী যে বিপদে পড়ল বেচারা জেলে!

ঠিক একই রকম বিপদে পড়েছিল অন্য এক জেলে। তার গল্প এখন তোমাদের বলি। জেলের নাম 'মন্দভাগ্য জেলে'। কারণ তার ভাগ্যটা খুবই মন্দ। জাল নিয়ে যায়, কখনো মাছ পায় না। সে যখন নদীর দক্ষিণে যায়, তখন মাছ পাওয়া যায় শুধু উত্তরে। যখন যায় উত্তরে, মাছ চলে আসে দক্ষিণে।

বেচারার ভারি কষ্ট। একটিমাত্র মেয়ে, তাকে দু'বেলা খেতে দিতে পারে না। মেয়ে মাঝে-মাঝে বলে, সবাই মাছ পায়, তুমি পাও না কেন বাবা ? জেলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলে, নামটার জন্যেই পাই না। আমার নামই হলো মন্দভাগ্য।

নামটা বদলে ফেলো না কেন বাবা ?

তা কী করে বদলাই ? বাবা-মা শখ করে নাম রেখেছিল।

একেক দিন জেলে যখন খালি হাতে ফিরে আসে জেলের স্ত্রী বলে, ওগো তুমি মাছ মারা ছেড়ে অন্য কোনো কাজ ধরো। মাছ মারা তোমাকে দিয়ে হবে না। তোমার মধ্যে কিছু-একটা আছে। তোমার গন্ধ পেলেই মাছ পালিয়ে যায়।

জেলে নিচু গলায় বলে, মাছ মারা কী করে ছাড়ি বলো, অন্যকোনো কাজ তো শিখিনি।

শেখো নি তো কী হয়েছে, এখন শেখো।

তা হয় না বউ। মাছ মারা আমাদের জাতব্যবসা, এটা ছাড়তে পারি না। ছাড়লে পাপ হবে।

একদিন হয়েছে কী— আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নেমেছে। ঘোর বর্ষা।

মন্দভাগ্য জেলের ঘরে কোনো খাবারদাবার নেই। জেলের স্ত্রী বলল, ওগো জালটা নিয়ে বের হও না, যদি কিছু পাও।

বৃষ্টির মধ্যে যাব ? শরীরটাও ভালো লাগছে না।

ঘরে কোনো খাবার নেই। দেখো যদি মাছটাছ কিছু পাও। মেয়েটা না খেয়ে আছে।

জেলে বৃষ্টির মধ্যেই বেরুল। তার মেয়েটিও এল পিছু-পিছু। সে বাবার মাছ ধরা দেখবে।

জেলে জাল ফেলল। ফেলেই মনে হলো জালে টান পড়ছে। যেন খুব ভারী কিছু আছে। জেলের মেয়ে বলল, এ রকম করছ কেন বাবা ?

মনে হচ্ছে, কিছু-একটা জালে বেঁধেছে।

মাছ ?

হ্যাঁ।

বড়ো মাছ না-কি বাবা ?

বেশ ভারী লাগছে।

দু'জনে মিলে অনেক কষ্টে জাল টেনে তুলল। মাছটাছ কিছু না। পেতলের এক কলসি। মুখ খুব শক্ত করে বন্ধ। জেলের মেয়ে বলল, খবরদার বাবা মুখ খুলবে না। মুখ খুললে দৈত্য-টৈত্য কিছু বের হতে পারে।

কী করব তাহলে ? আবার পানিতে ফেলে দেব!

দাও।

টাকা-পয়সাও তো থাকতে পারে। দেখছিস না কেমন ভারী। আয়, খুলে দেখেই ফেলি।

দু'জনে মিলে বহু কষ্টে মুখ খুলতেই কুণ্ডলি পাকিয়ে ঘন কালো ধোঁয়া বেরুতে লাগল। সে কী শোঁ-শোঁ শব্দ! কিছুক্ষণের মধ্যেই ধোঁয়া জমাট বেঁধে পাহাড়ের মতো কী এক দৈত্য হয়ে গেল।

মন্দভাগ্য জেলে ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। তার মেয়েটাও কাঁপছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। দৈত্য কেমন পিটপিট করে তাকাচ্ছে। যেন সে খুব অবাক হয়েছে। জেলে তার মেয়েকে ফিসফিস করে বলল, চল দৌড়ে পালাই। বলেই দাঁড়াল না, দৌড়াতে শুরু করল। একবারও পেছনে ফিরে তাকাল না। ভয় পেলে মানুষের শরীরের শক্তি খুব বেড়ে যায়। যে দৌড়াতে পারে না, সেও খুব ভালো দৌড়ায়। এদের বেলায়ও তাই হলো। নিমিষের মধ্যে তারা চলে এলো গ্রামের পাশে। নিশ্বাস নেবার জন্যে একটু থেমেছে। অমনি মেঘের মতো গর্জনে কে যেন বলল, দৌড়াচ্ছ কেন ?

ওরা ঘাড় ফিরিয়ে দেখে— দৈত্য। পেছনে-পেছনে লম্বা-লম্বা পা ফেলে চলে এসেছে। দৈত্যটা আবার বলল, হঠাৎ এমন দৌড় দিলে কেন ?

জেলের মেয়ে বলল, ইচ্ছে হয়েছে দিয়েছি, তাতে আপনার কী ?

জেলে ভেবেছিল, দৈত্য এই কথায় খুব রাগ করবে। কিন্তু সে রাগ করল না। হাসিমুখে বলল, এই মেয়েটা কী সুন্দর কথা বলে। নাম কী গো তোমার ?

আমার নাম ময়না।

ময়না ? আহ্ কী সুন্দর নাম। বারবার বলতে ইচ্ছে করে।

ময়না বলল, আপনার কী নাম।

আমার নাম বোকা মিয়া দৈত্য।

বোকা মিয়া দৈত্য আবার কেমন নাম!

কী করব বলো, বাবা-মা রেখেছে। আমরা ছিলাম পঞ্চাশ ভাইবোন। আমি সবচে' বোকা। এই জন্যে আমার নাম বোকা মিয়া দৈত্য।

বোকা হলেই বুঝি বোকা নাম রাখতে হয় ?

দৈত্যদের তাই নিয়ম।

খুব খারাপ নিয়ম।

দৈত্য হেসে বলল, এই মেয়েটা এত সুন্দর করে কথা বলা কার কাছ থেকে শিখেছে ?

জেলের ভয় তখনো কাটেনি। সে আবার ভাবছে দৌড়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করবে। ময়নার জন্যে পারছে না। ময়না গল্প জুড়ে দিয়েছে। দৈত্যের সঙ্গে কেউ এমন গল্প জোড়ে!

ময়না বলল, আপনি কলসির ভেতরে কতদিন ছিলেন ?

দশ হাজার বছর। যা কষ্ট করেছি। কলসির ভেতর অন্ধকার, কিচ্ছু দেখা যায় না। এখন বৃষ্টি হচ্ছে দেখছি। আহ্ কী সুন্দর লাগছে!

আপনাকে কলসির ভেতর কে ঢোকাল ?

আমার বাবা-মা। খুব বোকা ছিলাম তো, এই জন্যে রাগ করে কলসির ভেতর ঢুকিয়ে ফেলে দিয়েছিল।

আপনার বাবা-মা তো খুব খারাপ।

ছিঃ ছিঃ ময়না, বাবা-মাকে খারাপ বলতে নেই। বোকা ছিলাম, এই জন্যে ফেলে দিয়েছে। এটা হচ্ছে দৈত্যদের নিয়ম।

জেলে বলল, আমরা এখন তাহলে যাই। আপনিও আপনার দেশে চলে যান।

দেশে কীভাবে যাব ? আমি কি পথঘাট চিনি ?

একে-ওকে জিজ্ঞেস করে চলে যান।

আমি কি অন্যসব দৈত্যের মতো বুদ্ধিমান যে জিজ্ঞেস করে-করে চলে যাব ? আমি খুব বোকা।

ময়না বলল, তাহলে আপনি এখন কোথায় যাবেন ?

তোমাদের সঙ্গে যাব।

সে কী!

তোমরা কি আমাকে এখানে ফেলে রেখে যাবে ? তার ওপর যা খিদে পেয়েছে। দশ হাজার বছর কিচ্ছু খাইনি।

মন্দভাগ্য জেলে দৈত্য নিয়ে ফিরেছে, এই খবর সারা গাঁয়ে রটে গেল। গ্রাম ভেঙে লোকজন এসে উপস্থিত। কেউ এ রকম দৈত্য দেখেনি। কেউ বলছে, দৈত্যটা হাতির মতো বড়। কেউ বলছে, পাহাড়ের মতো বড়। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যাচ্ছে।

গ্রামের মোড়ল জেলেকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গম্ভীর গলায় বলল, সত্যি-সত্যি দৈত্য বলেই তো মনে হচ্ছে। স্বভাব-চরিত্র কেমন ?

জেলে বলল, খুবই ঠান্ডা স্বভাব।

ঠান্ডা হলেই ভালো। কথা বললে জবাব দেয় ?

হ্যাঁ দেয়। জিজ্ঞেস করুন— যা জিজ্ঞেস করতে চান।

মোড়ল ভয়ে-ভয়ে এগিয়ে গেলেন। কাঁপা গলায় বললেন, তো আপনি কতদিন এখানে থাকবেন ?

দৈত্য বলল, অনেকদিন থাকব। যাব আবার কোথায় ? জেলেদের সঙ্গে থাকব। ওদের কাজকর্ম করব।

তাহলে তো জেলের কপাল ফিরল। আপনি তো নিমিষের মধ্যে ওদের এনে দেবেন সাত রাজার ধন।

দৈত্য অবাক হয়ে বলল, সাত রাজার ধন আমি পাব কোথায়!

সে কী! আমরা তো শুনেছি দৈত্যরা সাত রাজার ধন আনতে পারে, কলসিভর্তি মোহর আনতে পারে, গুপ্তধন আনতে পারে।

আমি ঐসব পারি না। শিখিনি কখনো। আমি হলাম গিয়ে বোকা দৈত্য।

আপনি পারেন কি ?

কাজ করতে পারি। আমার গায়ে খুব শক্তি।

মোড়ল খানিকক্ষণ চুপ থেকে বলল, আমি হচ্ছি গাঁয়ের মোড়ল। সবাইকে আমি তুমি করে বলি। আপনাকেও যদি তুমি করে বলি তাহলে কেমন হয় ?

জি, ভালোই হয়।

আচ্ছা শোনো, আমার একশ' বিঘা জমি আছে। চাষ করে দিতে পারবে ?

কীভাবে চাষ করতে হয় শিখিয়ে দিলে পারব।

খুব সোজা, লাঙল দিয়ে চাষ করতে হয়। তবে তোমার লাঙল লাগবে না। একটা শক্ত কোদাল হলেই তুমি পারবে। মাটি কোপাবে। পারবে না ?

জি, পারব।

তাহলে তো ভালোই হয়। তুমি খাওয়া-দাওয়া করো। তারপর এসে জমিটা চাষ করে দাও। আমি কিন্তু টাকা-পয়সা কিছু দেব না।

টাকা-পয়সা লাগবে না।

ভালো, খুব ভালো।

জেলের স্ত্রী দৈত্যকে কী খাওয়াবে কিছুই বুঝতে পারছে না। ঘরে কিচ্ছু নেই।

তবু এর বাড়ি, ওর বাড়ি ছোটাছুটি করে এক ধামা চাল জোগাড় করল। সেই চালে ভাত হলো তিন ধামা। এক বালতি ডাল রান্না করল। একটা সবজিও রাঁধল। শুধু ডাল-ভাত তো দেয়া যায় না, দৈত্য হলেও তো মেহমান। তাছাড়া দশ হাজার বছর বেচারা না খেয়ে আছে। এ রকম ক্ষুধার্ত একজনকে ভালো-মন্দ খাওয়াতে ইচ্ছা করে।

দৈত্য একনিমিষে সব শেষ করে বলল, আর কিছু নেই ?

জেলে বউ লজ্জিত গলায় বলল, জি না। আমরা খুবই গরিব, যা রেঁধেছি এর-ওর কাছ থেকে চেয়ে এনে রেঁধেছি। আপনার বোধহয় পেট ভরেনি।

তা অবশ্য ভরেনি। তবু যা করেছেন যথেষ্ট। আমার দৈত্য মা-ও এত আদর করে খাওয়ায়নি। বোকা ছিলাম তো, এই জন্যে দেখতে পারত না।

জেলে বউয়ের মন খুব খারাপ হলো। আহা বেচারা! এখন তাকে ঘুমুতে দেয়া যায় কোথায় সেও এক সমস্যা। ঘরের ভেতর ঢোকানোর প্রশ্নই ওঠে না। অথচ বর্ষা-বাদলার দিন। বাইরে থাকলে সারা রাত বৃষ্টিতে ভিজবে।

জেলে এক বুদ্ধি বের করল। ঘরের বেড়া কেটে কোনোমতে শুধু দৈত্যের মাথাটা ঢোকাল। তার পাহাড়ের মতো শরীর রইল বাইরে। এতেই দৈত্য মহাখুশি।

ময়না ঘুমুতে গেল দৈত্যের মাথার পাশে। তার মোটেও ভয় লাগছে না। দৈত্যকে সে ডাকছে দৈত্য ভাইয়া বলে। ঘুমুবার আগে সে দৈত্যকে একটা ধাঁধাও জিজ্ঞেস করল।

বোকা দৈত্য সেই ধাঁধার উত্তর দিতে পারল না। বারবার বলতে লাগল, এই মেয়েটার এত বুদ্ধি কেন ? অসম্ভব বুদ্ধি তো মেয়েটার।

দৈত্য ঘুমুল সাতদিন সাত রাত। অষ্টম দিনের দিন জেগে উঠে বলল, মোড়লের জমি চাষের কাজটা করে দিয়ে আসি। ভদ্রলোক ঐ দিন বলে গেলেন। দেরি হয়ে গেল। লম্বা ঘুম দিয়ে ফেললাম, উচিত হয়নি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রামের লোক শুনল মোড়লের জমি থেকে প্রচণ্ড ধুপধাপ শব্দ আসছে। যেন পৃথিবী ভেঙে পড়ছে এমন অবস্থা। গাঁয়ের লোক ভয়ে অস্থির, না জানি কী হচ্ছে। মোড়ল পাশের গাঁয়ে কী একটা কাজে গিয়েছিল। খবর পেয়ে ছুটে এসে মাথায় হাত দিয়ে বসল। দৈত্য একশ' বিঘা জমিতে এমনই খোঁড়াখুঁড়ি করেছে যে, জমি উধাও। বিশাল এক পুকুর তৈরি হয়েছে। দৈত্য সেই পুকুরের পানিতে কোদাল হাতে দাঁড়িয়ে। মোড়ল কপাল চাপড়ে বলতে লাগল, এখন আমার কী হবে রে ? এখন আমি কোথায় যাব রে! আমি যে পথের ফকির হলাম রে!

মোড়ল মহা হৈচৈ শুরু করল। গাঁয়ের সব লোক জড়ো করে বিরাট এক বক্তৃতা দিয়ে ফেলল, এই যে গাঁয়ে এক দৈত্য বাস করছে এটা কি ভালো হচ্ছে ? কখন কী করে বসে কে জানে। এখন মনে হচ্ছে ঠান্ডা। ক'দিন ঠান্ডা থাকবে কে জানে। যদি রেগে যায় তখন কী উপায় হবে ?

গাঁয়ের সব লোক বলল, ঠিক কথা।

মোড়ল বলল, আরো কথা আছে, এই দৈত্যের যন্ত্রণায় আমরা ঘুমুতে পারছি না। ব্যাটা যখন ঘুমোয় এমন নাক ডাকে যে, কার সাধ্য ঘুমোয়।

ঠিক ঠিক।

তারপর বাচ্চাদের কথা ধরো। বাচ্চারা দৈত্য দেখে ভয় পায়। আর কেনই বা ভয় পাবে না। আমরাই ভয়ে অস্থির।

ঠিক ঠিক।

দৈত্যের খিদের কথাও চিন্তা করতে হবে। ব্যাটা একাই তো সব খাবার খেয়ে ফেলবে। খিদে পেলে সে কি আর চুপ করে থাকবে ? তোমার-আমার সবার খাবার খেয়ে খেলবে। ফেলবে না ?

তা তো খেয়ে ফেলবেই। এখন কী করা ?

জেলেকে ডেকে বলো, যেন সে তার দৈত্য বিদেয় করে। ব্যাটা ফাজিল, দৈত্য ধরে নিয়ে এসেছে।

ডাকা হলো জেলেকে। মোড়ল বলল, ঐ দৈত্য ব্যাটাকে বিদেয় করো।

জেলে হাত জোড় করে বলল, ও বড় ভালো দৈত্য।

ভালো-মন্দ বুঝি না। ওকে বিদেয় করতে হবে।

বিদেয় করলে ও যাবে কোথায় ? বেচারা পথঘাট চেনে না। বোকাসোকা দৈত্য। তার উপর মায়া পড়ে গেছে।

বিদেয় করবে না তাহলে ?

জি-না।

বেশ, তাহলে গাঁয়ের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক শেষ। কেউ তোমার সঙ্গে কথা বলবে না। তোমার মাছ কিনবে না। তোমার সঙ্গে মেলামেশা করবে না। তুমি থাকো তোমার দৈত্য নিয়ে।

বেচারা জেলে খুব মন খারাপ করে চলে এলো। তাদের কষ্টের সীমা রইল না। কেউ তার মাছ কেনে না, কথা বলে না। খিদের যন্ত্রণায় জেলের মেয়ে কাঁদে। ঘরে কোনো খাবার নেই। দৈত্য উঠোনে বসে বসে দেখে আর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। তার খুব কষ্ট। পেটে প্রচণ্ড খিদে। মাঝে-মাঝে খিদের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে বনে চলে যায়। দশ-বারোটা কলা গাছ চিবিয়ে খেয়ে ফিরে আসে। একদিন সে ময়নাকে বলল, এইভাবে তো আর থাকা যাচ্ছে না। কী করা যায় বলো তো খুকি ?

ময়না বলল, আমি তো জানি না কী করবে।

দৈত্য বলল, যখন ঘরে খাবার থাকে না, লোকজন কোনো কাজ দেয় না, তখন মানুষরা কী করে ?

কেউ-কেউ ডাকাতি করে। জোর করে খাবার নিয়ে আসে। আবার কেউ-কেউ ভিক্ষা করে।

ভিক্ষা করাটা আবার কী ?

একটা থালা হাতে নিয়ে মানুষের বাড়ি-বাড়ি যাওয়াকে বলে ভিক্ষা করা। মানুষের বাড়ি-বাড়ি গিয়ে সুর করে বলতে হয়— চারটা পয়সা দেন মা, সারাদিন খাই নাই।

দৈত্য খানিকক্ষণ গম্ভীর হয়ে বসে রইল। তারপর হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, একটা থালা নিয়ে এস খুকি, ভিক্ষা করব।

থালা হাতে দৈত্য বেরুল ভিক্ষা করতে। সারাদিন মানুষের বাড়ি-বাড়ি ঘুরে সন্ধ্যাবেলা ফিরে এল। কেউ তাকে কিচ্ছু দেয়নি। দৈত্য বসে আছে উঠোনে। তার সামনে বসে আছে ময়না। কেউ কোনো কথা বলছে না, সন্ধ্যা প্রায় হয় হয়। ঠিক তখন পুব আকাশে ছোট্ট দুটি কালো মেঘ দেখা গেল। আর শোঁ-শোঁ শব্দ হতে লাগল। দেখতে-দেখতে মেঘ ফুলে-ফেঁপে বিশাল হয়ে গেল। গাঁয়ের সবাই ভয়ে কাঁপছে। তাদের ধারণা, ঝড় আসছে। প্রচণ্ড ঝড়।

আসলে কিন্তু ঝড় নয়। আসছে দৈত্যের বাবা ও মা। জেলের উঠোনে তারা নামল। কী ভয়ঙ্কর তাদের চেহারা। রাগে তাদের শরীর কাঁপছে। চোখ টকটকে

লাল। নিশ্বাসে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে। বাবা দৈত্য বলল, আমি খবর পেলাম, তুই কলসি থেকে বের হয়ে মানুষের বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষা করছিস! এটা কি সত্যি ?

বোকা মিয়া দৈত্য নিচু গলায় বলল, হ্যাঁ বাবা।

হ্যাঁ বাবা বলতে তোর লজ্জা লাগে না ? ছিঃ ছিঃ কী অপমান। দৈত্য হয়ে মানুষের বাড়ি-বাড়ি ভিক্ষা করা! লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। তুই একটা চিৎকার করলেই তো সব লোক টাকাপয়সা দিয়ে ভরিয়ে দিত।

মানুষকে ভয় দেখাতে আমার ভালো লাগে না।

বাজে কথা বলবি না। দৈত্যদের কাজই হচ্ছে মানুষকে ভয় দেখানো। তোকে নিয়ে এখন আমি করি কী ? তোর জন্যে কাউকে আমরা মুখ দেখাতে পারছি না। এখন যা করতে হবে তা হচ্ছে তোকে বোতলে ভরে মাঝসমুদ্রে ফেলে দিতে হবে, যাতে কেউ আর খুঁজে না পায়।

বোকা মিয়া দৈত্য চুপ করে রইল।

দৈত্যর মা বলল, হ্যাঁ তাই করো। একেবারে মাঝসমুদ্রে নিয়ে ফেলো।

বাবা দৈত্য ছোট একটা বোতল বের করে বলল, আয় তুই। এর ভেতর ঢুকে যা।

বোকা দৈত্য কাঁদো-কাঁদো গলায় বলল, বোতলের ভেতর যেতে আমার ইচ্ছা করে না।

ইচ্ছা না করলেও যেতে হবে। নয় তো তুই ভিক্ষা করে দৈত্যদের জাত-মান খোয়াবি। তোর জন্যে আমি কারো কাছে মুখ দেখাতে পারি না।

জেলে এবং জেলের বউ ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। কী ভীষণ কাণ্ড! তারা কী করবে কী বলবে কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। ময়না কিন্তু ভয় পাচ্ছে না। দৈত্যের বাবা-মা'র উপর রাগে তার গা জ্বলে যাচ্ছে। কী খারাপ বাবা-মা। নিজের ছেলেকে বোতলে ভরে পানিতে ফেলে দিচ্ছে। ময়না এগিয়ে এসে বলল, না, দৈত্য ভাইয়াকে আপনারা বোতলে ভরতে পারবেন না।

বাবা দৈত্য রাগী গলায় বলল, এ কে ?

আমার নাম ময়না। আমরা বোকা মিয়া দৈত্যকে কলসি থেকে তুলেছি। ও আমাদের। ও আমাদের সঙ্গে থাকবে।

তোমরা ওকে তুলেছ ?

হ্যাঁ।

কলসির মুখ খুলে বের করেছ ?

হ্যাঁ করেছি।

এর জন্যে কী শাস্তি হবে জানো ?

না, জানি না। কী শাস্তি হবে ?

মাটিতে গর্ত করে জ্যান্ত পুঁতব।

মা দৈত্য বলল, এই ঝামেলা করে কাজ নেই। কেটে টুকরা-টুকরা করে নদীতে ভাসিয়ে দাও।

জেলে এবং জেলের বউ দু'জনেই কেঁদে ফেলল। তারা বুঝতে পারছে এই দু'জন বোকা মিয়া দৈত্যের মতো নয়। এরা হিংস্র, ভয়ঙ্কর, সত্যি-সত্যি শাস্তি দেবে। জেলে হাতজোড় করে বলল, এবারকার মতো ক্ষমা করে দিন! আর করব না। এইবারটি ক্ষমা করুন।

ক্ষমা ? ক্ষমা-টমা আমি করি না। ক্ষমা করার কোনো নিয়ম দৈত্যদের নেই। যাও ঘর থেকে একটা ধারাল চাকু নিয়ে এসো। পাজির দল। কলসি খুলেছে, আবার বড় বড় কথা বলে!

জেলে এবং জেলের বউয়ের ভয়ে আত্মা শুকিয়ে গেল। তারা ময়নাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। তখন বোকা মিয়া দৈত্য বলল, বাবা-মা। তোমরা দুজন আমার কথা ভালো করে শোনো। তোমরা যদি এদের শাস্তি দাও, তাহলে আমি বোতলে ঢুকব না। আর আমি যদি না ঢুকি তোমরা ঢোকাতে পারবে না।

তুই কী করবি ?

আমি ঘুরে বেড়াব। ভিক্ষা করব। এমন সব কাজ করব, যাতে তোমাদের খুব অপমান হয়।

কী সর্বনাশের কথা!

আমি শুধু ভালো কাজ করব। সবার উপকার করব। তাতে তোমাদের লজ্জা হবে। তোমরা লজ্জায় কাউকে মুখ দেখাতে পারবে না।

তা তো পারবই না।

আর তোমরা যদি এদের শাস্তি না দাও তাহলে বোতলে ঢুকব।

লক্ষ্মী বাপধন ঢুকে যা। কথা দিচ্ছি ওদের শাস্তি দেব না।

এরা খুব গরিব। খেতে পায় না। এদের টাকা-পয়সা সোনা-দানা এনে দাও। না এনে দিলে আমি বোতলে ঢুকব না।

আনলে ঢুকবি তো ?

হ্যাঁ, ঢুকব।

নিমিষের মধ্যে মা দৈত্য সাত ঘড়া সোনার মোহর, এক কলসি হীরে-জহরত এনে দিল। সাত রাজারও এত হীরে-জহরত, সোনার মোহর থাকে না।

জেলে এবং জেলের বউ বলল, আমরা হীরে-জহরত, সোনা-দানা চাই না। আপনি বোকা মিয়া দৈত্যকে রেখে যান। বোতলে ভরে ফেলে দেবেন না। আমাদের খুব কষ্ট হবে।

ময়না কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

বোকা মিয়া দৈত্য বলল, কেঁদো না। তোমার কান্না দেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। মনে হচ্ছে আমিও কেঁদে ফেলব। দৈত্য কাঁদলে খুব লজ্জার ব্যাপার হয়।

বলতে-বলতে দৈত্য কেঁদে ফেলল। তার বাবা-মা বলল, ছিঃ ছিঃ! কী লজ্জা, কী লজ্জা! এক্ষুনি ঢোক বোতলের ভেতর। এক্ষুনি।

বোকা মিয়া দৈত্য ধোঁয়া হয়ে গেল। সেই ধোঁয়া ধীরে ধীরে ঢুকল বোতলের ভেতর। দৈত্যের বাবা-মা বোতলের মুখ বন্ধ করে সেই বোতল ফেলে দিল গভীর সমুদ্রে।

তারপর অনেক দিন কাটল। অনেক বছর কাটল। সোনার মোহর এবং হীরে-জহরত নিয়ে জেলে হলো বিরাট বড়লোক। সাত মহলার বাড়ি করল, বাগান করল। হাতি কিনল, ঘোড়া কিনল। একসময় বোকা মিয়া দৈত্যের কথা তার আর মনেই রইল না।

আর বোকা মিয়া দৈত্য ?

সে পড়ে রইল গভীর সমুদ্রে। বছরের পর বছর বোতলে বন্দি হয়ে তার দিন কাটতে লাগল। মাঝে-মাঝে সে কাঁদত। কাঁদতে কাঁদতে বলত, ওগো তোমরা কেউ আমাকে তুলে নাও। আমার ছোট্ট মেয়ে ময়নাকে খুব দেখতে ইচ্ছে করে। পৃথিবী দেখতে ইচ্ছে করে, চাঁদের আলো দেখতে ইচ্ছে করে।

বোকা মিয়া দৈত্যের কথা কেউ শুনতে পায় না, তবে গভীর সমুদ্রের নাবিকরা মাঝে-মাঝে কান্নার শব্দ শোনে। এই কান্না কোথা থেকে আসছে তারা বুঝতে পারে না।

মিতুর অসুখ

মিতুর আজ আবার অসুখ করেছে।

দুদিন পরপর তার এমন অসুখ করে। ডাক্তাররা আসেন, ওষুধপত্র দেন। যাবার সময় মুখ কালো করে চলে যান। মিতুকে কেউ কিছু বলে না, কিন্তু সে জানে তার অসুখটা খুব খারাপ ধরনের। এবং এই অসুখের তেমন কোনো ওষুধপত্র নেই। অসুখ হলেই তার খুব মন খারাপ হয়। এই মন খারাপের কথাও সে কাউকে বলে না।

আজ মিতুর খুব মন খারাপ হয়েছে। কান্না পাচ্ছে, বিছানায় শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না। মিতুর মা তার কপালে হাত রেখে বললেন, শরীরটা কি খারাপ লাগছে মা ?

মিতু বলল, না। সে যদি বলত 'লাগছে' তাহলে তার মা খুব মন খারাপ করতেন। এই জন্যে সে মিথ্যা করে বলল, না!

মিতুর মা বললেন, হাত-মুখ ধুয়ে কিছু খাও, তারপর আবার শুয়ে থাকো।

আমার শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করছে না মা।

ইচ্ছে না করলেও হাত-মুখ ধুতে হবে। কিছু খেতে হবে। কারণ ভালো মেয়েরা তাই করে। ঠিক না?

আমার ভালো মেয়ে হতে ইচ্ছে করে না মা।

মিতুর মা হেসে ফেললেন। কোলে করে তাকে বাথরুমে নিয়ে নিজেই মুখ ধুইয়ে দিলেন। সে আধখানা পাউরুটি, অল্প খানিকটা দুধ খেয়ে আবার শুয়ে রইল। তার পায়ের কাছে শীতকালের সুন্দর রোদ। জানালায় খয়েরি রঙের দুটি চড়ুই পাখি কিচকিচ করছে। মিতু পাখিদের কথা বুঝতে পারে না। বুঝতে পারলে খুব মজা হতো। কথা বলা যেত ওদের সঙ্গে। পাখিরা নিশ্চয়ই অনেক গল্প জানে।

ঠিক সাড়ে ন'টায় মিতুর বাবা অফিসে চলে গেলেন। যাবার আগে অনেকক্ষণ মিতুকে আদর করলেন। একবার বললেন, কেন যে মেয়েটার এত অসুখ হয়!

তার মা গেলেন দশটায়। তিনি মেয়েদের একটা স্কুলে পড়ান। সেই স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষা। তার না গেলেই নয়। বাসায় রইল মিতু এবং কাজের মেয়েটি। মিতুর মা বললেন, আমি পরীক্ষা শুরু করিয়েই চলে আসব। দেরি হবে না। তোমার জন্য কী আনতে হবে বলো তো?

কিছু আনতে হবে না।

আমি পাশের বাসার ভদ্রমহিলাকে বলে যাচ্ছি— উনি তোমাকে এসে দেখে যাবেন। কেমন?

আচ্ছা।

মিতুর মা চলে যাবার পরপরই কাজের মেয়েটি ঘরে ঢুকল। আদুরে গলায় বলল, ছোট আফা, ঘরে লবণ নাই। আমি দোকানে যাই। লবণ আনমু।

তাড়াতাড়ি এস।

যামু আর আসমু।

এই যে সে গেল আর ফেরার নাম নেই। মিতুর জ্বর হু-হু করে বাড়ছে। সে ক্ষীণ গলায় ডাকল, বুয়া-বুয়া। কেউ সাড়া দিল না। এতবড় বাড়িতে সে একা। পানির তৃষ্ণা পেয়েছে, কে তাকে পানি এনে দেবে? মিতুর কেমন ভয়-ভয় করতে লাগল। ভয় পেলেই তার কান্না পায়। কান্নাও পেতে লাগল। সে এখন পড়ে ক্লাস ফোরে। ক্লাস ফোরের মেয়েদের কাঁদতে নেই। ক্লাস টু পর্যন্ত কাঁদা যায়। ক্লাস থ্রিতে উঠলে ব্যথা পেলে অল্প-স্বল্প কাঁদা যায়। কিন্তু ক্লাস ফোরে সবরকম কান্না বন্ধ। ব্যথা পেলেও কাঁদা যাবে না।

মিতু আবার ডাকল, বুয়া-বুয়া।

ঠিক তখন রান্নাঘরে ঝনঝন শব্দে কী যেন পড়ল। মিতু চমকে উঠে বলল, রান্নাঘরে কে?

আমি। আসছি, এক মিনিট।

অচেনা একজন পুরুষ মানুষের গলা। মোটা খসখসে। মিতু ভয়ে-ভয়ে বলল, আপনি কে।

আমি কেউ না। আমি বন্ধু।

কেউ না আবার বন্ধু হয় না-কি ?

হওয়ালেই হয়।

এই বলেই লোকটা ঢুকল। মোটা, বেঁটেখাটো একজন মানুষ। গোলাকার মুখ। বড় বড় চোখ দুটি বাদামি, কেমন যেন চকচক করছে। মুখভর্তি দাঁড়িতে ঋষির মতো লাগছে। মাথার চুলগুলো ছোট করে কাটা।

লোকটির গায়ে হলুদ চাদর। চাদরের অর্ধেকটা পানিতে মাখামাখি। হাতে পানির গ্লাস। লোকটি হাসিমুখে বলল, পানি ঢালতে গিয়ে এই অবস্থা। একটা কাজ ঠিকমতো করতে পারি না। এই নাও পানি।

আমার তৃষ্ণা পেয়েছে কী করে বুঝলেন ?

বুঝব না কেন ? আমি হচ্ছি বন্ধু। বন্ধুরা সব জানে।

আপনি কার বন্ধু ?

যখন যার কাছে যাই তখন তার। এই বলেই চোখ বন্ধ করে হেঁড়ে গলায় গান ধরল—

সখী তুমি কার ?
যখন যার কাছে থাকি তখন আমি তার।

মিতু খিলখিল করে হেসে ফেলল। লোকটি গান থামিয়ে রাগী-রাগী গলায় বলল, হাসছ কেন ?

বিশ্রী করে গান গাচ্ছিলেন তাই হাসছি।

বিশ্রী করে কিছু করলেই হাসতে হয় ?

হ্যাঁ হয়।

তুমি যে বিশ্রী একটা অসুখ বাধিয়ে বসে আছ— এটা নিয়েও তো আমি হাসতে পারি। হা হা হা। হা হা হা।

লোকটি কেমন পেটে হাত দিয়ে মাথা দুলিয়ে-দুলিয়ে হাসছে। হাসি থামেই না। মিতুর একবার মনে হল লোকটা বোধহয় পাগল। কিন্তু দেখতে মোটেই পাগলের মতো লাগছে না।

মিতু গম্ভীর গলায় বলল, আপনি এত হাসছেন কেন ? বেশি হাসলে পেট ব্যথা করে। লোকটি সঙ্গে-সঙ্গে হাসি থামিয়ে বলল, তাইতো, পেট ব্যথা করছে তো।

আপনি চেয়ারটায় বসুন না।

লোকটি চেয়ারে বসল। মিতু বলল, আপনি কে ?

এককথা বারবার জিজ্ঞেস করো। বললাম না আমি বন্ধু।

আমার বন্ধু ?

হ্যাঁ তোমার। বুয়া ফিরে না আসা পর্যন্ত আমি তোমার পাশে বসে থাকব! গল্প-টল্প করব।

বুয়া ফিরছে না কেন ?

আর বলো কেন! ও লবণ কিনে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে গিয়ে একটা রিকশার নিচে পড়ে গেছে। লোকজন ধরাধরি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেছে, তবে বিশেষ কিছু হয়নি।

মিতু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। লোকটি হাই তুলে উদাস গলায় বলল, এদিকে তোমার মা আটকা পড়েছেন স্কুলে, একটার আগে ফিরতে পারবেন বলে মনে হচ্ছে না।

আপনি এতসব জানলেন কী করে! আপনি কি জাদুকর ?

হ্যাঁ, আমি জাদুকর।

আপনি খুব মিথ্যুক।

পাগল মেয়ে বলে কী! আমি সত্যি জাদুকর। রূপকথার বইয়ে জাদুকরদের কথা পড়োনি ?

পড়েছি। সেসব তো অনেক আগের কথা।

আমিও অনেক দিন আগের জাদুকর। হাজার-হাজার বছর ধরে বেঁচে আছি।

আপনি জাদুকর হলে একটা জাদু দেখান।

কী জাদু দেখতে চাও ?

একটা পাখি বানাতে পারবেন ?

নিশ্চয়ই পারব। একটা কাগজ লাগবে। ধবধবে সাদা কাগজ।

লোকটি টেবিলের উপর থেকে একটা সাদা কাগজ নিয়ে এলো। কাগজটা মিতুর চোখের সামনে বেশ অনেকক্ষণ খুব কায়দা করে নাড়ল। তারপর করল কী— অতি দ্রুত মিতুর ক্রেয়ন দিয়ে একটা পাখির ছবি এঁকে বলল, এই দেখ পাখি। এখন বিশ্বাস হলো যে আমি জাদুকর ? প্রথমে ছিল একটা সাদা কাগজ, হয়ে গেল একটা পাখি।

মিতু ঠোঁট উল্টে বলল, এ রকম পাখি তো আমিও আঁকতে পারি।

তাহলে তুমিও একজন জাদুকর। হা হা হা। হা হা হা।

এ রকম বিশ্রী করে হাসবেন না তো। আমার রাগ লাগছে।

এই কথায় লোকটি একটু যেন রেগে গেল। চোখ ছোট-ছোট করে বলল, তুমি একা একা ভয় পাচ্ছ দেখে এলাম। এখন বলছ, আমার হাসি শুনে রাগ লাগছে। বেশ হাসব না।

লোকটি চুপ করে বসে পা নাচাতে লাগল। মিতু বলল, এ রকম চুপচাপ বসে থাকলেও আমার রাগ লাগে।

তাহলে আমাকে কী করতে বলো?

একটা গল্প বলুন। ভূতের গল্প।

দিনেদুপুরে আবার কিসের ভূতের গল্প? ভুতের গল্প বলতে হয় রাতে।

তাহলে অন্য কোনো গল্প বলুন।

বেড়ালের গল্প শুনবে?

বলুন।

এক দেশে একটা ছোট্ট মেয়ে ছিল। আর মেয়েটার ছিল ইয়া মোটা লেজ-ফোলা এক বেড়াল। একদিন বেড়ালটা এসে মেয়েটাকে বলল, আপামণি, আমার লেজটা দিন-দিন এত মোটা হচ্ছে কেন বলো তো? কী লজ্জার ব্যাপার, সবাই আমার লেজের দিকে তাকিয়ে হাসাহাসি করে। আমার কাঁদতে ইচ্ছে করে।

মিতু গল্পের মাঝখানে বিরক্ত গলায় বলল, এইসব কী বানিয়ে-বানিয়ে বলছেন! বেড়াল বুঝি কথা বলতে পারে?

নিশ্চয়ই পারে। দিনরাত মিঁয়াও মিঁয়াও করছে না?

মিঁয়াও-এর কি কোনো মানে আছে?

আছে। সবাই বুঝতে পারে না। কেউ-কেউ পারে। আমি জাদুকর, আমি পারি।

আপনি পারেন?

নিশ্চয়ই পারি। তোমাকেও শিখিয়ে দিতে পারি। শিখতে চাও?

হ্যাঁ চাই।

উত্তর দিকে মুখ করে বসবে। বাঁ হাতে ধরবে ডান হাতের বুড়ো আঙুল। ডান হাতে ধরবে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল। মাথা রাখবে দু'হাঁটুর মাঝখানে। চোখ বন্ধ রাখবে। যে পশু বা প্রাণীর কথা শুনতে চাও, তার কথা মনে-মনে ভাববে। ব্যস, হয়ে গেল।

সত্যি বলছেন?

বিশ্বাস না হলে পরীক্ষা করে দেখো। ঐ তো একটা চড়ুই পাখি বসে আছে জানালায়। তোমাকে যে রকম শিখিয়েছি, তেমন করে তাকাও। চড়ুই পাখির সব কথা বুঝতে পারবে।

মিতু লোকটির কোনো কথা বিশ্বাস করল না, তবু সে যেমন-যেমন শিখিয়েছে তেমন করল। কী আশ্চর্য! সত্যি-সত্যি সে শুনল চড়ুই পাখিটা কিচকিচ করে কথা বলছে। কথাগুলো এরকম—

উফ মাগো কী রোদ বাইরে! রোদে যেতে ইচ্ছা করছে না। এই মেয়েটার ঘরে খাবার-দাবারও কিছু দেখছি না। অন্যকোথাও গিয়ে খুঁজলে হয়। যেতে ইচ্ছা করছে না। ছোট মেয়েটা ঐ বুড়োর সঙ্গে বকবক করছে শুনতে ভালো লাগছে। ওরা কী

নিয়ে কথা বলে কে জানে! বকবক বকবক বকবক। রাতদিন বকবক। এরা যে এত কথা বলে— এদের গলা ব্যথা করে না!

মিতু আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, আমি চড়ুই পাখির কথা শুনতে পাচ্ছি। ওর সব কথা বুঝতে পারছি।

লোকটি গম্ভীর গলায় বলল, আমাকে একটা ধন্যবাদ দাও। আমিই তো তোমাকে শেখালাম।

বন্ধু, আপনাকে ধন্যবাদ।

মিতুর মনে হলো লোকটি যেন মুচকি-মুচকি হাসছে। তার মানে কী ? চড়ুই পাখি হয়তো বলেনি, বলেছে এই মানুষটি। গলার স্বর অন্যরকম করে হয়তো বলেছে। মিতু চোখ বন্ধ করে ছিল, তাই শুনতে পায়নি। মিতু বলল, আমার মনে হয়, ঐ কথাগুলো আপনি বলেছেন। চড়ুই পাখি কিছু বলেনি।

লোকটি এই কথার জবাব না দিয়ে উঠে দাঁড়াল। হাসিমুখে বলল, আমি এখন বিদায় নিচ্ছি। তোমার বুয়া চলে আসবে কিছুক্ষণের মধ্যেই।

আপনি আবার কবে আসবেন ?

আর আসব বলে তো মনে হচ্ছে না। আমি দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াই। একবার যেখানে যাই দ্বিতীয়বার আর সেখানে যাওয়া হয় না। তুমি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলে একা-একা, তাই কিছুক্ষণ বসলাম।

আপনাকে ধন্যবাদ।

ও আরেকটা কথা, তোমার অসুখও সারিয়ে দিচ্ছি। এক কাজ করো, দুচোখ বন্ধ করে মনে-মনে তিনবার বলো অসুখ সেরে যাক।

এতেই অসুখ সেরে যাবে ?

নিশ্চয়ই সারবে। বলেই দেখো।

মিতু তাই করল। তার কেমন জানি মনে হচ্ছে অসুখ সেরে গেছে। জ্বর-জ্বর ভাব নেই। সে চোখ মেলল, লোকটি নেই। যেমন হুট করে এসেছিল, তেমনি হুট করে চলে গেছে।

লোকটি চলে যাবার কিছুক্ষণের মধ্যেই বুয়া এলো। তার হাতে-মাথায় ব্যান্ডেজ। সে হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, কী যে কাণ্ড হইছে, ছোড আফা, একটা রিকশা...

মিতু তাকে কথা শেষ করতে দিল না। চেঁচিয়ে বলল, জানো বুয়া, আমি পাখিদের কথা বুঝতে পারি। খুব সোজা। ডান হাত দিয়ে ধরতে হয় বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল...

এরপর অনেকদিন কেটে গেছে! মিতু নতুন ক্লাসে উঠেছে। এখনো সে পাখিদের কথা বুঝতে চেষ্টা করে। পারে না। হয়তো জাদুকর তাকে মিথ্যা কথা বলেছে।

জাদুকর মিথ্যা বলেছে, এটাও মিতুর বিশ্বাস করতে মন চায় না, কারণ তার অসুখ তো পুরোপুরি সেরে গেছে।

একদিন মিতুর বাবা মিতুর মাকে বললেন, একটা অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষ করছ ? মিতু দেখি প্রায়ই কেমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে বসে থাকে। মাথা দু'হাঁটুর মাঝখানে। ব্যাপারটা কী বলো তো ?

মিতুর মা হাই তুলে বললেন, বাচ্চাদের খেলা। খেলার কি কোনো মানে হয় ? আমিও ছোটবেলায় এমন কত খেলা খেলেছি। মেয়েটার অসুখ সেরে গেছে, এটাই বড় কথা।

অসুখটা কী করে সারল সেটাও একটা রহস্য। খুব খারাপ ধরনের অসুখ ছিল মিতুর। সারার কথা ছিল না। হঠাৎ সেরে গেল কীভাবে ? মিতুর মা বলেন, অসুখ সেরে গেছে, সেটাই বড় কথা। কীভাবে সারল সেটা না জানলেও কোনো ক্ষতি নেই।

আলাউদ্দিনের চেরাগ

নান্দিনা পাইলট হাইস্কুলের অঙ্ক শিক্ষক নিশানাথ বাবু কিছুদিন হলো রিটায়ার করেছেন। আরো বছরখানেক চাকরি করতে পারতেন, কিন্তু করলেন না। কারণ দুটো চোখেই ছানি পড়েছে। পরিষ্কার কিছু দেখেন না। ব্ল্যাকবোর্ডে নিজের লেখা নিজেই পড়তে পারেন না।

নিশানাথ বাবুর ছেলেমেয়ে কেউ নেই। একটা মেয়ে ছিল। খুব ছোটবেলায় টাইফয়েডে মারা গেছে। তাঁর স্ত্রী মারা গেছেন গত বছর। এখন তিনি একা একা থাকেন। তাঁর বাসা নান্দিনা বাজারের কাছে। পুরান আমলের দু'কামরার একটা পাকা দালানে তিনি থাকেন। কামরা দুটির একটি পুরান জিনিসপত্র দিয়ে ঠাসা। তাঁর নিজের জিনিস নয়। বাড়িওয়ালার জিনিস। ভাঙা খাট, ভাঙা চেয়ার, তলা নেই— কিছু পেতলের ডেগচি, বাসন-কোসন। বাড়িওয়ালা নিশানাথ বাবুকে প্রায়ই বলেন— এইসব জঞ্জাল দূর করে ঘরটা আপনাকে পরিষ্কার করে দেব। শেষ পর্যন্ত করেন না। তাতে নিশানাথ বাবুর খুব একটা অসুবিধাও হয় না। পাশের একটা হোটেলে তিনি খাওয়া-দাওয়া সারেন। বিকালে নদীর ধারে একটু হাঁটতে যান। সন্ধ্যার পর নিজের ঘরে এসে চুপচাপ বসে থাকেন। তাঁর একটা কেরোসিনের স্টোভ আছে। রাতেরবেলা চা খেতে ইচ্ছা হলে স্টোভ জ্বালিয়ে নিজেই চা বানান।

জীবনটা তাঁর বেশ কষ্টেই যাচ্ছে। তবে তা নিয়ে নিশানাথ বাবু মন খারাপ করেন না। মনে-মনে বলেন, আর অল্প কটা দিনই তো বাঁচব, একটু না হয় কষ্ট করলাম। আমার চেয়ে কষ্টে কত মানুষ আছে। আমার আবার এমন কী কষ্ট ?

একদিন কার্তিক মাসের সন্ধ্যাবেলায় নিশানাথ বাবু তাঁর স্বভাবমতো রাতের খাওয়া সেরে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেন। নদীর পাশের বাঁধের উপর দিয়ে অনেকক্ষণ হাঁটলেন। চোখে কম দেখলেও অসুবিধা হয় না, কারণ গত কুড়ি বছর ধরে এই পথে তিনি হাঁটাহাঁটি করছেন।

আজ অবশ্যি একটু অসুবিধা হলো। তাঁর চটির একটা পেরেক উঁচু হয়ে গেছে। পায়ে লাগছে। হাঁটতে পারছেন না। তিনি সকাল-সকাল বাড়ি ফিরলেন। তাঁর শরীরটাও আজ খারাপ। চোখে যন্ত্রণা হচ্ছে। বাঁ চোখ দিয়ে ক্রমাগত পানি পড়ছে।

বাড়ি ফিরে তিনি খানিকক্ষণ বারান্দায় বসে রইলেন। রাত ন'টার দিকে তিনি ঘুমুতে যান। রাত ন'টা বাজতে এখনো অনেক দেরি। সময় কাটানোটাই তাঁর এখন সমস্যা। কিছু একটা কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারলে হতো। কিন্তু হাতে কোনো কাজ নেই। বসে থাকা ছাড়া কিচ্ছু করার নেই। চটির উঁচু হয়ে থাকা পেরেকটা ঠিক করলে কেমন হয়? কিছুটা সময় তো কাটে। তিনি চটি হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। হাতুড়ি জাতীয় কিছু খুঁজে পেলেন না। জঞ্জাল রাখার ঘরটিতে উঁকি দিলেন। রাজ্যের জিনিস সেখানে, কিন্তু হাতুড়ি বা তার কাছাকাছি কিছু নেই। মন খারাপ করে বের হয়ে আসছিলেন, হঠাৎ দেখলেন ঝুড়ির ভেতর একগাদা জিনিসের মধ্যে লম্বাটে ধরনের কী একটা যেন দেখা যাচ্ছে। তিনি জিনিসটা হাতে নিয়ে জুতার পেরেকে বাড়ি দিতেই অদ্ভুত কাণ্ড হলো। কালো ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি হয়ে গেল।

তিনি ভাবলেন চোখের গণ্ডগোল। চোখ দুটো বড় যন্ত্রণা দিচ্ছে।

কিন্তু না, চোখের গণ্ডগোল না। কিছুক্ষণের মধ্যে ধোঁয়া কেটে গেল। নিশানাথ বাবু অবাক হয়ে শুনলেন, মেঘ গর্জনের মতো শব্দে কে যেন বলছে, আপনার দাস আপনার সামনে উপস্থিত। হুকুম করুন। এক্ষুনি তামিল হবে।

নিশানাথ বাবু কাঁপা গলায় বললেন, কে? কে কথা বলে?

জনাব আমি। আপনার ডান দিকে বসে আছি। ডান দিকে ফিরলেই আমাকে দেখবেন।

নিশানাথ বাবু ডান দিকে ফিরতেই তাঁর গায়ে কাঁটা দিল। পাহাড়ের মতো একটা কী যেন বসে আছে। মাথা প্রায় ঘরের ছাদে গিয়ে লেগেছে। নিশ্চয়ই চোখের ভুল।

নিশানাথ বাবু ভয়ে-ভয়ে বললেন, বাবা তুমি কে? চিনতে পারলাম না তো।

আমি হচ্ছি আলাউদ্দিনের চেরাগের দৈত্য। আপনি যে জিনিসটি হাতে নিয়ে বসে আছেন এটাই হচ্ছে সেই বিখ্যাত আলাউদ্দিনের চেরাগ।

বলো কী!

সত্যি কথাই বলছি জনাব। দীর্ঘদিন এখানে-ওখানে পড়ে ছিল। কেউ ব্যবহার জানে না বলে ব্যবহার হয়নি। পাঁচ হাজার বছর পর আপনি প্রথম ব্যবহার করলেন। এখন হুকুম করুন।

কী হুকুম করব?

আপনি যা চান বলুন, এক্ষুনি নিয়ে আসব। কোন জিনিসটি আপনার প্রয়োজন ?

আমার তো কোনো জিনিসের প্রয়োজন নেই।

চেরাগের দৈত্য চোখ বড়-বড় করে অনেকক্ষণ নিশানাথ বাবুর দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর গম্ভীর গলায় বলল, জনাব, আপনি কি আমাকে ভয় পাচ্ছেন ?

প্রথম পেয়েছিলাম, এখন পাচ্ছি না। তোমার মাথায় ঐ দু'টা কী ? শিং না-কি ?

জি শিং।

বিশ্রী দেখাচ্ছে।

চেরাগের দৈত্য মনে হলো একটু বেজার হয়েছে। মাথার লম্বা চুল দিয়ে সে শিং দুটো ঢেকে দেবার চেষ্টা করতে করতে বলল, এখন বলুন কী চান ?

বললাম তো, কিছু চাই না।

আমাদের ডেকে আনলে কোনো-একটা কাজ করতে দিতে হয়। কাজ না করা পর্যন্ত আমরা চেরাগের ভেতর ঢুকতে পারি না।

অনেক ভেবে-চিন্তে নিশানাথ বাবু বললেন, আমার চটির পেরেকটা ঠিক করে দাও। অমনি দৈত্য আঙুল দিয়ে প্রচণ্ড চাপ দিয়ে পেরেক ঠিক করে বলল, এখন আমি আবার চেরাগের ভেতর ঢুকে যাব। যদি আবার দরকার হয় চেরাগটা দিয়ে লোহা বা তামার উপর খুব জোরে বাড়ি দেবেন। আগে চেরাগ একটুখানি ঘষলেই আমি চলে আসতাম। এখন আসি না। চেরাগ পুরান হয়ে গেছে তো, তাই।

ও আচ্ছা। চেরাগের ভেতরেই তুমি থাকো ?

জি!

করো কী ?

ঘুমাই। তাহলে জনাব আমি এখন যাই।

বলতে-বলতেই সে ধোঁয়া হয়ে চেরাগের ভেতর ঢুকে গেল। নিশানাথ বাবু স্তম্ভিত হয়ে দীর্ঘ সময় বসে রইলেন। তারপর তাঁর মনে হলো— এটা স্বপ্ন। স্বপ্ন ছাড়া কিছুই নয়। বসে ঝিমাতে-ঝিমাতে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ঘুমের মধ্যে আজেবাজে স্বপ্ন দেখেছেন।

তিনি হাত-মুখ ধুয়ে শুয়ে পড়লেন। পরদিন তাঁর আর এই ঘটনার কথা মনে রইল না। তাঁর খাটের নিচে পড়ে রইল আলাউদ্দিনের বিখ্যাত চেরাগ।

মাসখানেক পার হয়ে গেল। নিশানাথ বাবুর শরীর আরো খারাপ হলো। এখন তিনি আর হাঁটাহাঁটিও করতে পারেন না। বেশিরভাগ সময় বিছানায় শুয়ে-বসে থাকেন। এক রাতে ঘুমুতে যাবেন। মশারি খাটাতে গিয়ে দেখেন, একদিকের পেরেক খুলে এসেছে। পেরেক বসানোর জন্যে আলাউদ্দিনের চেরাগ দিয়ে এক বাড়ি দিতেই ঐ রাতের মতো হলো। তিনি শুনলেন গম্ভীর গলায় কে যেন বলছে—

জনাব, আপনার দাস উপস্থিত। হুকুম করুন।

তুমি কে ?

সে-কী! এর মধ্যে ভুলে গেলেন ? আমি আলাউদ্দিনের চেরাগের দৈত্য।

ও আচ্ছা-আচ্ছা। আরেক দিন তুমি এসেছিলে।

জি।

আমি ভেবেছিলাম— বোধহয় স্বপ্ন।

মোটেই স্বপ্ন না। আমার দিকে তাকান। তাকালেই বুঝবেন এটা সত্য।

তাকালেও কিছু দেখি না রে বাবা। চোখ দুটা গেছে।

চিকিৎসা করাচ্ছেন না কেন ?

টাকা কোথায় চিকিৎসা করাব ?

কী মুশকিল! আমাকে বললেই তো আমি নিয়ে আসি। যদি বলেন তো এক্ষুনি এক কলসি সোনার মোহর এনে আপনার খাটের নিচে রেখে দেই।

আরে না, এত টাকা দিয়ে আমি করব কী ? ক'দিনই-বা আর বাঁচব।

তাহলে আমাকে কোনো একটা কাজ দিন। কাজ না করলে তো চেরাগের ভেতর যেতে পারি না।

বেশ মশারিটা খাটিয়ে দাও।

দৈত্য খুব যত্ন করে মশারি খাটাল। মশারি দেখে সে খুব অবাক। পাঁচ হাজার বছর আগে নাকি এই জিনিস ছিল না। মশার হাত থেকে বাঁচার জন্যে মানুষ যে কায়দা বের করেছে তা দেখে সে মুগ্ধ।

জনাব, আর কিছু করতে হবে ?

না, আর কী করবে! যাও এখন।

অন্য কিছু করার থাকলে বলুন, করে দিচ্ছি।

চা বানাতে পার ?

জি না। কীভাবে বানায় ?

দুধ-চিনি মিশিয়ে।

না, আমি জানি না। আমাকে শিখিয়ে দিন।

থাক বাদ দাও, আমি শুয়ে পড়ব।

দৈত্য মাথা নাড়তে-নাড়তে বলল, আপনার মতো অদ্ভুত মানুষ জনাব আমি এর আগে দেখিনি।

কেন ?

আলাউদ্দিনের চেরাগ হাতে পেলে সবার মাথা খারাপের মতো হয়ে যায়। কী চাইবে, কী না চাইবে, বুঝে উঠতে পারে না, আর আপনি কিনা...

নিশানাথ বাবু বিছানায় শুয়ে পড়লেন। দৈত্য বলল, আমি কি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দেব ? তাতে ঘুমুতে আরাম হবে।

আচ্ছা দাও।

দৈত্য মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। নিশানাথ বাবু ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙলে মনে হলো আগের রাতে যা দেখেছেন সবই স্বপ্ন। আলাউদ্দিনের চেরাগ হচ্ছে রূপকথার গল্প। বাস্তবে কি তা হয় ? হয় না। হওয়া সম্ভব না।

দুঃখে-কষ্টে নিশানাথ বাবুর দিন কাটতে লাগল। শীতের শেষে তাঁর কষ্ট চরমে উঠল। বিছানা ছেড়ে উঠতে পারেন না। এমন অবস্থা। হোটেলের একটা ছেলে দু'বেলা খাবার নিয়ে আসে। সেই খাবারও মুখে দিতে পারেন না। স্কুলের পুরান স্যাররা মাঝে-মাঝে তাঁকে দেখতে এসে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেন। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেন— এ যাত্রা আর টিকবে না। বেচারা বড় কষ্ট করল। তাঁরা নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলে তিনশ' টাকা নিশানাথ বাবুকে দিতে এলেন। তিনি বড় লজ্জায় পড়লেন। কারো কাছ থেকে টাকা নিতে তাঁর বড় লজ্জা লাগে।

এক রাতে তাঁর জ্বর খুব বাড়ল। সেই সঙ্গে পানির পিপাসায় ছটফট করতে লাগলেন। বাতের ব্যথায় এমন হয়েছে যে, বিছানা ছেড়ে নামতে পারছেন না। তিনি করুণ গলায় একটু পরপর বলতে লাগলেন— পানি। পানি। গম্ভীর গলায় কে একজন বলল, নিন জনাব, পানি নিন।

তুমি কে ?

আমি আলাউদ্দিনের চেরাগের দৈত্য।

ও আচ্ছা, তুমি।

নিন, পানি খান। আমি আপনাতেই চলে এলাম। যা অবস্থা দেখছি, না এসে পারলাম না।

শরীরটা বড়ই খারাপ করেছে রে বাবা।

আপনি ডাক্তারের কাছে যাবেন না, টাকা-পয়সা নেবেন না। আমি কী করব বলুন ?

তা তো ঠিকই, তুমি আর কী করবে।

আপনার অবস্থা দেখে মনটাই খারাপ হয়েছে। নিজ থেকেই আমি আপনার জন্যে একটা জিনিস এনেছি। এটা আপনাকে নিতেই হবে। না নিলে খুব রাগ করব।

কী জিনিস ?

একটা পরশপাথর নিয়ে এসেছি।

সে কী! পরশপাথর কি সত্যি সত্যি আছে না-কি ?

থাকবে না কেন ? এই তো, দেখুন। হাতে নিয়ে দেখুন।

নিশানাথ বাবু পাথরটা হাতে নিলেন। পায়রার ডিমের মতো ছোট। কুচকুচে কালো একটা পাথর। অসম্ভব মসৃণ।

এইটাই বুঝি পরশ পাথর ?

জি। এই পাথর ধাতুর তৈরি যে-কোনো জিনিসের গায়ে লাগলে সেই জিনিস সোনা হয়ে যাবে। দাঁড়ান, আপনাকে দেখাচ্ছি।

দৈত্য খুঁজে পেতে বিশাল এক বালতি নিয়ে এলো। পরশপাথর সেই বালতির গায়ে লাগাতেই কাঁচা হলুদ রঙের আভায় বালতি ঝকমক করতে লাগল।

দেখলেন ?

হ্যাঁ, দেখলাম। সত্যি-সত্যি সোনা হয়েছে ?

হ্যাঁ, সত্যি সোনা।

এখন এই বালতি দিয়ে আমি কী করব ?

আপনি অদ্ভুত লোক, এই বালতির কত দাম এখন জানেন ? এর মধ্যে আছে কুড়ি সের সোনা। ইচ্ছা করলেই পরশপাথর ছুঁইয়ে আপনি লাখ লাখ টন সোনা বানাতে পারেন।

নিশানাথ বাবু কিছু বললেন না, চুপ করে রইলেন। দৈত্য বলল, আলাউদ্দিনের চেরাগ যে-ই হাতে পায় সে-ই বলে পরশপাথর এনে দেবার জন্যে। কাউকে দেই না।

দাও না কেন ?

লোভী মানুষদের হাতে এসব দিতে নেই। এসব দিতে হয় নির্লোভ মানুষকে। নিন পরশপাথরটা যত্ন করে রেখে দিন।

আমার লাগবে না। যখন লাগবে তোমার কাছে চাইব।

নিশানাথ বাবু পাশ ফিরে শুলেন।

পরদিন জ্বরে তিনি প্রায় অচৈতন্য হয়ে গেলেন। স্কুলের স্যাররা তাঁকে ময়মনসিংহ হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে দিলেন। ডাক্তাররা মাথা নেড়ে বললেন, অবস্থা খুবই খারাপ। রাতটা কাটে কিনা সন্দেহ।

নিশানাথ বাবু মারা গেলেন পরদিন ভোর ছ'টায়। মৃত্যুর আগে নান্দিনা হাইস্কুলের হেডমাস্টার সাহেবকে কানে কানে বললেন, আমার ঘরে একটা বড় বালতি আছে। এটা আমি স্কুলকে দিলাম। আপনি মনে করে বালতিটা নেবেন।

নিশ্চয়ই নেব।

খুব দামি বালতি...

আপনি কথা বলবেন না। কথা বলতে আপনার কষ্ট হচ্ছে। চুপ করে শুয়ে থাকুন।

কথা বলতে তাঁর সত্যি-সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছিল। বালতিটা যে সোনার তৈরি এটা তিনি বলে যেতে পারলেন না।

হেডমাস্টার সাহেব ঐ বালতি নিয়ে গেলেন। তিনি ভাবলেন— বাহ্ কী সুন্দর বালতি! কী চমৎকার ঝকঝকে হলুদ! পেতলের বালতি, কিন্তু রঙটা বড় সুন্দর।

দীর্ঘদিন নান্দিনা হাইস্কুলের বারান্দায় বালতিটা পড়ে রইল। বালতিভর্তি থাকত পানি। পানির উপর একটা মগ ভাসত। সেই মগে করে ছাত্ররা পানি খেত।

তারপর বালতিটা চুরি হয়ে যায়। কে জানে এখন সেই বালতি কোথায় আছে!

বনের রাজা

সব বনেই একজন রাজা থাকে। তাই না ?

সাধারণত সিংহ হয় বনের রাজা। কারণ তার শক্তি বেশি। মেঘ ডাকার মতো শব্দ করে সে গর্জন করে। বনের সব পশুরা তাকে ভয় পায়। রাজা হবার জন্যে এমন একজন পশুরই তো দরকার— তাই না ?

এখন হয়েছে কী জানো, সোহাগপুর বনে কোনো রাজা ছিল না। কেন আমি ঠিক জানি না। মনে হয়, ঐ বনের পশুদের কোনো রাজার দরকার ছিল না। কিংবা তারা জানেই না যে, বনের রাজা দরকার। তাতে তাদের খুব অসুবিধাও হচ্ছিল না। খুব আরামেই দিন কাটছিল। পশুদের মধ্যে বেশ ভাব ছিল। তারা সারা বনে ছুটোছুটি করে, খেলাধুলা করে সময় কাটাত।

একদিন ঐ বনে কী করে যেন অনেক দূরের এক বন থেকে একটা শিয়াল এসে উপস্থিত হলো। সোহাগপুর বনে ঢোকার পথে তার দেখা হলো একটা হরিণের সঙ্গে। হরিণ অবাক হয়ে বলল, তুমি কে ভাই ?

শিয়াল বিরক্ত গলায় বলল, কেন, আমাকে দেখে চিনতে পারছ না ? শিয়াল এর আগে দেখোনি ?

তা দেখব না কেন ? তোমাকে তো চিনতে পারিনি, তাই জিজ্ঞেস করলাম। অনেক দূর থেকে এসেছ না-কি ভাই ?

হ্যাঁ, দূর থেকেই এসেছি। এই বনের নাম কী ?

সোহাগপুর।

ওয়াক থু! এটা আবার কেমন নাম ?

কেন ভাই, নামটা এমন খারাপ কী ?

খুবই খারাপ। আর শোন, আমাকে এরকম ভাই-ভাই করবে না। এইসব খাতির আমি পছন্দ করি না।

হরিণ খুবই অবাক হলো। এরকম বদমেজাজি পশু সে এর আগে দেখেনি। শুধু-শুধু রেগে যাচ্ছে। বিরক্তিতে বারবার মুখ কোঁচকাচ্ছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড!

শিয়াল বলল, এই হরিণ, শোন, আমাকে তোমাদের রাজার কাছে নিয়ে যাও তো। তাঁকে প্রথমে একটা সালাম দিয়ে আসি।

হরিণ অবাক হয়ে বলল, রাজা আবার কী ?

রাজা আবার কী মানে! এই বনে রাজা নেই ?

না তো।

রাজা নেই তো বন শাসন করে কে ? দুষ্টু পশুদের শাস্তি দেয় কে ? অন্য বনের পশুরা এলে তাদের তাড়িয়ে দেয় কে ?

কেউ দেয় না।

কেউ দেয় না ? এ তো দেখি বোকা পশুদের রাজ্য। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! অন্য বনের পশুরা এ খবর জানতে পারলে তোমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যাবে। তবে আমি যখন এসেছি একটা ব্যবস্থা করব। তুমি সবাইকে খবর দাও। একটা সভা হবে।

হরিণ আরো বেশি অবাক হলো। চিকন গলায় বলল, সভা আবার কী ?

সভা কী তাও জানো না ?

না।

সভা মানে হলো সব পশু এক জায়গায় মিলিত হবে। সেখানে বুদ্ধিমান পশুরা বক্তৃতা করবে। বোকারা শুনবে আর হাততালি দেবে। মাঝে-মাঝে মাথা নাড়বে।

হরিণ ছুটে গেল সব পশুদের খবর দেবার জন্যে। শিয়াল নদীতে হাত-মুখ ধুয়ে ভদ্র হলো। গাছের ডালে একটা বানর বসে অবাক হয়ে তাকে দেখছিল। শিয়াল বলল, এই যে বানর, একটা কাজ করো তো। একটা ফুলের মালার ব্যবস্থা করো।

মালা দিয়ে কী করবে ?

আরে ব্যাটা গাধা, বক্তৃতা হবে না! গলায় মালা না দিয়ে বক্তৃতা দেব কীভাবে ? এ তো দেখি মূর্খ পশুর দেশ।

বানর লজ্জা পেয়ে ফুলের মালা বানাতে ছুটে গেল। সভা শুরু হলো রাতে।

সুন্দর চাঁদনী রাত। চারদিকে ফকফকা জোছনা। বনের মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গায় সব পশুরা জমা হয়েছে। সবার মনেই কৌতূহল। হচ্ছে-টা কী ? এসব জিনিস আগে তারা হতে দেখেনি।

শিয়াল গলায় ফুলের মালা দিয়ে একটা উঁচু ঢিবিতে উঠে বসল। কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, সংগ্রামী পশুরা, আমার অভিনন্দন।

পশুরা সব মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগল। তারা কিচ্ছু বুঝতে পারছে না। 'সংগ্রামী পশুরা' এই শব্দটার মানেই তারা জানে না। শিয়াল এবার বক্তৃতা শুরু করল।

প্রিয় পশুসমাজ, লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাচ্ছে। কারণ আমি জানতে পেরেছি এই বনে কোনো রাজা নেই। হায় হায় কী কাণ্ড! রাজ্য আছে অথচ রাজা নেই। ছিঃ ছিঃ ছিঃ! প্রিয় পশুসমাজ, আপনারাও আমার সঙ্গে বলুন— ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

বনের সব পশু একসঙ্গে বলল— ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

শিয়াল বলল, রাজা হচ্ছে বনের শোভা। যিনি দুষ্টু পশুদের শাস্তি দেন। একটা খরগোস বলে উঠল, আমাদের মধ্যে কোনো দুষ্টু পশু নেই।

শিয়াল চোখ লাল করে বলল, বক্তৃতার মাঝখানে কথা বলছ— তুমিই তো দুষ্টু পশু। খবরদার, আর একটা কথাও বলবে না।

যেসব পশুরা নিজেদের মধ্যে ফিসফিস করছিল তারাও ফিসফিসানি থামিয়ে মূর্তির মতো হয়ে গেল। শিয়াল বলল, আজকের এই সভায় আমরা একজন রাজা ঠিক করব। সে হবে সোহাগপুর বনের রাজা।

একটা সিংহ গম্ভীর গলায় বলল, রাজা করবে-টা কী ?

কিচ্ছু করবে না। শুধু শুয়ে-বসে থাকবে আর প্রজাদের মঙ্গল চিন্তা করবে। অন্য পশুরা তার খাবার-দাবার এনে দেবে।

মজা মন্দ নয়।

এটা কোনো মজার ব্যাপার নয় সিংহ। খুবই কঠিন কাজ।

একটা বাঘ বক্তৃতা শুনতে-শুনতে বিরক্ত হয়ে উঠছিল। সে বলল, এত বকবকানি ভালো লাগছে না। যে-কোনো একজনকে রাজা বানিয়ে সভা শেষ করো, ঘুম পাচ্ছে।

শিয়াল হাসিমুখে বলল, একজন কাউকে ইচ্ছে করলেই তো রাজা বানানো যায় না। রাজার অনেক গুণ থাকতে হয়। রাজাকে হতে হবে অসম্ভব বুদ্ধিমান।

সঙ্গে-সঙ্গে একটা মাকড়সা বলে উঠল, তাহলে তো আমাকেই রাজা হতে হয়। আমার মতো বুদ্ধি কার আছে ? এরকম একটা জাল বানানো কি সহজ কর্ম!

সব পশু একসাথে বলে উঠল, ঠিক ঠিক ঠিক। ওকেই রাজা বানিয়ে দাও।

শিয়াল বিরক্ত হয়ে বলল, পোকামাকড়দের রাজা হবার কোনো নিয়ম নেই।

মাকড়সা বেচারা মন খারাপ করে জালের এক কোনায় লুকিয়ে পড়ল। শিয়াল বলল, রাজাকে হতে হবে সুন্দর। মাকড়সাদের মতো কুৎসিত কেউ রাজা হতে পারে না। রাজাকে হতে হবে রূপবান।

রাজাদের সুন্দর হতে হবে শুনে পাখিদের মধ্যে সাড়া পড়ে গেল। একটি ময়ূর পেখম মেলে হেঁটে গেল সবার সামনে। পাখায় তার নানান কারুকার্য।

শিয়াল বলল, পাখিদের রাজা হবার নিয়ম নেই। বনের রাজা হতে হবে একজন পশু। আশা করি পশু এবং পাখির মধ্যের তফাতটা আপনারা জানেন। পাখি ডিম পাড়ে। পশু পাড়ে না।

এই কথায় বাদুড়রা নড়েচরে উঠল। এক বুড়ো বাদুড় গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, শিয়াল সাহেব, আমরা কিন্তু ডিম পাড়ি না।

ডিম না পাড়লেও তোমরা পাখি। বনের রাজার চারটা পা থাকতে হবে। বানরের দুটা পা এবং দুটা হাত। কাজেই বানর হতে পারছে না। ভাইসব, খেয়াল রাখবেন বনের রাজার চারটা পা থাকতে হবে।

একটা গাধা প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছিল। বনের রাজার চারটা পা থাকতে হবে শুনে গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। অত্যন্ত গম্ভীর ভঙ্গিতে সবার সামনে দিয়ে হেঁটে গেল। তার দিকে তাকিয়ে বিরক্তমুখে শিয়াল বলল, যাদের পায়ে ক্ষুর আছে তাদেরও রাজা হবার নিয়ম নেই। কারণ বোকা পশুদের পায়েই ক্ষুর থাকে; যেমন— গাধা, গরু, ভেড়া, ছাগল।

সিংহ বলল, আমাদের রাজা হবার নিয়ম আছে তো ? না-কি তাও নেই ?

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় আপনাদেরও নিয়ম নেই। কারণ আপনাদের গায়ে শক্তি অনেক বেশি। কাজেই আপনারা হবেন রাজার সৈন্য। আপনাদের মধ্যে একজন হবেন রাজার প্রধান সেনাপতি।

সেটা মন্দ নয়।

বাঘ বলল, আমরা কী হব ?

আপনারা হবেন পুলিশ।

সেটা আবার কী ?

সৈন্যদের মতোই। ওটাও খারাপ না।

বাঘ খুশি হলো। তার মনে হলো পুলিশই-বা খারাপ কী ? সবাই তো আর হতে পারছে না।

শিয়াল বলল, রাজা হবার জন্যে এখন বাকি থাকছি শুধু আমি। এখন আপনারা ভোট দিন।

হরিণ ফিসফিস করে বলল, ভোট কী করে দিতে হয় আমরা জানি না।

ভোট দেয়া খুবই সোজা। যাদের হাত আছে তারা হাত তুলে ভোট দিন। যাদের হাত নেই তারা লেজ তুলুন।

ভোট হয়ে গেল।

শিয়াল হলো সেই বনের রাজা।

রাজা হয়েই সে সোহাগপুর নাম পাল্টে বনের নাম রাখল শিয়ালনগর। বনের ভেতরে ছোট্ট একটা খাল ছিল। সেই খালের নাম টোপাই খাল। তার নাম পাল্টে রাখা হলো শিয়ালখাল।

সে সিংহকে ডেকে বলল, এই বনে আরো যেসব শিয়াল আছে তাদের লেজ কেটে দেয়া হোক।

সিংহ অবাক হয়ে বলল, কেন ?

তাহলে রাজাকে চিনতে সুবিধা হবে। নয় তো অন্য কোনো শিয়াল দেখেও কেউ-কেউ তাকেই রাজা ভাবতে পারে।

সব শিয়ালদের লেজ কেটে দেয়া হলো। তখন বনের রাজা ঘোষণা করলেন, লেজ নেই এমন কোনো পশু রাজা হতে পারবে না।

এক বছরের মধ্যে বনের চেহারা পাল্টে গেল। হরিণরা মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়ায়। পাখিরা গান গায় না। বানররা মনের আনন্দে ডালে-ডালে কিচকিচ করে না। রাজার ভয়ে তারা অস্থির।

রাজাকে সবার মানতে হয়। রোজ একবার তাকে কুর্নিশ করতে হয়। পূর্ণিমার রাতে তার দীর্ঘ বক্তৃতা শুনে বলতে হয়, শিয়ালনগরের শিয়াল রাজার জয় হোক।

শিয়াল বলল, প্রিয় প্রজারা, তোমরা সুখে আছ তো ?

সবাই বলল, আছি আছি। সুখে আছি।

আনন্দে আছ তো ?

আছি আছি। আনন্দে আছি।

গাধাদের বুদ্ধি তো খুব কম থাকে, কাজেই সে হঠাৎ বোকার মতো বলে ফেলল, আমরা তো সুখে নেই। কষ্টের মধ্যে আছি। সবাই কেন বলছে সুখে আছি ?

তার এই কথায় শিয়ালের মুখ কালো হয়ে গেল। সে কড়া গলায় বলল, এই গাধা রাজাকে অপমান করার চেষ্টা করছে।

গাধা অবাক হয়ে বলল, আমি আবার আপনাকে কখন অপমান করলাম ?

শিয়াল বলল, পুলিশ ওকে শাস্তি দাও।

অমনি বাঘ তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুহূর্তের মধ্যে তার ঘাড় মটকে ফেলল। শিয়াল বলল, প্রিয় বন্ধুগণ, এই দেখো রাজাকে অপমান করার শাস্তি। গাধা জাতটাই হচ্ছে খারাপ। সব সময় আজেবাজে কথা বলে। বাকি যে সব গাধা আছে তাদের সবার মুখ সেলাই করে দেয়া যাক। বানর, তুমি সুচ-সুতা নিয়ে এসে সবার মুখ সেলাই করে দাও।

একটা ভেড়া এই কথায় খুবই অবাক হয়ে বলল, মুখ সেলাই করলে ওরা কীভাবে খাবে!

তা নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমিও মনে হচ্ছে গাধাদের দলে। তোমার শাস্তি হওয়া দরকার। বাঘ, যাও ওঁর মুণ্ডুটা ছিঁড়ে নাও।

ভেড়া বলল, আমার মুণ্ডু ছেঁড়া এত সহজ নয় বনের রাজা। আমরা ভেড়ারা সবাই একসঙ্গে থাকি। বাঘ কাছে এলে শিং দিয়ে এমন গুঁতো দেব যে, মজা টের পাবে।

বাঘ বলল, কথা ঠিক। ওদের শাস্তি না দেয়াই ভালো।

শিয়াল বলল, তাহলে বরং দেশ থেকে ওদের বের করে দাও।

কালো এবং পাহাড়ের মতো এক মহিষ এতক্ষণ চুপ করেছিল। সে উঠে দাঁড়াল। চকচক করছে তার বিরাট শিং। মহিষের চোখ লাল টকটক করছে। যেন সে এক্ষুনি কারো উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। মহিষ ভারি গলায় বলল, বন থেকে বের করে দেবার কথা কী যেন শুনতে পাচ্ছি। কথাটা আমার ভালো লাগছে না। যে বনে জন্ম, সেই বনে থাকবে না, যাবে অন্য বনে— এ কেমন কথা ?

সব কটা মহিষ একসঙ্গে মাথা নাড়াল। এক বুড়ো হরিণ বলল, অন্য বনের কেউ এসে রাজত্ব করবে, এটাই বা কেমন কথা। শিয়ালকেই যদি রাজা বানাতে হয় তাহলে আমরা আমাদের নিজেদের শিয়ালকেই বানাব।

সব হরিণ একসঙ্গে বলল, ঠিক ঠিক ঠিক।

টিয়া পাখিরা একসঙ্গে ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ বলে ডাকে। টিয়া পাখিদের ট্যাঁ শব্দের মানে হচ্ছে— খাঁটি কথা।

শিয়াল রাজা হাসিমুখে বলল, এই বনের শিয়াল কী করে রাজা হবে বল ? ওদের তো লেজ নেই। রাজা হতে হলে লেজ লাগে।

রাগী মহিষ বলল, ওদের লেজ কে কাটিয়েছে এটা তো আমরা জানি। কী ভাইয়েরা, জানি না ?

সব পশু একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল—

জানি জানি জানি
শেয়ালের শয়তানি।

শিয়াল এই ছড়া শুনেই হাসিমুখে বলল, সামান্য জিনিসটা নিয়ে তোমরা এত হৈচৈ করছ কেন ? গাধার মুখ সেলাইয়ের কথা থেকেই এতসব উল্টোপাল্টা ব্যাপার হচ্ছে। ওটা ছিল ঠাট্টা। পশুরা হচ্ছে আমার সন্তানের মতো, ওদের মুখ কী করে সেলাই করব বলো ? ঠাট্টা করছিলাম।

রাগী মহিষ বলল, আমার কাছে তো ঠাট্টা বলে মনে হয়নি।

মনে হয়নি কারণ তোমার বুদ্ধি খুব সূক্ষ্ম। খুবই চিকন বুদ্ধির পশুরা ঠাট্টা বুঝতে পারে না। প্রিয় পশুসমাজ, এই চিকন বুদ্ধির মহিষকে আমি প্রধানমন্ত্রী বানাতে চাই। আপনারা ভোট দিন।

মহিষ বলল, আমি প্রধানমন্ত্রী হতে চাই না।

তাহলে তুমি কী হতে চাও বলো। যা চাইবে তাই হবে। তোমার বুদ্ধি দেখে আজ আমি খুব খুশি হয়েছি। বলো, তুমি কী চাও ?

আমি চাই তুমি এ বন ছেড়ে চলে যাও। যেখান থেকে এসেছ সেখানে যাও।

শিয়াল তাকাল বাঘের দিকে। বাঘ মুখ ফিরিয়ে নিল।

শিয়াল তাকাল সিংহের দিকে। সিংহ বলল, মহিষের কথাটা খারাপ না।

শিয়ালের মুখ শুকিয়ে গেল। সে তাকাল সব পশুদের দিকে। কী রকম চোখ করে সব পশুরা তার দিকে তাকাচ্ছে। কী সর্বনাশের কথা!

বনের একটা শিয়াল বলল, এর লেজটা কেটে দিলে কেমন হয়?

সব শিয়াল একসঙ্গে বলল, মন্দ হয় না। ভালো হয়। খুবই ভালো হয়।

শিয়ালের কথা শেষ হবার আগেই কুমির এসে কুট করে কামড় দিয়ে শিয়ালের লেজ কেটে নিল।

শিয়াল চোখ লাল করে বলল, এটা কী হলো?

সব পশুরা মাথা ঝাঁকাতে-ঝাঁকাতে বলল, ভালোই হলো। হায়েনা হা হা করে হেসে উঠল।

গাছের ওপর থেকে বানররা হাততালি দিতে লাগল। তাদের আনন্দের সীমা নেই।

শিয়াল থমথমে গলায় বলল, রাজার সঙ্গে তোমরা খুবই বেয়াদবের মতো আচরণ করছ।

মহিষ বলল, তোমার লেজ নেই। তুমি এখন আর রাজা নও।

চারদিকে দারুণ হৈচৈ শুরু হলো। মহা আনন্দের হৈচৈ। সেই আনন্দ-উল্লাসের মাঝখান দিয়ে মাথা নিচু করে শেয়াল রওনা হলো নতুন কোনো বনের দিকে। যেখানে এখনো কোনো রাজা নেই।

সে মনে-মনে ঠিক করে ফেলল— নতুন বনে গিয়ে বলবে, যে শিয়ালের লেজ নেই সে-ই হবে রাজা। এটাই নিয়ম।

শিয়াল হেঁটে-হেঁটে যাচ্ছে। বনের শেষ প্রান্তে গিয়ে একবার পেছনে ফিরল। বনের সব পশুরা বলল, দূর হ, দূর হ।

সজারু এগিয়ে গিয়ে বলল, আরেকবার যদি পেছনে তাকাবি, তাহলে কিন্তু চোখ গেলে দেব।

শিয়াল আর পেছনে তাকাল না।

হলুদ পরী

আগামীকাল সুমির জন্মদিন

কেকের অর্ডার দেয়া হয়েছে।

মোমবাতিও কেনা হয়েছে। এই মোমবাতি কেনা নিয়ে সুমির মা এবং বাবার মধ্যে ছোটখাটো একটা ঝগড়াও হয়েছে। সুমির বাবা মনসুর সাহেব খুব চমৎকার চারটা মোমবাতি কিনে এনেছেন। সুমির মা তাই দেখে গম্ভীর। তিনি থমথমে গলায় বললেন, চারটা মোমবাতি কী মনে করে কিনলে?

মনসুর সাহেব বললেন, চার বছর শেষ হচ্ছে, তাই চারটা।

পাঁচ বছরে পড়ছে, মোমবাতি হবে পাঁচটা। এটাই নিয়ম।

মনসুর সাহেব বিরক্ত হয়ে বললেন, বাচ্চার সামান্য একটা জন্মদিন। এর আবার এত নিয়ম-কানুন কিসের ? চারটা এনেছি, এ-ই যথেষ্ট।

মোটেই যথেষ্ট নয়। সবকিছুর নিয়মকানুন আছে।

সুমির মনটাই খারাপ হয়ে গেল। কী সামান্য জিনিস নিয়ে দু'জন ঝগড়া লাগিয়ে দিয়েছে! মা কথা বলছেন রাগী-রাগী গলায়। বাবা গম্ভীর। সুমী বলল, আমার জন্মদিন লাগবে না। তোমরা ঝগড়া করছ কেন ?

মনসুর সাহেব সঙ্গে-সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, ঝগড়া করলাম কোথায় ? কোনো ঝগড়া হচ্ছে না। আমরা তর্ক করছি।

এমন রাগী-রাগী গলায় তর্ক করছ কেন ?

আচ্ছা যাও, আর করব না। এখন বলো তো জন্মদিনে কী চাও ?

কিচ্ছু চাই না।

কিচ্ছু চাই না বললে তো হবে না, কিছু একটা চাইতে হবে।

না, আমার কিচ্ছু চাই না। জন্মদিনও লাগবে না।

মনসুর সাহেব খুব হাসলেন। সুমিকে আদর করেলেন। পেটে কাতুকুতু দিয়ে হাসালেন। তারপর বললেন, এবার বলো কী চাই ?

সুমি বলল, আমাকে একটা হলুদ পরী দিও বাবা।

আচ্ছা ঠিক আছে, দেব।

সুমির মা বললেন, আমি কী দেব ?

তুমি দেবে চকলেট।

আচ্ছা দেব। এক বাক্স চকলেট।

সুমির ধারণা হলো, বাবা-মার ঝগড়াটা মিটে গেছে। সে ঘর সাজানো দেখতে গেল। ঘর সাজাচ্ছেন পল্টু মামা। পল্টু মামা আর্ট কলেজে পড়েন। তিনি লাল-নীল কাগজ দিয়ে যা সুন্দর করে ঘর সাজাচ্ছেন! দেখে সুমির মন খারাপ হয়ে গেল। কারণ জন্মদিন শেষ হয়ে গেলেই এ সব খুলে ফেলা হবে।

পল্টু মামা বললেন, দেখলি, কেমন ইন্দ্রপুরী বানিয়ে দিচ্ছি।

সুমি বলল, ইন্দ্রপুরী কী মামা ?

ইন্দ্রের প্রাসাদের নাম ইন্দ্রপুরী।

প্রাসাদ কী মামা ?

যা তো এখন। এত কী কী করলে কাজ করতে পারব না, রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর গল্প শোনাব।

সুমি হাসতে হাসতে নিজের ঘরে চলে গেল। পল্টু মামার গল্প যা সুন্দর! ভয়ের গল্প শুনলে ভয়ে কান্না এসে যায়। হাসির গল্প শুনলে হাসতে হাসতে পেট ব্যথা করে।

রাতে খাবার টেবিলে আবার সুমির বাবা এবং মার ঝগড়া বেধে গেল। সুমির মা বললেন, সামান্য একটা জিনিসও দেখে-শুনে কিনতে পার না। জন্মদিনের মোমবাতি একেকটা কলা গাছের মতো মোটা। কেকের উপর বসালে তো আর কেকই দেখা যাবে না।

এর উত্তরে সুমির বাবা ইংরেজিতে কী যেন বললেন। নিশ্চয়ই খুব রাগের কথা। কারণ এটা শুনেই সুমির মা রেগে গেলেন এবং তিনিও ইংরেজিতে হড়বড় করে কী সব বলতে লাগলেন।

পল্টু মামা বললেন, তোমরা দুজন মিনিটে-মিনিটে ঝগড়া কর কেন বলো তো ? তাও এই বাচ্চা মেয়ের সামনে। যা করতে হয় আড়ালে করো।

পল্টু মামার কথার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের মুখ হাসি-হাসি হয়ে গেল। কিন্তু সুমি বুঝতে পারছে এটা সত্যিকারের হাসি নয়। সে চলে গেলেই আবার তারা ঝগড়া শুরু করবে। বড়রা এরকম কেন ?

সুমির খুব মন খারাপ হলো। পল্টু মামা এমন মজার মজার গল্প করলেন, তবু তার মন খারাপ ভাবটা কাটল না। একসময় বলেই ফেলল, বড়রা এত ঝগড়া করে কেন মামা ?

পল্টু মামা সুমির মাথায় হাত বোলাতে-বোলাতে বললেন, এটা হচ্ছে বড়দের স্বভাব।

এত খারাপ স্বভাব কেন বড়দের ?

তা তো বলতে পারলাম না।

তুমিও তো বড়। কই, তুমি তো ঝগড়া করো না।

বিয়ে করি নি তো এখনো, তাই করি না। বিয়ে করবার পর দেখবি আমি শুরু করেছি। এখন ঘুমিয়ে পড়। কাল জন্মদিন, সকাল-সকাল উঠতে হবে।

জন্মদিনের শুরুটা হলো খুব সুন্দর। ভোরবেলা থেকে সবাই টেলিফোন করছে— হ্যাপি বার্থডে সুমি। শুভ জন্মদিন সুমি। জন্মদিনের শুভেচ্ছা নাও সুমি।

একেকবার টেলিফোন আসে আর কী যে ভালো লাগে সুমির! বিকেল থেকেই খালা এবং ফুপুরা আসতে শুরু করলেন। বাড়িভর্তি হয়ে গেল মানুষ। কেক কাটা হলো। জন্মদিনের গান গাওয়া হলো। তারপর শুরু হলো জন্মদিনের উপহারের প্যাকেট খোলার পালা।

সুমির বাবা সুন্দর কাগজে মোড়া একটা প্যাকেট দিয়ে বললেন, তোমার হলুদ পরী বাজারে কোথাও খুঁজে পাইনি, তার বদলে নিয়ে এসেছি রিমোট কনট্রোল মোটর কার।

সুমি বলল, আমি তো সত্যিকারের পরী চেয়েছি।

সত্যিকারের পরী মানে ?

যে পরী আকাশে উড়তে পারে। কথা বলতে পারে। গান গাইতে পারে। নাচতে পারে।

সুমির বাবা বললেন, এই মেয়েটা বলে কী! সত্যিকারের পরী বলে কিছু আছে না-কি ?

আছে, একশ'বার আছে।

সুমির কথায় সবাই হেসে উঠল। এমন রাগ লাগল সুমির যে কান্না পেয়ে গেল। সে ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, আমি সত্যিকারের পরী ছাড়া কিচ্ছু নেব না।

সুমির মা রাগী গলায় বললেন, ছেলেমানুষী করবে না সুমি। পরী, ভূত, পেত্নী এসব গল্পের বইয়ে থাকে। রূপকথায় থাকে। সত্যিকারের এসব কিছু নেই।

আছে, একশ'বার আছে।

না নেই। আমি যা বলছি শোনো। তোমার বাবার উপহার হাতে নাও। সবাইকে দেখাও।

সুমি রিমোট কনট্রোল কারের প্যাকেটটা মেঝেতে ছুড়ে ফেলে দিল। বাবা এবং মা দু'জনের মুখই গম্ভীর হয়ে গেল। সুমির বড় ফুপু বললেন, বাচ্চাদের এসব রূপকথার গল্প আসলে শোনাতে নেই। এতে অদ্ভুত অদ্ভুত সব ধারণা তৈরি হয়। ভূত, প্রেত, রাক্ষস-খোক্কস নিয়ে দিন-রাত ভাবে, সাহস কমে যায়।

সুমির বাবা বললেন, প্যাকেটটা হাতে নাও, নয়তো আমি খুব রাগ করব।

সুমি প্যাকেট হাতে নিল না। কান্না কান্না গলায় বলল, তুমি বলেছিলে পরী এনে দেবে। এনে দাও নি, আমি ভাতও খাব না, কিচ্ছু খাব না।

সুমির মা এসে মেয়ের গালে একটা চড় বসিয়ে দিলেন। জন্মদিনের আসরটা নষ্ট হয়ে গেল। সুমি রাতে কিছু খেল না। একা একা নিজের বিছানায় শুয়ে রইল। পল্টু মামা অনেক সাধাসাধি করলেন। সে খাবেই না।

মা এসে সুমির বিছানার পাশের টেবিলে ঢাকা দেয়া বাটি এনে রাখলেন এবং কড়া গলায় বললেন, আমি তোমাকে খেতে বলব না। তবে তোমার যদি খেতে ইচ্ছে হয় তাহলে খাবে।

আমি খাব না।

বেশ। না খেতে চাইলে না খাবে।

সুমির মা চলে গেলেন। যাবার আগে নীল বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে গেলেন। মশারি গুঁজে দিলেন এবং বললেন, রূপকথার বইয়ে অনেক কথাই থাকে। তার কোনোটাই ঠিক না। সেখানে বাঘ মানুষের মতো কথা বলে। কিন্তু তা কি সম্ভব ?

বাঘ কি মানুষের মতো কথা বলতে পারে ? কতদিন তো তুমি চিড়িয়াখানায় গিয়েছ। বাঘকে কোনোদিন মানুষের মতো কথা বলতে শুনেছ ?

সুমি জবাব দিল না। মা তাঁর ঘরে চলে গেলেন। সুমির ঘরটা মার ঘরের সঙ্গেই, মাঝখানে শুধু একটা দরজা। দরজাটা ভেজানো থাকে। কখনো লাগানো হয় না। সুমি রোজ মাঝরাতে উঠে বাবা-মার ঘরে চলে যায়। দু'জনের মাঝখানে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সুমি মনে মনে ভাবল আজ রাতে সে যাবে না। কিছুতেই যাবে না। আজ কেন, কোনোদিনই যাবে না। সে অনেকক্ষণ কাঁদল। একসময় কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়ল।

ঘুম ভাঙল অনেক রাতে। ঘুম ভেঙেই মনে হলো ঘরটা যেন কেমন অন্যরকম লাগছে। শোবার সময় নীল আলো ছিল, এখন কেমন হলুদ আলো। চারদিকে মিষ্টি গন্ধ। ঝুনঝুন শব্দ হচ্ছে। নূপুর পায়ে কে যেন হাঁটছে। আবার খিলখিল করে কে যেন হাসল।

এই সুমি।

সুমি চমকে উঠল। অদ্ভুত কাণ্ড! দুটি হলুদ পরী হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। তারা সুমির চেয়ে অল্প একটু বড়। দুজনের মুখ দেখতে অবিকল এক রকম, যেন দুজন জমজ বোন। গায়ের রঙ গাঢ় হলুদ— যেন সোনা দিয়ে তৈরি। তাদের গা থেকে চাপা হলুদ আভা বেরুচ্ছে। তাদের পাখা হালকা সবুজ রঙের, তার উপর সোনালি দাগ কাটা। দু'জন একসঙ্গে বলল,

কথা বলছো না কেন সুমি ?

তোমরা কে ?

ও-মা, আমাদের চিনতে পারছ না! আমরা হলুদ পরী।

কখন এসেছ ?

অনেকক্ষণ আগে এসেছি। কত নাচলাম, গান গাইলাম, কিছুতেই আর তোমার ঘুম ভাঙে না।

সুমি মশারির ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো। এই তো হলুদ পরী। গল্পের বইয়ের ছবির চেয়েও বেশি সুন্দর। সুমি বলল, তোমরা কি দুই বোন ?

না, আমরা দুই বোন না। সব পরীরা দেখতে একরকম হয়, তুমি জানো না ?

না তো।

এস আমরা এক সঙ্গে নাচি।

আমি তো কোনো নাচ জানি না।

কোনো নাচ জানো না ?

একটা শুধু জানি— আইলো দেয়া ঈশানে।

একটা পরী ফিক করে হেসে ফেলে বলল, আইলো দেয়া ঈশানে আবার কী ? এর মানে কী ?

মানে জানি না, শুধু নাচটা জানি।

এসো তাহলে তাই নাচি।

কিন্তু মা আর বাবা যদি জেগে যায় ?

জেগে গেলে জাগবে।

ওরা কী বলে জানো ? ওরা বলে পরী বলে কিছু নেই।

তাহলে আমরা কারা ?

পরী দুটি খুব হাসতে লাগল। একজন বলল, মানুষদের বেলায় উল্টা নিয়ম। মানুষ যত বড় হয় তত তাদের বুদ্ধি কমতে থাকে।

অন্য পরীটা বলল, নাচতে-নাচতে আমার খিদে লেগে গেছে। আমাকে কিছু খাওয়াবে সুমি ?

ঐ তো খাবার ঢাকা দেয়া আছে, খাও না। আমার জন্মদিনের খাবার।

পরী দু'জন টুকটুক করে সবটা খাবার খেয়ে ফেলল। ওদের খাবার নিয়ম খুব অদ্ভুত। খাবারটা মুখে দিয়েই চোখ বন্ধ করে ফেলবে। চিবাতে থাকবে অনেকক্ষণ ধরে। চোখ বন্ধই থাকবে, খুলবে না। খাবারটা পুরোপুরি গিলে ফেলার পর তাকাবে।

সুমি ভাই, আমরা এখন যাব।

আবার এসো ?

উঁহু আর আসব না। একজন মানুষের কাছে আমরা একবারই আসি। তাও সবার কাছে না।

সুমি বলল, আমার খুব ইচ্ছা করছে বাবা-মাকে ডেকে এনে তোমাদের দেখাই।

যাও ডেকে নিয়ে এসো।

না, ডাকব না। আমি তাদের উপর খুব রাগ করেছি।

কেন ? তারা পরী বিশ্বাস করে না, এই জন্যে ?

উঁহু। তারা শুধু নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, এই জন্যে।

পরী দুটি এই কথায় আবার খিলখিল করে হেসে উঠল। পাশের ঘর থেকে সুমির বাবা বললেন, কে হাসে ? কে ?

একটি পরী ফিসফিস করে বলল, সুমি, তুমি ঘুমের ভান করে পড়ে থাকো। দেখবে কী মজা হয়!

সুমি চট করে মশারির ভেতর চলে গেল। চাদর টেনে দিল।

পরী দুটি হাসছেই। কী সুন্দর রিনরিন ঝিনঝিন শব্দ হচ্ছে!

সুমির বাবা আবার বললেন, ও ঘরে কে ? এই বলে তিনি ঘরের বাতি জ্বালালেন। সুমির মাকে ডাকলেন। তাঁরা দু'জনই একসময় সুমির ঘরে ঢুকে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সুমির বাবা কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, এসব কী! এরা কারা!

সুমির মার মুখে কোনো কথা নেই। তিনি থরথর করে কাঁপছেন।। ভয়ে তাঁর গলা দিয়ে শব্দ বেরুচ্ছে না।

সুমির বাবা বললেন, এটা সত্যি নয়। এটা স্বপ্ন।

একটি পরী হাসতে হাসতে বলল, মোটেই স্বপ্ন নয়। গায়ে চিমটি কেটে দেখুন। ব্যথা লাগবে।

তোমরা কারা ?

পাখা দেখেও চিনতে পারছেন না ? আমরা হলুদ পরী।

সুমির মা ভাঙা গলায় চেঁচিয়ে ডাকলেন, ও পল্টু, ও পল্টু, তাড়াতাড়ি আয়। সুমি শুনতে পেল পাশের ঘরে পল্টু মামা জেগে উঠেছেন। চটিপায়ে ফটফট করে এগিয়ে আসছেন। একটি পরী সেই শব্দ পেয়ে জানালায় উঠে বাইরে ঝাঁপ দিল। ডানা ঝাঁপটে আকাশে উঠে গেল। অন্য পরীটি বলল, আপনারা দুজন শুধু ঝগড়া করেন কেন ? আর করবেন না, কেমন ?

এই বলে সে-ও জানালা দিয়ে বেরিয়ে গেল। সুমির মা ছুটে এসে সুমিকে জড়িয়ে ধরলেন।

সুমি বলল, কী হয়েছে মা ?

না না, কিছু হয়নি। কিছু হয়নি।

পল্টু মামাও ঘরে ঢুকে অবাক হয়ে বললেন, রাত দুপুরে সবাই জেগে! ব্যাপারটা কী ?

সুমির বাবা বললেন, কী যেন দেখলাম।

কী দেখলেন ?

না মানে বুঝতে পারছি না। চোখের ভুল বোধহয়। মনে হলো যেন...

যেন কী ?

না মানে

সুমির বাবা কথা শেষ করলেন না, তাকালেন সুমির মার দিকে।

এই ঘটনা অনেকদিন আগের। এখন সুমি অনেক বড় হয়েছে। হলিক্রস কলেজে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ে। তার নিজেরও সবকিছু পরিষ্কার মনে নেই। শুধু মনে আছে এক রাতে দুটি পরী এসেছিল তার ঘরে। সেই রাত থেকে তার বাবা-মা বদলে গেছেন। কখনো নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করেন না। দু'জনের মধ্যে খুব ভাব। এত ভাব যে মাঝে-মাঝে সুমির নিজেরই হিংসা করে।

পরিশিষ্ট

গ্রন্থপঞ্জি

১। অন্যদিন

হুমায়ূন আহমেদের সপ্তম উপন্যাস। এটি গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। প্রকাশক খান ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রচ্ছদশিল্পী সমর মজুমদার। ২০০৫ সাল থেকে প্রকাশক দিব্যপ্রকাশ। প্রচ্ছদশিল্পী ধ্রুব এষ। দাম ৫৫ টাকা। উৎসর্গ : জনাব নূরুননবী শেখ, ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল।

২। এই বসন্তে

'এই বসন্তে' হুমায়ূন আহমেদের অষ্টম উপন্যাস। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালের ঈদসংখ্যা রোববারে। একই বছর তা গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়। প্রকাশক নওরোজ সাহিত্য সম্ভার। ২০০৫ সাল থেকে প্রকাশক অন্যপ্রকাশ। প্রচ্ছদশিল্পী ধ্রুব এষ। দাম ১০০ টাকা।

উৎসর্গ : হুমায়ুন আজাদ, শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

এই উপন্যাসটি রোববার ঈদসংখ্যা ১৯৮৪ প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় আমার সব লেখাই প্রচুর ঘষামাজা করি। এখানে তা করা হয় নি। পরিমার্জনাহীন টানা লেখাতে একধরনের বন্য গন্ধ থাকে। এই বসন্তেতে তার প্রয়োজন ছিল।

৩। সবাই গেছে বনে

হুমায়ূন আহমেদের এই নবম উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৪ এপ্রিল ১৯৮৪ সালে। প্রকাশক খান ব্রাদার্স, ঢাকা। প্রচ্ছদশিল্পী কাজী হাসান হাবিব।

উৎসর্গ : প্রবাস বন্ধু রত্ন সভাপতি সুরিয়াকুমারন, আরি রত্না ভিজে তুঙ্গা, রেহমান ফরিদ।

৪। তোমাকে

হুমায়ূন আহমেদের দশম উপন্যাস। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। ১৯৯২ সাল থেকে প্রকাশক অনন্যা। প্রচ্ছদশিল্পী : ধ্রুব এষ।

উৎসর্গ : জরী, তোমাকে।

অনন্যার শোভন সংস্করণের ভূমিকা

অনন্যা প্রকাশনী আমার 'তোমাকে' উপন্যাসটি শোভন সংস্করণ প্রকাশ করছে। 'তোমাকে' নামটা বদলাতে পারলে খুশি হতাম। উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে 'তোমাকে' নামের কোনো সম্পর্ক নেই। এখন নাম পাল্টালে পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন বলে করলাম না। এমনিতেই আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ— আমি নানানভাবে পাঠক-পাঠিকাদের বিভ্রান্ত করি। অভিযোগের পাল্লা আর বাড়াতে চাই না।

হুমায়ূন আহমেদ
১৫/০৫/১৯৯২

৫। আনন্দ বেদনার কাব্য

হুমায়ূন আহমেদের প্রথম গল্প সংকলন। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। প্রকাশক স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা। প্রচ্ছদশিল্পী ধ্রুব এষ। দাম ১০০ টাকা।

উৎসর্গ *শামসুর রাহমান*, শ্রদ্ধাস্পদেষু, আমাকে দেখাও পথ ধ্যানী/ চোখ বন্ধ করে অন্ধকারে হেঁটে হেঁটে/ এখন কোথায় যাব ? কার কাছে যাব ?

এই গল্পসংকলনে ৯টি গল্প রয়েছে— আনন্দ-বেদনার কাব্য, এইসব দিনরাত্রি, উনিশশ' একাত্তর, জলছবি, খেলা, শিকার, পাখির পালক, অসুখ, কবি।

৬। তারা তিনজন

হুমায়ূন আহমেদ রচিত দ্বিতীয় সায়েন্স ফিকশন। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৪ সালে। প্রকাশক নওরোজ কিতাবিস্তান। প্রচ্ছদশিল্পী সমর মজুমদার

উৎসর্গ : বিপাশা, শিলা ও নোভাকে।

৭। দেবী

মিসির আলী-বিষয়ক প্রথম গ্রন্থ। প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮৫ সালে। প্রকাশক অবসর প্রকাশনী। প্রচ্ছদ বিদেশী আলোকচিত্র অবলম্বনে। সূচনায় রবীন্দ্রনাথ 'চিরকাল এইসব/রহস্য আছে নীরব/রুদ্ধ ওষ্ঠাধর জন্মান্তের নবপ্রাতে/ সে হয়তো আপনাতে/পেয়েছে উত্তর।'

৮। অমানুষ

না অনুবাদ না রূপান্তর, অন্যধরনের একটি বই। প্রথম প্রকাশিত হয় কাজী আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত 'রহস্য পত্রিকা'য়। গ্রন্থকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৫ সালে। প্রচ্ছদ সমর মজুমদার। ১৯৯৭ সাল থেকে প্রকাশক দিব্যপ্রকাশ। দাম ৮০ টাকা।

উৎসর্গ : কাজী আনোয়ার হোসেন শ্রদ্ধাস্পদেষু।

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

'অমানুষ' কাজী আনোয়ার হোসেন সম্পাদিত রহস্য পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয়। গল্পের কাঠামো এ কে কুইন্যালের 'ম্যান অন ফায়ার' থেকে নেয়া। কাঠামোগত সামান্য মিল ছাড়া 'ম্যান অন ফায়ারের' সঙ্গে এ বইয়ের কোনো সম্পর্ক নেই। 'অমানুষ' রহস্য পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর যাঁরা আমাকে চিঠি দিয়ে উৎসাহিত করেছেন, তাঁদের সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

হুমায়ূন আহমেদ
৩১/০১/১৯৮৫

৯। তোমাদের জন্যে রূপকথা

ছোটদের জন্য লেখা হুমায়ূন আহমদের প্রথম গল্প সংকলন। প্রথম প্রকাশ জুন ১৯৮৮। প্রকাশক প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা। প্রচ্ছদ মাসুক হেলাল।

উৎসর্গ ছোট্ট মনি, নীষা

এখানে রয়েছে ৭টি গল্প। গল্পগুলো হলো— কানী ডাইনি, রানী কলাবতী, বোকা দৈত্য, মিতুর অসুখ, আলাউদ্দিনের চেরাগ, বনের রাজা, হলুদ পরী।

রূপকথা আর কবিতার রূপকথা-চরিত্রের আধুনিকায়ন বইটির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

প্রথম প্রকাশের ভূমিকা

গল্প লেখার গল্প

যে সব বাবা-মা, তাঁদের বাচ্চাদের জন্যে এই বইটি কিনবেন কিংবা যাঁরা বইটি নাড়াচাড়া করে দেখবেন, শেষ পর্যন্ত কিনবেন না এই ভূমিকা তাঁদের জন্যে। হঠাৎ রূপকথা লেখার ইচ্ছে কেন হলো, প্রথম গল্প কী করে লিখলাম, সেই কথা বলতে ইচ্ছে করছে।

একদিন দুপুরে বাসায় ফিরে শুনি আমার বড় মেয়ে নোভা নিখোঁজ। ঘণ্টা দুই ধরে তাকে না-কি কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না। মেয়ের মা খুব নার্ভাস ধরনের, সে যখন কেঁদে ফেলার চেষ্টা করছে, তখন নোভাকে ভাঁড়ার ঘরের চৌকির নিচে আবিষ্কার করা হলো। সে গভীর মনোযোগে এমন একটি বই পড়ছে, যা তার পড়ার কথা নয়। মেয়ের মা রাগী গলায় বলল, এই বই তুমি কেন পড়ছো ? এটা বড়দের একটা বাজে বই। [জনান্তিকে বলে রাখি যে বই সম্পর্কে বলা হচ্ছে, সেটা আমারই লেখা একটা ভূত-প্রেত বিষয়ক বই।]

মায়ের কঠিন শাসনে মেয়ে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে বলল, 'বাবা এই সব বাজে বই না লিখলেই পারে। আমাদের জন্যে লিখলেই পারে।' তখনি ঠিক করলাম বাচ্চাদের জন্যে রূপকথা জাতীয় কিছু গল্প লিখব।

লিখতে গিয়ে দেখি কঠিন সমস্যা। রূপকথার গল্প মাথায় আসছে না। রাজা-রানি দিয়ে ঠিকই শুরু করি, কিন্তু এগুতে পারি না। রাজা, রানি এবং রাজকন্যারা কেমন যেন দূরের মানুষ হয়ে থাকে অথচ আমি চাচ্ছি এমন রাজার গল্প লিখতে, যে আমাদের ঘরের মানুষ। লিখতে না পারার কষ্ট যারা লেখালেখি করেন না তাঁরা কখনো জানবেন না। আমার কিছু ভালো লাগে না, সারাক্ষণ রূপকথার গল্প নিয়ে ভাবি। লিখতে বসি, কয়েক লাইন লিখে পাতাটা ছিঁড়ে কুটি-কুটি করে ফেলি। আবার লিখি। আবার ছিঁড়ে ফেলি।

এই সময় মেজো মেয়ে জ্বরে পড়ল। আকাশ-পাতাল জ্বর। আমার মন খারাপ হয়ে গেল। শিশুদের কষ্ট আমি কখনো সহ্য করতে পারি না, আর আমার এমনই ভাগ্য যে, আমার সামনেই শিশুরা সবচে' বেশি কষ্ট পায়।

একরাতে মেয়েটার জ্বর একটু কমেছে। আমি তার মাথার কাছে বসে আছি। বিকেলের দিকে ছোটখাটো একটা ঝড় হবার কারণে ঘরে ইলেকট্রিসিটি নেই। মোমবাতি জ্বালানো হয়েছে। চারদিকে অদ্ভুত আলো-আঁধার। আমার মেয়ে বলল, একটা গল্প বলো। আমি বললাম, কী গল্প ?

সত্যি গল্প।

আমি শুরু করলাম। গল্পটা যাতে সত্যি বলে মনে হয়, সেজন্যে আমি নিজেই হলাম তার নায়ক। আমি নিচু গলায় বলে যাচ্ছি—

একদিন কী হয়েছে শোনো, আমি সন্ধ্যাবেলা বাসায় ফিরছি। হঠাৎ দেখি রাস্তার ধারে কী যেন একটা পড়ে আছে। বেশ অদ্ভুত দেখাচ্ছে জিনিসটা। মনে হচ্ছে পেতলের তৈরি। আমি বাসায় নিয়ে এলাম। তখনো বুঝতে পারি নি এটা আসলে আলাউদ্দিনের আশ্চর্য প্রদীপ।

মেয়ে বলল, সত্যি বাবা ?

হ্যাঁ সত্যি।

আমরা তখন কোথায় ?

তোমাদের তখনো জন্ম হয় নি। তারপর কী হলো শোনো— মশারি খাটাবার জন্যে পেরেক পুঁততে হবে। আমি ঐ প্রদীপ দিয়ে পেরেকে বাড়ি দিতেই চেরাগের ভেতর থেকে দৈত্য বের হয়ে এল। কী ভীষণ চেহারা।

বাড়ি দিলে দৈত্য বের হয় না বাবা। ঘষা দিতে হয়।

আমার বেলায় বাড়ি দিতেই বের হলো।

তুমি খুব ভয় পেলে ?

হ্যাঁ। তবে দৈত্যটা ছিল ভালোমানুষ ধরনের। বেশ হাসি-খুশি। সে আমার জন্যে চা বানিয়ে আনল, মশারি খাটিয়ে দিল। পেরেক পুঁততে গিয়ে আঙুল থেঁতলে ফেলল।

আহা বেচারাকে দিয়ে তুমি এত কাজ করাচ্ছ কেন ?

আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, দৈত্যের প্রতি সহানুভূতিতে আমার মেয়ের ক্ষুদ্র হৃদয় আর্দ্র হয়ে উঠেছে। এই জিনিসই চাচ্ছিলাম। দেরি করলাম না, সেই রাতেই কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। লিখে ফেললাম— 'আলাউদ্দিনের চেরাগ।' বাকি গল্পগুলোও এইভাবেই লেখা। এদের ঠিক রূপকথা বলা হয়তো যাবে না। রূপকথার উপাদান ব্যবহার করে এ কালের কথা বলতে চেয়েছি।

খুব ভয়ে ভয়ে লেখাগুলো নিয়ে উপস্থিত হচ্ছি। কারণ খুদে পাঠকদের তুষ্ট করা খুব কঠিন কাজ। তারা গল্পের ভেতরে কোনোরকম ফাঁকি সহ্য করে না।

আমি কোনোরকম ফাঁকি দেবার চেষ্টা করি নি। তবু সন্দেহ যাচ্ছে না— আমি কি পারব আমার ক্ষুদে পাঠকদের কাছে পৌঁছতে! আর যদি পারি— সেই আনন্দ-সংবাদ কি খুদে পাঠকদের বাবা-মারা আমাকে দয়া করে পৌঁছাবেন ? এই কষ্টটা তাঁরা যাতে করেন সেই উদ্দেশ্যেই এত দীর্ঘ ভূমিকা।

হুমায়ূন আহমেদ
শহীদুল্লাহ হল, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

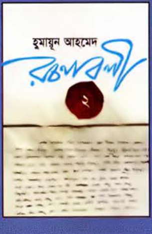

Humayun Ahmed
Rachanabali [Vol. II]

price Bdt 500.00
US $ 25.00
cover design :: Masum Rahman
anyaprokash<< dhaka<< bangladesh
www.anyaprokash.com

an ANYAPROKASH publication

ISBN 984 868 504 9

security
hologram